COMPLETE WORKS OF



ANIRUDDHA BOSE

Volume 1

COMPLETE WORKS OF



ANIRUDDHA BOSE

Volume 1

COMPLETE WORKS
OF



ANIRUDDHA BOSE

Volume 1



SMRITI PUBLISHERS
ESSENCE OF CREATIVITY
www.smritipublishers.com

COMPLETE WORKS OF ANIRUDDHA BOSE VOLUME 1
Published by **SMRITI PUBLISHERS**
Website: www.smritipublishers.com

First Edition: September 2019
First eBook Edition: September 2019

Illustration: Aniruddha Bose

Publisher
SMRITI PUBLISHERS
“OASIS” CF-41 Sector I Salt Lake City Kolkata 700064

ISBN Number: 978-81-937558-3-9

Dedicated to my wife

Smriti Bose

সূচিপত্র

উনিশ

কুড়ি

একুশ

বাইশ

তেইশ

চব্বিশ

পঁচিশ

ছাব্বিশ

সাতাশ

আঠাশ

উনত্রিশ

ত্রিশ

একত্রিশ

বত্রিশ

তেত্রিশ

চৌত্রিশ

পঁয়ত্রিশ

অনিরুদ্ধ বসু সম্বন্ধে কিছুকথা...



পেশায় প্লাস্টিক সার্জেন, নেশায় লেখক অনিরুদ্ধ বসুর জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ কলকাতায়। বিই কলেজের স্নাতক ইঞ্জিনিয়ার বাবা স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রমোহন বসু ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রৌপ্যপদক প্রাপ্ত বাংলার স্নতাকোত্তর মা স্বর্গীয় ইলা বসুর-র উৎসাহে ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। সেন্টজেভিয়ার্স স্কুল ও মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ। পরে ইউনাইটেড কিংডমেররয়্যাল কলেজ অফ সার্জেনস থেকে এফ আর সি এস। ইংল্যান্ডে বহু বছর কাটিয়েছে। দু-বছর মধ্যপ্রাচ্যে ও। এখন কলকাতার প্রখ্যাত প্লাস্টিক সার্জেন। দেশে ও বিদেশে অন্যতমদের মধ্যে একজন।

ছোটবেলা থেকেই লেখায় আসক্তি।স্কুল পত্রিকা ‘নিহিলউল্ট্রার’ সম্পাদক পদের দায়িত্বে থাকাকালীন নিয়মিত সাহিত্যচর্চা। বহুপত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি। পরে ইংল্যান্ড ও কুয়েতে সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ।

নিয়তি কেন বাধ্যতে। অনেক সময় নিয়তি বিভিন্ন আঙ্গিকে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ব্যস্ততার মধ্যে ২০০৬ শালে পায়ের হাড় ভেঙেছ’ মাস হুইল চেয়ারে থাকাকালীন সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় পুনরায় লেখালেখি শুরু। সেই সময় ‘অন্বেষণ’ উপন্যাস রচনা। যা প্রকাশিত হয় ২৫ আগস্ট ২০০৭-এ। নতুন আঙ্গিকের এই উপন্যাস সাড়া ফেলে দেয় সংস্কৃতি মহলে। বেস্ট সেলার শুধুই হয়নি,ব্যস্তপ্র্যাকটিসের মধ্যেও লেখায় অনুপ্রেরণা জোগায়। দ্বিতীয় উপন্যাস‘নিঃশব্দে’ওবেস্টসেলারের খাতায় নাম লেখায়। শুধু তাই নয়,লন্ডন বুক ফেয়ার ও জাতীয় মাধ্যমে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ভবিতব্য নতুন সৃষ্টির দিক খুলে দিগন্তে নতুন দিশার আলো দেখায়। বহুদেশ থেকে সংগৃহীত মানুষ,সমাজ,উপলব্ধি বন্দি হয় তার লেখনীর বিভিন্ন আঙ্গিকে। ব্যস্ততার মধ্যেও সময় খুঁজে নেয় নতুন চেতনার রচনা শৈলীতে। খুনের গল্পের বিবর্তন থেকে বৈজ্ঞানিক দর্শন তার লেখাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

এই খণ্ডটিতে প্রকাশিত চারটি উপন্যাস –**দেখা, তোমাকে..., ক্যানভাসে** ও **স্ফুলিঙ্গ**। প্রত্যেকটাই ভিন্ন স্বাদের। বারবার নিজেকে ভাঙার মধ্যেই তার নতুনত্বের প্রকাশ। প্র্যাকটিসের বাইরে সেখানেই তার শান্তি। তার প্রতিটা উপন্যাস মৌলিক চিন্তা ধারার ফসল। অনেক ক্ষেত্রে সাবেকিয়ানা ভেঙে বেরবার প্রয়াস। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্য কে নতুন করে খুঁজে চিনতে। তাকে লেখনীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।

লেখা তুমি আত্ম দহনে জ্বলো

যদি নতুন সুরে,নতুনতানে না কিছু বলতে পার।

রবীন্দ্রসংগীত, ক্লাসিক্যাল সংগীতের অনুরাগী অনিরুদ্ধ বসুর শান্তির নীড় স্ত্রী স্মৃতি বসু।


দেখা
অনিরুদ্ধ বসু

দেখা

DEKHA
A Bengali Novel by ANIRUDDHA BOSE
Published by **SMRITI PUBLISHERS**
Website: www.smritipublishers.com

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ২০০৯

দ্বিতীয় প্রকাশঃ জানুয়ারী ২০১০
দ্বিতীয় ই-বুক প্রকাশঃ আগস্ট ২০১৩

তৃতীয় প্রকাশঃ জুন ২০১৭
তৃতীয় ই-বুক প্রকাশঃ জুন ২০১৭

প্রচ্ছদপটঃ পাপিয়া ঘোষাল
অলংকরণঃ স্বপন দত্ত

উৎসর্গ

আমার পরমশ্রদ্ধেয়া মা

স্বর্গত ইলা বসুকে

যাদের সহযোগিতা এ লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়
পূর্ণশ্রী নাগ
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবাশিস গৌতম

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

অনিরুদ্ধ বসুর তৃতীয় উপন্যাস "**দেখা**"-র ভূমিকা লিখতে বসে কয়েকটা কথা মনে হল। মান আর হুঁশ ... এ দুই নিয়ে মানুষ। এ কথা অনেক শোনা। কিন্তু কি সত্যিই কখনো আমরা এ দুটো জিনিসের খোঁজ করি?

অনিরুদ্ধর এই ছোট উপন্যাসটি পড়ার পরে, অন্তত আমার একটা কথা মনে হচ্ছে যে, অনিরুদ্ধ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, এই লিরিক্যাল কাহিনিটিতে এই দুটি জিনিসেরই খোঁজ করে গেছে। মানুষের জীবনের অনেকগুলো মূল প্রশ্ন উঠে এসেছে এই উপন্যাসটিতে। পিতা কে? পিতৃস্নেহ কী এবং কেন? সন্তান স্নেহের আসল রূপটি কী? মা কাকে বলে? মাতৃত্ব কি অর্জন করা যায়? নাকি তা নিতান্তই এক জান্তব এবং জেনেটিক ব্যাপার মাত্র। জীবন আসলে কী এবং সবার উপরে এই জীবন নিয়ে কী করব?এই বেসিক প্রশ্নগুলির উত্তর না খুঁজে পেলে আমাদের 'হুঁস' হবে না। আর হুঁস না হলে 'মান'-ও আসবে না।

অনিরুদ্ধ এক আপাত সরল কাহিনির মধ্যে দিয়ে চিন্তাশীল পাঠককে জীবন সম্পর্কিত অনেকগুলি মৌলিক প্রশ্নর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, এটাই এক সংবেদনশীল লেখক হিসেবে ওর কৃতিত্ব।

অনিরুদ্ধর এই উপন্যাসটির নাম '**দেখা**'। ছোট্ট নাম, কিন্তু তাৎপর্য গভীর। দেখা শব্দটির পেছনে তিনটি ফ্যাকটর আছে। দ্রষ্টা, দৃশ্য এবং পর্যবেক্ষণ। কে দ্রষ্টা? যে দেখছে। এখানে কে দেখছে? শ্রাবস্তি, অরিজিৎ না মঞ্জরী? নাকি পাঠক? নাকি মহাকাল? দৃশ্যটাই বা কী? কী দেখছে ওরা? পশ্চিম দেখছে পুবের জাগতিক দৈন্যের পিছনের এক বিশাল বিরাট ঐতিহ্যকে। নাকি পুব দেখছে পশ্চিমের বৈভবের আড়ালের এক অনন্ত দৈন্যের হাহাকারকে? কী ভাবে দেখছে? অণুবীক্ষণে না দূরবীক্ষণে? নাকি বিহঙ্গদৃষ্টিতে?

এক আপাত সারল্যের আড়ালে, অনিরুদ্ধ এই জটিল প্রশ্নগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে। 'বুঝ জন যে জান সন্ধান' আর যদি সত্যিই মননশীল পাঠক এই প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজে পান, তবে সেটাই হবে তাঁর আসল দেখা... মান আর হুঁশকে দেখা। জীবনকে দেখা। জীবনের আসল '**দেখা**' কে দেখা।

আজ অনিরুদ্ধর এই তৃতীয় উপন্যাসটির ভূমিকা লিখতে বসে মনে হচ্ছে, খ্যাতিমান এই শল্যচিকিৎসক আরও আগে কলম ধরলে বোধহয় বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণালি ভাণ্ডার অনেক বেশি সমৃদ্ধ হত।

অলমিতি।

দুর্গাপুর জুন ২০০৯

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় প্রকাশের ভূমিকা

হয়ত অন্ধকারের পেছনেই দিয়া জ্বলে। ব্যথার নিভৃত আকাশে ফুটে ওঠে অরেকটা প্রেরণার অনুরণন। হয়ত বা ক্ষণস্থায়ী দুঃখকে বরণ করে নিতে হয় নতুন চেতনার আলোকে। যখন সৃষ্টি করাঘাত করে বিকিকিনির পৃথিবীতে। মনে হয় সব মিথ্যে। কেনই না লিখছি? কী হবে একান্ত মনের কথা নিবদ্ধ করে?

তাই দ্বিতীয় প্রকাশের ভূমিকা লিখতে বসে চোখে জল এসে গেছে। অনেক চোখের জল ফেলেছি প্রথম প্রকাশের পরে।

যে একদিন সাহিত্যকে বেছে নিয়েছিল তার নতুন চেতনার স্ফুলিঙ্গ হিসেবে, সে আজকে কেন লিখছে "কেনই বা লিখতে গেলাম?" সে কি অর্বাচীন কিছু প্রকাশকের ধৃষ্টতার স্বীকার হয়ে?

প্রথম প্রকাশ সাড়া জাগিয়েছিল বিদগ্ধ মহলে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরের চেতনায়। দুর্ভাগ্যবশত তা পৌঁছতে পারেনি জনসমক্ষে। কেন? অনেক প্রশ্নের উত্তর অপ্রকাশিতই থেকে যায়। তার কাহিনি কোনওদিন লিখব যদি বা ইচ্ছে হয়। এখন আমি নিঃশব্দ নাবিক। লিখে যাই আমার মনের ভাষা নীরবে অন্তহীন। উদাস মন, নিজেকে খোঁজে সর্বক্ষণ।

লিখি আমার মনের ছন্দে।

ভালো কী মন্দ ফুটবে আপনাদের পাওয়া না-পাওয়ার আনন্দে।

কলকাতা

জানুয়ারি ২০১০

অনিরুদ্ধ বসু

তৃতীয় প্রকাশের ভূমিকা

'দেখা'অনেক দিক দিয়েই আমার সাহিত্য জীবনের মাইলস্টোন।

এই উপন্যাসে রাবীন্দ্রিক ছোঁয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে, একবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে নতুন রূপে পদার্পণ। নতুন আঙ্গিকে, আজকের কথোপকথন ইংরেজি-বাংলা মেশানো রচনাশৈলী নিয়ে। হয়ত বাংলা ভাষার বিবর্তনে আগামীর দিশা। রবীন্দ্রোত্তর যে লেখা প্রকাশিত হয়েছে, সবই একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে। সরাসরি গল্প বলা। দেখার জাম্পকাট স্টাইল অন্যান্য সাহিত্যের থেকে ভিন্ন। বিদেশে থাকা, শ্রাবস্তির ইটোনিয়ান অ্যাক্সেন্ট দেশে কাটানোর পর কীভাবে বাংলা ভাষায় বিবর্তিত হল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যর প্রগতিতে ধ্রুবতারা।

প্রকাশনা জগতের অপকীর্তি, এই উপন্যাস, লেখালেখির সঙ্গে আমায় প্রকাশনার দুনিয়ায় আনে। প্রকাশকের গতের চিন্তাধারা ও খামখেয়ালিপানা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের প্রকাশনা স্মৃতি পাবলিশার্সের স্থাপন, বিন্যাস ও বিস্তার।

বারবার বেস্টসেলারই হয়নি, এখন পর্যন্ত আমার যত প্রকাশিত উপন্যাস, সর্বাধিক বিক্রিত ও আদৃত। বহুবার অনুমতি ছাড়া গল্পটিকে টুকতে গিয়ে বাংলা ছায়াচিত্র জগৎও বেকায়দায় পড়ে। রিলিজ আটকে অবশেষে আমার গল্প অনুকরণ বন্ধ করেছে। তাতেই প্রমাণ এই উপন্যাসের নিজস্বতা।

উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ উদ্বোধন হয়, মায়ের হাতে, আমার জন্মদিন ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯, গোর্কি সদনে। তাঁকে উৎসর্গ করা বলেই তাঁর আশীর্বাদ এই বইটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে। সব বাধা বিঘ্ন কাটাতে সহায়ক হয়েছে। এই উপন্যাসের হাত ধরেই আমার ইংরেজি সাহিত্যে পদার্পণ। দেখার ভাবানুবাদ The Vision দিয়ে ইংরেজি সাহিত্য যাত্রা শুরু।

আজকের যুগ-দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব কাহিনির মধ্যে দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি শাশ্বত দ্বন্দ্ব ও সত্যকে। মানুষের চিরন্তন চাওয়া-পাওয়া, যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্ন। ফলে দু'প্রান্তে জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা, সমগ্র যাপনচিত্রটাই মানুষের মধ্যে বিশাল তফাত গড়ে দেয়। সেখানেও কোথাও-বা মিলনের আর্তিটুকু রয়ে যায়। যা অনেকটা সাগরের সঙ্গে আকাশের মিলনে ব্যবধানরেখার বিস্তারের সঙ্গে তুলনীয়। দৃশ্যমান অথচ অগম্য। নিঃসঙ্গতার ফাঁক পূরণ করাটা ইদানীং সর্বত্র বহুজনের কাছেই যথেষ্ট কষ্টকর। যে ধারণাটা ক্রমশ চারদিকেই প্রকট হয়ে উঠছে। কাহিনির বিস্তারে চরিত্রগুলোর অবস্থান, তাদের

একাকিত্ব বা সংঘবদ্ধ বিচরণ ক্ষণস্থায়ী না কি চিরস্থায়ী সেই সিদ্ধান্ত পাঠকের। যুগের বিবর্তনে তা কতটা ছাপ রেখে যাবে, সময়ই বলে দেবে।

কালকের সাহিত্যকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্মৃতি পাবলিশার্স প্রকাশনাকে ধন্যবাদ। আর আমার স্ত্রী স্মৃতি বসুকে, যার ধৈর্য, সহায়তা ও উৎসাহ না থাকলে আমার চর্চা বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হত না।

কলকাতা

মে ২০১৭

অনিরুদ্ধ বসু

কাহিনি

হয়ত কবির চোখ দিয়ে দেখলে ফুটে উঠত নতুন কোনও এক বকুল। কিন্তু মনের ধূসর ক্যানভাসে একটা প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে তো কবিতা লেখা যায় না। শুধু অতীত, ভবিষ্যৎ আর বর্তমান ভুলে, এক মুহূর্তের জন্য হলেও সোনালি রোদের ভেসে বেড়ানো মেঘের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলে ফেলা যায় "বিউটিফুল!"

তাই নিজের মনের গভীরের দীর্ঘশ্বাসকে এক মুহূর্তের জন্য চেপে সাদা রাজহাঁসের মতো সারি সারি ভেসে বেড়ানো মেঘের দিকে তাকিয়ে শ্রাবস্তি নিজের মনেই বলল "বিউটিফুল"। এই মুহূর্তের এইটুকু পাওয়া যেন ঘন কুয়াশার মধ্যে বেঁচে থাকার একটুকরো স্ফুলিঙ্গ। তার মধ্যেই আছে সারা বিশ্বের আনন্দ।

মাটি থেকে ৩৬০০০ ফিট ওপরে ৩৬০ মাইল বেগে ছুটে যাওয়া ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের কলকাতা-হিথরো ফ্লাইটের জানলার পাশে বসে এ ছাড়া শ্রাবস্তির আর কী-ই বা করার থাকতে পারে?

রাজহাঁসের মত মাথা তুলে বোয়িং ৭৮৭ মহাকাশ বিদীর্ণ করে ছুটে চলেছে, একটা আধা-চেনা নিজের মাটির গন্ধ ছেড়ে এক ফেলে আসা স্বপ্নের পৃথিবীর মায়ালোকে।

কোনটা মায়া?

আর কোনটা তার ছায়া?

শ্রাবস্তির মনে হল, ছায়া মায়ার আলো-আবছায়াতে, এই মুহূর্তের সুন্দর সোনালি আলোর আভা, যা নীচে ভেসে থাকা মেঘের সারির বুকে ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে, সেটাই কায়া। তার নিজের আমির আবছায়ার ওপর, যাদুকরের মতো, তার ম্যাজিক ওয়ান্ড বুলিয়ে দিচ্ছে...

এবার বোধহয় জাগবার সময় হয়েছে।

সাদা ধবধবে মেঘগুলো কেমন হেসে হেসে নির্দ্বিধায় ভেসে বেড়াচ্ছে। যতক্ষণ না সূর্য মুখ লুকোবে পুঞ্জীভূত মেঘের গাঢ় অন্ধকারে। ততক্ষণ পর্যন্ত এরা ভেসে ভেসে, হেসে হেসে চলে যাবে অনন্ত অসীম মহাশূন্যে। দূর থেকে দূরান্তে। বাধাহীন, বন্ধনহীন, নীল আকাশে ওড়া পাখিটার মতো। এর মধ্যেই তারা খুঁজে নেবে তাদের নতুন দিগন্ত। কিংবা অন্তের সংকীর্ণতা থেকে বিপুলের অসীমতার অনন্ত।

"ম্যাডাম হোয়াট উড ইউ প্রেফার? টি ওর কফি?"

"কফি প্লিজ, উদাউট এনি সুগার ওর মিল্ক"

কফিতে চুমুক দিল শ্রাবস্তি। মনে পড়ে গেল, গতকাল পর্যন্ত ভোরবেলায় সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা অরিজিৎ বসু কফির কাপটা বেডসাইড টেবলে রেখে ঘরের পর্দা টানতে-টানতে একগাল হেসে বলত "মর্নিং

ম্যাম। এবার ওঠার সময় হয়েছে”

কেন যে নিজেই কফিটা নিয়ে আসত, বোঝেনি শ্রাবস্তি। বাড়িতে তো কাজের লোকের কোনও অভাব ছিল না। তবুও... শুধু কী ওয়েস্টার্ন কালচারে বড় হয়ে ওঠা শ্রাবস্তিকে, ইস্টার্ন আপ্যায়নের ছোঁয়া দেখাতে? না কি, মনের ভেতরের একরাশ পুঞ্জীভূত আবেগকে একটা নির্বাক ব্যাখ্যা দিতে?

নীচের মেঘটা কেটে গেছে। এখন রাতে পূর্ণিমা দেখা যায়। ভোর রাতে রিপোর্টিং টাইমে, পূর্ণিমার চাঁদ মিলিয়ে যাওয়ার আগে, পূর্বের সূর্যের রশ্মির লাল আভা ভরিয়ে দিয়েছিল দমদম বিমান বন্দর। সকালের রক্তিম আভা যেন হোলি খেলে যাচ্ছে ভোরের আজানের সুরে ভরা নীচে ভেসে বেড়ানো মেঘটার ফাঁকে। কিংবা তার মনের এক অদেখা আকাশে। শূন্যতা থেকে পূর্ণতার এক নতুন দিগন্তে। হারানো থেকে পাওয়ার এক নতুন মর্মে। নতুন মর্ম, যা তার হারিয়ে যাওয়া সত্তাটাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

স্টিভস থটস ডোন্ট মেক হার মেলাঙ্কলাস। স্পেন্ডিং এ মুনলিট ইভিনিং অ্যাট দ্য ফ্রেঞ্চ রিভেরা, ডোন্ট মেক হার হার্ট বিট উইথ অ্যান এক্সট্রা রিদিম। মোর সো, ইট ইজ দ্য ক্লাউডস, দ্যাট ফ্রিস হার ফ্রম দ্য চেনস অফ দ্য ফাইনাইট, টু ফ্যাদম দ্য আনলিমিটেড বাউন্ডারিস অফ দ্য ইনফাইনাইট।**সো সুইট ওয়াজ নেভার সো ফেটাল। আই মাস্ট উইপ। বাট দে আর ক্রুয়েল টিয়ার্স, দ্য সরোস হেভেনলি।**

***

নীল জিনস, সাদা টপস পরা শ্রাবস্তির প্রসাধনহীন মুখে যেন একটা অচেনার উদ্বেগ। এই অচেনাই তাকে বারবার হাতছানি দিয়েছে।

একবার...

বারবার...

হাজারবার।

তার পঁচিশ ছোঁয়া চেহারাটার মধ্যে ভারতীয় রং-এর বহিঃপ্রকাশ হলেও, কোথাও ব্রিটিশ ইটোনিয়ান অ্যাক্সেন্টটা বুঝিয়ে দেয়, দেহের সঙ্গে উচ্চারণের বিপুল পার্থক্য। যেন দু-দেশের টাগ-অফ-ওয়ার চলেছে। কে জেতে? একেবারে নারকেল যে। বাইরেটাই যা কালো। ভেতরটা সাহেবদের থেকেও পরিচ্ছন্ন ধবধবে।

সমুদ্রের পাড়ে বালির ওপর লাউঞ্জারে শুয়ে দিনশেষের বিদায় নেওয়া সূর্যটার দিকে চেয়েছিল শ্রাবস্তি। সমুদ্রের জল পা ছুঁয়ে যাচ্ছে। চটিটা গাড়িতে ফেলে খালি পায়ে বসে উপভোগ করতে করতেই হারিয়ে গেছিল শ্রাবস্তি।

অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিয়েছিল দূর প্রান্তরে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পৃথিবীর সঙ্গে তার আলো-আঁধারি লুকোচুরি। বিদায় নেওয়ার আগে দিনান্তের শেষ রাগিনী শুনিয়েছিল শ্রাবস্তি বসুকে। ঝাউবনের ও-প্রান্তে, অবিরাম ঝিঁঝি পোকার ডাক অর্কেস্ট্রায় এক নতুন সিম্ফনি বাজিয়ে জানান দিয়ে গিয়েছিল - সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই।

পশ্চিমবাংলার সমুদ্র সৈকতটা ওদেশের থেকে অনেক আলাদা। এখানে করফু, মাজোরকা বা ইবিজার মতো উন্মাদনা নেই। এখানে আছে, নিঃশব্দ এক নিঝুমতা। এখানে আছে, নিজের জন্য কয়েক মুহূর্ত। এখানে আছে, সমুদ্রপাড়ে বসে অরিজিৎ বসুর কথা শোনা।

নতুন করে খুঁজে নেওয়া অনেক দিনের ফেলে আসা জীবনের গান। অনেক প্রশ্ন। অনেক কৌতূহল। সব যেন শেষমেশ গিয়ে মিশেছে মোহনায়... হারিয়ে যাওয়া পুরনো স্মৃতি আঁকড়ে, কিছু মুহূর্ত ভাগাভাগি করে নেওয়া ।

বাবার দিকে তাকিয়ে শ্রাবস্তি বলেছিল “বিউটিফুল!”

অরিজিৎ বসু কিন্তু অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে ছিল না। ভারী চশমার ফাঁক দিয়ে দেখছিল তার বহুদিনের হারানো মেয়ে শ্রাবস্তিকে। যেন বহুদিন আগের নিজেকে দেখা।

অনেকদিন আগে লন্ডনের নরউড গ্রিনের ফ্ল্যাটে সে ওকে জীবনের প্রথম পদক্ষেপ নিতে শিখিয়েছে। মন বলছিল, শেষ বেলায় কী সেই মেয়ে তাকে হাত ধরে অন্তিম পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যাবে? জীবনের সব চাওয়াকে মুছে, এইটুকু পাওয়ার অপেক্ষায় কী দিন গোনা?

মেয়েকে বলেছিল “চা খাবে?”

“ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য হোটেল, ড্যাড” শ্রাবস্তি বাবার দিকে ঘুরে প্রশ্ন করছিল।

“কেন যেতে হবে? ওই ঝুপড়িতেই চা পাওয়া যায়”

“আর ইউ সিওর, আই ওন্ট গেট এ টামি আপসেট?”

“একেবারেই নয়। ভাঁড়ে চা। তাও আবার বয়েন্ড। ইউ কান্ট গেট এ মোর স্টেরাইল অ্যাটমসফিয়ার” ড্রাইভারের দিকে ইঙ্গিত করে চা আনতে বলেছিল।

অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে শ্রাবস্তির মনে হয়েছিল, ছোটবেলায় শোনা দ্য সান নেভার সেটস ইন ব্রিটেন, কেমন ধোঁয়াশা ভরা। অর্থহীন।

এমন সূর্যাস্ত তো আগে দেখেনি। সারাদিনের ফ্যাচফ্যাচে বৃষ্টির মধ্যে সূর্যর দেখা পাওয়াই ভার। সূর্যাস্ত তো দূরের কথা। পাউন্ড খসিয়ে ইবিজা, ম্যালোর্কা, বা সিসিলিতে গিয়ে প্রকৃতিকে খুঁজতে হয়। আর এখানে তিন-ঘণ্টা ড্রাইভ করলেই বিউটিফুল সি-বিচ উইথ অ্যাম্পেল গ্রিনারি।

এখানে উন্মাদনা নেই নাইট লাইফ নেই ডিস্কো নেই

আছে একটা শান্ত নিরবচ্ছিন্ন মাদকতা।

উজোর নেশায় ভারী বাজনার তালে তালে ভোর রাত পর্যন্ত উন্মাদ নৃত্যের মধ্যে ডুবে ক্লান্ত অবসন্ন নেশাগ্রস্ত দেহটাকে খাটের মধ্যে ছড়িয়ে হারিয়ে যাওয়ার থেকে, এই শান্ত নির্জন পরিবেশে আরেকবার একাকী, নিজেকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখা।

অরিজিৎ জিজ্ঞেস করল "কিছু খাবে?"

"নো ড্যাড.... নট দ্যাট হাঙ্গরি"

বাবার থেকে চোখ ঘুরিয়ে আবার তাকিয়েছিল দিন শেষের ক্লান্ত শান্ত সমুদ্রে। সূর্যের শেষ-রশ্মির আভাটা আছড়ে পড়েছে। সেই আভায় মুক্তোর মতো চিকচিক করছে জল। মৃদুমন্দ ঢেউগুলো প্রতি মুহূর্তে সেই ঝিলিকের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। পেছনে ঝাউগাছের সারির ফাঁকে আলোর আবির ছড়িয়ে বাবার মুখে।

বাবা চিরকালই ফরসা। বাঙালি বলে চেনাই যায় না। মনে হয়, কোনও আরব দেশের বাসিন্দা। ৫' ৮" লম্বা। ছিপছিপে গড়নের মধ্যভাগে একটু মেদ। সৌম্য চেহারা। সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবিতে যেন অ্যারেবিয়ান নাইটস-এর শেখ। পাঠান বলেও ভুল হতে পারে। ডান হাতের রোলেক্স ঘড়িটায় আভিজাত্যের প্রকাশ।

"ড্যাড, দ্য সানসেট হিয়ার হ্যাস এ সিরিনিটি, এ ট্র্যাঙ্কুইলিটি, হুইচ ইজ সো ভেরি মিসিং ইন আওয়ার পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড"

অরিজিৎ হেসে বলেছিল "দ্য সানসেট ইজ দ্য সেম এভরিহোয়ার। হোয়াট ইজ মিসিং ইজ দ্য ওয়ে অফ লুকিং"

শ্রাবস্তি জবাব দেয়নি। সিসিলি, নিসে বা ইবিজাতে অনেক উন্মাদনা। তাই সময় নেই প্রকৃতিকে অনুভব করার। সেখানে প্রকৃতি একটা অবগুণ্ঠন। যার ছত্রছায়ায় সেই ইংরেজি ফিস অ্যান্ড চিপস উইথ মাসড পিস-টাই বেশি আকর্ষণীয়।

সেদিন যখন ফোনে শ্রাবস্তি বলল "ড্যাড আই ওয়ান্ট টু মিট ইউ" বিশ্বাস করতে পারেনি অরিজিৎ। ঠিক শুনেছে তো? বয়স হয়ে গেছে। কানের কী কোনও ভরসা আছে?

"শ্রাবস্তি ফ্রম ইংল্যান্ড?"

"ইয়েস ড্যাড" ওপাস থেকে ভেসে এসেছিল শ্রাবস্তির ইটোনিয়ান অ্যাকসেন্ট।

কতদিন মেয়েকে দেখেনি। চিনতে পারবে তো? কাবুলিওয়ালার মতো শ্রাবস্তির ছোটবেলার ছবিটা বুকে আঁকড়ে ধরে এত বছর পার করে দিয়েছে। সেই ছোট্ট শ্রাবস্তি পঁচিশে পা দিয়েছে। ওর জন্মের শুভক্ষণের কথা মনে হতেই শিউরে উঠেছিল অরিজিৎ বসু।

প্রতিবছর শ্রাবস্তির জন্মদিনে ওর মঙ্গল কামনায় কালীবাড়িতে পুজো দেয়। স্বপ্নেও একবার ভাবেনি শ্রাবস্তি কী রকম দেখতে হয়েছে। ভাবলেই কষ্ট। ভাবলেই দুঃখ। শুধু মূর্তিপুজোয় নির্বাক আশীর্বাদ জানায় হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে।

সেই মেয়ে আজ তার পাশের লাউঞ্জারে বসে মন্দারমণিপুরের সূর্যাস্ত উপভোগ করছে। ভাবতে না পারলেও, এটাই সত্যি। এই সত্যটাই তো জীবন। বাস্তবের সামনে মুখোমুখি। তাকে অনুভব করতে ফিরে গেছে অতীতে...

শ্রাবস্তি অরিজিতের দিকে তাকিয়ে বলল "টুডে ইজ পূর্ণিমা, ইজন্ট ইট?"

পূর্ণিমা মানে বিথোভেনের মুনলিট সোনাটা। বিথোভেনের সোনাটার বাইরেও তো কোনও সুর থাকতে পারে। সেটা খুঁজতেই এখানে আসা। নতুন করে, রক্তের বন্ধনকে নতুন রূপে চেনা। নতুন ছন্দে, নতুন প্রাণের জোয়ারে। আবার নতুন করে, নতুন আবেগে, নতুন পথ চাওয়া।

"হ্যাঁ আজ পূর্ণিমা" অরিজিৎ ফিরেছিল।

কিছুক্ষণ পরেই বাইরের পূর্ণিমা ভরে দিয়েছিল অন্ধকার সমুদ্রসৈকত। কিন্তু অরিজিতের জীবনের পূর্ণিমা, শ্রাবস্তির ফোন পাওয়ার পর থেকেই মিটমিট করে হাসতে শুরু করে দিয়েছে। জ্যোৎস্নায় ভরিয়ে দিয়েছে তার আবছায়া অন্ধকারে ভেসে বেড়ানো হৃদয়ের সিল্যুট।

***

হোয়েন স্টিভ ওয়াকড আউট অফ হার উইথ লিন্ডা, শ্রাবস্তি হ্যাড লস্ট হার ওয়ার্ডস।অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট, ইন দ্য টোয়াইলাইট অফ হার মেলাঙ্কলি সি কুড হিয়ার এ ভয়েস, এ ভয়েস ফ্রম উইদিন 'দ্য এন্ড মার্কস দ্য বিগিনিং ওফ এ নিউ এরা'

আর সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হয়েছিল আরেক অনুরণন। বিচ্ছেদের মধ্যে জীবনকে পাওয়ার নতুন চেতন।

রঞ্জিতা বলেছিল "নেভার মাইন্ড। ইট হ্যাপেনস ইন অল অফ আওয়ার লাইভস"

শ্রাবস্তির মনে হয়ছিল, যদি হওয়ার-ই থাকে নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনও কারণ আছে। সেই কারণটা খুঁজতে হবে। বারবার একই গোলকধাঁধার খেলায় ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজন কী?

রঞ্জিতা ঠিক বলছে না। মাকে সে ছোটবেলা থেকেই দেখছে। জীবনের সব চাওয়াকে দৈনন্দিন হিসেবের চোরাবালিতে ফেলে স্বর্গ খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্বর্গ যেন মেটিরিয়ালিজম-এর চৌহদ্দির মধ্যে বন্দি। সেই স্বর্গটার

জন্যই তো মায়ের হাত ধরে আজ সে বিলেতে সব কিছু পেয়েছে। বাবা তাকে কিছুই দেয়নি, খালি বুদ্ধিটুকু ছাড়া।

স্টিভের কাছে ধাক্কা এক নতুন অনুরণন। তার না-দেখা নিজের অস্তিত্বের আরেক অবগুণ্ঠন। দ্যাট শ্রাউড হ্যাস টু বি রিভিল্ড। তাহলে কী মায়ের দেখানো পৃথিবীর মধ্যে কোথাও খামতি ছিল? আগেই সন্দেহ ছিল। এখন নিঃসন্দেহ হল। মা ঠিক নয়। যদি ঠিক হত, স্টিভ তাকে ছেড়ে চলে যেত না। তার নিজস্ব পূর্ণতার মধ্যে কোথাও যেন একটা শূন্যতা। শ্রাবস্তি তো আর ভারতবর্ষ দেখেনি। কী করে জানবে সে ওয়েস্টার্ন পৃথিবীর বাইরের কথা?

তাই এবার মায়ের কথার তালে, ছন্দ না মিলিয়ে জীবনের ঝংকারে তাকে খুঁজে পেতে হবে। এবার সময় হয়েছে জানা থেকে অজানায় পাড়ি দেওয়ার... নিজেকে চেনার... নিজের রক্তটাকে খুঁজে নেওয়ার...

ছোট্ট সিন্দুকে লুকিয়ে থাকা চিরকুটটা বার করে দেখেছিল নম্বরটা। বাবার হাতে লেখা। শেষ বিদায়ের উপহার।

"ইফ ইউ নিড মি জাস্ট কল মি" বাবা চিরকুটটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল।

চেহারাটাও একটা আবছায়া অস্তিত্ব। মানুষটার কথা এতদিন পরে কতটুকুই বা মনে আছে? একটা নাম। একটা পদবি। এক অপরিচিত মানুষের অস্তিত্ব, সে আজও পরম্পরার মতো বহন করে চলেছে। তার মূল্য কী ব্রিটিশ বার্থ রেজিস্ট্রারেই শেষ হয়ে গেছে?

ইন্টারনেট ঘেঁটে বাবার হদিস মিলিয়ে নিয়েছিল। নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর। তখন রাত ক'টা জানে না। ইন্ডিয়াতে বোধহয় সকাল। ফোনটা তুলে বলেছিল "ড্যাড আই ওয়ান্ট টু মিট ইউ"।

একটা পঙক্তি। অনেক না-বলা কথা বলে দেয়।

একটা উক্তি। অনেক সুপ্ত চেতনাকে, জাগিয়ে দেয়।

একটা সুদূর... বিপুলতায় হারিয়ে যাওয়া আবছায়া অবয়বের মধ্যে হাতছানি দিয়ে কাছে টেনে নেয়।

শুরু হয়ে গিয়েছিল মনের ভেতরে, জানা থেকে অজানার পথে ছোটার অশ্বমেধ। ঘোড়া ছুটবে। যেদিকে ছুটবে, সেদিকেই যেতে হবে।

মা তো অশ্বমেধ যজ্ঞে বিশ্বাস করে না। অতীত কলকাতার কোন এক বাই-লেনে ফেলে এসেছে। ডার্টি পলিউটেড কলকাতার লেক গার্ডেন্স, রেল লাইনের ধারে গলির চায়ের দোকানে প্রাণের স্পন্দন নেই। প্রাণের ঝংকার আছে হ্যারডস-এর সেলে। টটেনহাম কোর্ট রোডের বুটিকে। বিদেশি ধাঁচে নিজেকে ময়ূরপুচ্ছধারী কাক সাজিয়ে ফেলায়।

মা বিশ্বাস করে শুধু জাগতিক সুখে। যা দেখা যায়, তাই সত্য। যা বোঝা যায়, তাই ভবিতব্য - এমনটাই।

এই সময়ের মধ্যে যা কিছু করে নেওয়া যায়, সেটাই জীবন। যেটুকু পাওয়া যায়, সেটাকে পঞ্চেন্দ্রিয়র মধ্যে সীমিত রাখাই ভালো। এর বাইরের পৃথিবীকে জেনেই বা কী লাভ?

সেই বন্ধন ছেড়ে বেরতে এবার মন ডুকরে কাঁদছে।

সব দেখেও, কিছুই দেখা হল না।

সব জেনেও, শেষ পর্যন্ত কিছুই বোঝা হল না।

সব পেয়েও, কিছুই পাওয়া হল না।

তাই মায়ের অজান্তে, গভীর রাতের নিস্তব্ধ অন্ধকারে শুরু হয়ে গেল, শ্রাবস্তির ঘোড়া ছোটানোর পালা।

***

মা কোনওদিন বুঝবে না। যার চাওয়া-পাওয়া ভোগের আড়ম্বরে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় স্বামী ডেভিডের ক্যান্টারবেরির প্রাসাদের অঢেল সবুজের মধ্যে, হিটেড সুইমিং পুল থেকে বাইরের শীতের সূর্যটাকে উপভোগ না করে, লাউঞ্জারে শুয়ে, বারবার হিসেব মেলাবার চেষ্টা করেছে। মার্সিডিজ কনভার্টিবল নিয়ে ছুটে গেছে শপিং সেন্টারে। ফিরে এসেছে গাদা-গুচ্ছের জামাকাপড়, পার্ল নেকলেস থেকে, রয়েল ডল্টন-এর চৌত্রিশতম ডিনার সেট নিয়ে। লেক গার্ডন্সের এঁদো গলিতে বসে, ভাবতেও কী পারত, সে একদিন এই বিশাল প্রাসাদে রাজত্ব করবে?

স্বপ্ন না দেখলে কিছু হয় না। তাই স্বপ্ন দেখাই ভালো। সেই স্বপ্নের হাত ধরেই বিদেশে পাড়ি...

তারপর?

যখন লাগুভেলিনের শেষ পেগে গলা ভিজিয়ে পুলিশ চোখের আড়ালে ডেভিড বাড়ি ফিরেছে, মা তখন লারপোস খেয়ে, গভীর ঘুমে মগ্ন।

ঘুমের মধ্যেই শান্তি। তৃপ্তি। স্বপ্নের মাদকতা।

ডেভিড কিন্তু মায়ের ঘরের দিকে যাওয়ার চেষ্টাও করেনি। ক্যান্টারবেরির ম্যানসনে কী ঘরের অভাব? কোনও একটা ঘরে টাই না খুলেই জুতো পরা অবস্থায় নিজের অসাড় দেহটা এলিয়ে দিয়েছে।

তারপর?

আর মনে নেই।

পরের দিন সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট তৈরির সময় ভেবেছে - আজ যদি সুজি থাকত? তাহলে বেকন অ্যান্ড এগস-টা নিজে করতে হত না।

রঞ্জিতা টোস্টের ওপর স্ক্র্যাম্বেল্ড এগস-টা পেতে বলেছে “আই মাইট বি লেট টুনাইট”

ডেভিড চুপ করে থেকেছে। প্রশ্ন করলে, রঞ্জিতার মুখের ঝামটা খেতে হবে। খোদ ব্রিটিশ সাহেব তো। খুব ভালো করেই জানে, কখন সরে পড়তে হবে।

ব্রেকফাস্ট টেবলে শ্রাবস্তি নেই। নিস্পৃহ দাম্পত্য জীবনের অর্থহীন বচসার মধ্যে তার কোনও জায়গা নেই। মা ইউনিভার্সিটিতে চলে গেলে ‘বাবা’ প্রপার্টির তদারকিতে বেরিয়ে যাওয়ার পর, শ্রাবস্তি নিজের ব্রেকফাস্ট নিজেই তৈরি করে নিতে পারবে।

“ক্যান উই টক?” স্টিভ কিছু বলতে চাইছিল।

“হোয়াট ইজ দেয়ার টু টক? ইটজ ওভার। ইউ ওয়ান্টেড ইট দ্যাট ওয়ে”

“স্টিল উই কুড বি ফ্রেন্ডস?”

“বেটার নট। হোয়াটজ দ্য পয়েন্ট ইন টেকিং এ রিলেশনশিপ ফরোয়ার্ড, হুইচ হ্যাস অলরেডি এন্ডেড?”

না চাইতেও এন্ড যখন তার ছোট্ট স্বপ্নমাখা জীবনকে এলোমেলো করে দিয়েছে, তখন ধোঁয়াশায় ভরা শেষটাকে আরও ধোঁয়াশায় টেনে নিয়ে লাভ কী? তাছাড়া পুরোনো একটা অস্তিত্বহীন সম্পর্কের চোরাবালিতে জড়িয়ে, নিজের কনফিউশনটাকে আর বাড়াতে চায় না। মনে মনে শেষটাকে পেছনের অন্ধকারে ফেলে, নতুন সানরাইজকে বরণ করে নিয়েছে শ্রাবস্তি। স্টিভ এখন অতীত। ইউসিএইচ-এর দিনগুলো এখন একটা ধোঁয়াশায় ভরা অতীতের স্মৃতি।

সে শুধু ক্যান্টারবেরিতে এসেছিল একটু স্পেসের জন্য। এ স্পেস হুইচ সি সো ডেস্পারেটলি ওয়ান্টস অল এলোন।

ডেভিড অর মাম-এর সঙ্গে নয় ।

***

অরিজিৎ খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল “এখন তো বসন্ত নয়”

মঞ্জরী আকাশে উড়ে যাওয়া এক ঝাঁক সাদা পায়রার দিকে তাকিয়ে বলল “ওকথা বলছ কেন?”

“শুনতে পাচ্ছ না কোকিলের ডাক?”

মঞ্জরী কান পাতল বনবিতানের গাছের ফাঁকে। নিস্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। পড়ন্ত সূর্যের রক্তিম আলোয় স্নান করে শুনতে চাইল কোকিলের গান। অরিজিতের হাতে হাত রেখে, মিষ্টি হেসে বলল “তুমি ঠিকই বলেছ। বসন্ত আসতে আর বেশি দেরি নেই”

অরিজিৎ মঞ্জরীর চোখের ওপর চোখটা নামিয়ে আনল। ওর কাজলকালো চোখে কী সে বনলতা সেনকে খুঁজছে? না কি, মঞ্জরীকে বিশ্বাস করতে চাইছে? চাইছে, অথচ পারছে না। অরিজিতের কাছে শীতের মিঠে আমেজটা অনেক বেশি আরামদায়ক। বসন্তের স্বপ্ন নিয়ে পড়ে থাকতে চায় না। স্বপ্ন বড় বেদনাদায়ক। আশা-ই হতাশার কারণ। আশার চোরাবালিতে, হতাশার মরুভূমি গড়তে চায় না।

মঞ্জরীরকে বলল "কী আসবে, অতশত ভাবি না। শীতটা গা সওয়া হয়ে গেছে। বেশ লাগছে" নিজের প্রৌঢ়ত্বকে স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া। না কি, মঞ্জরীর উপস্থিতি শীতের আকাশে ফাগুয়ার রং ছড়িয়েছে?

এক ঝলক চিন্তাটা মাথায় ঘুরপাক খেতে, মঞ্জরীর মনে হল অরিজিৎ কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টাই সত্যি। যেটুকু অরিজিৎকে চিনেছে, তাতে মনে হয় না, সে প্রকৃতির সব রং ছেড়ে শুধু শীতের মাধুর্যে ডুবে থাকবে।

হয়ত মন বলছিল 'বসন্ত আসবে'। তাই শীতের মধ্যেও কোকিলের ডাক শুনতে পেয়েছে। শুধু শোনেইনি, মঞ্জরীকেও শুনিয়েছে। আসলে মনের কোনও এক গোপন গভীরের গুঞ্জন, শীতের মধ্যে কোকিলের কূজন হয়ে ভেসে আসছিল। স্বাভাবিক ঋতুপ্রবাহের বাইরে, অন্য একটা স্পন্দন। সেই স্পন্দনের ভেতরের নিঃশব্দ আহ্বান... মনের ধূসর ক্যানভাসে হারিয়ে যাওয়া। তুলির নতুন টান। তার অতি সেনসিটিভ মনের গভীর আনাচে-কানাচে এক নতুন রাগের ঐকতান।

না, না। বনলতার চোখ দিয়ে অরিজিৎকে দেখেনি মঞ্জরী। মধ্য-চল্লিশের বাসনার লালসা নিয়েও নয়। দেখেছে তাকে, তার মতো করে। অরিজিতের কান দিয়ে সে শুনেছে, পাখিদের না-শোনা কলতান। ওর মধ্যেই সে খুঁজে পায় তার অর্থহীন গতানুগতিক জীবনের শিক্ষিত অনুভূতির অন্য এক প্রাণ। নিজের না-গাওয়া ছন্দের ধ্বনি। তার একান্ত একাকী নিভৃত সুপ্ত পরিতৃপ্তির খনি। মৃদুমন্দ স্পর্শে অরিজিৎকে ফিরিয়ে দেবে ওর হারিয়ে যাওয়া গান। একমাত্র অনুরাগী প্রাণ। সারাজীবনের পুঞ্জীভূত নিভৃত অভিমান।

মঞ্জরীর কাজলকালো চোখে স্নিগ্ধতার আবেশ "সে আসবে"

"কে?"

"বসন্তের কোকিলের ডাক যখন শীতে শুনতে পাচ্ছ, মানে সে আসবে"

অরিজিৎ মঞ্জরীর দিকে ফিরে, আবার বলল "কে?"

"কে আবার? তোমার মেয়ে শ্রাবস্তি"

কিছুটা বিরক্ত হয়েই অরিজিৎ বলল "আমাকে কষ্ট দিতে তোমার বড় ভালো লাগে, তাই না?"

ন্যাচারাল সেটিং দাঁতে, মুচকি মিষ্টি হাসি "দুঃখ দেব কেন? যা মনে হল, তাই বললাম"

উদাসীন, আকাশে ভেসে বেড়ানো পায়রার ঝাঁকের দিকে চেয়ে অরিজিৎ -কেমন ডানা মেলে নিশ্চিন্তে ভেসে বেড়াচ্ছে... অনন্ত আকাশে।

বাধা-বন্ধনহীন স্পন্দে পাল-ছেড়া আনন্দে। হয়ত আকাশে ওড়া পাখিদের মধ্যে কোনও উড়োজাহাজ দেখতে পেয়েছে। উড়োজাহাজ!

ছোটবেলার মতো বিদেশে পাড়ির স্বপ্ন নয়... একটা স্বপ্নকে বাস্তবের মাটিতে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা। এটাই তো জীবন-সায়াহ্নে একমাত্র আশা। শেষ ক'টা দিনের স্বপ্ন নিয়ে, জীবনকে আবার নতুন করে ভালোবাসা।

অরিজিৎ ভাবছে ওয়ান্স আই হ্যাভ হেলপড হার টু টেক দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইন লাইফ। আই হোপ সাম ডে সি উড হেল্প মি টু টেক মাই লাস্ট।

***

স্টিভ ওয়াজ লাইক এ গড সেন্ট গিফট।

সাডবেরি হিলে থাকা, হ্যারোর ইটন থেকে পাশ করা, পোরশে ৯১১ কনভার্টিবল নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, স্টিভ জেফারসন যে কেন ক্যান্টারবেরির সাইমন ল্যাংটন গ্র্যামার স্কুল থেকে পাশ, অস্টারলির স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে বাস, সেকেন্ড জেনারেশন ইন্ডো-ব্রিট শ্রাবস্তির সঙ্গে ডেট করতে গেল, সেটাই আশ্চর্য। ইউসিএইচ তাদের এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছিল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। দুজনেই হবু ডাক্তার।

গাওয়ার স্ট্রিট দিয়ে পা চালিয়ে ওরা চলে যেত ইউস্টনে। সেখানে ওর পেটুকের মতো রসগোল্লা গেলা দেখে হাসি থামাতে পারেনি শ্রাবস্তি।

"ইটজ হাই ক্যালরিজ স্টিভ"

"হু কেয়ার্স? ইট ইজ সুইট। আই লাইক দ্য সুইট থিংস ইন লাইফ", একটু থেমে বলেছিল "ইন্ডিয়ান ফুড অ্যান্ড ইন্ডিয়ান গার্লস আর অলওয়েজ সুইট"

শ্রাবস্তি সুইট কি না জানে না। রংটা কালো হলেও, বাঙালি মেয়েদের একটা নিজস্ব লালিত্য সেই সঙ্গে মনন আছে, যদি চোখ থাকে তাকে দেখার। যদি মন থাকে শোনার। বাঙালির একটা নিজস্ব সাংসারিক মাধুর্য আছে। যদি ইচ্ছে থাকে ঘর করার।

স্টিভ কী দেখেছিল, কে জানে? কিন্তু ওয়েস্টএন্ডে বসে সময় নষ্ট না করে, টটেনহাম কোর্ট রোডে বাজার না সেরে, হাইড পার্কে জলাশয়ের পাশে শ্রাবস্তির সঙ্গে নিঃশব্দে হেঁটে, বেইসওয়াটারের খানস-এ মোগলাই

খেয়ে বাড়ি ফেরাই বেশি পছন্দ করত। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে খোলা আকাশের মধ্যেই মুক্তির স্বাদ।

উইকেন্ডে লং ড্রাইভে বেড়িয়ে পড়া। ব্রাইটনের সমুদ্রতটে অর্নির্দিষ্ট পায়চারি... জনবহুল লন্ডনের কংক্রিট জঙ্গলের মধ্যে হাইড পার্কই একটু অবকাশ। একটু আকাশ। খোলা বাতাস। বেঁচে থাকার শ্বাস। ব্যস্ততায় ভরা লন্ডনে, তাসের দেশে একটু আশ্বাস। সেই আশ্বাসের মধ্যেই মনকে খোঁজার প্রচ্ছন্ন বিলাস।

সারাদিন নিরবচ্ছিন্ন তাসের দেশে জীবনের ফাঁকে মন কখনও উদাসী জিপসি। সাদা রাজহাঁসের মতো ডানা মেলে অসীম অনন্ত নীলিমায়। একটু আকাশ, অল্প মাটি, সামান্য রং, মনের মতো পাওয়া মুহূর্ত। সেখানে গান, কবিতা, ছবি, সাহিত্যর ছোঁয়া। আছে মনের বাইরে বেরিয়ে মনটাকে দেখার অবসর। ঠিক যেন স্যাক্রে ক্যুর ছেড়ে মনমার্টের রাস্তায় হাঁটা... অথবা সেন্ট মার্কস স্কোয়ার থেকে ছিটকে পিয়াজালা রোমার পাশে চুপচাপ বসে থাকা। ছন্দহীন জীবনে অন্তহীন আকাশ। মনের সিটাডেলে বরণ করার বিকাশ। তার মধ্যেই নিজেকে খোঁজার ছোট্ট প্রয়াস।

শ্রাবস্তিকে বলেছিল “আই অ্যাম টায়ার্ড অফ দিস সো কল্ড এলিট ওয়ে অফ লিভিং। দেয়ার ইজ ভেরি লিটল স্পেস আউটসাইড দ্য সো-কল্ড প্রোটোকলস”

স্টিভের দিকে ফিরে শ্রাবস্তি বলেছিল “হোয়াটস দ্য হার্ম? আফটার অল, উই আর সিভিলাইজড বিইংস। দেয়ার হ্যাজ টু বি সাম প্রোটোকল”

“ইন দ্য রেলমস অফ দ্য প্রোটোকলস, কান্ট থিংক”

একটা অর্থহীন যন্ত্রবাক্স, আমাদের চিন্তাকে বাক্সবন্দি করে দেয় চার দেওয়ালের আনাচে-কানাচে। যেখানে পুঁথিগত অর্থহীন প্রলাপ, বারবার ধাক্কা মারে বুকে। যেখানে সংস্কৃতি আর অপসংস্কৃতি সংশয় জাগায় না মূল্যবোধে। সেখানেই একটুকরো অবসর। বিনোদনের উপায় খুঁজতে বাধ্য করে। মাঝে মাঝে কোনও এক সন্ধেকে নিজের করে পাওয়া। সেখানে গ্ল্যামারের অর্থহীন প্রলাপ নেই। নেই বিকিকিনির মশলা। আছে শুধু মনকে বরণ করে নেওয়া। আছে মনের পসরা সাজিয়ে নৈবেদ্য ভরে নতুন রূপে সেজে ওঠা।

স্টিভের সঙ্গে সেই অবসরই তো শ্রাবস্তির দোসর। হোক না সে ইটনে পড়া খোদ সাহেব। মনটা তো আর অক্সফোর্ড স্ট্রিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না। বাইরেও কিছু পেতে চায়।

একটা অনুভূতি।

একটা পাওয়া।

কলেজের ফাঁকে শুরু হয়েছিল নতুন গান গাওয়া।

রং, দেশ, অরিজিন ভুলে একটু চাওয়া। অনুভূতির ছন্দে, আবেগকে বড় কাছ থেকে পাওয়া...

হাইড পার্কের ঘাসে পা ফেলে স্টিভ বলত “লাভ ইন্ডিয়ান ফুড, ইন্ডিয়ান মিউসিক, ইন্ডিয়ান ড্রেস”

“অ্যান্ড মি?” শ্রাবস্তি প্রশ্ন ছুড়েছিল।

“অবভিয়াসলি ইউ টু। ইটজ বিকস অফ ইউ”

শ্রাবস্তি বুঝতে পারত না, এটা কি খোদ ব্রিটিশের মন জোগানো কথা? এর মধ্যে কি কোথাও কলোনিয়াল কালচারের খোলসটা পরা? বুঝতে পারত না, স্টিভ ইন্ডিয়ান সব কিছু ভালোবাসে, না ইন্ডিয়াকে।

ইন্ডিয়াকে শ্রাবস্তি দেখেনি। মা দেখতে দেয়েনি। আর পাঁচটা সেকেন্ড জেনারেশন ব্রিটিশের মতো তার নেচারটাকে ব্রিটিশ ছন্দে রং মাখিয়ে ব্রিটনিক রুটলেস ইন্ডিয়ানদের মতোই জেনেছে, ওয়েম্বলি থেকে সাউথহল চত্বরে। সেখানে ইন্ডিয়া, বলিউড আর কারি হাটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ডেভিডের ক্ষমতা ছিল না মায়ের ওপর কথা বলার। বলতেও চায়নি। তবুও কোথায় জন্ম-জন্মান্তেরর টান। ঠিক কোথায়, বুঝতে পারত না।

শ্রাবস্তিকে স্টিভ বলত “ডু ইউ ওয়ান্ট টু গো টু ইন্ডিয়া?”

চিজুইক রাউন্ড-অ্যাবাউট থেকে অস্টারলির দিকে, পোরশে ৯১১ কনভার্টিবল ড্রাইভ করার সময় পাশে বসা শ্রাবস্তির কাছে শুনত, তার মায়ের শেখানো নির্লিপ্ততা “হোয়াট ফর? আই অ্যাম সিওর আই ক্যান সি ইন্ডিয়া হিয়ার টু। উই হ্যাভ গট মোর কারি আউটলেটস দ্যান ইন্ডিয়া। ইউ গেট ইন্ডিয়ান ফুড ইভন অ্যাট সেইন্সবেরিস, অ্যাসডা অর ইভেন মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সর। আই হ্যাভ সিন এ ফিউ ফিল্মস ইন লেস্টার স্কোয়ার। উই সি অমিতাভ বচ্চন, শারুখ খান অ্যান্ড জন আব্রাহাম অ্যাট দ্য ওয়েম্বলি”

শ্রাবস্তির মনে হত, লন্ডনের এই ইন্ডিয়ান কালচারের মধ্যেই সে ইন্ডিয়াকে পেয়েছে। ভারতীয় বিদ্যা ভবনে ক্লাসিক্যাল ইন্ডিয়ান ডান্স ভরতন্যাট্যম, কত্থক, মণিপুরি। তাহলে ইন্ডিয়া গিয়ে কী হবে? মাকে অসন্তুষ্ট করা ছাড়া।

***

রঞ্জিতা আর পাঁচটা স্বপ্ন-দেখা বাঙালির মতোই বড়ো হয়েছে। মা শিখিয়েছে, পুবকে ভুলে পশ্চিমকে বরণ করতে। জন্ম ঈশ্বরের দান হলেও, কর্ম নিজের হাতে। তাই লেক গার্ডেন্সে আবদ্ধ না থেকে জীবনটাকে স্বপ্নের জোয়ারে ভাসিয়ে আঁকড়ে ধরার আশা। অস্তিত্ব বিপন্ন করে স্বপ্নকে বরণ করেছে। বাস্তবে সার্থকতায় সাজতে। জগৎটা দেখতে হলে, অরিজিৎকে ছেড়ে ডেভিডকে ধরতে ক্ষতি কী? ক্যালকাটা ইজ পাস্ট। ইন্ডিয়া ইজ পাস্ট। সে চায়নি, শ্রাবস্তি দেশি অতীতেই আবার ফিরে যাক।

বেশ কয়েক বছর আগে, শ্রাবস্তি বলার চেষ্টা করেছিল “আই ওয়ান্ট টু গো অ্যান্ড মিট মাই ড্যাড”

রঞ্জিতা মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠেছিল "হোয়াট ফর? ইউ হ্যাভ টু গো ফরোয়ার্ড। নট লুক ব্যাক। নেভার এভার মেনশন অফ গোয়িং ব্যাক টু ইওর পাস্ট"

তারপর আর সাহস পায়নি। মায়ের মেজাজ অজানা নয়। তার থেকে ডেভিডও বাদ নেই।

"কান্ট ইউ ড্যু দ্য ডিসেস?"

"ইউ ক্যান পুট দেম ইন দ্য ডিসওয়াশার"

"সিওরলি নট ফর থ্রি প্লেটস। কাম অন ডেভিড, ইউ আর ড্যাম লেজি"

সাহেবকে দাস করার মধ্যে আলাদা মানসিক তৃপ্তি। ওরা সারা বিশ্বকে দাস করেছে। সেই অ্যাংলো-স্যাক্সন ব্রিডকে পায়ের তালায় রাখাই অ্যাচিভমেন্ট। যা গান্ধিজি পারেননি, রঞ্জিতা পারে।

ভালোবাসার অনেক রূপ আছে। এ অন্য রূপ। দেবী দুর্গার মতো নানা রূপে আত্মপ্রকাশেই তো নারীত্বের পূর্ণতা। রঞ্জিতা পূর্ণ নারী হতে চেয়েছে। তাণ্ডবে লিপ্ত রক্ষাকালী শিবের বুকে পা ফেলে লজ্জা পেলেও, রঞ্জিতা বাঙালি মায়ের চিন্ময়ী রূপটাকে উপেক্ষা করেই শ্রাবস্তিকে দেখাতে চেয়েছে, তার বিদেশের মাটিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে।

সাকসেস ইজ দ্য কি অফ মর্ডান সিভিলাইজেশন। সেটা অর্জন করা যায় না বাই সাবমিশন। তাই ডমিনেশন।

ডেভিড হয়ত পারত। তার আগেই রঞ্জিতা ব্যঙ্গ করে ডেভিডকে বলেছে "হি লিভস ইন হিস ক্যান্টারবেরি টেলস" ক্যান্টারবেরি টেলসের মায়াডোরে ঘেরা, বড়লোক সুপুরুষ রঞ্জিতার থেকে কম শিক্ষিত ডেভিড তো আর শ্রাবস্তিকে অন্য কোনও মন্ত্র দিতে পারবে না? কেনই বা? শ্রাবস্তি তার মেয়ে নয়, রঞ্জিতার মেয়ে... স্টেপ ডটার।

শুধু একবার মিনমিন করে বলেছিল "জিতা, লেট শাবি ড্যু হোয়াট সি প্রেফার্স"

"লেট হার স্টপ থিংকিং অ্যাবাউট আদার থিংস। অ্যান্ড পারসিউ হার মেডিক্যাল কেরিয়ার। দ্যাট ইজ মোর ইম্পরট্যান্ট ফর হার লাইফ, দ্যান থিংকিং অ্যাবাউট হার থিওরিটিক্যাল ফাদার অফ দ্য পাস্ট, হু ডেসার্টেড হার" রঞ্জিতা ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল।

ডেভিড আর কথা বাড়ায়নি। শ্রাবস্তি চুপ করে গেছে। তার কিছুই করার নেই। মা যা বলবে, শুনতে হবে। এর বাইরে, শ্রাবস্তির আর কে আছে?

***

স্মৃতির জলসাঘর ছেড়ে বাস্তবের আঙিনায় দাঁড়িয়ে আর পেছনে দেখতে চায়নি অরিজিৎ বসু। অতীত তো আর ফিরে আসবে না। বর্তমানকেই পাথেয় করে বাঁচতে হবে।

হাই কোর্টে সারাদিন যুক্তির বন্যা বইয়ে, সন্ধেবেলা মঞ্জরীর হাত ধরে তারা গোনার মধ্যে অরিজিৎ খুঁজে নিয়েছিল বিচ্ছিন্ন জীবনে এক-টুকরো আশ্বাস। বাঁচার একমাত্র বিশ্বাস। সম্পর্কের মায়াজালে, সৎ-অসতের দোলায় না দুলে, শুধু চিরন্তনের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে নিজের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে। তাই বার অ্যাসোশিয়েশনের মিটিং-এর ফাঁকে শশাঙ্ক যখন কালো কোটটা ঠিক করে ওকে প্রশ্ন করেছিল "ডোন্ট ইউ এভার গেট বোরড?"

অরিজিৎ মুচকি হেসে বলেছিল "একেবারেই নয়। অস্থায়ী সম্পর্কের জের না টেনে, একা পৃথিবীতে বেশ আছি। গান শুনি, গল্প পড়ি, রেস্টুরেন্টে খাই। মাঝে-মধ্যে, এক-আধটা সিনেমাও দেখি। বোর হব কেন? সব সময় খুশি হওয়ার জন্য মানুষের প্রয়োজন নেই। নিজের মধ্যেও খুশি হওয়া যায়"

"তবুও... মাঝে-মাঝে কি মনে হয় না, পাশে কেউ থাকলে ভালো ছিল?"

"চিরদিন তো কেউ থাকবে না। আসবে, যাবে। এই আসা-যাওয়ার খেলা চলতেই থাকবে। কিন্তু তখনও আমি থাকব"

শশাঙ্কর বউ-বাচ্চা পরিবেষ্টিত খোলস-ঢাকা অ্যাপার্টমেন্টের আবদ্ধতায় বাইরের পৃথিবীটা অচল। তাই অরিজিতের একাকী জীবন তার ভাবনার অতীত। এরা সৌভাগ্যবান। জীবনের ক্ষুদ্রতম বলয়ের মধ্যে নিজেকে অর্থপূর্ণ প্রমাণ করে হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেই এদের তৃপ্তি। ওদের বাঁচাটা শুধু মুহূর্তের জন্য।

কেবল অরিজিতের মতো কিছু হতভাগ্য জীবন-সমুদ্রের ঘুর্ণিঝড়ে ছিটকে পড়ে, মহাশূন্যে ভেসে ভেবে চলেছে... মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী। তার আগে, একটু বেঁচে নিই। বুক ভরে শ্বাস। মনের মতো করেএকটিবার।

"তোমার মতো আঁতলামো করে আমার জীবন চলবে না। আমাকে সুপর্ণার কথা, পিউর কথা ভাবতে হবে"

ভাবনার কী কোনও শেষ আছে? না ভাবলেই কী নয়?

মঞ্জরীর ছোঁয়ায় মিষ্টি আবেশ। কলেজ জীবনে সুপর্ণার প্রেমের সেই স্পর্শটুকু হারিয়ে গেছে। এখন জীবনটাই বেশি মধুর।

শশাঙ্ককে বলল "ভাবার জন্য তুমি আছ। আমার মতো কিছু বাউন্ডুলে নয় নাই ভাবল। মুহূর্তটাকে অনুভব করে যাবনিজের মতো করে"

উদাস মঞ্জরী একদিন খোলা আকাশে চেয়ে বলেছিল "সম্পর্কটা কিছু নয়। মুহূর্তটাই আসল"

কোনটা আসল, কোনটা নকল, অরিজিৎ জানে না। শুধু জানে, এভাবেই চলতে হবে। এটাই তার পাথেয়।

মঞ্জরীরকে বলেছিল “মুহূর্ত নয়, অনুভূতিটা। ওই যে দূরের মেঘগুলো নিজের মনে ভেসে বেড়াচ্ছে, তার খবর ক'জন রাখি? কার সময় আছে পায়রারা কোনদিকে উড়ে যাচ্ছে, খবর রাখতে?”

“ওই রাখতে-ঢাকতে-গড়তে-জুড়তেই জীবনটা পার করে দিলাম”

অরিজিৎ ফিরে তাকাল মঞ্জরীর কচি কলাপাতা টাঙ্গাইল শাড়ির দিকে “এটা কে কিনে দিয়েছিল? কর্তা?”

“হ্যাঁ। যখন বেঁচেছিল” মঞ্জরী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অতীতকে ফেলে আসতে চাইছে।

“সেটাও তো একটা পাওয়া”

নিঃশব্দ মঞ্জরী। পাওনা-গন্ডার হিসেব মেলাতে তো অরিজিতের সঙ্গে বসেনি। মেলাতে গেলেই হারানোর ক্ষোভ বারবার ফিরে আসে। অরিজিতের সঙ্গে নিঃশব্দ মুহূর্তগুলো তার কুয়াশাচ্ছন্ন পৃথিবীতে সোনালি আলোর রেশ। সেই মাদকতাকে পাওয়া না-পাওয়ার হিসেবে মেলাতে চায় না। পেলেই হারাতে হবে। না পেলে আর হারানোর নেই।

নিস্তব্ধতা ভেঙে অরিজিৎ বলল “শ্রাবস্তি ফোন করেছিল”

“কোত্থেকে?”

“ইউকে থেকে বোধহয়। জানি না ঠিক কোত্থেকে। বলল আসবে”

অরিজিতের ভারী চশমার দিকে তাকিয়ে বলল “সেদিন বলেছিলাম না, মন বলছিল, শীতে বসন্তের কোকিলের ডাক শুনেছি। এ হওয়ারই ছিল”

“কী হওয়ার ছিল জানি না। সে আসছে বাবার কাছে ফেলে আসা সতেরো বছরের হিসেব বুঝতে”

“তুমি তৈরি?”

“তৈরির কী আছে? সত্যি বলার জন্য তো তৈরি হতে হয় না? মন থেকে বেরিয়ে আসে”

মঞ্জরীর মনে হল, সত্যি বলবার জন্য না হলেও, সত্যের মুখোমুখি হওয়ার জন্য, কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন।

মঞ্জরী পারেনি। শুধু মনের গভীর গোপনে অরিজিতের মেয়ের প্রতি সুপ্ত অনুভূতির মতো, ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। ঘুমের মধ্যেই শান্তি। জাগলেই এখনকার বেঁচে থাকার শান্ত-স্নিগ্ধ রেশটুকুও হারিয়ে যায়। জাগিয়ে কী লাভ?

যেমন একদিন নিজের সাজানো জীবনটা হঠাৎ-ই ওলট-পালট হয়ে গেছিল। প্রস্তুতির কোনও অবকাশই ছিল না। এখন অরিজিতের হাত ধরে একাকিত্বের মধ্যে, বেঁচে থাকার রসদ সাজিয়ে নিয়েছে।

আকাশে ভাসা মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল "দেখ দেখ মেঘ কেটে যাচ্ছে। শীতকালে তো আর বৃষ্টি হয় না"

"হতেই পারে। শীতকালে তো আর কোকিল ডাকে না। তবুও কোকিলের ডাক শুনেছি"

"তুমি অনেক কিছু শুনতে পাও, যা অন্যেরা পায় না। অনেক কিছু দেখতে পাও, যা অন্যেরা পায় না"

অরিজিতের মনে হল, এটাই বাইরের ঘূর্ণিঝড়ের আত্মপ্রকাশ। কিছু ঘটবার আগে, সব নিয়ম ওলট-পালট হয়ে যায়।

***

মা আপত্তি করেনি। করবেই বা কেন? পাত্র যখন ডাক্তার, বনেদি বড়োলোক বাড়ির একমাত্র সন্তান, আপত্তি করার কোনও কারণ নেই। তার ওপর, শ্রাবস্তি নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করতে চেয়েছে। তাও খোদ সাহেব। যে সে নয়, ইটনে পড়া। নিজে যখন লেক গার্ডেন্স থেকে ক্রস-ম্যারেজ করেছে, সেকেন্ড জেনারেশন ইন্ডো-ব্রিটিশ শ্রাবস্তি যে করবে, এটাই স্বাভাবিক।

তবুও শ্রাবস্তির দ্বিধা ছিল।

স্টিভেকে বলেছিল "ইওর ড্যাড?"

স্টিভ ওর কাঁধটা জড়িয়ে বলেছিল "ইনিশিয়ালি হি হ্যাড সাম রিসার্ভেশন্স। বাট আই এক্সপ্লেনড টু হিম, আই ওয়ান্ট টু ম্যারি ইউ। হি আন্ডারস্টুড। ডোন্ট ওয়ারি। ইটজ আওয়ার লাইফ"

শ্রাবস্তি নিজের পৃথিবী গড়তে চাইছিল মায়ের ডমিন্যান্সের বাইরে। স্টিভ দিয়েছিল কনফিডেন্স। তেইশ বছরের শ্রাবস্তির কাছে নতুন জীবনের দূত। নতুন ছন্দে, নতুন আনন্দে। খাঁচা ছেড়ে হারিয়ে যাওয়ার অন্য দিগন্তে।

তবুও সংশয় কাটে না। স্টিভকে প্রশ্ন "অ্যান্ড ইওর মাম?"

"সি ইজ মোর অফ এ সোসালাইট। হোয়ার হ্যাজ সি দ্য টাইম, টু পন্ডার ওভার মাই ইমোশনস?"

তবুও শ্রাবস্তির মনে হয়েছিল, সি কুডন্ট এক্সপেক্ট অ্যান এশিয়ান অ্যাস হার ডটার ইন ল্য। আফটার অল, দ্য ব্লু ব্লাড ডস গিভ এ ফলস সেন্স অফ প্রাইড। কী আর করা যাবে?

ইন্টারন্যাশনাল ডায়মন্ড এক্সপোর্টার স্টিভের বাবার অর্থেই তার এই সোশাল আইডেন্টিটি। ইফ হার হাসব্যান্ড ক্যান অ্যাক্সেপ্ট, অ্যান্ড হার ওনলি সান ওয়ান্টস টু ম্যারি, হু ইজ সি টু ইন্টারফিয়ার? আফটার

অল, সি ডাসন্ট বিলং টু দ্য প্রফেশনাল সোশাল মিডিওক্রিটিস অফ দ্য মেডিক্যাল কমিউনিটি। ইট ইজ দেয়ার লাইফ। লেট দেম বি হ্যাপি।

ইফ স্টিভ ক্যুড ব্রেক দ্য ট্র্যাডিশনস বাই পারসুয়িং এ মেডিক্যাল কেরিয়ার, ইট ইজ ইমপ্যারেটিভ, দ্যাট হি উইল ব্রেক মেনি মোর ট্র্যাডিশন্স অফ দ্য ব্রিটিশ ক্লাস। লেট হিম লিভ দ্য লাইফ হি প্রেফার্স। গ্র্যামার স্কুল আর পাবলিক স্কুল তো সমান নয়। সি নিউ শ্রাবস্তি ওয়াজ ব্রিলিয়ান্ট। দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগেস্ট স্কোর ইন হার সোসালাইট মিলিউ।

দ্য এনগেজমেন্ট ওয়াজ সেলিব্রেটেড বাই বোথ জয়নিং ইন দ্য ওপেনিং অফ এ বটল অফ ডম পেরিডন। দিস ফলোড দ্য গালা রিসেপশন অ্যাট দ্য গ্রোসভেনার হোটেল। শ্রাবস্তি ম্যারেড স্টিভ উইথ অল দ্য পম্প অ্যান্ড গ্র্যাঞ্জার। এ ম্যারেজ, হুইচ দ্য ওয়াটারশন ফ্যামিলি উড রিমেমবার।

গড়ে উঠল, ছোট্ট আস্তানা হ্যাম্পটন কোর্টে। স্টিভ আর শ্রাবস্তির ভালোবাসার নীড়। স্বপ্নের নীড়। নতুন স্বপ্নের অবগুণ্ঠন খুলে আগামী দিনের নতুন মায়াবি স্বপ্ন হাত ধরে টানল। অনাবিল পাওয়ার আনন্দের জোয়ারে। সুখের স্বপ্ন-সাগরে। নতুন ভালোবাসার সপ্তম নিখাদে।

রঞ্জিতা যেন সামাজিক স্তরে আরেক ধাপ এগিয়ে। এ শুধু শ্রাবস্তির বিয়ে নয়। তার সামাজিক উত্তরণ। ডেভিডের ছোট্ট ক্যান্টারবেরির পৃথিবী থেকে লন্ডনের এলিটে পর্দাপণ। সেই সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পার হয়ে যেত তার একাকী নিশিযাপন।

***

অরিজিৎ দমদম এয়ারপোর্টে শ্রাবস্তিকে রিসিভ করতে গেছিল। নিজের মেয়েকে চিনতে পারবে তো? ছোটবেলায় ফেলে আসা ছোট্ট শ্রাবস্তির মুখটার স্মৃতি বুকে করে, নেতাজি সুভাষ ইন্টারন্যাশনালের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসা জনস্রোতকে দেখছিল অরিজিৎ।

ফোনের পর শ্রাবস্তি অবশ্য বেশ কয়েকটা ই-মেল করেছে। ই-মেলে ছবিও পাঠিয়ে দিয়েছে। শেষ পাঠানো শ্রাবস্তির ছবির বেশভূষা অরিজিতের পছন্দ না হলেও, ছবিগুলো মোবাইলেই। বেশভূষা নিয়ে খুব একটা মাথা না ঘামালেও, মুখের ভাবভঙ্গির মধ্যে ছোটবেলায় ফেলে আসা সরলতা নেই। অন্তরের গভীর সংশয় প্রকট। ছবিটা মনে গেঁথে গেছে।

বহুদিনের পুঞ্জীভূত আবেগে চশমায় ঢাকা চোখটা ঝাপসা। কয়েক মুহূর্ত।

“ইউ আর মাই ড্যাড, আরেন্ট ইউ?” পেছন থেকে টিপিক্যাল ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট শুনে বুকটা কেঁপে উঠল। না দেখেও মন বলে দিল, এ আর কেউ হতে পারে না। একমাত্র শ্রাবস্তি। জন্ম-জন্মান্তরের নাড়ীর বন্ধনকে চিনিয়ে দিতে আকার লাগে না। ভাষাও নয়। পরিচয় মনে। শুধু অনুভূতি দিয়ে চিনে নেয় তার হারিয়ে যাওয়া শ্রাবস্তিকে।

একবার বারবার বহুবার। চোখ জুড়ে। বুক ভরে। ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে। মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছে না। ভাষা স্তব্ধ, মৌন অনুভূতির মিছিল।

“অফ কোর্স”

চোখের জলে বুকে জড়িয়ে নিল একমাত্র মেয়েকে। চশমাটা ভিজে গেছে। ঠোঁট থর-থর কাঁপছে। হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে ব্যথাভরা সুখে। ভাষাহীন নীরব অন্তরের অনুভূতির প্লাবনে। জনবহুলতার মধ্যেও মৌনতায়। নিজস্ব দুনিয়ায়। জনস্রোতের মধ্যে যখন যাত্রীরা আপনজনকে চিনে গন্তব্যে পাড়ি দিতে ব্যস্ত। কার-ই বা সময় আছে, ফেলে আসা অনুভূতি রোমন্থনের দিকে ফেরার?

সম্বিৎ ফিরল একটি ছেলের গলায় “বাবু আমার গাড়িতে যাবেন?”

অরিজিৎ ফিরে দেখল, শ্রাবস্তির বয়সি একটি ছেলে অরিজিতের দিকে চেয়ে। চোখে কাতর মিনতি।

“আমাদের গাড়ি আছে” বিষণ্ণ ছেলেটাকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে দেখে, মায়া হল।

“অন্য কেউ যদি যায়”

“কেউ যাবে না বাবু। সবার তো কলকাতায় কেউ না কেউ চেনা আছে। ফরেনাররা আমাদের গাড়িতে ওঠে না। প্রি-পেড ট্যাক্সি নেয়। আমার-ই দুর্ভাগ্য। সাতসকালে বউনি হল না”

“কত কামাতিস?”

“তিনশো টাকা”

পার্স থেকে তিনশো টাকা দিল “অন্য কোনও সোয়ারি দেখ। আমার প্রয়োজন নেই”

টাকা নিয়ে ছেলেটি বুঝতে পারল না বাবুটা পাগল কি না। সেলাম ঠুকে চলে গেল। এরকম পাগল পৃথিবীতে আজ-ও আছে বলেই পৃথিবী থেমে যায়নি। নইলে যে কী হত? শ্রাবস্তির ট্রলিটা ঠেলতে ঠেলতে বলল “ওয়েট এ মিনিট। ড্রাইভারকে ফোন করছি গাড়ি আনাতে”

***

জেট ল্যাগের জন্য ঘুম আসছে না। বাবার এখন মধ্য রাত্রি হলে, শ্রাবস্তির সন্ধে। দ্য পাবস মাস্ট স্টিল বি বিইমিং উইথ লাইফ। স্টার্ট অফ এ উইকেন্ড ইন লন্ডন। এস্পেসিয়ালি দ্য ওয়েস্ট এন্ড।

শ্রাবস্তি কলকাতায় কেন এসেছে?

আধা চেনা কিংবা না-চেনা পিতৃ-মাতৃভূমি দেখতে?

হারিয়ে যাওয়া সত্যিকারের বাবাকে খুঁজতে?

ছোটবেলার না-পাওয়া পরিবারের কৈফিয়ত চাইতে?

তার মধ্যে স্টিভের ভারতীয় নারীকে না-পাওয়ার ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে? শেষ অবধি কী নিজেকেই খুঁজতে!

স্টিভের কথা মনে হতেই বুকটা কেঁপে উঠল হারানোর ব্যথায়। কত ভালোবেসেছিল। একটু আশা। বুকভরা ভালোবাসা। সেই ছিল জীবনের একামাত্র অভিলাষা।

ডেভসে হনিমুনে, বরফের মধ্যে, স্কির স্লোপে, তীব্র বেগে গ্লাইডারে ভেসে বেড়াতে, ওর মনে হয়েছিল স্টিভ শুধু স্বপ্ন নয়, ভেসে বেড়ানোর নতুন দিগন্ত।

"এনজয়িং দ্য ট্র্যাঙ্কুইলিটি অফ দ্য ভাস্ট এক্সপ্যানস অফ দ্য অ্যাল্পস?"

"দ্য ফিল অফ ইউ অ্যারাউন্ড"

আজ সে অনুভূতি মলিন। বাবার সল্ট লেকের তিনতলা বাড়িতে অসহায়। একটা শূন্যতা। নিস্তব্ধ অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ছকে বাঁধা রাস্তা। যে পথে সে আর পা বাড়াতে চায় না।

মা বলেছিল "নেভার মাইন্ড। ইট হ্যাপেন্স ইন অল অফ আওয়ার লাইভস"

অরিজিৎ বসুকে ছেড়ে, ডেভিডকে ধরাটা বড় কোনও ব্যাপার নয়। কালকে ডেভিডের বদলে মার্টিনও হতে পারত। গণ্ডিটা চেনা-জানা ফার্মি স্পিয়ারের মধ্যে আবদ্ধ। লাইফ হ্যাজ গট ইটস আপস অ্যান্ড ডাউন্স।

সেই জগৎটাকেই দেখে এসেছে শ্রাবস্তি। তাই স্টিভ যখন বলেছিল "টেল মি মোর অ্যাবাউট ইন্ডিয়া"

শ্রাবস্তি জানত না কী বলবে। তার কাছে ইন্ডিয়া মানে আধা-সাহেব বাঙালি মা। কালো রঙের মোড়ক ঢাকা সাউথহলে তন্দুরি এক্সপ্রেস অন জেলেবি জাংশনে, রুটি-মাংস কিংবা জিলিপি খাওয়া। কিংবা ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে বলিউড এক্সট্রাভ্যাগ্যাঞ্জা। মা তো তাকে আর কোনও ইন্ডিয়াকে চিনতে দেয়নি।

"নেভার বিন টু ইন্ডিয়া। বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ হিয়ার"

"আই নো। ডিডন্ট ইউ এভার ফিল লাইক ভিসিটিং ইওর নেটিভ মাদারল্যান্ড?"

কী বলবে, জানে না শ্রাবস্তি। কিছু বলতে গেলে, মাকে ছোট করা। একটু হেসে দিগন্ত বিস্তৃত অ্যাল্পসের দিকে তাকিয়ে "ডিডন্ট গেট দ্য অপারচুনিটি"

স্টিভও পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বলল "স্যাড। সিন বিউটিফুল পিকচার্স অফ ন্যন্ডাডেভি অ্যান্ড ন্যন্ডিকুন্ড। হোপ টু গো দেয়ার সামডে"

কীসের ইন্ডিয়া? কোন ইন্ডিয়া? শ্রাবস্তি তো সে ইন্ডিয়াকে দেখেনি। ছবিও নয়। ইংল্যান্ডের বাইরের ইন্ডিয়া অচেনা।

"ফরগেট ইন্ডিয়া। উই আর ইন সুইটজারল্যান্ড"

স্টিভ বিষণ্ণ "রিয়েলাইজ দ্যাট"

ভারতীয় বংশোদ্ভূত সদ্য বিবাহিত শ্রাবস্তি পাশে থাকতেও যেন সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে তুষারাবৃত অ্যাল্পসের পর্বতমালার অসীমে। অ্যাল্পসের বাইরের বিপুল পৃথিবী অজানা। ঘরেও তার ছোঁয়া নেই।

স্টিভ থেকে বাবা। ইংল্যান্ড থেকে ইন্ডিয়া। চেনা পৃথিবী থেকে অচেনায় পাড়ি। অনেক প্রশ্ন নিয়ে শ্রাবস্তি চেয়ে রইল সল্ট লেকের অন্ধকার আকাশে। এখানে আকাশ লন্ডনের মতো মেঘাচ্ছন্ন নয়। পরিষ্কার। মাঝরাতে জানলার পাশে বসে তারা গোনা যায়।

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার,

হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর

জেট ল্যাগ আর প্রশ্নের আবর্ত রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। কত প্রশ্ন। কত জিজ্ঞাসা। অনেক বেদনায় খুঁজে বেড়ানো অভিলাষা। জন্মদাতার কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা। একটা আশা। অনেক দিন না-শোনা, নতুন কোনও ভাষা।

রাতের নিঝুমে ঘুমন্ত জন্মদাতাকে এখন প্রশ্ন করা যাবে না। থাক পড়ে সে সব কালকের জন্য। আজ শুধু একাকী নিঃশব্দে তারার দিকে চেয়ে ফেলে আসা স্মৃতি হাতড়ে বেড়ানো।

***

"এসেছে?" মঞ্জরী কোকিলের ডাক শুনলেও, শীতের জড়তা মাখা একটা নির্লিপ্ততায় অরিজিৎ ফোনে বলল "হ্যাঁ। কাল সকালে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে"

"এখন কোথায়?"

"দোতালায় ঘুমোচ্ছে। ওর এখন মাঝরাত। এখনও জেট ল্যাগ কাটেনি"

"কিছু বলল?"

"এখনও নয়। দম নিচ্ছে। রিকভারিং আফটার দ্য জার্নি। জানা থেকে অজানায় পাড়ি"

"তুমি অজানা? নিজের বাবা!"

"কলিযুগ। তোমার কারমেল কনভেন্ট নয়" একটু থেমে বলল "পরে কথা হবে"

মোবাইল ডিসকানেক্টেড হতেই মঞ্জু বুঝল, ও এখন একা থাকতে চায়। অনেক কথা মঞ্জরীকে বলে দিতে হয় না। অনুভব করতে পারে। রঞ্জিতা যদি পারত। বোঝালেও যে বুঝতে চায়নি, তাকে কী বোঝানো যায়? ওকে বুঝতে শেখানোই হয়নি।

গরিয়াহাটের জুসলা হাউসের রঙিন আলোর ঝলমলানির মধ্যে মালাবদলের পর অরিজিৎ যখন রঞ্জিতার সঙ্গে শুভদৃষ্টি বিনিময় করেছিল, নতুন স্বপ্নে ভরেছিল তার সমস্ত সত্তা। লেক গার্ডেন্সের সদ্য চুনকাম করা দেওয়ালের পাশে ছোট খাটে শুয়ে অরিজিৎ রঞ্জিতার ছোট্ট স্তনের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছিল "খাটটা বড় ছোট"

রঞ্জিতা, অরিজিতের কথার জের টেনে বলেছিল "খাট ছোট হলে কী হবে? জীবনটা অনেক বড়। হাত ধরে ভাগাভাগি করে নেব দু'জনে"

হ্যারডস থেকে সেলফ্রিজের সেল। রয়েল ডল্টন আর এডিনবারা ক্রিস্টালে রঞ্জিতা খুঁজেছিল সদ্য বিবাহিত জীবন। অরিজিতের মিডল টেম্পলের যথসামান্য বেতনে, মিংক কোটের প্রাচুর্যে নিজেকে সাজিয়ে, রঞ্জিতার মনে হত এটাই জীবন। ফিসফিস করে অরিজিতের কানের কাছে মুখ এনে বলত "তোমার মতো স্বামী পেয়ে, আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে"

সম্ভোগের মধ্যে, অরিজিতের মনে হত আর্থিক অনটন থাকলেও, এর মধ্যেই স্বর্গ। তার অন্য নাম স্বপ্ন। তাই নিয়ে বাঁচাই জীবন। সেই পরিণতির অবশ্যম্ভাবী আত্মপ্রকাশ শ্রাবস্তি হলেও, তা শুধু স্বপ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হাতছানি দিয়েও কঠিন বাস্তবের কাছে পরাজিত। অরিজিৎ হেরে গেছে রঞ্জিতার কাছে। না কি, দুটো ভিন্ন সত্তার টানাপোড়েন, যে যার নিজের স্বার্থটাই বড় করে দেখেছিল? তাদের দ্বন্দ্ব যে একটা নির্মল শিশুর ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে, কেউই ভাবেনি। অরিজিতের কিন্তু একবার যে মনে হয়নি, তা নয়।

"একা মেয়ে মানুষ করা সম্ভব নয়" অরিজিৎ প্রতিবাদ করলে তীব্র দাবানলে জ্বলে উঠছে রঞ্জিতা "কেন? এদেশে কত সিঙ্গল প্যারেন্ট ফ্যামিলি আছে। তাদের বাচ্চারা কি মানুষ হচ্ছে না?"

শ্রাবস্তি কী মানুষ হয়েছে? অরিজিৎ জানে না। বিচ্ছিন্ন একটা নির্মল পবিত্র আত্মা, কোন টানে, আজ এত বছর পর, তার কাছে এখানে? কৌতূহল নিঃশব্দে আলোড়ন তুলেছে। আর স্বপ্ন দেখে না অরিজিৎ।

মঞ্জরীকে নিয়েও নয়। প্রথম যেদিন কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরা মঞ্জরী এসেছিল, নিরাভরণ মঞ্জরীকে দেখে মনের কোথাও ঢেউ খেলে গেছিল। কে জানে কেন? নিয়তি কী এভাবেই মুহূর্তে বন্ধন বাঁধে? ঢেউটা আলোড়ন তুলতে পারে।

প্রসাধনহীন মুখের দিকে তাকিয়ে "শশাঙ্ক পাঠিয়েছে?" মাথা নেড়েছিল মঞ্জরী।

“কী ব্যাপার? বলুন” কথায় মিডল টেম্পেলের ছোঁয়া।

“আমি বিধবা” ভণিতা না করেই বলেছিল “গত বছরের রাজধানী এক্সপ্রেসের অ্যাক্সিডেন্টে স্বামী মেয়েকে হারিয়েছি”

“কী হয়েছিল?” অনুকম্পা নিয়ে তাকাল ওর দিকে।

“তিনজন রাজধানীতে কলকাতা থেকে দিল্লি যাচ্ছিলাম। গয়া থেকে দশ-পনেরো কিলোমিটার হবে, অ্যাক্সিডেন্ট! কী করে যে বেঁচে গেলাম, কে জানে? স্বামীর ইনস্ট্যান্ট ডেথ। ওরা ওকেও ডেড ডিক্লেয়ার করেছে, যদিও বডি পাওয়া যায়নি” একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মঞ্জরী। ছেড়ে আসা জীবনকে বাস্তবে ফেরাতে বুক ফেটে যাচ্ছে। অনেক সময় সত্যিটাকে উহ্য করে রাখার মধ্যেও শান্তি। ঘুমনো অতীতকে বর্তমানে টেনে তাকে আরও দুর্বিষহ করার মানেই হয় না। অতীত! অতীতের পাতায় তোলা থাক।

বুঝতে পেরে অরিজিৎ বলল “সে কথা ছাড়ুন। আমি কী করতে পারি?”

মঞ্জরীকে অতীত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে বলল “গতস্য শোচনা নাস্তি” মেয়েটার দুঃখের কাসুন্দে ঘেঁটে লাভ নেই। দুঃখ বাড়বে। অশান্তিতে এসেছে। ওর শান্তি চাই।

নিজেকে সামলে মঞ্জরী বলল “ঘর তো গেছে। এখন মাথা গোঁজার আস্তানাটাও যেতে বসেছে”

অরিজিৎ চুপ। চেয়ে আছে ওর দিকে।

“ভাসুর অ্যামেরিকায়। স্বামীর কাজেও আসেনি। এখন বলছে বাড়িটা ছেড়ে দিতে”

“বাড়িটা কার নামে?” চশমাটা টেবলের ওপর রাখল।

“শ্বশুরের। শ্বশুর ওটা ওদের দু-ভাইয়ের নামেই লিখে গেছে”

“শ্বশুর মারা যাওয়ার পর মিউটেশন হয়েছে?”

“বলতে পারব না। উনিই ওসব দেখতেন। আমি কিছু জানি না”

“অরিজিন্যাল দলিলটা আছে?”

“থাকতে পারে। খুঁজে দেখতে হবে”

অতীতটা ফ্ল্যাশ বালবের মতো পলকে জ্বলে উঠে নিভে গেছিল। মঞ্জরীকে বলেছিল “দেখতে হবে ভাগাভাগি করে গেছে কি না। অরিজিন্যাল দলিলটা খুঁজে বের করতেই হবে। আপনার ওখানেই থাকার কথা। ভাশুর যখন অ্যামেরিকায়, ওর কাছে বোধহয় নেই”

মিনতি মাখা চোখে বলেছিল “রাস্তায় দাঁড়াতে হবে না তো?”

মঞ্জরীকে দেখে, ভেতরে আলোড়ন। কেন, বুঝতে পারছিল না। কোনও অদৃশ্য শক্তির যাদু। সেই ছন্দের রাগে বলেই ফেলতে পারত “আমার তিনতলা বাড়ি। আপনার মাথা গোঁজার কোনও অভাব হবে না” কিন্তু

এক অজানা অচেনা ভদ্রমহিলাকে তো সেকথা বলা যায় না। তাই আশ্বস্ত করতে বলল “আমি তো আছি”

ছোট তিনটে শব্দ। অনেক না-বলা কথাই বলে দেয়। ছোট্ট একটা উক্তি, নিঃসঙ্গতায় মন ভরিয়ে দেয়। ছোট্ট একটা ভরসা, থমকে যাওয়া জীবনে নতুন স্পন্দন জাগায়।

নেচে উঠল মঞ্জরীর হৃদয়। সহায় বলতে তো বৃদ্ধা মা। বাবা সরকারি ডাক্তার। বছর তিনেক আগে মারা গেছেন। মা থাকেন যাদবপুরের একটা ফ্ল্যাটে। সে তো আর মায়ের ঘাড়ে গিয়ে চাপতে পারে না। কুড়ি বছর বিবাহিত জীবনের পর চাকরিজীবী মেয়ে তো আর মায়ের ঘরে ফেরত যেতে পারে না!

মঞ্জরী অরিজিতের চোখে কী যেন খুঁজছিল। আজও জানে না অরিজিৎ। যুগ-যুগান্তের ফেলে আসা প্রেম কী এভাবেই ঝড় তোলে? দুটি আত্মা কী এভাবেই চিনে নেয় একে-অপরকে? অনন্ত না-বলা প্রেম?

যার ভাষা নেই।

শব্দ নেই।

অভিব্যক্তি নেই।

কিছু মুহূর্ত ছাড়া।

ঢেউটা বুকে চেপে উদাসীনভাবে দেওয়ালের দিকে তাকাল অরিজিৎ। স্বপ্ন দেখতে চায় না। স্বপ্ন বড় বেদনাময়।

***

ডেভিডকে গঞ্জনা দিয়ে রঞ্জিতা বলল “হোয়াট কাইন্ড অফ ফাদার আর ইউ? হোয়েন ইউ ম্যারেড মি, ইউ প্রমিসড টু টেক ফুল কেয়ার অফ হার”

“জিতা, সি ইজ অ্যান অ্যাডাল্ট। হাউ ক্যান আই রেগুলেট হার লাইফ?” ডেভিড মিনমিন করে রঞ্জিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

“ইটজ নট এ কোয়েশ্চেন অফ রেগুলেটিং হার লাইফ। বাট হোয়াট ইজ রাইট ফর হার”

“সি ইজ ওল্ড এনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট” ডেভিড বোঝাবার চেষ্টা করল।

রঞ্জিতা ঝাঁঝিয়ে উঠল “ইফ সি ওয়াজ, দিস ম্যারেজ উডন্ট হ্যাভ ব্রোকেন। সি ইজ স্টিল এ কিড”

শ্রাবস্তি কিড কি না ডেভিড জানে না। পশ্চিমি সভ্যতায় বড় হয়ে ওঠা কোনও মেয়ে আঠারো বছরের পর কিড থাকে কি না, জানা নেই। ডেভিডের মনে হল, রঞ্জিতা পুবের চোখ দিয়ে পশ্চিমকে ধরার চেষ্টা করছে।

নিজে পশ্চিমকে বরণ করলেও, মনটা পুবের গারদেই বন্দি। তার টানাপোড়েন মেয়েকে নিয়ে, কী করবে, না বুঝেই ডেভিডের ঘাড়ে দোষ দেওয়ার চেষ্টা।

এটাই রঞ্জিতার প্রবলেম।

কী জবাব দেবে? তার বিয়ে ভেঙে, এমিকে ঘর-ছাড়া করে, রঞ্জিতা যে পৃথিবী গড়েছে, সেখানে শ্রাবস্তি কনফিউশনে বড় হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। যদি এমি আর ডেভিডের বংশধর থাকত! তাহলে হয়ত এমিকে ছাড়ার আগে, ডেভিড আরও একবার ভাবত।

নির্লিপ্ত হয়েই বলল "ইচ অফ আস হ্যাভ টু গো থ্রু আওয়ার লাইফ"

"রাবিস। আই ওয়ান্টেড টু বি হিয়ার। সো আই অ্যাম হিয়ার" রঞ্জিতা মানতে নারাজ।

ডেভিডের মনে হল, রঞ্জিতা অযথা শ্রাবস্তিকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ছে। শ্রাবস্তি অ্যাডাল্ট। জীবনকে ঠিক গুছিয়ে নিতে পারবে। শ্রাবস্তির ইন্ডিয়া যাওয়ার চিন্তা রঞ্জিতাকে বিচলিত করছে না। ভয়, আশঙ্কা। যদি ন্যাচারেল বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়... তার আসল রূপ খুলে যাবে।

ডেভিড বলল "সি হ্যাজ দ্য রাইট টু ফাইন্ড দ্য ট্রুথ ইন হার ওন ওয়ে। ইটজ জাস্ট এ ম্যাটার অফ টাইম। টুডে ইজ দ্য ডে। হাউ ক্যান ইউ এলিয়েন হার ফ্রম হার ওন ওয়ে অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং?"

"দ্য রং ওয়ে" রঞ্জিতার কথায় শ্লেষ।

"দ্যাটস ইওর প্রবলেম। ইউ অ্যাডপ্ট দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়েজ অফ লাইফ। অ্যান্ড ইয়েট ওয়ান্ট ইওর ডটার টু গ্রো আপ লাইক দ্য ইস্টার্নস। টু ফলো ইউ হোয়াট ইউ প্রিচ" আস্তে বলল।

"ইটস বিটউইন মি অ্যান্ড মাই ডটার। ইউ ডোন্ট কাম ইন দ্য পিকচার। ইউ আর নট হার ফাদার। সিন্স হার ন্যাচারাল ফাদার ইজ আউট অফ দ্য সিন, দ্য ওনাস লায়েজ অন মি টু গাইড হার ইন দ্য রাইট পাথ" রঞ্জিতা থাপ্পড় মেরে ডেভিডকে বসিয়ে দিল। বিয়ে করেছ বলে সব অধিকার কিনে নাওনি।

ডেভিড বুঝতে পারে, ডাক্তার জেকিল আর মিস্টার হাইডের মতো দ্বন্দ্বে জর্জরিত রঞ্জিতা। দোদুল্যমান এই মানসিকতা নিয়েই সারা জীবন কাটিয়েছে। আগে বুঝলে এমিকে ছেড়ে কী রঞ্জিতাকে বিয়ে করত! বেঁচে গেছে ওর প্রাক্তন স্বামী অরিজিৎ বসু। এই নিদারুণ অসম্পূর্ণ নারীকে কী কেউ পূর্ণ করতে পারবে!

পূর্ণতা না খুঁজে, দৈনন্দিন গার্হস্থ জীবনে অশান্তি না বাড়িয়ে, নিঃশব্দে ডেভিড অন্য ঘরে চলে গেল। পয়েন্টলেস আরগুয়িং উইথ আ লেডি হু ফেইলস টু আন্ডারস্ট্যান্ড।

***

ছোটবেলার বুকভরা স্বপ্নটাকে অরিজিৎ রঞ্জিতার মধ্যে খুঁজেছিল। দূরের চাঁদটাকে ছোট্ট বাচ্চার মতো হাতে পেতে চায়।

আয় আয় চাঁদমামা

খোকার কেপালে টিপ দিয়ে যা

সিঁদুর পরিয়ে ছোটবেলার বিপুল বুকভরা স্বপ্নটাকে খুঁজেছিল রঞ্জিতার উত্তপ্ত দেহে। ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে, বিস্তীর্ণ সবুজে, নীল আকাশে ভাসা মেঘটাকে নরউড গ্রিনের ফ্ল্যাটে। রঞ্জিতার গোলাপি টপস ঢাকা বুকে। বেঁচে থাকার অভিলাষা। বহুদিনের স্বপ্ন আঁকা ভালোবাসা। নতুন জীবন পথে আবেগ তোলা নতুন ভাষা।

সোনালি আলোয় ডানামেলা এয়ার ইন্ডিয়ার ৭৮৭ বোয়িংটা রঞ্জিতার সঙ্গে সেই স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল। কেন যে মানুষ স্বপ্ন দেখে? না দেখলে দুঃখ পেতে হয় না। তবুও স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়। যেমন সব হারিয়েও, মনের নিথর পাথরকে অরিজিতের হাত ধরে মঞ্জরী বসন্তের কোকিলের গান শুনতে পায়। শীতের মধ্যেও বসন্তের সুর জানান দেয় বাইরের হাওয়া।মনে বসন্তের ডাক।

তখন কত স্বপ্ন। কত আবেগ। মিডল টেম্পেলের স্তম্ভ থেকে নরউড গ্রিনে। গাড়িতে ঘণ্টাখানেক হলেও, বড়ই কাছে। আত্মার কাছাকাছি। নিবিড় অনুভবে।

স্বপ্নটা কী জানার আগেই শীতের ভোরে কুয়াশার ঝলক লেক গার্ডেন্সের দোতলার বারান্দায়। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দাদু বলত “তখন সাহেবদের রাজ। বেণীমাধব দাসের সান্নিধ্যে বড় হয়ে উঠেছিলাম। কী করব বোঝার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম স্বাধীনতা আন্দোলনে”

ছোট্ট রঞ্জিতা স্কিপারে লাফিয়ে জিজ্ঞেস করত “পড়াশোনা করতে না?”

“সেরকমভাবে নয়। তবে পরীক্ষায় খারাপ করিনি। সুভাষ বোস ডাক দিলেন। কংগ্রেস পার্টিতে জয়েন করলাম। তখন একটাই স্বপ্ন। ব্রিটিশদের দেশ থেকে হঠাও”

“কেন দাদু, ব্রিটিশরা কী ক্ষতি করেছিল?”

“অত-শত জানতাম না। শুধু জানতাম, ডাল-ভাত স্বাধীন হয়ে খাব। পরের গোলাম হয়ে নয়” একটু থেমে, চশমাটা টেবলের ওপর রেখে বললেন “গান্ধীজি বলেছিলেন ওয়ে টু স্বরাজ ইজ স্টিপ অ্যান্ড ন্যারো। তার স্বপ্নে কতবার জেল খেটেছি”

ছোট্ট রঞ্জিতার মাথায় ঢুকত না ব্রিটিশ রাজত্ব করুক, চাই ভারতীয়, কী আসে যায়? লেক গার্ডেন্সের দোতলার বারান্দা দিয়ে পুরো আকাশটা দেখা যায় না। মায়ের বোনা গোলাপি সোয়েটার চাপিয়ে, ঠান্ডায় নিজেকে ঢেকে রাখা।

দাদু চোখ বন্ধ করে বলে চলেছে “চারণকবি মুকুন্দ দাশ তখন গাইছেন **ছেড়ে দে রেশমি চুড়ি বঙ্গ নারী** ... রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের পর নাইট উপাধি ছাড়লেন... বিনয়-বাদল-দিনেশের ফাঁসি...”

রঞ্জিতা স্কিপিং থামিয়ে বলল “তাতে তোমার কী এসে গেল?” আগামী প্রজন্ম ফেলে আসা বিশ্বাসকে প্রশ্ন করছে। দাদু বুঝলেও, ছোট্ট রঞ্জিতার বোঝার ক্ষমতা ছিল না, অজান্তে কত বড় প্রশ্ন করেছে।

আজও জীবনে অর্থহীন উন্মাদনা আছে বলেই পৃথিবীটা এগিয়ে চলেছে। যেদিন সেই পাগলামোর পোকা, উচ্ছ্বাসের আবেগ হারিয়ে যাবে, হিসেব নিয়ে বসে, মানুষ সব কিছু চাওয়া-পাওয়ার মাপকাঠিতে বিচার করবে, সেদিনও কী নতুন কিছু সৃষ্টি হবে? বিপ্লব, কবিতা থেকে বিজ্ঞান। সব কিছুই সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন, যেদিন কারও মাথায়, পাগলামির ভূত চেপেছিল।

দাদুও ওই পাগলের দলের শরিক। ব্রিটিশ গোলামির প্রতিবাদের নীরব সাক্ষী।

রঞ্জিতার কথা টেনে দাদু বলেছিল “আজ বুঝবি না। একদিন টের পাবি”

ঠিকই বুঝেছিল রঞ্জিতা, নিজের মতো করে। ব্রিটিশ এমন এক জাতি, দুনিয়াকে পায়ের তলায় লুটিয়ে রাখতে পারে। সভ্যতাকে আগামীর রশ্মি দেখাতে পারে। ধ্বজা উড়িয়ে, পৃথিবীর বুকে, নিজেদের দৃঢ় পদক্ষেপ রাখতে পারে।

বড্ড ছোট মনে হয়েছিল নিজেকে, এই সর্বগ্রাসী সভ্যতার কাছে।

মা বলত "এদেশে কিসসু হবে না"

বড় হতেই মাকে প্রশ্ন “কেন মা?”

“দেখ না, আমি বাংলা সাহিত্যে ডক্টরেট। ডিলিট। কী হল? হাতা-খুন্তি ঠেলছি”

“বিলেতে থাকলে কী অন্য কিছু হত?”

“কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যেতাম”

একটা স্বপ্ন। দাদুর মতো সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়। তাতে গুলি খেয়ে শহিদ হওয়া যায়। নিজের লাভ হয় না। লাভ করতে হলে, ও দেশের মাটিতে বসেই ওদের জয় করতে হবে। দাদুরা সেকেলে। ওদের চিন্তাধারাও। অতীতের দিকে না তাকিয়ে, আগামীর সাজে সাজতে হবে। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। স্বপ্নের মায়াবি আলোকে। একটা রঙিন কালো পর্দার আড়ালে।

রঞ্জিতার ছোটবেলার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিল অরিজিৎ। মায়ের মুখে শোনা, ছোটবেলার রূপকথার দেশের কবিতাকে বাস্তবের আঙিনায় পৌঁছে দিয়েছিল। পিকাডেলি সার্কাসের আলোর বাহারে। রূপে, রসে, ছন্দে। সোহোর রেমন্ড রিভারবেয়ার থেকে ওয়েস্টমিনস্টারের নৌকায় আরেক পৃথিবীতে।

এটাই জীবন। বেঁচে থাকার শহর।

***

আহা রে! মেয়েটার মুখের ওপর রোদের আভাটা ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে। চাদরটা গা থেকে সরে গেছে। মুখটা থমথমে। বোধহয় কোনও দুঃস্বপ্ন দেখছে। কাল রাতে পর্দা টেনে শুতে ভুলে গেছে। এখন সকাল নটা হলেও গ্রিনউইচ মিন টাইমে এখনও সাড়ে-চারটে। অরিজিৎ চারদরটা টেনে দিল শ্রাবস্তির ওপর। পর্দা খুলে দিল। শান্তিতে ঘুমোক। আজ শনিবার। ওদের উইকএন্ড।

শীতের সকালের মিঠে রোদ উপেক্ষা করে জানলার ধারের আরাম কেদারায় বসল। আজ সে সকালের সূর্য দেখবে না। শুধু বুক ভরে চেয়ে থাকবে তার একমাত্র উত্তরসূরির দিকে। মনটা ভরে গেছে পরিপূর্ণতায়। কেন? শুধু কী এত বছর পরে মেয়েকে দেখায়? যাকে বিগত সতেরো বছর দেখেনি। মনে হল, সে স্বার্থপরের মতো নিজের কথা ভেবেই আট বছরের শ্রাবস্তিকে ছেড়ে এসেছিল। শুধুই স্বার্থ? তখন কী মেয়ের থেকে প্রফেশনাল সাকসেসই প্রধান ছিল?

একটু নড়ে আবার উল্টো দিক ফিরে শুল শ্রাবস্তি। ঘুমোক। মুখ দেখা যাচ্ছে না। চুলগুলো বালিশে ছড়িয়ে। কত বড় হয়ে গেছে। মনে পড়ল সেসব রাতের কথা। যখন ওকে নিয়ে সারা রাত বসে থাকত। ঘরের কাজের ক্লান্তি, পড়াশোনার পর রঞ্জিতা গভীর ঘুমে মগ্ন। মাঝরাতে ওর ডিম্যান্ডসের তদারকি। পাশে না থাকলে মেয়েটার চিৎকার।

রঞ্জিতাকে বলেছিল “পাশের ঘরে শুলে ঘুমোতে পারবে। উইকএন্ডে আমি ওকে সামলাব”

সেই শ্রাবস্তি।

লন্ডনের ইলিং হসপিট্যালে জন্মাবার পর গাড়ি নিয়ে ছুটে গেছিল হাউন্সলোর মাদার কেয়ারে প্রথম জামা কিনতে। রঞ্জিতার সুপারস্টিশন ছিল, জন্মাবার আগে জামাকাপড় করালে, বাচ্চার অমঙ্গল হয়। মেয়ে মানে গোলাপি। ছেলে হলে নীল। মেয়ে যখন, গোলাপি জামা, সোয়েটার, র‍্যাপার। বুকের দুধ খাওয়ালে স্তন ঝুলে যাবে। কে যে রঞ্জিতাকে শিখিয়েছিল? পাউডার মিল্ক গরম জলে গুলে, কোলে করে ফিডিং বটল নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসা। সময়-অসময় হাগিস চেঞ্জ।

রঞ্জিতা বলেছিল “বাচ্চার যখন এত শখ, তুমিই সামলাও”

রঞ্জিতার কী প্রেগনেন্সিতে সমর্থন ছিল না? থাক, চাই না থাক, ইটজ টু লেট।

শ্রাবস্তি আড়মোড়া ভেঙে হাত দুটো শূন্যে ছুড়ে চোখ কচলিয়ে বলল “হোয়ার অ্যাম আই?”

“ক্যালকাটা। চা করে আনি”

টেবল থেকে চশমা তুলে অরিজিৎ বেরিয়ে গেল। বাড়িতে কী কাজের লোকের অভাব? তবুও কেন যে অরিজিৎ নিজেই চা করতে গেল, কে জানে? একদিন ছোটবেলায় মেয়েকে কোলে নিয়ে দুধ খাইয়েছে। আজ মেয়ে সাবালক। মেয়েকে চা খাওয়ানোর লোভটা সংবরণ করতে পারল না।

এই ছোট অভিব্যক্তির মধ্যে যে কত পাওয়া লুকিয়ে, সবাই যদি বুঝত? বুঝলে, বড় পাওয়ার পেছনে না ছুটে, ছোটগুলো হারাত না।

ওর বেরনোর দিকে তাকিয়ে হাত দুটো টান করে, আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল শ্রাবস্তি। পর্দাটা ফাঁক করে, মধ্য ভোরের কলকাতাকে দেখল। সল্ট লেককে, ঠিক কলকাতা বললে ভুল হবে। কলকাতার চেয়ে অনেক শান্ত, নিরিবিলি। এখানে নরউড গ্রিন, হ্যাম্পটন কোর্ট বা গ্রিনউইচ ভিলেজের ছোঁয়া। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে পর্দাটা টেনে দিল।

মায়ের অমতে, সবকিছু পেছনে ফেলে কেন এই অজানার পথে? কেবল স্টিভের ধাক্কার পর? বাবা তো আগেও ছিল। কোনওদিনও তো বাবার কথা সেরকমভাবে মনে হয়নি। আজ কেন?

দু-কাপ চা হাতে ঘরে ঢুকল অরিজিৎ। শ্রাবস্তির দিকে এগিয়ে বলল "ঘুম হল?"

"ইয়েস ড্যাড। থ্যংকস" চায়ের কাপটা নিল।

অরিজিৎ বুঝতে পারছিল এরপর কী আসবে। নিস্পৃহভাবে কাপটা নিয়ে পাশের সোফায় বসে বলল "ইজ এভরিথিং ফাইন?"

"পারফেক্ট। ড্যু ইউ অলওয়েজ মেক টি ইওরসেলফ?"

"নো। টুডে ইজ স্পেশাল। তুমি এসেছ"

অনেক অনুভূতি এই শব্দে বন্দি। অনেক কথা, অনেক সুর, অনেক রাগ। দুটি আত্মাকে নীরবে বন্দি করেছে। অনেক কথা বাকি থেকে গেছে। থাক। অনেক না বলা সুর উঁকিঝুঁকি মারছে। থাক। চায়ের পেয়ালার নির্বাক চুমুক অনুভূতির স্পন্দনকে অলিখিত মায়ায় ভাসিয়ে দিয়েছে। এই নির্বাক স্পন্দন, অলিখিত মায়াই কী না বলা-কথা বলে দেয়? না-শোনা সুর নতুন করে শোনায়?

বাইরের সোনালি আলোয় ভেসে বেড়ানো পাখিদের দিকে তাকিয়ে একটা আবছায়া স্মৃতি আবার ফিরে এল। ধোঁয়াশায় ভরা আবছায়া অবয়ব। বাবার হাত ধরে ব্রাইটন বিচে গ্রীষ্মের এক দুপুরে এমনিভাবে তাকিয়ে ছিল, আকাশে ওড়া পাখিদের দিকে। নাম না জানা পাখি। ওরা বলত মাইগ্রেটরি বার্ডস। সেও কী ওদের মতোই মাইগ্রেটারি? প্রশ্নটা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সি ইজ ব্রিটিশ বাই বার্থ। বর্ন ইন ইংল্যান্ড। ব্রিটিশ বাই ন্যাশনালিটি।

অরিজিতের দিকে ফিরে বলল "আই ক্যান ভেগলি রিকল। হোয়েন ইউ, মি অ্যান্ড মাম মি ইউসড টু গো আউট এভরি উইকএন্ড"

চায়ে চুমুক দিয়ে অরিজিৎ বলল "ক্যান ইউ?"

"সিইং দোস বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য এয়ার, ইট রিমাইন্ডেড মি অফ দোস ডেইস"

অরিজিৎ উত্তর দিল না। শুনতে চায়। এখনও বলার সময় হয়নি। অনেক কথা বলা হবে। অনেক ব্যথা শোনা হবে। এখন নয়। এখন মুক্ত বিহঙ্গের মতো শ্রাবস্তিকে ভেসে বেড়াতে দিতে হবে কলকাতার আকাশে-বাতাসে। চেনাতে হবে নিজের মাটির গন্ধ, সুদূর তেপান্তর থেকে আসা বলাকার মন।

বাবাকে চুপ থাকতে দেখে বলল "ড্যু ইউ রিমেম্বার?"

"অফ কোর্স। এভরি বিট অফ ইট। হাউ ক্যান আই ফরগেট?" এঙ্গেলবার্টের সুর **ইজ ইট সো ইজি টু ফরগেট?**

না। এখন কিছুই বলবে না। শুধুই শুনবে। শ্রাবস্তির কথা।

***

মঞ্জরী বলল "কথা হয়েছে?"

ফোনের ওপারে অরিজিৎ "না"

শ্রাবস্তি আসার পর মঞ্জরীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। উপস্থিতিটা শ্রাবস্তি কীভাবে নেবে, এই ভেবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে মঞ্জরী। হারানোর দুঃখ ভালো করেই বোঝে। অরিজিতের এই পাওয়াকে কোনওভাবেই হারাতে দিতে চায় না। অরিজিতের কাছ থেকে দূরে থাকলে শ্রাবস্তিকে আরও কাছে পেতে পারে অরিজিৎ।

"তুমি কথা তুলবে না?"

"না। ও দেখতে এসেছে, দেখুক। বুঝতে এসেছে, নিজের মতো করে বুঝে নিক। আমি কিছু বলতে গেলে মনে করবে, সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করছি"

"ও এখন কোথায়?"

"ওপরে। জানি না কী করছে। উইকএন্ড। বোধহয় রিল্যাক্স করছে"

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল অরিজিৎ। সংযত করে বলল "রাখি"

এতদিনে অরিজিৎকে কিছুটা চিনতে পারে মঞ্জরী। অরিজিৎ যখন ঝট করে কথা থামিয়ে দেয়, তখন অন্য পৃথিবীতে চলে গেছে। ধূসর পৃথিবীর নিস্তব্ধ বালুচরে, ভাসমান আবছায়া আলোকে সন্ধ্যারাগের নতুন সুর

খুঁজতে। সেখানে স্তব্ধ নীরবতায় না-শোনা রাগ। কী রাগ, কে জানে?

সল্ট লেকের নিস্তব্ধ শনিবারের শীতের কুয়াশায় কয়েকটা বিন্দু ভেসে বেড়াচ্ছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পুরিয়া ধানেশ্রীর সুরে। তাই দিয়ে আবার নতুন করে সাজাতে হবে সায়াহ্নের সন্ধ্যারতি।

কতবার?

মঞ্জরীর সঙ্গে আলাপে সে পেয়ে গেছিল হারানো ছন্দের গতি। বিলুপ্তির অন্ধকার থেকে মনের পরিতৃপ্তি। চলার নতুন জ্যোতি। দুঃখটা যখন ধূসর পাণ্ডুলিপির মতো ক্রমশ মনের গভীরে হারিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মঞ্জরী একদিন দুম করে বলে বসল “ভালো লাগছে না”

ওর কথার ঝংকার টেনে অরিজিৎও বলেছিল “আমারও। চলো না কোথাও ঘুরে আসি”

দু’জনেই পালাতে চাইছিল তাসের দেশ ছেড়ে। অলীক স্বপ্নের মায়ালোকে। মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এক শুক্রবার অরিজিতের ফোন “আধঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে নাও”

“কেন?”

“গাড়ি নিয়ে আসছি। কয়েকদিন কলকাতার বাইরে ঘুরে আসি”

“কোথায়?”

“জানি না। আধঘণ্টার মধ্যে আসছি” ফোনটা কেটে দিয়েছিল অরিজিৎ।

এই অরিজিৎ। এমনিতে ছকে বাঁধা জীবন। কিন্তু মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা হলেই শীতে বসন্তের কোকিলের ডাক শুনতে পায়। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। কিংবা এলোমেলো করে দেওয়ার মধ্যে নিজেকে পায়। মঞ্জরী অনুভব করতে পারে।

অরিজিতের পাশে সামনের সিটে, হাল্কা নীল তাঁতের শাড়িতে, সিট-বেল্ট লাগিয়ে বলল “জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। কেন জান? নিজেই জান না। চল, যেখানে নিয়ে যাবে। সঙ্গে আছি”

শীতের সকালের মিষ্টি রোদ্দুর গায়ে মেখে চশমার ফ্রেম ঠিক করে, গাড়ির স্টিরিও সিস্টেমটা চালিয়ে দিল। কলকাতার ছেড়ে গাড়ি ছুটছে অজানার পথে। স্টিরিওতে বাজছে -

পথ হারাব বলেই এবার পথে নেমেছি

সোজা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি

মঞ্জরী প্রশস্ত হাইওয়ের দিকে তাকিয়ে। জানা পথের চৌহিদ্দি ছেড়ে অজানার পথে। জীবন ভাটায় একটু ছন্দ, একটু আশা। পাখির মতো ডানা মেলে ধরে নিজেকে নতুন করে ভালোবাসা। নিজের মনেই বলল “ভালোই করলে। আমার মনও চাইছিল”

অরিজিৎ কোনও জবাব দিল না। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে গাড়ি ছুটছে। চেনা বদ্ধতা থেকে মুক্তির আনন্দের শূন্যতায়। না কী পূর্ণতা? শূন্য-পূর্ণের দোটানায় জীবনের গতি, প্রস্ততি, দ্যুতি। ছোটার একঘেয়ামি থেকে নিষ্কৃতি। শুধু জানে, যখন মানুষের খিদে পায় সেটা প্রকৃতি। যখন মানুষ কেড়ে খায় সেটা বিকৃতি। যখন মানুষ ভাগ করে খায় সেটাই সংস্কৃতি। মঞ্জরীর সঙ্গে মুহূর্তটাকে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে একটা সৃজন লুকিয়ে। এটাই নতুন ছন্দের সুর এঁকে দেয়। পুরিয়া ধানেশ্রী থেকে শিবরঞ্জনী। রাগ নয়, ভেতরের সুখের প্রস্ফুটন। এক মুঠো সুখকে ভাগ করে নিতে আজ মঞ্জরীর সঙ্গে। দুঃখের কালবেলায় এটুকুই পাওয়া। হারানো সুরে, নতুন গান গাওয়া। এটুকুই মধ্য বয়সের চাওয়া।

এর আগে তো, এভাবে কখনও মঞ্জরীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েনি। কোনও রেস্তরাঁ বা গাছের আলো-আঁধারি। বা দু'জনের নির্জন আস্তানা। কিছু মুহূর্ত, কিছু টুকরো আবেগ। কিছু কথা। কিছু ভাষাহীন নীরবতার রেশ।

গলসি পর্যন্ত কোনও কথা নেই। সব কথা সুরের ছন্দে হারিয়ে। একটু এগিয়ে রাস্তার পাশের ধাবায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল "চা খাবে?"

"নিশ্চয়ই" সিট-বেল্ট আলগা করে গাড়ির দরজা খুলে মঞ্জরী পা ছড়িয়ে দিল ভিজে ঘাসের ওপর।"যাচ্ছিটা কোথায়?"

"চল না, যদ্দুর যাওয়া যায়। এখনও ঠিক করিনি। শান্তিনিকেতন, বিষ্ণুপুর, বেলিয়াতোড় বা মাইথন। যেখানেই হোক না কেন, এক সঙ্গে যাওয়ার আনন্দটাই বড়। ভালো লাগাটাই আসল" মুহূর্তের ছন্দকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার মধ্যেই তৃপ্তির প্রকাশ। একঘেঁয়ে স্তব্ধতার মৌন বিকাশ।

মনে পড়ে গেল সেই সময়কার কথা। যখন ভাশুর প্রায় তাকে গৃহছাড়া করে।

অরিজিৎ বলেছিল "কোর্ট কাছারি করে লাভ নেই। বছরের পর বছর কেস চলবে। ইনজাংশন হলে সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত কেউই বাড়ি ভোগ করতে পারবে না"

"তাহলে?"

"ভাশুরের সঙ্গে কথা বলি" অরিজিৎ স্বাভাবিক।

মঞ্জরী আশ্চর্য হয়ে গেছিল। কোনও ব্যারিস্টার যে ক্লায়েন্টের বাড়ি বয়ে বিপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে আসতে পারে, জানা ছিল না। স্বাভাবিক নয়। সেই মুহূর্তেই নতুন ছন্দ জলতরঙ্গ বাজিয়ে গেছিল। মিঠে সুখের অনুভূতি। অনেক হারানোর মধ্যে পাওয়ার আভাসে তৃপ্তি।

মঞ্জরীর বাড়িতে, ভাশুরকে বলেছিল "কোর্ট-কাছারি, মামলা-মোকদ্দমা করে কী হবে?"

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অরিজিতের ওপর "এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছেন কেন?"

“এসব করে লাভ নেই। ইনজাংশন দিলে, চোদ্দ বছর এ বাড়ি কেউই ভোগ করতে পারবে না। আপনার তো বাড়ি আছে। এই বাড়িটা নিয়ে কেন পড়েছেন?”

“এমনি কেন? কেউ ছাড়ে? বাড়িটার ভ্যালুয়েশন করাই। তার অর্ধেক ভাগ যদি মঞ্জরী আপনাকে দেয়?”

অরবিন্দ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরিজিৎকে দেখেছিল। অ্যামেরিকায় বসবাসকারি বাঙালি। নিজের সুবিধা বুঝে নিতে হবে।

অরিজিৎ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলেছিল “দলিলটা দেখেছি। কোনও মিউটেশন হয়নি। সেদিক দিয়ে এখনও বাড়িটা আপনাদের বাবার। দু’জনেরই সমান অংশ। আপনি তো আর এখানে থাকছেন না। কোর্ট-কাছারি করার চেয়ে আধা ভাগ অনেক ভালো। নয় কী?”

অরবিন্দ ভাবল। মঞ্জরীকে যতটা অসহায় ভেবেছিল, এখন মনে হচ্ছে ততটা নয়। এই ভদ্রলোককে যেখান থেকেই জোগাড় করে থাকুক না কেন, পেছনে বড় খুঁটি। নাম-ডাক-প্রতিপত্তি আছে, খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছে। এ যদি মঞ্জরীর হয়ে দাঁড়ায়, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গচ্চা ছাড়া আর কিছুই হবে না। তার থেকে টাকা নিয়ে সরে পড়াই ভালো। কোথা থেকে এই মহিলা এমন জাঁদরেল লোককে পাকড়াল, বুঝতে পারল না।

“দু-দিন ভাবার সময় দিন”

শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেছিল অ্যামেরিকাবাসী। কীভাবে যে মঞ্জরীর অ্যাকাউন্টস, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে অরিজিৎ জড়িয়ে পড়ল, নিজেও জানে না। একটা আশ্রয়, একটা বিশ্বাস খুঁজছিল মঞ্জরী। অরিজিতের ওপর নিজেকে সঁপে দিতে দ্বিধা করেনি।

হারিয়ে যাওয়া জীবনে নতুন নীড়। মনের কোণে বাজা জলতরঙ্গের শব্দহীন সমীর। অলিখিত মোহনায় দূর থেকে দেখা তীর। হারলে হারবে। সবই তো হারিয়েছে। আরেকবার নয় হারল। ক্ষতি কী?

অরিজিৎ চায়ের ভাঁড়টা মঞ্জরীর হাতে এগিয়ে দিয়ে বলল “চা খাও। চিকেন পকোড়া আসছে”

***

শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়ার ঝলক হঠাৎ ছুঁয়ে গেল শ্রাবস্তিকে। শীতের স্পর্শ। শ্রাবস্তি হাত কাটা সোয়েটারের বোতাম আটকে নিল। বারান্দা দিয়ে খোলা টেরেস। ওপারে কয়েকটা বড় গাছ। ইংল্যান্ডে দেখেনি। তারার আলোয় গাছগুলো আকাশের গায়ে বিচিত্র সিল্যুয়েট এঁকেছে। ছোটবেলায় রূপকথায় পড়া নোম বা গবলিনের মতো। আকাশ তারায় ভরা। ইংল্যান্ডের তারাগুলো এত ঝকঝকে নয়। ভেসে আসছে পোকার অদ্ভুত একঘেয়ে সুর।

মনে পড়ল ডেভিড ওকে পোলস্টার চিনিয়েছিল। বাংলায় ধ্রুবতারা। ধ্রুব মানে শিহর। স্ট্যাটিক। খুব কান্না পেল। স্ট্যাটিক। জীবনে স্ট্যাটিক বলে কিছু আছে নাকি। বারান্দার বেতের সোফায় গা এলিয়ে ইন্ডিয়ার হালকা শীতের আকাশে ধ্রুবতারা খুঁজতে লাগল। ধ্রুবতারা থেকে ল্যাম্প পোস্টের আলো। বাতির মতো জ্বলছে। দূরে অথবা কাছে। মিঠে কুয়াশায় ল্যাম্প পোস্টের আলোটা ফোটনের স্নিগ্ধতার বিন্দু ছড়িয়ে দিচ্ছে। নিঃঝুম নিস্তব্ধ বিশাল উপনগরী। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে ক্লান্ত রাগিণীর শেষ সুর বাজিয়ে যাচ্ছে। সময় হয়েছে অশ্বমেধের ঘোড়া থামানোর। যজ্ঞের আগুনে স্নাত হয়ে বিশুদ্ধতা চেনার। অস্তিত্বের পবিত্রতার ধ্রুবতারা দেখার।

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার

হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর

কয়েকফোঁটা শিশিরে হিমেল হাওয়ার স্পর্শ। শিহরণ। কম্পন। বাইরের নিস্তেজ আবরণ। নতুনের পথে দোটানার জাগরণ। অনেক প্রশ্ন তোলপাড় করছে। অস্তিত্বটা নিজের কাছেই ধোঁয়াশা। তার জন্য কী বাবার কিছুই করার ছিল না? একরাশ প্রশ্ন নিয়ে সাত-সমুদ্র-তেরো নদী পেরিয়ে সে এসেছে। হাত-কাটা নীল সোয়েটারের ওপর ডান হাত বোলাল। হৃদয়ের স্পন্দন কড়া নাড়ছে। কেউ কী নেই? তবে কী সব মিথ্যে?

স্টিভকে ধরে বাঁচতে গিয়ে অনুভব করেছিল, মায়ের শেখানো পৃথিবীর শূন্যতা। অনুভব করা সত্ত্বেও, অন্ধকারে হাত বুলিয়ে কী যেন খোঁজার চেষ্টা করে চলেছে।

“ইউ আর নট ইন্ডিয়ান। দেয়ার ইজ নাথিং ইন্ডিয়ান অ্যাবাউট ইউ। এক্সেপ্ট দ্য কালার অফ ইওর স্কিন” কথাটা কষে থাপ্পড় মেরেছিল তার ভারতীয় অরিজিনকে। কোথায় তার ভারতীয় বাবা, যে তাকে হাত ধরে পথ দেখাতে পারবে? মধ্যরাতে বাবার দুধ খাওয়ানোর স্মৃতি ধূসর। বাবা নেই। আছে মায়ের দ্বিতীয় পক্ষের

আশ্রয় ডেভিড। ডেভিডের সে ক্ষমতা নেই। কার হাত ধরে ডার্কনেস ছেড়ে লাইট দেখবে? স্টিভের ব্রিটিশ অ্যারোগ্যান্স? না তার আইডেন্টিটির গরমিল? বাবা থাকলে কী বলত? জানার সৌভাগ্য হয়নি শ্রাবস্তির।

শ্রাবস্তির দিকে না তাকিয়ে অরিজিৎ বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়াল। কাশ্মীরি চাদরটা কাঁধের ওপর ফেলে উল্টোদিকের ল্যাম্প পোস্টে চেয়ে। ঝিঁঝি পোকার কলরব গেয়ে উঠছে ফেলে আসা অতীত।

খুকু ঘুমোল পাড়া জুড়ল বর্গি এল দেশে

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে

উইকএন্ডে ছোট্ট শ্রাবস্তির সঙ্গে বিনিদ্র নিশি। ফিডিং বটল, ন্যাপি। কিছুক্ষণের জন্য ক্লান্তির অবসান। ওপাশের খাটে গভীর ঘুমে রঞ্জিতা। মেয়ের কান্না তার রাতের সুখ-নিদ্রা ভাঙতে পারেনি। সেই রঞ্জিতা দোদুল্যমান জীবনবোধে অতীত। হারিয়ে গেছে দুঃখ-আনন্দের যুগলবন্দিতে।

"এখানে থাকব না" অরিজিতের দৃঢ়তায় কেঁপে উঠেছিল রঞ্জিতা।

"তোমার কেরিয়ারটাই বড়। আমরা কেউ নই?" রঞ্জিতার স্বরে স্বভাবজাত ব্যঙ্গ।

"কেরিয়ার নয়। মাথা উঁচু করে বাঁচা। ইন্ডিয়াতে গিয়েও সম্ভব। তোমার যেতে আপত্তি কোথায়?"

"আমার ইন্ডিয়া ভালো লাগে না। মেয়ে বড় হলে, এই বিদেশের মাটিতেই আবার ফিরে এসে লড়াই। আমরা কষ্ট করেছি। ও যাতে না পায়"

"ওর যেমন জীবন, আমাদেরও তো আছে"

চায়ের কাপগুলো ডিশ-ওয়াশারে ঢুকিয়ে রঞ্জিতা বলেছিল "বাবা হলে সব সেকেন্ডারি। মেয়ে প্রাইমারি"

রঞ্জিতা কী ঠিক বলেছিল? সংসার-ধর্মে ঢুকলে কী নিজের আমি'টাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হয়? এগো, না ওর জীবনদর্শন?

ধ্রুবতারার রং বারবার পাল্টায়! সেই রঙের বাহারে, জীবন নতুন স্পন্দনে সুরের মূর্ছনা ছড়ায়, আবেগ আর বিচারবুদ্ধির দ্বন্দ্বে। তার টানাপোড়েনেই জীবনের প্রবাহ। বা ফেলে আসা বিরহ। এই প্রবাহ-বিরহের দ্বন্দ্বদোলায় সন্ধ্যাতারার শেষ বাতিটা জানান দেয়, জীবনের উত্তরণ বা স্বপ্নের নতুন বাতাবরণ।

"ড্যাড, হোয়াই ডিড ইউ ডেসার্ট মি?"

শ্রাবস্তির কথায় চমকে উঠল অরিজিৎ। প্রশ্নটা আসবে, জানা। অতর্কিতে এভাবে আসবে, সেটা অজানা।

শ্রাবস্তির দিকে ফিরে বলল "টেক রেস্ট। পরে অনেক সময় আছে কথা বলার"

শ্রাবস্তি চেয়ার ছেড়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে বলল "হু অ্যাম আই? হোয়াট ইজ মাই আইডেন্টিটি?"

অরিজিৎ ফিরে বলল "কিছু খাবে?"

বাবার তাচ্ছিল্যে শ্রাবস্তি খেপে উঠল। এতদূর থেকে কি এসেছে শুধু বাবার কাছে আতিথেয়তার জন্য?

“কাম অন ড্যাড। ইউ আর ট্রাইং টু অ্যাভয়েড দ্য কোয়েশ্চেন” চোখে-মুখে প্রচ্ছন্ন বিরক্তি।

অস্তিত্বহীন জীবনে বাবা আরও বেশি করে তাকে মুছে দিতে চাইছে। হি হ্যাজ ডেসার্টেড হার। লেফট হার টু এ মিক্সড এনভায়রনমেন্ট। হোয়ার হার ম্যারেজ, হার লাইফ ইস অ্যাট স্টেক। লাইফ হ্যাজ বিকাম মিনিংলেস, ইন দ্য অর্কেস্ট্রা অফ হার টার্মঅয়েল। মা ঠিকই বলেছিল। বাবা ভীষণ স্বার্থপর। অ্যান আউটরাইট সেলফ-সেন্টার্ড হিউম্যান বিইং। বউ-বাচ্চার জন্য ভাবে না। এ ডিগ্রেডেশন অফ এ হিউম্যান বিইং। সে বোকার মতো এতদূর এসেছে তার মানে খুঁজতে? হাউ ফুলিশ অফ হার!

অজান্তেই বেরিয়ে এল “আই হ্যাড নো আইডিয়া। ইউ আর সো সেলফ সেন্টার্ড”

অরিজিৎ রেলিং ছেড়ে বেতের সোফায় বসল। শ্রাবস্তিকে অন্য সোফায় ইঙ্গিত করে, ঠান্ডা স্বরে বলল “সিট ডাউন”

শ্রাবস্তির রাগ তখনও কমেনি। বুকের ভেতরটা ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে বিদীর্ণ। প্রবল আবেগে চোখের জল আছড়ে পড়তে চাইছে, অন্তরের পুঞ্জীভূত বর্ষার খরস্রোতা প্লাবনে। বাহির-অন্তর মিলেমিশে একাকার আদি অকৃত্রিম শাশ্বত প্রশ্নের নিষ্পেষণে। কালস্রোতে বিভিন্ন আচ্ছাদনে সাজানো, আমোঘ তরঙ্গের নিত্য-নতুন জোয়ারে জীবনব্যাপী ধ্রুপদি কলতানে। হু অ্যাম আই? হোয়াট ইজ মাই আইডেন্টিটি?

রেলিংয়ে ভর দিয়ে দৃঢ় স্বরে বলল “আই ওয়ান্ট অ্যান আন্সার”

অরিজিৎ স্থিরভাবে তাকাল বহুদিনের ফেলে আসা একমাত্র লিগ্যাসির দিকে। তার প্রতিটা রক্তবিন্দু, প্রতিটা কোষের জিন, তার উত্তরাধিকারের ভবিষ্যৎ, বেঁচে থাকা বর্তমানকে প্রশ্ন করছে। আমার মধ্যেই তুমি বেঁচে থাকবে। আমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তোমার ভবিষ্যৎ নেই। আমার মধ্যেই তোমার প্রকাশ। আমার মধ্যেই তোমার বিকাশ। আমার অবলুপ্তিতে তোমার অস্তিত্বের সর্বনাশ।

আবেগে থরথর করে শ্রাবস্তি কাঁপছে। ভবিষ্যৎ নিশ্চিহ্ন করে দেবে তাকে অবলুপ্তির অন্ধকারে।

ধীর শান্ত গলায়, ভবিষ্যতের চোখে চোখ রেখে অরিজিৎ বলল “তোমায় জবাব দেব না। দেখাব”

***

আহা রে! মেয়েটা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। পোরশে চড়া মেয়ে, লোকাল ট্রেনের ভিড়ের ধকল কী নিতে পারে? নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে, অরিজিৎ সরে যাওয়া খেশটা গায়ে ঢেকে দিল। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে একটাই জিজ্ঞাসা ‘আই হ্যাভ হেলপড হার টু টেক হার ফার্স্ট স্টেপ ইন লাইফ। উইল সি হেল্প মি টু টেক মাই লাস্ট?’

অনেক প্রশ্ন, অনেক দ্বন্দ্ব ঘুরপাক খাচ্ছে। সে কী স্বার্থপরের মতো মেয়েকে ছেড়ে এসেছিল! শ্রাবস্তি তো তাই বলল। রঞ্জিতাও বহুবার বলেছে। ধ্রুবতারার রং পাল্টায়। তখনকার ধ্রুবতারা আর এখনকার সন্ধ্যাতারার মধ্যে কী কোনও তফাত আছে? তখন কী ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বলে এগোটাই বড় ছিল? পরিবার কী তবে সন্ধ্যাতারার মতোই গৌণ?

রঞ্জিতা বলেছিল "ইউ কেয়ার ফিগস ফর এনি অফ আস। ইউ আর আফটার ইওর প্রফেশনাল সাকসেস। দ্যাটস দ্য বি অল অ্যান্ড অল অফ ইওর লাইফ"

ব্রিটেন থেকে আসা মেয়েকে ভারত দেখানো শুরু। চার্চে সান্ডে মর্নিং কয়ার শুনে বড় হয়েছে। ক্যান্টারবেরি ক্যাথিড্রালের কথা মনে পড়তে পারে। আজ রবিবার। সেই কয়ার-ই তাকে শোনাবে। না, না, ক্যান্টারবেরি ক্যাথিড্রালে নয়। কলকাতার পাশেই ব্যান্ডেল চার্চে। গাড়ি ছেড়ে হাওড়া স্টেশন থেকে দু'জনে ব্যান্ডেল লোকালে। গা-ঠেলা ভিড়। শীত বলে অতটা গরম লাগছে না। কেউ লজেন্স বিক্রি করছে, কেউ ধূপকাঠি। অপূর্ব সুবাস।

শ্রাবস্তি জিজ্ঞেস করল "হোয়াট ফ্র্যাগনেন্স ইজ দিস?"

অরিজিৎ হেসে বলল "তোমাদের ল্যাভেন্ডার নয়। পিওরলি ইন্ডিয়ান। স্যান্ডেল উড। এই চন্দন কাঠ আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে জুড়ে আছে। বিয়ে থেকে শ্রাদ্ধ। সবেতেই ব্যাবহার করা হয়"

"দ্য স্মেল ইজ এক্সুইজিট। ক্যান আই বাই ওয়ান?"

"নিশ্চয়ই। অ্যাজ মেনি অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট"

কয়েক প্যাকেট ধূপকাঠি কিনে ফেলল। ফেরিওয়ালা ভাবেওনি এক সঙ্গে কেউ এতগুলো কিনবে। দামের বেশি টাকা গুঁজে দিল ওর হাতে। মেয়ে চেয়েছে। সেটাই বড় কথা।

ট্রেন শ্রীরামপুর-ভদ্রেশ্বর পার হয়ে গেছে। শ্রীরামপুর থেকে ফেরিওয়ালা পুঁতির মালা নিয়ে উঠল "খুব সস্তা। জুড়ি পাওয়া মুশকিল। মাত্র দশ টাকা" পসরা মার্কেটিং করছে।

"সো চিপ। দিস চাঙ্কি জুয়েলারিস কস্ট এ ফরচুন ইন হ্যারডস" চোখে বিস্ময়।

"এটা তোমার ইউকে নয়, ইন্ডিয়া। এখানের লোকেদের অত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই"

গরিব দেশে এসব জিনিস কত সস্তা। অথচ শ্রাবস্তি দেখেছে লন্ডনের ডিজাইনার ব্যুটিকে চড়া দামে এগুলো বিক্রি হয়। ব্রিটিশরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেগুলো ম্যাচিং ড্রেসের সঙ্গে কিনতে।

"হোয়াট প্রফিট ড্যু দে হ্যাভ?"

"নট এ লট। এনাফ ফর এ সার্ভাইভাল। ঠিক ততটাই। হাম্বল সার্ভাইভালের জন্য অনেক টাকার দরকার হয় না। পুরোটাই মনের ব্যাপার। কত চাই? কতটা পেলে বলতে পারবে, আর চাই না"

“ইন আওয়ার ওয়ার্ল্ড এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু দ্যাট” শ্রাবস্তি তার দেখা দুনিয়াটা বোঝাতে চাইছে।

“সো অলসো হিয়ার। কিন্তু সবার তো টাকা নেই। তাদেরও বাঁচতে হয়। ফাইন্যালি এভরিথিং বয়েলস টু হাউ মাচ উই নিড অ্যান্ড হাউ মাচ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ। পোরশে কিংবা মার্কের সঙ্গে তো সার্ভাইভালের কোনও সম্পর্ক নেই। ইটজ হাউ মাচ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ টু মেক ইউ হ্যাপি”

মা শিখিয়েছিল স্ট্যাটাস, মানি, পাওয়ার। বাবা অন্য রকম বলছে। পৃথিবীর দুই প্রান্তে দু’জনের কথায় কোনটা ঠিক? হুইচ ইজ দ্য রাইট ওয়ে?

মেয়েকে ঘুমোতে দিয়ে অরিজিৎ নিজের ঘরে ফিরে এল। সাউন্ড সিস্টেম আপনমনে বেজে চলেছে। কোকিলের কুহু শুনতে পাচ্ছে। এত বছর পর মেয়ের সান্নিধ্যে? যার উপস্থিতি সমাজের কাছে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে? জিনের প্রোপাগেশন সাবকনশাস মাইন্ডে সিকিউরিটি দেয়। শ্রাবস্তি ফিরে এসেছে পদবির উৎসে। বসু - গৌতম গোত্র। মানে খ্রিস্টপূর্বে গৌতম মুনির বংশধর।

রামধনুর সাতটা রঙের মতো তিনটে রং ক্যালিওডোস্কোপের ছকে ঘোরাফেরা করছে। সেগুলো ধ্রুবতারাকে কী এক আভরণ পরাচ্ছে,নতুন রূপে, ছন্দে। ধ্রুবতারা পাল্টায় কি না অরিজিৎ জানে না। হয়ত নয়। জীবনের এই ক্যালিডোস্কোপে শুধু তার আভরণই পাল্টায়।

চমকে উঠেছিল শ্রাবস্তি। অন্ধ স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সাত বছরের দৃষ্টিসম্পন্ন মেয়েকে দেখে। বাবা-মায়ের হাত ধরে ট্রেনের সিটের মাঝখানের আয়েল দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্ধ বাবা-মায়ের গলায় সুরঃ

আমার দুখে দুখে জনম গেল গো

গুরু সুখ তো আমার সইল না

জনম দুখি কপালপোড়া গুরু

আমি একজনা

মেয়েটি হাত পেতে সবার কাছে ভিক্ষা নিচ্ছে। লেস্টার স্কোয়ার আন্ডারগ্রাউন্ডে গিটার নিয়ে বহুবার ব্রিটিশদের ভিক্ষে করতে দেখেছে। কিন্তু এই গানে তো ব্যথার সুর। ব্যথা কী লেস্টার স্কোয়ারে নেই? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সুরের সঙ্গে মনের এত যোগাযোগ নেই। এই ইন্ডিয়া। এখানে সুর এভাবেই মনের কথা বলে! তার বিক্ষিপ্ত মন সেই সুর শুনতেই এসেছে। এই না-চেনা, না-জানা, উপ-মহাদেশে। অনেক প্রশ্ন নিয়ে এসেছিল জন্মদাতার কাছে। সব প্রশ্ন উহ্য রেখে প্রখ্যাত ব্যরিস্টার বাবা গাড়ি ছেড়ে শ্রাবস্তিকে নিয়ে লোকাল ট্রেনে। রিয়েল ইন্ডিয়াকে দেখাতে।

পাশের ধুতি-শার্ট পরা লোকটা অরিজিৎকে বলল “আপনাকে তো আগে দেখিনি। আপনি কী এই ট্রেনে প্রথম?”

“প্রথম নয়। তবে অনেকদিন পর”

যে যথা মাং প্রপদ্যমেত অংসতথৈব ভাজ্যাম্যহম।

মম বর্ত্মানুবর্তমেত মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।

লোকটি নিজের মনে আওড়ে গেল। ফিরে তাকাল ওর দিকে। অত্যন্ত সাদামাটা। অথচ কি অদ্ভুতভাবে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াচ্ছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত লোকটিকে মেপে বলল “আপনি দারুণ পণ্ডিত”

শ্রাবস্তি দেখছে লোকটিকে।

“আমি কোনও পণ্ডিত নই। বিদ্যে ক্লাস এইট”

“সংস্কৃত শিখলেন কোথায়?”

“শিখিনি বাবু। আমার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর বলিয়ে নেন”

গুল মারছে। এ কখনও হয়? শ্রাবস্তি অবাক হয়ে শুনছে। গডের সারমন চার্চে প্রিস্টদের মুখে শুনেছে। সেটাই রীতি। সেটাই প্রথা। অনেক দেবশিশু ধর্মের বড় বড় অরগ্যানাইজেশন আলোকিত করে হাজারো লোকের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী আওড়াচ্ছে। তাও ধর্মগ্রন্থ থেকে মুখস্থ বিদ্যে। আর এই লোকটা না পড়েই! গুল ছাড়া আর কী। অরিজিতের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছে, ওকে ওরা বিশ্বাস করছে না।

অরিজিৎ বলল “মানেটা আপনি জানেন?”

শ্রাবস্তির দিকে তাকাল। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে। এখানে কী সাধারণ লোকও সংস্কৃত শ্লোক জানে?

“কেন জানব না বাবু? যে যেভাবে আমাকে চায়, সে সেই ভাবে আমাকে পাবে। আমি তো ওনাকে চাই। আমার মতো করে পেয়েও গেছি। আর কী দরকার?”

শ্রাবস্তি চেয়ে আছে লোকটির দিকে। এখানে ট্রেনে ভিখারি গান গায়। সাধারণ লোক সংস্কৃত বলে। ওদেশে তো টিউবে ‘সান’ কিংবা ‘ডেইলি মিরর’ পড়ে লোকের কেচ্ছা হজম করে। ওরাও ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানিদের দিকে নাক সিটকিয়ে ‘আনসিভিলাইজড’ ভাবে। মা-ও তাই ভাবে। শ্রাবস্তিও তাই জানত। এখন বুঝছে টেলিভিশনের ‘টিউটর্ড’ শব্দটা সাধারণ মানুষকে কীভাবে প্রভাবিত করে। আজ সভ্যতার যন্ত্রবাক্সের বাইরে নতুন করে দুনিয়া দেখছে। অরিজিৎ আর শ্রাবস্তির সংশয় বুঝিয়ে দিচ্ছে, ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না।

“মিথ্যে বলছি না বাবু। সে আরেক কাহিনি”

একমনে শুনছে ওর কাহিনি “তখন দমদম লাইনে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করি। রেল লাইনের হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক লাইনে কাজ করতে গিয়ে শক লাগে। তারপর কিছু মনে নেই। নিমতলা ঘাটে ওরা যখন আমাকে পোড়াতে গেছে, চিতায় শুয়ে চোখ মেললাম। চুল্লির ওপর থেকে হেঁটেই নেমে এলাম। ওরা

চিৎকার করতে লাগল ‘বেঁচে আছে ভূত’। ওদের বোঝাতে চাইলাম, আমি বেঁচে আছি, ভূত নই। কেউ বিশ্বাস করল না। ভূত ভেবে আমাকে একঘরে করে দিল। বউ মেয়ে ছেড়ে চলে গেল। ভেতর থেকে তখন সংস্কৃত শ্লোক বেরচ্ছে। ওরা বুঝতে পারছে না আমার মতো অশিক্ষিত কী করে সংস্কৃত বলে যাচ্ছে? শেষমেশ চাকরিটাও গেল। শুনেছিলাম ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হয়ে গেলে সেই লোককে চাকরিতে রাখা যায় না”

একটু থামল “আমার নাম ত্যাগী মুরমু। চাকরি নেই। সংস্কৃত দিয়ে তো পেট চলে না। শেষমেশ লালুপ্রসাদ যখন ডানকুনি লাইন উদ্বোধনে এলেন, কেঁদে পায়ে পড়লাম। কেন জানি না, লালুজির দয়া হল। ব্যান্ডেলে খালাসির চাকরি দিলেন”

ওর চোখের কোণায় কয়েক বিন্দু চকচক করছে। হয়ত গুল মারছে না। সত্যি কথা বলছে। চোখের জলে ফুটে উঠছে মনের ভাষা।

“আজ আমার কেউ নেই। তাতে কিছু যায় আসে না। আমার ঈশ্বর আছে। বোধ আছে। আর কিছু চাই না”

এমনও কি হয়! শ্রাবস্তি বিশ্বাস করতে পারছে না। মির‍্যাকেলসের কথা গল্পে পড়েছে। বাইবেলেও। সি ক্যুড ন্যারেট এ ফিউ সামস বাই হার্ট। অ্যান্ড হিয়ার ওয়াজ দিস অর্ডিনারি ম্যান টকিং রিলিজিয়ন উইদাউট এনি নলেজ অফ ইট অর বুক টিচিং।

ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া!

খাটে শুয়ে অরিজিতের মনে হল, শ্রাবস্তির দোটানাটা তার মধ্যে রামধনুর রঙের ক্যালিডোস্কোপ। যদি শ্রাবস্তি মেয়ে না হয়ে, ছেলে হত? অরিজিৎ কী তাকে ছেড়ে আসতে পারত? ছেলে বংশের বাহক। তার নাম, পদবি, পরিচয়, লিগ্যাসির ধ্বজা। আর মেয়ে? সে তো, তার নাম নিয়ে বেঁচে থাকবে না। তার লিগ্যাসি বহন করবে না।

আজ এই অর্ধশিক্ষিত লোকটার কথা তাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। হোক না অবিশ্বাস্য ঘটনা। ঘটনা তো। এগুলোই কী স্বর্গ-নরকের মেলবন্ধন? দ্য মিসিং লিঙ্ক! তবে কী শ্রাবস্তিকে ফেলে আসার চিন্তা নরকের ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে? পুত্র-পৌত্র-পুন্নাম। নরক থেকে উদ্ধার।

রাত কত কে জানে? অনুভব করছে, এই নিষ্পেষণ শুধু শ্রাবস্তিকে কুরে কুরে খাচ্ছে না। তাকেও। ত্যাগী মুরমু তাকেও ফেলে আসা অতীতের দোটানায় দাঁড় করিয়েছে।

***

পকোড়া চা শেষ করে গাড়িতে উঠতে যাবে, হঠাৎ সামনে একটি বাচ্চা মেয়ে। বছর ছয় হবে। অন্ধ বাবার হাত ধরে হেঁটে চলেছে।

বাবার গলায় চিরন্তন অন্ধকারের শব্দঃ

আমার দুখে দুখে জনম গেল গো

গুরু সুখ তো আমার সইল না

জনম দুখি কপালপোড়া গুরু

আমি একজনা

মঞ্জরীর বুকটা কেঁপে উঠল। কার গান গাইছে? নিজের, মঞ্জরীর না অরিজিতের? মানবজীবনের প্রায়শ্চিত্তের সুর? ফেলে আসা পুরনো স্মৃতি নাড়া দিচ্ছে। ফুলশয্যার কথা নয়। স্বামী-মেয়ে নিয়ে সুখের দিনের কথাও নয়। সুখটাকে কখনও সোনার খাঁচায় বন্দি করতে চায়নি। তবুও এক অদৃশ্য শক্তি অদেখা সোনার খাঁচাটাকে খুলে দিয়েছে। সাদা পায়রাটা, একদিন ট্রেনের কামরার খাঁচা ছেড়ে, নীল আকাশের অনন্ত নীলিমায় উড়ে গেছে। বোঝার আগেই সব শেষ। ফাগুয়ার আবেশ অনুভব করার আগেই জীবনের রং ধূসর। এখন পড়ে হারানো ব্যথার বেহাগ। রাতারাতি সব উল্টে-পাল্টে গেল। সুখ সইল না।

অরিজিৎ অনুভব করছিল মঞ্জরীকে। বা নিজেকে। সব পেয়েও না-পাওয়ার ঝংকার। জীবনের প্রায়শ্চিত্ত। কেন এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে আঁকড়ে মানুষ বাঁচতে চায়?

ভিক্ষা চায়নি। তবুও মেয়েটির হাতে একশো টাকা গুঁজে দিল। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে "বাবু এত টাকা। লোকে আমাদের চোর বলবে"

মেয়েটার হাতে টাকাটা চেপে বলল "চোর বলবে কেন? আমাদের সবকিছুই তো তাঁর-ই দান। আমরা সবাই ভিখারি। তাঁর ভিক্ষাই নয় ভাগাভাগি করে নিলাম"

গাড়িতে উঠে বসল অরিজিৎ। মঞ্জরী তখনও চেয়ে আছে মেয়েটির দিকে। নিজের মেয়েকে কী খুঁজছে ওর মধ্যে?

স্টিয়ারিংয়ে বসে যতদূর চোখ যায়, অরিজিৎ চেয়ে আছে মোটোরওয়ের শেষ প্রান্তে। আলোয় রাস্তাটা মিলেমিশে একাকার। তারপর আর দেখা যায় না। ভাবা যায় না।

ছোট্ট টুম্পা কী ওই বয়সে ও-রকমই ছিল? মনে পড়তেই চোখ ছলছল। ছবিটা অস্পষ্ট হলেও অনুভূতিটা এখনও সকালের রোদের মতো উজ্জ্বল। নীরব ব্যথার একা পূজা। যে পূজা দিতে সে ক্লান্ত।

কেনই বা বাঁচা?

কেনই বা আশা?

কেনই বা চাওয়া?

পেলেই বা কী হবে?

গাড়ি বাঁক নিল দিল্লি এক্সপ্রেসওয়ের অজানা পথে। মাঝে একটু বিশ্রাম। আনন্দকে কাঁপিয়ে দিয়েছে নিরানন্দ স্বরে। ভাষাহারা ঢেউ আছড়ে পড়ছে নোঙরহীন তীরে। মুক্তি নেই। পরিত্রাণ নেই। তবুও বরণ করে অনির্দিষ্টের পথে এগোনো। দুর্গাপুর পার হয়ে মাইথনের দিকে। হঠাৎ ঝট করে ইউ-টার্ন। অবাক মঞ্জরী বলল "ফিরে যাচ্ছ?"

"না। তোমায় এক জায়গায় নিয়ে যাই" একটু এগিয়ে গাড়িটা বাঁ দিকে ঘোরাল।

এসে দাঁড়াল ছোট্ট মন্দিরের হাটে। ছোট ছোট বাঁশের ওপর তেরপল বাঁধা বিকিকিনির শিবির। সাদা ইটের দেওয়াল ঘর। পান-বিড়ির দোকান। বেশিরভাগ দোকানদারদেরই ভিড়। গুটিকয়েক লোক হেঁটে বেড়াচ্ছে। ডান দিকের ল্যাম্প পোস্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে ইলেকট্রিসিটি কোনও বাড়ির দিকে। শুকনো ঘাসের সরু পথে, দু-পাশের তেরপল আর টিনের চালের ফাঁক দিয়ে মঞ্জরী দেখল, দূরে একটা লাল মন্দির।

অরিজিৎ বলল "এটা ঘাগড়বুড়ির মন্দির। এস"

পকোড়ার টুকরোগুলো ঝেড়ে বলল "খুব জাগ্রত"

মঞ্জরীর মনে হল, এই লোকটা কী বিলেতে টিকতে পারত? কলকাতায় এত বছর। এখানে যে একটা মন্দির আছে, জানত না। এই ইটোনিয়ান অ্যাকসেন্টভাষী সেটাও জানে। ওর চোখ দিয়ে নতুন করে দেখছে তার দেশকে। তার জন্ম-মাতৃভূমিকে। মা হয়ে যে কাজ পারেনি, পুরুষ অরিজিৎ তাকে দেখাচ্ছে আরেক মাকে। জননী জন্মভূমি। কেন যে মানুষ ব্যথার অনন্ত সাগরে আশ্রয় খোঁজে? শান্তি কী ওই পাথরের কতগুলো মূর্তির মধ্যে লুকিয়ে? কেউ জানে না। তবুও ছোটে পাথরের প্রতি। না কি, অনন্ত অজানাকে রূপ দিতে চায় পার্থিব আকারে? মন পার্থিব আশ্রয় চায়। চলার পাথেও। বেঁচে থাকার সহচর। মুহূর্তের নীরবতা। কোনও পীঠস্থানে।

মঞ্জরীর মনে পড়ল মেয়েকে নিয়ে যেদিন বেলুড় মঠে গেছিল। সেদিন গঙ্গার শান্ত নীরবতা পুণ্যের থেকেও বেশি আকৃষ্ট করেছিল। টুম্পা বলেছিল "মা, স্বামীজি কী মানুষ ছিলেন?"

চমকে উঠেছিল! বলে কী। পরমহংসদেব, স্বামীজি এরা দেবতা হতে যাবেন কেন?

"দেবতা হবেন কেন? আমাদের মতোই মানুষ"

"তবে কেন ওদের ছবি ঘরে টাঙিয়ে পুজো করে?"

"ওরা মানুষ হয়ে জন্মালেও, চিন্তায়, বিচার-বুদ্ধিতে ছিলেন অন্য জগতের"

টুম্পা স্টার ওয়ার্স দেখেছে। এক সময় এরিক ফন দ্যানিক্যানের লেখা ‘দেবতারা কী অন্য গ্রহের মানুষ?’ পড়েছে। বোঝেনি। লোকে যাকে পুজো করে, সেই তো দেবতা। এরা কেন? দেবতা আর মানুষের সূক্ষ্ম ভেদরেখাটা অজানা। ওই বয়সে বুঝতে অসুবিধা হয়নি, এক বিশাল শক্তি। যার ভাষা তার অজ্ঞাত।

ভেতরের ঝড়কে প্রকাশ না করে, অরিজিৎ বলল “চল, দর্শন করে আসি”

দু’ধারের তেরপল আর বাঁশের গুড়ির মধ্যে দিয়ে, ঘাস উঠে যাওয়া পায়েচলা পথে দূরের লাল বাড়িটা চোখে পড়ল। বাড়ির ওপরে দশভুজার দু’পাশে দুটো সিংহ। দশভুজাকে প্রহরীর মতো রক্ষা করছে। মাথায় অর্ধ গোলাকৃতি আচ্ছাদনের ওপর ছোট্ট ধ্যানমগ্ন শিবের মূর্তি। শিবকে ঢেকে রেখেছে বিস্তৃত সাপ। বাঁ দিকে ছোট্ট ত্রিভুজাকার লাল পতাকা। ডানদিকে ল্যাম্প, মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের আলো। গেট পেরতেই, বাঁ দিকে সিমেন্টের বাঁধানো ঢিপি। সেখানে গুটিকয়েক ছেলে আড্ডা মারছে। পার হতেই দেখল পেশিওর নীচে কিছু লোক। বুঝতে অসুবিধা হল না এটাই মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বার।

কলকাতার নামী-দামি ব্যারিস্টার এখানে কেন?

মঞ্জরী যেমন শীতে কোকিলের ডাক শুনতে পায়, তেমনি অরিজিতের বুকের তোলপাড়ও অনুভব করে। আবেগে মন যখন কেঁপে ওঠে, সবাই আশ্রয় চায়। ভাবে এক অদৃশ্য শক্তির কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়াতেই শান্তি।

অরিজিৎকে জিজ্ঞেস করল “মূর্তিপুজো মানো?”

যতটুকু দেখেছে, মেলাতে পারছে না, অরিজিতের ঘাগড়বুড়ির মন্দিরে পর্দাপণ। অসহায় অরিজিৎ আশ্রয় খুঁজছে। আত্মবিশ্বাসের পার্থিব রূপ। মন্দির, শ্রাবস্তি, মঞ্জরী, যেই হোক না কেন। দোদুল্যমান মন কিছু আঁকড়াতে চাইছে।

অরিজিতের হাতে চাপ দিল “ভেতরে এস”

***

খোলা আকাশে চোখ মেলল মঞ্জরী। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। বাঁ হাতটা নাড়তে দেখল তার সঙ্গে কোনও কিছু বাঁধা। ঘাসের ওপর, মাটির চাদরে শুয়ে। স্যালাইন চলছে। এখানে কী করে? পাশের মানুষগুলোকে চেনা যাচ্ছে না অন্ধকারে। চারদিকে হই-হট্টগোলের আওয়াজ। কয়েকটা অস্পষ্ট মানুষ এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। কারও হাতে হ্যারিকেন। অস্পষ্ট অবয়ব।

মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। চোখ বুজল। মনে পড়ল টুম্পা অমিতের সঙ্গে রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি যাচ্ছিল। এ তো রাজধানীর টু-টায়ার এসি স্লিপার নয়। খোলা আকাশের নীচে সতরঞ্চি।

অনেকদিন ধরেই টুম্পা বলছিল "চলো কোথাও বেড়িয়ে আসি"

খেয়াল করেনি। অফিস আর অমিতের বাউন্ডুলে কাজের চাপে টুম্পাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়নি। বেচারা মেয়েটা স্কুল, বাড়ি, গান নিয়ে পড়ে। যাদবপুরের লক্ষ্মণরেখায় আবদ্ধ। নেহাৎ মেয়েটা বইয়ের পোকা। আবদার করে না। দিল্লিতে মঞ্জরীর পিসতুতো বোন থাকে। তাই দিল্লিকে কেন্দ্র করে ভেবেছিল দেহরাদুন, নৈনিতাল, আলমোরা, কৌশানি ঘুরে আসবে। কিংবা ওপাশে চণ্ডীগড় হয়ে সিমলা, কুফরি, চেল। পরে ভাবা যাবে। আগে বেরিয়ে পড়া যাক।

বাঙ্কে মঞ্জরী আর টুম্পা। অমিত নীচে। অন্ধকারে চেয়ে। একটা বিরাট শব্দ। তারপর... আর মনে নেই।

অমিত টুম্পা কোথায়? পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করল "কী হয়েছে?"

"আপনাদের রাজধানীর বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। শুয়ে থাকুন। উঠবেন না। দেখি আর কে বেঁচে" প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কালস্রোতের প্রবাহে, সব স্মৃতিই একদিন ধূসর। সেই ভয়ানক অ্যাক্সিডেন্টের স্মৃতিও সময়ের চাপে মলিন। সঙ্গে হারানোর যন্ত্রণা। অমিতের ডেডবডিটা ভালো করে চিনতেও পারেনি। মুখ থেঁতলে রক্তে মাখামাখি। বেশভূষা কার্ডগুলো দেখে, শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিল। মুহূর্তের মধ্যে একটা সাজানো সংসার নিশ্চিহ্ন। দিল্লি, দেহরাদুন হরিদ্বার সিমলা মিলেমিশে শূন্যতায় একাকার। টুম্পার দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধানে অপারগ সরকারি সংস্থা শেষমেশ মৃত বলে ঘোষণা করেছিল। মন মানেনি। আজও মানে না। তবু মেনে নিতে হয়েছে। উদাস মাতৃত্ব আজও খুঁজে বেড়ায় টুম্পাকে। রাস্তাঘাটে, সরকারি অফিস থেকে রেলকর্তাদের দরজায়। বৃথাই। যে গ্রহেই থাকুক না কেন, ছোট্ট টুম্পা ফিরে আসবে উষ্ণ বুকে। ঠিক আগের মতো দুহাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নেবে। টুম্পা আজও ফেরেনি। হয়ত আসবেও না। তার বদলে শ্রাবস্তি আসছে অরিজিতের কোল ভরতে। ওই জনমদুখি গান গাওয়া মেয়েটার মতো। অনেকদিনের জমা দুঃখের হিসেব মেলাতে।

শীতে কোকিল ডাকবে কি না কে জানে। যখন একবার শুনতে পেয়েছে, নিশ্চয়ই আবার ডাকবে। ব্যথার আঙিনায় আবার নতুনের সন্মুখীন হওয়া।

রেগুলার ক্লাসে মঞ্জরী একদিন বই আনতে ভুলে গেছিল। ছোটবেলায় পাশাপাশি স্কুলে।

"তোর বইটা দেখতে দিবি?" নীল স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ পরা মঞ্জরী, রঞ্জিতাকে প্রশ্ন।

"নাঃ"

“কেন?”

“বললাম তো না” মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল রঞ্জিতা।

মুখচোরা মঞ্জরীর সাহস হয়নি রঞ্জিতাকে আরেকবার প্রশ্ন করার। তারপর কত বছর। যে যার নিজের পৃথিবীতে। ছোটবেলার স্মৃতিগুলো টুকরো হয়ে ভেসে বেড়ালেও রঞ্জিতার স্মৃতি ম্লান। আজ সেই ম্লান স্মৃতির আত্মজ আসছে স্বপ্ন নিয়ে। টুম্পাকে নতুন করে দেখার প্রত্যাশায়। ছোটবেলার দুঃস্বপ্নের দিনগুলো মিলেমিশে একাকার। টুম্পা-শ্রাবস্তির যুগলবন্দিতে। জীবন আবার নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে, দুই মাতৃত্বের দোলায়।

জানত না মঞ্জরী। অরিজিৎই একদিন কথাচ্ছলে বলেছিল “রঞ্জিতা কারমেল কনভেন্টে পড়ত”

“আমিও তো কারমেল কনভেন্টের। রঞ্জিতা কী নাচত?”

“হ্যাঁ। গীতাদির কাছে শিখেছিল”

“আমার ক্লাসমেট। চিনতাম। জানতাম না, তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে”

চমকে উঠেছিল অরিজিৎ। বুঝতে পারেনি, বিভিন্ন রূপে কারমেল কনভেন্ট কেন বারবার তার জীবনে। স্বাভাবিক স্বরে বলেছিল “পৃথিবীটা কত ছোট। তাই না?”

মুখে স্বাভাবিকতা থাকলেও, মনে আশঙ্কা। সেই কারমেল। রঞ্জিতা, মঞ্জরী। বারবার একই গোলকধাঁধায় কেন? পৃথিবীটা গোল বলে? নাকি প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্বর সঙ্গে মিশে থাকে কতগুলো অলিখিত সত্য। ভালোবাসা, ঘর, সংসার। চাওয়া, পাওয়া, বিরহ, মিলন সব কিছু একই তারে বাঁধা। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনই স্বরলিপিতে সীমিত। বিভিন্ন সুরে, রূপে, রঙে, আবেগে আত্মপ্রকাশ করে। তবুও সূত্রটা অলিখিত ছন্দে বাঁধা।

অরিজিতের একবার মনে হয়েছিল, কারমেল তার জীবনে কী, ভালো না মন্দ? সময় উত্তর দেবে। অস্বীকার করতে পারেনি সূত্রধারকে। প্রবহমান সময়ে অনেক কিছুই পাল্টায়। পাল্টায় না সূত্রের রেশ। বোকা মানুষ সেই সূত্রের ঠিকানাই জানে না। জানবে কী করে কোন সুতোয় বাঁধা রয়েছে জীবন?

মঞ্জরী বলল “কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বল-তো?”

অরিজিৎ মোটরওয়েতে তাকিয়ে বলল “জানি না। বোধহয় জাহান্নামে”

মঞ্জরী বুঝতে পারল না জাহান্নামটা কদ্দুর।

***

জাহান্নামটা যে এত সুন্দর মঞ্জরীর জানা ছিল না। ডানদিকের লরিগুলোর ফাঁক দিয়ে অরিজিতের গাড়ি বাঁক নিল মাইথনের দিকে। কিছু দূর যেতে টি-জাংশনের বাঁ দিকে ঘুরে অরিজিৎ ডাইনে দেখাল "এটা কল্যাণেশ্বরীর মন্দির"

দেব-দেবি থেকে দূরের লোকটা, কী করে এত মন্দিরের নাম-ঠিকানা জানল বুঝে উঠতে পারল না। সাহেবিয়ানার বাইরে যে বাঙালিত্ব লুকিয়ে, আঁচ করেছিল। কিন্তু পশ্চিমবাংলার গলি-ঘুপচি মন্দিরের হদিস গুলে খেয়েছে, বুঝতে পারেনি।

পাহাড়ের গা বেয়ে কাঁচা রাস্তায় সেকেন্ড গিয়ারে গাড়িটা নিয়ে বলল "সোজা রাস্তাটা মাইথন ড্যামের দিকে চলে গেছে। ড্যাম পার হলেই পঞ্চকোট পাহাড়। গড়-পঞ্চকোটেও থাকা যেত। বড্ড কমার্সিয়াল। আমার ভালো লাগে না"

পাহাড়ের ওপর ডাক-বাংলোর পাশে, নদীর দিকে চোখ পড়ল। অরিজিৎ গাড়ি থেকে নেমে বলল "ভেতরে এস"

বারান্দায় হাঁটতে স্বর্গ যেন তার দুয়ার খুলে দিল। সামনে নিরুত্তাপ বরাকর নদী। নদীর ওপর মাইথন ড্যাম। গ্রিল গেট ধরে দাঁড়িয়ে, সামনের বাগানে নাম না-জানা ফুলের দিকে চেয়ে মঞ্জরী হারিয়ে গেছিল। নিজের ঝরা ফুলকে খুঁজছে ওদের মধ্যে। টুম্পা থাকলে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াত এই বাগানে। কোথায় আছে? যদি বেঁচে থাকে, ঠিক আছে তো? আর না থাকলে? ভাবতেই শিউরে উঠল। মায়ের মন কিছুতেই মানতে চায় না।

টুম্পার তখন কতই বা বয়েস। তিন-চার হবে। বায়না ধরেছিল, ভাইজ্যাগ যাবে। অমিত এমনিতেই ঘরকুনো। বেরতে চাইত না। মেয়ের বায়না, বউয়ের আবদার। বিয়ের পাঁচ বছর হল। হনিমুনও করে উঠতে পারেনি। যাদবপুরের একতলা ঘরেই হনিমুনের মধ্যে টুম্পার জন্ম।

টুম্পা যখন বায়না ধরল "মা, বাপিকে বল না, বেড়িয়ে আসি" মঞ্জরীর মনে হয়েছিল, নিজের জন্য না হোক, মেয়ের জন্য একবার বেরনো দরকার। অমিত নন-অ্যাডভেঞ্চারাস। অচেনা জায়গায় যাওয়ার থেকে চেনা জায়গাই বেশি পছন্দ করে। কর্মসূত্রে ভাইজ্যাগ ঘোরা। প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম। যাওয়া যেতেই পারে। পাহাড়ের ওপর ফরেস্ট বাংলোয় বরাকরের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ল, টুম্পাকে নিয়ে ভাইজ্যাগ যাওয়ার কথা। কালো বোল্ডারের স্তূপ। এখানে ওখানে মাথা উঁচু করে ঢেউয়ের সঙ্গে এক অন্তহীন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের জলের রং নীলচে, ঘোলাটে। প্রবল বিক্রমে সমুদ্র আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ডাঙা কিন্তু দখল ছাড়েনি। নিহত সৈনিকের মতো বোল্ডারগুলো পড়ে সমুদ্র আর ডাঙার নোম্যানস ল্যান্ডে।

রামকৃষ্ণ বিচ।

বাঙালি সারা ভারতে বা একটু বাড়িয়ে বললে, সারা পৃথিবীতে যেটুকু সম্মান পায়, তার পিছনে এই মহাপুরুষের অবদান আঠারো আনা। বাংলার বাইরে রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দের নাম দেখলে সব বাঙালিরই বুক ভরে ওঠে।

টুম্পা বেলুড় মঠে প্রশ্ন করেছিল "রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ কী ভগবান? তবে লোকে ওদের পুজো করে কেন?"

সেকথা মনে হতেই কেমন কেঁপে উঠল। অস্পষ্ট ভগবানের অবয়বে তার বিপুল শক্তিকে মানুষের অন্তর বারবার খোঁজে চেনা-জানা চৌহদ্দির মধ্যে। মঞ্জরীর আত্মাও নিরাকারকে আকারে বন্দি করতে চাইছে।

বাংলাদেশের বাইরে, বিশাখাপত্তম বা ভাইজ্যাগে রামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত সমুদ্রসৈকত অমিতেরও ভালো লাগে। নানা কাজে, অনেকবার এসেছে। স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে আসাই অন্যরকম।

লম্বা বিচ।

জলের মাঝে অসংখ্য কালো পাথরের চাঁই এখানে ওখানে মাথা উঁচু করে। স্নান করা খুব সহজ নয়। তবুও অনেকেই জলে নেমে পড়েছে। সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে অনেক দূরে বাঁদিকে সাবমেরিন মিউজিয়াম চোখে পড়ে। আইএনএস কারসুরা। বিগতযৌবন সাবমেরিনটি ভারতীয় নৌবাহিনী থেকে রিটায়ার করে আজ সাগরতটে যাদুঘরে পরিণত। আদর করে তার নাম দেওয়া হয়েছ 'স্মৃতিকা'। অতল সমুদ্রের আহ্বান ছেড়ে এখন সে অগুনতি দর্শকের অবাক হওয়া চোখ, মনের কৌতূহল মেটায়। যখনই এই সাবমেরিনটাকে এ রকম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখে, অমিতের খুব কষ্ট লাগে। গুনগুনিয়ে ওঠেঃ

বদ্ধ পৃথ্বীর মুখর সুর গায় অজানার গান।

ভাঙতে চায় মনের দুয়ার ছুটে অবিরাম।।

মঞ্জরীর মনে হল, আমরাও ঠিক এরকম না? ইচ্ছের হাত-পা বেঁধে, মনের আহ্বানকে জোর করে বন্ধ করে, না শোনার ভান করে জাদুঘর হয়ে পড়ে আছি।

হারিয়ে গেছিল। পেছন ফিরে দেখল অরিজিৎ নেই। ঘরটায় উঁকি মারল। খালি গায়ে পাঞ্জাবি পরছে। মঞ্জরীকে উঁকি মারতে দেখে বলল "পাশের ঘরটা তোমার"

অরিজিতের বলিষ্ঠ দেহ আগে কখনও দেখেনি। ফুলশয্যার স্মৃতি আজ ঝরা পাপড়ি। সেই প্রথম। সেই শেষ। অনুভূতির অবাঞ্ছিত অবশেষ।

ঘরে ঢুকে কাফতানটা বার করে, মঞ্জরীর মনে হল, সত্যি কী যৌবন শেষ? আর কী পুরুষের চাহিদা নেই? না পুরুষ-মহিলা নির্বিচারে পার্থিব অবয়ব খুঁজছে?

টুম্পা প্রশ্ন করেছিল "তোমরা রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীকে পুজো কর কেন?"

সহজ-সরল বাচ্চা মনের প্রশ্ন। অথচ উত্তরটা জটিল। না-জানা ঈশ্বররূপী বিগ্রহ পুজোর চেয়ে জানা ইতিহাস আঁকড়ালে, কাছের মনে হয়। সেটা যেই হোক না কেন। রামকৃষ্ণ-সারদা মা বা বিবেকানন্দ। পাথরের মূর্তির থেকে জলজ্যান্ত মানুষের অবয়ব অনেক বেশি আকর্ষণীয়। পাথরের শিবকে কল্পনায় ভাসানোর থেকে, সশরীর অবয়ব শিবমূর্তি, শূন্যতার মধ্যে বেশি পূর্ণতার ছোঁয়া দেয়।

সে ভাবেই কী অরিজিতের অবয়ব নারীত্বের সুপ্ত অনুভূতিতে আলোড়ন তুলছে? নাকি, হৃদয়ের নিঃশব্দ আঙিনায় আবার ফুল ফোটাতে চাইছে বিচিত্র আভরণে। না-চেনা অনুভূতির নতুন জাগরণে। মানুষ-ঈশ্বরের যুগলবন্দির সুরে।

ফিকে আলোয় মনে হল শীতের ছোট দিন ক্রমে গোধূলিতে মিশছে। বাইরে বেরিয়ে দেখল, পড়ন্ত দিনের ধূসরে অরিজিৎ একদৃষ্টে চেয়ে আছে রক্তিম আভায় স্নাত বরাকরের শেষ সূর্যর দিকে। রক্তিম আভা জানান দিচ্ছে, দিন এখনও শেষ হয়নি।

কাফতান পরা মঞ্জরীকে পাশে দাঁড়াতে দেখে চশমাটা রুমাল দিয়ে মুছল "ঘুম হল?"

মিঠে আলোয়-স্নাত স্বগতোক্তি "চা দেবে না?"

"বলেছি। আনছে। অপেক্ষা করছিলাম। ঠান্ডা না হয়ে যায়"

ক্যানন ইক্সাস ক্যামেরায় শেষ আভাকে ফ্রেমে বন্দি করছে। মুহূর্তটাকে। শুধু নদী নয়, ব্যথার নৈবেদ্যকেও সাজাতে চাইছে মনের ছন্দে। নতুন অনুভূতির আনন্দে। শ্রাবস্তি আসছে। ছোট্ট দুটো হাত বাড়িয়ে তার দিকে "হোয়াই ডিড ইউ ডেসার্ট মি ড্যাড?"

আবারও মনে হল, মেয়ের বদলে ছেলে হলে কী পারত? ছেলে বংশের ধ্বজা। পদবির সাক্ষী। ভয়, ব্যথায় বুকটা কেঁপে উঠল। নরকের ভয়? পুত্র-পৌত্র-পুন্নাম। নরক থেকে উদ্ধার। মেয়ে আসার খবরে ভালো লাগছে কেন? মেয়েকে এত বছর পরে দেখতে পাবে? না কি, সমাজের কাছে ভাবমূর্তি সবল হবে? না কি, অবচেতনে জিনের প্রপাগেশনে ভরসা? শূন্য জীবনের পূর্ণতা। তা ঘাগরবুড়ি বা কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরে নেই। আছে উত্তরসূরির রক্ত-মাংসের শরীরে। অতৃপ্ত মন সান্ত্বনা খুঁজছে পার্থিব অবয়বে।

সান্ধ্য প্রসাধনে মঞ্জরী। আকাশি নীল শাড়ি। সাদা হাফ-হাতা ব্লাউজের ওপর কাশ্মীরি কালো শাল ফেলে বারান্দার প্লাস্টিকের চেয়ারে বসল। হাল্কা হলেও ঠোঁটে লিপস্টিক। মিস্তি দ্য রোশাসের মিষ্টি সুবাস। নতুন রূপে সাজার ইচ্ছা? কী সে রূপ?

"মেয়ের কথা খুব মনে হচ্ছে, তাই না?"

বুঝতে পেরেও এড়িয়ে গেল অরিজিৎ “তোমারও তো”

“কী করে বুঝলে?”

“তোমাকে সূর্যাস্তের দিকে তাকাতে দেখে মনে হল, হারিয়ে গেছ অন্য এক জগতে”

অরিজিৎ কী করে যে মনের কথা ধরে ফেলে। মঞ্জরীর মনে হল, নৈঃশব্দ্য কথা বলে। সুর, তান, লয়। ভাষাহীন স্তব্ধতা নিঃশব্দে খুঁজে নেয় স্বপ্নের বনলতাকে।

“সতেরো বছর পরেও দুঃখটাকে হজম করতে পারনি”

“তুমিও তো পারনি সাত বছর পর”

“এই দুঃখ নিয়েই বাঁচাতে হবে। বাকি জীবনের শান্তি খুঁজে নিতে হবে। তোমার তো শ্রাবস্তি আসছে। আমার টুম্পা কোনওদিনও ফিরে আসবে না” দীর্ঘশ্বাসে মিলিয়ে গেল স্বর।

ঝিঁঝি পোকার কলরব অজানা রাগিনী বাজাচ্ছে। ছন্দহীন ছন্দ। পাওয়ার আনন্দ। চমকে উঠল অরিজিৎ। কী পাবে? পেলেই বা কী হবে? কেনই বা এ চাওয়া? আর না পেলেই বা কী যায় আসে? একি অবচেতনে নিজেকে অমর রাখার প্রয়াস? অ্যান্টিকুইটিতে চুমুক দিল “কী বেশে কে আসে কে জানে? যে বেশে, যে পরিবেশে আসে, সে কি আমার? কে জানে?”

“তোমার মধ্যে এত দোটানা কেন?” কাশ্মীরি শালটা জড়িয়ে ভডকায় চুমুক “আমার কোনও চাওয়া নেই। ফুরিয়ে গেছে! তোমার এখনও পড়ে। কেন? কী পাবে শ্রাবস্তি এলে?”

চুমুক দিয়ে বলল “এই বয়সে, পাওয়া হারানো অবান্তর”

“তোমার কাছে অবান্তর। আমার নয়। জীবন ফুরিয়ে যায়নি” মঞ্জরীর কটাক্ষ।

সত্যি তো। কারও জীবন ফুরায়নি। তবুও প্রত্যেকে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছে। ঘাগরবুড়ির ঈশ্বর? শ্রাবস্তি? না অন্য কিছু? টুম্পাকে মনের গভীরে ঢেকে রাখতে পারে, অরজিৎও শ্রাবস্তিকে। পাওয়া না-পাওয়ার ধোঁয়াশায়। সবের পেছনে একটাই সত্যি।বিভিন্ন আকারে আত্মপ্রকাশ করলেও, মর্ম একটাই। মন খোঁজে মন। সারাক্ষণ।

চাওয়া না-পাওয়ার দোলায় কেঁপে ওঠা মঞ্জরী বলল “শ্রাবস্তির ছবিটা দেখাবে? ই-মেলে পাঠিয়েছিল না?”

মোবাইল ফটোস ঘেঁটে এগিয়ে দিল।

“ঠিক তোমার মতো। ঠোঁট। হাসি”

“রঞ্জিতার ছাপও আছে। তুমি তো ওকে চিনতে?”

“সেই ছোটবেলায়। এখন নিশ্চয়ই অনেক পাল্টে গেছে”

“হবে হয়ত” আকাশে তাকিয়ে ঝিঁঝি পোকার কলতানের মধ্যে কথা ছুড়ে দিল। ওই কলতানে নতুন সুর খুঁজছে। ব্যথার সুর। মনের সুর। হয়ত বা পূর্ণতার সুর। চেয়ার ছেড়ে ঘরে ঢুকে গেল অরিজিৎ।

কলতানে, মোচড়ানো শূন্যতাকে, শান্ত করতে চাইছিল মঞ্জরী। শ্রাবস্তির ছবি। ঝাপসা হওয়া টুম্পার ছবি। অদৃশ্য সূত্রে, ছন্দ খুঁজছে। চিরন্তন নারী হৃদয়ের ডাক। নারীর পূর্ণতা। ব্যথায় বুকটা মুচড়ে উঠছে। চোখ ছলছল। হারিয়ে যাচ্ছে সুদূর অন্ধকারে। মাইথন ড্যামের ঝলমলে আলোগুলো জানান দিচ্ছে, অন্ধকারের মধ্যেই দিয়া জ্বলে। এখনও শেষ প্রান্তে ঠেকেনি। অরিজিৎ অনেকক্ষণ ঘরে। কী করছে? ভেসে এল, ভেতর থেকে গোঙানির শব্দ। ভয়ে উঠে পড়ল মঞ্জরী। দরজায় কান পাতল অজানা আশঙ্কায়। আস্তে ডাকল “অরিজিৎ”

সাড়া না পেয়ে ঘাবড়ে গেল। সাহস করে, আধা ভেজানো দরজা ঠেলে, অন্ধকার ঘরে ঢুকে দেখল খাটে শুয়ে অরিজিৎ। অস্ফুট কান্নার আওয়াজ। অরিজিৎ কাঁদছে?! পাশে বসল। আলতো করে হাত রাখল ওর গালে। জলে ভিজে গেছে। মুছে দিল।

কয়েক মুহূর্ত।

নিজের দুচোখ বেয়েও নেমে এল অসময়ের শ্রাবণধারা। এক অসহ্য দুঃখ দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙেচুরে তোলপাড় করে দিচ্ছে। যা আসেনি, যা পায়নি, যা হবে না, যা বলেনি, সব কিছু দলে-পিষে অচেনা অজানা বিস্ময় হয়ে বিশাল জটায়ুর মতো আগলে ধরল।

অরিজিতের দ্রুত শ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। শোয়া অরিজিৎ অন্ধ আবেগে বুকে টেনে নিল মঞ্জরীকে। কিছু বোঝবার আগেই, ঠোঁট দুটো ওর মধ্যে ডুবিয়ে দিল, পূর্ণতার খোঁজে। পুরো শক্তি দিয়ে আকড়ে। একটা আশ্রয়। সম্পূর্ণতা। ঘাগরবুড়ির মন্দিরে নেই। শুধুই মানুষের উষ্ণতার বাহুবন্ধনে।

বিছানায় শুয়ে দুটি মানুষ কাঁদছে। একটা অনুরণন। চাওয়া-পাওয়ার সাগর পেরিয়ে দুঃখের দ্বীপে পৌঁছে গেল ওরা দু’জন। দুঃখের ধারায় ভিজে অসহায় ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে, অলৌকিক নীড়ে।

না বা হ্যাঁ, কিছু বলার অবকাশই নেই মঞ্জরীর। ব্যথায় কাঁপা-কাঁপা শরীর অরিজিৎকে সঁপে, ওর মধ্যে, সম্পূর্ণ উজাড় নিঃশেষ করে দিতে চাইল নিজেকে। টুম্পা কোনওদিন ফিরবে না। শ্রাবস্তির উপস্থিতিটাও ধোঁয়াশা। তার জীবনে এখন একটাই সত্য। তার গায়ে লেপটে থাকা উষ্ণ রক্ত-মাংসের উত্তাপ। তার অর্ধ-সমাপ্ত নারী-জীবনের পূর্ণতার বিকাশ। যাকে সঁপে আবার খুঁজে পাবে হারিয়ে যাওয়া নারীত্বকে।

মাইথন ড্যামের ঝলমলে আলোটাও হারিয়ে গেল অন্ধকারে, দুই হৃৎপিণ্ডের ঘনঘন স্পন্দনে, দুই আত্মার দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসে। অরিজিৎ এই মুহূর্তে হারিয়ে যেতে চাইছে মঞ্জরীর মধ্যে। মঞ্জরীও নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে, একমাত্র পার্থিব আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে, মিলনের স্বর্গে। দুঃখের দুই নৌকো, দামাল ঝড়ের

দাপটে, অন্তহীন সময়ের সাগরে, অসহায়তার পাল তুলে বাঁচতে চাইল, না পাওয়া শ্রাবণধারায় ভিজতে ভিজতে।

***

অখণ্ড নীরবতায় তিন সাগরের প্রয়াগে পলকহীন চেয়ে শ্রাবস্তি। ভারতবর্ষের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের ওপর স্মৃতিসৌধে দাঁড়িয়ে, মনে পড়ল ল্যান্ডস এন্ডের কথা। প্লিমাউথ থেকে ডার্টমুরের ওপর ড্রাইভ করছিল ল্যান্ডস এন্ডের দিকে। ডার্টমুরটা কোথায় বুঝতে পারেনি।

সাইকেলে এক ব্রিটিশ সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিল "হোয়ার ইজ ডার্টমুর?"

সাইকেল থামিয়ে সাহেব বলেছিল "দিস ইজ ডার্টমুর। অ্যাট দ্য মিডল অফ এভরিওয়ার অ্যান্ড নোহোয়ার" বলেই হেসে পেডল চেপে এগিয়ে গেছিল।

বে অফ বেঙ্গল, ইন্ডিয়ান ওসন, অ্যারাবিয়ান সির মহাপ্রয়াগে দাঁড়িয়ে সে কথাই মনে পড়ল। একদিকে অস্তগামী সূর্য শেষ রশ্মির আভা ছাড়াচ্ছে আরব সাগরে। লালচে জল আরো লাল। সেই জলে রহস্যময়তা। অন্যদিকে পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি মারছে বঙ্গোপসাগরে। নীল জলরাশি সন্ধের আধো অন্ধকারে চাঁদের আলোর রিফ্লেকশনে আশ্চর্য মোহময়। দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের অনন্যতা বিস্তার করে নীলচে-কালোর গভীরে।

অনুভূতির মহাসঙ্গম। সব পাওয়া না-পাওয়া, দেখা না-দেখা, চেনা না-চেনা, বিশাল প্লাবনে একাকার। সেই দৃশ্যের মাঝে উঁকি মারছে গোধূলিতে সিলুয়েট হওয়া বিবেকানন্দ রক। চূড়ায় বিবেকানন্দ টেম্পল ।

আজ খ্রিস্টমাস। লন্ডনে স্যান্টা 'জিংগল বেলস' গাইছে।

অরিজিৎ বলল "১৮৯২ সালে এমন খ্রিস্টমাসের দিনে স্বামী বিবেকানন্দ সমুদ্রে সাঁতার কেটে এই রকসে এসেছিলেন"

"হোয়াই ডিড হি সুইম? ওয়াজ দেয়ার নো বোট অ্যাট দ্যাট টাইম?" শ্রাবস্তি ভাবতে পারে না, কেউ সাঁতার কেটে ৫০০ মিটার পাড়ি দেবে। সে তো নৌকায় এসেছে।

"দেয়ার ওয়াজ এ বোট অ্যাট দ্যাট টাইম। বাট হি হ্যাড নো মানি। আসার আগে স্বামীজি সারা ভারত ঘুরেছিলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২ কন্যাকুমারীতে পৌঁছন। এক্সহস্টেড অ্যান্ড পেনিলেস স্টেয়িং অ্যাট কনিয়াকুমারি হি নিডেড টু কাম টু দিস আইল্যান্ড, নট ওনলি টু মেডিটেট, বাট অলসো, টু সি দ্য ফেস অফ মাদার ইন্ডিয়া ইন ইটস এন্টায়রিটি"

শ্রাবস্তির চোখে বিস্ময় "ওয়াস দেয়ার নো সার্কস ইন দ্য সি?"

“ছিল। হি কুডন্ট কেয়ার লেস। হি নিডেড দ্যাট সলিচুড। মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন টু অ্যাড্রেস দ্য ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়াস কংগ্রেস ইন শিকাগো ইন ১৮৯৩”

গতকাল কলকাতা থেকে থিরুবন্তপুরমে ফ্লাইটের পর, গাড়ি করে ড্যাড দেখিয়েছে কোভালাম, নাগরকয়েল, সুচিন্দ্রাম। দীর্ঘ ৮৭ কিমি ঘুরে রাতে কন্যাকুমারীতে যখন পৌঁছয়, দেহে কিছু নেই। সমুদ্রতীরে বিবেকানন্দপুরমের কটেজে গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কতক্ষণ খেয়াল নেই। উত্তাল সমুদ্রের কলরবে, খিদেয় ঘুম ভেঙেছিল। বাইরে বেরিয়ে দেখল, বাবা ইজিচেয়ারে সমুদ্রে তাকিয়ে।

“ইউ মাস্ট বি হাঙ্গরি?” অরিজিৎ বলল।

“ইয়স ড্যাড”

শ্রাবস্তি চেয়ার টেনে অরিজিতের পাশে বসল। চেয়ে আছে অনন্তবিস্তৃত জলরাশির দিকে। মাতাল ঢেউগুলো পাড়ে আছড়ে পড়ছে। অনেক পথ চলার পর তীরে আশ্রয় খুঁজছে। তীর তাকে শান্ত করে ফিরিয়ে দিচ্ছে। সেখানে ক্ষণিক বিশ্রাম নতুন উদ্দামে ফিরে যাওয়ার আগে।

খাবার অর্ডার দিয়ে, অরিজিৎ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল “ড্যু ইউ নো হাউ দিস নেম কেম?”

“নো”

“পুরাণে বলে দ্য স্যাক্রেড ওয়াটারস অফ দিস হোলি প্লেস অ্যাবসল্ভস ওয়ান, অফ অল সিনস”

“ইজ দ্যাট সো? রিমেম্বার দে সেইড দ্য সেম হোয়েন মেকিং এ উইশ থ্রোয়িং পেনিস অ্যাট দ্য ট্রেভি ফাউনটেনস ইন রোম” চেনা ইউরোপকে মেলাতে চাইছে, এই বিশাল উপ-মহাদেশের সঙ্গে।

“অ্যাকর্ডিং টু দ্য লিজেন্ড অসুররা ঈশ্বরদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। তার ফলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে অরাজকতা। এদের মধ্যে বানাসুর নামে এক দানব, পৃথিবীতে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছিল। সন্তানদের এই কষ্ট সহ্য করতে পারছিলেন না মাদার আর্থ। তিনি ভগবান বিষ্ণুর সাহায্য নেন। উনি বলেন, ঈশ্বরেরা যদি ডিভাইন মাদার পরাশক্তির সাহায্য নেয়, তবেই একমাত্র বানাসুরাকে থামাতে পারবে”

বাবা তাকে ভিন্ন রাজ্যের ফেয়ারি টেল শোনাচ্ছে। যেমন ছোটবেলায় অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যান্ড শোনাত। কিংবা এসপস ফেবলস। মনগড়া রাজকুমারীর গল্পও। বাবার ছবি অস্পষ্ট হলেও, গল্পগুলোর স্মৃতি ফিরে আসছে। সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া অনুভূতিও। অবাক, খেতে খেতে শুনছে।

“পরাশক্তি আগুন থেকে টিন-এজেড ভার্জিন রূপে আবির্ভূত হয়। ভারতের সব থেকে দক্ষিণ প্রান্তে যায়। এভাবেই কন্যা (মেয়ে) আর কুমারী (ভার্জিন) শব্দটা আসে। এই মেয়েটি শিবের আশীর্বাদ নিয়ে বানাসুরকে ধ্বংস করে। কন্যাকুমারী টু দ্য লোকাল পপুলেস সিগনিফাইস ভার্জিনিটি অফ মাইন্ড, বডি অ্যান্ড সোল”

শ্রাবস্তি মনে করতে পারল না, ল্যান্ডস এন্ডের সঙ্গে, এরকম কোনও লিজেন্ড জড়িয়ে কি না। নো ওয়ান্ডার দিস কনট্রি হ্যাজ এ রিচ হেরিটেজ। মিথ হলেও, মিথ তৈরির সৃজনশীলতাকে অস্বীকার করা যায় না।

ছোটবেলায় স্কুল ফেরত, কেঁদে মাকে বলেছিল "ক্যান ইউ মেক দ্য কালার অফ মাই স্কিন হোয়াইট?"

রঞ্জিতা কথার পৃষ্ঠে অরিজিৎকে বললেও, ওর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। যে সভ্যতা একটা বাচ্চার মনে ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে পারে, সে কোন সভ্যতা? দুনিয়ার শক্তিশালী সভ্যতা হলেও, সব থেকে প্রাচীন নয়। আমারা সবাই যদি অমৃতস্য পুত্র, তবে কেন এই ভেদ?

তখন ভালো করে বোঝেনি। এখন বুঝছে। কালো চামড়া নিয়ে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। স্টিভ শুধু কালো চামড়াকেই গ্রহণ করতে চায়নি। চেয়েছিল বর্ণে, ছন্দে, রূপে, গন্ধে সম্পূর্ণতায় তার ইন্ডিয়ান। সে পারেনি স্টিভকে ইন্ডিয়ান রূপ দেখাতে। রাগ হল মায়ের ওপর। মায়ের জন্যই তো।

ফিরে তাকাল তিন সমুদ্রের তরঙ্গিত প্রবাহে। কিছুক্ষণ আগে দেখা বিবেকানন্দ মণ্ডপে বিবেকানন্দর আট ফুট ব্রোঞ্জ স্ট্যাচু। সেই মহান পুরুষ, যাকে চেনাতে সুদূর কলকাতা থেকে বাবা তাকে এতদূর নিয়ে এসেছে। কী দেখাতে? সূর্যাস্ত আর পূর্ণিমার যুগলবন্দির মধ্যে বহুদিনের হারানো মেয়েকে শোনাতে চাইছে, জাগরণের গান।

অরিজিৎ বলে চলেছে "বলছিলাম না, বিবেকানন্দ দু-বছর ধরে সারা ইন্ডিয়া ঘোরেন। হি হ্যাড লিভড ইন সিথিং কলড্রন, ওয়াজ অ্যাফেক্টেড উইথ ফিভার, বাট হ্যাড ক্যারিড এ বার্নিং সোল অ্যামিডস্ট দ্য বান্ডেল অফ স্টর্ম। অল টু গিভ হিম এ রিয়েলাইজেশন"

"হোয়াট রিয়েলাইজেশন?" প্রাচুর্যে বড় হওয়ায় রিয়েলাইজেশনের মানে বোঝেনি। আজ মন এই মেটিরিয়ালিস্টিক সভ্যতার বাইরে সেই দর্শন খুঁজছে। দর্শনই বেঁচে থাকার একমাত্র সোপান। শ্রাবস্তি বাঁচতে এসেছে। কেউ বলেনি। অরিজিৎ আন্দাজ করেছিল।

"রিয়েলাইজেশন অফ ইন্ডিয়া হুইচ ওয়াজ লাইক গডেস দুর্গা। দ্য ডাউনফল অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইটস রেজারেকশন। অন দ্য পাস্ট, প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার অফ ইন্ডিয়া। সে অনুভব করেছিল, ইন্ডিয়ার সব থেকে বড় অ্যাসেট তার স্পিরিচুয়াল কনশাসনেস। এই স্পিরিচুয়ালিজম শুয়ে আছে তার অতিপ্রাচীন ধর্ম, সভ্যতার মধ্যে। সিটিং হিয়ার হি ক্যুড সি মাদার ইন্ডিয়া। এই রকে বসে দেখেছিল ভারতের মহান ইতিহাস। এত বছর সারা ভারত ঘোরা মনের চোখ খুলে দেয়। হি অলসো রিয়েলাইজড দ্যাট ওয়েস্ট ওয়াজ ল্যাকিং ইন স্পিরিচুয়ালিজম। যেটা ইন্ডিয়া দিতে পারে"

শ্রাবস্তি ইতিহাসের পাতা ছেড়ে হারিয়ে গেছে অনুভূতির আকাশে। এক না-দেখা সভ্যতাকে নতুন করে দেখা। এক না-চেনা পৃথিবীকে নতুন আঙ্গিকে চেনা। এক না-পাওয়া ঐতিহ্যের স্বাদ নতুন করে পাওয়া।

ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া!

বাবা কাঁধে আলতো করে হাত রেখে ওকে ঘুরিয়ে দিল। পেছনে সমুদ্র। চেয়ে আছে বিরাট ভূ-খণ্ডে। স্বামীজির ভারতকে লন্ডনের বঙ্গ-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে, বিবেকানন্দ রকস থেকে দেখছে, এক নতুন রূপে। তার পিতৃ-মাতৃভূমিকে।

অরিজিৎ মেয়ের মাথায় হাত রেখে চোখ বুজে বলল "তৎত্বম অসি"

আবেগাপ্লুত শ্রাবস্তি ফিসফিস করে বলল "হোয়াট ডাস দ্যাট মিন?"

"ইউ আস্কড মি ইওর আইডেন্টিটি? তুমি এই বিশাল বিপুল সভ্যতার একটা অংশ। ইউ আর এ লিগ্যাসি অফ দিস হেরিটেজ। তোমার দেহের প্রতিটা অণু-পরমাণুর মধ্যে মিশে আছে এই ইন্ডিয়া। ইউ আর পার্ট অ্যান্ড সোল অফ দিস হিউজ হেরিটেজ অ্যান্ড সিভিলাইজেশন। দ্যাট ইজ ইওর আইডেন্টিটি। ইউ আর ইন্ডিয়া"

শ্রাবস্তির চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে মুক্তোর মতো শিশিরবিন্দু। কতদিন ভালো করে কাঁদেনি। আজ যেন বিবেকানন্দ রকসে দাঁড়িয়ে, তার না-চেনা ভারতবর্ষকে দেখছে। অনুভব করছে। উপলব্ধি করছে।

তার অস্তিত্ব নতুন আভরণে সাজছে।

***

"হোয়াই ডিড ইউ ডেসার্ট মি ড্যাড?"

প্রশ্নটা বারবার ঘুরে-ফিরে আসছে। শ্রাবস্তি এখনও উত্তর খুঁজে পায়নি। কন্যাকুমারী থেকে ফিরে আবার সেই প্রশ্ন। ভারতবর্ষে কিছু দেখা হয়েছে। নিজের আইডেন্টিটির ছেঁড়া তারের সুর, ভাসা ভাসা মেলডি তৈরি করছে। তবুও জন্মদাতার অবয়বটা ধোঁয়াশা। ভারতবর্ষের প্রক্ষাপটে, বাবা নিজেকে তুলে ধরতে চাইছে। বুলশিট। তার অরিজিন আর জন্মাধিকারে তার বাবা এক হতে পারে না। কী বলতে চাইছে? ড্যাড ইজ জাস্ট ইভেডিং দ্য পয়েন্ট।

"কাম অন, ইউ আর ইভেডিং দ্য কোয়েশ্চেন" শ্রাবস্তি সোফা ছেড়ে ডাইনিং ক্রকারি ক্যাবিনেটে হাত রাখল। থ্রি-কোয়ারটার সাদা কটন শর্টস, হাফ-হাতা হাল্কা-নীলে সাদা ফুল আঁকা টপস। ভারী ঠোঁট মুচকে, তীব্র শ্যেনদৃষ্টি "ইউ আর সেলফ সেন্টারড"

রঞ্জিতার শেখানো সত্য ওলটাবার ক্ষমতা কী অরিজিতের আছে? হয়ত আছে। না হলে এত বছর পর শ্রাবস্তি কেন আসবে?

কঠিন জেনেও বলল "হোয়াই আর ইউ গেটিং আপসেট? তুমি এসেছ সত্যি জানতে। সত্যিটাই বলব। ফর হেভেন্স সেক সিট ডাউন"

অরিজিৎকে ঠান্ডা দেখে খেপে উঠল শ্রাবস্তি। রেগে বলল "কাম অন ড্যাড। আই অ্যাম নো ফুল। ইউ আর ইভেডিং দ্য ইসু লাইক ইউ হ্যাভ অলোয়েজ ডান"

অরিজিৎ দৃঢ়ভাবে বলল "আই অ্যাম নট ট্রাইং টু ইভেড দ্য ইসু। যখন ইংল্যান্ড ছাড়ি তোমার বয়স আট। বোঝার বয়সই হয়নি"

শ্রাবস্তি শুনছে। অরিজিৎ বলে চলেছে "যদিও আমি ব্যারিস্টারি পাশ করি, ভারতীয় কালো চামড়া হিসেবে ব্যারিস্টারি প্র্যাকটিস করতে পারতাম না। ইংল্যান্ডে থাকলে সলিসিটার হয়ে থাকতে হত"

শ্রাবস্তি থামিয়ে বলল "হোয়াই ডিডন্ট ইউ?"

"হোয়াই সুড আই? এনিথিং ওয়ার্স ইন ইন্ডিয়া?"

"ইউ লস্ট ইওর ফ্যামিলি" শ্রাবস্তির দ্বন্দ্ব। ফ্যামিলি না কেরিয়ার? কোনটা আগে?

"যদি তোমার মা ফেরত আসত, সব ঠিক থাকত। সি ডিডন্ট"

"হোয়াই?"

"তার কাছে সাকসেস, হ্যাপিনেস মানে ইংল্যান্ড। হোয়াটজ রং উইথ ইন্ডিয়া? অ্যান্ড হোয়াট ইজ সো বিউটিফুল অ্যাবাউট ইংল্যান্ড?"

"আই হ্যাভ বিন বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন ইংল্যান্ড। কান্ট থিংক অফ লিভিং এনিহোয়ার এলস"

"আই অ্যাম বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন ইন্ডিয়া। হাউ ড্যু ইউ এক্সপেক্ট মি টু লিভ লাইক এ কিং এনিহোয়ার এলস?" শ্রাবস্তির কথাটাই ফিরিয়ে দিল।

শ্রাবস্তি মুখে কথা নেই। কয়েক মুহূর্ত। ভুলে গেছিল বাবার প্রফেশন। কলকাতার এস্ট্যাবলিসড ব্যারিস্টার। আভরণের বাইরে বাবাকে খুঁজছে। যার বর্ণ তার অন্তরে। সামাজিক অলংকার মুক্ত মানুষটাকে। স্টিভকে কাছে পেয়েছিল ভালোবেসে। অরিজিৎকে বুঝতে চায় জীবনের তাগিদে।

অরিজিৎ থামল "মাইন্ড ইফ আই হ্যাভ এ ড্রিংক?"

"নট অ্যাট অল। গো আহেড"

বার ক্যাবিনেটের দরজা খুলে বলল "অনেক ভালো ওয়াইন আছে। হোয়াট উড ইউ প্রেফার? অ্যান ইন্ডিয়ান ওয়াইন ফ্রম সোলান ওর স্যাটু রথচায়েল্ড? দুটোই আছে"

"লেটস ট্রাই দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ান প্লিজ। হোয়াট নেম ডিড ইউ সে?"

"সোলান। সিমলার কাছে ব্রুয়ারি। ভালো ওয়াইন তৈরি করে"

"হোয়াট ফ্লেভার? এপ্রিকট, রোস, গ্রেপ?"

শ্রাবস্তি আশ্চর্য হচ্ছে। ইন্ডিয়াতে এত ওয়াইন হয়? তার ধারনা ছিল ফ্রান্স, জার্মানি ছাড়া এত রকমের ওয়াইন কোথাও হয় না! ফ্রেঞ্চ ভিনিয়ার্ডের স্মৃতি এখনও ভাসছে। এতদিনে কিছুটা ইন্ডিয়ান হেরিটেজ দেখেছে। এখন দেখছে ইন্ডিয়ান ওয়ে অফ লিভিং। হোয়াই মাম হ্যাড টোল্ড হার 'ইন্ডিয়া ওয়াজ এ ডার্টি ন্যাস্টি প্লেস উইথ নো লাইফ' হোয়েন সি হারসেলফ ওয়াজ বর্ন হিয়ার?

সোলানের এপ্রিকট ওয়াইনে চুমুক দিয়ে বলল "মাম সেড ইউ ওয়ার নট প্রিপেয়ারড টু টেক আওয়ার রেসপনসিবিলিটি"

"কেন নেব না? ইউ আর মাই ওনলি ডটার"

গ্লেনমর‍্যাঙ্গিতে চুমুক দিয়ে অরিজিৎ বলল "কে তোমার পাবলিক স্কুল ফিস দিয়েছে? মাকে জিজ্ঞেস করেছ?"

"সি ডিড নট মেনশন" ডেভিডের কথা চেপে গেল। ডেভিডকে এনে সিচুয়েশন কমপ্লিকেটেড করতে চায় না। সোফায়, টেবল ল্যাম্পের আলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল "আই ফিল সো লস্ট। মাই ম্যারেজ হ্যাজ ব্রোকেন। আই অ্যাম অ্যান ইনকমপ্লিট লেডি"

"ইনকমপ্লিট! মাই ফুট। ড্যু ইউ নো দি মিনিং অফ ইনকমপ্লিটনেস?"

অরিজিৎ দৃঢ় কণ্ঠে, মমতা ভরা স্বরে বলল "তুমি কী মনে কর বিয়েটাই কমপ্লিটনেসের একমাত্র অবলম্বন? ডিভোর্সড হলে ইনকমপ্লিট হয়ে যাবে? ড্যু ইউ নো দি ইম্পর্ট্যান্স অফ বিইং আ ওম্যান? এতই সহজ। এটাই কী শিখেছ মায়ের কাছ থেকে?"

ক্রি...ই...ই...ই...ইং... যান্ত্রিক শব্দে চমকে উঠল। সিকিউরিটি বেল।

"গোবর্ধন, দেখ তো কে?"

কয়েক মিনিট। মঞ্জরী ঘরে ঢুকল। আশা করেনি এসময় মঞ্জরী আসবে। আগে বলেনি। মঞ্জরীকে দেখে আশ্চর্য। ভাবেনি, না জানিয়ে এভাবে হঠাৎ এসে পড়বে।

চটিটা দরজার সামনে খুলে বলল "হ্যাভ আই কাম অ্যাট দ্য রং টাইম?"

অবাক বিস্ময়ে শ্রাবস্তি চেয়ে আছে মঞ্জরীর দিকে। হু ইস সি? হঠাৎ এই সন্ধেবেলায় বাবার বাড়িতে কেন? ইস সি এ গার্লফ্রেন্ড অফ হার ড্যাড? ভেতরে তোলপাড় চলেছে। এই অপরিচিত মহিলার উপস্থিতি হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিল। বাবার সঙ্গে নিভৃতে বোঝাপড়া করতে চাইছিল। এখন ও আসায় সম্ভব নয়।

শ্রাবস্তির পাশের সোফায় বসে মঞ্জরী বলল “আই অ্যাম মঞ্জরী। ইউ আর শ্রাবস্তি” হাত বাড়াল “নাইস টু মিট ইউ”

কিংকর্তব্যবিমূঢ় শ্রাবস্তি স্বভাবজাত ব্রিটিশ এটিকেটসে হাত বাড়িয়ে বলল “নাইস টু মিট ইউ টু”

শ্রাবস্তি আশা করছিল অরিজিৎ কিছু বলবে। কয়েক মুহূর্ত। সেই নীরব মুহূর্তে, দূরে ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ। বাবাকে কত কথা বলার আছে। এই অপরিচিত মহিলার সামনে বলা যাবে না।

মৌনতা ভেঙে শ্রাবস্তি বলল “ইউ হ্যাভ কাম টু মিট মাই ফাদার। হ্যাভেন্ট ইউ?”

চেয়ে আছে সাদা-নীল ফুল আঁকা ঢাকাই শাড়ি পরা মঞ্জরীর দিকে। মধ্যবয়সি। সুন্দরী না হলেও মুখশ্রীর নিজস্ব মাধুর্য আছে। কে এই মহিলা? মম-এর বয়সি হবে। অথচ কত তফাত। প্রসাধন, আড়ম্বর নেই। হাল্কা লিপস্টিকের প্রলেপ। না খুঁজলে বোঝাও যায় না। মাকে একবারও প্রসাধনহীন অবস্থায় বেরোতে দেখেনি। কারও বাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা। পাশাপাশি দেখছে। অনাড়ম্বর মহিলাকে। আর কেন্টের জন্মদাত্রীকে।

মঞ্জরী শ্রাবস্তিকে বলল “নো। আই হ্যাভ কাম টু মিট বোথ অফ ইউ”

এবার শ্রাবস্তির অবাক হওয়ার পালা। ভ্রু কুঁচকে বলল “মি?”

“ইয়েস। ইউ আর লাইক মাই ডটার হুম আই লস্ট ইন এ ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট”

বিরক্তি থেকে বিস্ময়। জয়-জয়ন্তীর ঝালা মিশে গেল বেহাগের সুরে। দীর্ঘশ্বাস চেপে, স্বাভাবিক স্বরে বলল “মাই হাসব্যান্ড টু। তোমার সম্বন্ধে জানি। তোমার মা, আমি ক্লাসমেট ছিলাম। অ্যাকচুয়ালি স্কুল ব্যাচমেট”

এবার আরও অবাক হওয়ার পালা। মহিলা তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে। নিশ্চয়ই বাবা বলেছে। কেন? বাবার জীবনে ওর অস্তিত্ব ঘুরপাক খাচ্ছে। সে প্রশ্ন এখানে করা যাবে না। না-দেখা দেখাটাকে গিলে স্বভাবজাত ব্রিটিশ ভঙ্গিমায় বলল “সরি টু হিয়ার দ্যাট”

শ্রাবস্তির কথা টেনে মঞ্জরী বলল “ওয়েল, দ্যাটস লাইফ। আমি কিন্তু এখনও বেঁচে আছি। আশা নিয়ে নয়। স্টিল ট্রাইং টু ফ্যাদম দ্য ফ্র্যাগ্রেন্স অফ লাইফ”

মঞ্জরীর স্পষ্ট ইংরেজিতে শ্রাবস্তি অবাক। আরও অবাক ইংরেজি ভাষার সাবলীলতায়। কী বলবে, ভেবে পেল না। বাবার সঙ্গে হিসেব-বোঝাপড়া করার অনেক সময় আছে। এই মহিলা, তার কৌতূহল বাড়াচ্ছে। তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। মায়ের ছোটবেলার বন্ধু। বাবাকে তো জানেই। মাকেও। ভাবছিল অরিজিৎ ইন্ট্রোডিউস করে দেবে। অরিজিৎ সোফার কোনে বসে হুইস্কি খাচ্ছে। বাবার দিকে তাকাল। কিছু কথার আশায়। নীরব দেখে বলল “আই অ্যাম শ্রাবস্তি বসু”

“আই নো। ইউ আর অরিজিৎস ওনলি ডটার। অলরেডি টোল্ড ইউ আমার নাম মঞ্জরী। পদবির প্রয়োজন নেই। বিধবার পদবি দিয়ে কী হবে? আই অ্যাম মাই ওন আইডেন্টিটি”

‘আই অ্যাম অ্যান ইনকমপ্লিট লেডি’ কিছুক্ষণ আগেই বাবাকে বলছিল না শ্রাবস্তি? উত্তরের আগেই, মহিলা ঢুকে পড়ে। ওর মনের কথা না জেনেই, উত্তর নিয়ে হাজির।

তবুও ব্যঙ্গ করে বলল “অ্যান্ড মে আই নো, হোয়াট ইজ দ্যাট আইডেন্টিটি?”

“টু নো দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু নো মি। অ্যাজ আই অ্যাম” অরিজিৎকে বলল “উডন্ট ইউ সার্ভ মি সাম ওয়াইন?”

“অফ কোর্স” বার ক্যাবিনেট থেকে আরেকটা ওয়াইন গ্লাস বার করে এপ্রিকট ওয়াইনটা ঢেলে বলল “ফ্রম সোলান। শ্রাবস্তির চয়েস”

ওয়াইনে চুমুক দিয়ে মঞ্জরী বলল “ফর দ্য টাইম বিইং লেটস্ কিপ দ্য ইস্যু অ্যাসাইড। টেক মি অ্যাজ এ কমন ফ্রেন্ড অফ ইওর ড্যাড অ্যান্ড মাম”

কী বলতে চাইছে? মিসিং লিংক? একটা বন্ধন, যার ভিত্তিতে তার ভারতবর্ষে আসা। অনেক প্রশ্ন, যা তাকে তাড়া করে বেরিয়েছে এত বছর। হার প্রেসেন্ট ডাইন্যামিক স্টেট ইজ ইন এ নো ম্যানস ওয়ার্ল্ড। হার প্রেসেন্ট আইডেন্টি হ্যাঙ্গিং ইন দ্য এয়ার বিটুইন টু কানট্রিস। এক যে দেশে বড় হয়েছে - শিক্ষা, বিয়ে, ডিভোর্স। আরেকটা যা দেখতে এসেছে।

বিবেকানন্দ রকসে তার মাথায় হাত রেখে, মুখটা ঘুরিয়ে, মাদার ইন্ডিয়াকে দেখিয়ে বাবা বলেছিল ‘ইউ আর ইন্ডিয়া’ যে দেশের নেটিভদের মতো তার গায়ের রং। সে দেশের এক ঝলক দেখেছে। সময় হয়েছে বিবেকানন্দ রকস থেকে ভারতবর্ষ দেখাকে নিবিড় করে বোঝার।

মঞ্জরী বলল “ইন্ডিয়া ইজ নট ওনলি এ হেরিটেজ। ইট ইজ অলসো এ সেন্স অফ বিলঙ্গিং। দ্য ওয়ারমথ, অ্যাফেকশন, কেয়ার, ইভেন টু এ ফরেনার লাইক ইউ”

কথায় পরোক্ষ শ্লেষ। বুঝলেও, শ্রাবস্তি অবহেলা করে বলল “হোয়াট ওয়ারমথ?”

ওয়াইনের গ্লাসটা টেবলে রেখে, শ্রাবস্তিকে আলিঙ্গন করে মঞ্জরী বলল “ইউ আর মাই ডটার”

প্রশ্নর উত্তরের আগে, হারানো ব্যথার গোপন নিভৃত কোণ থেকে, লুকিয়ে থাকা ফল্গুধারা বেরিয়ে আসছে। ভাসিয়ে দিতে চাইছে চার চোখের সঙ্গমকে। না-দেখা অনুভূতির মালা ধ্রুবতারা খুঁজছে। না-চেনা ধ্রুবতারা। ছোটবেলার কবিতাঃ

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার

হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর

দূরের তারাটা দূরেই থেকে গেছে। কাছে এসে ধরা দেয়নি। আজ বুঝি সেই তারা দু-হাত বাড়িয়ে ডাকছে। সে ডাকে সাড়া না দিয়ে যাবে কোথায়? অন্য পথ যে নেই। কেরিয়ারিস্ট, স্ট্যাটাস খোঁজা মায়ের কাছে, মাতৃত্বের কর্তব্যে মঞ্জরীর উষ্ণ ছোঁয়ার অভাব ছিল। তাই কী স্টিভকে পেয়েও ধরে রাখতে পারেনি? সেই অভাব কী স্টিভও অনুভব করেছিল? অঙ্কের বাইরে অনুভূতির কম্পন। যা শিহরণ তুলে যুগ-যুগান্তরে প্রতিটা মানুষকে অলিখিত বন্ধনে বন্দি করে। এই নাম না-জানা বন্ধনের পরিচয় খুঁজতে শ্রাবস্তি এখানে? না কি, চেনা নাম, অথচ অচেনা মানুষটাকে নতুন করে চিনতে? মঞ্জরীর দিকে চেয়ে ওর নরম উষ্ণ হাত এক অলিখিত নিবিড় বন্ধনে বেঁধে ফেলছে। সম্পর্কহীন, পরিচয়হীন, ভাষাহীন নতুন স্পর্শের অনুরণনে।

মঞ্জরী শ্রাবস্তিকে বলল “দেয়ার ইজ লট টু নো, মাই ডিয়ার। দ্য নাইট ইজ স্টিল ইয়ং”

***

আটপৌর শাড়ি পরা মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে শ্রাবস্তি বলল “হোয়াই ডিড ইউ ব্রিং মি হিয়ার?”

মঞ্জরী গঙ্গার দিকে তাকিয়ে “লং হোয়াইল ব্যাক মাই ডটার আস্কড মি এ ভেরি পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন ইন দ্য সেম সারাউন্ডিং”

শ্রাবস্তি মনে করতে পারল না, মাকে কখনও এই বেশে দেখেছে কি না। জিনস-টপস-সালোয়ারের বাইরেও আটপৌর শাড়ির একটা মাধুর্য আছে। না দেখলে বুঝত না। রাত জাগা করফুর সমুদ্রপারের বাইরেও যে শান্ত নিরবচ্ছিন্ন জায়গা থাকতে পারে, জানা ছিল না। এখানেই নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়, ডিজের উন্মাদনার মধ্যে নয়।

স্টিভ বলত “আই ডোন্ট লাইক দ্য নয়েজ”

“আই লাইক ইট” শ্রাবস্তির কথা মেনে নিত স্টিভ। মনে কী চলত, ও কি একবারও ভেবেছে? সি এনজয়েড পার্টি, ডিস্কো, হ্যঙ্গিং আউট, হার ওনলি ফর্ম অফ এন্টারটেনমেন্ট।

একা চলার অন্তরের মাধুর্য অনুভব করছে। বেলুড় মঠের নিস্তব্ধতায় শান্তির আমেজ। তার অন্তর এত বছর এটাই খুঁজছিল। মঞ্জরীও খুঁজছিল। গঙ্গার ওপারে মন্দিরে সন্ধের আরতির ঘণ্টা বাজছে। ঢং... ঢং... ঢং... আওয়াজ জলের উপরে ভাসছে। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে বাতাসে। প্রত্যেকের অন্তরের নিভৃতে। একেই ঠাকুর ওঁকারধ্বনি বলেছিলেন। সাকার নিরাকারকেও তো এভাবে বোঝানো যায়। ঘণ্টার ঢং শব্দের প্রথম ঢ-টা সাকার, আর অং-টা নিরাকার। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ওঙ্কারধ্বনির শব্দে আবেগাপ্লুত শ্রাবস্তির হাত থেকে ব্যাগটা পড়ে গেল। লক্ষ করেনি খোলা ছিল। একটা ছোট্ট টিনের কনটেনার ঘাসে লুটিয়ে পড়ল।

মঞ্জরী ওটা হাতে নিয়ে বলল "এটা কী?"

"এয়ারোসল গান। উই অলোয়েজ কিপ ইট উইথ আস টু প্রটেক্ট আওয়ারসেলভস। আফটার অল, দেয়ার আর মেনি ব্যাড মেন"

কনটেনারটা শ্রাবস্তির ব্যাগে ঢুকিয়ে বলল "ভালো। আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে **রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে?**"

"মানে?"

"এভরিথিং ইজ প্রিডেস্টিন্ড। স্লাইটলি ডিফারেন্ট ফ্রম ওয়েস্টার্ন ফিলসফি"

শ্রাবস্তি অবাক। এ দেশে মানুষের ঈশ্বরের ওপর এত বিশ্বাস। গায়ে কাঁটা দিল। গঙ্গার দিকে তাকাল। গোধূলির পড়ন্ত আলোয় বিষণ্ণ। ঘোলাটে জলে মিশেছে পড়ন্ত বেলার মন-খারাপ করা লালচে আলো। সেই আলোয় টুম্পাকে দেখছে, শ্রাবস্তির চোখে। তার সঙ্গে মিশেছে, সন্ধের কালচে রেশ। এখন ভাটা। কলকাতার দিকে জল বয়ে চলেছে। সঙ্গে বেশ কিছু কচুরিপানা। ফ্রি জয়-রাইড নিয়ে একটা পাখি কচুরিপানায় বসে। এতদূর থেকে মঞ্জরী পাখিটাকে চিনতে পারল না। মনে হল কাক। দূরে, দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে দুটো নৌকো ভেসে আসছে। অসামান্য ফটোগ্রাফের মতো সন্ধের পড়ন্ত আলোয় সিল্যুয়েট নৌকো দুটোকে অসাধারণ লাগছে। এপাড়ে বেশ ভিড়। বেলুড় টুরিস্ট স্পট। বিকেলে বহু লোক আসে। কেউ মন্দিরে আরতি দেখতে, কেউ ঠাকুর দেখতে, কেউ গঙ্গার পাড়ে সময় কাটাতে, কেউ প্রেম করতে, কেউ বা চুপ করে পাড়ে বসে ভাবতে। সাধারণ টুরিস্ট তো আছেই। শিকাগোর লেকচার বিশ্ববাসীকে টেনে আনে পলিউটেড কলকাতার নিরবচ্ছিন্ন শান্তির গহ্বরে।

পিছনে মন্দিরের দিকে মঞ্জরী তাকাল। জনসাধারণের ভীতি মেশানো ভক্তির উদ্রেকের জন্য, বিশাল মন্দিরটা যথেষ্ট গাম্ভীর্য বহন করে। যেন স্বামীজির বিশাল ব্যক্তিত্বের মূর্ত প্রকাশ। শ্রাবস্তিও ওদিকে চেয়েছিল। বিবেকানন্দ রকস থেকে বেলুড় মঠ। দুটো ভিন্ন জায়গা হলেও মানুষটা এক। যার সম্বন্ধে ড্যাড বলেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ। যে মাদার ইন্ডিয়াকে দেখেছিল ভারতবর্ষের শেষ ল্যাজ থেকে। মাথায় হাত রেখে বলেছিল 'ইউ আর ইন্ডিয়া'। যেখানে বিবেকানন্দ শেষ, সেখানে শ্রাবস্তির শুরু। বাবা এক ঝলক ভূখণ্ড দেখিয়েছে। সময় হয়েছে দেশটাকে দেখার। মঞ্জরী একই লোকের আরেকটা পীঠস্থানে নিয়ে এসেছে। মাদার ইন্ডিয়াকে দেখাতে নয়। কী দেখাতে?

"হোয়াট ডিড ইওর ডটার আস্ক?"

"ইজ বিবেকানন্দ গড অর হিউম্যান?"

"অফ কোর্স হিউম্যান"

"লোকেরা তাকে ভগবানের মতো পুজো করে। দ্য সেম এজ ওল্ড কোয়েশ্চেন। ওয়াজ জিসাস গড অর হিউম্যান?"

"অফ কোর্স গড। হি ইজ দ্য ফাদার অফ খ্রিস্টানিটি"

"তাহলে ওর জন্ম থেকে আমাদের এই সাল গোনা কেন শুরু? গডস আর নট বর্ন?" মঞ্জরীর কথায় চমকে উঠল। আন্টি ইজ টকিং সেন্স। বি ইট ইস্ট অর ওয়েস্ট, দ্য স্টোরি ইজ দ্য সেম। ইফ দ্যাট বি সো, হোয়াই ওয়াজ সি রিবিউকড ওয়ান্স ফর দ্য কলার অফ হার স্কিন? এই ভেদাভেদ কী মানুষের তৈরি? দ্য স্টোরি অফ ভ্যালুস অ্যান্ড বিলিফস আর সেম এভরিহোয়ার। প্রত্যেকটা দেশে নিজ রূপে আত্মপ্রকাশ। ফর্ম পাল্টায়। সত্য নয়। আগে জানত। এখন বুঝতে পারছে।

মঞ্জরী শাড়িটা বুকে জড়িয়ে বলল "এখানে পুজো দিতে আসিনি। নতুন করে হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে খুঁজতে এসেছি। হোয়াট ব্রট ইউ টু ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইওর ড্যাড আফটার অল দিস ইয়ার্স?"

ঘাবড়ে গেল শ্রাবস্তি। হট করে এমন ব্যক্তিগত প্রশ্নের সম্মুখীন হবে বুঝতে পারেনি। সে এসেছে অনেক প্রশ্ন নিয়ে। তার না-চেনা বাবাকে চিনতে। তার না-চেনা পিতৃমাতৃভূমিকে দেখতে। অন্ধকার শূন্যতায় পূর্ণতা খুঁজতে। এই মহিলা ব্যক্তিগত জায়গায় কেন প্রবেশ করতে চাইছে?

ওর মনের দো-টানা বুঝে মঞ্জরী বলল "হ্যাভ আই আস্কড ইউ সামথিং অকোয়ার্ড? যদিও তুমি আমায় চেন না ইওর প্যারেন্টস নো মি ওয়েল"

"ইউ স্টাডিড উইথ মাম?"

"একই স্কুলে। নো হার সিন্স চায়ল্ডহুড"

ইতস্তত করছিল। মায়ের সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন। কাউকে জিজ্ঞেস করতে বা বলতে পারেনি। মাকে দেখেছে ব্রিটিশ পটভূমিতে। সময় হয়েছে, নতুন করে তাকে দেখার, ভারতীয় পটভূমিতে। দূরে ভাসা কচুরিপানার ওপর পাখিটার দিকে তাকিয়ে বলল "হাউ ওয়াস সি?"

"শুনতে চাও, দ্য ট্রুথ? অর ওয়ান অফ দোস ইউসুয়াল এক্সপ্রেশনস?"

দৃঢ়ভাবে শ্রাবস্তি বলল "দ্য ট্রুথ। নথিং বাট দ্য ট্রুথ" যেন কোর্টে শপথ নিচ্ছে।

"নো ডাউট সি ওয়াজ ট্যালেন্টেড। নাচ জানত। ওর মাও শিক্ষিত। বাট সামহোয়ার ডাউন দ্য লাইন দ্য নর্মাল এটিকেটস ওয়ার ল্যাকিং। আই মিন, সি ওয়াজ সিনিক্যাল অ্যান্ড ডিডন্ট মিক্স উইথ দ্য ক্রাউড"

"হোয়াই?"

"সি হ্যাড দিস উইয়ারড আইডিয়া সি ওয়াজ সুপিরিয়র দ্যান রেস্ট অফ আস। হুইচ আনফরচুনেটলি, সি ওয়াজন্ট। হয়ত মনের মধ্যে একটা ইনসিকিউরিটি। আমি অনেকবার তোমার মায়ের বাড়ি গেছি। ওর মা,

মানে তোমার দিদিমা, তোমার গ্র্যান্ডপাকে স্লেভের মতো ট্রিট করত। হ্যাভ ইউ সিন ইওর গ্র্যান্ডপা?"

"নো। হি ডায়ড বিফোর আই ওয়াজ বর্ন"

বুঝতে পারছে মামের ডেভিডের সঙ্গে ব্যবহারের তাৎপর্য। শুধু ডেভিড নয়। ইট মাস্ট হ্যাভ বিইং এভরি মেল সি কেম অ্যাক্রস ইন হার লাইফ। মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় ড্যাডকে মাম স্কেল ছুড়ে মেরেছিল। এক কোণে শ্রাবস্তি ভয়ে শিউরে হেল্পলেসলি কাঁদত। বোঝার বয়েস হয়নি কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক। সেই রাগের আতঙ্ক অবচেতনে সারাজীবন তাড়া করেছে। কীসের ভয়? শূন্যতার ভয়। হারানোর ভয়। স্টিভকে হারানোর পর প্রথম বুঝল, ভয়ের কিছু নেই। হারাবার আর বাকি কী? আজ সন্ধ্যারাগের সুরে শুনতে পাচ্ছে আরেক না-শোনা গান। সবাই হারাতে এসেছি। আর হারাবার কী আছে?

সন্ধে ঢলে পড়েছে। ওপাশে অনেকটা গির্জার আদলে গড়া রামকৃষ্ণদেবের মন্দির থেকে আওয়াজ আসছে ঢং... ঢং... ঢং... জাস্ট লাইক দ্য ডং অফ দ্য চার্চ বেলস অন এ সানডে মর্নিং। সুর এক। ভূমি আরেক। মন ভূমির ভেদাভেদ ভেদ নিজের ভেতরে ঢুকতে চাইছে। না চেনা, না জানা আরেক জীবনে। মঞ্জরী ওর ভেতরকে ছুঁতে পারছে। শ্রাবস্তির হাতটা হাতে টেনে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল "ইওর ড্যাড হ্যাজ গন থ্রু এ লট"

শ্রাবস্তিও মঞ্জরীর হাতে চাপ দিল "হোয়াই ডিড হি লিভ মি?"

"সে চায়নি। বাধ্যে হয়েছিল। বিকস ইওর মাম ডিডন্ট ওয়ান্ট টু কম্প্রমাইজ ফর এ কমপ্লিট ফ্যামিলি। আর ইউ ম্যারেড?"

"ডিভোর্সড"

হিন্দুর সিঁথির সিঁদুর জীবনসঙ্গীর পরিচয় দেয়। হাতের রিং দেখে ঠাওর করা মুশকিল মেয়েটি বিবাহিত কি না। হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর আবছা স্বপ্ন মঞ্জরীকে নাড়িয়ে দিল। কেউ চেয়েও পায় না। কেউ পেয়েও ধরে রাখতে পারে না। কী বিচিত্র এই জীবন।

শ্রাবস্তির হাতে নিজে চাপ দিল "প্রব্যাবলি ইউ রিয়েলাইজ হাউ ইম্পরট্যান্ট এ ফ্যামিলি ইজ। জানি না হোয়াই ইওর ম্যারেজ হ্যাজ ব্রোকেন। এ ব্রোকেন হোম ক্যান ওনলি গিভ আনাদার ব্রোকেন হোম"

ব্রোকেন হোম ক্যান ওনলি গিভ আনাদার ব্রোকেন হোম। চমকে উঠল শ্রাবস্তি। স্টিভকে হারানোর কারণটা বুঝছে। তার অস্তিত্বহীনতার মূল সুর। যে দেশে যে পৃথিবীতেই থাকি, কিছু অবলম্বন করে বাঁচতে চাই। না থাকলেও, থাকার অনুভূতি। মাম বলেছিল 'নেভার মাইন্ড। ইট হ্যাপেন্স ইন অল অফ আওয়ার লাইভস' ইফ দ্যাটজ ট্রু, হোয়াই ড্যু পিপল ম্যারি?

আন্টিকে বলল "এ সেন্স অফ বিলঙ্গিং ইজ দ্য এসেন্স অফ কমপ্লিটনেস"

“হু ইজ কমপ্লিট? ডোন্ট নো। প্রব্যাবলি নোবডি নোস”

শ্রাবস্তির মনে শব্দটা বারবার নাড়া দিচ্ছে কমপ্লিট। ওয়াজ সি ইনকমপ্লিট উইথ স্টিভ?

আচমকা মঞ্জরীকে প্রশ্ন “হোয়াট ইজ ইওর রিলেশনশিপ উইথ ড্যাড?”

চমকে উঠল মঞ্জরী। এভাবে প্রশ্নটা আসবে আশা করেনি। কয়েক মুহূর্ত। সামলে নিল। তীক্ষ্ণ পলকহীন দৃষ্টি “নাথিং। অর মে বি এভরিথিং। রিলেশনশিপ কান্ট বি ডেফাইন্ড অলওয়েজ। হোয়াট উই কল রিলেশনশিপ আর উইদিন দ্য রেলমস অফ নোন প্যারামিটার্স। ইটজ অ্যাকচুয়ালি এ সেন্স অফ বিলঙ্গিং, এ ফিলিং টুয়ার্ডস অ্যাচিভমেন্ট অফ কমপ্লিটনেস” চোখ দুটো জলে ভরে গেছে। টুম্পা অমিতের কথা মনে পড়ছে। একসঙ্গে বেরনো, রাতের টেবলে বসে খাওয়া, কত কিছু। যা আমরা গুরুত্ব দিই না।সেই গুরুত্বহীন জিনিসগুলো যখন জীবন থেকে হারিয়ে যায়, বুঝতে পারি তার মহাত্ম্য। মঞ্জরীর চোখের জল শ্রাবস্তির বুকে হিল্লোল তুলেছে। ছোট্ট জীবনে অনেক হারানোর কল্লোল। না-পাওয়ার কলতান। না-দেখার নিঃশব্দ ঝংকার।

সন্ধে ঢলে পড়েছে। গঙ্গার পাড় ধূসর আবছায়া অন্ধকার। দূরে ওপাশে টিমটিম করছে আলোগুলো। গঙ্গার এপাশ থেকে কলকাতাকে দেখছে। পেছনে দুটো মন্দিরের স্নিগ্ধ আলোয় চার্চ-বেলসের মতো কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ ভেতরে পবিত্রতার স্পর্শ আনছে। শব্দের পবিত্রতার মধ্যেই মনের পবিত্রতা।

ড্যাডের সঙ্গে সম্পর্ক যাই থাক না কেন, সি ইজ পিওর। সি ইজ মাদারলি। সি ক্যান ফিল দ্য রিদমস অফ হার হার্ট। আন্টির মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। আবছায়া সিল্যুটের দিকে তাকিয়ে বলল “ইওর টিয়ার্স স্পিক মেনি এ ওয়ার্ডস। ইউ আর এ মাদার, হুজ হার্ট ক্রায়েস ফর হার ডটার। সরি টু হ্যাভ আপসেট ইউ আন্টি”

চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছে মঞ্জরী বলল “আই অ্যাম ফাইন। জানি না তোমার বাবার জীবনে আমার অস্তিত্ব কী? দুজনেরই জীবন ইনকমপ্লিট”

দূরের তারাটা কাছে আসছে। ছোটবেলায় নিজের মনে আওড়ানোঃ

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার

হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট উই আর

তারাটা আর অন্ধকার আকাশে জ্বলজ্বল করছে না। নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। মাটির কাছাকাছি।

হাত বাড়াবার জন্য অপেক্ষায়... এখন শুধু ধরাটাই বাকি।

***

শীতের সকালে আড়মোড়া ভেঙে যখন শ্রাবস্তি উঠল, ড্যাড তখন কোর্টে। ব্রিটিশ সামারের মতো আবহাওয়া। এমন দিনে কেউ ঘরে বসে থাকে। যেখানে খুশি যেতে পারে। শপিং মল কিংবা কলকাতা ঘুরে দেখতে পারে। গাড়ি উইথ ড্রাইভার মজুত।

অলসভাবেই ডাকল “করবি, চা দেবে”

এখানে কত সহজ। হাঁক দিলেই হাজির। ইংল্যান্ড হলে নিজে চা-টাও গরম করতে হত। চায়ের কাপ হাতে, বারান্দার বেতের সোফায় বসে, শীতের মিষ্টি আমেজ উপভোগ করে ভাবছিল, কী করবে? মোবাইল বাজতেই ভাবল ড্যাড। কিন্তু না।

ও ইন্ডিয়ায় এসেছে রঞ্জিতা জানে না। জানলে তাণ্ডব শুরু হয়ে যেত। মাকে শুধু জানিয়ে এসেছে “আই নিড সাম স্পেস। গোয়িং টু ভিসিট এ ফিউ কান্ট্রিস”

“হুইচ কান্ট্রিস?”

“জার্মানি ইন দ্য ফার্স্ট ইন্সট্যান্স। দেন ডিসাইড” কথাটা এড়িয়ে গেছিল।

চাকুরে মেয়ে। স্বাধীনভাবে ঘুরবে। রঞ্জিতা বাধা দেওয়ার কে? দিলেই বা কেন শুনবে? ড্যাডের কাছে আসছে জানলে দিত না। ডাক্তার হলেও মা তাকে বাচ্চার মতো ট্রিট করে। কন্ট্রোলে রাখতে। কনট্রোলই প্রধান। ফিলিংস সেকেন্ডারি। ডিভোর্সের পর যদিও কিছুটা মেলো ডাউন করেছে। নেভার দ্য লেস...

ফোনটা তুলে বলল “ড্যাড”

“নট ইওর ড্যাড। আন্টি” মহিলা কণ্ঠস্বর।

“হায় আন্টি, হাউ আর ইউ?”

“ফাইন। আই অ্যাম অফ টুডে। ফিল লাইক গোয়িং আউট সামহোয়ার?”

“সিওর। আই ওয়াজ থিংকিং টু”

“গেট রেডি। আধঘণ্টার মধ্যে আসছি”

হাউ ডিফারেন্ট। আন্টি ক্যান ফিল হার। হার ওন মাদার কুডন্ট। না-জানা, না-চেনা সম্পর্ক বারবার চাওয়া-পাওয়ার গভীরে ধাক্কা মারছে। টেলিপ্যাথি! দ্যাটস হোয়াট দে কল ইট ইন ইংল্যান্ড। একটা বন্ধন। যার ভাষা নেই। তবুও তা রূপে, রসে, ছন্দে, গন্ধে আত্মপ্রকাশ করে নিজ মহিমায়। নাম না-জানা অনুভূতি।

শূন্যতার মধ্যে একটু আশ্রয়। সেটাই খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ সলিচুড অফ ফুলফিলমেন্ট, ইন দ্য সোজার্ন অফ এক্সিসটেন্স। বাহিরের আমি ভেতরের আমিকে খুঁজছে।

***

হর্ন বাজতেই বুঝল, এ আর কেউ নয়, আন্টি। জানলায় মুখ বাড়িয়ে বলল "লেটস টেক ড্যাডস কার। দেয়ার ইজ এ ড্রাইভার"

"হোয়াই? ডোন্ট হ্যাভ ফেইথ ইন মাই ড্রাইভিং? হপ ইন। ইটজ ইউ অ্যান্ড মি টুডে। নো থার্ড পার্সন"

গাড়িতে উঠে শ্রাবস্তি বলল "ইওর শাড়ি লুকস গরজিয়াস। হোয়াটজ ইট কলড?"

মঞ্জরী সাদা খয়রি-পাড় কটকি শাড়ির দিকে তাকাল "তোমার পছন্দ? তুমি পরবে?"

শ্রাবস্তি অসহায়ভাবে বলল "আমি তো শাড়ি পরতে জানি না"

"আমি শিখিয়ে দেব"

কথাটা যে এভাবে ফলে যাবে বোঝেনি। সল্ট লেকের সিএ মার্কেটে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে মঞ্জরী বলল "এস"

"হোয়ার?"

আবরণী সকালে খদ্দের পায় না। দোকানদার শাড়ি সাজিয়ে মেলে ধরেছে।

"কোনটা পছন্দ?"

"আ... ন... টি..."

"কথা নয়। পছন্দ কর" বাধা দিল মঞ্জরী।

ঢাকাই, মটকা, কোটা। শ্রাবস্তির অস্বস্তি লাগছিল। ওর ছাপ দেখে মঞ্জরী বলল "ধরে নাও, আমি তোমার মা। কিংবা বাবা। মেয়েকে কিনে দিচ্ছি। না নিলে দুঃখ পাব"

কথা না বাড়িয়ে সিট বেল্ট লাগিয়ে বলল "হোয়ার আর উই গোয়িং?"

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে মঞ্জরীর জবাব "টু হেভেন অর হেল। ডস ইট মেক এ ডিফারেন্স? দ্য মোমেন্ট ইজ ইম্পরট্যান্ট। নট দ্য প্লেস"

"ইওর শাড়ি লুকস গরজিয়াস। শাড়িগুলো পরতে শিখিয়ে দেবে?"

স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে বলল “নিশ্চয়ই। বাঙালি হয়ে শাড়ি পড়বে না, তা কী হয়”

আন্টি ইস লুকিং ফ্যাবুলাস টুডে। নতুন বেশে। নতুন আভরণে। তার সমস্ত অস্তিত্বে নতুন রাগ। শ্রাবস্তিকে পাওয়ার আনন্দে?

নিবেদিতা সেতু দিয়ে গাড়ি ছুটছে। খুব খারাপ চালায় না মঞ্জরী। কলকাতার রাস্তায় শ্রাবস্তি গাড়ি চালাতে পারবে না। সো ক্রাউডেড। আন্টি ইজ অ্যাট ইজ। মনে পড়ল, প্যারিসের আর্ক ডি ট্রায়াম্ফে সাত বার ঘুরে শেষ অবধি লেনে ঢুকতে পেরেছিল। দিস ইজ অ্যাজ ব্যাড অ্যাজ প্যরিস। অ্যান্ড টক অ্যাবাউট রোম। কুডন্ট বি ওয়ার্সর। আন্টিকে ডিস্টার্ব করতে চায় না বলে, কথা বলল না।

আবছা স্মৃতি। এখন বিস্মৃতির অতলে। বাবা ড্রাইভ করছে। মা পাশের সিটে। পেছনে চিল্ড্রেন্স সিটে শ্রাবস্তি। উইকেন্ড ট্রিপ টু কান্ট্রিসাইডে। আবছা মিষ্টি অনুভূতির স্মৃতি। একটা ঘর। ছোট হলেও নিজস্ব। সম্পূর্ণতার আমেজ। সেই সম্পূর্ণতা আর এল না। আসবে কি না জানে না। তবুও না-পাওয়া অনুভূতিকে খুঁজে বেড়ানো। ছোটবেলার মেঘলা আকাশে তারা খোঁজার মতো। তারাটা কাছে এসেও ধরা দিচ্ছে না। তবুও ছোটবেলার মন তারাটাকে ছুঁতে চায়।

নিবেদিতা সেতুর ওপর, মঞ্জরী ডাইনে হাত বাড়িয়ে বলল “লুক অ্যাট দ্যাট টেম্পল। দক্ষিণেশ্বর মন্দির। রামকৃষ্ণদেবের পুজোর জায়গা। বাংলাতে বলি পীঠস্থান”

বার্কসায়ারে রামকৃষ্ণ মিশনে স্টিভের সঙ্গে দু-একবার গেছে। নামটা শোনা। কিন্তু সেখানে তেমন কিছু অনুভব করেনি। মনে হয়েছিল, ইংল্যান্ডের প্লেস অফ ইন্টারেস্টের মতো আরেকটা দেখার জায়গা।

শ্রাবস্তি ওদিকে তাকিয়ে বলল “আমরা কী ওখানে যাচ্ছি?”

চমকে উঠল মঞ্জরী ওর আধো বাংলায়। শ্রাবস্তি বাংলা বলার চেষ্টা করছে।

“না” এক অজ্ঞাত যাত্রায় নিয়ে যেতে চায়।

আপত্তি নেই। হারিয়ে আবার হারতেই তো সে ইংল্যান্ড থেকে বেরিয়ে পড়েছে। শোনা অথচ অজানা পৃথিবীর সন্ধানে। এই হারানোর মধ্যে যদি কিছু খুঁজে পাওয়া যায়, ক্ষতি কী? জলবেষ্টিত দ্বীপের আবদ্ধতায় জীবনকে দেখেছে। এই আবদ্ধতাই ব্রিটিশদের ইইসি থেকে আলাদা করে দিয়েছে সুপিরিয়রিটির মোহে। দে হ্যাভ মেন্টালি নট ইভলভ ফর্ম দেয়ার আইল্যান্ড মাইন্ডসেট। তার রেশ শ্রাবস্তি বুঝতে পারেনি। এটুকুর মধ্যেই খুঁজে পাচ্ছে আরেক পৃথিবীর রস।

সেই সকালে চা খেয়ে বেরিয়েছে। পেটে ছুঁচো ডন মারছে। আন্টিকে বলল “আমার খিদে পেয়েছে”

খিদে মানে রেস্তরাঁ। ইংল্যান্ডের মতো এখানে মোটরসাইড ট্র্যাভেল লজ নেই। অগত্যা মোটামুটি ছিমছাম হোটেল। মিনারেল ওয়াটারের বোতল বগলে গুঁজে বলল "আই অ্যাম সেপটিক্যাল অ্যাবাউট দ্য ওয়াটার"

"ইন্টারন্যাশনল স্ট্যাটিসটিক্স অনুযায়ী ইউকের জল বেশি পলিউটেড বিকস অফ কেমিক্যাল ওয়েস্টস। তুমি যখন অভ্যস্ত নও, বেটার ক্যারি দ্য মিনারাল ওয়াটার"

ওয়ান্টান সুপ অ্যান্ড গার্লিক চিকেন দুটোই সুস্বাদু। খাওয়া শেষে শ্রাবস্তি জিজ্ঞেস করল "হোয়ার ইজ দ্য ল্যু?"

বেয়ারা বোঝেনি। মঞ্জরী বাংলা করে জিজ্ঞেস করল "বাথরুমটা কোথায়?"

দেখিয়ে দিল। রেস্তোরাঁর বাইরে। শ্রাবস্তি চলে গেল। টুম্পাকে নিয়ে কতদিন এভাবে এখানে-ওখানে খেতে চলে গেছে। অমিতের সময় ছিল না, মেয়ের বায়না-আবদারের দিকে চোখ ফেরাবার। খাওয়াটা আসল নয়। এই ছোট ছোট অভিব্যক্তিতে মেয়ের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল নিবিড় বন্ধন। তার রেশ আজও তাড়া করে বেড়ায় অবচেতনে। সেখানেই খুঁজে পায় অরিজিতের না-গাওয়া রাগ। সুর এক। পুরনো পাওয়ার স্মৃতি, এখন শূন্যতার গীতি। বাকি জীবনের গতি। বেহাগের সুরের মূর্ছনা মালকোষের মধ্যে সূর্যোদয়ের প্রথম দ্যুতি।

"হেল্প! হেল্প! হেল্প! আ... ন... টি..."

শ্রাবস্তির গলা না? চেয়ার ছেড়ে ছুট দিল বাথরুমের দিকে। পাশাপাশি দুটো বাথরুম। ছেলেদের ও মেয়েদের। একদল যুবক শ্রাবস্তিকে ঘিরে। তার মাঝ থেকে শ্রাবস্তির করুণ আর্তনাদ। ওদের ঠেলে, শ্রাবস্তিকে জড়িয়ে বলল "কী হয়েছে?"

ভয় কান্না মেশানো গলায় শ্রাবস্তি বলল "দে ওয়ার ট্রাইং টু মলেস্ট মি"

কোনও কথা নয়। ওদের মধ্যে একজন নেতা গোছের, সামনে দাঁড়িয়ে। চটি খুলে সপাটে মারল গালে। রাগে সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে। যা হয় হোক। ভাবার সময় নেই। ওদের দিকে তাকিয়ে "লজ্জা করে না তোদের? বাচ্চা মেয়ের পেছনে লাগতে? দেখি কোথায় কে মরদের বাচ্চা। কচুকাটা করে ছাড়ব"

মধ্যবয়সি মহিলার দেমাক দেখে ঘাবড়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত। তারপর স্বাভাবিক পুরুষালি ঢঙে ওই নেতা খেঁচিয়ে উঠল "বেশি রং বেড়েছে। দেখে নে তো শালিকে"

কথা শেষ হওয়ার আগে, ওর অন্ডকোষে হাটু দিয়ে লাথি "দেখি, কে দেখবে! সাহস তো কম নয়। আমার মেয়েকে ছিঁড়তে এসেছিস"

শ্রাবস্তি এক কোণে দাঁড়িয়ে আন্টির 'রণং দেহি' মূর্তি দেখছে। মঞ্জরীর অন্য এক মূর্তি। দুর্গা নয়। কালীমূর্তি। দক্ষযজ্ঞে নেমেছে। কিছুই পরোয়া করে না। শ্রাবস্তির ভয়ে কাঁপছে। ইফ সি কুড ডু এনিথিং, সি উড। বাট সি হ্যাজ নেভার ফেসড সাচ এ সিচুয়েশন বিফোর। নিউ ইয়র্কের ব্রংকসে একজন রিভলভার

উচিয়ে টাকা চেয়েছিল। বিনা বাক্যব্যায়ে ২০ ডলার দিয়ে দিয়েছিল। নিগ্রো ছেলেটা ডলার নিয়ে কেটে পড়েছিল।

গুরুকে মার খেতে দেখে, কয়েকজনকে এগিয়ে আসতে দেখে, মঞ্জরী ছুটে গেল শ্রাবন্তির দিকে। ওর হাত থেকে ব্যাগের ঝিপ খুলে এয়ারোসল গানটা ওদের মুখে স্প্রে করল। মুহূর্তে জ্বলে উঠল চোখগুলো। মুখের রং পাল্টে গেল। বুঝতে পারেনি কী হচ্ছে। নির্ভয়ে মঞ্জরী ছেলেটার সামনে গিয়ে বলল ‘‘আর লাগবি আমার মেয়ের সঙ্গে?’’

অবাক মস্তানের দল মঞ্জরীর মাতৃরূপকে ভয় পেতে শুরু করেছে। দেবি যখন তাণ্ডবে মেতেছে, রুখবে কে? কিছুরই পরোয়া করে না। ততক্ষণে নাটক-চিৎকারে ভিড় জমতে শুরু করেছে। গুরু বুঝতে পারছে, ওরা কোণঠাসা। নীচটা ব্যথায় জ্বলছে। অন্যদের চোখগুলোও। কী স্প্রে করল? বাপের জন্মে দেখেনি।

নিজেকে গুটিয়ে বলল ‘‘চল চল, একদিন শালিকে দেখে নেব। আমার নাম কেষ্ট পোদ্দার। এ তল্লাটে সবাই আমায় এক নামে চেনে।... তোকে ছেড়ে দেব না। দেখি শালা কে তোকে বাঁচায়? কেষ্ট পোদ্দারের নামে এ তল্লাটে বাঘে-গরুতে জল খায়। জিজ্ঞেস করে নিস’’

একসঙ্গে বেড়িয়ে গেল।

জবাব না দিয়ে, শ্রাবন্তিকে জড়িয়ে রেস্টুরেন্টের দিকে এগোল ‘‘ডোন্ট ওয়ারি। ইউ আর ফাইন। অ্যাজ লং অ্যাজ আই অ্যাম হিয়ার, নো বডি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যান টচ ইউ’’

ভিড়ের মধ্যে থেকে নানান প্রশ্ন ‘‘কী হয়েছিল দিদি?’’‘‘আপনি ঠিক আছেন তো?’’‘‘জানেন ওরা এ-পাড়ার দাপটে মস্তান’’‘‘ওদের সঙ্গে না লাগলেই ভালো করতেন’’

মঞ্জরী ওদের কথার জবাব না দিয়ে, বেয়ারার দিকে টাকা ছুড়ে, চেঞ্জের অপেক্ষা না করে, গাড়ির ড্রাইভিং সিটে। পাশে শ্রাবন্তি। হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে নতুন করে বুকে আগলে নিয়েছে।

***

আস্তে আস্তে আকাশের আলো কমে যাচ্ছে। একটা দুটো করে তারা ফুটে উঠছে আকাশের ক্যানভাসে। গঙ্গার জল ধীরে ধীরে কালচে হয়ে যাচ্ছে। দূরে দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে একটা নৌকো পাল তুলে ভেসে আসছিল। সেটা ক্রমশ জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। রাতের আঁচল আস্তে আস্তে হাওয়ার টানে ছড়িয়ে পড়ছে। ধীর পায়ে সন্ধ্যা নামছে। ক্লান্ত অবসন্নতার শিথিল আচ্ছাদন বিছিয়ে। আকাশের এঘর, ওঘর, সেঘরের দরজা খুলে সব ঘরেই একটা একটা করে মৃদু তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

শ্রাবস্তি মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। ইংল্যান্ডে এমন করে সন্ধ্যা আসে না। অন্তত সে যেখানে থাকে, সেখানে নয়। শ্রাবস্তির মনে হল, এই সন্ধ্যার সঙ্গে মায়ের কোথায় যেন একটা মিল আছে। সারাদিন হুটোপাটি করে বাচ্চারা শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় ঘরে ফিরছে। মা তাদের আসার পথ চেয়ে ঘরে ঘরে দিয়া জ্বালিয়ে রাখছে। কখন ওরা এসে মায়ের কোলে লুটোপুটি খাবে। হঠাৎ ওর মনে হল, সন্ধ্যার আঁধার যেন মায়ের ঘন কালো চুল। মনে পড়ল, আগে ওর মায়েরও লম্বা চুল ছিল। হঠাৎ কী যে হল। বোধহয় সাহেবদের দেখে, দুম করে একদিন কেটে ফেলল। মায়ের কথা মনে পড়তেই, ওর মনে একটা অদ্ভুত আবেগের সৃষ্টি হল। অভিমান, রাগ, দুঃখ, হতাশা মিলে ভীষণ মনখারাপ করা অবস্থা।

আড়চোখে পাশে বসা মঞ্জরীর দিকে তাকাল। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মঞ্জরীর মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। চুলগুলো হালকা হাওয়ায় উড়ছে। সামনে গঙ্গার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্থির বসে। শ্রাবস্তির হঠাৎ মনে হল, মঞ্জরী আর সন্ধ্যা যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তার দুচোখ হঠাৎই ভীষণ জ্বালা করে উঠল। চোখে জল এসে গেল। অব্যক্ত ব্যথায় ইচ্ছে হল মরে যেতে। পাশ ফিরে মঞ্জরীর দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল। জল ভরা চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টিতে, আধো অন্ধকারে ওর মনে হল, মঞ্জরীর শরীরটা যেন অন্ধকারের সঙ্গে গলে গলে মিশে যাচ্ছে।

গোধূলির শেষ রশ্মি তখন গঙ্গার ওপর বিদায়বেলার শেষ আলোর আভা ছড়িয়ে ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। রাগ ভূপালির শেষ রেশটা টেনে দিচ্ছে অস্তগামী সূর্যের নিঃশেষ হয়ে যাওয়া আলোর দিগন্তে। বর্ণহীন অন্ধকার সেজে উঠছে নতুন বর্ণের আভরণে। কালো শাড়িতে ঢাকা ঘোমটা তোলা বধূ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে গিয়ে থমকে গেছে। ওপাশের দাওয়ায় শিশুটির কান্না তুলসীতলার প্রাঙ্গণ থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছে উঠোনের আঙিনায়।

সেই কান্না মঠের সন্ধ্যারতির কাসরঘণ্টার থেকেও মনকে বেশি করে নাড়া দেয়। এ তো ছোট্ট অবলা শিশুর করুণ মিনতিতে তার মাকে কাছে পাওয়ার ডাক। এখানেই রয়েছে জীবনের আসল সন্ধ্যারতি। পূজার নৈবেদ্যে নয়। কোথায় মিলেমিশে গেছে না-শোনা অন্তরের ঝংকারে। সেই ঝংকার শুনিয়ে যাচ্ছে, না দেওয়া পূজার মন্ত্রঃ

বরণ করি আমি তোমায়
আমার নিজের না পাওয়া
প্রদীপের পেছনে পড়ে থাকা
একান্ত নিভৃত অন্ধকারে।
তোমায় আমি গ্রহণ করি

আমার শেষ রাগিনীর

একাকী নিঃশব্দ ঝংকারে।

তুমি যেই হও না কেন তুমিই তো আমার পূজা।

তুমি যেই হও না কেন তুমিই আমার রাজা।

তুমি যেই হও না কেন তুমিই তো আমার তৃষা।

শ্রাবস্তি চলতে চলতে আজকের মঞ্জরীকে দেখে হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়েছে। রঞ্জিতা জন্মদাত্রী মা। মঞ্জরী জন্মদাত্রী না হলেও, আরেক মা। শ্রাবস্তি এসেছে বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। তার আগেই পেয়ে গেল আরেক ছন্দ। মাতৃত্বের রূপ, রস, গন্ধের অন্য আনন্দ।

ঢলে পড়া সন্ধ্যার অন্ধকারে চেয়ে, আবছায়া সিল্যুট মঞ্জরী জীবন্ত অন্য রঙে। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া ক্ষণ। না-পাওয়ার শুভ আলোড়ন। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল অশরীরী মঞ্জরীকে। তখনই মঞ্জরী ফিরে বলল ‘‘কী হয়েছে?’’

“হোয়াই ডিড ইউ টেক দ্যাট রিস্ক ফর মি?”

“রিস্কস আর রেলেটিভ। ইউ আর দ্য সিওরিটি অফ মাই লাইফ”

কী বলছে আন্টি! শ্রাবস্তির গুলিয়ে যাচ্ছে। মাথা কাজ না করলেও, মন করছে। অনেক দিনের, না-পাওয়া স্বপ্ন ধরা দিচ্ছেঃ

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার

হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর

মঞ্জরী তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল ‘‘তুমি কী ওই তারাদের নাম জানো?’’

“না”

“অনেক নাম আছে। বাংলায় নাম দিয়েছি স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, অরুন্ধতী। সব মিলিয়ে সাতাশটা। কিন্তু দিক খোঁজার জন্য আমরা খুঁজে বেড়াই একটাই তারা। ধ্রুবতারা। ইংরেজিতে দ্য নর্থ স্টার”

ছোটবেলার শোনা রাইমটা পাশে নেমে এসেছে, জানা বা অজানা কোনও এক তারা হয়ে। যাকে এতদিন খুঁজছিল। নাম যাই হোক না কেন। সেই তো তার অবলম্বন। তার নর্থ স্টার! বেঁচে থাকার ধ্রুবতারা।

দ্য সঙ অফ হার লাইফ।

দ্য রিদম অফ হার ডিসায়ার্স।

দ্য সোলেস অফ হার মেলাঙ্কলি।

স্টিভ নয়। মামও নয়। ইট ইজ হার আন্টি। হু হ্যাজ ফিলিংস ফর হার। সি হ্যাড সিন দ্যাট হোয়েন দ্য বয়েস ওয়ার ট্রাইং টু মলেস্ট হার।

ঠাকুরের বিশাল মন্দিরের পাশে মায়ের মন্দির। আকারে ছোটই। এরও বিশেষত্ব আছে। হিন্দু মন্দিরগুলো সাধারণত দক্ষিণ বা পশ্চিমমুখি হয়। মায়ের মন্দিরটি নিয়মের বাইরে। পূর্বমুখি। মা গঙ্গা দেখছেন অপলক দৃষ্টিতে। মায়ের গঙ্গা খুব প্রিয় ছিল। তাই মন্দিরটি নিয়ম ভেঙে ওই ভাবেই তৈরি। ছোট্ট শান্ত মন্দিরটিতে জাঁকজমক নেই। মা সবার মা। মা শান্তভাবে বসে সন্তানদের জন্য অপেক্ষা করছেন। মনটা জুড়িয়ে গেল। চুপ করে বসে দুচোখ বুজতেই, ভেসে উঠল মায়ের শান্ত স্নিগ্ধ মুখচ্ছবি। ভেতরে কে যেন ডেকে উঠল 'আমি সবারই মা। সত্যিকারের মা'

পেছনে কুলকুল করে বয়ে চলেছে ভারতবর্ষের প্রাণদায়িনী সুরধুনী গঙ্গা। সামনের ঠাকুরের মন্দির থেকে ভেসে আসছে, মনপ্রাণ ভরিয়ে দেওয়া গুরুগম্ভীর স্তোত্র খণ্ডন ভব বন্ধন। মানে বুঝতে পারছে না। তবু সেই স্তোত্র ভেতরে ওঙ্কারধ্বনি তুলছে। এরকমই কী ছিল প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের আশ্রম? ওই ওঙ্কারধ্বনিতে রঞ্জিতার সুর শুনতে পারছে না। অন্য মায়ের সুর। কে সে? ঝাপসা ছবিটা আকার নিচ্ছে, একটা পার্থিব অবয়ব। কোটা শাড়ি পড়া অস্পষ্ট সিল্যুট দেখছে। আর কে? সেখানে একজনই বসে। তার আন্টি।

সেই স্তোত্রের ফাঁকে, পেছনে মঠের থেকে ভেসে আসছে কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ। ঢং... ঢং... ঢং... শ্রাবস্তির মনে পড়ল চার্চে স্টিভের সঙ্গে বিয়ে

ইন রিচনেস অর ইন হেলথ

ইন সিকনেস অর ইন পর্ভাটি

আন্টিল ডেথ ড্যু আস অ্যাপার্ট

সামাজিক শেখানো প্রহসনগুলো বুকে থাপ্পড় মারছে। সি ইজ ইওর মাম, জি ইজ ইওর ড্যাড, হি ইজ ইওর ল্যফুলি ওয়েডেড হাসব্যান্ড।

কোথায় রঞ্জিতা? কোথায় মঞ্জরী? একজন জন্মদাত্রী। আরেকজন জীবনদায়িনী। একজন সমাজের ঘেরাটোপে বন্দি। অন্যজন অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধতে চাইছে। বন্ধনহীন বাহুডোরে। মঞ্জরীকে জিজ্ঞেস করল ''ড্যু ইউ বিলিভ ইন দ্য ইনস্টিটিউশন অফ ম্যারেজ?''

চমকে উঠল মঞ্জরী। কী বলতে চাইছে? ঘুরিয়ে বলল ''এভরি রিলিজন, কালচার, সিভিলাইজেশন হ্যাজ সেট আপ সার্টেন নর্মস্ টু লিভ ইন সোসাইটি। যদি তুমি আমার মতামত জানতে চাও, আমি বলব, আই

রেসপেক্ট অল দ্য নর্মস। বাট আউটসাইড দ্য প্যারাডাইমস অফ দিজ নর্মস, রামকৃষ্ণস ওয়াইফ সারদাদেবী টট আস দ্য ইউনিভার্সাল ভ্যলুস অফ মাদারহুড''

"হোয়াট ডস দ্যাট মিন?"

"তাঁর নিজের কোনও সন্তান ছিল না। পৃথিবীর সবাইকে নিজের সন্তানের মতো দেখতেন"

শ্রাবস্তির মনে হল, মঞ্জরী কিছু বোঝাতে চাইছে। বাজিয়ে দেখার জন্য বলল ''ড্যু ইউ মিস ইওর ডটার?''

"আগে করতাম। এখন আর করি না। ভেবে কী হবে? পেছন ফিরে ভেবে লাভ নেই। যা অতীত তা ফিরে আসবে না। বিশেষ করে আমার সামনে যখন একটা সুইট প্রেজেন্ট"

রাগ ভুপালির ঝালার তরঙ্গ শ্রাবস্তির অন্তরে। এখন আর মঞ্জরী আরেক মহিলা নয় - সারদা মায়ের মতো, আরেক মা। সারা পৃথিবীর মাতৃত্ব ওর মধ্যে লুকিয়ে কি না, জানে না। নিজের অগোচরে কোথায় স্থান করে নিয়েছে জন্মদাত্রী মায়ের ছোটবেলার বন্ধু।

আজ সে বেলুড় মঠে বেড়াতেই আসেনি। এসেছে তার হারিয়ে যাওয়া সত্তাকে নতুন আভরণে সাজাতে। সন্ধের কাঁসরঘণ্টা বুঝি সেই বরণের গীত গাইছে। তার অন্তরের দেবীকে বোধন করতে, নাম না-জানা নতুন ছন্দে।

দুচোখ জলে ভরে গেছে। কী খুঁজতে এসেছিল? আর কী পেল? কথাটা বোধহয় ঠিক।ইউ লুজ সামহোয়্যার, ইউ উইন এলসহোয়্যার। চাওয়া-পাওয়াটা গুলিয়ে ভেতর থেকে অস্ফুট কান্নার ঝালা হয়ে আছড়ে পড়ছে। সেই কান্না দুঃখের নয়। পূর্ণতার।

মঞ্জরীকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল '' মা... ম''

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না মঞ্জরী। চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়ছে। চাপা মাতৃত্ব ভাষাহীন চোখের জলের প্লাবনে আছড়ে পড়ছে। সে কোনওদিনই বিশ্বাস করেনি টুম্পা নেই। আজ ঈশ্বর, বহুদিনের হারানো টুম্পাকে নতুন রূপে তার কোলে নিয়ে এসেছে। নতুন প্রতিমার জীবন্ত কায়ায়। মায়া-কায়া মিলেমিশে একাকার, অশ্রুনদীর শেষ ঝালার ঐকতানে।

শ্রাবস্তিকে বুকে টেনে বলল ''মাই সুইট বিউটিফুল ডটার''

ভাষা থেমে গেলেও হৃদস্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর। একটা সুর মনের গভীরে আলোড়ন তুলছে। কী সেই সুর? ওরা জানে না। শুধু জানে, সেই উদাসী সুর মনের কোথাও ছন্দ ছাড়াচ্ছে। দেশ, কাল, স্থান, সময়, সম্পর্কের বেড়াজালের বাইরে অনুভূতির অভ্যুদয়। অন্তরের শব্দহীন বাণীর অন্য মূর্ছনা। সব হারানোর মধ্যেও নতুন করে পাওয়ার অনুক্ষণ। নব-জীবনে নতুন জাগরণ।

***

কম্পিউটারের সামনে বসে সামনের সপ্তাহের ব্রিফটা রেডি করবে বলে ম্যাকবুক-প্রো খুলে বসেছিল অরিজিৎ। মন বসছিল না। মনটা এখানে-ওখানে উড়ে বেড়াচ্ছিল। সাত-সমুদ্র তেরো নদীর পাড় থেকে সল্ট লেকের বাড়ির শ্রাবস্তির চারধারে। মানুষটা এক। কিন্তু এই সতেরো বছরে কত পাল্টে গেছে। ছোট্ট শ্রাবস্তি আজ বড় হয়ে গেছে। এখন রাতে বায়না ধরে না। ফিডিং বটল হাতে সারা-রাত বসে থাকতে হয় না। এখন তাকে ইসপস ফেবলস পড়ে শোনাতে হয় না। এখন জীবনের ফেবল শুনতে চায়। অরিজিতের কিছু বলার নেই। জীবনের ফেবল কী কেউ শেখাতে পারে? শুধু দেখাতে পারে।

ফাইলটা খুলতে পেছন থেকে ভেসে এল শ্রাবস্তির গলা ‘‘ড্যাড, আর ইউ বিজি?’’

“নট অ্যাট অল” ঘুরে দেখল শ্রাবস্তি দাঁড়িয়ে। হালকা খয়েরি হাফ-প্যান্ট, সাদা টপস। প্রসাধনহীন শ্রাবস্তি যেন বাড়িরই একজন। বিদেশিনি নয়। তার হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট মেয়েটি “ভেতরে এস। তোমার জন্য কফি করে আনি” অরিজিৎ উঠে পড়ল।

অরিজিৎকে বেরতে দেখে শ্রাবস্তি বলল ‘‘দেয়ার আর প্লেন্টি অফ পিপল অ্যাট হোম। হোয়াই ইউ?’’

“ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড” কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

শ্রাবস্তি স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসে কম্পিউটারের ডকুমেন্টসগুলো দেখছিল। চোখ পড়ল ‘শ্রাবস্তি’ নামের ফোল্ডারে। স্বাভাবিক কৌতূহলে, ক্লিক করতেই ফাইলগুলো দেখতে পেল। অসংখ্য ছোটবেলার ছবি। খুলে দেখছে। জন্মের সময়কার, বাবা ফিডিং বটল হাতে, বাবার কোলে আকাশে তুলে খেলছে। এত কম চুল ছিল সেই বয়সে? নাউ সি হ্যাজ টু ট্রিম হার হেয়ার এভরি থ্রি মান্থস। অস্পষ্ট পুরোনো স্মৃতি ফিরে আসছে। বুকের ভেতর নাড়াচাড়া। ছুঁতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। সেসব অস্পষ্ট স্মৃতির মধ্যে ছবি - মেমরিজ অফ হ্যাপিনেস অ্যান্ড ফুলফিলমেন্ট।

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল খুলতেই চোখের সামনে শ্রাবস্তিকে লেখা চিঠি।

৭ জানুয়ারি ১৯৯৪। তার দশম জন্মদিন। তাকে লেখা বাবার চিঠি। লেখাই হয়েছে। সে পায়নি। পড়তে লাগল বাবা কী লিখেছিল।

“মাই লাভিং শ্রাবস্তি। অন দিস ডে ইউ আর টেন ইয়ার্স ওল্ড। ইউ মাইট হ্যাভ ফরগটেন মি। বাট আই কান্ট টেক মাই আইস অফ ইউ। স্টিল ইউ আর পার্ট অফ মাই বিইং। এ ফিউ মান্থস ব্যাক আই ওয়াজ হ্যাভিং ডিনার অ্যালোন অ্যাট দ্য রেস্তোরাঁ ট্যানজারিনস। ড্রেডফুলি মিসিং ইউ। ইট রিমাইন্ডেড মি অফ দ্য ডিনার উই হ্যাড অ্যাট আন্টালিয়া ইন নটিংহ্যাম” ঝাপসা মনে পড়ছে সেই উইকেন্ডের কথা। খাবার কথা

নয়, মায়ের কথাও নয়। সেদিনের সেন্স অফ টুগেদারনেস। তার একটা পৃথিবী ছিল। সে হারিয়েছে। পড়ে যাচ্ছে "লাস্ট উইক আই ওয়েন্ট টু আরাবারি, এ ফরেস্ট বাংলো ইন ওয়েস্ট মেদিনীপুর। ইট রিমাইন্ডেড মি অফ দ্য ডেইস উই স্পেন্ট ইন ব্ল্যাক ফরেস্ট। হোয়েন ইউ ক্যুড জাস্ট অ্যাবাউট ওয়াক"

সে স্মৃতিও মনে নেই। কিন্তু ড্যাড আজও সে স্মৃতি আঁকড়ে বসে। ড্যাড ওয়াস জাস্ট নট এ নেম। একটা অনুভূতি, যা আগে কখনও অনুভব করেনি। ডেভিড ওয়াজ অ্যান অ্যাকসেপ্টেড এন্টিটি। কিন্তু অনুভূতিটা পড়ে ছিল অন্য কোথাও। অন্য কোনওখানে। আজ কম্পিউটারের স্ক্রিনে সেই আবছা না-চেনা অনুভূতিটা নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। বাবা আগে ছিল একটা নাম। ক্রমশ বুঝছে বাবা না-দেখা রক্তমাংসের মানুষ। অনুভূতিটা না-শোনা লয়। একই সূত্রে বাঁধা। জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্টের স্মৃতি মনে নেই। কিন্তু ড্যাডের এই অভিব্যক্তি বুকের ফাঁকা জায়গায় আলোড়ন তুলছে। মনে পড়ল, শেষবার ড্যাড যখন ইংল্যান্ড থেকে চলে এল, কান্না ভেজা গলায় বলেছিল "আই উইল মিস ইউ ড্যাড"

ড্যাডের দীর্ঘশ্বাস অনেক কথা বলে দিয়েছিল। সেদিন বোঝেনি। আজ সেই আবছায়া স্মৃতি শূন্যস্থানে তরঙ্গ তুলছে। মন্দারমণিপুরের হাল্কা ঢেউয়ের মৃদু তরঙ্গ নয়। আছড়ে পড়া উদ্দাম ঘূর্ণিঝড়।

শ্রাবস্তি পড়ে চলেছে "আই ড্যু নট নো হাউ ইউ আর ফেয়ারিং ইন ইওর একজ্যামস। আই অ্যাম নট দেয়ার টু টেক কেয়ার অফ ইওর ম্যাথস। বাট নেক্সট ইয়ার ইউ হ্যাভ টু টেক ইওর গ্র্যামার স্কুল একজ্যামস। শ্রাবস্তি, আই ক্যুড অ্যাফর্ড ইওর পাবলিক স্কুল আনটিল নেক্সট ইয়ার। ফর হুইচ আই হ্যাভ কেপ্ট মানি ইন দ্য ব্যাংক সেলিং দ্য লাস্ট বিট অফ ইনসিওরেন্স পলিসি আই হ্যাড"

শ্রাবস্তি থামল। এসব তো জানা ছিল না। মা তো কোনওদিন সেকথা তাকে বলেনি। জানতই না, বাবা তার পড়াশোনার সব বন্দোবস্ত করে রেখে এসেছে। মা কেন বলেনি? বাবাকে তার জীবন থেকে মুছে ফেলার জন্য? চোখে জল। বাবা ওয়াজ এ মিস্ট্রি টু হার। কর্তব্যহীন বাবা। পিতৃরূপ ধীরে ধীরে স্পষ্ট। মায়ের দেখানো রূপ নয়। অপরিচিত অথচ কাছের মানুষের।

আরেকটা চিঠি। তার চৌদ্দ বছর বয়েসে জন্মদিনে লেখা। ফাইলটা খুলল "আই ডোন্ট নো হাউ ইউ আর পারসিউয়িং ইওর স্টাডিস। হ্যাভ ইউ গট ইন্টু দ্য গ্র্যামার স্কুল? ডোন্ট নো। ইফ আই ওয়ার দেয়ার, আই ক্যুড হ্যাভ টেকন কেয়ার অফ ইওর স্টাডিস"

ফাইলের ডেটগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে প্রত্যেক জন্মদিনে বাবা তাকে একটা করে চিঠি লিখেছে। চিঠি ওই তারিখের। ডেট পাল্টানো হয়নি।

সাহস সঞ্চয় করে মাকে দাবি করতে পারেনি ওয়ান্ট টু মিট মাই ড্যাড। বলেও ছিল। মায়ের মুখ-ঝামটা "হোয়াট ফর? ওয়ান হু হ্যাজ ডেসার্টেড ইউ?"

সেটাই জেনেছে, বিশ্বাস করেছে। সেই বিশ্বাসে ভর করে নিজের দুনিয়া গড়বার চেষ্টা করেছে। ক্রমশ ড্যাড মানুষ থেকে নামে রূপান্তরিত। যার পদবি আজও বহন করছে। এতদিন পর্যন্ত এইটুকুই ড্যাডের অস্তিত্ব ছিল। আজ বুঝছে, রক্ত-মাংসের মানুষটাকে। এসেছে কৈফিয়ত চাইতে। আজ সে প্রশ্নও হারিয়ে গেছে। মাতাল ঢেউটা অনুভূতির চূড়ায় ভলক্যানোর খাঁজে আঘাতে ভরিয়ে দিচ্ছে লেলিহান রোষাগ্নিকে।

আঠারো বয়সের জন্মদিনে ''শ্রাবস্তি, আই অ্যাম রিয়েলি ওয়ারিড অ্যাবাউট ইউ। আর ইউ ইন দ্য রাইট পাথ? রিমেম্বার, নো ম্যাটার হুইচ পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ মে লিভ, উই হ্যাভ এ হেরিটেজ। এ রিচ ট্র্যাডিশন। ডোন্ট সোয়ে উইথ দ্য টাইড অ্যান্ড লুজ ইওরসেলফ। ডোন্ট মিক্স উইথ দ্য রং ওয়ান্স অ্যান্ড স্পয়েল ইওর লাইফ''

বাবার সাবধানবাণী।

ওয়াজ স্টিভ রং অর ব্যাড? প্রব্যাবলি সি ওয়াজ নট প্রিপেয়ার্ড ফর স্টিভ। মা শুধু তার সামাজিক পরিচয় দেখেছিল। আর্থিক প্রাচুর্য। একবারও ফিরে তাকায়নি শ্রাবস্তি মানুষটার দিকে। ডেভিডের মতো স্টিভও যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। ওপরে ওঠার সোনার চাবিকাঠি। তাই আজও ডেভিডের বিশাল প্রাসাদে লারপোসের বড়ি খেয়ে রাতের সুখনিদ্রা কিনে নিতে হয়। মানুষটা অতৃপ্তির প্রতিচ্ছবি। অতৃপ্তি সুখ দিতে পারে, শান্তি দিতে পারে না।

"হিয়ার ইউ আর" চায়ের কাপের ট্রেটা টেবলে রেখে বাবা বলল।

শ্রাবস্তির ভেতরে তখন ঘূর্ণিঝরের তাণ্ডব। চুলোয় যাক চা। চুলোয় যাক খাওয়া। বুকের কান্না বাঁধ মানছে না। উঠে আঁকড়ে ধরল বাবাকে। হাউহাউ করে কাঁদছে। বুকে চেপে ধরেছে অরিজিৎ বসুকে। মুখ লুকিয়ে বহুদিনের জমে থাকা চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে পাঞ্জাবিটা। বাঁ হাতে মেয়েকে আগলে, ডান হাতটা চুলের মধ্যে বুলিয়ে দিচ্ছে। কাঁদুক। কেঁদে নিক। অনেক বছরের জমে থাকা চোখের জলে ভাসিয়ে দিক সমস্ত সত্তাকে। অরিজিতের চোখেও জল। আঠারোটা বছর ধরে একা নিভৃতে বহন করে চলেছে। আর রুখতে পারবে না। শীতের রাতেও দু-চোখ বেয়ে নেমে এসেছে বর্ষার উপচে পড়া অশ্রু-প্লাবন।

ওরা জানে না চা কখন ঠান্ডা হয়ে গেছে। খরাতপ্ত হৃদয় চার-চোখের অশ্রুধারার প্লাবনে শান্তির মেঘমল্লার গাইছে।

মেয়ের মাথায় হাত রেখে বলল ''গড ব্লেস ইউ মাই চায়েল্ড''

***

চলন্ত ট্রনের জানলার বাইরে, সুজলা সুফলা সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়ে, শ্রাবস্তি বলল "হোয়ার আর উই গোয়িং?"

হাওয়ায় প্রশ্ন। অরিজিৎ কিংবা মঞ্জরী যে কেউ উত্তর দিতে পারে। কথাটা লুফে নিয়ে অরিজিৎ বলল ''প্রশ্ন করেছিলে তুমি কে? কী তোমার আইডেন্টিটি? তোমায় বলেছিলাম, বলব না দেখাব। টুক ইউ টু লোয়েস্ট পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া, দ্য বিবেকানন্দ রকস। মাদার ইন্ডিয়াকে দেখিয়েছিলাম। মনে আছে?''

জানলার বাইরে থেকে চোখ ফেরাল শ্রাবস্তি। ফার্স্ট ক্লাস এসি কম্পার্টমেন্টের নরম গদিতে বসে ভারতকে দেখছে। ট্রেনের মৃদু কম্পনের ছন্দে, মনের আনন্দে। বহুবছর আগের ঝাপসা স্মৃতিগুলো ফিরে আসছে। ড্যাড, মাম অ্যান্ড সি। মাঝে কত বছর। জীবনের রং কত বদলে গেছে। ইংল্যান্ডের কান্ট্রিসাইড থেকে বাংলার সবুজ মাটি - কত দূর। কিংবা নয়। একসঙ্গে পথ চলাই, হারিয়ে যাওয়া ছন্দ আঁকছে মনে। হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন। স্থান-কাল-মানুষ পালটালেও মনে আরেক ছন্দ।

"ইয়েস"

"নাউ উই আর গোয়িং টু সি দ্য রিচ হেরিটেজ অফ মাদার ইন্ডিয়া। বেনারস, দ্য সারপ্রাইজিং মডেল অফ হিন্দু কালচার। সারনাথ, দ্য প্লেস হোয়ার বুদ্ধিজম টুক ইটস বার্থ"

"হাউ ফার আর দ্য টু?"

"বেশি দূর নয়। এ ডিসট্যান্স অফ টেন কিলোমিটারস। পাশাপাশি দু'জায়গায় দুই ধর্মকে দেখতে পারবে। হ্যাভ ইউ হার্ড অফ গৌতম বুদ্ধ?"

"ইয়েস, অফ কোর্স। হি ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ বুদ্ধিজম"

"বুদ্ধিজমের জন্মদাতা গৌতম বুদ্ধ। মা মায়া ওনার জন্মাবার সাত দিনের মধ্যে মারা জান। হিস স্টেপমাদার মহাপ্রজাপতি ওয়াজ গিভেন টু লুক আফটার হিম। কিন্তু রিয়েলিটিতে তার পিসি গৌতমীর কাছে মানুষ। আমরা সবাই এক-একজন মুনি-ঋষির ডিসেনড্যান্ট। আমরা বসু-রা গৌতম মুনির বংশধর। গৌতম গোত্র"

"গোত্র?" শ্রাবস্তি বুঝতে পারছে না।

"ইয়েস। ভারতীয় কালচারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পূর্বপুরুষকে স্মরণ করি। আমাদের বসুদের ক্ষেত্রে গৌতম মুনিকে"

"দ্যাট মিনস আওয়ার ফোর ফাদার আর দ্য সেম?"

"প্রেসাইসলি। গৌতম মুনি"

অস্তিত্বের ইতিহাসকে কাছ থেকে দেখে চাঞ্চল্য অনুভব করছে। অরিজিৎ ছোটবেলার গল্প বলার দিনে ফিরে গেছে ''ইন প্রব্যবলি ৫৬৩ বিসি বিটুইন ইস্ট নেপাল অ্যান্ড নর্থ বিহার, নদীর পারে কপিলাবস্তু বলে

শাক্য ট্রাইবদের ছোট্ট রাজত্ব ছিল। রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন। নদীর ওপারে কোল ট্রাইব থাকত। ওদের রাজধানী ছিল দেবদহ। দুই ট্রাইবরা সব সময় ঝগড়া করত''

মঞ্জরী অবাক। এত জানল কোত্থেকে? ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বহুবছর ইংল্যান্ডে থাকা অরিজিৎ বসুকে দেখছে অন্য রূপে। আগে দেখেনি। জানে ওর বই পড়ার শখ। এত তত্ত্ব জানা সেটা অজানা। শ্রাবস্তি ফিরে গেছে ছোটবেলায়। মাম ঘুমিয়ে। বিনিদ্র ড্যাড ফেবল শোনাচ্ছে। এ ফেবল নয়। না-দেখা ভারতের অঙ্গ। শাশ্বত ইতিহাস।

"দুই ট্রাইবের রোজকার ঝগড়া বন্ধ করতে শাক্য ট্রাইবের রাজা শুদ্ধোদন, কোল ট্রাইবের রাজা অঞ্জনের দু-মেয়েকে বিয়ে করে। একজন মায়া, অন্যজন মহাপ্রজাপতি। গৌতম বুদ্ধ ওয়াজ বর্ন আউট অফ দ্যাট ওয়েডলক টু মায়া। গৌতম বুদ্ধের জন্ম কপিলাবস্তু দেবদহের মাঝে, লুম্বিনি পার্কে। আনফরচুনেটলি হিজ মাদার মায়া ডায়েড এ উইক আফটার হিস বার্থ"

শ্রাবস্তি বলল ''দ্যাট মিনস বুদ্ধ হ্যাড টু মাদার্স। এ রিয়েল ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান হু ব্রট হিম আপ?''

মাতৃত্বের সংজ্ঞা হাতড়ে বেড়াচ্ছে। রঞ্জিতাও মাম। মঞ্জরীও। টু আর পোলস অ্যাপার্ট ফ্রম ডিফারেন্ট পারস্পেকটিভ। মাতৃত্ব নবরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। গভীর গোপন অন্ধকারে, আলোর স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে তার নিশানা। নিজের দীপালোকে পথ চলার সুর। পরের শেখানো ভুয়ো বুলির আড়ম্বরে নয়। রঞ্জিতা এতদিন ধরে যা শিখিয়েছে, তার বাইরেও পৃথিবী আছে। না-দেখা, না-ছোঁয়া মনের পৃথিবী। সেখানে আরেক মুখ ভেসে উঠছে। সে আর কেউ নয়। পাশের সর্বহারা মা, মঞ্জরী। গৌতম বুদ্ধের জীবনের মধ্যে নিজের চাওয়ার বাতাবরণ খুঁজে পাচ্ছে।

জানলার বাইরে সবুজ ঘাসের বিছানায় ক্রমে সরে যাওয়া দেবদারু গাছগুলোর দিকে চেয়ে। দৃশ্যটা পালটালেও ট্রেনে বসা মঞ্জরী আর অরিজিতের ছবি পাল্টাচ্ছে না। নন পার্মানেন্ট থিংস কাম অ্যান্ড গো। পার্মানেন্ট থিংস স্টে ফরএভার।

শ্রাবস্তির মনের কথা বুঝে অরিজিৎ বলল ''ডু ইউ নো হোয়ার ইওর নেম কেম ফ্রম?''

চুপ মঞ্জরী, বলার সূত্র পেয়ে বলল ''বনলতা সেন থেকে"

"সে তো জীবনানন্দ দাশের কবিতা"

থমকাল মঞ্জরী। আবার কোত্থেকে? নিজের মনেই আওরালঃ

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা

মুখ তার শ্রাবস্তির কারুকার্য

"ট্রু। গৌতম বুদ্ধ ওখান থেকেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন"

মঞ্জরী অবাক ‘‘কোথায়? জানতাম না তো’’

“বুদ্ধদেব হাজার পদ্মের পাপড়িতে বসে অলৌকিক পাওয়ার দেখায় সেখানকার রাজা প্রসেনজিৎকে”

শ্রাবস্তির ভেতরে চাঞ্চল্য। বুদ্ধদেব শুধু তার গোত্রীয় নয়। তার নামের সঙ্গেও জড়িয়ে। ছোটবেলায় অনেকেই প্রশ্ন করত ‘‘হোয়ার হ্যাজ ইওর নেম অরিজিনেটেড ফ্রম?’’

বোকার মতো মাথা নাড়ত ‘‘ডোন্ট নো। পেরেন্টস গেভ মি দ্য নেম’’

“সো ডিফিকাল্ট টু প্রোনাউন্স”

“ইটজ অ্যান ইন্ডিয়ান নেম। মাস্ট হ্যাভ সাম স্যান্সক্রিট অরিজিন” না জেনে ওদের থামাতে কথাটা ছুড়ে দিয়েছিল।

নিজের নামের সঙ্গে এক প্রাচীন ইতিহাসের যোগসূত্র দেখে কৌতূহল বেড়ে গেল ‘‘ড্যাড, আই ওয়ান্ট টু গো দেয়ার’’

“দেয়ার ইজন্ট মাচ টু সি” অরিজিৎ ইতস্তত করছিল।

জেদ করেই বলল ‘‘ইউ প্রমিসড ইউ আর নট গোয়িং টু টেল মি, বাট সো মি মাই আইডেন্টিটি’’

মেয়ে বাপের মতোই। যুক্তির ব্রিফে কিছু কম নয়।

“আগে তোমায় সারনাথে নিয়ে যাব ভাবছিলাম” অরিজিৎ বুঝল এবার উল্টোদিকে ছুটতে হবে।

“ওয়ান্ট টু গো টু শ্রাবস্তি ফার্স্ট” মেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সন্ধেবেলা বেনারস পৌঁছে, হোটেলে দুটো ঘর বুক করে বলল ‘‘নট টুডে। টুমরো’’

নিজেই জানে না কী করে যাবে ‘‘তোমরা এক ঘরে থাকতে পারবে তো?’’

শ্রাবস্তি বাংলায় বলল ‘‘হ্যাঁ, মায়ের সঙ্গে থাকব’’

চমকে উঠল অরিজিৎ। কী বলছে শ্রাবস্তি। মা!

মঞ্জরী শ্রাবস্তির ব্যাগ তুলে বলল ‘‘হ্যাঁ, আমরা মা-মেয়ে এক ঘরেই থাকব। তুমি জানো শ্রাবস্তি কী করে যেতে হয়?’’

“না। খোঁজ নিয়ে দেখি”

ওদের ঘরে পাঠিয়ে খোঁজ নিতে বেরল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝল, অত সহজ নয়। বইয়ে পড়া অন্য। বাস্তবে পৌঁছনো আরেক ব্যাপার।

অনেক ঘুরে, খোঁজ-খবর নিয়ে, ডিনারে বলল ‘‘শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছি। ট্রেনে করে গোরখপুরে যেতে হবে’’

“ইজ দ্যাট টু ফার?” শ্রাবস্তি বাবার দিকে তাকিয়ে।

“নট টু নিয়ার অ্যাজ ওয়েল। রাফলি ২৩১ কিলোমিটার। সেখান থেকে আরেকটা ট্রেন ধরতে হবে। গোনডা রেলওয়ে রুটে। পৌঁছতে হবে গায়েনঝাওয়া বা বলরামপুর। সেখান থেকে গাড়ি। ওনলি ২৯ কিলোমিটারস”

রাতে খাটে একা শুয়ে ঘুম আসছে না। হোটেলে সহজে ঘুম আসতে চায় না। রুম সার্ভিসকে ডবল স্কচের অর্ডার দিল। ও ঘরে মঞ্জরী-শ্রাবস্তি কী ঘুমিয়ে? মঞ্জরীকে বন্ধু হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছিল শ্রাবস্তির কাছে। আজকে লবিতে ওদের কথায় মনে হল, ওর অগোচরে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জানেও না, মঞ্জরী কীভাবে শ্রাবস্তির মনে জায়গা করে নিয়েছে। এত বছর ধরেও অরিজিৎ রক্তের সম্পর্ককে পার্থিব রূপ দিতে পারেনি। মঞ্জরী কী করে সম্পর্কহীন অস্তিত্বকে আত্মীয়তায় বেঁধে ফেলল, বুঝতে পারছে না। স্কচে চুমুক দিল। মেয়েরাই পারে, যা ছেলেরা পারে না।

এতদিন বিশ্বাস করত নাসৎ উৎপদ্যতে, ন সৎ বিনশ্চয়তে। যা অসৎ (নন পারমানেন্ট) তার উৎপত্তি হয় না আর যা সৎ (পারমানেন্ট) তার বিনাশ হয় না। সেই বিশ্বাসে এত বছর মেয়ের আসার অপেক্ষায় বসে। সম্ভাবনা নেই জেনেও, অসম্ভবকে বুকে আঁকড়ে এগিয়ে যাওয়ার বৈচিত্র্যহীন ছন্দকে নতুন তুলির ক্ষীণ টানে আঁকার চেষ্টা করছিল। সেদিন বনবিতানে মঞ্জরী যখন শীতের মধ্যে বসন্তের কোকিলের ডাক শুনতে পেল ‘সে আসবে’, মন বিশ্বাস করেনি।

সে এল। তার অগোচরে মঞ্জরী ওকে সম্পর্কহীন গভীর সম্পর্কের মায়াজালে বেঁধে নিজেকে মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠা করল। আজ মঞ্জরী তার এতদিনের বিশ্বাসে নাড়া দিয়েছে। নন-পারমানেন্ট সম্পর্ক কোনওক্রমে আজ পারমানেন্ট হয়ে গেছে। অদেখা অনুভূতি নতুন বন্ধনের বাহুডোরে। নতুন আবরণে। নতুন রূপে নতুন আজানের স্বরে। বুঝতে গিয়ে সব গুলিয়ে যাচ্ছে অরিজিতের।

সব হারানো মা-ই জগজ্জননী হতে পারে। জন্মদাত্রী না হয়েও, মেয়ের মনের জননী। চেনা-জানা পরিচয়ের মায়াজালের বেষ্টনি ছেড়ে বেরিয়ে পরিচয়হীন অনুভূতির সুরে বাঁধতে। সেই পরিচয়, হারানো মেয়েকে নতুনরূপে ফেরাবে, তার হারানো পৃথিবী।

দেখা হবে অ-দেখাকে।

চেনা হবে অ-চেনাকে।

পাওয়া হবে না-পাওয়াকে।

***

এই শ্রাবস্তি! তার নামের উৎস। কোনও সংস্কৃত শ্লোক নয়। একটা জায়গা। জীবনানন্দর কবিতার বাস্তব স্মারক।

শ্রাবস্তি যখন ইলিং হাসপাতালে জন্মেছিল, প্রথাগত নাম ছেড়ে অরিজিৎ ভারতীয় নাম খুঁজছিল। ওদেশের নিয়ম অনুসারে ছ'মাসের অন্নপ্রাশন পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। এক মাসের মধ্যে বার্থ সার্টিফিকেটে নামকরণ করতে হবে। শ্রাবস্তির কথা জানত না। কলেজ জীবনে প্রিয় জীবনানন্দ দাশের কবিতার বনলতা সেনকে সারা জীবন খুঁজে বেড়াচ্ছে। বনলতা তো মেয়ে হতে পারে না। তার জীবনের স্বপ্ন। মেয়েকে বেঁধে ফেলতে চাইছিল স্বপ্নের সঙ্গে। অতএব শ্রাবস্তি।

জীবনানন্দ কী দর্শনের চোখ দিয়ে দেখেছিল বনলতাকে? বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি থেকেই কী সেই বনলতার কল্পনা?

হাজার বছর ধরে

আমি পথ হাটিতেছি পৃথিবীর পথে

সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে

মালয় সাগরে

অনেক ঘুরেছি আমি

বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে...

সেদিন বোঝেনি। নামের মাধুর্যই আকৃষ্ট করেছিল। শ্রাবস্তির কারুকার্য নিশ্চয়ই সুন্দর। ফুটফুটে মেয়েটাও সুন্দর। তাই আদর করে নাম দিয়েছিল শ্রাবস্তি।

হাজার বছর... সিংহল... বিম্বিস্বার...

সবই বৌদ্ধধর্মের প্রেরণা। সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করার পর মগধে ভিক্ষাবৃত্তি করেন। সেখানকার প্রবল-প্রতাপ নরপতি মগধরাজ বিম্বিসার। তার দর্শনে মুগ্ধ হয়ে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন। মহারাজ অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পর বৌদ্ধধর্ম প্রচার শুরু করেন। বোধগয়ার গাছের তলায়, গৌতম বুদ্ধের মূর্ছনার পর বোধিসত্ত্ব লাভ। কলিঙ্গ থেকে আসা দুই ব্যবসায়ী মূর্ছনার পর তাকে খেতে দেয়। তাঁরাই বুদ্ধদেবের প্রথম শিষ্য। পালিভাষী এই দুই বণিক তাঁর দর্শন নিয়ে যান দক্ষিণে। হীনইয়ান তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ সিংহলে। অথচ এখানে শুধু একটা গাছ আর মন্দির।

অরিজিৎ শ্রাবস্তির দিকে তাকাল। জিনস-টপস ছেড়ে সাদার ওপর খয়রি কাজের সালোয়ার-কামিজ পরেছে। হোটেলের লবিতে সকালে দেখে চমকে উঠেছিল। কোত্থেকে পেল?

"লাভলি। হোয়ার ডিড ইউ গেট দিস ফ্রম?"

পাশে সাদা কটকি ঠিক করে মঞ্জরী বলল ‘‘আমি কিনে দিয়েছি। ওর সঙ্গে আর ইংরেজিতে কথা বলবে না। একদম না, বলে রাখছি’’

শ্রাবস্তি আধো বাংলায় বলল ‘‘মা ফুচকা, পুলিপিঠেও খাইয়েছে’’

এর মধ্যে ওনার দেশি রসনাচর্চাও হয়ে গেছে। বাঙালি নারীর খাওয়ানোর মধ্যেই পরিতৃপ্তি।

গাইড বলে চলেছে ‘‘ইয়ে আনন্দ বোধিবৃক্ষ। বুদ্ধদেবকা পাঁচ শিষ্য মে এক কা নাম আনন্দ। ওহি ইয়ে পেড় পহলে পোঁতা থা’’

জনগণ সহজে পায় না। ইয়ে বাঙ্গালি সাহাবলোগ ইধর আয়ে। জ্যাদা বকশিস মিলেগা। আবেগে বলে চলেছে ‘‘উস জমানে মে ইয়ে কোশলরাজ কা দেশ থা। নাম থা মহেত। ঔর ওহ নদী জো আপ দেখ রহে হ্যায় উসকা নাম অচিরাবতী’’

মঞ্জরী গাছের পাশ দিয়ে মন্দিরের দিকে তাকাল। গাইডকে পেছনে ফেলে কটকির আঁচল ঠিক করে এগিয়ে গেল মন্দিরের দিকে। পেছনে শ্রাবস্তিও। দেখছে মন্দিরের স্তূপের বৌদ্ধ আমলের কারুকার্য। তার নামের উৎসভূমি। পাশে প্রবহমান উচ্ছ্বাসহীন নদী। নিরুচ্ছ্বাসের মধ্যে ছন্দ তুলে অবচেতনে তরঙ্গের লহর তুলছে। আদি সভ্যতা নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে, নতুন সম্পর্কের বাতাবরণে।

দুই দেশ মিলেমিশে একাকার যুগ্ম অনুভূতি তরঙ্গের নিরুচ্ছ্বাস প্লাবনে। বরণডালা সাজিয়ে নতুন জোয়ারে ভাসার। আভরণহীন আবরণে সাজার, নতুনের নিমন্ত্রণে।

অরিজিৎ ও গাইড পেছন পেছন। গাইড প্রবল উদ্যমে বলে চলেছে ‘‘বুদ্ধা কা আট দর্শনকে জগা মে ইয়ে এক। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগোয়ান পর বিশোয়াস নেহি করতে থে। গৌতম বুদ্ধ হাজারো পদ্মকে উপর বৈঠ কর কোশলরাজকো উসকা দর্শন শুনায়ে। কোশলরাজ খুশ হো কর, উসে ইধর রহনে দিয়ে। চৌবিস সাল ও ইঁহা থে। ইঁহা সেহি ধরম শুরু হুয়া। কোঠেওয়ালি আম্রপালী উসকে পহেলা মহিলা শিষ হুয়া। ফির কৌস্মবী, বেরঞ্জা, সাকাশ্য। ঔর গৌতমী। জিনে উসকো বড়া কিয়া। উসে তিনবার ইহা ঘুসনে নেহি দিয়া ঈশ্বর’’

ঈশ্বর হয়ে গেল গৌতম বুদ্ধ। যিনি ঈশ্বরধর্মে কখনও বিশ্বাস করেননি। বিশ্বাস করেছেন মানবধর্মে!

অরিজিৎ বলল ‘‘কত সহজে এরা মানুষকে ভগবান করে দেয়। গতের বাইরে যে সব মানুষের কথা চিরস্থায়ী, তারাই এদের কাছে ভগবান। ভগবানের সংজ্ঞাটা এরা জানে না। তাহলে তো বলতে হয় রামকৃষ্ণও ভগবান। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও’’

নিজের আনন্দে গাইড বলে চলেছে ‘‘ইধর দস্যুও ভি ভগোয়ানকে ভক্ত হো গয়ে। মাহাকচ্চায়ন, মহাকাশ্যপ ছোড় কর দস্যু অঙ্গলিমাল ভি উসকা শীষ হুয়া। তীর্থঙ্কর মহাবীর ভি ইধর বহতবার আ চুকে’’

ঠিক বলছে তো? অরিজিৎ অতদূর জানে না। মনে হল ঠিকই বলছে। শ্রাবস্তি হিন্দি বুঝলেও, অতটা পারদর্শী নয়। কিছু বুঝতে পারছে। ওর কাছে বেশি রোমঞ্চকর জায়গাটার নাম। শ্রাবস্তি!

অরিজিতের দিকে এগিয়ে বলল ''হোয়াট সিগনিফিক্যানস হ্যাজ দিস প্লেস হ্যাভ উইথ মাই নেম?''

স্তূপের পাথরে বসে সামনের অচিরাবতী নদীর দিকে তাকিয়ে অরিজিৎ বলল ''জানি না। তোমার যখন নাম রাখি, তার পেছনে আমার বহুদিনের স্বপ্ন জড়িয়ে। সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন কবিতা। এখন মনে হচ্ছে হয়ত সিগনিফিক্যানস আছে। দ্য আল্টিমেট অ্যাবোড অফ পিস। জীবনানন্দ নিশ্চয়ই অত কিছু ভেবে লেখেননি। হয়ত সাবকন্সাসে ওটাই খুঁজছিলেন''

অরিজিৎ কথা রেখেছে। মেয়ের সঙ্গে আর ইংরেজিতে কথা বলছে না।

"কী?" শ্রাবস্তির চোখে কৌতূহল।

"তোমার বোঝার ব্যাপার। গৌতম বুদ্ধ সেই সময় অর্থডক্স হিন্দুইজমটাকে মেনে নিতে পারেননি। আবার ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে উঞ্ছবৃত্তিকে জীবনের ধর্ম বলে বরণ করতে পারেননি। তাই একটা মিডল পাথ বেছে নিয়েছিলেন। দ্য করেক্ট ওয়ে অফ লিভিং। অ্যারিস্টটল, ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ অ্যারিস্টটল, হেভেন্ট ইউ?"

"ইয়েস, দ্য গ্রিক ফিলসফার" মাথা নাড়ল শ্রাবস্তি।

"অ্যারিস্টটল এক-সময় বলেছিলেন ভারচু লায়েস ইন দ্য গোল্ডেন মিন"

"সো বোথ অফ দেম ওয়ার ফলোয়িং দ্য সেম ফিলসফি। বোথ ইস্ট অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট"

অরিজিৎ জবাব দিল না। শ্রাবস্তি বুঝে নিক নিজের মতো করে। ছোটবেলায় বাবাও তাকে হাত ধরে সব কিছু শিখিয়ে দেয়নি। জীবনসমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে, প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায়। সেও তার মেয়েকে হাত ধরে চলতে শেখাবে না। নিজের মতো করে বোঝাবে না। কাউকে দর্শন শেখানো যায় না। নিজে উপলবদ্ধি করতে হয়। মঞ্জরীও তো অমিত-টুম্পাকে হারাবার পর চলার নিশানা পেল। তার নিজের দর্শন।

গাইড অরিজিতের পাশে ''উস তরফ জো শহর দেখ রহে উসকে নাম থা সাহেত। ও ভি কোশলরাজকে এক শহর। ইয়ে শ্রাবস্তিকে দুসরা শহর। মেমসাব ঔর একঠো দেখনে কে জগা হ্যায়''

গাইডের দিকে ফিরে বলল ''কেয়া?''

"জেটবান বিহার। ইধর সে ৫০০ মিটার" আঙুল তুলে জেটবান বিহারের দিকে।

"কত এনসেন্ট সিভিলাইজেশন। তাই না?"

"তুমি না এলে দেখাই হত না" মঞ্জরী শ্রাবস্তিকে বলল।

"আমারও" অরিজিৎ সায় দিল।

এই দেখা কী শুধু দেশ দেখা? না কি, তার না-চেনা অতীতকে নতুন রূপে পাওয়া? দেখার থেকে পাওয়াই বড়। সময়ের ক্যানভাসে এই দেখা একদিন ম্লান হয়ে যাবে। পাওয়াটা কিন্তু হারিয়ে যাবে না। চিরকাল নর্থ স্টারের মতো জ্বলজ্বল করবে নতুনের আনন্দে। অনেক ঝিনুকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া আসল মুক্ত।

***

"আপনারা বেনারস যাচ্ছেন?" স্পষ্ট বাংলায় উল্টো সোফার প্রৌঢ়ার প্রশ্ন।

ট্রেনের মৃদুমন্দ ঝাঁকানিতে আকাশি শাড়ির পাড়টা ঠিক করে মঞ্জরী বলল ''হ্যাঁ। বেনারস থেকে সারনাথেও যাব''

চেষ্টা করেও তৎকালে গোরখপুর থেকে বেনারসের ফার্স্ট ক্লাসের বুকিং পাওয়া গেল না। অগত্যা টু টায়ার এসি। প্রৌঢ়ার দিকে তাকাল। সাদার ওপর সোনালি কাজ ঢাকাই শাড়ি। মনে হয় ষাটোর্ধ্ব। এক সময় সুন্দরী ছিলেন। বয়সে চামড়ার জৌলুস কমলেও সৌন্দর্যের ছোঁয়া।

প্রৌঢ়া মঞ্জরীকে বলল ''আমি শ্বেতা চৌধুরী। প্রতি বছর বেনারস যাই। উনিও আমার সঙ্গে যেতেন। দু-বছর হল দেহ রেখেছেন। ইনকাম-ট্যক্স কমিশনর ছিলেন। গোরখপুরে থাকি। হেড-মিস্ট্রেস। রিটায়ার করেছি''

উত্তরে মিষ্টি হেসে বলল ''মঞ্জরী। ও অরিজিৎ'' শ্রাবস্তিকে জড়িয়ে ''আমার মেয়ে শ্রাবস্তি''

সুখী পরিবার, আনন্দে ঘুরছে। উনি চলে যাওয়ার পর, বাড়িটা ফাঁকা। সব থেকেও কিছু নেই। একদিন উনি ছিলেন, মেয়ে ছিল। আজ দোতলা বাড়িটা লৌহকপাট। দৈনন্দিন প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে একাই বেড়িয়ে পড়া। উন্মুক্ত আকাশে। কখনও বেনারস। কখনও কেদার-বদরি। এইটুকুই পাওয়া।

শ্বেতা চৌধুরী বলল ''মেয়ে-জামাই-নাতনি নিউইয়র্ক হোয়াইটহেভেনে সেটেল্ড। এক-ই মেয়ে। বছর-দু'বছরে আসে। ওরা বলে ওখানে গিয়ে থাকতে। ভালো লাগে না''

"কেন?" মঞ্জরী জিজ্ঞেস করল।

"সারাজীবন গোরখপুরে কাটিয়ে দিলাম। ওখানে হাঁপিয়ে উঠি। অত মেকানিক্যাল লাইফ ভালো লাগে না। ঘরে বসে টিভি। উইকএন্ডে ওদের সঙ্গে বেরনো"

কথাটা শুনে শ্রাবস্তির বুক মুচড়ে উঠল। বুঝতে পারছে, কত কষ্ট বুকে নিয়ে বাবা একা কাটিয়েছে। তবুও, বাবার কাজ আছে। যেদিন থাকবে না? বাবার কষ্টের কথা মনে হতেই চোখে জল এসে গেল।

শ্রাবস্তির বয়সি ব্রিটিশরা বুঝবে না বার্ধক্য কী? ইনডিপেনডেন্স ইজ মোর ইম্পরট্যান্ট দ্যান দ্য বন্ডেজ। এখন বুঝছে, ওদেশের বুড়িরা ডাক্তার দেখাতে এলে কেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে। কত জনের সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে। মেডিক্যাল হিস্ট্রির সময় থামিয়ে দিলে দুঃখ পেত। বোঝেনি, কথা বলার লোক না থাকাটাও বেদনাদায়ক। এখন বুঝছে। সঙ্গে মঞ্জরী আর বাবার সম্পর্ক। গ্ল্যাড মঞ্জরী ইস দেয়ার। শ্রাবস্তি ছাড়া আর কী ছিল বাবার জীবনে? মঞ্জরীরও স্বামী-মেয়ে হারিয়ে? তবুও বাবা তাকে ভোলেনি। জন্মদিনের চিঠি, কালীঘাটে পুজো... নিজেকে দোষী মনে হল। উইকএন্ডে যদি বাবার সঙ্গে অন্তত একবার কথা বলত, মনটা ভরে যেত।

শ্রাবস্তির দিকে ইঙ্গিত করে মঞ্জরী শ্বেতা চৌধুরীকে বলল ‘‘ও ডাক্তার। ইংল্যান্ডে থাকে। কিছুদিনের জন্য এসেছে’’

শ্বেতা চৌধুরী ধরেই নিয়েছে, ওরা পরিবার। শ্রাবস্তি বুঝলেও বাধা দিল না। ভালোই লাগছে। এরকম পরিবার সে বহুদিন পায়নি। ভাবলে ক্ষতি কী? এও শুনেছে, ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিয়ানরা স্বামী-স্ত্রী-কন্যার বাইরে, কোনও রিলেশেনশিপ অ্যাক্সেপ্ট করে না। রিলেশনশিপের বাইরেও যে রিলেশনশিপ হয়, এতদিনে বুঝেছে। যে ডেফিনিশন দিক না কেন, একটা বন্ধন, একটা পাওয়া। মনের নিবিড় আচ্ছাদন। তার অপূর্ণতাই তাকে টেনে এনেছে ইংলিশ চ্যানেলের ওপার থেকে জন্মের উৎস সন্ধানে। বন্ধনের বাইরে বন্ধন। নাম উপলক্ষ মাত্র। অনুভূতির পূর্ণতাই আসল।

প্রৌঢ়া বলল ‘‘কী ভালো মিষ্টি মেয়ে তোমাদের’’ শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছল ‘‘বিদেশে থেকেও সাহেব হয়ে যায়নি। বেনারস, সারনাথ ঘুরতে আসে’’

মঞ্জরীর মনে হল, শাড়ি দিয়ে চোখের জল আড়াল করল ‘‘কবে যে ঈশানীদের সুবুদ্ধি হবে। নাতনিকে পুরো অ্যামেরিকান করে দিয়েছে। বাংলায় কথা বলতে পারে না। শুধু কর্তব্যের খাতিরে ইন্ডিয়া আসে। সারাজীবন গোরখপুরে বড় হয়েছে। এখন গোরখপুর ভালো লাগে না। বেনারস তো স্বপ্ন। সব কালচার অ্যামেরিকায় থেমেছে। যে গোরখপুরে বড় হলি, বিয়ের আগে পর্যন্ত কাটালি, তা সেকেলে। বাবা এই ইন্ডিয়াতেই সম্মানের সঙ্গে গর্ভনমেন্টে কাজ করেছে। সেটা কিছু নয়? অ্যামেরিকায় সুইমিং পুল সমেত বাড়ি, মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি, এই তোদের পৃথিবী?’’

শ্রাবস্তি দু’দেশের, দুই সভ্যতার সমন্বয়, মেলবন্ধন খুঁজতে এসেছে। দুই পৃথিবীকে চিরকাল আলাদা করে দেখেছে দুই সভ্যতা। বিশ্বায়নে অপসংস্কৃতি মিলে জগা-খিচুড়ি পাকাচ্ছে। বাবার দেখানো ভারত, এই বিশ্বায়িত দুনিয়া থেকে কত আলাদা।

অরিজিৎ এতক্ষণ চুপ ছিল। এবার হাওয়ায় কথা ছুড়ে দিল ‘‘যার যেখানে শান্তি’’

অনেক না-বলা কথা বলে দেয়। অনেক ভেদাভেদের প্রাচীরে নতুন আলো ছড়ায়। অনেক স্তব্ধ মৌনতা অনন্ত সুখ-সাগরে মেশে। সেখানেই নিভৃত মনের দিয়া। তুষারাবৃত অখণ্ডতার মধ্যে আত্মার ডাক, চিরনবীনের বেশে, চিরনুতনের ডাকে, আগামীর সোনাঝরা দিনের স্বপ্নে। স্থান, কাল, সময়ের বাইরে অ্যারিস্টটল, বুদ্ধের পথেও তো বাঁচা যায়। মধ্যপথ তো সেই এক।

শ্বেতা চৌধুরীকে বলল ‘‘দূর কী শুধু জায়গায়? দূরত্ব তো মনেও’’

চমকে উঠল শ্বেতা চৌধুরী ‘‘ঠিক বলেছ। একা থাকতে নানা উল্টোপাল্টা চিন্তা ঘুরপাক খায়’’ অরিজিৎকে বলল ‘‘আপনাদের মেয়ে এই বুড়ো বয়সে নতুন জীবন-দর্শন শেখাল’’

মঞ্জরীও আশ্চর্য। অরিজিতের মেয়ে বলবে না তো কার মেয়ে বলবে? পরিপূর্ণতা নিয়েই বলল ‘‘তাই ওকে ভারতের নানা পীঠস্থান ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। দেখানো আমাদের কর্তব্য। বোঝাটা ওর নিজস্ব’’

অরিজিতের ভালো লাগছে। শ্রাবস্তিকে ভারতবর্ষ দেখাতে চেয়েছিল। শ্রাবস্তি এই বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছে শাশ্বত সত্য। পরিধির বাইরে, মঞ্জরীর মাতৃত্বের মমতায়, খুঁজে পাচ্ছে বাঁচার স্পর্শ।

শ্বেতা চৌধুরী বা রঞ্জিতা, বারবার ফিরে যাবে, না-পাওয়ার অতৃপ্তিতে। তা ছেড়েই একদিন অশ্বমেধ ছুটিয়ে ছিল। এখন ঘরে ফেরা নয়, এগিয়ে যাওয়া। পঁচিশ বছরে কতটুকুই বা দেখেছে? সামনে প্রশস্ত জীবন। সেখানে স্টিভ নেই, রঞ্জিতা থেকেও নেই। ডেভিড শুধু মায়ের দেওয়া নাম। একদিন ফিরে যেতে হবে ইংল্যান্ডে। সেখানে অরিজিৎও থাকবে না, মঞ্জরীও নয়। একাই খুঁজে নিতে হবে তার আগামী পথ। সে পথ কোথায় থামে, জানে না। শুধু জানে, তা এগিয়ে যাওয়ার পথ। তাকে একাই বাছতে হবে সে পথের দিশা। বন্ধনের মধ্যে মুক্তি।

অশান্তির মধ্যে শান্তি।

হারানোর মধ্যে পাওয়ার পরিতৃপ্তি। তার জীবনের ব্যাপ্তি।

***

মূল গন্ধকূটি বিহার!

মুগ্ধ তাকিয়ে শ্রাবস্তি। এটাই বিখ্যাত মূল গন্ধকূটি বিহার। হিস্ট্রি বইতে পড়েছে। পাশেই সেই বিখ্যাত বটগাছ বোধিবৃক্ষ। যার তলায় গৌতম সিদ্ধার্থ এনলাইটেনমেন্ট লাভ করেছিলেন। মঞ্জরীর দিকে তাকাতেই ওর মনের প্রশ্নটা পড়ে ফেলল।

“না, এটা সেই গাছ নয়। সেটা বোধগয়ায়। অরিজিন্যাল গাছটা মরে গেছে। ওর চারা সম্রাট অশোকের ছেলে মহেন্দ্র মেয়ে সংঘমিত্রার হাত দিয়ে সিংহল, মানে সিলোনে পাঠিয়েছিলেন শান্তির প্রতীক হিসেবে। এই গাছটা সেই সিংহলের গাছের ডাল নিয়ে এসে লাগানো। তবে বৌদ্ধরা এটাকেই অরিজিন্যাল বোধিবৃক্ষ হিসেবে মানে, ভক্তি করে”

বেনারস থেকে ভাড়া গাড়িতে ১০ কিমি। শ্রাবস্তি চেয়েছিল সারানাথে আগে আসতে। হয়ত বিমাতার দ্বারা পরিপোষণের জাতকের ধর্ম-উন্মোচনের রহস্য ভেদ করতে চাইছিল। অরিজিতের মনে হয়েছিল, সেটাই ভালো। বৌদ্ধধর্মের ব্যঞ্জনা না জানলে, হিন্দুধর্মের মহাত্ম্য বুঝবে কী করে?

বিশাল বটগাছের চারদিক জুড়ে নানান মন্দির আর স্তূপ। শ্রীলংকার ভক্তরা অনেকগুলো স্তূপ বানিয়েছেন। চারদিকে নানা দেশের ভক্তদের বানানো অনেক মনাস্ট্রি। একদিকে চিনা মন্দির। একটু দূরে বার্মিজ মনাস্ট্রি। অন্যদিকে জ্যাপানিজ। সব দেশের যোগসূত্র এই সারনাথে। আশ্রয়ের নতুন ব্যাখ্যা।

“ওই উঁচু স্ট্রাকচারটা কী?” শ্রাবস্তির কথায় ঘুরে তাকাল মঞ্জরী।

উত্তরের সুযোগ না দিয়ে মঞ্জরীর পাশে দাঁড়িয়ে অরিজিৎ বলল “ওটা ধামেক স্তূপ। ওখানে দাঁড়িয়েই বুদ্ধদেব তাঁর পাঁচ শিষ্যকে প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন। লোকে বলে এর মধ্যে বুদ্ধদেবের অস্থি মানে রেলিক আছে। বলা হয়, স্তূপটি ৫০০ বিসিতে তৈরি। উপরের অংশের ইটগুলো মৌর্যযুগের, সম্রাট অশোকের আমলের, নিয়ার অ্যাবাউট ২০০ বিসির। এখানেই বৌদ্ধধর্মের শুরু”

শ্রাবস্তি মুগ্ধ তাকিয়ে রইল, মহামানবের ধর্মস্থলে। এই ভাঙা মন্দিরগুলো দেখলে বিশ্বাসই করাই মুস্কিল, যে ২৫০০ বছর আগে এই ধর্মের জন্ম। কোনও স্তূপ ছিল না। ছায়াঘেরা অর্ধ-বনাঞ্চলে, এক মহাভিক্ষুর বাণী শুনতে গমগম করত অসংখ্য ভিক্ষু, ভক্ত, সাধারণ লোকজন।

অরিজিৎ বলে চলেছে “বিদেশ থেকেও কত লোক আসত। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং এসেছিলেন”

অরিজিতের পাণ্ডিত্যে মঞ্জরী আশ্চর্য। ওকে পুজো-আর্চা করতে দেখেনি। ধর্ম সম্বন্ধে ওর ধারণাও জানা নেই। ওর সঙ্গে সম্পর্ক ধর্ম-অধর্মের বাইরে। নীরবতার উর্বর প্রান্তে। তবুও মনে হল, অবসর সময় ধর্মের বই পড়েছে। হয়ত নিজেকে খোঁজার আশায়।

অরিজিৎ বলে যাচ্ছে, মঞ্জরী শুনছে। ইতিহাসের তারা আজ কোথায়? এই কী মানুষের জীবন? সবই টেম্পোরারি? পারমানেন্ট কিছুই নেই? তাহলে, অমিত-টুম্পার জন্য দুঃখ করে কী হবে? ওদের মতো সেও একদিন চলে যাবে। ক্ষণস্থায়ী জীবনের মায়ায়, স্বপ্নে বিভোর না হয়ে, যেটুকু আছে, তাকে ধরে আশ্রয় খোঁজাই ঠিক। নয় কী?

চারপাশে তাকাল। বহু মানুষ। অবাক চোখে চারদিক দেখা টুরিস্টরা। লাল কাপড়ে হাতে চাকার মতো কিছু ঘোরানো বুদ্ধিস্ট মঙ্ক। ইউনিফর্ম পরা গ্রুপে স্কুলের বাচ্চা। ক্লায়েন্ট খুঁজতে ব্যস্ত ধূর্ত গাইড। সব মিলিয়ে বিচিত্র হ-য-ব-র-ল।

স্তূপে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল শ্রাবস্তি। ভেতরে আলোড়ন, নতুন জাগরণে। তার মধ্যে দুটো মুখ বারবার ভেসে উঠছ, রঞ্জিতা আর মঞ্জরী। মাতৃত্বের সংজ্ঞা খুঁজছে মন, সর্বক্ষণ। জন্মদাত্রী, না নতুন পথের যাত্রী? এসেছিল বাবার কাছে কৈফিয়ত চাইতে। বাবা দেখাচ্ছে জীবনবোধের পথ। লন্ডনের হাইড পার্কের ভিড়ে এই বোধ খুঁজে পায়নি। ফিরতে হয়েছে মাতৃভূমিতে, মাতৃত্বের নতুন ব্যাখ্যা শিখতে।

ঘুরতে ঘুরতে চোখ পড়ল এক ফ্যামিলির দিকে। বাবা, মা, দুই মেয়ে। বড় মেয়েটির বয়স তার মতোই হবে। চারজনে হাসছে, গল্প করছে, গাইডের পেছনে দৌড়চ্ছে। কমপ্লিট ইউনিট। ভেতরের খরস্রোতা উপচে পড়ল চোখের কোণে। মঞ্জরী দূর থেকে দেখছিল। মনের অবস্থা আন্দাজ করে এগিয়ে এল।

"নাথিং ইজ লস্ট। কিছুই হারায়নি। শুধু কিছু মূহূর্ত। সবার জীবনেই হয়। তার মধ্যেই বেঁচে থাকতে হয়"

"কী নিয়ে?" ফেলে আসা অতীত তাকে জীবনের দোড়গোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কোন পথে? যে পথে এতকাল হেঁটেছে? না, যে পথের বাণী এখন শুনছে? পশ্চিম না পুব, কোনটা? মঞ্জরীকে ইতস্তত দেখে, অরিজিৎ এগিয়ে শ্রাবস্তিকে বলল "আত্মদীপো বিহরথ অওসরনা অনঞ্চ সরনা"

চমকে উঠল মঞ্জরী। এ যেন অন্য নতুন অরিজিৎ। এতদিন ওর পাশে দাঁড়াবার জন্য মন কাঁদত, এখন শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠছে।

বুঝতে পারেনি শ্রাবস্তি ''তার মানে?''

অরিজিৎ শ্রাবস্তির মাথায় হাত রেখে বলল ''এবার থেকে তোমার, নিজের দীপালোকে পথ চলা। অন্যের ওপর নির্ভর করো না। একে বলে অষ্টমাঙ্গিক মার্গ। বুদ্ধের ভাষায় প্রজ্ঞা, শীল, সমাধি। এরপরে আর কিছুই নেই। শুধুই পূর্ণতা''

মঞ্জরী বুঝতে পারেনি ''সমাধি?''

"পৌছতে পারলেই সব পাওয়া। ইউনিভার্সের সঙ্গে মিলন, একাত্মতা"

শ্রাবস্তির মাথায় ঢুকছে না। শুধু আলোড়ন তুলছে দুটি শব্দ 'আত্মদীপো ভব', নিজের দীপালোকে পথ চলা। সেই দীপকে কী করে ইংল্যান্ডের মাটিতে জ্বালিয়ে রাখবে? জীবন-দর্শন এক। জীবন-যাপন আরেক। বৌদ্ধধর্মের গূঢ় তত্ত্ব বোঝে না। তার কাছে আগামীর বাঁচার মন্ত্রই প্রধান।

অরিজিৎ বুঝতে পেরেছে মেয়ের সংশয়। জন্মের সম্পর্ক অনেক না-বলা ভাষা ছুঁয়ে যায়। মনের নিভৃত দোটানাকে...

মাথায় হাত রেখে বলল ‘‘তুমি তো এখানে থাকতে আসনি। উই হ্যাভ টু গো ব্যাক। বিফোর ইউ রিচ ইংল্যান্ড আই উইল সো ইউ দ্য ওয়ে’’

এ না হলে বাবা। বাবা ইন্ডিপেন্ডন্স কেড়ে নেয় না, লাইক সাম ওয়েস্টানার্স থিংক। ইন্ডিপেন্ডন্সের মধ্যে নতুন পথ দেখায়। বুক ভরে গেল পরিতৃপ্তির আনন্দে। নতুন পাওয়ার ছন্দে। খুঁজতে এসেছিল জন্মদাতাকে। নিয়ে যাবে কর্মজীবনের সঙ্গীকে। নিজের পথে পা বাড়িয়ে। আগামীর বাঁচার মন্ত্র। সেখানে অরিজিৎ-মঞ্জরী না থাকলেও, তাদের খুঁজে নিতে হবে নিজের দীপালোকে। চাওয়া-পাওয়ার বাইরে চিনে নিতে হবে নিজের আলোকে। আজ নিজের মতো দুই বিচ্ছিন্ন সত্তা ধরা দিয়েছে চেতনার প্রশস্ত দিবালোকে। এইটুকুই তার পাওয়া।

***

গঙ্গা!

এই সেই বিখ্যাত কাশীর গঙ্গা। শ্রাবস্তি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে। কাশী - দ্য ওল্ডেস্ট লিভিং সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।

নৌকোটা গঙ্গায় ভাসছে। নৌকোওলা টানা বকে চলেছে কাশীর মহাত্ম্য বর্ণনায়। অসংখ্য ঘাট। মাঝি পরপর নাম বলে যাচ্ছে। মনে রাখা অসম্ভব। তার মধ্যেই চোখে পড়ার মতো দশাশ্বমেধ ঘাট। ঘাটে অসংখ্য চাটাইয়ের ছাতা। বেনারসের হোটেলে ইন্টারনেটে আগেই দেখেছিল। এই ছাতাগুলো কাশীর ট্রেডমার্ক। নীচে, সারি দিয়ে বসে আছে পণ্ডিতের দল। এখানে হিন্দুধর্মের সব ক্রিয়া কাজই চলছে। মাথা মুণ্ডন, স্নান করছে অসংখ্য মানুষ। পরপর ঘাট। প্রয়াগ ঘাট, শীতলা ঘাট, অহল্যাবাই ঘাট, দ্বারভাঙা ঘাট, রাণামহল ঘাট, চউস্টি ঘাট, রাজ ঘাট, নারদ ঘাট, কেদার ঘাট, হরিশ্চন্দ্র ঘাট, হনুমান ঘাট, আনন্দময়ী ঘাট, জানকী ঘাট, অসি ঘাট। মাঝি মন্ত্রের মতো মুখস্ত বলে যাচ্ছে। শ্রাবস্তির মাথায় ঢুকছে না। স্লো মোশনে চলা ভিডিওর মতো। ফ্রেমগুলো থেমে এগিয়ে যাচ্ছে নতুন ফ্রেমে। এক একটা ফ্রেম, হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকলাপ। তার মধ্যেই মিশে ধর্মের বিভিন্ন আচার।

হঠাৎ নাকে বিশ্রী পোড়া গন্ধ। তাকাতেই চোখে পড়ল, একটা ঘাটে শবদাহের দাউদাউ বহ্নিশিখা অল্প ব্যবধানে জ্বলছে। লোকের ভিড়। অনেক ডেডবডি ঘাটে শোয়ানো। কিছুলোক কান্নাকাটিও করছে। এটা নিশ্চয়ই ক্রিমেশন এরিয়া।

“এহি হ্যায় মণিকর্ণিকা। ইহা মাতা পার্বতীকা কুণ্ডল খো গয়ে থে। শিউজি হর গুজর হুয়ে আদমিকো মন্ত্র শুনাতে থে। বড়ি মাহাত্ম্য হ্যায় ইয়ে জগহ কা”

নৌকাওয়ালা কি বলছে খেয়াল নেই। চোখ উল্টদিকের মণিকর্ণিকা ঘাটে।

অরিজিৎ বলল ‘‘ওটা শ্মশান। ক্রিমেটোরিয়াম। আমাদের রিলিজনে মারা যাবার পর কবর দেওয়া হয় না। ডেডবডি পুড়িয়ে ফেলা হয়’’

ক্রিমেটোরিয়ামের কথা আগে শুনেছে। কখনও দেখেনি। এই প্রথম ক্রিমেটোরিয়াম দেখা।

অরিজিৎ দোদুল্যমান নৌকোর কাঠের তক্তায় ভর দিল ‘‘এই যে আগুন জ্বলছে দেখছ, এটা ট্র্যাডিশনাল ক্রিমেশন পদ্ধতি। কলকাতার ক্রিমেটোরিয়াম অবশ্য এরকম নয়। ওখানে ইলেকট্রিক বার্নার আছে। ইট টেকস এ শর্টার টাইম। আমাদের হিন্দুধর্মে বলে, আগুন দেহকে শুদ্ধ করে। ফাইনাল স্টেজ অফ মর্টাল এক্সুমেশন তাই আগুন দিয়ে। আওর সোল ইজ পিওর। ইট ইজ দ্য স্রাউড অফ আওয়ার মর্টাল বিইং দ্যাট ইজ ইমপিওর’’

মণিকর্ণিকা ঘাটের দিকে শ্রাবস্তি চেয়ে। ঘাটের লেলিহান আগুণের দিকে নয়। ভস্মশেষের দিকেও নয়। চেয়ে আছে সাত বছরের ছোট মেয়ের ডেডবডির দিকে। ফুটফুটে মেয়েটা যেন ঘুমিয়ে আছে। মনে হয় না, আর নেই। তাকে জড়িয়ে, একটি লোক আর মহিলার বুকফাটা কান্না বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে আর নেই। মেয়েটির বাবা-মা হবে। না হলে এমনভাবে কেউ কাঁদে? ওদের কান্নায় সন্তানহারা মানুষের আর্তনাদ। ওদের বুকফাটা হহাকার হাতুড়ি মারছে বুকে। অনেক মৃত্যু দেখেছে ডাক্তারি জীবনে। মৃত্যুর পরিণতির প্রতিশব্দ এমনভাবে নাড়া দিয়ে যায়নি। এ শুধু মৃত্যু নয়, বাবা-মায়ের বুকফাটা যন্ত্রণা। পেয়েও হারানোর মর্মভেদী কান্না। তীব্র ব্যথার সাক্ষাৎ অঙ্গীকার। আঘাত করছে বারবার। এ প্রত্যেক দেশের সন্তানহারা বাবা-মায়ের কান্না। সেই কান্না মিশছে অন্তরের অস্তিত্বকে হারানোর বেদনায়। মানুষ চলে যায়। কিন্তু শূন্যতা থেকে যায়।

কয়েকমাস আগেও, অরিজিতের কাছে সে ছিল বেঁচে থেকেও মৃত। অস্তিত্বের অনির্বাণ অগ্নি নয়। এমনি করেই কী বাবা একলা তার জন্য কাঁদত? নিশ্চয়ই। না হলে, অমন চোখের জলের চিঠি প্রতি জন্মদিনে কী লিখতে পারত হারানো মেয়ের জন্য? রঞ্জিতার ঘেরাটোপে যে ফেরার সম্ভাবনা নেই, অরিজিতের থেকে কে বেশি জানে? এতদিন শুধু রঞ্জিতাকে দেখেছে। অরিজিৎকে চিনেছে রঞ্জিতার আলোয়। আজ আবার নতুন করে দেখছে, তার জন্মদাতা বাবাকে। সব রাগ মিলেমিশে একাকার, না-বলা ছন্দে। তার সুর ১৮ বছর ধরে বয়ে বেড়াচ্ছে। কেন সে বোঝেনি? এতকাল ধরে, কেন শোনেনি হারানোর সুর? মায়ার পৃথিবীর দৌড়ে ভুলে গেছিল, জন্মদাতা পিতাকে। না-চেনা যোগসূত্র।

মিথ্যে বলেছে রঞ্জিতা ‘ইওর ড্যাড হ্যাজ ডেসার্টেড ইউ’

হাউ ক্যান এ ড্যাড ডেসার্ট হার ওনলি ডটার? হোয়াট এ ফুল সি হ্যাজ বিন। বাবার জন্য মায়া হচ্ছে। এসেছিল অনেক প্রশ্ন নিয়ে। বাবা কথা রেখেছে। প্রশ্নের জবাব দেয়নি। উত্তর দেখিয়েছে। না-বলা কথাকে, দেখার ভাষা বলে দেয়। না-বলা শব্দ, দেখার শেষ প্রান্তে হিল্লোল জাগায়। না-পাওয়া পৃথিবী, নতুন সুরে খেলে, না-পাওয়া ছন্দের নব-জাগরণে।

শ্রাবস্তির চোখে জল। বাবার হাতটা তুলে নিল নিজের হাতে। আস্তে চাপ দিল। অন্তরে ভালোবাসার তীব্র ঝড়। বহু বছরের না-পাওয়া অনুভূতি ফিরে এসেছে। ছোটবেলার তারাটা আর **হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর** নয়। নেমে এসেছে মর্ত্যে। অচেনা বাবাকে নতুন করে চেনায়। ফুটে উঠেছে নতুন আলোকে। সেই আলো বর্ণময় গীতি নয়। হারানো স্বপ্নের স্মৃতিও নয়। প্রবহমান জীবনের প্রকৃতি। তার বেঁচে থাকার দীপ্তি। আগামী জীবনের নতুন গতি। সেখানেই পরিতৃপ্তি।

কয়েক মুহূর্ত...

"আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?"

নিজেকে সামলাতে পারল না। দু-চোখের ধারায় অরিজিৎ অনুভব করছে মেয়ের অন্তঃস্রাবী নীরব স্বর। বুকে টেনে নিল শ্রাবস্তিকে। কোনও কথা নেই। সব কথা থেমে গেছে বাবা-মেয়ের হৃদয়ের স্পর্শে। ভাষাহীন অনুভূতির আবেগে। আশ্রয়প্রার্থী বিহঙ্গের নৈঃশব্দ্যে। নৌকাওয়ালাও ইতিহাস বলা থামিয়ে দিয়েছে। কীসের ইতিহাস? বর্তমান যেখানে নতুন ছন্দে দুটি জীবন্ত আত্মাকে বরণ করে নিয়েছে, সেখানে মৃত অষ্টগণ্ডা লোকের নাম আওড়ে কী লাভ? বহুদিন নৌকাওয়ালা-কাম গাইডের কাজ করেছে। আজ তার কাজ সার্থক। পুরনো ইতিহাস ঘেঁটে কিছু কামিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু এই মুহূর্তের অনুভূতিকে টাকার পাল্লায় বিচার করা যায় না। আবেগে বলে উঠল "খুস রহো বাবু। খুস রহো বেটি। মেরা ঔর কুছ কহনেকা নেহি"

মঞ্জরীর চোখে জল। অনেকদিন আগে শীতের সকালে শুনতে পেয়েছিল কোকিলের রব। সেই রব আজ একসঙ্গে মিশে গেছে বহু চেনা রাগের না-শোনা সুরে।

মেয়েকে বুকে আগলে, ফিসফিস করে বলল "মেয়ে তো বাবার কাছে ক্ষমা চায় না। বাবার কাছে দাবি করে। তোমার দাবিই আমার সব থেকে বড় পাওয়া"

কোন অরিজিৎকে দেখছে শ্রাবস্তি? রঞ্জিতার দেখানো না রক্তমাংসের অরিজিৎ? একটাই মানুষ। দুই দৃষ্টিভঙ্গি। সময় হয়েছে নতুন আঙ্গিকে বিচারের। নিজের মতো করে। এতদিনের দেখা জীবনকে সে আবার নতুনভাবে দেখেছে। এই নতুন দেখার আলোকে, আগামীর পাথেয় তৈরি করতে হবে। ক্রমশ ডেভিডের ছবিটা মিলিয়ে যাচ্ছে। চোখের জলে, রঞ্জিতার ছবিটাও ঝাপসা। স্টিভ কী এটাই চেয়েছিল ওর থেকে? না

পেয়ে, দূরে সরে গেছে? অশ্রুরাশির ঝাপসা আবছায়ায় ক্রমশ ফুটে উঠছে আরও দুটি মুখ। যাদের আলোয় নতুন করে দেখতে পারছে নিজেকে। নতুন করে পাওয়া নাড়ীর বন্ধনকে...

এই বন্ধনের মধ্যেই তো মুক্তির আনন্দ। যা ঝাপসা হয়ে এসেছিল, সে পথের শেষ দেখার জন্যই অশ্বমেধ শুরু হয়েছিল না-জানা পথে। সেই ঘোড়া যখন এখানে ঠেকেছে, এটাই তার আগামীর পাথেয়, বাঁচার নতুন মন্ত্র।

চোখের জলে অরিজিতের শার্ট ভিজে গেছে। ঝাপসা চোখে চেয়ে আছে মেয়ের দিকে।

সি ইজ হিস স্কাই।

সি ইজ হিস হোপ।

মেয়ের চোখে তাকিয়ে মনে হল ‘‘আই নো, আই উইল বি লিভিং ইন দিস বিউটিফুল ওয়ার্ল্ড, ইভন আফটার আই অ্যাম গন’’ ওর মধ্যেই তার প্রকাশ।

ওর মধ্যেই তার বিকাশ।

সে আর কেউ নয়। তার একমাত্র মেয়ে শ্রাবস্তি।

***

নীচে ভেসে বেড়ানো মেঘের ফাঁকে সোনালি রোদের হাসি পূর্ণতার প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে। অনেক বছরের না-পাওয়ার ছোঁয়া। সারাজীবন ছুটে বেড়ানো স্বপ্নের মায়াজাল কাটিয়ে, মায়ার বাইরে, পূর্ণতার স্নিগ্ধ আবেশটুকু নিয়ে বিভোরে বেঁচে থাকা। শূন্যতা সেখানে অন্ধকারে মুখ ঢেকেছে। মেঘের দিকে তাকিয়ে মনে হল, সে আর অজানার পথে পাড়ি দিচ্ছে না। অজনাকে জেনেই বরণ করেছে আগামীর পাথেয়।

বাবা আর খুঁজে পাওয়া হৃদয়ের মা, দমদমে বিদায় জানাতে এসেছিল। মঞ্জরীর চোখ জলে ছলছল। কাছের মেয়েটা দূরে চলে যাবে? টুম্পা ফিরে আসেনি। মঞ্জরী জানে, শ্রাবস্তি ফিরে আসবে। কিন্তু কাছে না-থাকা মেয়ের ই-মেল, হোয়াটসঅ্যাপ ফোনে মন ভরে?

শ্রাবস্তি আশ্বাস দিয়েছে ‘‘প্রতি উইকএন্ডে ফোন করব’’

পেয়েও হারাতে হচ্ছে। ফোন করা আর পাশে পাওয়া কী এক জিনিস? দুধের স্বাদ কী ঘোলে মেটে? তবুও ওটুকু আশায় বুক বাঁধা। হারানোর মধ্যে মনের প্রদীপে সন্ধ্যারতি। সব কিছুই তাই। কিছুই থাকে না। কদিন আগেও ছিল না। পেয়েও হারাতে হয়! তবুও এর মধ্যেই চলে জীবনের প্রবাহ। মৃত্যু একদিন সে প্রবাহে যবনিকা টানে। আবার জন্ম! অন্য রূপে, অন্য রঙে পাওয়া-হারানোর খেলা। আবার মৃত্যু। লাইফ

সাইকেলের এই গোলকধাঁধায় পার হয়ে যায় জন্ম থেকে মৃত্যু, আজীবন। জীবনের মানে বোঝার আগেই জীবন শেষ হয়ে যায়।

অরিজিৎ চুপ করে দূরে দাঁড়িয়ে। দেখছে তার একমাত্র মেয়েকে। অনেক দিনের অদেখাকে নতুন রূপে। সেখানে কোনও সুর নেই, তাল নেই, ছন্দ নেই। শুধু আছে বহুদিনের স্বপ্নের জীবন্ত অনুভূতি। মেয়ের চোখে তাকিয়ে। তার মতোই অন্তর্ভেদী সে দৃষ্টি। চোখের মণিদুটো জ্বলজ্বল করছে।

সেই তার সূর্য।

সেই তার চন্দ্র।

সেই তার তারা।

সেই তো তার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড।

এই অখণ্ড, বিস্তৃত বিশ্বকে দেখছে, মেয়ের চোখের তারায়... তার মনে হল, এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পরেও বেঁচে থাকবে তার মেয়ের মধ্যে। সে আর কেউ নয়। তার একমাত্র মেয়ে শ্রাবস্তি।

মঞ্জরীর দিকে তাকাল। ছোটবেলায় দেখা বনলতা সেনের মায়াজাল ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বের আঙিনায়, বুঝতে পারছে, ক্ষণস্থায়ী জীবনের মায়া কাটিয়ে তো চলে যেতেই হবে। এই পৃথিবীর নিয়ম। স্বপ্নের বনলতা সেনের দুনিয়ায়, সে যদি আগামীর স্বপ্ন এঁকে দিতে পারে, এর চেয়ে সুখের মৃত্যু আর কী হতে পারে? সেই স্বপ্নের আত্মজ আর কেউ নয়। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া তার শ্রাবস্তি।

বাবাকে চুপ থাকতে দেখে, শ্রাবস্তি এগিয়ে এল। বাবার হাতটা তুলে চাপ দিল। অরিজিৎ কোনও কথা বলছে না। মুখটা শ্রাবস্তির কারুকার্যের মতোই আজ একটুকরো পাথর।

"আমি আবার আসব। প্রতিবছর আসব। যখনই তোমার দরকার হবে তখনই"

অরিজিৎকে চুপ দেখে, শ্রাবস্তি ওর ডান হাতটা তার মাথায় রাখল। ফিসফিস করে বলল "বাবা তুমি শুনিয়েছিলে 'তৎত্বম অসি'। বিবেকানন্দ রকসে দাঁড়িয়ে তুমিই বলেছিলে আমার দেহের অণু-পরমাণু ভারতবর্ষ। আই অ্যাম ইন্ডিয়া" জড়িয়ে ধরে অশ্রুচোখে চেয়ে বলল "একা নই। তুমি আমার সব। আমার দেহের অণু-পরমাণু তুমি। আই অ্যাম ইউ"

নিজেকে সংযত রাখতে পারল না অরিজিৎ। চোখের জলে প্রবল আবেগে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল। ভাষাহারা মৌনতা দুজনের স্পর্শে শব্দ খুঁজে নিল ছোটবেলার রাইমের মধ্যে।

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার

হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর

সেই তারারা নিঃশব্দে গেঁথেছে মালা। নতুন জীবনের ডালা। নতুন ছন্দে। পরম প্রাপ্তির আনন্দে। এ জন্মে, এর থেকে আর বেশি কী চাওয়ার থাকতে পারে?

ফিসফিস করে বলল ‘‘টেক কেয়ার মাই গার্ল’’

পাশে দাঁড়ানো মঞ্জরীর চোখেও জল। শীত ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। কোকিলের ডাক বনবিতানের নীরব ঐকতানেই শুধু নয়। সে ডাক শুনতে পাচ্ছে, হাজারো কলধ্বনির মধ্যে। বসন্তকে নবরূপে আলিঙ্গনে। ফেলে আসা অনুভূতির নতুন বরণমালায়।

“ইউ টু” শ্রাবস্তি ফিসফিস করে বলল।

অরিজিতের বেষ্টনী শিথিল হতে, শ্রাবস্তি হ্যান্ড লাগেজ তুলে মঞ্জরীর দিকে এগিয়ে গেল ‘‘আমি তো আসতেই থাকব। যখনই তোমরা চাইবে। মা, বাবার কেউ নেই। তুমি দেখো’’

শ্রাবস্তিকে বুকে টেনে চোখের জলের বন্যায় ফিসফিস করে বলল ‘‘ঘর কী? আমারা হয়ত কেউ পাব না’’

ওর কথার রেশ টেনে শ্রাবস্তি বলল ‘‘ইংল্যান্ডে বসে ঘর খুঁজতাম। সংসার খুজতাম। ভবিষ্যৎ খুঁজতাম। ‘আমার’ ভারতবর্ষে এসে দেখলাম ঘর শুধু দেশ-কাল-সময়ের মধ্যে নেই। ঘর তো সব-সময়ই আছে। দেখাটা বাকি ছিল। আজ সে দেখা পূর্ণ হল’’

“ঠিক বলেছ। ঘর তো আমাদের মনে। তোমার আসাতে আমারও চেনা হয়ে গেল”

সিকিউরিটি এনক্লোজারের ওপাশে, শ্রাবস্তির হাত-নাড়া অবয়ব মেলাবার আগে, হারিয়ে গিয়েছিল দু’জনেই। ভাষাহীন নীরবতায়। স্তব্ধ মৌনতায়। তা যেন গতিময় বর্তমানকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে অনাদি-অনন্তের সামনে।

অরিজিৎ মঞ্জরীর হাতে চাপ দিল। অরিজিতের হাতটা টান দিয়ে মঞ্জরী বলল ‘‘তবে চলো। বাকি যে কটা দিন আছে, পায়-পা মিলিয়ে হেঁটে নিই’’

শ্রাবস্তির চোখের জল শুকোতে কতক্ষণ লেগেছিল, জানে না। প্লেনটা মাটি থেকে ডিভোর্স করার আগে, ভারতের সুজলা সবুজের দিকে অপলক চেয়ে। এয়ার হোস্টেস বলে চলেছে ‘‘প্লিজ ফাস্টেন ইওর সিট বেল্টস। উই আর টেকিং অফ ফ্রম দ্য নেতাজি সুভাষ ইন্টারন্যাশনল এয়ারপোর্ট। দ্য ফ্লাইট টু হিথরো ইজ গোয়িং টু টেক আস ইলেভেন আওয়ার্স। দ্য ওয়েদার অ্যাট...’’

চিরাচরিত বুলিগুলো কানে আসছে না। বুকের ভেতর দোটানা। যে পৃথিবীতে বড়ো হয়েছে তার থেকে যে পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছে তা কত আলাদা। কোন পৃথিবীর পথে সে হাঁটবে? মনের পৃথিবীর সঙ্গে বাস্তবের

পৃথিবীর কত তফাত।

খুঁজতে এসেছিল বাবাকে। দেখে গেল বাবাকে, ভারতের আদি অকৃত্রিম প্রাচীন ঐতিহ্যকে। সেই তো এই বিশাল দেশের অতিপ্রাচীন সভ্যতার একটুকরো মুক্ত। লন্ডনের গাওয়ার স্ট্রিটে বা হ্যাম্পটন কোর্টে কোথায় দাঁড়াবে?

আসার আগে বাবা তাকে ছোট্ট এমপিথ্রি প্লেয়ার কিনে দিয়েছিল। বলেছিল ‘‘এখন নয়। হিথরোতে নেমে ইমিগ্রেশন থেকে বেরিয়ে এটা শুনবে’’

“কী আছে?” শ্রাবস্তি উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করেছিল।

“শুনলেই বুঝতে পারবে”

মন চাইছিল এখুনি শোনে। কী সুর, কথা, বাঁধা আছে? বাবা দৃঢ়ভাবে বলে দিয়েছে ‘‘কিছুতেই এর আগে শুনবে না। মাই হনেস্ট রিকোয়েস্ট টু ইউ’’

বাইরের সোনালি রোদের ঝলকানির আলোয় সংশয়ের উত্তর খুঁজছিল। কেবলই মনে পড়ছে ভারতের অতিপ্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সারসত্য ‘মিডল পাথ’। বাবাও এও বলছিল, অ্যারিস্টটলের কথা ‘ভারচু লায়েস ইন দ্য গোল্ডেন মিন’। যদি দু-দেশের দুই অতিপ্রাচীন সভ্যতা একই ভাষা বলে থাকে, তফাত কোথায়? তফাত কিছুই নেই। দেখাটাই কেবল আলাদা।

যে দেখেনি, সে বোঝে না।

যে বোঝেনি, সে চেনে না।

আর যে চেনে না, সে কেমন করেই বা জানবে, যে মানব-সভ্যতার দৈনন্দিন প্রবাহের বাইরে সর্বকালে সমস্ত ধর্মই মানুষের জন্য একটাই ভাষা বলেছে। সব দেশেই তো মানুষ, আনন্দে হাসে, দুঃখে কাঁদে। ইতিহাসের একইভাবে পুনরাবৃত্তি হয়েই চলে। তবুও অঞ্চলভেদে তাদের রীতি-নীতি আলাদা। তাকেও তো একটা রীতি মেনে সংসারের পথে চলতে হবে। সে তো অরিজিৎ বসু নয়, যে সব দেশ ঘুরে, নিজের পৃথিবীতে হারিয়ে যেতে পারবে?

প্লেন যখন হিথরোতে ল্যান্ড করল তখন দুপুর। গ্রিনউইচ মিন টাইমে দুপুর দুটো। ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকার জন্য ইমিগ্রেশন ক্লিয়ার করতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। বাইরে কনভেয়ার বেল্টে লাগেজের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল।

দেখল ওপাশে এক মিক্সড ক্যাপল। কোলে ছোট্ট ফুটফুটে শিশু। দ্য ম্যান অ্যান এশিয়ান, ইন্ডিয়ান কিংবা পাকিস্তানি। বউটি ব্রিটিশ। কোলের বাচ্চার দিকে তাকল। সাদা না কালো? এই নিষ্পাপ শিশুর তো কোনও

রং নেই। সাদা-কালোর ওপরে উঠে, মিটমিট হাসছে। ওই ক্যপল শিশু কোলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে। ট্রলি ঠেলতে দেখল, ওপাশের হাজারও ভিড়ে ওদের পরিবার ওদেরকে চিহ্নিত করেছে। এগিয়ে এসে দু-হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিল। বাচ্চার হাসি তাদের অনুভূতিকে বহির্বিশ্বে নিয়ে এসেছে। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আনন্দে এগিয়ে চলেছে লিফটের দিকে...

শ্রাবস্তি ট্রলি ঠেলে বেরিয়ে এল। বাইরে থেকে সাটল বাসটা ধরতে হবে। রামাদা-ইনের উলটো দিকে কারপার্কে ওর গাড়ি। ওখান পর্যন্ত নিয়ে যাবে ফ্রি সাটল।

বাসে বসে মনে পড়ল বাবার কথা। মঞ্জরীর কথা। কলকাতার কথা। ভারতের কথা। ফেলে আসা অচেনাকে নতুন করে দেখার কথা। আর বাবার দেওয়া এমপিথ্রি প্লেয়ারের কথা। কানে হেডফোন লাগিয়ে এমপিথ্রি প্লেয়ার চালিয়ে দিল। কথা নয়। অতি পরিচিত পুরনো হিন্দি গান। সাউথহলে রেস্টুরেন্টে কয়েকবার শুনেছে।

এমপিথ্রি প্লেয়ারে বেজে চলেছে বাবার দেওয়া গানঃ

জিনা ইয়াহা মরনা ইয়াহা

ইসকে সিওয়া জানা কাঁহা

জি চাহে যব হামকো আওয়াজ দে

হাম হ্যায় ওহি, হাম হ্যায় ইয়াহা...


তোমাকে...
অনিরুদ্ধ বসু



তোমাকে...

TOMAKE

Published by SMRITI PUBLISHERS
Website: www.smritipublishers.com

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ২০১১
প্রথম ই-বুক প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ২০১১

দ্বিতীয় প্রকাশঃ এপ্রিল ২০১৫
প্রথম ই-বুক প্রকাশঃ এপ্রিল ২০১৫

প্রচ্ছদপটঃ পাপিয়া ঘোষাল
অলংকরণঃ স্বপন দত্ত

উৎসর্গ

আমার বোন
সুমনা বসু কে

যাদের সহায়তা এই লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে

আশিস কুমার চট্টপাধ্যায়
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
সুধীতি নষ্কর
জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

অনিরুদ্ধ বসুর **“তোমাকে”**-র পাণ্ডুলিপিটি পড়ার পর একটা কথাই মনে হল যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্য সত্যিই বোধহয় সাবালক হয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যের ম্যচুরিটির পরিচয় বলতে একদল লোক বোঝেন অকপট যৌনতা অবাধে বলার অধিকার। আমি সে দলে নই। সাহিত্যের সাবালকত্ব শুধুমাত্র যৌনতার খুল্লামখুল্লা বিবরণেই হয় না। আরও অনেক কিছুই প্রয়োজন সেই তকমাটুকু অর্জন করার জন্য। সবচেয়ে বেশি যেটা লাগে, তা হল সেরিব্রাল ম্যচুরিটি, অর্থাৎ মানসিক সাবালকত্ব। সেটা বোঝা যাবে কী করে? উত্তরটা হল, মানসিক বিস্তৃতি দেখে।

সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। জীবন বলতে আমরা কী বুঝি, এ প্রশ্ন করলে নানা জন নানা উত্তর দেবেন, কেননা প্রত্যেকেই জীবনকে নিজের প্যারাডাইম দিয়ে দেখেন এবং বিচার করেন। কিন্তু জীবন শুধুমাত্র একজন বা এক দল বা এক জাতির দর্শন নয়। জীবন মানে এর উপরেও অনেক কিছু। প্রকৃতির সঙ্গে ইন্টার‍্যাকশন জীবন। তাই তার মধ্যে এমন অনেক কিছু ঢুকে পড়ে, যা হয়তো-বা একজন সাধারণ মানুষের হিসেবের বাইরে। সাহিত্য তখনই সাবালকত্ব অর্জন করে, যখন এই সব অজানা অচেনা দিকগুলো সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

‘তোমাকে’ উপন্যাসটি সেইরকম একটি গণ্ডিভাঙা লেখা। না, চিঠি দিয়ে লেখা বলে নয়, কারণ বাংলা সাহিত্যে পত্রসাহিত্যের অভাব নেই। **‘তোমাকে’**-র অনন্যতা অন্যখানে। এর নতুনত্ব হল ভার্টিকাল টাইম (যাকে বাংলায় বলা যেতে পারে ‘উল্লম্ব সময়’)-এর মতো একটা কঠিন ম্যাথেমেটিকাল কনসেপ্ট নিয়ে দুজন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ফুটিয়ে তোলা।

নায়ক এবং নায়িকা, কারও নাম নেই (এটাও একটা নতুন স্টাইল বলা যায়)। নামহীন দুজন মানব-মানবী আধুনিক জীবনের গোলকধাঁধায় কানামাছি খেলছে নিজের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে। প্রেমকে খুঁজতে গিয়ে কামের চোরাবালিতেও পড়েছে। আর তাদের এই খোঁজাটা তাদের পৌঁছে দিচ্ছে সময়ের অন্দরমহলে। এই সেই সময়, যা এক উদাসী সন্ন্যাসীর মতো বয়ে চলেছে কোনো দিকে না তাকিয়ে। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ এই উদাসীর চলার ছন্দেও আসে ছন্দভাঙার খেলা। সময় হয়ে ওঠে উল্লম্ব। আর এই ভার্টেক্সে যে পড়ে, সে-ই আস্বাদন করে এক তূরীয় লোকের অনন্য অভিজ্ঞতা।

অনিরুদ্ধর কৃতিত্ব, সে এই কঠিন কনসেপ্টটিকে আমাদের ধরা ছোঁয়ার নাগালে পৌঁছে দিয়েছে। বাকিটা মননশীল পাঠকের নিজের মোকাবিলা, সময়ের সঙ্গে।

দুর্গাপুর, মে, ২০১১

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় প্রকাশের ভূমিকা

ব্যতিক্রমী উপন্যাস লেখার দুটো দিক আছে।একদিকে যেমন বিদগ্ধ মহলে তা বিশেষ সমাদৃত হয়ে বেস্ট সেলার হয়ে যায়, অন্যদিকে কিছু সমালোচকদের হাতে পড়ে অর্থহীন লেখার আখ্যা পায়।পত্র-সাহিত্যের চেনা গতে ফেলে ওরা খুঁজতে চায় চিরায়ত একটি ভ্রমণ কাহিনি ও গতানুগতিক বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে কোনো পরকীয়া প্রেমের বিন্যাস।যেটুকু থাকবে সরল চিন্তার মায়া জালে জড়িয়ে।

পত্র-সাহিত্য হিসেবে লেখা হলেও, **'তোমাকে...'**যেতার পরিধি ছাড়িয়ে সময়ের অন্দরমহলে পৌঁছে গেছে এবং সময়ের লিনিয়ারিটি ভেদ করে তার চতুর্থ মাত্রা বা ফোর্থ ডাইমেনশন 'উলম্ব সময়', যা 'ভারটিক্যালটাইম' তার হাত ধরে পৌঁছে গেছে তূরীয় লোকে।সাধারণ পাঠক এত কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে যে, সেই কঠিন ধারণা আস্বাদন করতে ব্যর্থ হয়।

আসলে যে যেভাবে দেখে, কিংবা দেখতে চায়, বা দেখতে অভ্যস্ত, এই দৃষ্টি ভঙ্গিটাই আসল।থমকে দাঁড়ানো সংকীর্ণ ভাবনার অচলায়তনে আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক কোনো চিন্তা ধারা মেলে ধরাই ছিল লেখাটির মুল উদ্দেশ্য।

প্রথম সংস্করণে সেই ভাবনার যথাযথ প্রকাশ ঘটে নি বলে বহু পাঠকের অভিযোগ ছিল।সেই বক্তব্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি বিষয়টিকে সহজ ভাবে তুলে ধরার।এরপর পুরোটাই পাঠকের হাতে ছেড়ে দিলাম।

এই কাহিনিতে যৌথ সম্পর্কের জটিলতা প্রধান আলোচ্য বিষয়।যে চিরন্তন সম্পর্ক চেনাগতে মিশে গেছে কাল্পনিক সময়ে।যেখানে 'সময়' বাধাহীন, অনন্ত বলে আমাদের কাছে পরিচিত।মানুষের মনে সত্য-মিথ্যা, ঠিক-ভুল, সম্ভব-অসম্ভব, জানা-অজানা, বোঝাওনা-বোঝার চিরকালীন দ্বন্দ্বর প্রতিফলন।

ব্যবহারিক জীবনে নানা সমস্যা আমরা এতটাই নিজের মতো করে পেয়ে থাকিযে, তাদের সঠিক রূপ আমাদের কাছে বহুসময়ে ভীষণ ভাবে অস্পষ্ট হয়ে যায়।অত্যন্ত প্রয়োজনে ও আমরানা-পারি জানতে, না-পারিতার থেকে বেরিয়ে আসতে।ঘুরপাক খেতে থাকি গতিহীন মননে সময়ের আবর্তে।এবং তখনই নিজেকে আবার তৈরি করতে হয়, মনকে গড়ে তুলতে হয় চিরন্তন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়।সেই মুক্তি যতই তাৎক্ষণিক হোক না কেন, আমাদের চাহিদার কাছে সেটুকু অত্যন্ত জরুরি।

দিনের শেষে বা বলা ভালো সারাদিন, প্রত্যেকের নিজের জন্য একটু স্পেস খুব দরকার। যেখানে এসে প্রতিটা ব্যক্তিত্ব নিজের সামনে দাঁড়ায়, নিজেকে ঝালিয়ে নেয় বা কার্যক্রম তলিয়ে দেখে। সেটুকুর জন্যই

বোধহয় প্রতিটা মানুষের কিছুটা নীরবতাও প্রয়োজন। নৈঃশব্দ্য আমাদের অনেকটা ইন্ধন জোগায়।

সমতল থেকে পাহাড় হয়ে আবার সমতলে ফেরা।শেষ পর্যন্ত না পড়লে লেখাটির কেন্দ্রবিন্দুতে কতটা পৌঁছনো যাবে তা নিয়ে সন্দেহ থাকেই।সময়ের ব্যাপ্তিতে লেখাটির স্থান কোথায়, সময়-ই বলে দেবে।লেখক হিসেবে চেষ্টা করেছি গতিশীল বাংলা সাহিত্যকে, একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।আজ পুনঃ প্রকাশনার প্রাক্কালে এক বন্ধুর একটি কবি তার লাইন মনে পড়ে গেল -

'লেখা তুমি আত্ম দহনে জ্বল,
যদি নতুন সুরে, নতুন তানে,
না কিছু বলিতে পার'

শুভেচ্ছা সহ –
এপ্রিল ২০১৫
কলকাতা

অনিরুদ্ধ বসু



প্রথম চিঠি

কস্তূরী

ভালোবাসি!

কথাটা বলতে গিয়েও কোনোদিন বলা হয়নি। নানাভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে, কখনও কবিতার ছন্দে, কখনও-বা অনুভূতির আনন্দে। হয়তো কখনও নিস্তব্ধ কোনো এক মুহূর্তে, একাকী নির্জনে। ভাষা স্থবির, হারিয়ে গেছে এক মৌনতার নীরব মিছিলে... আকাশের ওই উত্তুঙ্গ নীলে... চুপ করে থাকা সাদা ধবধবে মেঘগুলো কী সেদিন কিছু বলতে চেয়েছিল?

তোমাকে?

আমাকে?

কিংবা আমাদের দুজনকেই?

সূর্যের বর্ণালি আলোর প্লাবনে ডুবে যাওয়া চাঁদের পাহাড়টাকে সরিয়ে... স্মৃতির আর্কাইভে পেছন ফিরে আরেকবার দেখার?

নাকি স্পর্শটা বোঝার সময় ছিল না আমাদের...

যখন অনুভূতি ছুটে চলে উত্তাল বেগে, তখন ঠিক সময় হয় না বিবেককে আরেকবার পরখ করে দেখার... বিহঙ্গের সাবলীল উড়ে যাওয়ার নিস্তরঙ্গ ছন্দ, তখন হয়তো ফিরে তাকাতে চায় না পুরনো ফেলে আসা স্মৃতির জলসাঘরে।

জীবন এক কবিতা!

জীবন এক সুর!

জীবন এক পটে আঁকা ছবি!

জীবন তখন বাঁচার এক নতুন মন্ত্র!!

মগজের যন্ত্রটা তখন সাহারার মরুভূমির মতো বেসুরো রাগ।

শুনতে চায় না মন...

তুমি সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে বলেছিলে “কোনটা ধ্রুবতারা বলো-তো?”

বলেছিলাম “তোমাকে যখন চিনে ফেলেছি, ধ্রুবতারা কি না জেনে কী হবে?”

আসলে সব নক্ষত্রের মধ্যে তো ধ্রুবতারাটাই সব থেকে উজ্জ্বল। নক্ষত্র চিনে আমার কী লাভ? পাশে ঢাকাই শাড়ি পরা লম্বাটে মুখের ছিপছিপে অবয়বটা যখন রয়েছে, তখন ধ্রুবতারা, ইষ্টদেবতা, স্বর্গ-নরকের পরিত্রাতা - এসব জেনে কী হবে?

তুমি যখন আছ, তখন মোহময় কিংবা নিরাময় পৃথিবীর স্বাদ তো তোমার মধ্যেই!

সেই স্বাদ ছেড়ে, আর কোন স্বাদের পেছনেই বা বৃথা ছুটব?

কিংবা বুঝব?

কেন-ই বা?

আলতো সরানো সাদা-নীল ঢাকাই শাড়ির পাটের ফাঁক থেকে তোমার সাদা ব্লাউজে ঢাকা স্তনটা কী ধ্রুবতারার থেকে কম আকর্ষণীয়? দূরের কোনো এক না-চেনা উজ্জ্বলতা, কিংবা এক না-দেখা নিরাকার আকার খোঁজার কী কোনো মানে আছে? যখন সব সৌন্দর্যের সাকার, তোমার ওই আলতো নরম উষ্ণ হাতটা চেপে ধরে রেখেছে, আমার ঘামে ভিজে যাওয়া তালুকে।

তাকে অস্বীকার করি কী করে?

নামটা জানা না থাকলেও সৌম্যদার বিয়েতে রুপোলি থালা হাতে গোলাপটা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলে আমার দিকে। সেই মুহূর্তে প্রথম দেখেছিলাম তোমাকে...

আমার কাজ করা কোহিনুরের গিলে করা পাঞ্জাবির বোতামের ফাঁকে গোলাপটা গুঁজতে হাত উঠেছিল তোমার। চোখে চোখ রেখে মিষ্টি হেসে বলেছিলে “এখানেই এটা মানায়”

কোথায় মানায় জানি না। জানবার মতো মনের অবস্থাও তখন ছিল না। সুগন্ধি দেহের সুবাসে তাকিয়েছিলাম তোমার ঘন এলোচুলের দিকে... বড় কাছ থেকে অনুভব করছিলাম তোমার দেহের নিজস্ব সুবাস।

সেদিন কি তুমি মিষ্টি দ্য রোশা লাগিয়েছিলে?

না কি শ্যনেল?

না কি তোমার নিজের দেহের-ই সুবাস?

সুবাসটাকে অনুভব করতে পারি, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরেও রাখতে পারি। কিন্তু কী করব বলো? সুবাসের বাহারি নামটা তো কোনোদিন শিখিনি। শেখবার সুযোগও হয়নি... সামর্থ তো নয়-ই! তবে ঘিয়ে রঙের মটকা শাড়ির খয়েরি পাড়ে, অন্যান্য বেনারসি পরা মহিলাদের থেকে, তোমাকে মনে হয়েছিল আলাদা। এই

নিরাভরণ আড়ম্বরটাই বেশি করে আকর্ষণ করেছিল। তুমি যেই হও না কেন, সবার থেকে আলাদা। আমার স্বপ্নের আকাশের না-দেখা কোনো এক না-চেনা তারা।

সেই প্রথম দেখা।

বিয়েবাড়ির হাজার লোকের ভিড়ে আমার বুকে, নিমন্ত্রিত হাজার জনকে আপ্যায়নের ফাঁকে, তোমার সেই ক্ষণিকের শ্বাস-প্রশ্বাস, সারা সন্ধেটাকে গোলাপের সুবাসে আর রঙিন আলোর স্বপ্নে ভরিয়ে দিয়েছিল।

সেই প্রথম!

বোধহয় সেই ভিড়ের মধ্যে ভালো করে দেখনি আমাকে। তবুও একবার ফিরে না তাকালেও, তুষের আগুনের মতো পুঞ্জীভূত একটা অনুভূতিকে, দূর প্রদীপের বহ্নিশিখা যে দাবানলে পরিণত করতে পারে, সেদিন বুঝিনি।

নাম জানি না। হদিসও জানি না। তবুও সেই স্নিগ্ধতার আগুন, ফাগুন এনেছিল আমার কৃষ্ণচূড়ার রঙে ভরা মনপালাশের আকাশে। একলা রাতের শেষ ঘুমটিকে কেড়ে নিয়েছিল ভৈরবীর অন্তিম রাগিনীর নীরব ঝংকারের ঐকতানে...

এই সেই না-চেনা তুমি।

হয়তো ঠিক সেই মুহূর্তে, তুমি ছুঁয়ে গিয়েছিলে আমার আমিটাকে...

পরের দিন সূর্য উঠেছিল। কিন্তু সূর্যের প্রখর দীপ্তি ম্লান করে দিতে পারেনি তোমার ওই মুহূর্তে দেখা মুখ। সৌম্যদার বিয়ের স্মৃতি ছাপিয়ে বারবার ফিরে এসেছিল একাকী মনের নিভৃতে।

তার পর বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে।

“আমায় চিনতে পারছেন?” এক আধা চেনা মহিলার কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকালাম ভিড়ের মধ্যে। প্রিয়া সিনেমা হলের সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য হলেও থমকে যাওয়া।

কে ডাকছে?

বহু লোকের ভিড় ঠেলে তুমি কচি ঘাস রঙের টাঙ্গাইল শাড়ির আঁচলের পাড় ঠিক করতে করতে, স্মিত হেসে এগিয়ে বললে “চিনতে পারছেন?”

বহুদিন ধরে, বুকের মধ্যে এক স্বপ্নের নীড়ের মতো আগলে রাখা একটা না-ভোলা মুখ, যেন আবার জীবন্ত হয়ে উঠল প্রিয়ার সামনে, অনেক লোকের ভিড়ে, নিস্তব্ধ একাকী অনুভূতির বস্তবের ফসল হয়ে।

“কেন চিনব না? সেই তো বিয়েবাড়িতে দেখা হয়েছিল। ভাবতে পারিনি মনে রাখবেন।”

"এ মা! মনে রাখব না কেন? সেদিন গোলাপটা পরাতে গিয়ে মনে হয়েছিল, এখানেই এটা বেশি মানায়। আপনার পাঞ্জাবির বোতামের ফাঁকে।"

আমি আশ্চর্য, কী করে এতদিন পরেও তুমি আমার কথা মনে রেখেছিলে? ভেবেছিলাম, ওটা তো আমার চোখ দিয়ে তোমাকে মুহূর্তের জন্য দেখা। পাওয়ার সুপ্ত বাসনা জাগার আগে, না-পাওয়ার বেদনা। হঠাৎ মনে পড়ল তোমার না-দেখা লাজুক চাহনির মধ্যেও হয়তো বা তোমার কাজলকালো চোখ সুনিবিড়, আড়চোখে দেখেছিল আমাকে।

"আপনাকেও ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল।" আমার হৃদস্পন্দনের গতি যে কত দ্রুত স্বরে বাজছিল, তুমি কি সেই মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলে? জানবই বা কী করে? জানতে গেলে তো তোমার না-দেখা চাহনির ভাষা বুঝতে হবে। আরও চিনতে হবে তোমাকে...

সলজ্জ হাসি, একঝলক, বলেছিলে "আপনি কি কোনো কাজে যাচ্ছেন?"

"কাজের আগে কি কেউ সিনেমা দেখতে আসে?" একগাল হেসে বলেছিলাম।

"তাহলে এক কাপ চায়ের দাবি করতেই পারি? না কি, সেটা অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে?" মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়েছিলে।

"কেন? অনধিকার হবে কেন? বেশ তো, চলুন না তবে, কোথাও গিয়ে বসি" অধিকারের বেড়াজাল ভেঙে দেখতে চেয়েছিলাম তোমাকে।

সিনেমার ভিড় পেছনে ফেলে দেশপ্রিয় পার্কের গা ঘেঁষে তখন দুজনে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। সন্ধেবেলার জমজমাট কলকাতা আলোর রোশনাই ছড়িয়ে উজ্জ্বল, জনবহুল রাস্তার সন্ধ্যালোকে হাজার লোকের নিজস্ব গতিময় মিছিলে উচ্ছল-প্রাণ নগরীর কেন্দ্রের কোলাহলে।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার আগের মুহূর্তে, লেক মার্কেটের ওপাশে বহু মানুষের পদধূলি স্পর্শ করে বিদায় নেওয়ার ফাঁকে, শাড়ির দোকান থেকে মহিলাগোষ্ঠীর গুঞ্জন, সিনেমা ফেরত তরুণ-তরুণীদের সরব কুজন, আর ঘরের পথে গৃহস্থদের কাজের শেষে গিন্নির ফিরিস্তি মেনে দিনের শেষে লেক মার্কেটের বাজারের মধ্যে তো কোনো নতুন সুর শুনতে পাচ্ছিলাম না।

হয়তো সেই সুর আবার খুঁজে পাব

তোমার মধ্যে...

তোমার দিকে তাকিয়ে...

তোমাকে পেয়ে...

মনে মনে ভাবছিলাম, যাই কোথায়? রাসবিহারী আর শরৎ বোস রোডের মোড়ে, সেই সাবেকি তৃপ্তির দোকানে বসা যেতেই পারে। হঠাৎ মনে পড়ল রোয়িং ক্লাব তো এখান থেকে বেশি দূর নয়। একটু হাঁটলেই পৌঁছে যাওয়া যেতে পারে। ওখানে লেকের পাশের মাঠটা নিরিবিলিও বটে। অনেকদিনের স্বপ্নটাকে বাস্তবে ঠাঁই দিতে হলে, এর থেকে ভালো জায়গা এই মুহূর্তে আর কী-ই বা থাকতে পারে?

"একটু হাঁটতে অসুবিধা আছে?" তোমার চটির দিকে তাকিয়ে বললাম।

"নাঃ... কত দূর?" ফিরে তাকালে। গ্রামের লোকের মতো আবার 'হোথা' বলে বসি কি না।

"আমি একমাত্র একটা ক্লাবেরই মেম্বার। ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব। আমার খিদেও পেয়েছে।"

"বেশ তো চলুন না। ওখানেই গিয়ে বসি। অনেকদিন আগে একবার কুট্টি কাকা ওখানে নিয়ে গিয়েছিল আমাদের। জলের ধারে, তাই না?"

"হ্যাঁ ঢাকুরিয়া লেকের গা ঘেঁষে।"

"আমার জলের ধারে বসতে খুব ভালো লাগে।" ছোট্ট একটা বাচ্চার মতো নিজের মনেই বলে উঠলে।

"আমারও" বলতে গিয়েও, পারলাম না তোমাকে পাশে পেয়ে।

জল, ফুল আর বনানী কার না ভালো লাগে? আর যদি সন্ধ্যারাতে পরিষ্কার আকাশে তারা ওঠে, তাহলে তো কথাই নেই। শুষ্ক, রুক্ষ লোকের মনেও যে দু-কলি প্রেমের অনুভূতির উদয় হবে না... এমন কি স্বপ্নেও ভাবা যায়?

স্বপ্ন মুহূতের্র জন্য হলেও, বাস্তবের পৃথিবীতে যদি চাঁদের মতো নেমে আসে, ক্ষতি কী? সেই মুহূর্তে স্বপ্ন থাকে না, বাস্তবও না। থেকে যায় শুধু মুহূর্তটুকু। তোমাকে তো শুধু সেই মুহূর্তের জন্যই চাইছিলাম। তুমিও বোধহয় সেভাবেই চেয়েছিলে আমাকে। ভাবনাটাকে চাঁদের পাহাড়ে ভাসিয়ে দিতে, জীবনের ছন্দটাকে একটু-বা ঝালিয়ে নিতে... তার আগে কিছু ভাবিনি। পরেও ভাবার মতো কোনো অবকাশ-ই ছিল না। হয়তো সামনে-পেছনে সব সময় সেই শূন্যতাই থাকে। বৃথাই তার মানে খোঁজার চেষ্টা করি অর্থহীন স্বভাবে।

তখনও পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে ওঠেনি। তখনও রাগ ভূপালির শেষ মূর্ছনাটা স্বব্ধ হয়ে যায়নি। তখনও রোয়িং ক্লাবের প্লাস্টিকের চেয়ারগুলো সেই রাগের রেশটা শুনতে পায়নি।

আমি শুনেছিলাম।

তুমিও বোধহয় শুনেছিলে।

নিঃশব্দে, কিছুটা নীরবে।

ভাষাহীন, অনুভূতির মৌনতার মিছিলে। দিনান্তের শেষ রশ্মির মায়াময় আলোকে...

ছোট্ট জলরাশির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলে "কেন বলুন তো আপনার সঙ্গে এলাম?"

“আমি মনে মনে আপনার সঙ্গ চেয়েছিলাম। সব-ই নিয়তি!”

নিয়তি কি সন্ধ্যারাগের নতুন সুর আঁকে। সন্ধ্যারাগ কেন? জীবনের সব রাগ তো নিয়তির সুরে-ছন্দে-স্পর্শে-চেতনায় বাঁধা। সেই না-জানা সুরটাকে আমরা কেবল-ই মেলাতে চাই চেনা চিরপরিচিত জীবনের ঝংকারে। হিসেবের খাতা খুলে। ব্যবসায়িক অঙ্কের কালিমায়... কিংবা স্বপ্নের ঘোরে মোহের আঙিনায়...

“যা চাওয়া যায়, তা কি পাওয়া যায়?”

আবার হিসেব। এই হিসেবের অঙ্ক কষতে কষতে ধুলিসাৎ হয়ে যায় আমাদের জীবন। কেনই বা তুমি সেই অঙ্ককে আবার মাটিতে টেনে এনে মিশিয়ে দিতে চাইছিলে নিজের করে পাওয়া মুহূর্তটুকুকে?

“ওসব গূঢ় কথা ভেবে কী লাভ? পাওয়াটা তো একটা বোনাস। আজ আমি এই মুহূর্তে কী পেলাম... সেটাই কী বড় নয়? হারানোর জন্য তো পড়েই আছে জীবন।”

জলতরঙ্গের ঝিলমিলে তাকিয়ে বলেছিলে “ঠিক তাই। সেরকম ভাবে কোনোদিন ভেবে দেখিনি কখনও। স্বাদ না পেলে, পাওয়ার অর্থটাই বা বুঝব কী করে?”

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলেছিলাম “অত ভেবে কী হবে? ভালো লাগলেই ভালো। না লাগলে চলুন, বাড়ি যাই।”

“যাব কেন? যাবার জন্য তো আসিনি। বেশ লাগছে।” একটু থেমে বলেছিলে “এসেছি ভালো লেগেছে বলেই। কেউ তো দিব্যি দেয়নি আপনাকে চেনার?”

“তবুও যখন চিনেছেন, তখন কোথাও তো মন চেয়েছে?”

“অনেকদিন ধরেই। শুধু হদিসটা জানতাম না।” কচি কলাপাতা শাড়ির আঁচলটা ঠিক করতে করতে বলেছিলে।

“তাই কী?” যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

জবাব আসেনি।

আধো আঁধারিতে তোমার আবছায়া লেকের দিকে ফেরানো সিল্যুটটা শুধু এক অব্যক্ত রাগ শুনিয়েছিল। তুমি বুঝতে পেরেছিলে কি না জানি না। আমি শুনতে পেয়েছিলাম সেই না-বলা রাগ।

সেটাই মুহূর্ত।

কিংবা অসংখ্য রঙিন স্বপ্ন।

হয়তো অনেকদিনের পুঞ্জীভুত না-শোনা কোনো এক অগ্রন্থিত সুর। এই সব ছোট ছোট মুহূর্তের মাঝে সুরের ঝংকারেই তো বোনা হয় জীবনের ছন্দময় কলতান। তারই মধ্যে বেঁচে থাকে আমাদের সুপ্ত নিভৃত প্রাণ। দৈনন্দিন জীবনের নব ঐকতান।

শাঁখরাইলের কাঁচা মাটির রাস্তা, যা পুকুরপাড়ে শ্রাবণধারায় প্লাবিত হয়ে যায়, তার থেকে ঢাকুরিয়া লেকের একাংশে রোয়িং ক্লাবের লন-এর দূরত্বটা খুব বেশি না হলেও, এইটুকু পথ হাঁটতে বহু বছর লেগেছে আমার। কোনো আশা ছিল না, স্বপ্ন ছিল না। তাগিদ শুধু একটাই। বাঁচার। এগিয়ে চলার। সব মিলিয়ে এক দৃঢ় যাপনের অঙ্গীকার।

তুমি হয়তো ভুলে গেছ। পরে একদিন বলেওছিলাম, মনে আছে কী?

"তোমরা শাড়ি আর প্রসাধন নিয়ে যতটা সময় নষ্ট করতে পার, আমাদের ডাল-ভাতের বন্দোবস্ত করতে তার থেকে অনেক বেশি সময় লেগে যায়।"

"কেন? মুখ দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি..."

ঠিক। কথাটা বইয়ে মানায়। ঘরে বসে বিনা পরিশ্রমে ডাল-ভাতের আমদানি হয় না। হত... যদি না অ্যাডাম আর ইভ কোনোদিন ভুল করে জ্ঞানবৃক্ষের ফলটা লোভে পড়ে গিলে না ফেলত। তাহলে বোধহয় সৃষ্টির ইতিহাসটাই পালটে যেত।

তা থাকুক ইতিহাসের পাতায়। তখন আমাকে খুঁজেছিলাম, ছোট্ট পৃথিবীর পড়া মুখস্থ করার খাতায়।

কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর, সেই পুকুরপাড়ের একতলা বাড়ি আর বাবার গ্র্যচুইটির টাকা ছাড়া, আর কোনো সম্বলই তো ছিল না। যাতে দেনার দায়ে ভেসে যেতে না হয়, তাই খদ্দরের পাঞ্জাবি আর কাঁধের ঝোলানো শান্তিনিকেতনি ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম সেই ডাল-রুটির খোঁজে।

রোয়িং ক্লাবের লেকের ধারে চায়ে চুমুক দিয়ে বলেছিলাম "সেদিনের তোমার হাতের গোলাপফুল আমার গিলে করা পাঞ্জাবিতে কী খুব মানানসই লেগেছিল? না, আমাকে খুশি করার জন্য বলেছিলে?"

ঘন কালো বেণীটাকে পেছনে ফেলে বলেছিলে "ভালো লেগেছিল... তাই। এখন ঠিক বলতে পারব না কেন। অনেকদিন হয়ে গেছে তো। সেটা আপনার পাঞ্জাবি না আপনাকে, কে জানে? মনে হয় আপনাকেই। পাঞ্জাবিটা তো একটা উপলক্ষ্য মাত্র।"

"এক অপরিচিত যুবককে কেন ভালো লেগেছিল?"

সন্ধ্যার অন্ধকারে ভালো করে মুখটাও দেখা যায়নি তোমার। তবুও শ্যামবর্ণা সেই মুখের আবছায়া অবয়বের দিকে তাকিয়ে একটা উত্তর খুঁজছিলাম আলো-আঁধারিতে। কী বোকাই না ছিলাম!

সেই অন্ধকারে আমার দিকে ফিরে বলেছিলে "কেন যে কার কাউকে ভালো লাগে, তা কি কেউ জানে? বোকার মতো প্রশ্ন করছেন কেন?"

সত্যিই বোকার মতো। ভালো লাগার কী কোনো কারণ আছে? না কি কোনো চেনা অঙ্ক? বিজ্ঞানীরা যাই বলুক না কেন, ফিনাইল-ইথাইল-এমাইন পড়ে থাক বাক্সবন্দি হয়ে রিসার্চের পাতায়। আমি তো আর বায়ো-

কেমেস্ট্রির ছাত্র নই!

শুধু বুঝি মন। সেটাই আমার অন্তরের প্রতিধ্বনির নিভৃত অবগুণ্ঠন, সর্বক্ষণ। অনুভূতি দিয়ে যার শুরু, সময়ের প্রবাহে মিশে যায় চোখের জলের এক বিশাল সাগরে। সেটাই তো অন্তরের শেষ ঝালার অনন্ত রাগিনী। যা আমাদের অবচেতনে আজীবন দীপ জ্বালিয়ে যায় পাওয়া বা হারানোর বাইরে। মননে, বাঁচার নিভৃত এক স্ফুলিঙ্গ!

ততক্ষণে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আঁচল, রোয়িং ক্লাবের ফাঁক দিয়ে দেখা ঢাকুরিয়া লেকটাকে এক ঝাপসা ধূসর ওড়নায় ঢেকে দিয়েছে। ওপাশে কয়েকটা আলো জ্বলছে। বোধহয় লেক ক্লাবের শেষ ল্যজটুকু। এদিকের রোয়িং ক্লাবের ঘর থেকে ছিটকে আসা আলোর টুকরো একটা মোহময় আবেশে ভরিয়ে দিয়েছে মাঠটাকে।

সেই মৃদু আলোয় চোখ পড়ল তোমার পায়ের দিকে। চমকে উঠলাম! এতক্ষণ তো লক্ষ্যই করিনি। আলতা মাখা পায়ের ধারটা ওই ফিকে চাঁদনির আভাসে চিকচিক করছে। ঠিক হেঁসেলে হাঁটু গেড়ে বসা মাটির উনুনে মায়ের ঘুঁটে ঠাসার সময় জ্বলজ্বল করা সিঁথির সিঁদুরের মতো।

মুহূর্তের মধ্যে এক অস্পষ্ট ছবি এক ঝলক চোখের সামনে রং খেলিয়ে মিলিয়ে গেল। চোখটা গিয়ে পড়ল তোমার সিঁথিহীন পেছনে টানা লম্বা গাঢ় ঘন চুলের দিকে। শাঁখের মতো কান, কচি কলাপাতা শাড়ি মোড়া সাদা ব্লাউসে ঢাকা উন্নত স্তন... আবছায়ার মায়া যেন নিবিড় করে দিয়েছে সেই মুহূর্তটাকে।

অপরিচিত শিহরণে কেঁপে ওঠা। আহাঃ... এই মুহূর্ত তো এমন করে আসেনি কখনও।

স্বপ্নের তারাটা তো বহু দূরের। এই মুহূর্তের তুমি তার থেকে অনেক কাছের।

যদি বিয়ে হয়ে থাকত, কিংবা হয়েছে কি না তাও তো জানি না, সিঁদুরটা লাগাতে কোথায়? আজকাল মেয়েরা সিঁদুর পরে না। সিঁদুরটা কি রক্ষণশীল একটা সাবেকি প্রথার বহিঃপ্রকাশ মাত্র? নাকি সামাজিক নাগপাশের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ?

সিঁদুরের আবিরের আভা না-ই বা খেলল মনে, উপঢৌকন সাজিয়ে কি কোনো লাভ আছে প্রতিটি ক্ষণে?

লেকের দিকে তাকিয়ে উদাসীন। বলেছিলাম “ভালো লেগেছে, সেটাই বড় কথা। বিশ্লেষণ করে কী হবে?”

“ঠিক বলেছ। অতশত ভেবে কী লাভ বলো তো? এই মুহূর্তটাকে ভাগাভাগি করে নেওয়াই ভালো। নয় কি?”

একফালি চাঁদ সুদূর আকাশের কোণে উঁকি মারতে শুরু করেছে। কখন সে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ভরিয়ে দেবে জানা নেই। ইদের চাঁদের আলো-আঁধারিতে তোমার একটু লম্বাটে শ্যামলা মুখটাকে আরেকবার দেখা।

কাজলকালো গভীর চোখের দিকে চেয়ে তোমার অনুভূতিকে টের পাওয়ার চেষ্টা। তোমার উপস্থিতিটাই যেন বহু না-পাওয়ার মধ্যে ক্ষণিকের।

হারিয়ে যাওয়া হাজার লোকের ভিড়ে সেই তো আমার মানসীর প্রাণস্পন্দন। ঢাকুরিয়া লেকের জলতরঙ্গের মতো মনে শিহরণ জাগাচ্ছিল এক নতুন অনুভূতি। এই কী ভালোবাসা? আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের প্রত্যাশা? নাকি দূরের ওই চাঁদটার এক ঝলক পরশের মতো হারিয়ে যাওয়া একটা মায়ার খেলা? ইহলোকে দ্যুলোকের কোনো এক না-দেখা অচেনা ছায়া?

সব-ই তো হারিয়ে যায়। দিন-ক্ষণ-রাত্রি। স্রোতস্বিনীর তীরে আমরা শুধু নীরব বয়ে যাওয়া সময়ের অসহায় যাত্রী। না হয় এক মুহূর্ত নিজের মতো করেই দেখলাম তোমাকে...

সেই মুহূর্তে পাওয়া-হারানোর বাইরে বেরিয়ে একা বসে দেখেছিলাম তোমার কাজলকালো চোখের গভীরে কোথাও কোনো নির্জন নিভৃতে একা একা। হয়তো অনুভব করেছিলে আমার নীরব চোখের চাহনি।

বুঝেও না বোঝার ভান করে, আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলে "সিনেমাটা কেমন লাগল?"

"ওই আর কী! সময় কাটানো। আজকালকার সিনেমা তো। মনে তেমন দাগ কাটে না।"

"তাহলে দেখতে গিয়েছিলে কেন?"

"কিছু করার ছিল না বলে। তা ছাড়া এত সস্তায় ফ্রি এসি পাব কোত্থেকে?"

একটু থমকে বলেছিলে "লেকের পাড়ে বসেও তো হাওয়া খাওয়া যায়? সেটা কী আর্টিফিশিয়াল এসির থেকে মন্দ?"

"ভরদুপুরে? ছায়া খুঁজে নিতে হবে তো সেই অন্দরমহলে। ক্লাবের ভেতরে হাঁ করে বসে কি বেয়ারার মুখ দেখব? তার থেকে প্রিয়ার এসিটায় রং-বেরঙের ভেলকি দেখা অনেকগুণ ভালো। তা ছাড়া না এলে তো, তোমার সঙ্গে দেখাই হত না।"

সারা দুপুরের বিস্বাদটা হারিয়ে গেল সেই মুহূর্তে অনুভূতির আবেগে। মালকোষ যেন সন্ধ্যাতারার মধ্যে আজানের সুর হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল তখন।

"এ মা! তোমার নামটাই তো জানা হয়নি!"

"কী হবে জেনে? তুমি যে নামে আমায় ডাকতে চাও, তাই দাও না কেন। আমি তো সেই একই মানুষ।" একটু থেমে তোমার চোখে চোখ রেখে বলেছি "আজ থেকে আমি তোমার নাম দিলাম কস্তূরী। নাম জানতে চাই না। পরিচয়ও না। হিসাব মেলাতেও চাই না"

"কেন?"

"কী হবে জেনে? আমি নয় তোমাকে দেখলাম তোমার মতো করে। কস্তূরী - এটাই তোমার প্রথম ও শেষ পরিচয়।"

হয়তো ঘরে ফেরা পাখিরাও একবার মুচকি হেসেছিল। একটা যুবক। একটা যুবতী। দুই পরিচয়হীন আত্মা কাছে আসতে চাইছে মুক্ত বিহঙ্গের মতো - নামহীন, গোত্রহীন, সামাজিক পরিচয় বিহীন এক নিজস্ব ছন্দে - তাদের জীবনের কাছাকাছি! দুটি হৃদয়ের সাতসুরে গাঁথা অনুভূতির আনন্দে। অপরিচয়ের মাঝে নিজেদের খুঁজে পাওয়া, আকাশ ছেড়ে জমিতে, এক নতুন বালুচরে। সেখানে সাদা-কালো পাখনামেলাদের ঘরে ফেরার আনন্দের মধ্যেই সব ক্লান্তির অবসান। সব বিধূরতার ধারাস্নানে আনন্দের আবাহন।

"বেশ। আজ থেকে আমি কস্তূরী" কচি কলাপাতা রঙের টাঙাইল শাড়ির ওপর পড়ে থাকা সবুজ পুঁথির মালাটা নেড়ে আবার বলেছিলে "আজ থেকে আমি কস্তূরী। তোমাকে তাহলে কী বলে ডাকব?"

"যে নাম তুমি দিতে চাও আমাকে" আমার থেকে ছোট একটা মেয়েকে আপনি বলতে মন সায় দেয়নি। ভালোবাসাতে 'আপনি' হয় না - শুধুই 'তুমি'।"

"কৌস্তুভ"

মুহূর্তের মধ্যে 'আমি'-টা 'তুমি'-তে রূপান্তরিত হল এক অজানা ছন্দে। আমরা জড়িয়ে পড়লাম এক না-জানা, না-চেনা অগ্রন্থিত বন্ধনে। হয়তো নিভৃত অন্তর আবার বহুদিনের সুপ্ত স্বপ্নের ভাষা খুঁজে পেল, আমাদের দ্বৈত অনুভূতির প্রকাশে।

কেউ প্রশ্ন করিনি, কেন দিলাম নতুন একটা নাম। কেউ জানতে চাইনি কী তার পরিণাম। দুজনেই একে অন্যের কাছে নতুন পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম আলো-আঁধারির পৃথিবীতে। ছায়া নেই, কায়া আছে। গোত্র নেই, সূত্র আছে। আকার নেই, বর্ণ আছে। আশা নেই, তবু ভাষা আছে। সমাজ নেই, যদিও আমরা তো আছি।

"কস্তূরী তুমি কোথা থেকে এসেছ জানি না। কোথায় চলেছ তা-ও জানি না। জানতেও চাই না।"

"জানার কী প্রয়োজন আছে? ওই যে পাখিগুলো আকাশে উড়ে চলে যাচ্ছে, ওরা তো জানে, ওরা কোথায় যাবে? শেষ পর্যন্ত কী পৌঁছবে নিজেদের নীড়ে? তারপর থেমে যাবে। আবার সকালে উঠে সেই একই খেলা খেলবে একই চক্রে। এর বাইরেও তো একটা বিশাল বিপুল পৃথিবী। মাটির বাঁধা গণ্ডির টান ছেড়ে চল না আমরা ভেসে বেড়াই ওই নীল আকাশের কোণে। যতদিন না সময় থামিয়ে দেয়ে আমাদের দুজনকে।"

"থামতে তো আমিও চাই না। কিন্তু ওই নীল তেপান্তরে ভাসার ভাষাটা কে বলে দেবে?"

"জেনেই বা কী হবে? যা জানা, তা একটা সীমার মধ্যে বাঁধা।"

“আমরা নয় ভাসলাম সেই সীমাহীন অসীম সাগরে”

কস্মিনকালেও জানতাম না, আমার মধ্যে এত কবিতা লুকিয়ে আছে, শুধু অনুভূতির স্পর্শের অপেক্ষায়। সময়মতো তা আপন শব্দে ফুটে ওঠে স্বকীয় ছন্দে। সেই ছোঁয়া পেলে জীবনটাই হয়ে ওঠে কবিতা। সুর ভেসে বেড়ায় মনে। এই মন আর সুরের যুগলবন্দিই তো জীবনের মর্ম।

মাত্র কিছুক্ষণের আলাপ। কিন্তু মনে হয়েছিল জন্ম-জন্মান্তরের কোন এক অজ্ঞাত ছন্দ যেন নিজের সুপ্ত চেতনায় বাসা বেঁধে ছিল। শুধু অভাব ছিল পরশপাথরের। তার ছোঁয়ায় আবার নতুন ছন্দে জেগে উঠেছে। অনুভূতির একান্ত গভীরে আলতো করে তার কোমল স্পর্শ।

নাম-না-জানা এক রোমাঞ্চ!

সেই প্রথম!

কাছ থেকে দেখা।

মনের সুরের ক্ষীণ আলাপটুকু বুক ভরে শোনা।

যাবার আগে বলেছিলে “যোগাযোগ থাকবে কী করে?”

একটা দশ টাকার নোটে নাম না লিখে, শুধু মোবাইল নম্বরটা এগিয়ে বলেছিলাম “এই দিয়ে”

তুমিও চামড়ার পার্স থেকে একটা বাসের টিকিটে নম্বরটা লিখে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলে “তোমার কস্তুরী...”

শাঁখরাইলের এক সাধারণ ছেলের কাছে স্বর্গটা যেন সেই মুহূর্তে মাটিতে। সংসার আর রোজগারের তাগিদের বাইরে আবার এক নতুন সুর।

জীবনের।

নাকি বেঁচে থাকার নতুন ঐকতান?

সারাদিন টিপ-টিপ করে বৃষ্টি। কী যে ভূত চাপল তোমার। বললে মেট্রোর সামনে দেখা করবে।

বৃষ্টি তখনও থামেনি। প্যাচপ্যাচে ক্লান্তির নেই কোনো বিরাম। নেই সারাদিনের একঘেয়েমির অবসান। অবিরাম বৃষ্টির ছটা। জল জমেছে কলকাতার আনাচে-কানাচে। ছোটোবেলা থেকে যেমন দেখে আসছি। একটুও পাল্টায়নি।কলকাতায় বৃষ্টি মানেইহাঁটু জল। ট্র্যাফিক জ্যম। কেন যে একটু বৃষ্টি হলেই কলকাতায় গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে, কে জানে? এ এক নিয়মিত ব্যারাম।

বাস থেকে নেমে চটিটা সামলে বললে “ফুচকা খাব।”

সেরেছে। এই টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে ফুচকাওয়ালা কি এখনও পসরা সাজিয়ে বসে আছে? এসপ্ল্যানেডে বাস স্ট্যান্ডের কাছে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু ভিক্টোরিয়ার গেটের পাশে যে থাকবে না, সেটা নিশ্চিত।

কুঁড়েমির জন্য একটু হেসে বললাম "অনাদি কেবিনে মোগলাই পরোটা খেলে হয় না?" যদিও সেই মুহূর্তে আমারও ফুচকা খেতে ইচ্ছে করছিল।

"না। ফুচকা।"

কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে লাগলাম এসপ্ল্যানেডের বাস গুমটির দিকে। দূরপাল্লার বাসগুলো ছাড়ার আগে বাঙালির রসনা তৃপ্ত করার স্পৃহা জাগতে পারে। সেই ভেবে দু-একজন ফুচকাওয়ালা দিনের লাভের টুকরো গোনার আশায় বসেও থাকতে পারে।

দূরে আকাশবাণীর পাশে আকাশের দিকে তাকালাম। জমাট মেঘ ছড়িয়ে আছে। আনাচে-কানাচে, ইডেন গার্ডেন্সের ওপর। ফাঁক থেকে পড়ন্ত বিকেলের সূর্য লুকোচুরি খেলে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে। সেই লুকোচুরির মধ্যে সুপ্ত এক অনুভূতির আলো-অন্ধকারের মাখামাখি মনে আবির ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তুমিও কি তাকিয়েছিলে ওই পড়ন্ত বিকেলের ধূসরে?

না-জানাকে জানা। না-দেখাকে দেখা। না-পাওয়াকে একটু নিজের মতো করে পাওয়া।

সেই আলো-আঁধারির লুকোচুরিতে মাখামাখি এক স্বপ্নে দেখা, না-পাওয়া খেলা।

লক্ষ করলাম, ব্লাউজটা পিঠের দিকে ভিজে গেছে বৃষ্টিতে। তোমার সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তাকিয়ে আছ ওই বৃষ্টি-ভেজা দূরের ঘাসের দিকে। যেখানে জলের কণা আলতো করে নরম ছোঁয়া দিচ্ছে গড়ের মাঠের সবুজে। সেখানেই জীবনের ছন্দ। সেখানেই পাওয়ার আনন্দ। সেখানেই লুটিয়ে আছে মনের নিভৃত স্বপ্নের আতরভেজা সুগন্ধি জীবনের লাবণ্য। তোমার না-পাওয়া তুমি। হয়তো আমার হাতে হাত রেখে তোমার আমি।

"কী অদ্ভুত, তাই না?" হাঁটতে হাঁটতে আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলেছিলে।

"কী?"

"তোমার আর আমার মোবাইলের রিং টোন এক।"

সত্যি তো।

লক্ষ করিনি।

তুমি করেছিলে!

নিজের অজান্তেই যুগলবন্দি সুর ভেঁজেছিল দুজনের না-পাওয়া পৃথিবীর ধূসরে।

সেই মুহূর্তে একটা সুপ্ত চেতনা কোনো আবছায়া ছবি খুঁজছিল...

একটা ছবি!

একটা না-পাওয়া জীবনের নতুন বিচ্ছুরণ!!

তোমাকে

কৌস্তুভ



দ্বিতীয় চিঠি

কৌস্তুভ

সত্যি তুমি আমার জীবনে একটা স্ফুলিঙ্গ।

রোজকার একঘেঁয়ে জীবনে না-পাওয়ার এক নতুন অঙ্ক। সব কিছুই তো আছে আমার... বাড়ি... স্বামী... কন্যা। বেঁচে থাকার মতো অর্থটুকুও। তার বাইরেও তো আছে মনের মতো একটা নিঃশব্দ বাক্যহীন আত্মচেতনার যন্ত্র। তবু সব কিছু পেয়েও কোথায় যেন একটা অনন্ত বিস্তারি শূন্যতা। তাই মহাশূন্যের নিঃসীম গভীরে না হারিয়ে, জাগতিক বালুচরে বহুদিন ধরে মন চাইছিল এই অসম্পূর্ণ আমির একটা নীরব উন্মোচন। হয়তো-বা নিজের মনের আয়নায় আরেকবার নিজেকে দেখা। নতুন কোনো এক আভরণ। অতৃপ্তির সমুদ্রে ডুবে থাকার মধ্যেও, মনের স্পর্শে আশ্চর্য না-ছোঁয়া মলম।

মুখঢাকা গৃহবধূ যেন নিজের অপূর্ণতার চরাচরে লক্ষ্মণরেখার বলয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দি হয়ে একটু আকাশ খুঁজছিল। দেবীর আরাধনার নৈবেদ্য সাজাবার আগে এক টুকরো বেশ্যালয়ের মাটি। বলয়ের বাইরে মনের এক নতুন স্ফুলিঙ্গ। আমার না-বলা কথার, নতুন কোন এক না-জানা সুরের অপরিচিত রেশ। না-শোনা পাখির ডাক। যা বহুদিন ধরে খুঁজেছিলাম জীবনের গহীনে। যাকে ছুঁতে গিয়েও পারিনি হৃদয়ের অন্তরে। তবুও সেই না-শোনা কলরব বারবার স্বপ্নের রূপে ভেসে আসছিল আমার অবচেতনে। সেই স্বপ্নের গলি ধরে এগিয়ে যাওয়া... স্বপ্নের রাজপথকে আবার নতুন করে খুঁজে নেওয়া। সেটাই তো আমার বেঁচে থাকার দোসর। একাকী নিভৃত অন্তর।

সেই যেদিন বিয়েবাড়িতে তোমায় প্রথম দেখি, মন বলেছিল তুমি একা, অন্য। অন্তরের কেমেস্ট্রির মানেটা বুঝি না। ইকনমিক্সের ছাত্রী। তবে তোমার জিওগ্রাফিটা দেখে মনে হয়েছিল, তুমিই আমার অন্তরের গোলাপের না-দেখা, না-জানা কোনো এক অচেনা পথিক। তাই বুকে গোলাপ আটকাতে গিয়ে নির্বাক সর্মপণ হয়েছিলাম তোমারই কাছে, আমার অন্তরের অনুভূতির দৃষ্টিতে। না-পাওয়া এক নিভৃত আত্মার মুহূর্তের পরিতুষ্টি। কিছুই বলতে পারিনি সেদিন।

তাই তো কলম তুলে নিজের কথা লিখতে বসেছি তোমাকে...

সৈকত তো বেশিরভাগ সময়ই বাড়ির বাইরে থাকে। দূর-দূরান্তে কাজের সূত্রে ছুটে বেড়ায়। একা পিঙ্কুকে নিয়ে কেমন যেন ছন্দহীন আবর্তে পড়েছিলাম। প্রাচীরহীন এক অদৃশ্য বন্ধন ঘিরে রেখেছিল আমার প্রতিটা ক্ষণ। মুক্তির মধ্যেই বদ্ধতার গুমোট ক্লস্ট্রফবিয়া গ্রাস করেছিল।

নাকতলার বাড়ির বসার ঘরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম... এটাই কী বিবাহিত জীবন! মাত্র এইটুকু? এর বেশি চাওয়াটা কি সমাজের চোখে বেসুরা রাগ হয়ে বাজবে? আমার মনের আকাশ কি চিরদিন অসম্পূর্ণতার ভেলায় ভাসবে? বারবার খুঁজতাম আমার না-পাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, না-দেখা সেই আকাশটাকে। আমার একান্ত নিভৃত পিয়াসী মনও খুঁজত অলীক পৃথিবীর রূপটাকে... বর্ণহীন ধোঁয়াশায় ভরা স্বপ্নটাকে যদি নিয়ে আসতে পারি বাস্তবে।

নোঙরহীন তরীটাকে যদি ভেড়াতে পারি অজানা তীরে...

ধীমান মাঝে-মধ্যে আসত। আমার থেকে বয়সে ছোটো। অনর্গল বকবক করে যেত। সেটুকুই আলোর ঝিলিক। অথবা সময় কাটানোর বাইরে ঘরে বসে দেখা আরেক মিরিক।

"আচ্ছা দিদি, বলো তো বিয়ে করতে গেলে কি চাকরি-ই করতে হবে?"

"কে বলল?"

"সুধীতি"

"সুধীতি কি তোমায় বিয়ে করবে, না তোমার চাকরিকে?"

"ভালো যখন বাসে, তো আমাকেই করবে বলে মনে হয়। চাকরিকে আবার বিয়ে করা যায় নাকি?"

"আমি তো কোনো চাকরি করিনি। বলবই বা কী করে?"

"জানো দিদি... একটা ব্যবসা করার ইচ্ছে আছে। এই যে তোমাদের সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম, তার ব্যবসা।"

"এ দেশে চলবে?"

"কেন চলবে না? এই যে বড় বড় মাল্টিন্যশনল কম্পানিগুলো অফিস খুলছে, মাসে মাসে লাখ-লাখ টাকা সিকিউরিটির ওপর খরচ করছে। যদি সব কিছু ইলেকট্রনিক্যলি করে দেওয়া যায়, অনেক সস্তা পড়বে। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে তো সেটাই এখন বড় কস্ট সেভিং ভেঞ্চার।"

আমি তখন ভাবছিলাম এই আকাশ ছোঁয়া ইনফ্লেশনের বাজারে সংসার চালানোর খরচ কী করে কমানো যায়? আর উনি ভাবছেন কোটি-কোটি টাকার মাল্টিন্যশনলদের খরচ কমানোর কথা। তারাই হয়তো এই ইনফ্লেশনের মূলে। আমি বাস্তবের মধ্যে পৃথিবীটাকে দেখতে চাইছিলাম। ধীমান দেখতে চাইছিল ওর আগামী দিনের বুনিয়াদ, স্বপ্নের নতুন আলোকে।

জাগতিক পাওয়ার স্বপ্নটা তো একদিন অজানা দিগন্তে হারিয়ে যায়। কিন্তু মনের চাহিদার স্বপ্নটা ক্রমশ দিগন্ত ছাড়িয়ে উড়তে থাকে, ডানা মেলা পরিযায়ী পাখিদের মতো। দূর থেকে দূরান্তে। অসংখ্য লোক থেকে লোকান্তরে।

এই রে!

ওই দাড়িওয়ালা বুড়োটা যে আমার পিছু ছাড়ে না। তোমাকে লিখতে বসলেও নিজের অজান্তে উনি যেন ভাষাটুকু বলে দিয়ে জান। উনি আলোকিত করে রেখেছেন আমাদের জীবনের প্রতিটা কণা। কিন্তু বেঁধে দিয়েছেন আমাদের ভাষা থেকে চিন্তার সর্বস্তরের উঠতি ফণা।

না... না... না... না...

দেব না।

কিছুতেই দেব না।

আমার অনুভূতি ওই বুড়োটাকে গ্রাস করতে।

কোনো মতেই নয়।

এটা আমার একান্ত নিজের পৃথিবী। এখানে ওনার প্রবেশাধিকার নেই।

এখানে আমি একা অন্য, সাধারণ নারী।

ধীমান তো শুধু অবসর মাত্র। একটা ছোটোভাই-এর সঙ্গে কিছু সময় কাটানোর একটা ফলহীন যন্ত্র। কিন্তু তাই দিয়ে কী ভরে সর্বক্ষণ আমার না-পাওয়া? এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো। স্রেফ সময় কাটানোর জন্য কিছু ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত। তাতেই সীমাবদ্ধ আমার চিত্ত।

সিনেমা হল থেকে গড়ের মাঠ। মাঝে মাঝে সুধীতি, পিঙ্কুও ভিড়ে যেত। ধীমান আমাদের ভালো ভালো রেস্টুরেন্টে খাওয়াত। সিনেমা দেখাত।

তবুও... কোথায় যেন একটা না-পাওয়ার শূন্যতা...

সৈকতের অনুপস্থিতিতে সময়টা অন্তত দিব্যি কেটে যেত।

একদিন হেসে সুধীতিকে বলেছিলাম "ঘোরা তো অনেক হল। বিয়েটা করছ কবে?"

"বিয়ে করেই বা কী হবে? ও তো ব্যাঙ্গালুরুতে যাওয়ার প্ল্যান করছে। বিয়ে করে আমি থাকব এখানে, আর ও যাবে ব্যাঙ্গালুরুতে। সে বিয়ে করেই বা কী লাভ?"

"কেন তুমিও তো যেতে পারো ওর সঙ্গে?"

"আগে যাক। ব্যবসা জমাক। তারপর তো। ভেবে দেখা যাবে তখন।"

থোড় বড়ি খাড়া। বা উল্টোটা। বিয়েটা যেন সিঁথির সিঁদুরের মতো একটা লাইসেন্স। দিলেই যেন মনের বন্ধন তৈরি হয়ে গেল।

রজনীগন্ধার মালা বদল করে এক রাতেই সৈকত আমায় বেঁধে ফেলেছে। বন্ধন তো বটেই। মানসিক না হলেও সামাজিক শৃঙ্খলের এক উপঢৌকন।

কিন্তু তাতে কি ভরে অতৃপ্ত মন?

আমার অর্থহীন নিঃসঙ্গ দুপুরের একাকী দগ্ধ নিরালায়...

বাকিটা সময়, মনের অবগুণ্ঠনে একটা অব্যক্ত কান্না আছড়ে পড়ত। বাঁধভাঙা অশ্রুর নীরব প্লাবনে।

সেই স্থিতিশীল জলের কোনো গতি নেই...

কোনো দিক নেই...

কোনো বর্তমান নেই...

কোনো ভবিষ্যৎ নেই!

পরমা আর ওদের সাঙ্গপাঙ্গরা মাঝে মধ্যেই আড্ডা মারতে আসত। যেন যিশুখ্রিস্টের লাস্ট সাপারের মতো তেরোজন গৃহিনীর অর্থহীন প্রলাপের সমন্বয়। যার যত টাকা, তার তত গরম। অনর্থক বাক্যালাপের ফুলঝুরি। সাব-থ্যালামিক সব আলাপ-বিলাপ-সংলাপ-প্রলাপ।

ওই আর কী!

মাঝে মাঝে পরমার সঙ্গে কীর্তন শুনতে যাওয়া। সময় কাটানোর সদুপায়। পরমা আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। অযথা বকবকানির চেয়ে গান শোনা অনেক ভালো। সে-ও তো লাস্ট সাপারের তেরোজনের একজন। সেখানে কী করে থাকবে এর থেকে বেশি আলো?

ও বলত "আমার জীবনটাও তাই রে। ছেলেটা মুম্বাইতে চাকরি করে। স্বামীর তো চাকরি নেই সেই কবে থেকে। ঘরে বসে সারাদিন মাল খেয়ে যাচ্ছে। এই যে গান করি, এতেই আমার মুক্তি।"

"পায় কী?" আমি সেরকম গান জানি না বলেই হয়তো এই অবান্তর প্রশ্ন।

"জানি না। তবুও তো কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকা যায় নিজেকে।"

যে বয়সই হোক না কেন, সবাই যেন নাম-না-জানা ছোট ছোট আবর্তের পৃথিবীতে একাকী। বিরাট এই ভূমণ্ডলে। অলিখিত আবর্তটা মানসিক বলয়কে সামাজিক ঘেরাটোপে ধরে রেখেছে।

মুক্তি নেই!

পরিত্রাণ নেই!

এর মধ্যেই বাঁচা।

এর মধ্যেই জীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা খুঁজে নেওয়া।

এর মধ্যেই মরা।

এই বলয়ের মধ্যেই চাওয়া-পাওয়া লুকিয়ে। জীবনের পরিব্যাপ্তিটা ছোট ছোট আবর্তের লক্ষ্মণরেখাগুলোর মধ্যে এক্কা-দোক্কা খেলছে।

"তোর রাজার খবর কী?"

"আছে রানির সঙ্গে। মাঝে মধ্যে ঘুরতেও যাই। সিনেমাও দেখি। ওর বউ বাচ্চা আছে।"

"ডাক্তারি করছে?"

"হ্যাঁ। সে ব্যপারে ঠিক আছে। না হলে সংসার চলবে কী করে? তবে ওই আর কী। এর বেশি আর কী চাইতে পারি ওর কাছ থেকে?"

"শুতে ইচ্ছে হয় না?"

"না রে। কোথায় যেন বিবেকে লাগে।"

পরমা আমার থেকে বয়েসে কত বড়। ওর সে সব সাধ আহ্লাদও চলে গেছে। কিংবা তাকে সামাজিকতার হাঁড়িকাঠে বলি দিয়েছে।

সংস্কার!

বিবাহিত জীবনের সঙ্গে জড়ানো একটা সংস্কার। সুযোগটা তো পরের ব্যাপার। মনটাই যেন ছোটোবেলা থেকে শেখানো গতানুগতিক তালে বাঁধা। সেই সামাজিক লক্ষ্মণরেখায় বড় হতে গিয়ে মন বলে আর কিছু নেই। শুধু একটা পার্থিব প্রাণহীন অবয়ব। যার আচ্ছাদনে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে স্থিতিশীল জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া চেনা সুরের ঐকতানে।

সেই তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়!

বিচ্ছিন্নতা এখানে পাপ।

বিচ্ছিন্নতা সামাজিক বিচ্যুতি।

বিচ্ছিন্নতা মানেই চারিত্রিক অবনতি!

সেই সুর সময়, কাল, যুগের অঙ্কে বাঁধা পড়েছে গতিময় এক বলিরেখার মধ্যে।

শান্তি খুঁজতে চাও?

সেখানেই।

তৃপ্তি খুঁজতে চাও?

সেই পরিমণ্ডলের মধ্যেই সীমিত।

সুখ-দুঃখের লাল-নীল খাতা নিয়ে বসতে চাও?

সে-ও তো সেখানেই।

এর নাম কি সংসার?

না সংস্কার?

দিয়া আবার অন্য। অন্যান্যদের থেকে টাকায় অনেক বেশি বলীয়ান। কর্তার মাদকের ব্যবসার বিপুলআমদানিতে অর্থের ঔদ্ধত্য আকাশচুম্বি। মাটিতে পা-রাখাই দায়। সেখানেও আমার শিক্ষা-সংস্কার-রুচি সব কিছুই অর্থহীন। জাগতিক ও মানসিক সার্থকতার এক জ্বলন্ত রূপ।

সেখানেও আমি নেই। আছে দিনগত অর্থহীন প্রলাপ। নিঃশব্দে বসে হজম করা, অন্তরের পুরনো এটিকেটস-এ কিছু প্রচলিত সংলাপ। এক ছন্দহীন স্বরূপ। যতই হই না তার থেকে বিরূপ। তার মধ্যেই গড়তে হবে আমার জীবনের গণ্ডিবাঁধা স্বর্গ। সোনার পাথরবাটি। সেখানে আমার আমি অনেক মূল্যহীন, গৌণ। মুখ্য আমার পারিবারিক অস্তিত্বের মধ্যে ধরে রাখা একটা চেনা মুখোশ।

"ঘরের পর্দাটা বড্ড সেকেলে লাগছিল। পালটে ফেললাম।"

মুচকি হেসে বলতাম "বাড়িটাই পালটে ফেলতে পারতিস?"

"কর্তা বলেছিল। কিন্তু জানিস পুরনো বাড়ি ছেড়ে যেতে মন চায় না। অবশ্য ও দু-দুটো ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছে। থাক সে দুটো পড়ে। মেয়ে বড় হয়ে বিয়ে করলে, জামাই নিয়ে থাকবে ওখানে"

কত চিন্তা। তাই না?

পিঙ্কুর মতো ছোট্ট মেয়ে কবে বড় হবে... বড় হলে বিয়ে হবে... বিয়ে হলে সংসার হবে... সংসার হলে ফ্ল্যাটের দরকার পড়বে... জাগতিক আশার ব্যাপ্তি কতটা দূর যে যেতে পারে।

কোনো শেষ আছে?

মনে মনে হাসি পেলেও সেটাকে চেপে বলতাম "দাম বাড়বে।"

যার পৃথিবী, সন্ধেবেলা রক্সি বারের অর্ধ উলঙ্গ হিসেবি নাচের শেষে দিনের কড়ি গুনে বাড়ি ফেরা। পৃথিবীটা তো ওর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর থেকে বেশি বোঝাব কী করে?

তবুও...

এদের সঙ্গেই বাঁচতে হবে। এদের সঙ্গেই মিশতে হবে। নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হবে। ওরাও খাওয়াবে। চক্রব্যূহে ঘুরপাক খাওয়া সংসার! বেঁচে থাকা? জীবনকে ভোগ করার মূলমন্ত্র? ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম, জীবনের সংজ্ঞাটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। অবচেতন হারিয়ে যাচ্ছে দৈনন্দিন চেতনার গোলকধাঁধায়।

কিছু তো একটা করতে হবে। তাই করা।

এই আর কী!

পিঙ্কু গভীর ঘুমে মগ্ন। সৈকত বাড়ি নেই। কলকাতার বাইরে। ঘুম আসে না। মাঝরাতে চেয়ে থাকতাম চাঁদের দিকে। চাঁদের স্নিগ্ধতার স্পর্শেই শান্তি! রোশনি আমার না-পাওয়া ছন্দের, একাকী রাতের যা কিছু।

ধ্রুবতারা কখনও খুঁজিনি, কোনোদিন। বহুদূরের নক্ষত্র। যাদের জাগতিক চাওয়া আছে, তারাই তো ধ্রুবতারা খোঁজে। আমার চাহিদার তো কোনো অভাব রাখেনি সৈকত। শুধু চাঁদের মৃদু আলোর ছোঁয়া চেয়েছিলাম।

কাছ থেকে... একাকী।

চাঁদের মিঠে আলোটাকে কী একা অনুভব করা যায় না? সব সময় কি চাঁদ দেখতে গেলে প্রেম করতে হয়? প্রকৃতি আমার অনন্ত রাত্রির সাথী। না-কেনা ব্যথার মলম, নীরবে একাকী। না-ছোঁয়া প্রেমের বলিরেখা। তার পেছনে ছুটে খুঁজছিলাম এক না-পাওয়া মরীচিকা।

আমার তো দেখেশুনেই বিয়ে হয়েছিল। খবরের কাগজ থেকে।পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতোই। চাঁদকে বোঝবার রেশটুকু প্রেমিকের হাত ধরে অনুভব করার অবকাশ-ই হয়নি। প্রেমিককে চাঁদের আলোয় দেখা, সে তো অনেক দূরের।

যেদিন আসামে প্রথম সৈকতের বাড়িতে পৌঁছলাম, সে তখন অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সদ্য বিবাহিত স্ত্রী যে সেদিন প্রথম এসেছে, তার জন্য সময়টুকুও নেই। আমি একা ঘরে সারাদিন অপেক্ষায়। কিন্তু সৈকত এল না। কাজের অছিলা না সত্যি কাজ, কে জানে? বেরিয়ে গেল আমাকে একা রেখে।

তবুও তার মধ্যেই খুঁজে নিতে হয় জীবনের গতানুগতিক সুখ-দুঃখের উপাখ্যান। সেখানেই পড়ে থাকে বেঁচে থাকার কলতান।

তখনও আমি সিঁথিতে সিঁদুর পরতাম। একটা আচ্ছাদনের মতো। সবাই সেখানে বাঁধাপড়ে আছে জীবনের নামে।

আমিও...

সেখানে গোলাপ নেই, জীবন আছে। বর্ণ নেই, তবু তাসের দেশের একটা অলিখিত নিয়ম আছে। সেখানে মানুষের প্রাণ নেই, যদিও টেনে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় আছে। সেখানে আমি নেই, শুধু আমার খোলসে ঢাকা দেহটা আছে।

আমি, আর আমার বেঁচে থাকার মধ্যে, কত-ই তফাত!

এই কী জীবন?

কেন একটা কনভেন্টে পড়া মেয়েকে আবদ্ধ রাখা হয়েছে অর্থহীন বাঙালিয়ানার মায়াজালে? এই কী সংসারের স্থায়িত্বের অলিখিত নিয়ম? জিওগ্রাফিটা বেঁচে থাকবে, কিন্তু কেমেস্ট্রিটা হারিয়ে যাবে? এর নাম সংসার। সীতার স্বার্থে রামচন্দ্রের গড়া লক্ষ্মণরেখায়।

তার কারণ আর কেউ নয়... আমার বাবা। একটা সামাজিক স্থিরতায় মানুষ করেছিলেন আমাকে। আরোপিত ঘেরাটোপে তৈরিও করতে চেয়েছিলেন একই আদলে। পাওয়া নয়, কেবলই দেওয়া। নিজের মতো সবকিছু বুঝে।

সেই সামাজিক সন্দেশের ছাঁচে বড় হয়ে উঠেছি। আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত বাঙালির মতো সৈকতের হাতে তুলে দিয়ে বাবা কর্তব্য শেষ করলেন। হাজারটা মধ্যবিত্তর মতো।

প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি।

যৌবনের চাহিদা বাঙালি মেয়ের মধ্যে তুষের আগুনের মতো ধিক-ধিক করে জ্বলে। বিয়ের স্বপ্নে সেই কাঙ্ক্ষিত চাহিদাটা হঠাৎই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দৈহিক চাহিদায় উত্তরণ। আমি কোন ছাড়? সৈকত যে দেহের চাহিদাটাকেই উসকে দিল। এবার খরস্রোতা নদীর বাঁধভাঙা প্লাবন। সেই প্লাবনের তোড়ে আমি অংশীদার হব না, এ তো ভাবাও ভুল।

কিন্তু কোথায় যেন বাংলা স্কুলে পড়া সৈকত আর কনভেন্টে বড় হওয়া আমার মানসিকতার মধ্যে এক বিরাট ফারাক ছিল। সেদিন বুঝিনি। সৈকত এত চাপা যে, ওকে কোনোদিন ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

আজও নয়।

তোমাকে সেদিন সৌম্যদার বিয়েতে দেখে মন বলেছিল, হয়তো তুমি বুঝবে। কিংবা আমি তোমাকে বুঝব। অবচেতনে যখন এই দোলাচল, ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার বুকে গোলাপ পরাতে গেলাম।

না-পাওয়ার আড়ালে কোথায় যেন ওই গোলাপের আভা নতুন রেশ নিয়ে এসেছে। তোমার পাঞ্জাবি ছাড়িয়ে চলে গেছে আরও গভীরে। আমার বুকে হিল্লোল তুলেছিল তোমার দ্রুত বয়ে যাওয়া শ্বাসের শব্দ।

বুঝতে পারনি। হাজার লোকের ভিড়ে বোঝাও সম্ভব নয়।

জীবনের বাজি নিয়েই পৃথিবীতে আসা। জন্ম... বিয়ে... সংস্কার... প্রেম... মৃত্যু - সবটাই একটা জুয়া। সর্বদাই খেলে চলেছি, প্রতিদিন... প্রতিমুহূর্তে...

বাবা বলেছিল “বুঝলি, এই বুড়ো বয়েসে এসে বুঝলাম জীবনটাই একটা জুয়া। জেতা বা হারা... তারপর মরা”

“মরতেই যদি হয় তো বেঁচেই মরব” আমি হেসে বলেছিলাম।

বুঝিনি কথাটা কতখানি সত্যি। আজ তোমাকে কাছে পেয়ে মনে হচ্ছে স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ। তার মধ্যেই বেঁচে থাকার নিত্য নতুন আনন্দ। সে আনন্দের স্বাদটা যেন বারবার কড়া নেড়ে যাচ্ছিল স্তব্ধ মনের বদ্ধ ঘরের দরজায়। সোনার চাবির কল্পিত পরিভাষায়।

নিজের অস্তিত্বের দৈনন্দিন শবটা, হয়তো ক্ষণকালের জন্য হলেও, সেই আনন্দটাকে বারবার খুঁজেছিল।

তারপর হঠাৎই আচমকা সৌম্যদার বিয়েতে সেদিন পেয়ে গেলাম তোমাকে...

মানিব্যাগ থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে বললাম "ওই যে গান্ধীজির ছবিটার ওপর কিছু একটা লিখে দাও তো?"

"কী লিখব?"

"যা আমি সারাজীবন বুকে ধরে রাখব"

তুমি ভাবছিলে কী লিখবে? আমি ভাবছিলাম, এই কি সেই না-শোনা কথা, যা শোনার আগ্রহে, আমি সারাজীবন ধরে বসে আছি। সব পেয়েও নিরালায় অপেক্ষা করেছি একা?

তোমার লেখা নোট-টা এখনও আমার ব্যাগে আছে। হয়তো তোমার মনে নেই। আমি আজও ওটা বুকে বেঁধে রেখেছি।

'উড়ে বেড়ালে আমাকে পাবে...

ধরা দিলে সব হারাবে'

সেদিনের লেখা তোমার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

কেন জান? তুমি তো আমায় ধরতে চাওনি। তুমি তো আমায় হারিয়েই পেতে চেয়েছ।

সৈকত আমায় ধরতে চেয়েছিল কি না জানি না। হয়তো চায়নি। পেতেও চায়নি। শুধুই রাখতে চেয়েছিল। আর পাঁচটা সামগ্রীর মতো ওর সুসজ্জিত ঘর সাজাতে, দামি কোনো আসবাবের মতো। কিংবা পিঙ্কুর জননীর বেশে। অভিসারের স্বর্গ মুছে। দিনের আলোর লিখিত নিয়মের অলিখিত কোষে। বাক্সবন্দি একটা অস্তিত্বের মধ্যে।

আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল "ঘরটা তো তোমার। তোমার নিজের মতো করে সাজিয়ে নাও।"

কী সাজাব?

ইট-কংক্রিট-পাথর-সিমেন্ট দেওয়া একটা নীড়?

পাখিরা তো খড়কুটো দিয়েও সেই নীড় সাজায়। সৈকত ঘরটাকে সাজাতে চেয়েছিল আরেকটা পুতুল দিয়ে - অগ্নিসাক্ষীর বরণমালা পরিয়ে কিনে আনা লাইসেন্সড পুতুল। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসের কেনা সামগ্রী। বুঝতে পারেনি, শুধু বিয়ের রাতের হোমের মধ্যেই আগুনের তাপ শেষ হয়ে যায় না। সেই তাপ

লেগে থাকে বুকের স্পন্দনে। যা প্রতিটা দিন যৌবনের তৃপ্তির মধ্যে স্থিতি লাভ করলেও, ফল্গুধারার মতো বয়ে চলে সারা জীবন। দৃঢ়তর বন্ধনের দীপ্ত বহ্নিশিখায়...

তখন আর আমার কতই বা বয়েস? বুকভরা স্বপ্ন নিয়েই উড়তে চেয়েছিলাম। বন্ধনের মধ্যে থেকেও মুক্ত নীল আকাশে।

পাখিদের কী ঘরে ফেরার তাড়া আছে?

সে ফিরবে মিলিয়ে যাওয়া সাঁঝের আলোতে। হয়তো সে ফিরবে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে। ঘরে এসে ক্লান্তিটাকে জুড়িয়ে নিতে। সেখানেও কি সে আবার স্বপ্ন দেখবে? কোনো এক নীড়ের? মনের দুয়ার খুলে আবার ভাসবে বাঁধভাঙা চাঁদের আলোর জোয়ারে?

সৈকতকে বলেছিলাম "তোমার কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে না?"

"ওসব দেখার সময় আমার নেই। রোজগার করে খেতে হবে তো। তোমার সময় আছে। তুমি দেখো।"

আমাকে কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে দিয়ে, সৈকত ডুবে যেত তার কাজের মধ্যে। সময় হয়নি একবারও তাকাবার, জীবনের খোলা আকাশের দিকে। সময় হয়নি তার রং-রূপ-রস দিয়ে জীবনকে আবার রঙিন করে তোলার। জীবন চলুক তার নিজের গতিতে। সে পড়ে থাক তার জীবিকার আলোকে।

কবিতা?

ওসব কেবল ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে লোকেদের মায়া।

তার পাল্লায় পড়লে ধসে যাবে জীবনের অর্ধেকটা কায়া।

আমি বোধহয় খুঁজছিলাম সেই না-শোনা গান। ভোরের আকাশে পাখিদের কলকাকলিতে ভরিয়ে দেওয়া কোনো এক নতুন সুরের তান। যেখানে হিসেবের বাইরে একটা পৃথিবী। সেখানেই তো বাঁচার স্পৃহা আবার নতুন করে জাগে। সেখানে আছে তন্দ্রাহারা দিনের গান। সেখানে আছে আমার বেঁচে থাকার নব অভ্যুত্থান। জীবনের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে হাজার কবিতা। সেটাকেই খুঁজে নিতে হয়।

সৈকত বোধহয় কোনো দিনও কবিতাটাকে দেখতেই শেখেনি। অনুভব করা, সে তো সময়ের অপব্যয়। হিসেবের খাতা ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে, যে কোনো সময়। সে নিজেকে ভুলে থাকতে চেয়েছিল হিসেবের খাতার প্রশস্ত পাতায়। নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সংসার রথের পাল্কিতে চড়ে।

বুকটা কেঁপে উঠেছিল। বুঝেছিলাম রোজগারের মাটি আর স্বপ্নের মায়ার মধ্যে কত তফাত। স্বপ্ন শুধু খেলে গেছে আমার মনের আকাশে। বাস্তব তাকে বেঁধে রেখেছিল শূন্য বাতাসে।

সম্ভোগের কাতরতার মধ্যে ছিল না কোনো প্রাণ। শুধু ছিল যৌবনের নিশুতি রাতে আকাঙ্ক্ষিত কোনো ফেলে আসা মুহূর্তের অযাচিত বিরল দান। সব ছাপিয়েও কোথায় যেন একটা বিরাট শূন্যতা। যেখানে

সম্ভোগের পরিপূর্ণতা লুকিয়ে আছে যুগলবন্দির সুরে। সেখানেই যেন সাহারার নৈঃশব্দ্য আমাদের অন্তঃপুরে। লাল বেনারসি আর সিঁদুরের মধ্যে নেই, মনকে ছোঁয়ার মধ্যেই আছে পরিতৃপ্তির খনি।

"আজকেই বেরিয়ে যেতে হবে..." সৈকত ব্রিফের ফাইল গোছাতে গিয়ে বলেছিল।

"কোথায়?" আগে থেকে বলেনি বলেই চমকে গিয়েছিলাম।

"গুজরাত। আমেদাবাদে একটা প্রজেক্টের কন্ট্র্যাক্ট পেয়েছি।"

"কই বলনি তো?"

"কথা হচ্ছিল। আজকেই যে যেতে হবে জানতাম না। সকালে টি.এম.সি-র প্রজেক্ট ম্যানেজার শৈলেশ প্যাটেল ফোন করে বলল আজকেই যেতে। কাল ইন্সপেকশনে আসছে। ওরা প্রজেক্টের টেকনিক্যাল ভ্যালিডিটি নিয়ে আলোচনা করতে চায়। সেটা তো আমি না থাকলে সম্ভব নয়।"

"কবে ফিরবে?" সৈকতের স্যুটকেসটা গোছাতে গোছাতে, ওর দিকে না ফিরেই প্রশ্ন করলাম।

"ঠিক জানি না। এক সপ্তাহ পরে বুঝতে পারব। কী জানি? কয়েক মাসও লেগে যেতে পারে। ওদের প্রগ্রেস কীভাবে এগোচ্ছে না-দেখে তো বলতে পারব না"

ততক্ষণে সৈকতের ফাইল গোছানো শেষ হয়ে গেছে। সেদিন সন্ধের ফ্লাইটে হারিয়ে গিয়েছিল আমেদাবাদের প্রজেক্টে। আমি পড়ে রইলাম একা।

তুমি যখন বললে "আমি তো লিখে দিলাম নোটে। তুমি কী লিখে দেবে আমার বুকে?"

আমি গোলাপ-ছাপা ব্যাগে পড়ে থাকা কোনো এক বিয়ের প্রেজেন্টেশনের জন্য কেনা একটা গিফট কার্ডে লিখে দিয়েছিলাম "ইতি তোমাকে..."

তোমাকে খুঁজেছি আমার যৌবনের উচ্ছ্বাসে। তোমাকে খুঁজেছি আমার ব্যর্থতার বহ্নিশিখায়। তোমাকে খুঁজেছি আমার মনের হাজার দরজা খুলে। কতদিন কতযুগ ধরে। কত বিনিদ্র রজনীর একাকী নীরব অন্ধকারে। কত স্তিমিত দীপের বাসনার নির্লিপ্ত অবসরে। কত কামনার উচ্ছ্বাসে জ্যোৎস্নায় ভেজা জানলার ফাঁক ধরে।

সেখানে আমি একা অন্য।

তুমি একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলে "আচ্ছা বল তো প্রেম কী?"

"প্রেম শুধু কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়ে পাশাপাশি বসে থাকা একটা মুহূর্ত মাত্র।"

"তুমি কবিতা লেখ নাকি?" অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলে।

"কবিতা তো আমাদের সবার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। আমি এতদিন ধরে তো তাকেই খুঁজছিলাম"

"পেয়েছ?"

“জানি না। মনে হয় পেয়েছি। আসলে কী জান? মনের সুপ্ত অনুভূতি যখন আবেগ নিয়ে বেরিয়ে আসে ভাষার ছন্দে, সেটাই হয়ে যায় কবিতা। যে ভাষা দিতে পারে, সে কবি হয়ে যায়। আর আমার মতো যারা পারে না, তারাই থেকে যায় সাধারণ মানুষ হয়ে। কবিতা তো আমাদের সবার জীবনেই আছে। শুধু অনুভব করা বাকি” একটু থেমে তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম “কেউ পারে, আবার কেউ পারে না, তাকে ছন্দে মেলাতে...”

“আমার মধ্যে কোনো কবিতা নেই। ছন্দ ও সুর যেন বারবার একটা তার ছেঁড়া রাগে গিয়ে মেশে...” আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাসীনভাবে কথাটা ছুড়ে দিয়েছিলে তুমি।

বোধহয় নিজেকে...

একই আকাশের দিকে চেয়ে আমি বলেছিলাম “চল না কোথাও বেড়িয়ে আসি”

“কোথায়?”

“কোথাও একটা। যেখানে ওই ডুবে যাওয়া চাঁদটাকে সরিয়ে স্মৃতির দুয়ারে নরম হাতের ছোঁয়া রাখা যায়।”

“সে দেশের ঠিকানা তো আমার জানা নেই।”

“ঠিকানাটা লুকিয়ে আছে অন্তরে। চল না, তাকে খুঁজে বেড়াই কোনো এক তেপান্তরে। যেখানে আকাশ আর মাটি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এক স্তব্ধ অনুভূতির চূড়ায়।”

কথাটা আবেগে বলে ফেলেছিলাম। সেই মুহূর্তে ভাবিনি সৈকতকে কী বলব? সৈকত এখন কলকাতায়। পিঙ্কুকে দেখে রাখতে পারবে। সে ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই। আর না পারলে আমার মা-বাবা তো রয়েছেই। সেই মুহূর্তে মনও ফিরে তাকাতে চায়নি সামাজিক ঘেরাটোপে।

তুমি আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলে “বেশ তো। চল না কালকেই বেরিয়ে পড়ি।”

“কাল? কোথায়?”

“একবার তো ট্রেনে চেপে বসি। তারপর দেখা যাবে কোথায় তোমার তেপান্তরের মাঠ?”

যেন সব গণ্ডির বাইরে খুঁজে পেতে চেয়েছিলে এক অসীম অনির্দিষ্টকে। গন্তব্য না জেনেও এক পথভোলা দৌড়। তার মধ্যেই কোনো এক মুহূর্তে নিজেদের খুঁজে নেওয়া।

“বেশ চল তবে বেড়িয়ে পড়ি” কী করে যে সব সামলে বেড়িয়ে পড়ব ভাবিওনি সেই মুহূর্তে। তবুও মন বলছিল “চল যাই। বেড়িয়ে পড়ি তোমার সঙ্গে।”

মনে পড়ে না নিজে থেকে কখনও এমন দুম করে কোনোদিন কিছু করে ফেলেছিলাম কি না। এতকাল তো সব কিছুই করেছি চেনা সুরের ছকে। না হয় দু-পা হেঁটে নিলাম বেসুরো ছন্দে।

“কালকেই?”

“হ্যাঁ... কাল-ই।”

সৈকতকে কী বলব? সব কিছু গুছিয়ে রেখে যেতে হবে তো।

মনে পড়ে গেল কলেজ-দিনের কথা।

“রেডি হয়ে নে। দু-ঘন্টার মধ্যে ট্রেন ধরতে হবে।” বৈশালী ফোন করতে চমকে উঠেছিলাম।

“কোথায় যাব?”

“অতশত জেনে কী হবে? ট্রেনে উঠে ভাবব।”

“টিকিট?”

“আরে ছাড় তো। টিটি-কে কিছু দিয়ে ম্যানেজ করে নেব।”

এই ছিল বৈশালী। হুজুগে দাপুটে বাধা বন্ধনহীন, বাউন্ডুলে, বেপরোয়া, ছন্নছাড়া, উদ্দাম বাঁধভাঙা যৌবনের উল্লাসে ভরপুর। বৈশালী হোস্টেলে থাকত বলেই ওর এই বেড়িয়ে পড়ার হুজুগে কোনো রকম পিছুটান ছিল না।

আমারও নয়।

দাদা তখন ইউনির্ভাসিটিতে। বাড়িতে বাবা-মা-আমি-দাদা। সংসার সামলানো, সে তো মা-ই করে। অত চিন্তা কীসের?

গোছগাছ করতে দেখে মা বলল “কোথায় চললি?”

“জানি না।” সুটকেশে সালোয়ার জিন্স ভরতে ভরতে বললাম।

“তার মানে?” অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল মা।

একটু ঝাঁঝিয়ে বললাম “জানি না। বললাম তো...”

“এ আবার কী?” মা ঠিক বুঝতে পারছিল না আমাকে। নাকি নতুন ভাবে চেনার চেষ্টা করছিল তার না-চেনা মেয়েকে?

বুঝতে পেরেই বললাম “বৈশালীর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি। বৈশালী জানে। আমি জানি না।”

মাকে ভাবতে দিয়ে, গোছাতে গোছাতে ভাবছিলাম, কী নিতে ভুলে যাচ্ছি। কিছু ফেলে যাচ্ছি না তো? তখনও কী ছাই বোঝার বয়স ছিল যে, কিছুই তো নিয়ে যাওয়া যায় না।

কোথায় টিটি! কোথায় বুকিং! ট্রেনের বাথরুমের সামনে চাদর পেতে বসে সারা-রাত কাটিয়ে দিলাম দুজনে। ঘুমে চোখ ঢলে আসছিল। এর আগে তো কখনও ট্রেনের বাথরুমের সামনে বসে সারারাত কাটাইনি।

তন্দ্রার রেশ কাটল বৈশালীর আওয়াজে “এই নে চা। মোগলসরাই এসে গেছি।”

বৈশালীর হাত থেকে চা নিতে নিতে বললাম "কোথায় যাচ্ছি বল তো?"

"দিল্লি পর্যন্ত টিকিট আছে। যেখানে খুশি নেমে যেতে পারি।"

চায়ে এক চুমুক দিয়ে আড়ষ্ট ঘুম চোখে বৈশালীর দিকে তাকিয়ে বোকার মতো বলেছিলাম "কিন্তু কোথায়?"

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে, বৈশালী তার জিন্স-এর পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে বলেছিল "খাবি?"

মাথা নেড়ে বলেছিলাম "নাঃ।"

বৈশালী সিগারেট জ্বালাতে জ্বালাতে বলেছিল "জীবনটা জানিস এই সিগারেটের মতো। পুড়ে শেষ হয়ে যাবি। কিছুই পাবি না। অতশত ভেবে কী হবে? মরে যদি কেওড়াতলার শ্মশানেই পুড়তে হয়, তার আগে একটু দম দিয়ে নিই।"

সেই অল্প বয়েসের জীবনে কিছু না ভেবেই কথাটা বলেছিল বৈশালী। এখন বুঝতে পারছি একটুও মিথ্যে বলেনি। তখন সেই ভিড়ের মধ্যে কবিতা খোঁজার সৌভাগ্য হয়নি আমার। কিন্তু এই উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেরিয়ে পড়ার স্পৃহাটা, কোথায় যেন মনের কোণে, একটা ছাপ ফেলে দিয়েছিল। যা মুছেও মোছেনি। বুঝতে পারিনি তখন। বুঝলাম তোমার কথায়।

তোমার আহ্বানে যেন ভেতর থেকে সেই সিলমোহরটা বেরিয়ে আসতে চাইছিল কবিতার ছন্দে।

ডাক দিচ্ছিল সেই না-পাওয়া সুর।

সেই না-শোনা কবিতা আবার আমাকে!

সেই ভেঙে দেওয়ার একছত্র স্বাধীনতা!

কিছু না ভেবেই তোমাকে বলেছিলাম "বেশ চল। তাহলে বেড়িয়ে পড়ি কোথাও, কালই।"

আমরা বেড়িয়ে পড়েছিলাম, অজানার খোঁজে। বেড়িয়ে পড়েছিলাম, বাঁধ ভাঙার নেশায়, দুচোখ বুজে। এক অবিরাম গতিতে ছুটে চলার আশায়। আমরা বেড়িয়ে পড়েছিলাম, এক মোহনার দিশায়।

তোমার কী সে কথা এখনও মনে আছে কৌস্তভ? ভুলে যাওনি তো সেই দিনের আলাপ?

তোমাকে

কস্তূরী



তৃতীয় চিঠি

কস্তূরী

ইতি তোমাকে....

সেই গোলাপ ছাপা গিফট কার্ডটা আজও বুকে ধরে রেখেছি। এটাই আমার নিজের পৃথিবীতে একটুকরো সান্ত্বনা। কিংবা আমার দৈনন্দিন টানা পোড়েনের মধ্যে একটু বা না-পাওয়া আরাধানা।

দোলাচল আমার বর্তমানকে ঘিরে। বিবেকের চিন্ময়ীকে রূপ দিতে চেয়েছিলাম স্বপ্নময় অঙ্গীকারে। বহুদিন লালিত নিভৃত স্বপ্নের বাসরে। স্বপ্নটা সেই ছোটোবেলায় দেখা শাঁখরাইলের পুকুরপাড়ে। ধূসর রুক্ষ লালমাটি, মাঝেমাঝে ঘাস বিছানো জমিতে টিমটিমে ল্যাম্প-পোস্টের আলো-আঁধারিতে জীবন গড়ার স্বপ্ন।

কী বোকাই না ছিলাম!

জীবনের মানেটা তখনও বুঝতে শিখিনি। সেদিন বুঝিনি জীবনের বাসর থেকে স্বপ্নের দোসর বহুদূর। পরে টের পেলাম দুটো পৃথিবীর ভিন্ন অঙ্ক। কিন্তু ততক্ষণে বাঁধা পড়ে গেছি গতির একটানা পথে। বাসর থেকে সংসারের ছন্দহীন রথে।

বিয়ে করেছিলাম হুট করেই। অতশত না ভেবেচিন্তে।

অনামিকার সঙ্গে পরিচয় সেই ডাল-ভাতেরই তাগিদে। আনন্দবাজারের অফিসে প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটে দুজনেই বসেছিলাম। কখন ডাক পড়ে। চাকরি চাই। যে কোনো একটা চাকরি। বৃহস্পতির দশা চলছিল কি না তাও জানি না। সুদূর শাঁখরাইলের এক অজ্ঞাত, অখ্যাত কোনো ছেলেকে যে কেউ ক্যাচ ছাড়া চাকরি দেবে, এটা স্বপ্নে ভাবাও ভুল। তবুও আশা। একটু বা প্রত্যাশা। তাই নিয়েই ছুটে চলা, আশা মাখা কুয়াশায়।

আশাটা কুহকিনী হল না। মায়ার স্বপ্ন নেমে এল বাস্তবের কায়ার পৃথিবীতে। কিছু বোঝার আগেই চাকরিটা পেয়ে গেলাম আমরা দুজনেই। এটাই হয়তো গ্রহের সংযোগ। চাকরিটা নিছক উপলক্ষ মাত্র।

অনামিকা বেরোতে বেরোতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল “আপনার জন্যই পেলাম। জানেন আজ দু-বছর ধরে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।”

মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম। দেখে মনে হল সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। কোনো প্রসাধন নেই। ছাপা শাড়ি পড়া। সেই প্রথম, কাছ থেকে অনামিকাকে দেখা। সেই দেখা যে কোনো দিন শুভদৃষ্টিতে রূপ নিতে পারে, কল্পনা করতে পারিনি।

উৎফুল্ল হয়ে বেরোচ্ছিলাম। হঠাৎ পাওয়ার আনন্দে ভাটা পড়ল, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে। দোরগোড়ায় মেয়েটির চটির একটা স্ট্র্যাপ গেল ছিঁড়ে। চাকরি পাওয়ার আনন্দটাই মাটি।

"ইশ"

"কী হল?"

"চটিটা ছিঁড়ে গেল।"

"চলুন দেখি কোথাও একটা মুচি পাওয়া যায় কি না?" আমার সহানুভূতির স্বরে বোধহয় কিঞ্চিৎ লজ্জা পেল।

স্ট্র্যাপটায় গিঁট মারতে মারতে বলল "না থাক। বাড়িতে গিয়ে ঠিক করিয়ে নেব।"

"এভাবে কী করে যাবেন? বাড়ি কোথায়?"

"হাওড়ায়। বালিটি কুরিতে।"

"ইস! এতদূর কি এভাবে যাওয়া যায়? চলুন দেখি, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে একটা কিছু পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই"

মেয়েটির একটু দ্বিধা ছিল। বুঝতে পেরে বললাম "কোনো অসুবিধা আছে?"

ইতস্তত করে বলল "না... মানে.. বাস ভাড়া ছাড়া কোনো পয়সা নেই।"

কেমন মায়া হল। এই দুপুরে এতটা পথ এসেছে এই ক'টা টাকা সম্বল... চাকরির আশায়... কোনো অনুভূতি ছিল না... পৃথিবী সত্যিই বড় কঠিন। ছন্দহীন গদ্যময়।

ওর অস্বস্তি কাটাতে বললাম "যদি কিছু মনে না করেন এটুকু পয়সা আমি দিয়ে দিতে পারব। আসুন তো আমার সঙ্গে।"

হয়তো ওর মনে একটু দ্বিধা ছিল।

এবার একটু দৃঢ়ভাবেই বললাম "আসুন তো। অত লজ্জার কিছু নেই।"

কোনো কথা না বাড়িয়ে আমার সঙ্গে চলতে শুরু করল। চাঙ-ওয়া ছাড়িয়ে পুলিশ স্টেশনের দিকে কিছুটা এগোতে অবশেষে মুচির দেখা মিলল।

চটি সারাই করে পয়সা দেওয়ার সময় মেয়েটি বিনম্র ভাবে বলল "ইশ! আমার যে কী লজ্জা করছে না!"

“এই তো ক’টা পয়সা। লজ্জা পাওয়ার কী আছে? এখন তো চাকরি পেয়ে গেছেন। নেক্সট মান্থে শোধ করে দেবেন। যদি এতই সঙ্কোচ থাকে, এটাকে ধার হিসেবে নেবেন। মাইনাস সুদ।”

এবার হেসে ফেলল মেয়েটি। এই প্রথম ওকে নতুন পরিচয়ের জড়তা কাটিয়ে, একটু স্বাভাবিক হতে দেখলাম। সঙ্কোচের জড়তা কাটিয়ে স্বাভাবিক হতে পেরেছে।

আঁচল দিয়ে ঘামে ভেজা কপালটা মুছে বলল “থ্যঙ্ক ইউ।”

“শুধু শুধু থ্যঙ্কস হয় না। চলুন ওই সামনের সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর মোড়ে কফি হাউসে বসি। আমিই কফি খাওয়াব। তা না হলে এখান থেকে বালিটিকুরি হাঁটতে গিয়ে আবার চটির স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে যাবে।”

হেসে ফেলল মেয়েটি। এবার যেন আরও নিবিড় ভাবে দেখলাম। লক্ষ করলাম, অনাড়ম্বর মেয়েটির মুখের একটা নিজস্ব লালিত্য আছে। আগে শাঁখরাইলের মতো পাড়াগাঁয়ে সে লালিত্য এতদিন পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। সেটাই ছুঁয়ে গেল আমার হৃদয়। হয়তো প্রথম কোনো মহিলার কাছের সান্নিধ্য পাওয়ার চাপা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর ইন্ডিয়ান কফি হাউসে গিয়ে বসলাম। তখনই পরিচয় হল।

অবন্তিকা।

হাওড়ার দাশনগরের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে বাবা চাকরি করত। বেশ কিছুদিন হল কারখানা বন্ধ। হাওড়া গার্লস কলেজ থেকে গ্র্যজুয়েশন, ক্যলকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে জার্নালিজমে মাস্টার্স।

সেদিন আর বেশি কিছু বলেনি।

শাঁখরাইলের ছেলে, যে মহিলার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকত, সে প্রথম কোনো এক অচেনা যুবতীর এত কাছে বসবার সুযোগ পেল। ভালো লেগে গেল তাকে। পরিণতি গিয়ে ঠেকল বাসরসজ্জার আসরে।

অনামিকা আমার বিবাহিত স্ত্রী। জীবনের পথে সহযাত্রী। আমার ছোট্ট পৃথিবীর একছত্র সাম্রাজ্ঞী।

তাই তুমি যখন বললে ‘চলো না কোথাও বেড়িয়ে আসি, দুম করে তো ‘হ্যাঁ’ বলে দিলাম তোমাকে।

মাঝখানে অনেকগুলো প্রশ্ন ঝুলছে।

একদিকে অনামিকা। অন্যদিকে চাকরি। যে দুটো সাংসারিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। অন্যদিকে তোমার সঙ্গে উদ্দেশ্যহীনভাবে বেড়িয়ে পড়ার ডাক। সহচর মন।পেছনের অন্ধকারকে দূরে ঠেলে স্বপ্নের আকাশে ভাসার তাড়না। সেখানেই যে মনের দোটানা আর সংসারের বিড়ম্বনা।

এই ত্রিভুজের ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছি। দ্বন্দ্ব ছাড়া কী আছে? মুক্তির মধ্যে যেমন আনন্দ, বন্ধনের মধ্যেও তেমনই লুকিয়ে আছে শান্তির নীড়। বন্ধন আর মুক্তি কি কখনও এক সুরে বাঁধা হতে পারে? ইহুদি মেনুইন

আর রবিশঙ্কর ঝংকার তোলে সরগমের সুরে, কোমল থেকে নিখাদের সপ্তম মার্গে। রুডিয়ারড কিপলিং অতীত। বর্তমান শুধু তুমি আর আমি। দুটি মন। না-পাওয়াকে নিজের করে পাওয়ার শুভক্ষণ।

তবুও...

আমি সেই মুহূর্তে সেটাই তো চাইছিলাম। এই পৃথিবীর বাইরের অন্য এক পৃথিবীকে দেখতে। পায়ে পা মিলিয়ে স্বল্পতার মধ্যে বৃহত্তর কোনো এক পাওয়াকে নিবিড় করে নিতে।

নতুন স্বাদের খোঁজে।

নতুন দিশার আশায়।

পালতোলা নৌকোর মতো ছুটে যাওয়া দিগন্তের মোহনায়।

হাতে হাত রেখে নতুন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায়।

কিছুটা অন্যমনস্কভাবে টিভির খবর দেখতে দেখতে অনামিকাকে বললাম "কাজের জন্য আমায় কয়েকদিন বাইরে যেতে হতে পারে।"

"কোথায়?" রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আঁচলটাকে কোমরে বাঁধতে বাঁধতে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল অনামিকা।

"প্রথমে দিল্লি। তারপরে সেখান থেকে ওরা যেখানে পাঠায়।"

অনামিকা আর প্রশ্ন করেনি। এতদিনে আমার এই ছন্নছাড়া চাকরি জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। ও তো আমার মতো একই কাজ করেছে। টুবলু হওয়ার পর আর চাকরি করা সম্ভব হল না। ঘর-সংসার করা, বাচ্চা মানুষ করা, আমার বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখাশোনা করা। ওর জার্নালিজমের সার্টিফিকেটটা এখন ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে রূপান্তরিত হয়েছে। এতদিনে বোধহয় ভুলেই গেছে জার্নালিজম জিনিসটা কী?

তাই অযথা প্রশ্ন না বাড়িয়ে বলল "যাওয়ার আগে কিছু টাকা তুলে দিয়ে যেও তো। মাসকাবারি আনা বাকি। টুবলুর স্কুলের মাইনাটাও..."

"কত?"

"হাজার পাঁচেক।"

আমার সিনিয়র এডিটর আশিস ঘোষ আমার দিকে তাকিয়ে বলল "হঠাৎ বাইরে যাবে কেন?"

একটু আমতা আমতা করেই বললাম "ওই যে আপনাকে অনেকদিন ধরেই বলছিলাম না, পাহাড়ের নতুন ডেভেলপ করা রিসর্টগুলো নিয়ে একটা স্টোরি করব। হঠাৎ মনে হল, সেটা সেরেই ফেলি। আজকাল খুব বেড়াবার ডিমান্ড বেড়েছে। ওটা বাজারে ভালো খাবে।"

"কিন্তু ছবি তো লাগবে?" আশিস ঘোষ পার্ফেকশনিস্ট। একটু থেমে বলল "পুষ্পেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?"

আমার আর তোমার মধ্যে পুষ্পেন্দু! কাবাব মে হাড্ডি।

মৃদু প্রতিবাদ করে বললাম "আবার খরচ বাড়াবেন কেন? আমার ডিজিটাল ক্যামেরাতেই কয়েকটা ছবি তুলে আনব। পরে ডিটিপি-র লোককে দিয়ে একটু সাজিয়ে নেবেন।"

"বেশ যাও। পুরো কভারেজ চাই কিন্তু..." সম্মতি দিয়ে আশিস ঘোষ বলল "কবে যেতে চাও তাহলে?"

"কাল" আচমকা উত্তরে আশিস ঘোষ হকচকিয়ে তাকাল।

ভাবছে, এই পাগলটাকে নিয়ে কাজ করার অর্থ যতটাই অপ্রত্যাশিত হোক না কেন, তার লেখা বাজারে বিক্রি করা ততটাই সহজ। হাজার হোক মালিক তো মুনাফাটাই শুধু বোঝে। তাই আমার মতো পাগলকে একটু প্রশ্রয়ও দিয়ে থাকে।

মুচকি হেসে বলল "এইটাই তুমি। একবার যখন ঠিক করে ফেলেছ, কাজটা শেষ না করে ছাড়বে না" একটু থেমে বলল "কত টাকা লাগবে?"

"পঞ্চাশ দিয়ে দিন। এর থেকে বেশি বোধহয় লাগবে না" এতদিন রিপোর্টারের কাজ করতে করতে মনে মনে জানতাম, যে রিসর্ট নিয়ে লিখতে যাই না কেন, সব কিছুই তো **অন দ্য হাউস**। কলমের জোরে ব্যবসা চলে। আজকাল আতিথেয়তায় পাবলিসিটি কথা বলে।

ভাউচারে লিখতে লিখতে বলল "অ্যাকাউন্টস অফিস থেকে তুলে নিও। বেস্ট অফ লাক।" তারপর মুচকি হেসে চোখ টিপে বলল "আই ওয়ান্ট এ সেলিং স্টোরি।"

আশিস ঘোষ সম্পাদকদের মধ্যে একটু প্রগতিশীল। এতদিনে বেশ বুঝে গেছে, সময়ের চাহিদা মেনে অর্ধনগ্ন নায়িকার ছবি, আর পলিটিক্যাল নেতাদের নির্বোধ একঘেয়েমি ইদানীং বাজারে খাচ্ছে না। এর থেকে অরণ্য, প্রকৃতি, বাঘ, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বা ধর্মীয় স্থান, রিসর্ট এখন অনেক বেশি চলে। রিসর্টের কাহিনি লিখতে গেলে ওখানে থাকা-খাওয়া ফ্রি। কে না চায় তাদের সম্বন্ধে খবরের কাগজ একটু ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে লিখুক? অ্যাডভার্টাইজমেন্টের থেকে একজন রিপোর্টারের দেখভাল অনেক সস্তা। বিজ্ঞাপনের ছায়ায় আজকাল ওগুলো কেউ আর তেমন গুরুত্বই দেয় না।

কম খরচে অনেক বেশি পাবলিসিটি!

সন্ধেবেলা মালিক এক বোতল হুইস্কি নিয়ে হাজির হয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলবে "একটু ফলাও করে লিখবেন স্যর। যাতে আরও লোক এদিকে আসে..." একটু থেমে "আমাদের সার্ভিসেস কিন্তু এক্সিলেন্ট। দেখতেই তো পাচ্ছেন স্যর..."

কস্তূরী সেই প্রথম।

দুজনেই না-পাওয়া স্বপ্নের হাত ধরে পথ চলা। সংসারের লক্ষ্মণরেখা ছিঁড়ে বনবাসে। সেখানে অতর্কিতে রাবণের আবির্ভাব হবে না তো...

যুগ-যুগান্তরের অতৃপ্ত কোনো মোহময় স্বর্গ?ভেসে বেড়াব দুজনে। শুনব হৃদয়ের ডাক নিভৃত নিরালায় কুজনে।

কে জানে?

তবু বাঁধ ভেঙে চলার আনন্দটাই বা কম কীসের? ওড়ার নেশা যেন পেয়ে বসেছে।

কলকাতায় পায়ে পা মিলিয়ে দু-চার কদম একসঙ্গে চলেছি। বর্ষাস্নাত বিকেলে কাদামাখা মাটিতে স্লোগানের ভিড় এড়িয়ে। কোনো এক নির্জন কোণে আধ-ভেজা দেহটাকে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে, তোমার প্রলেপহীন অবয়বের উষ্ণ সুবাস বর্ষার ভিজে মাটির গন্ধের মতো বুক ভরে অনুভব করেছি। তবুও অন্য দেশে তোমাকে নিয়ে অর্নিদিষ্টের পথে যাওয়ায় অনেক তফাত। একটা না-শোনা, না-জানা আবছায়ার দেশে।

সময়ের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

রঙিন পর্দার ওপারে।

আকাশে ওড়া পাখিটা যখন দিনশেষে নীড়ে ফিরে আসে, আমাদেরও কী কোনোদিন ফিরতে হবে চেনা পৃথিবীর গণ্ডির আবর্তে? আমারাও তো অসীম সাগরের মাঝে সাঁতার কাটতে গিয়ে কিছু মুহূর্তকে মুক্তোর মতো তুলে আনার চেষ্টা করতে পারি। সেখানে একটা আভাস তো এখনও আছে। দিনান্তের শেষ পলে সেই ঘরেই ফিরে যাই। শুধু সেই মুহূর্তটাকে স্মৃতি করে আবার ভেসে বেড়াই দৈনন্দিন নিয়মের জাঁতাকলে। মন তখনও পড়ে থাকে ওই পাখিদের ওড়ার ছন্দের তালে তালে। দিন-রাত মিশে যায় মুহূর্তের আনন্দে।

বিহঙ্গ উড়তে উড়তে কোনোদিন থেমে যায় সামাজিক বলিরেখায়। পাওয়াটা মুহূর্তের অনুভূতি হলেও পেছনে পড়ে যায় কায়ার মায়ায়। সেই মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে কায়ার পরশের স্বপ্নে বিভোর অর্নিদিষ্ট থেকে ফিরে আসে সুনির্দিষ্টে।

এবার সময় হয়েছে সেই র্নিদিষ্টের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার ভাষা বুঝতে। ওড়ার ছন্দে মনের লেখায় স্বরলিপির সুর নতুন করে গাঁথতে হবে। চলার পথে, শীতের রাতের ঘন কুয়াশা। কালকের ভোরের সঙ্গে সেই সঙ্গীতের রেওয়াজে, নতুন করে গলা সাধা। চলার ছন্দ পেছনে ফেলে, অর্নিদিষ্টের পথে সুরের

কবিতায় ভাসা। মনে খেলে বেড়াচ্ছে ক্ষীণ আশা। আবার নিজেদের নিজের মতো করে খুঁজে পাওয়ার একটা মনগড়া প্রচেষ্টা।

এখনও মনে আছে সেই মুহূর্তের কথা।

তুমি ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের সোফায় গা এলিয়ে টানটান, বলেছিলে "আচ্ছা, কোথায় যাচ্ছি বল-তো?"

"জানি না। জানতে চাই-ও না। বোধহয় জহান্নামে..." মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছি।

স্বর্গটা কোথায় তা তো এখনও বুঝতে পারলাম না। জাহান্নামটা যে কদ্দুর, জেনেই বা কী হবে? কিন্তু এই মুহূর্তটাকে যে বহুদিন ধরে খুঁজছিলাম, সেটাই বা অস্বীকার করি কী করে? তোমার মধ্যে কী দেখেছিলাম জানি না। তোমার থেকে কী পাব, তাও ভাবিনি কখনও। জানতেও চাইনিকোনোদিন। কিন্তু এই মুহূর্তের আনন্দটুকুর তো কোনো ব্যাখ্যা নেই। কোনো শব্দ নেই। আছে শুধু একটা না-বলা অনুভূতি। নিঃশব্দ পাওয়া। সেটাই বোধহয় বহুকাল ধরে খুঁজেছি বারবার। কোকিলের ডাকে, ঝিঁঝি পোকার শব্দে, মনের নিভৃতে, এক না-লেখা সিম্ফনি তুলতে চেয়েছি প্রতিটা স্বপ্নকে ঘিরে। আজকে হয়তো বা তাকেই খুঁজতে চলেছি, নতুন করে। তোমাকে নিয়ে স্বপ্নসৌধ গড়ব নতুন বুনিয়াদে শেষবার।

কস্তূরী, তুমি জাহান্নামের পথটা আমায় দেখিয়েছিলে এক নতুন রূপে। নতুনএক ছন্দে মন ভরে যাওয়া, না-খুঁজে পাওয়া বুকভরা আনন্দে। নতুন প্রাণের নিত্য নতুন আবেগের পসরা সাজিয়ে। চলার ছন্দে, জীবনের গতির নতুন মালা পরিয়ে।

জানলার বাইরে ট্রেনের গতিপথে মুছে যাওয়া দৃশ্যপটের দিকে তাকিয়ে তুমি বলে উঠলে "আচ্ছা, জাহান্নামটা কোথায় বল-তো?"

"জানি না। বোধহয় আমাদেরই মধ্যে। না-বলা এক ছন্দে। পাওয়া না-পাওয়ার দ্বিধাহীন দ্বন্দ্বে। কিংবা পরম প্রাপ্তির আশাহীন এক স্বপ্নমাখা আনন্দে..."

সেই সরে যাওয়া দৃশ্যপট গুলো দেখতে দেখতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলে "আমিও জানি না।"

"কী জান না?"

"কোথায় চলেছি? আর কেনই বা চলেছি?"

"চলার আনন্দটাই তো বড় কথা। কী হবে ভেবে, কোথায় গিয়ে থামব? আমরা কি কেউ গন্তব্যটা জানি?"

"ক্যাওড়াতলায়..." তোমার দীর্ঘশ্বাসে, সেই মুহূর্তে, ফুটে উঠেছিল এক হতাশার ছবি।

জীবনের সুনিশ্চিত পরিণতি।

প্রশ্ন করিনি, কেনই বা এ হতাশা?

কীসেরই বা এত প্রত্যাশা?

এর উত্তর পেতে গেলে জানতে হবে তোমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের না-পাওয়া ভাষা। জানতে হবে, তোমার স্বপ্নভরা দুচোখের না-দেখা গভীর চাহনির প্রত্যাশিত তৃষা। বুঝতে হবে তোমার না-জ্বলা প্রদীপের দীপশিখার আলোকের পেছনে পড়ে থাকা ছায়ার অনুচ্চারিত কাহিনি। কী হবে বা জেনে তোমার অতীতের ফেলে আসা জীবনী? কী হবে বা বুঝে তোমার অতীতের না-পাওয়া কোনো এক নিরালা অভিসার? কী হবে জেনে তোমার অতৃপ্তির অন্ধকার?

তোমার ঘন কালো কোমর-ছোঁয়া মুক্ত বেণীর দিকে একবার তাকিয়ে বললাম "জানবার কি কোনো দরকার আছে কস্তূরী? এই মুহূর্তটাকেই শুধু সম্বল করে কি বেঁচে থাকা যায় না?"

বাইরের চলমান মুছে যাওয়া চলন্ত ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে, মুখ না ফিরিয়ে বলেছিলে "যায় বলেই তো হুট করে বেড়িয়ে পড়তে পারলাম"

"অসুবিধা হয়নি?"

"সে কথা জেনে তোমার লাভ?" তুমি কটাক্ষ করে বললেআমাকে।

সত্যিই তো!

লাভ-লোকসানের হিসেব মেলাতে তো আমরা বেরোইনি। বেরিয়েছি মনের অবগুণ্ঠন খুলতে। না-পাওয়ার চোরাবালিকে পেছনে ফেলে স্বপ্নসৌধ গড়তে। এর বেশি আর কী কিছু করার আছে? আমরা তো কেউই জানি না পরের মুহূর্তে আমাদের জন্য কী পড়ে আছে?

চলন্ত ট্রেনের জানলার বাইরের দৃশ্যপটগুলো যেমন মুহূর্তে মুহূর্তে সরে সরে যাচ্ছে, আমাদের জীবনের সাত রঙের রামধনুটা ক্ষণে ক্ষণে নানা বিচিত্র আভরণে রাঙিয়ে সাজাচ্ছে। আমাদের বেঁচে থাকার প্রতিটা মুহূর্ত যেন পটে আঁকা ছবি। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, পাওয়া না-পাওয়া - প্রতিটা স্পর্শ যেন নতুন। সব মিলেমিশে একটা সাদা ক্যানভাসে অনুভূতি দিয়ে ছবি আঁকছে অবিরত। মুছছে... আঁকছে... আবার তাকে মুছে ফেলছে। আবার মনের রঙে ভরিয়ে নতুন তুলির টানে নতুন ছবির রং মেলাচ্ছে। নিজের অগোচরে তা কখন মুছে আবার নতুন দিগন্তে মেশাচ্ছে। রামধনুর সাতটা রঙের ক্যালিডিওস্কোপের মতো মুহূর্তের বর্ণের বাহারে। সেই অস্পষ্ট রূপটা ফুটে ওঠার আগেই ছবিটা যেন আবার মিলিয়ে যাচ্ছে ধু-ধু প্রান্তের ধূসরে।

তুমি আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলেছিলে "তাই তো বেরিয়ে পড়লাম অর্নিদিষ্টের পথে।"

চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম "আমার সঙ্গে..."

অনামিকার কথা তো তোমায় বলা যাবে না। সেরিব্রাল অ্যাটাকে শয্যাশায়ী বাবার কাহিনিও শোনানো যাবে না। টুবলুর স্কুলের ইতিহাস তো একমাত্র আমার নিজের।তাই অনির্দিষ্টকে বৃত্তের মধ্যে দেখা এই মুহূর্তের ছন্দ। সেই আনন্দটাকে মাটি করি কেন অতশত ভেবে, হারাই কেন?

তখন আর আমার কত-ই বা বয়েস। আট কিংবা নয়। পুকুরপাড়ে বসে চাঁদ দেখা আর মনে মনে স্বপ্নের জাল বোনা।

আহা রে!

যদি কখনও চাঁদের দেশে...

স্বপ্ন দেখতে কার না ভালো লাগে? অনেক না-পাওয়াকে স্বপ্নের মধ্যে পেয়ে যাওয়া যায়। সেই বয়সে পুকুরপাড়ে বসে তো আর চাঁদ ধরার স্বপ্ন থাকে না। শুধু অনুভূতির আলোয় মুহূর্তটাকে উপভোগ করা যায়।

"ভালো লাগছে..."

লিপস্টিক মাখা ঠোঁট নাড়িয়ে ফিসফিস, বললে "তোমাকে..."

মায়াটা যেন সেই মুহূর্তে কায়া। স্বপ্ন পেল বাস্তবের রং।

অবন্তিকাকে কাছে পেয়েও অনুভবে দূরত্ব। শূন্যতা বুকে তরঙ্গ তুলে দিল। তোমাকে অনুভব করলাম পেয়েও না-পাওয়া অবয়বে। মনের মাঝে জলতরঙ্গ, যুগলবন্দিতে বেজে উঠল।

নতুন সরগম থেকে নিখাদের আশায়।

মৌনতার অলিখিত ভাষায়।

মুহূর্তের পূর্ণতায়।

অনামিকা পাক্কা গিন্নি। সব কিছুই অঙ্কে বাঁধা। বাবার চাকরি চলে যাওয়ার পর থেকে দুনিয়াদারিটা ভালোই শিখেছে। কোথায় কতটা খরচ করতে হবে, সব আঙুলের ডগায়। টুবলু থেকে শ্বশুর-শাশুড়ি - এমনকী আমার চা-সিগারেটের বরাদ্দ কোটা। এর বাইরে ভাবতে পারে না। ভাবতে চায় না। গল্পের বই পড়তেও আলসেমি। অবসরে টিভির প্রলাপ, সারাদিনের ক্লান্তির গ্লানি। সিরিয়ালের অর্থহীন বাণী। অবসর মানে পাড়ার গিন্নিদের সঙ্গে গুলতানি, কিছু সামাজিক সংলাপ। অবসরের ফাঁকে চাঁদের পূর্ণিমাটাও দেখতে ভুলে গেছে। দেখাটাই যেন আজগুবি প্রলাপ।

মন চাইছিল তোমাকে একটু ছুঁই। সংস্কার বলছিল এটা অন্যায়, এটা পাপ। একে প্রশ্রয় দিলে ভালোবাসা হয়ে যাবে মাটি। আঙুল তুলে বলবে "তোমরা তো সবাই এক..."

তবুও...

মন মেতেছিল ন্যায়-অন্যায়ের বাইরে। তোমাকে নিবিড় স্পর্শ করার অছিলার দ্বারে। আরও একটু কাছে ঘেঁষে বসলাম তোমার। আমার দিকে তাকিয়ে, মুচকি হেসে, ফিরে তাকালে জানলার বাইরে, ওধারে। বুঝে নিয়েছ আমার মনের সুপ্ত কথা। জেনে গেছ আমার আমিকে বলা গাথা।

বাইরে তাকিয়েই বললে "রাজকুমার কি রাজকন্যে পেয়ে গেল?"

হেসে বললাম "রাজকুমার রাজকন্যেকে বরণ করে নিল।"

সেই মুহূর্তে তোমার মনে কী চলছিল জানি না। আমার মনে জেগে উঠল নতুন এক আলোড়ন। নতুন অনুভূতির ধক-ধক করা বুকে বিবাদহীন শিহরণ। পালসের দ্রুত প্রবাহে অতিরিক্ত কম্পন। আমার মানুষটার ভেতরের সত্তার এক নব উন্মোচন।

তুমি বললে "বরণ করে কী কোনো লাভ হল?"

হেসে বললাম "আবার সেই হিসেবের খাতা... হিসেবটাকে নয় আমাদের সম্পর্কের বাইরে ফেলে রেখে দিলে। আমরা এখন কলকাতা থেকে অনেক... অনেক... অনেক দূরে..."

"বেশ তো। তুমি যদি সেভাবেই চাও, তাই হবে।"

"লোকসান তো হয়নি। লাভ-লোকসানের হিসেব নয় বাদ-ই দিলাম এ-ক'দিনের জন্য। পড়ে থাক পিছে আমাদের নিজেদের জীবনের উপাখ্যান। এই হিসেবের দৌড়ে আর কতদিন ছুটব বলতে পার, আছে কী কোনো অভিধান?"

"যতদিন এ জীবন আছে..." বাধা দিয়ে বলেছিলে।

"তুমি বড্ড বোকা।"

"কেন?" জানলা থেকে মুখ ঘুরিয়ে চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন।

"কেউ কি কখনও জেতে? কখনও হারে?"

"তাহলে কেন মারামারি করে মরে? এমনও হয়?"

"একেবারেই নয়। এ শুধু আমাদের মনগড়া মায়া। শুধুই নিত্য নতুন পথ খুঁজি সেই কল্পনাকে রেখে বাস্তবের ছায়ায়।"

"যদি সব বুঝেই গেলে, তবে ছুঁলে কেন আমার ছায়া?"

দরজাটা আধা ভেজানো ছিল।

বেয়ারা ঢুকে বলল "রাত কা অর্ডার। ভেজ ইয়া নন-ভেজ?"

"নন-ভেজিটেরিয়ান।"জবাব দিয়েছিলে মনে হয়। বেয়ারা সিট নম্বরের পাশে রাতের অর্ডার নিয়ে চলে গেছিল।

টু বার্থ ফার্স্ট ক্লাস কেবিন এসি। রাতে দরজা বন্ধ করলেই আমাদের নিজস্ব পৃথিবী। একেবার লাইনের শেষ কিউবিকল। নামের ছটায় দুরন্ত-ঘুরন্ত-বসন্ত-কবিগুরু রেলের মতো, এর নাম 'হনিমুন কেবিন' হয়েও যেতে পারে কোনোদিন। মনে মনে হাসলাম। সুযোগ পেলে পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা' নাম দিতাম। ওরা তক্কের খাতিরে বলত 'লায়লা মজনু'। নামটা যাই হোক না কেন, স্বাধীনতাতে যে কোনো হস্তক্ষেপ নেই, সেটা অনস্বীকার্য।

বেয়ারা যাওয়ার আগে ওকে বলেছিলে "চায় মিলেগা?"

"কেউ নেহি? অভি আ রহা হ্যয়। চায় ঔর প্যাটিস ইয়া চিকেন স্যন্ডুইচ"

"চিকেন স্যন্ডুইচ।" লক্ষ করলাম খাবার অর্ডারের ব্যাপারে তোমার কোনো দ্বিধা নেই।

কোনোদিন কী শাঁখরাইলের পাড়াগাঁয়ের ছেলে, পুকুরপাড়ে বসে, ফার্স্ট ক্লাসে চড়ার স্বপ্ন দেখেছিল? তাও আবার টু কিউবিকল বার্থে কোনো অচেনা মহিলার সঙ্গে, নির্জনে...

ডান দিকে জানলার বাইরে তাকাতে হঠাৎ একটা নীলচে কালো রক্তিম আভা বুঝিয়ে দিল সন্ধে হয়ে এসেছে। ট্রেনের মিউজিক সিস্টেমে বেজে চলেছে মিষ্টি সুর।

বলেছিলাম "কী রাগ বলতে পারবে?"

"রাগ মিয়া-কি-টোডি।"

"ঢপ মারছ" মুচকি হেসেছিলাম মনে হয়।

"মোটেই না। এক সময় সেতার শিখতাম। তুমি তো সে-কথা জান না।" প্রতিবাদ করেছিলে।

কে জানে?

সেতার অবশ্য খুব-ই শুনি। তবে রাগ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই বললেও কম বলা হবে, সেকথাও নিজে মানি। অনামিকা কি কোনোদিন সেতার শুনেছে? বিবাহিত জীবনে তো কোনোদিন দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার। ইচ্ছেও প্রকাশ করেনি কোনোদিন, করেনি ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সে যাওয়ার আবদার। বুঝবেই বা কী করে? যার জীবন সিরিয়ালের প্রলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার কাছে রাগের আলাপটা বিলাসিতার অর্থহীন স্বর্গ।

চায়ে চুমুক দিয়ে স্যন্ডুইচটা যেই না কামড় দিয়েছি, হঠাৎ আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিটা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে, আকাশে মিটিমিটি করে তারা ওঠার আগে, দুম করে ট্রেনটা থেমে গেল।

কী হল?!

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে বসে স্যন্ডুইচ আর চা শেষ করে কারণটার কথা ভাবছি, তুমি বললে "দেখ না কী হয়েছে?"

এখনও যখন ট্রেন ছাড়েনি কিউবিকল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম অনেক যাত্রী অ্যাটেনডেন্টকে ঘিরে ফেলেছে।

"কেয়া মালুম সাহাব? দেখিয়ে কোই লাইন কা ফিস প্লেট খুল রখা হ্যয়। ইধর তো ঐসে হি চোরি হোতা হ্যয়"

যদি তাই হয় তবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অনিবার্য রক্ষা। কিন্তু ডাকাতের ভয় প্রাণের ধড়ফড় দ্বিগুণ হয়ে গেল।

"কী হয়েছে?"

"বোধহয় কেউ ফিস-প্লেট খুলে নিয়ে গেছে..."

আমার কাঁধ ঘেষা স্বপ্ন-ওড়া পাখিটার শ্বাস-প্রশ্বাসে একটা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে পড়ল। তুমি কিছু না বললেও বেশ বুঝতে পারছিলাম, মনে মনে একটা আশঙ্কা কাজ করছে।

"ইশ্! বড্ড জোর বেঁচে গেছি"

যাত্রীদের মধ্যে যখন এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে, হঠাৎ এক পুলিশ বাহিনী আমাদের কিউবিকলের পাশের দরজা খুলে ঢুকল। সঙ্গে গোটা কয়েক জি.আর.পি। প্রত্যেকটা কিউবিকলে উঁকি মারছে। ঠিক তল্লাশি নয়। কাউকে যেন খুঁজছে। কম্পার্টমেন্টের শেষের ওপাশের দু-কামরার কিউবিকলটায় শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেল ওদের। যাদের জন্য এই ট্রেন থামা।

দুই যুবক-যুবতী। পুলিশ দেখে একটু হকচকিয়ে গেছে। ওদের মধ্যে যে সিনিয়ার অফিসার ওদের কামরায় ঢুকে বলল "তুমহে থানে মেঁ জানা হ্যয়"

"কেঁও?" যুবকটি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল।

"ও জানে সে হি পতা চলেগা"

"হমলোগ তো কোই গলতি নেহি কি" যুবকটি আবার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল।

ধমকে উঠল পুলিশ অফিসারটি "রুক্সানা কো লে কর ভাগ রহে থে, ঔর বোলতা হ্যয় গলতি নেহি কিই?"

রুক্সানা বলে মেয়েটি বলল "হামলোগ সাদি কি হ্যয়। দেখিয়ে হামারে পাস ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ভি হ্যয়"

রুক্সানার কথায় কর্ণপাত না করে পুলিশটি বলল "আরে ছোড় ইয়ে সব সাদি কা বাহানা। পৈসে দেনে সে শও সার্টিফিকেট ঐসে হি মিল যাতা। চলো পুলিশ চৌকি মে। পাপা ইনতেজারমে হ্যয়"

ফার্স্ট ক্লাস এসি স্লিপারে যখন উঠেছে অবস্থা নেহাত খারাপ নয়। বৈধ বিবাহ মুহূর্তের মধ্যে অবৈধ করে দিতে পারে আমাদের সভ্য সমাজ। তবুও সেই চিরন্তন সত্যকে সামনে রেখে, ঢালের মতো আভরণ পরিয়ে, ঘোমটার অন্তরালে খেমটা নেচে চলেছে সকলে - আমাদের সামাজিক সভ্য প্রগতিশীল সেই সমাজ। অনেকটা ডুগডুগি বাজানো বাঁদর নাচের মতো।

বিয়ে নামক লাইসেন্সটার অর্থ যেন কেমন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে সত্যি প্রেমের বলিদানে। হাজারটা বিবাহিত জীবনের অন্তরালে, হয়তো মোটে দু-এক টুকরো প্রেমের অনুভূতি আজও লুকিয়ে আছে। হয়তো-বা, তাও নয়। এই যুগল তার সাক্ষাৎ নিদর্শন। সেই নিদর্শনকে বলিকাঠে চড়াতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করে না গণ্যমান্য জঘন্য সমাজ।

তাহলে কাগজের ওপর দুটো সাক্ষর দিয়ে সাত পাঁকে বাঁধতে চাইছে কেন মনটাকে? উড়ুক না সে নিজের মতো খোলা পৃথিবীর আকাশে। উড়িয়ে তুফানে প্রাণটাকে। সাত সুরের মালা দিয়ে গাঁথা অঙ্গীকারের কল্পনাকে।

সজল চক্ষু রুক্সানাকে আর তার সদ্য-বিবাহিত ভীত সন্ত্রস্ত স্বামীকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিয়ে গেল ওরা। তোমার মনে তখন কী চলছিল, জানি না। আমার মনে বেজে চলেছিল, এই বলয়ের বৈধতার দামামা। সে দামামা হয়তো রেগে-ও বাজায়নি। সে লহরা আল্লারাখা থেকে গোবিন্দ বসু শুনতে পেরেছিল কি না, কে জানে?

আমাদের যাত্রার বৈধতার সংশয় ঘুচে গেল মন থেকে সেই মুহূর্তে। বাস্তব ছাড়িয়ে পড়ল কল্পনার উদ্ভাসিত আলোকে। কল্পনা নিয়েই তো তোমার স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি।

শুধুই তোমাকে...

এখন যেন সেই কল্পনাই নিজের তানে বন্দনাগান গাইছে নতুন চেনা সুরে। তোমাকে কাছে পাওয়ার অভিলাষ নিয়েই তো পথ চলা। তবে কেন মায়ার রং ছেড়ে পৃথিবীর পথের ভাষা বলা?

সেই বিয়েবাড়ির পর কত বিনিদ্র রাত্রি কেটেছে তোমার স্বপ্নে। আজকে ট্রেনের সামাজিক ছবিটা চেতনা দিল আমার মনে। বৈধতা কোথাও কুরবান হয় সামাজিক চাপে। আমরা উড়ে বেড়াই অলক্ষ্যে, সেই বৈধতা ভুলে অন্তরের নিভৃতে।

ট্রেন আবার চলছে অনির্দিষ্টের পথে। ফিরে এলাম রুদ্ধদ্বার কক্ষে। মিয়া-কি-টোডি এখন মিশে গেছে বেহাগে। এই ছোট্ট ঘটনাটি ছাপ ফেলেছে তোমার দ্বন্দ্বের না-ছোঁয়া আলোকে। সেই দ্বন্দ্ব ফুটে উঠল প্রশ্নের ঝলকে।

“আমার পরিচয় জানতে ইচ্ছে করে না?”

“না।”

“কেন?”

“জেনেই বা কী লাভ? সেখানেও তো হিসেবের চেনা অঙ্ক। এই যা দেখলে, তার অন্য কোনো এক ছন্দ...”

যে অঙ্ক থেকে পালাতে চাইছি বারবার। তাকে আবার ফিরিয়ে আনা কেন শতরূপে শতবার? চল না দুজনে উড়ে যাই বাধন ছিন্ন করে। নিজেদের মনকে আবার নতুন করে খুঁজে ফিরি আমাদের মনের দ্যুলোকে।

পড়ে থাক, না-বলা অনেক কথা।

পড়ে থাক, আমাদের জীবনের না-পাওয়া অনেক ব্যথা।

পড়ে থাক, না-বলা কথার কাঁটায় ভরা ফেলে আসা পৃথিবীটা।

এখন শুধু আমরাই ঘুরব মনের বৃত্তের বাইরে।

পড়ে থাক, পিছনে যত চোরাবালি।

বোতামের চাপেও এখন আর ফুটবে না কম্পিউটারে নতুন কোনো শব্দের কলি।

তোমাকে

কৌস্তুভ



চতুর্থ চিঠি

কৌস্তুভ

বিয়ের কথা তখনও খেয়াল করিনি।

প্রেমের তো নয়ই। দু-একটা ছেলে যে আশপাশে উশখুশ করেনি, এমনও নয়। দেখতে নেহাত খারাপ ছিলাম না কোনোদিন। নীল স্কার্ট আর সাদা টপস পরে যখন কারমেল কনভেন্টের বাস থেকে নেমে স্কুলে ঢুকতাম, ব্যঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় ওঠার সিড়িতে, নানাদার পানের দোকানের পাশে বসে থাকা যাদবপুর ইউনির্ভাসিটির ছেলেগুলোর ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে থাকা বুঝিয়ে দিত, আমার যৌবন বাড়ন্ত। সেটা কী, যে কোনো উঠতি মেয়ের প্রতি কোনো ছেলের আকর্ষণ? না কি, আমার প্রতি একটু বিশেষ টান? সেটা বোঝার ক্ষমতা ছিল না। আর থাকলেই বা কী? গায়ে পড়ে তো আর জানতে যাব না? যদিও মনে মনে ভীষণ ইচ্ছে করত, কেউ অন্তত একবার উঠে এসে একটু কথা বলার চেষ্টা করুক।

দাদার বন্ধুরা তো হামেশাই আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইত সে কথা। তবে সেরকম ভাবে নয়। আমি যখন এগারো-বারো তে পড়ি, তখন ওরা রীতিমত আইআইটি-র ইঞ্জিনিয়ার।

লাজপত রায় হল থেকে ফিরে সীতেশদা হাঁক দিল “এই পুচকে, একটু চা করে খাওয়াবি?”

কিন্নরদা একটু সহানুভূতির সঙ্গে বলত “ওকে পুচকে বলিস না সীতেশ। ও তো এখন বড় হয়ে গেছে। মনে কষ্ট পাবে।”

বুঝতে পারতাম, ওরা আমাকে এত ছোটো বয়স থেকে দেখেছে যে, আমার বড় হয়ে ওঠাটা চোখ এড়িয়ে গেছে। একদিকে ভালোই। কেউ প্রেমে পড়ে গেলে আবার মুশকিল। এমনিতেই ওদের কাউকে আমার বিশেষ করে কখনওই তেমন পছন্দ হয়নি। তার ওপর আবার ঘাসিকালচার ইঞ্জিনিয়ার, থুড়ি আইআইটি-র ভাষায় ওটা এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ার।

সেই বয়সে নিজের যৌবনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার মধ্যে মনে মনে একটা স্বতন্ত্রতা খুঁজে পেতাম। নিজেকে বেশ দামি লাগত। এই উন্নাসিকতায়, দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে আর প্রেম করা হয়েই উঠল না।

কলেজে উঠে ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে পালটে গেল। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির কফি হাউসে ছেলেদের সঙ্গেই আড্ডা মেরে কেটে যেত অতিরিক্ত সময়। বাড়ি যাদবপুরে, পড়িও সেখানে। পৃথিবীটা যেন থেমে

গিয়েছিল ওই চত্বরে। যে ছেলেদের সঙ্গে সকাল-বিকেল আড্ডা মারি, তাদের সঙ্গে আবার প্রেম হয় নাকি?

মন তো তেমন করে কাউকে কাছে চায়নি, টানেনি, ভালোবাসতেও পারেনি। বিশেষ করে যখন ইকনমিক্সের ছাত্রী। প্রেমের কেমেস্ট্রি-টা বুঝবই বা কী করে? তাই স্কুল-কলেজ-ইউনির্ভাসিটির গণ্ডি পেরিয়ে যৌবনেও স্বাদটা অধরা ছিল।

ইকনমিক্সে মাস্টার্স শেষ করে ভাবছিলাম অ্যামেরিকা যাব। ডক্টরেট করার ইচ্ছে কোনোদিনই ছিল না। হয়তো যাদবপুরের মেয়ের পক্ষে অ্যামেরিকা যাওয়ার ইচ্ছেটা নিছক-ই স্বপ্ন! তবুও ছোটোবেলা থেকেই স্কুলে যাওয়ার সময়, সেই স্বপ্নের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতাম। স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আদা-জল খেয়ে কখনও লাগিনি।

তবুও....

স্বপ্ন দেখতে তো ক্ষতি নেই?

বাবা বলত "স্বপ্ন না দেখলে কিছু হয় না।"

তাই বুক ভরে যাদবপুরের বাদেরাইপুরের বাবার ছোট্ট ফ্ল্যাটে বসে জানলার গরাদ ধরে স্বপ্ন দেখতাম। উড়ো-জাহাজটার দিকে তাকিয়ে মন ভেসে যেত সুদূর অ্যামেরিকার পথে। ওটাই স্বপ্নের নগরী। ওরা বলত, ওখানেই নাকি ভবিষ্যৎ তৈরি হয়।

"ছুটি" একদিন বাবা কাজ থেকে ফিরে, জামাটা খুলে আলনায় ঝোলাতে ঝোলাতে, মাকে বলল।

মা ঠিক বুঝতে পারেনি। চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে বলল "কীসের ছুটি?"

"কাজের। ভুলে গেছ আজ আমার রিটায়ারমেন্টের দিন?"

ফুলের তোড়া আর রিটায়ারমেন্টের সাক্ষর, অফিসের লোক নামিয়ে রেখে গেল, বসার ঘরের বেতের সোফায়। একটা দীর্ঘ কর্মঠ জীবনের ইতি টেনে দিল মেডেল আর ফুলের তোড়া।

"তার মানে?" মা তখনও ঠিক কঠিন বাস্তবে ফিরে আসতে পারেনি।

"কাল থেকে আর কাজে যেতে হবে না।"

বুকটা কেঁপে উঠেছিল। খাটের ওপর বইটাকে উলটে, বাবার দিকে তাকালাম। বাবা তো আমাকে আগে বলেনি রিটায়ার করছে। আমি বোকার মতো খাটে শুয়ে স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি সুদূর অ্যামেরিকার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের! স্বপ্নটা হাওয়ায় হারিয়ে গেল। বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলতেইনেমে এলাম রূঢ় বাস্তবে।

"কাল থেকে পেনশনের টাকায় সংসার চলবে।"

"মানে?" মা শাড়ির আঁচলে কপাল মুছতে মুছতে বাবার পাশে বসল।

মা যে কী না! এমন বোকার মতো প্রশ্ন কেউ করে? নাকি কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে আর্থিক চিন্তা করে? যদিও পেশায় বাবা ডাক্তার, কখনও ডাক্তারি প্র্যাকটিস করেনি। ডিভিসি-র মাইনে করা ডাক্তার হয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছে।

চেয়ারে বসে, খালি গায়ে, চায়ের পেয়ালা নিয়ে, টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বাবা বলল "আমার কর্মজীবনের এখানেই শেষ। যখন সারাজীবন প্র্যাকটিস করিনি, রিটায়ারমেন্টের পর আমার আর প্র্যাকটিস হওয়ার কোনো চান্স নেই। তাই এখন ওই পেনশনই একমাত্র ভরসা।"

হঠাৎ যেন স্বপ্নের পৃথিবীটা থমকে গেল। অ্যামেরিকার উড়োজাহাজ যেন হঠাৎ-ই ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করল যাদবপুরের দোতলার ছোট্ট ফ্ল্যাটে। স্বপ্নটা নেমে এল বাস্তবের দোরগোড়ায়। চুরমার করে দিল আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। এর পরে কী প্রশ্ন উঠবে তা-ও জানি। অ্যামেরিকার স্বপ্নের ইতি ঘটবে বাসরে।

প্রশ্নটা অপেক্ষায় ছিল। শুধু মুহূর্তের জন্য। বাবা রিটায়ার করলে বাবা-মায়ের মনে একটাই প্রশ্ন খেলে বেড়ায়। সোমত্ত মেয়েটার বিয়ে তো এখনও বাকি।অ্যামেরিকা হোক আর ত্রিপুরার ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ার হোক, মেয়েকে পার করাটাই তখন মুখ্য কর্তব্য। যতই প্রগতিশীল হোক না কেন সমাজ, জীবনটাকে কবিগুরুর চার অধ্যায়-এর বলয়ে বাঁধবার মধ্যেই যেন নারী জীবনের সার্থকতা।

যুগ পালটে যেতে পারে। ধর্ম ক্রুসেডের আকারে জেহাদ ঘোষণা করতে পারে। ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন রেনেসাঁ আনতে পারে। পুরনো পৃথিবীর স্বপ্ন মনকে নিঙড়ে ধূলিসাৎ করে নতুন ছবি আঁকতে পারে - কিন্তু পৃথিবী এগিয়ে চলে সেই অলিখিত শাশ্বত পথ ধরেই। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে ভালোবেসেও বিতাড়িত হয় নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ঘেরাটোপ থেকে। গিয়ে পড়ে ভবঘুরে পৃথিবীর বাউন্ডুলে জীবনে।

কাহিনিটা তো সেই এক। কবিতা, সাহিত্য, গল্প সবই পালটে যায়। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবী এগিয়ে চলে তার আপন পথে। সংসারের ধরা-বাঁধা অতি স্বাভাবিক নিয়মের ছকে।

মায়ের সম্বিত ফিরতে হয়তো কিছুটা সময় লাগবে। মা স্বপ্ন বোঝে না। বাস্তবকে চেনে। সেদিনও ঠিকঠাক বাস্তবতাকে মেলাবার চেষ্টা করছিল এই ইনফ্লেশনের বাজারে। হাজার হোক, সংসার তো তাকেই চালাতে হয়।

একবার আমার দিকে তাকিয়ে, বাবার দিকে ফিরে বলেছিল "ওর কী হবে গো?"

প্রশ্নটা অনেকদিন ধরেই মনের ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারছিল। উত্তরটাও হয়তো এসে পড়ত। যদি কোনো এক রাতে আমি এসে বলতাম "প্রবালকে বিয়ে করব।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের ঝড় বয়ে যেত।"কে প্রবাল? কী পড়াশোনা করেছে? কী করে? বাড়িতে আর কে কে আছে? নিজেদের পৈতৃক বাড়ি তো, না ভাড়া থাকে?"

সব প্রশ্নের সদুত্তর না পেলেও একটা সমঝোতা হয়ে যেত হয়তো কন্যাদায় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায়।

তারপর কোনো এক শুভ লগ্নে মালাবদল করে শুভদৃষ্টি হয়ে যেত। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে মন্ত্র উচ্চারণ করে পবিত্রতার মন ভোলানো আঙ্গিকে সিঁদুরের লাইসেন্স দিত পাড়া-পড়শী।

অনন্ত ভালোবাসার লাইসেন্স!

বাকি জীবনে প্রেমের লাইসেন্স!

আত্মীয়-স্বজন কেটারারের সাজানো খাওয়া পেট পুরে খেয়ে আশীর্বাদ করে সেই রাতের মতো বিদায় নিত। ফুলশয্যার বাসরে প্রবাল আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করত, চুমো খেত,চিরকালের চেনা গতে।

কিন্তু পাগলা মনটা যে সর্বদাই ছুটে চলে স্বপ্নের খোঁজে। জীবনের হাট থেকে স্বপ্নের বাসরঘর যে বহুদূর। সেখানে প্রবালের মতো হাজার ভালো ছেলে থাকতেই পারে, কিন্তু সেখানে তো অ্যামেরিকা নেই। আমি যে অ্যামেরিকাকে খুঁজছিলাম। প্রবাল, তিমির, সৌরভ, দ্বিজমান সব এক একটা সুযোগ্য নাম। এরা তো আমার স্বপ্নের নিভৃতে গড়া শিব নয়। শুধুই নিশ্চিন্ত আচ্ছাদনের একটা সংরক্ষিত ধাম।

আমার দিকে ফিরে বাবা বলল “এই বছরই তো তোর শেষ। তাই না?”

খাটে বসেই, বই থেকে মুখ না তুলে মাথা নাড়লাম। শুধু যে আমার ইকনমিক্সের শেষ তা নয়, বেশ অনুভব করছিলাম, আমার স্বপ্নেরও সেই সঙ্গে যবনিকা পড়তে চলেছে।

বাবা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল “ওর বিয়েটা দিয়ে ফেলতে হবে। তারপর যে করে হোক বুড়ো-বুড়ি চালিয়ে নেব কোনো ভাবে।”

একবার যে শেষ চেষ্টা করিনি, তা কিন্তু নয়। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম “এখন বিয়ে না করলেই কী নয়!”

চায়ের কাপটা কাচের টেবলের ওপর রেখে বাবা বলল “তো কী করবি?”

বইটা খাটের ওপর রেখে, বসে বললাম “অ্যামেরিকা যাব...”

“টাকা?”

“প্যাসেজ ফেয়ারটা দাদা দিয়ে দেবে। আমার জিআরই পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেছে। ওখানে গিয়ে পিএইচডি করব...”

ছেলে-মেয়ে দুজনেই দেশের বাইরে থেকে যাবে, মন থেকে পুরোপুরি সায় না দিলেও, বিশেষ করে শেষ বয়সে কে দেখবে, ভেবে একটা দোটানা চলছিল বাবার ভেতরে।

তবুও...

নিজেদের সুবিধার জন্য তো আর সন্তানদের ভবিষ্যৎকে থামিয়ে রাখা যায় না?

কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার দিকে তাকিয়ে উদাসীন, বলল "তোরা এখন বড় হয়েছিস। যা ভালো বুঝবি তাই কর।"

ভালো ক'জন মানুষ বোঝে? মনে মনে ভাবলেও চিত্রনাট্যটা তো উনিই আগে থেকেই লিখে রেখেছেন। আমরা বাধ্য স্তাবকের মতো কৃতিত্বের মিছে আস্ফালন করি।

যৌবনের সেই হুল্লোড়ে বাবা-মা বাধা না দিলেও, হঠাৎ স্যু আবির্ভূত হল দাদার জীবনে। শুধু ভেসে ওঠাই নয়, আমার ইকনমিক্সের পোস্ট গ্র্যজুয়েট ফিনিশ হওয়ার আগেই, ওদের গাঁটছড়া কমপ্লিট, দেশি থেকে বিদেশি কায়দায়। ওদের সদ্য হনিমুনের সংসারে আমি বাড়তি। ভিড় বাড়িয়ে কেনই বা ওদের ঝামেলায় ফেলব?

অতএব স্বপ্নটা রয়ে গেল আধুরা। পড়ে রইলাম আমার না-পাওয়া স্বপ্নের বন্ধনে, দেশজ অন্ধকারে। সৈকতের বাহুবন্ধনে।

স্বপ্ন থেকে ঘর।

মুক্তি থেকে বন্ধনের সুখ।

কিছু পাওয়ার অভিলাষ থেকে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার এক নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। স্বপ্নটাকে মিশিয়ে দিতে চাইলাম, অন্যকে পূর্ণ করার চিরপরিচিত আবর্তে।

সৈকতের কাছে সংসারই যেন জীবনের অলিখিত রীতি। তাকে না মানলেই সমাজের চোখে প্রচ্ছন্ন ভীতি। অনিশ্চয়ের দোলায় আত্মপ্রতিষ্ঠার এটাই নীতি। অগত্যা করতে হবে বলেই করা। এবার আমি বন্ধনে সংযত, মানসিকতায় ছন্নছাড়া।

"তোমার সংসার তুমি চালাও।" বিয়ে করতে হয় বলেই করা। বউকে সম্মান দিতে হয়, তাই দেওয়া। সংসারের দায়িত্বটা অনায়াসে তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে হারিয়ে যাওয়া যায় নিজের মধ্যে... কাজ আর শুধু কাজ।

আমার মানুষটা তো দূরের কথা, আমার শরীরটার দিকেও তাকাবার সময় ছিল না সৈকতের। তবে কি আমি যোগ্য নই? দৈহিক চাওয়া নিভে গেছে? সময় কই? এমনিতেই তো বিয়ের জন্য কত কাজ বাকি রয়ে গেল। তার কী হবে...

কেন আমি?

যুগযুগান্তর ধরে কিছু ভাষা দিয়ে মানুষের মনটাকে কারা যেন বেঁধে ফেলতে চেয়েছে, এক না-জানা ভালোবাসার সামাজিক বন্ধনে। ইংরেজিতেও কোনো এক মত বলে গেছে ইন সিকনেস অর ইন হেলথ, ইন রিচনেস

অর ইন পভার্টি, আনটিল ডেথ ড্যু আস অ্যাপার্ট...বিদেশি সভ্যতার ব্যবসায়িক পরিব্যাপ্তি তার জাগতিক কায়ার অঙ্কে ভালোবাসাকে বন্দি করেছে পৃথিবীতে।

ওরা ভাবে কী? কতগুলো মন্ত্র পড়লেই ভালোবাসা হয়ে যায়? আর আগেকার পুরনো বাংলা সিনেমার মেলোড্রামার মতো সেই মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি কি এক অপরিচিত অতীতকে বর্তমানের দরজায় অবার কখনও নিয়ে আসে?

যুগের একটা বিবর্তন হয়েছে। সঙ্গে নারী স্বাধীনতার চেতনারও। চেপে রাখা আকাঙ্ক্ষা যেন মনের নিভৃত কোণ থেকে বারবার সমাজের নাগপাশ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

আমার স্বপ্ন ডানা-কাটা পাখির মতো ঝাপটাচ্ছে, কিছু পাওয়ার আশায়। সেটা যেন হঠাৎ আছড়ে পড়ল বাস্তবের ধূসর সাহারায়। পড়ে রইলাম একাকী।সেই সংকীর্ণতায়, সৈকতেরই সঙ্গে, নতুন আকাশে এক রামধনু আঁকতে চেয়েছি। সীমাবদ্ধতার মধ্যে, তুলির টানে রঙিন আভায়।

একবার সৈকতকে বলেছিলাম “চল না কোথাও বেড়িয়ে আসি”

“তুমি যাও। তোমার মা-বাবাকে নিয়ে। তোমার বাবা রিটায়ার করেছেন। ওনাদের এখন প্রচুর সময় হাতে। আমাকে এখনই চেন্নাই ছুটতে হবে।”

“তুমি যাবে না?” চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আয়না থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম।

সৈকত ফাইলের পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে বলেছিল “বললাম তো। এখন আমার যাওয়ার ফুরসত নেই।”

বেড়ানো হল না।

জানলার ফাঁক দিয়ে দুপুর কাটিয়ে রাতে ‘ট্র্যাভেল অ্যান্ড লিভিং’ চ্যনেল দেখে আমার বেড়ানো শেষ হয়ে গেল।

কম্পিউটার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে মনে হত, দিনটা বুঝি বড্ড বড়। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ছটফটানি শুরু হলে থামতই না। চাঁদের মিঠে জ্যোৎস্না পাশের বাড়ির দাওয়া ভরিয়ে দিয়েছে। ক্যলিডিওস্কোপের মতো আলোর ঝিলিক খেলে যাচ্ছে অন্ধকার আকাশে। শেষ রাতে মালকোষের সুরে ভৈরবীর রাগ কী হারিয়ে গেছে জীবন থেকে! এ বাড়ির সাজানো ঘরে, শুধুই যেন দমচাপা শূন্যতা আর অন্ধকার।

যৌবন তো মুছে যায়নি। ভিজে যাওয়া নীচের উন্মাদনাটা আজ মুক্তি খুঁজছে অহল্যার মতো। কখন কার পায়ের ধুলোর ছোঁয়া পাবে? আবার পাষাণে প্রাণ জাগবে নতুন উন্মাদনায়।

চাওয়াটাকে আর বেঁধে রাখা যাচ্ছে না। পৃথিবীতে ক’টা মেয়েই বা তা পারে?

বনবাসে তো কোনো সঙ্গী নেই...

একাকী পথের সন্ধানে...

একদিন অজান্তে সেই বনবাসের নিঃসঙ্গতার বাঁধ ভাঙল। ইউনির্ভাসিটির বন্ধু তিমিরের বহু পুরনো প্রেমিক মন বোধহয় তখনও আমাকেই খুঁজছিল।

আমার না পাওয়া অবয়বটাকে?

বুধবারে বিগ-বাজারে গিয়ে তিমিরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা।

"চিনতে পারছিস?"

আমার সম্পূর্ণ অবয়বটাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলল "জমিয়ে সংসার করছিস, ওজনও একটু বেড়েছে বটে!"

"বিয়ের রস পড়লে ওজন বাড়ে বৈকি।" মুচকি হেসে তিমিরের চোখের দিকে তাকালাম। মেয়েরা ঠিক বুঝতে পারে। ওই চাহনির মধ্যে একটা নিঃশব্দ ভাষা কথা বলছে। ভেতরটা ঝলকে উঠল সেই মুহূর্তে। কিছু বলতে চাইছে?

আত্মা তখন পৌরুষ খুঁজছে যে কোনো আকারে। যে কোনো পুরুষ, যার যৌবন আছে, মাদকতা আছে। যে আমার না-পাওয়াটাকে ভরিয়ে দিতে পারবে। সে যেই হোক না কেন? অবয়বটা একটা নিমিত্ত মাত্র। যে আমাকে দেশে বসেই উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমার নিভে যাওয়া স্বপ্নকে আবার জাগাতে পারবে প্রতিটা কোষের স্ফুলিঙ্গে।

"কাল ফ্রি আছিস?" আমার আঁচল পরিবৃত পায়রার মতো নিটোল স্তনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল। দৃষ্টিটা কিন্তু তখনও ওই চত্বরেই আটকে।

"হ্যাঁ। কেন?"

তিমির আমাকে সিনেমা দেখাল। ভালো হোটেলে খাওয়াল। তবুও তো - কারও তো আমার জন্য একটু সময় আছে। হোক না সে খেয়াল-খুশির খাতা। তাই দিয়েই লিখব জীবনের না-পাওয়া অনুভূতি। অনেকদিন পর পরিপূর্ণতার দিগন্তকে ধরবার জন্য হাত বাড়ালাম।

"যাবি এক জায়গায়?" তিমির প্রশ্ন করল।

"কোথায়?"

"চল না আমার সঙ্গে।"

স্পষ্ট করে না বললেও, ইঙ্গিতটা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি। এর দুটোই উত্তর - হ্যাঁ, অথবা না। মন কী বলছিল, সেটা বড় কথা নয়। বাসনার পরিপূর্ণতা খুঁজছিল। সেই মুহূর্তে সেটাই সত্য। তার ব্যঞ্জনা তখন মলিন এক প্রথা মাত্র। যেখানে চাওয়াটা সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে।ইন্দ্রিয়গুলো সর্বক্ষণ খোঁজে বেঁচে থাকার

নতুন রসদ। অন্ন, বস্ত্র, আচ্ছাদন, এমনকী দৈহিক আনন্দ। এতদিন যা ছিল সুপ্ত, আজ যেন তা আত্মপ্রকাশ করেছে।

তিমির আমাকে নিয়ে গেল বাগুইহাটির ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে। পুরনো বাড়ির দোতলা। সবুজ দরজা। দেওয়ালের চুন খসে পড়েছে। ছোট্ট দুটো ঘর। চৌকি পাতা। অনেকটা হরিপদ কেরানির আস্তানার মতো নিরাপদ আশ্রয়।

আবার নতুন করে, উষ্ণ চাওয়াটার কাছে ফিরে যাওয়া। ইন্দ্রিয়কে মুক্ত করার এক চমকহীন উন্মাদনার সামনে।

"এই ফ্ল্যাটটা কার রে?"

"আমার এক বন্ধুর"

"এখানে নিয়ে এলি কেন?"

তিমির আমার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে কাছে টেনে নিয়ে বলল "ন্যকা! কিছুই বুঝিস না? তোকে একটু আদর করব বলে।"

সৈকত তো আমায় এভাবে কাছে টেনে নেয়নি কতদিন। পুঞ্জিভূত কালো মেঘ ছেয়েছিল মনে। না-পাওয়াকে পাওয়ার চেষ্টা।

কোনো কিছু বোঝার আগেই, তার উষ্ণ অধর আমার দিশাহীন নৌকের ভেসে যাওয়া স্রোতে। এক ঝটকায় হাত দিয়ে সরিয়ে দিলাম ওকে। মন বলছিল এটা ভুল, অন্যায়, পাপ। এটা অপরাধ। চাওয়া বলছিল, আমার জন্যও তো কিছু এ জীবনে আছে। অ্যামেরিকা নয় নাই-বা গেলাম। এখনও তো অন্যান্য চাওয়াগুলো ধিক-ধিক করে তুষের আগুনের মতো জ্বলছে। অস্বীকার করি কেমন করে? না জেনে তো আর এ পথে পা বাড়াইনি।

একটা দোটানার মধ্যে, কিছু বোঝবার আগেই, কখন যে সব কিছু হয়ে গেল। ঘর এসে পড়ল বাইরে। বিবাহিত জীবন এসে দাঁড়াল জলের ঘটি না-উলটে চৌকাঠের অপর প্রান্তে। মধ্যবিত্ত শেখানো সাজানো অর্থহীন মানসিকতা দুমড়ে-মুচড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল একটু পাওয়ার নেশায়।

অ্যামেরিকা স্বপ্ন হতে পারে। এটা আমার প্রতিটা রোম দিয়ে উপভোগ করা বাস্তব।

ওখানেই বুঝি আমার পাওয়ার স্বর্গ।

ওখানেই বুঝি আমার চাওয়ার বর্ণ।

ওখানেই বুঝি আমার না-পাওয়ার পূর্ণতা।

তিমির নিজেকে সভ্যতার মুখোশ পরিয়ে বলল "আবার কবে দেখা হচ্ছে?"

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললাম “জানি না...”

তিমির বলল “তার মানে?”

“মানে আবার কী? জানি না। ইচ্ছে হলে হবে। নয়তো নয়...” একটু নিরাসক্ত হয়েই উত্তর দিলাম। বাসনার নিরাসন হয়েছে, চাওয়ার বাঁধ ভেঙেছে। আসক্তির উত্তরটা তো এখনও খুঁজে পাইনি। হুজুগের বশে সব কিছু কেমন হয়ে গেল।

পিল খাইনি! কিছু হবে না তো আবার? তিমিরের বোঝা এই মুহূর্তের বাইরে সারাজীবন ধরে বয়ে বেড়াতে পারব না।

ভাবছি, সেই ছোটোবেলা থেকে নিজের চাওয়ার এক মুহূর্তের অঙ্গীকার। দ্বিতীয় একটা স্ফুরণ। হয়তো প্রথম। কিংবা তা-ও নয়। এখনও বাকি রয়ে গেছে।

তাই তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পাওয়াটা যদি পূর্ণতা লাভ করে, তবে কী কেউ অনির্দিষ্টর পেছনে ছোটে?

তিমির বলল “কী হল রে? মুষড়ে পড়লি মনে হচ্ছে? আমি তো তোকে জোর করে কিছু করিনি।”

“নাঃ। আমি তো নিজে থেকেই এসেছি।”

অজান্তে ক্ষণস্থায়ী আর চিরস্থায়ী অনুভূতির দোটানার আবর্তে তখনও ছিলাম। ভারসাম্যটা মুহূর্তের জন্য হলেও হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রত্যেক সম্পর্কের একটা পরিধি আছে - ভুত বর্তমান ভবিষ্যৎ। এই তিন মাত্রায় বাঁধা। যা অবয়বের আয়ত্তের বাইরে। অথচ এর কোনোটাই আমাদের হাতে নেই। একে অন্তত খেলার পুতুল ভেবে নেওয়া সম্ভব নয়। তিমিরকে কোন পরিধিতে ফেলব, নিজেই বুঝে উঠতে পারিনি তখন। ছিল শুধুই বর্তমানের মুহূর্তটুকু। চাওয়ার তো কোনো শেষ নেই। তাকে সময়ের ব্যাপ্তিতে ফেলে দিলেই যত মুশকিল। তখনই ওটা অধিকার হয়ে দাঁড়ায়।

আমি তো মুক্তি খুঁজতে এসেছি। তবে কেনই বা আবার ফিরে যাব সেই বদ্ধতায়?

রাতে শুয়ে অনেক ভেবেছি। তিমিরকে কি আমি সত্যি সত্যি ভালবাসি? মন সায় দেয়নি। দেহ তো মুহূর্তের খেলা। মন সেখানে সুদূরের না-ছোঁয়া ভেলা। বর্তমানের খেলার সঙ্গে তাকে আত্মার বন্ধনে বাঁধব কী করে?

শুধু ভেতরের উত্তপ্ত একটা চেতনা বিগ্রহ নয়, জাগ্রত নির্ঝর খুঁজছিল। জলপ্রপাতের বাঁধ যখন ভেঙেছে, আর প্রয়োজন কীসের এ সংসর্গে?

তিমির ফোন করেছিল বেশ কয়েকবার।

“না রে।” বারবার বলেছিলাম তাকে।

“কেন?” তিমির ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। বোঝবার কোনো কারণও নেই। ওর চাওয়াটা তো ওখানেই আটকে গেছে। এক গোলকধাঁধায়। ভীষণভাবে সংকীর্ণ চাহিদায় সীমাবদ্ধ। চাওয়ার মধ্যে ক্ষণিকের পাওয়াটাই যে পূর্ণতা, বোঝার দায় নেই।

বুঝবে কী করে, মন কোন সময় কোন কথা বলে?

“সব প্রশ্নের জবাব হয় না। মুহূর্তটাকে না হয় মুহূর্তের মধ্যেই রেখে দিলি। তার সঙ্গেই আমাকেও মুক্তি দিলি।”

সেই ‘না’ আর ‘হ্যাঁ’ তে পরিবর্তিত হয়নি কোনোদিন।

তিমির হারিয়ে গেছে, একদিনের আঁধারে। আমি পড়ে থেকেছি আমার অন্ধকার তিমিরের অবগুণ্ঠনে ঢাকা, সেই একা। নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে। যেখানে মন নেই, সেখানে তো আমিও নেই।

হঠাৎ কাজের ফাঁকে ধুমকেতুর মতো, কেন জানি না, একদিন সৈকতের নিভে যাওয়া বাসরে আবার প্রদীপ জ্বালাবার ইচ্ছে হল। এই ক্ষণিকের মধ্যেই ছিল পিঙ্কু। আমার পৃথিবীটা হারিয়ে গেল সৈকত থেকে দূরে, পিঙ্কুর মাঝে। ছোট্ট পিঙ্কুকে দেখাশোনা করার তালে ভুলে গেলাম আমাকে, আমার মন, আমার চাওয়াটাকে। আমিটা চাপা পড়ে গেল দৈনন্দিন গতানুগতিকতার আবর্তে। মন হারিয়ে গেল সাংসারিক চোরাবালির অলিখিত শর্তে।

তাই তুমি যখন বললে “চল না কোথাও বেড়িয়ে আসি।” মনটা যেন আবার ভেসে যেতে চাইল কোথাও...

কোনো সুদূর পরবাসে।

বহুদিন পরে মুক্তির আনন্দে আবার মনটাকে খুঁজে পাওয়া...

সুদূরের প্রান্তে পথ চলা। আমি একা নই। তোমাকে আবার নতুন করে দেখা, নতুন কথা বলা। নতুন কোনো খেলা।

“বেশ মজা লাগছে। হিসেবের বাইরে জীবনটাকে খুঁজে বেড়ানো।” তোমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম।

তোমার কি মনে আছে?

“তাই বুঝি চাইছিলে এতদিন?” তুমি যেন আমায় কষ্ঠিপাথরে ফেলে যাচাই করে নিয়েছিলে সেদিন।

“হয়তো তাই। বুঝিনি তো কোনোদিন আগে। তবে ভালো লাগছে এটা বলতে তো কোনো বাধা নেই। তোমাকে... ”

“তবে চল, তোমাকে নিয়ে যাই মাটি আর স্বর্গের মায়াপুরীতে” তোমার মিষ্টি হাসিটা ছুড়ে দিয়েছিলে আমার দিকে।

“কোথায়?” আর পাঁচটা মানুষের মতো প্রশ্ন জেগেছিল মনে।

একটু হেসে তুমি বলেছিলে “প্রথম দিনেই একটা শর্ত হয়েছিল। তোমার মনে আছে?”

“কী?” চোখ তুলে চেয়েছিলাম তোমার দিকে।

“এখানে কোনো প্রশ্ন নয়। শুধু একটু অনুভূতি” চুপ করে ছিলাম সেই মুহূর্তে।

“খিদে পেয়েছে, সেটুকু বলার অধিকার কি আছে?”

“অবশ্যই।” শান্তিনিকেতনি ঝোলা থেকে উজ্জ্বলার চানাচুর বার করে বললে “এই টুকুই আছে। আপাতত খেয়ে দেখতে পার। ব্রেকফাস্ট না-আসা পর্যন্ত।”

হঠাৎ তোমার মোবাইলটা বেজে উঠল।

“হ্যালো... না... ট্রেনে আছি... বলতে পারছি না...” ওপাশ থেকে কে কথা বলছে বোঝা যাচ্ছে না।

স্বাভাবিক নারীসুলভ কৌতূহলে খেতে খেতে শুনছিলাম তোমার কথোপকথন। প্রশ্ন করা যাবে না। আঁচ করার চেষ্টা করছিলাম কথা বলছে কার সঙ্গে। ওপাশের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না। বুঝলামও না, ও-পাশে কে?

তবুও একটা চাপা কৌতূহল। সংবরণ করছি অলক্ষ্যে।

কে তুমি?

আমি তো চিনি না তোমাকে।

তুমি কী আমার স্বপ্নে দেখা রাজকুমার!

নাকি, আরেকটা মুহূর্তের স্বপ্ন ভাঙার আলোড়ন?

আমার ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা বহ্নিশিখার নৈতিক স্খলন?

দোটানায় ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা।

এ কোন পথে পা বাড়িয়েছি?

সেই মুহূর্তে ফোনের লাল বোতামটা টিপে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে “কই দিলে না তোআমাকে? একাই খাবে?”

পাপড়ির টুকরগুলো এগিয়ে বললাম “নাও।”

চানাচুরের মচমচে কামড়ের আওয়াজ আর ট্রেনের উদাসী কম্পন মৃদুমন্দ ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে। শুধু বাইরেই নয়। ভেতরেও।

ভয়টা কী আমার মধ্যবিত্ত মানসিকতার? নাকি, নিরুদ্দেশে পাড়ি দেওয়ার?

বুঝবার আগেই ব্রেকফাস্ট। টোস্ট-অমলেট। চিন্তার ইতি। এখন পেটের সদগতি।

বৃত্তের মধ্যেই সব খেলা। সব কীর্তির অবসান। মোহ নিয়ে তাকে না দেখাই তো ভালো। নয় কি?

তোমার চোখ এড়ায়নি। বললে “কী ভাবছিলে?

“কিচ্ছু না।” শাড়ি থেকে চানাচুরের টুকরোগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে খাবারের প্লেটটা টেনে নিলাম। প্লাস্টিকের ক্লিংফিল্মটা খুলতে যাব, হঠাৎ বলে উঠলে “আমি বলব?”

“কী?” উত্তরের আশায় তাকিয়েছিলাম।

“ভাবছিলে কাজটা ঠিক করছ কি না। তাই নয় কি?”

কথার তিরটা বিঁধল আমার বুকে। তুমি কি আমার মনটাকেও পড়তে পার নাকি, চোখের চাহনির আলোয়?

তোমার কথাটা নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য একটু বা ব্যঙ্গ করেই বললাম “ধুস। আমি অতটা কমজোর নই। জেনেশুনেই তো তোমার সঙ্গে এসেছি। ভয় পাব কেন? আমার তো আর কোনো পিছুটান নেই।”

তুমি চুপ, চেয়ে রইলে জানলার বাইরে। তবে কি ধরা পড়ে গেলাম সেই মুহূর্তে তোমার কাছে? খেলছিলাম তো সেই ছোটোবেলার খেলা। কানামাছি ভোঁ ভোঁ... যাকে পাবি তাকে ছোঁ... সেই খেলার রুমালটা কী চোখ থেকে সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে?

মনে হল, বোধহয় ঠিক গুছিয়ে খেলতে পারছি না। তোমার মুখ যেন বলে দিচ্ছে, ধরে ফেলেছ। যদিও কিছু বললে না।

বললাম “আমরা যদি বেনারসে নামি?”

“আর একটু দূরে গেলে ভালো হয় নয় কী!”

সৈকতের সঙ্গে দূরে কোথাও গেছি কি না, মনে পড়ে না। ওর কখনও সময় হয়নি। বাইরের খোলা আকাশটাকে নিজের করে দেখার অবসরও ছিল না।

বাবার তখনও চাকরি আছে। প্রতি বছর নিয়ম করে পুজোর সময় বেড়াতে যেতাম। বাবা এলটিসি-তে টাকা পেত। কখনও পুরী। কখনও ভুটান। কখনও জলদাপাড়া, ডুয়ারস। জয়ন্তীর পাড়ে হাতির সারির দিকে চেয়ে থাকতাম। আহা রে! আমার যদি একটা ক্যামেরা থাকত!

বুক ভরে একটু শ্বাস নিতাম। শরতের মিঠে ঠান্ডার আমেজে জয়ন্তী থেকে হাতিপোতা। রাস্তার বাঁ-পাশে ভাঙা ব্রিজটার দিকে এক পলক তাকিয়ে জঙ্গলের পথে পা বাড়াতেই, বুকটা কেঁপে উঠল এক অজানা ভয়ে। বাঘ নেই তো এখানে?

ড্রাইভার বলছিল "দিদিমণি, সেদিনের কথা এখনও ভুলব না। একদল শুটিং পার্টি এসেছিল। 'সেদিন অরণ্যে' ছবিটার শুটিং-এর জন্য। ওদের কাজ করছিলাম। হঠাৎ রাত্রিবেলা কিছুটা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আপনাদের বাংলা সিনেমার নায়িকা শরণ্যা সিংহ বলল, উনি জঙ্গলে ড্রাইভ করবেন। বললাম দিদিমণি, এত রাতে বেরনো ঠিক নয়। আমার দিকে তাকিয়ে উনি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন আরে, কত জঙ্গল চষে বেড়িয়েছি। অত ভয়ের কী আছে? জঙ্গলের নাড়ী-নক্ষত্র আমার চেনা। এই এখানে, ট্যাভেরা গাড়িটা দাঁড় করিয়ে উনি আর ওনার হেয়ার ড্রেসার বনেটের ওপর বসে সিগারেট টানছিলেন। আমি পেছনের সিটে চুপ করে বসে। কিছুক্ষণ পরেই নাকে এল আতপ চালের গন্ধ..."

একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেছিলাম "আতপ চাল?"

ড্রাইভার আমার দিকে ফিরে বলেছিল "হ্যাঁ গো দিদিমণি। আতপ চাল মানেই ধারে কাছে কোথাও বাঘ আছে।"

অবাক প্রশ্ন "আতপ চালের সঙ্গে বাঘের কী সম্পর্ক?"

"জানি না। কিন্তু আজ তিরিশ বছর হয়ে গেল এ তল্লাটে ড্রাইভারি করছি। যখনই আতপ চালের গন্ধ পাই, দেখেছি ধারে কাছে কোথাও বাঘ রয়েছে।" একটু থেমে হরিনারায়ণ বলে "আতপ চালের গন্ধ পেয়ে বললাম, দিদিমণিরা তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে আসুন হেয়ার-ড্রেসার শুনল। শরণ্যা শুনলেন না। যতই হোক সিংহ তো, শেষমেশ হেয়ার-ড্রেসারের পিড়াপিড়িতে যেই না ড্রাইভারের সিটে বসেছেন, ওমনি দুটো বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল বনেটে। আর কয়েক সেকেন্ড হলেই আপনাদের ওই সুন্দরী হিরোইন চলে যেতেন বাঘের পেটে।"

গল্পটা শুনতে ভালোই লাগছে। হরিনারায়ণের দিকে তাকিয়ে বললাম "তারপর?"

স্টিয়ারিং হুইলটা ডান দিকে সামান্য কাটিয়ে বলল "সাঁপ। মারিনি। ওই দেখুন চলে যাচ্ছে।"

বাঁ দিকে তাকিয়ে সাপের ল্যাজটা জঙ্গলে মিলিয়ে যেতে দেখলাম। ভাগ্যিস হরিনারায়ণ সাপের ল্যাজে চাকা ফেলেনি।

"তারপর আর কী? ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে বায়স্কোপের সিংহ। ড্রাইভিং আর করবে কী!"

হরিনারায়ণ সাপ মারেনি।

কিন্তু আমি কী সাপের গায়ে পা দিয়েছি?

গোলাপের সুবাসটা যেন অন্তরের দোটানায় মিশে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য ব্রেকফাস্টটা বিস্বাদ ঠেকল। অমলেটটা বোধহয় ঠিকভাবে ভাজা হয়নি। একটু কাঁচা তেলের গন্ধ। বাধা ভেঙে এখনই সব চাই! জীবনটা জাস্ট হারিয়ে যাচ্ছে ট্রেনের শব্দে।

"ক-চামচ চিনি দেব?"

বিস্বাদ অমলেটের শেষ টুকরোটা মুখে ভরে তোমার দিকে তাকিয়ে বললাম "এক।"

চিনি খেলে ভুঁড়ি বাড়বে। সৌন্দর্য রসাতলে যাবে। কে যে যুগের দিব্যি দিয়েছিল, কে জানে? কেন রুবেন্স-এর থ্রি গ্রেসেস-এর মধ্যে কী কম সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে?

তবুও...

আমার মতো সকলেই চারশোটা বছরকে পেছনে ফেলে হাঁটছে। মুখে বলছি স্বাধীন। কিন্তু ইতিহাসের কাছে ভীষণভাবে পরাধীন। সংজ্ঞাটা যুগ-যুগান্ত ধরে আমাদের জড়িয়ে রয়েছে। যুগ পাল্টাতেই পারে। তিমিরের সঙ্গে ফেলে আসা বাসনার আগুনটাকেও নির্দ্বিধায় নিস্তেজ করে দিতে পারি মুহূর্তে। ঠিক এখনই। মনের কল্পনালোকে অনেক কিছুই পারি। আবার বাস্তবের চেতনায় বহু কিছু পারি না। সেটাই অপূর্ণ হয়ে পড়ে থাকে। কে মেলাবে সেই নিরুত্তর অঙ্ক?

সাপটা কে? সেটুকু বোঝার আগেই সাপের ভয়।

সব কেমন যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এক অজানা ভয়মেশানো দোটানা। আলেয়াটা ধরা দিয়েও অধরা। আশাটা কাছে এসেও মিশে যাচ্ছে ছলনায়। তবুও কেন এই মুহূর্তের জন্য বুক ভরে এতই-বা চাওয়া?

আমার দিকে তাকিয়ে বললে "চা-টা খেয়ে নাও। ভেবে কী হবে? যখন ঝাঁপ দিয়েছ, ভাসলেই না-হয় অজানা স্রোতে।"

কী অদ্ভুত দেখ! কী করে যে তুমি মনের কথাগুলো অকপটে ধরে ফেলেছিলে সেদিন। সুসজ্জিত আভরণ ভেদ করে পৌঁছে যাচ্ছিলে আমার গভীরে।

বুকটা কেঁপে উঠল।

এভাবে যদি কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে আমায় ব্যবচ্ছেদ করে যাও তুমি। কোথায় গিয়ে থামব কে জানে?

তোমাকে

কস্তূরী



পঞ্চম চিঠি

কস্তূরী

থামতে তো আমরা বেরোইনি!

বেরিয়েছি এক বাউন্ডুলে চিন্তায় পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, ছন্দকে নিঙড়ে নিজের মতো করে পেতে। নতুন সুরে, নতুন তালে, নতুন ছন্দে। মনের অবগুণ্ঠণ উন্মোচন করতে সপ্তর্ষির আলোকদিশায়। না-পাওয়া অমোঘ রশ্মির আশায়। আবার সাজাতে তাকে নতুন আবরণে। নতুন তারার না-দেখা আলোয় খুঁজতে। অপ্রাপ্তির মধ্যে যেটুকু পাওয়া, তাকে বরণ করে নিতে। মুখর না-শোনা ছন্দে, তানে। এক বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর উদ্বেল লহরার মধ্যে জীবনের সুরটাকে নতুন করে পেতে। দিক-দিগন্তকে ঝুলনের সাজে সাজাতে। রাত শেষে ভোরের আলোয় ভৈরবী রাগে।

মাঝখানে আর থামা হল না। ট্রেন দিল্লির দোরগোড়ায়। স্টেশন ছেড়ে বেরতে গিয়ে প্রশ্ন "কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

"জানি না। দেখি কোথায়। যেখানে মন চায়।"

সত্যিই তো তুমি জান না। কিন্তু আমি তো জানি। আমরা তো শুধুই ঘুরতে আসিনি। রিসর্ট নিয়ে একটা ফিচার লেখার জন্যই তো এতদূর আসা। ফার্স্ট ক্লাসে শুয়ে সুখনিদ্রায় ভাসা। সেই অছিলায় তোমার সঙ্গে কাটিয়ে নেব কিছুটা সময়। হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসাকে গাঁথব নতুন কাব্যমালায়।

জানি কি জানি না, সেটা বড় কথা নয়। বুঝি কি বুঝি না, জেনেই বা কী লাভ? পেয়েছি কি পাইনি, সেটুকুতেই খুঁজে ফিরি পূর্ণতার আলো। ধোঁয়াশার পৃথিবীতে না হয় পড়ে থাক অবুঝ পাণ্ডুলিপি। এবার সময় হয়েছে, তোমার সঙ্গে লিখব নতুন স্বরলিপি। সেই পেখম মেলার নিয়ত কাব্যগীতি। ময়ূরপঙ্খীতে সওয়ার আমরা সময়ের হাত ধরে উড়ে বেড়াই মরীচিকাময় বিস্তৃত দিগন্তের ওপারে।

একটু অবাক হয়ে তাকালে আমার দিকে - "এ আবার কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম!"

বুঝতে এতটুকুও ভুল হয়নি আমার। গাঢ়-নীল সালোয়ার আর সাদা চুড়িদার পরা প্রলেপহীন মুখের দিকে তাকিয়ে, তোমার দোটানাকে হাল্কা করে দিতে বললাম "বিশ্বাস কর আমাকে?"

স্বতঃস্ফূর্তভাবে মৃদু হেসে বললে "কেন করব না? করেছি বলেই তো এসেছি তোমার সঙ্গে।"

"বেশ তো। তাহলে বাকিটা ছেড়ে দাও আমার ওপর। শুধু মুহূর্তটাকে মনে রাখার ভার দিলাম তোমাকে..."

"নিলাম। কিন্তু এবার কোথায়, কদ্দুর?"

"যতক্ষণ না বিরক্ত হয়ে পালিয়ে যাবে।"

"পালিয়ে যেতে তো আসিনি। তোমার সঙ্গে সময় কাটাব বলেই তো হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছি।"

"বেশ, তবে চল যেখানে আমি বলি।"

তুমি অপেক্ষায় ছিলে কোন দিকে যাব এবার। আমি থামিয়ে দিলাম যেখানে ছিলে সেখানেই।

"দাঁড়াও একটু। আমি আসছি।"

আর কথা না বলে তোমাকে মাল সামলাতে রেখে হাঁটতে শুরু করলাম। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলে "যাচ্ছটা কোথায়?"

"আসছি। একটু অপেক্ষা কর।" মনে মনে ঠিকই করেছিলাম তোমাকে জানাব না, কোথায় যাচ্ছি। প্রতি ক্ষণে প্রতি পলে, তোমায় অনির্দিষ্টের ছোঁয়া দেব আমি। এই লুকোচুরির মধ্যেই ভরে যাবে আমাদের না-বলা পরিচয়ের ডালি। সেটাই ভালোবাসার সঙ্গী, গাঁথবে নতুন ফুলের মালা।

শুধু তোমার সঙ্গে ঘুরতেই আসিনি। সঙ্গে একটা কাজও নিয়ে এসেছি। দেখা যাক, তোমাকে না জানিয়ে সেই কাজটা সেরে ফেলতে পারি কি না। এও তো এক ধরনের খেলা।

টিকিট কাউন্টারে গিয়ে শুনলাম রানিখেত এক্সপ্রেস ছাড়বে রাত দশটা কুড়ি মিনিটে। কাঠগোদাম পৌঁছবে ভোর সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ। টিকিট কাটতে গিয়ে মনে হল, সারাদিন পড়ে আছে দিল্লিতে। কোথায় যাই তোমার সঙ্গে?

ফিরে এসে বললাম "চল আমার সঙ্গে।"

"কোথায়?"

"বলেছি না, প্রশ্ন করবে না"

কুলির মাথায় মাল নিয়ে সোজা রিটায়ারিং রুমে। ঘর বুক করে মালগুলো রেখে বললাম "মুখ হাত ধুয়ে স্নান করে নাও।"

যখন স্যুটকেস থেকে নতুন পোশাক বার করছিল, তখন হয়তো লক্ষ করনি, আমি নিবিষ্ট হয়ে চেয়েছিলাম তোমার ওই পোশাকের দিকে...

দেখছিলাম তোমাকে...

খয়েরি বুটিকের কাজ করা ক্রিম রঙের কামিজ। খয়েরি চুড়িদার। কিছু খুঁজছিলে স্যুটকেসে। বেশ মজা লাগছিল ঠোঁটের ওপর জিভ বোলানো মগ্ন তোমাকে। কী খুঁজছিলে অমন এক মনে? বেশ মজা লাগে মেয়েদের মন আর পোশাকের দ্বন্দ্ব দেখতে। হয়তো লক্ষ করনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেটা নিয়ে এত খোঁজাখুঁজি, সেটা বেরিয়ে আসতেই ভীষণ হাসি পেয়েছিল আমার।

ইশ! খয়েরি প্যান্টি আর ব্রা।

এটা নিয়েও ভাবতে এত সময় লাগে নাকি? বাইরের পোশাকের সঙ্গে ম্যচ করে ভেতরেও যে কেউ পরতে পারে, তা জানা ছিল না। মনে হল, অনামিকাকে তো সাজতে দেখিনি বহুদিন। কৌতূহলটাও তাই হারিয়ে গিয়েছিল অলক্ষ্যে।

যেমন অনেক কিছুই জানি না, শুধু শিখেছি দৈনন্দিন নিয়মের ধারায়। এবার তাকে ভেঙে দেখার সময় হয়েছে।

কলকাতার বাইরে তোমার সঙ্গে আপন মনে একলা পথে চলা। নিরালায় দুটো মনের কথা বলা।সেখানে থাকবে না বন্ধনের চক্র। থাকবে আত্মার পরিতৃপ্তি। মহাবিশ্বের অনাবিল নিবৃত্তি।

অনামিকা তো আমার বিন। তুমি আমার না-পাওয়া হৃদয়ের স্বপ্ন অন্তহীন। তাকে ঘিরে থাকা মনের স্বপ্ন বৃথাই এতদিন। সেখানেই গরমিল, অন্ধকারে ঢাকা।

আচ্ছা বাইরের পোশাক ভেদ করে কি কেউ ভেতরের পোশাক দেখতে পারে? তবে কেনই বা পিক অ্যান্ড চুজ করছিলে এতক্ষণ ধরে? বুঝতে পারিনি সেদিন। আজও সেই মানসিকতা আমার অজানা, কৌতূহলে রঙিন বাস্তব আর স্বপ্নের মাঝামাঝি এক আশ্চর্য অনধিকার চর্চা।

সাজ সরঞ্জাম নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলে। এবার পোশাক পালটাবার জন্য স্যুটকেস খুললাম। দিনের আলোয় চোখ বুজলাম এক পলক। অবচেতনে কল্পনার চেষ্টা করছি, তুমি বাথরুমে ঠিক কী করছ এই সময়?

তোমার নিরাবরণ সুঠাম অবয়ব মনে ভাসছে। রিটায়ারিং রুমের বাইরের দৃশ্যটা সামনে থেকে সরিয়ে দিলে ক্যানভাসটা ততটা ধূসর নয়। অলরেডি আঁকা হয়ে গেছে, তোমার সুতিহীন সিক্ত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কায়া। সেখানে বাস্তবের সুসজ্জিত অবয়ব ফেলবে না কোনো ছায়া। মুহূর্তটাকে সঙ্গী করে ভাসব সেই রূপের খোঁজে। বয়েই গেল, আলতা রাঙা লাজে তুমি তোয়ালে দিয়ে ঢাকলে, বা না-ঢাকলে।

ভালোবাসা পেতে অনেক দ্বিধা। স্বপ্ন দেখতে নেই তো কোনো বাধা। তাই তো রুবেন্স, রেনোয়া, ম্যাটিসে সে ছবি এঁকে গেছে শতাব্দীর আগে। ওদের কায়া হারিয়ে গেছে, তবু আজও ভুলিনি স্বপ্নের তুলিপট।

তোমার প্রসাধন শেষে, বেড়িয়ে পড়লাম দুজনে। অটোতে সওয়ারি হলাম হৃদয়ের শব্দের কুজনে। কালকে হারিয়ে যাবে এই মুহূর্ত, এই সময়, এই ক্ষণ। তবুও স্মৃতি থেকে যাবে। তোমাকে চাওয়ার উত্তপ্ত মনন।

"আচ্ছা কোথায় চলেছি বল-তো?"

তোমার ঠোটে আলতো করে আঙুল ছুঁইয়ে বললাম "কোনো প্রশ্ন নয়। আজ শুধু আমরা ঘুরব উদ্দশ্যহীন দিল্লির পথে, কিছুটা সময় কাটাতে।"

"বেশ তো। আমি তো আছি, চল।"

অটোতে হঠাৎ তোমার মোবাইল বেজে উঠল। হাতটা মুখের কাছে নিয়ে ফিসফিস করে কাউকে কিছু বলছিলে। বোঝবার চেষ্টা করেও পারিনি।কয়েকটা মাত্র শব্দ "তুমি ঠিক আছ? হ্যাঁ... আমি ঠিক আছি"

কে?

জানতে বড় ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। প্রশ্নের বন্যা এলে ভালোবাসা যাবে মরে। তুমি তখন আরেক অনামিকা, থাকবে ঘরের নীরব কোণে।

যেমন প্রশ্ন করা যায়নি আগে অনেক কিছু। আমার এই নগণ্য অস্তিত্ব আজও অজানা তোমার কাছে। তোমাকে ছাড়াও তো আমার নিজস্ব পৃথিবী আছে। আমার সংসারের দীপশিখা, ঘরের লক্ষ্মী অনামিকা। আমার পাওয়া-না-পাওয়ার অন্য একটা পৃথিবী। হয়তো বা শেষমেশ আমি সেই বৃত্ত ছেড়ে তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছি। আমার আমিকে নিয়ে একলা, তোমার হাত ধরে। স্বপ্ন ছেড়ে কায়ার আসরে।

প্রশ্ন করার অধিকার তো আমাদের কারও নেই। তবুও ভেতরের কৌতূহল অজান্তে নীরবে কথা কয়। উত্তর খুঁজি কান পেতে, চোখ খুলে, বুদ্ধি দিয়ে। চেনা নিয়মের গতে। আমাদের জীবনের সব পাওয়া ও হারানোর মাধুরীকে সাজাতে চাই আমাদের চেনা-জানা অঙ্কের বাইরে। সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে। অজান্তে সুদূর অন্তহীন পথ ধরে যেতে চাই মায়ার প্রাসাদে।

কে চেনা?

জানি না।

কেই বা অচেনা?

তাও বুঝি না।

তবুও সেই চেনা-অচেনার অঙ্কের না-জানা উত্তর বৃথাই নিয়মিত খুঁজে বেড়াই রোজ। জীবনকে বাঁধবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। সরল লক্ষ্মণরেখার মাঝে গন্তব্যহীন নেশায়।

আসলে প্রশ্ন কিন্তু একটাই।

আমি কী চাই?

এখন মনে হচ্ছে শুধু আমি নই। তুমিও কি চাও সেটা বুঝতে হবে। অন্যকে না-জানলে কল্পনা জীবনের স্রোতে ভাসে না।

রাজীব গান্ধী চকে এসে তুমি বললে "কোথায় যাচ্ছি তা তো জানি না। কিন্তু সত্যি কথা বলব? বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।"

"এখানে নয়। আমরা পালিকা বাজার যাব। সেখানেই লাঞ্চ।"

আমার পাগলামো দেখে হাসছিলে মনে মনে। দিল্লিতে এসে হোটেল ভাড়া না করে কেনই বা ঘুরতে বেড়িয়েছি রিটায়ারিং রুমে মাল ডাম্প করে? বোধহয় ভাবছিলে, যদি পালিকা বাজারেই খাব, রাজীব গান্ধী চক-এ যাচ্ছিই বা কেন?

তোমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললাম "রাজীব গান্ধি চক না ঘুরলে দিল্লি ঘোরা হয়? তাই ওখান থেকেই শুরু করলাম। এখান থেকেই তো দিল্লির ডাইভারজেন্স শুরু।"

তুমি নিঃশব্দে বসে। ভাবছিলে কোথায় যে শুরু আর কোথায় শেষ, কেউ কি জানে? পৃথিবী এখনও তো অনেকটাই অজানা রয়ে গেছে। সেই অদেখাকে দেখা, অজানাকে জানা, না-পাওয়াকে পাওয়া, এই নিয়েই তো আমাদের অভিযান। সময় বলে দেবে শুরু আর শেষের অন্তিম সন্ধিক্ষণ।

হাতে গোলাপ তুলে নেওয়া থেকেই তো আমাদের অনুভূতির শুরু। শেষের কথা কে বলবে?

তুমি না আমি?

পালিকা বাজার থেকে বেরিয়ে রিগ্যাল সিনেমার পাশে একটা স্ট্যান্ডার্ড রেস্টুরেন্ট। দেখলাম, দোকানটায় বেশ ভিড়। নিশ্চয় সাবেকি। এতদিনের দেখা, ঘুরতে ঘুরতে শেখা। হোটেলে ভিড় দেখলে ওখানেই আগে ঢুকে পড়। ওটাই হয়তো সব থেকে বেশি চলে। মূল্যায়নের সমীক্ষা, সহজ সরল সমাধান।

তোমাকে বললাম "বলছিলে না খিদে পেয়েছে? চল, এখানে বসে কিছু খেয়ে নিই।"

খাওয়া শেষ। উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম দুজনে। উইন্ডো শপিং করে সময় কেটে যাচ্ছিল। হঠাত একটু দাঁড়িয়ে ফেরিওয়ালার সঙ্গে দরদাম করে সময় কাটানো।

"কিতনা?"

"দো শো রূপয়ে মেমসাব"

"এক শো মে হোগা?"

ঝট করে বাধা দিয়ে বললাম "একশো নেহি। দশ!"

তুমি অবাক হয়ে তাকালে। ফেরিওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে বলল "ঠিক হ্যয়। বিশ মে লে যাইয়ে"

একটু অবাক হয়ে বললে “এরকম ভাবেই দরাদরি করতে হয়! জানতাম না তো আগে।”

“যস্মিন দেশে যদাচার।”

তুমি হারিয়ে গেলে ফেরিওয়ালার স্রোতে। সেই মুহূর্তে অনুভব করছিলাম, তোমার সঙ্গটা যেমন মধুর, কাছে পাওয়াটাও আমার ভিজে ঘাসের গালিচায় শুয়ে, তারার দিকে তাকিয়ে থাকার মতো স্বপ্নময়, সুদূর। তোমাকে নিয়ে নিত্য-নৈমিত্তিকতার বাইরে যাওয়াটাও অন্য কিছু। সেখানেই অর্থহীন জীবনের রোশনাই জ্বলে, নতুন করে শেখা। তুমি কী করছ সেদিকে হুঁশ ছিল না। শুধু তোমাকে হাজার লোকের ভিড়ে দেখার লোভ আকৃষ্ট করছিল বারবার। আমার নীরব চাহনি নিঃশব্দে একা একা তোলপাড়।

আবার অটোতে চেপে বললাম “লোটাস টেম্পল যানা হ্যয়। মালুম হ্যয় কাঁহা?”

“নাম তো শুনা হ্যয়” অটোওয়ালা ইতস্তত করছিল।

“কালকাজি মে। মন্দির মার্গ পর।”

এবার বুঝে গেছে অটোওয়ালা “আপলোগ আরাম সে বৈঠিয়ে। মৈ ওঁহা লে যা রহা হুঁ”

তোমার চোখের বিস্ময় বুঝিয়ে দিল ওই উদ্দেশ্যহীন ঘোরা থেকে হয়তো তোমায় বার করে এনে কোনো ভুল করিনি। তুমি এই গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি চাইছিলে। জীবনের মতো।

এটা কী মন্দির?

এক আধফোটা সাদা পদ্ম যেন পাপড়ি মেলে ধরেছে আমাদের সামনে। চারিদিকে সবুজ ঘাসের নরম গালিচার মধ্যে সাজানো ছোটো ছোটো বাহারি গাছের সারি সরলরেখায় চলে গেছে মন্দিরের দিকে। অনেকটা ইহজগতের গন্তব্যের মতো। যার মাঝখানের রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চললাম মন্দিরের দিকে।

বারবার ছবিতে দেখা সিডনির অপেরা হাউস-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। চলতি ভাষায় ‘লোটাস টেম্পল’ বলা হলেও আসল নাম ‘বাহাই মন্দির’। আধফোটা পদ্ম যেন শান্তি ও পবিত্রতার বাণী শোনাচ্ছে। পার্থিব বলয় থেকে বেরিয়ে আত্মার শুদ্ধিকরণের প্রয়াসে।

“বাহঃ! আগে তো এর কথা জানতাম না।” বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলে উঠলে।

“আজ জানলে। আমাদের জীবনের গোলকধাঁধার বাইরেও তো একটা পৃথিবী আছে।”

লোটাস টেম্পল আমাকে আরেকবার মনে করিয়ে দিল, পুরাণে কথিত আছে পিতামহ ব্রহ্মা যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন, তখন বিষ্ণুর নাভি থেকে পদ্মের আকারে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মে কথিত আছে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরও পদ্মের কোলেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শোনা যায়, গৌতম বুদ্ধ সহস্রদল পদ্মের ওপর বসে শ্রাবস্তিতে ধর্ম প্রচার করতেন। বুদ্ধ বলতেন, তোমাকে ওই পদ্মের মতো বিকশিত হতে হবে পঙ্কের

পাকস্থলীতে। কিন্তু সেই পাঁক যেন তোমার অন্তরের সৌন্দর্যকে কোনোভাবে মলিন না করতে পারে। তাই ওঁর বন্দনাগানে শোনা যায় ওঁ মণিপদ্মেহম।

সব ধর্মই একই সূত্রে গাঁথা। একই ছন্দে, একই উপমায়। একই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নজরে এল পদ্মের তিনটে স্তরে সাজানো বারোটা পাপড়ি, অর্ধ-উন্মোচিত। মানুষের চেতনার অর্ধ উন্মোচনের স্থান এখানেই। বাকিটা হয়তো বানপ্রস্থে অথবা নির্বাণের অষ্টমাঙ্গিক মার্গে।

তুমি পলকহীন তাকিয়ে ছিলে ওই সবুজ ঘাসের গালিচায় মোড়া আধ-ফোটা পদ্মের মন্দিরের দিকে। আমার দিকে ঘুরে বললে “ভেতরে ঢোকার আগে একবার বাইরেটা ঘুরে নিই।”

গাইডও একটা জোগাড় হয়ে গেল। মন্দিরটা প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছিল, তুমি আর আমি কোনো যজ্ঞের অগ্নি ছাড়াই চেতনার মধ্যে ঘুরছি এই ভিন ধর্মের পবিত্র তীর্থভূমিতে?

গাইড টেপ-রেকর্ডারের মতো বলে চলেছে এই মন্দিরের ইতিহাস।“ইয়ে মন্দির বাহাউল্লাকে নাম পর হুয়া। এক ক্যানাডিয়ান আর্কিটেক্ট ফারিবোঝ সাহাব আঠশো লোগ লেকে ইয়ে মন্দির নির্মাণ কিয়া। উনহে দশ বরস লগা থা ইয়ে করনে মেঁ। উনিশ সো ছিয়াসি মৈঁ ইয়ে মন্দির খুলা। ইয়ে সিমেন্ট, মার্বেল, বালু, ডলোমাইট ঔর গ্যাল্ভানাইজড স্টিল সে বনা হুয়া হ্যয়। ছব্বিস একর জমিন ইয়ে পুরা মন্দির কা আওতে মেঁ হ্যয়। ইয়ে মন্দির কা সাতাইশ পাপড়িয়া নে পর পর তিন স্তর মেঁ বিছরে হুয়ে হ্যয়। দো অন্দর কে তরফ মুড়া হুয়া হ্যয় ঔর এক বাহর।” একটু থেমে বলল “ইসকে চারো তরফ নও পুল হ্যয়। চলিয়ে আপলোগকো দিখাতা হুঁ।”

একটু নীচু স্বরে বললে “তুমি বাহা ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জান?”

“না” অজ্ঞতা স্বীকার করে নিলাম। শুনেছিলাম আর্কিটেকচারাল দিক দিয়ে এটা দিল্লির একটা দ্রষ্টব্য স্থান। তাই আসা। আগে তো কখনও আসিনি। ভাবলাম দেখেই যাই না একবার।

সারাদিনের ঘোরার পর তোমার পা দুটোক্লান্তিতে ভরে গেছিল “আর ঘুরতে ভালো লাগছে না। চলো ভেতরে গিয়ে বসি।”

সারা রাতের ট্রেন জার্নিতে ঘুম হলেও ঠিক মতো তো হয়নি। তারপর রিটায়ারিং রুমে লাগেজ রেখে সারা দিল্লি টো টো। দুপুরে পালিকা বাজারে খাওয়ার পর বিশ্রামও হয়নি। দুজনেই বিধ্বস্ত। মনে হল মন্দিরের ভেতরে ঢুকে একটু বিশ্রাম নিই।

গাইড বলে চলেছে “ইয়ে পদ্ম মেঁ ঈশ্বরকে বিকাশ হোতা...”

আর শোনার ইচ্ছে নেই। মন্দিরের ন’টি দরজার একটি দিয়ে ঢুকে পড়লাম সেন্ট্রাল হলে। সাদা মার্বেলে ঢাকা। অনেক লোক বসে। অথচ চারদিকে একটা নিস্তব্ধ শান্তি। মৌনতার সোচ্চার বাণী সর্বত্র। হলঘর থেকে

পাশের ধ্যানকক্ষে গিয়ে দেখলাম কোনো মূর্তি নেই।

অনেকেই বসে ধ্যান করছে। আমি আবার ধ্যানের কিছু বুঝি না। জানি না তুমি কতদূর বোঝ। কিন্তু এই মূর্তিহীন শান্তির দেবালোকে একটা নীরব বিশ্রামের বাতাবরণ রয়েছে, যা এই মুহূর্তে দুজনেই খুঁজছিলাম। এক কোণে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে কিছুটা ঝিমুনি এসেছিল।

হঠাৎ হই-হট্টগোলের আওয়াজে তন্দ্রার রেশটা কেটে গেল। চোখ খুলতেই দেখলাম কতগুলো ছোকরা উঁচু স্বরে ইংরেজিতে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ধ্যান না করলেও সেই উচ্চমার্গের কথাবার্তা তন্দ্রার আমেজ নষ্ট করে দিল বলে বিরক্ত লাগল।

এরা কি এটাকে কোনো নাইট ক্লাবের মজলিস ভাবে নাকি?

কী যে হল! হুট করে উঠে গিয়ে ওদের বললাম "হোয়াট দ্য হেল আর ইউ ডুইং?"

"জাস্ট টকিং।"

"ওয়েল ইফ ইউ ওয়ান্ট ট্যু ডু সো, দেয়ার আর প্লেন্টি অফ প্লেসেস ইন দ্য গ্রাউন্ডস।"

ওদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল "হোয়াট ড্যস দ্যট ম্যটার ট্যু ইউ? আর ইউ দ্য কেয়ারটেকার অফ দিস টেম্পল?"

ওদের কথা শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। তবুও নিজেকে শান্ত রেখে বললাম "নো। আই অ্যাম জাস্ট এ ভিজিটর লাইক ইউ।"

"দেন ইউ হ্যভ নো বিজনেস ট্যু ইন্টারফিয়ার।" আরেকটি ছেলে দৃঢ়ভাবে বলে উঠল।

ভেতরে ভেতরে জ্বলছি স্পর্ধা দেখে। তৃতীয় ছেলেটি একটু ব্যঙ্গ করেই বলল "আর ইউ এ মুসলিম?"

"ফরগেট হোয়াট রিলিজন আই অ্যাম। আই অ্যাম জাস্ট এ অর্ডিনারি হিউম্যন বিইং। অ্যাট লিস্ট ট্রাই টু মেনটেন দ্য স্যাঙ্কটিটি অফ দ্য প্লেস।"

"দ্যট ইজ নান অফ ইওর কনসার্ন।" ওরা যেন বিধাতা।

এবার একটু দৃঢ় ভাবেই বললাম "দিস ইজ দ্য প্রবলেম উইথ ইউ। ইউ হ্যভ নো রেসপেক্ট ফর এনি রিলিজিয়ন। দিস ইস ওয়ান অফ দ্য ব্যড আসপেক্টস অফ ইওর জেনারেশন। অর শুড আই সে গ্লোবালাইজেশন? আওয়ার কনট্রি ইজ বিল্ট অন এ রিচ হেরিটেজ। ফর হেভেনস সেক, ট্রাই ট্যু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যট হেরিটেজ। উই রেসপেক্ট অল রিলিজিয়ন ইরেস্পেক্টিভ অফ রেস, কালচার, ক্রিড, টাইম অর সিভিলাইজেশন।"

ওদের মধ্যে প্রথম ছেলেটি কিছু বলতে যাচ্ছিল। অন্য একজন ওকে থামিয়ে বলল "আরে চল্ চল্ কেঁও ইস আদমি কে সাথ বকওয়াস করতে হ্যয়। চল্ বাহার হাওয়া মেঁ যা কর দিল খুল কর বাতে করেঙ্গে।"

ওরা বেরিয়ে গেল। তোমার পাশে এসে বসলাম। মুখে কোনো কথা নেই। সময় দিচ্ছিলে নিজেকে সংযত হওয়ার। নিঃশব্দে কেটে গেল কিছুক্ষণ। ঝিমুনিটা কেটে গেছে। সেই সঙ্গে বিশ্রামের আমেজও। ধ্যানকক্ষে বসে লাভ নেই। বেরিয়ে এলাম হলঘরে।

নিস্তব্ধতা কাটিয়ে মুখ খুললে "হঠাৎ রেগে গেলে কেন?"

"এই ছেলেগুলো আজকের জেনারেশন। এরা কাউকে সম্মান দিতে জানে না। এটাই হচ্ছে দু-পাতা ইংরেজি পড়ে দিগগজ হয়ে যাওয়ার লক্ষণ।"

হলঘরের এক কোণায় বসে পড়লাম। তুমিও বসে পড়লে আমার পাশে। ক্ষয়ে যাওয়া তন্দ্রাকে একটু জুড়িয়ে নিতে।

ঠিক কতক্ষণ এভাবে বসেছিলাম জানি না।

"কসরৎ মেঁ ওহেদৎ"

দেখি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক আপাতবৃদ্ধ সাদা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। মাথায় টাক। পরনে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি। বললেন "আপ লোগ কি বঢ়হি মেহেরবানি। মেরা নাম হ্যায় গোলাম মর্তুজা। ইস মন্দিরকে রখপাল হুঁ।"

আমি সসম্মানে মাথা নাড়লাম। তারপর বিনম্র ভাবে বললাম "আপ অভি উরদু মেঁ কেয়া কহা?"

"ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি। আপলোগ কা বঢ়হি কৃপা। ইস পবিত্র স্থানকা মাহাত্ম্য কো আপনে রকসা কিয়া"

"হামলোগ ঘুমনে আয়ে থে। মন্দির কে বারে মেঁ বহোৎ শুনা। লেকিন বাহা কে বারে মেঁ কুছ নেহি জানতা।"

"হম সব বাহা ধরম কে বাহক হ্যায়। বাহাউল্লাজি কে শিষ্য। উপরওয়ালা উনহে ১৮১৭ মেঁ ইস ধরতি পর ভেজা থা এক নয়া মন্ত্র দেনে মেঁ। আপলোগ এব্রাহাম, মোসেস, বুদ্ধ, কৃষ্ণা, জোরোস্টার, যীশু ঔর মহম্মদ কে নাম তো শুনে হোঙ্গে? ইস মহাপুরুষকা বাদ বাহাউল্লা আল্লাকে নয়া অভতার মানা যাতা হ্যায়। ওহ্ ইরান মেঁ জনম লিয়া থা। ফির বাগদাদ সে বহোৎ জগহ ঘুম কর হাইফা মেঁ ১৮৯২ মেঁ গুজর গয়ে।"

তুমি এবার উৎসুক ভাবে মর্তুজা সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে "উনহে হমে কেয়া শিখায়ে?"

"হামারে কোই ধরম নেহি হ্যায়। হামারে কোই দেশ নেহি হ্যায়। সারে সংসার এক হ্যায়। এক ধরম, এক দেশ, এক ভাবনা। সব ধরম কা এক হি মন্ত্র হ্যায়। সব এক হো কর ইয়ে ধরতি পে পেয়ার-মহব্বৎ কে সাথ জিনা। ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি। সারে দুনিয়া এক হি সাধনা কা মন্দির বোলিয়ে, ইয়া মসজিদ বোলিয়ে, ইয়া চার্চ বোলিয়ে আপনে দিলকে আরাধনা কে জগহ ইয়েহি হ্যায়"

ওনার দিকে তাকিয়ে তুমি বললে "মুঝে মালুম নেহি থা। আজ নয়া বাত শিখা। বড়ি গহরাই বাত হ্যয়।"

মর্তুজা সাহেব আমাদের বললেন "ইয়ে জগহ শান্তিকে লিয়ে। আপলোগ ইয়ে শান্তি রকসা কিয়া, বঢ়হি মেহেরবানি হ্যয় আপলোগ সে"

আমরা মাথা নিচু করে ওনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে বললাম "ওহি শান্তি উনলোগ ভঙ্গ কিয়া। ইসলিয়ে মেরা দিল বেচহন হো গয়ে"

"ফির কভি জি চাহে তো ইঁহা আইয়ে। আপলোগকো বাহা ধর্ম কে বারে মেঁ বাতাউঙ্গা। পেয়ার মহব্বৎ ঔর শান্তি সে রহিয়ে।"

বেরিয়ে আসতে আসতে মনে হল, কী দেখতে এসেছিলাম আর কী জেনে গেলাম? এ-ও তো এক অদেখাকে দেখা, অজানাকে জানা। এক অতৃপ্ত আত্মার শুদ্ধি। এই শুদ্ধির মধ্যেই পরিতৃপ্তি।

তোমাকে বললাম "স্বামীনারায়ণ মন্দিরে যাবে?"

"আর শরীরে দিচ্ছে না। চল স্টেশনে ফেরত যাই।" বলেই তোমার খেয়াল হল, তুমি তো নিজেই জান না কোথায় যাচ্ছ?

বললে "আচ্ছা কোথায় যাচ্ছি বল-তো? আমাকে রিটায়ারিং রুমে গ্যারেজ করলে। তুমি কি দিল্লিতে থাকবে না?"

"আমরা রাত দশটায় রানিখেত এক্সপ্রেস ধরব।"

"আবার ট্রেন? কোথায় যাব?

"তোমার জেনে কী হবে?" ধোঁয়াশায় রেখে দিলাম।

"তাহলে চলো রিটায়ারিং রুমে গিয়ে বিশ্রাম নিই।"

"জো হুকুম ম্যাডাম।"

বুঝতে পারছিলাম তোমার দেহের ক্লান্তি, মর্তুজা সাহেবের কথায়, একটু নীরবতা খুঁজছে শয়নকক্ষে। নিঝুম অন্ধকারে একাকী। আমি ভাবছিলাম মর্তুজা সাহেবের কথা যদি সত্যি হয়, তোমাকে ভালোবেসে তো কোনো অন্যায় করিনি।

তোমাকে নিজের মতো থাকতে দেওয়ার মধ্যেই আমার ভালোবাসার সার্থকতা।

ট্রেন যখন ছাড়ল, তখন সারাদিনের ধকলে শরীরে আর কিছু নেই। খালি কেবিনের বার্থ ঠিক করাটুকু বাকি। বাথরুমের পাশে টু-বার্থ কেবিন।

বার্থটা তুলতে তুলতে বললাম "তুমি কোথায় শোবে?"

“নীচে”

আমার বরাবরই ওপরে শুতে ভালো লাগে। ভাবছিলাম প্যান্ট ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবিটা কি এখানে ছাড়ব না বাথরুমে গিয়ে। ধ্যাত... এত রাতে ওই পাবলিক বাথরুমে গিয়ে জামাকাপড় ছাড়া পোষায় না। তুমি বোধহয় স্যুটকেশ থেকে নাইট-ড্রেসটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করছিলে। সেই ফাঁকে প্যান্টটা খুলে স্যুটকেসে রেখে, পায়জামাটা পরে নিলাম। সার্টটা খুলে ভাঁজ করে ঢোকাতে গিয়ে গেঞ্জি পরা অবস্থায় যখন পাঞ্জাবিতে হাত দিয়েছি, তুমি পেছন ফিরে তাকালে আমার পুষ্ট পেশিগুলোর দিকে।

“বেশ তো। আমি নাইটিটা খুঁজছিলাম। সেই ফাঁকে তুমি ঠিক জামা পালটে নিলে। এবার আমি পাল্টাব কেমন করে?”

“আমি বাঙ্কে উঠে যাচ্ছি। কথা দিচ্ছি মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে বই পড়ব, তাকাব না তোমার দিকে” বলে বাঙ্কের শেকল ধরে ওপরে উঠে গেলাম তরতর করে।

তুমি কিছুটা দোটানায় ছিলে। এখানে জামা পালটাবে না বাথরুমে? তোমার দিকে না তাকিয়েও আমি অনুমান করছিলাম, তুমি কী ভাবছ। যতই মধ্যবিত্ত নারী হোক না কেন, পরপুরুষের সামনে জামাকাপড় চেঞ্জ করতে কোথায় যেন একটা সংস্কার কাজ করে অবচেতনে। না দেখলেও, বুঝতে পারছিলাম, কী চলছে তোমার মনে।

এক সময় কামিজটা দুহাত দিয়ে ফেলে ওপরে টেনে খুলে ফেললে। আমি আড় চোখে সেই স্বল্প-নীল আলোয় দেখলাম তোমার সকালে খোঁজা খয়েরি ব্রায়ের এক ঝলক। তখনও তোমার বুকের দিকে চোখ পড়েনি। ব্রায়ের রংটা চোখে পড়েছিল এক পলকে। সেটাই আমার সুপ্ত বাসনাকে জাগাতে যথেষ্ট। দেখছি না, এই ভেবে, তুমি আরেকটু নিজস্ব হলে। সালোয়ারটা খুলে সযত্নে গুছিয়ে রাখলে স্যুটকেসের এক কোণে। ওপরের বাঙ্কে শুয়ে ঘুমের ভান করে দেখছিলাম তোমার স্বল্পবাস শরীর। লক্ষ করনি সেই নজর। নিভৃতে ভেসে থাকা দেহের মাদকতা অনন্য।

সবই কী স্পর্শ করতে হয়!

দেখা কী যথেষ্টনয়!

অনামিকা ছাড়া আর কোনো মহিলাকে তো নগ্ন দেখিনি। অনামিকাই প্রথম এবং শেষ। বাসনাটাকে আবার নতুন করে জাগাচ্ছিলে তুমি। পুরুষের চাহিদার নতুন এক রেশ। নাইটিটা গলিয়ে আর একবার তাকালে বাঙ্কের দিকে। হয়তো পরখ করে নিচ্ছিলে, আমি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছি, নাকি ভান।

“তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ?” জেগেও চুপ করে ছিলাম। তুমি লাইট নিভিয়ে শোবার তোড়জোড় শুরু করলে।

সময় নিঃশব্দে চলমান, তাকে ধরে রাখতে হয় মুহূর্তের মধ্যে। শুধু ঘড়ির টিকটিক আওয়াজের মধ্যে সীমিত নয়। সে ছুটে চলে তার আপন স্রোতে আজ থেকে কালকের দিকে। তাকেই ধরে আমরা চলেছি রানিখেতের পথে। কাল ভোর না-হওয়া পর্যন্ত পৌছব না কাঠগোদাম।

মন চাইছিল তোমার পাশে গিয়ে শুতে। তোমাকে আদর করে একটু চুমু খেতে। মন চাইছিল তোমার নরম পায়ারার মতো বুকে আলতো চাপ দিতে। শুষে নিতে ইচ্ছে হচ্ছিল পরম উষ্ণতাটুকু।

অনুভব করতে পারি সেই মুহূর্তে কোনো সাড়া পেতাম না তোমার থেকে। কিছুটা বিষণ্ণ হয়েই হয়তো নিজেকে সরিয়ে নিতাম তোমার থেকে। মন অবসাদে ভরে যেত।

"কী হল?"

"মানে?"

"হাত সরিয়ে নিলে যে?"

"তুমি তো চাইছ না।"

"এমা! আমি কি তাই বলেছি নাকি?"

"মুখে কেন বলবে?"

শব্দমালা মিলিয়ে গেল অন্ধকার রাতে ট্রেনের হুইসলে।

এক প্রবহমান গতিতে আঁধারের যাত্রী আমরা দুজনেই নিঃশব্দ। যুগলবন্দির সুর তোমাকে না ছুঁয়েই পেলাম। ছুটে চলা তরঙ্গে খুঁজে পাওয়া দুটি হৃদয়।

অনামিকা মূর্ছা যেত এই রাতের কথা জানলে। সেই মুহূর্তের নিঃশব্দ অভিসার চেনা-জানা জীবনের সীমারেখায় ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যতের তারে বাঁধা। যার বাইরে ভাবাই যায় না সংসারী মনে অন্য কোনো কথা। জার্নালিজম কোনো সাবেক ধারণা নয়। সময় হয়েছে নিজেকে উন্মুক্ত করার। নিছক রিসর্টের ছন্দহীন বর্ণনা নয়। বাস্তবের তারে গাঁথা কোনো নতুন সুরের মালা।

বিকেলে একবার ফোন করেছিল অনামিকা "কোথায় আছ?"

"দিল্লিতে"

"কোথায় যাবে?"

"উত্তরাখন্ডে। রিসর্ট নিয়ে একটা কভার স্টোরি করতে হবে।"

"কবে ফিরবে?"

"বলতে পারছি না। সময় মতো জানিয়ে দেব।"

ফোন কেটে দিয়েছিল অনামিকা।

জানতে পারনি, কেননা তখন তুমি অক্ষরধাম স্বামীনারায়ণ মন্দিরের মিউজিক্যাল ফাউন্টেন শো-এর খোঁজ-খবর নিতে গেছ। ফোনটা কেটে যেতেই মনে হয়েছিল, আমি কি সংবিধান ভাঙছি? স্ত্রীকে না জানিয়ে চুপিসারে খেলছি? মনের চাওয়াকে কোথাও মেলে দিতে হবে মনের সত্যের সম্মুখে।

ফিরে এসে বললে "ছ'টা পয়তাল্লিশে আরম্ভ। দেখে স্টেশনে পৌছতে পারব না। যা ঠিক করেছিলাম তাই করব।"

"কী?"

"লোটাস টেম্পল থেকে সোজা স্টেশনে যাব। আর পারছি না ছুটতে। এবার রিটায়ারিং রুমে গিয়ে স্নান সারতেহবে। মাঝে কোথাও খেতে হবে তো?"

"ও নিয়ে একটুও ভেব না। দিল্লি স্টেশনের পাশে অনেক খাবার জায়গা আছে।"

সেই ফাঁকেই অনামিকা।

মায়াজালে কি শুধু মন ভরে?

তাকে উপভোগ না করলে, বন্ধন কি কখনও ছাড়ে?

"নাঃ... আর ইচ্ছে করছে না কোথাও ঘুরতে।"

"বেশ তো। তাই করি না কেন, তোমার মন যা চায়।"

ভাবছিলাম, এর আগে কি দিল্লি আসনি? ক্লান্তি সত্ত্বেও তোমার আগ্রহ কেন? সে প্রশ্ন করা যাবে না। তাই অলিখিত থাকবে অনেক কথা। অনেক কিছু আছে যার উত্তর খোঁজা ঠিক নয়। থাক না অনেক কথা অজ্ঞাতে। শুধু এই মুহূর্তে তুমি যা চাও, তাই না-হয় থাক নিভৃতে।

ট্রেনের শব্দ আলোড়ন তুলছে মনে। একঘেয়ে কর্কশ ঝংকার। অনন্ত পৃথিবীর ডাক নয়। এ তো নিজেকে হারিয়ে ফেলার সময়। অন্ধকারের পথে আমরা দুটি যাত্রী।

আমি শুয়েছিলাম, তোমার স্বপ্ন নিয়ে জেগে। তুমিও কি ভাবছিলে আমার কথা নাইট ল্যাম্পের আলোয়? তোমার গভীর শ্বাস বুঝিয়ে দিল ভাবনার মায়া ছেড়ে দিয়েছ তুমি। হারিয়ে গেছ তন্দ্রা-মেশানো শান্তির কোলে।

তোমাকে

কৌস্তুভ



ষষ্ঠচিঠি

কৌস্তুভ

`তোমাকে কতবার দেখব দীর্ঘশ্বাস বুকে ভরে।

তুমি আছ আর কেউ নয়। আমার নিজস্ব পৃথিবী তো সংসারের নিয়মে চলা নিত্যনৈমিত্তিক এক চিরচেনা বলয়। সেই অঙ্ক তো কারও অজানা নয়। সেখানে দুরন্ত খেলা চলে আর পাঁচটা জাগতিক নিয়মের সাজে। পিঙ্কুকে নিয়ে আমার জীবন চলে সৈকতের আচ্ছাদনে। রাত্রি আমার একাকী। সেখানে যেন বারবার শুনতে পাই আর এক কুহকের ডাক। কখন যেন মালকোষ মিশে গেছে ভৈরবীর তানে। ভোরের স্বপ্ন মিশেছে আজানের গানে।

ট্রেনের এসি কম্পার্টমেন্টে নেই সেই সুর!

হঠাৎ দুম করে ট্রেনটা থামতে তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। এমনিতেই নিজের খাট ছাড়া রাতে ঘুম আসে না। তা-ও আবার বিদেশ বিভূঁইয়ে অচেনা রেক্সিনের ওপর শোয়া। জানলার ফাঁক দিয়ে সেই আধো-অন্ধকারে আধ-ফোটা আলোয় দেখলাম একটা স্টেশন।

কাঠগোদাম... আমরা নামব।

সালোয়ার কামিজটা কোনো রকমে গলিয়ে নাইটিটা স্যুটকেসে ভরে ঘড়ির দিকে তাকালাম। ভোর পাঁচটা কুড়ি। ওপরে তুমি তখনও দিব্যি ঘুমোচ্ছ। এত নির্বিকার মানুষ হতে পারে? ভোরে নামবার কথা জেনেও আর্লাম না দিয়ে শুয়েছে?

"এই ওঠো... আমরা কাঠগোদামে পৌঁছে গেছি। নামবে না?"

ঘুম জড়ানো চোখে উঠতে গিয়ে মাথা ঠুকে গেল সিলিং-এ।

"এসে গেছি?" ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লে।

"তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও। নামতে হবে।"

"রেডি হওয়ার কী আছে?"

কোনোরকমে স্যুটকেস গুছিয়ে নেমে পড়লাম। আমার পটি পেয়েছিল। পরবর্তী গন্তব্য তো জানি না।

রিটায়ারিং রুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিলে হয়...

ভাবছিলাম একেবারে হোটেলে গিয়ে চেঞ্জ করব।

“যাচ্ছিটা কোথায় বলতে পারো?”

“ভীমতাল।”

এবার আর কোনো ভনিতা না করে স্বীকার করলাম, পটি পেয়ে গেছে।

“তাহলে চলো রিটয়ারিং রুমে।”

পুরনো একটা কথা মনে হতে নিম্নচাপের মধ্যেও হাসি পেয়ে গেল উইমেন ডিফিকেট ওয়ান্স আ উইক। মেনস্ট্রুরেট ওয়ান্স এ মন্থ। পারটুরেট ওয়ান্স এ ইয়ার। অতএব বেগটা যখন এসেছে তাকে থামিয়ে রাখা বাতুলতা মাত্র।

ওয়েটিং রুমে লাগেজ গুলো তোমার হেফাজতে ডাম্প করে সোজা ছুটলাম বাথরুমে। তুমি কী ভাবছিলে, তা জানার তখন সময় নেই।

বেরিয়ে বললাম ‘‘ইশ! বাথরুমটা বড্ড নোংরা”

“পাহাড়ের অঞ্চলে একটু নোংরাই হয়। হয়েছে ঠিক মতো?”

প্রশস্তির হাসি হেসে মাথা নাড়লাম। বাচ্চাদের যেমন খাওয়া, ঘুম আর ন্যাপি চেঞ্জ ঠিকঠাক হলে কান্না থেমে যায়, মহিলাদেরও পটি ঠিক হলে ম্যুডটা প্রসন্ন হয়ে যায়। বাথরুমের কথা ভুলে, আমি তখন নিজের স্বস্তির কথাই ভাবছি।

সংসারের কাজের জন্য একটু সকাল সকাল-ই উঠতে হয়। পিঙ্কু স্কুলে বেরোবার আগেই, মোটামুটি সকালের আধা কাজ নামিয়ে ফেলতে হয়। তাই সকালে ওঠার মতো এই অভ্যাসগুলো জীবনের অঙ্গ। এখন অ্যালার্মছাড়াই সময় জানতে হয়।

সৈকতের এত ঘনঘন চাকরির তাগিদে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রথম থেকেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। কিছুটা হাঁফিয়ে উঠেছিলাম এই একঘেঁয়ে জীবনে। একটু প্রাণের আরাম খুঁজছিলাম খোলা আকাশের নীচে।

সৌম্যদার বিয়েতে সেই বাধন ছিন্ন হয়ে গেল এক নতুন অনুভূতির আবেগে। তোমার উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস জাগিয়ে দিল অন্য এক চেতনা, না-পাওয়া স্বপ্নের নতুন পুলকে। দৈনন্দিন জীবনের গোলকধাঁধা হারিয়ে গেল এক সুদূর প্রসারী অসীম অনন্তের পানে... জীবনটাকে তো এতদিন দেখা গেছে বহু রঙে। এবার পূর্ণতার মর্ম তোমারই হাত ধরে পাব কোনো এক শুভক্ষণে।

“আমি তোমার ওই বাথরুমে যেতে পারব না” বললে তুমি।

“তোমাদের আর কী, যেখানে খুশি করে নিতে পারো”

"যেখানে খুশি নয়। বাকিটা হোটেলে..."

"এখান থেকে কদ্দুর?"

"দূর খুব একটা বেশি নয়। উনিশ-কুড়ি কিলোমিটার হবে। তবে রাস্তাটা ভালো নয়। যেতে ঘন্টা দেড়েক লেগে যাবে"

স্টেশনের বাইরে ভাড়ার-গাড়ির ছড়াছড়ি। দরাদরি হল ড্রাইভারেদের সঙ্গে। শেষে একটা ইন্ডিকা নিয়ে উঠে বসলাম লট-বহর সমেত।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে শিথিল গতিতে। লক্ষ করলাম, এই গাড়ির স্পিডের একটা নিজস্ব ঢং আছে। যত খালি রাস্তাই হোক না কেন চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটারের বেশি স্পিডে যাবে না।

হঠাৎ তোমার কী খেয়াল হতে বললে "ইশ... গাড়িতে ওঠার আগে চা খাওয়া হল না। খেয়ে নিলেই ভালো হত।"

"ভাগ্যিস্!" চোখ টিপলাম।"রাস্তায় তো আর রিটায়ারিং রুম পাওয়া যাবে না। চলো, চলো একেবারে হোটেলে গিয়ে চা খাব।"

মুখ দেখে মনে হল তুমি সকালের চায়ের অভ্যাস ছেড়ে বেরতে পারোনি। মুখে শুধু আক্ষেপের সুর। আমার আবার চায়ের অত নেশা নেই।

"এতই যদি ইচ্ছে ছিল, স্টেশনে খেয়ে নিলে পারতে?"

এতক্ষণ পর তাকালে আমার মুখের দিকে। চায়ের অভাব কাটাতে দৃষ্টিটা ক্রমশ নীচের দিকে নামতে একটু সচকিত হয়ে উঠলাম আমি।

ধ্যেৎ...

এতক্ষণ তো লক্ষ্যই করিনি!

তাড়াহুড়োর মধ্যে কামিজের ওপরের বোতাম দুটো লাগাতে ভুলেই গেছি। যার ফাঁক দিয়ে তোমার নজর পরেছে খয়রি ব্রা ঢাকা স্তনের দিকে। বাসি চোখের চাহনি। আমি বুঝতে পেরেছি জেনেও চোখ সরাওনি। হয়তো সেটা কাল রাতের না-পাওয়ার একটা নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি।

সব বুঝেও মূর্খের মতো চেয়ে রইলাম বাইরের দিকে। সামনেটাকে তোমার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে। মাঝে মাঝে মূর্খ সাজলে কতই না সুবিধা! ক'টা লোকই বা সেকথা বোঝে? ক'জনই বা তা করতে পারে? অনেক সময় অনেক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি এভাবে সহজেই এড়িয়ে যাওয়া যায়।

তুমি না-হয় চেয়ে থাকলে আমার আধো আবৃত স্তনের দিকে। আমার চোখ ভেসে গেল সকালের সূর্যস্নাত রক্তিম আভায় মেশা সবুজ প্রান্তরের বাঁকে। অনন্ত নীলিমার মাঝে ছড়িয়ে আছে ছোটো ছোটো দূর্বাদল।

তারই ওপর শিশিরের লুকোচুরি।

তখনও কলেজে পড়ি।

রোজ সকালে সাঁতার কাটতে যেতাম অ্যান্ডারসন ক্লাবে। বরাবরই জল আমার খুব ভালো লাগে। মর্নিং ওয়াকের মতো সাঁতার শরীরটাকে যেমন ফিট রাখত, মনটাকেও ভরিয়ে দিত নতুন সুরে। অনেকটা সকালে উঠে গঙ্গাস্নান করার মতো। পবিত্র হাওয়ায় নির্মল ঘ্রাণ। সকালের সাঁতারটুকু সারাদিনের জন্য ঝরঝরে করে দিত দেহ। ফ্রি-স্টাইল থেকে আজ ব্রেস্ট স্ট্রোক।

আমার স্তনের দিকে তাকানোর কথা ভেবে, বান্ধবীদের কথা মনে পড়ে গেল ‘বেশি করে ব্রেস্ট স্ট্রোক দিয়ে সাঁতার কাটলে বুক আরও বড় হয় জানিস?’

জানতাম না তো!

টিউব লাইটের মতো ওরা যা বলত, সেটাই মনে হত বেদবাক্য। কী বোকাই না ছিলাম! সাঁতার কেটে লেকের ধারে সবাই মিলে একসঙ্গে হাঁটতে চলে যেতাম। সকালের ফুরফুরে হাওয়ায় পায়ের চটি খুলে মখমল ঘাসের মধ্যে হাঁটার মধ্যে সে কী আনন্দ! তোমায় বলে বোঝাতে পারব না।

মন চাইছিল এই মুহূর্তে গাড়ি থামিয়ে চটি খুলে ঘাসের ওপর আবার ছেলেবেলার মতো নেচে বেড়াই। ফড়িং-এর উচ্ছ্বাসে। আপন ছন্দে, আনন্দে। পেখম ছাড়া ময়ূরের তালে।

একটা কথা বলব, রাগ করবে না তো। পশ্চিম বাংলার মতো এত সবুজ কিন্তু তোমার এই উত্তরাখন্ডে নেই।

না থাক।

তবুও...

তোমার সঙ্গে পথ চলার মধ্যেই বা কম আনন্দ কীসের? মনের মানুষ কাছে থাকলে যে কোনো জায়গায়ই মনটা ভালো লাগে।

“তুমি ঠিক আছ তো?” ফিরে তাকালাম পাশে বসা তোমার দিকে। তোমার দৃষ্টি এবার স্তন থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে আমার মুখে। আচ্ছা তোমরা সব সময় ওই দিকে তাকাও কেন বল-তো, যখন মুখের সৌন্দর্য অনেক মিষ্টি? অথবা চোখের দৃষ্টি! অ-দেখাকে দেখার আকাঙ্ক্ষাতেই কি নীচে নামার নেশা? ওখানে তো কোনো বৈচিত্র্য নেই। বৈচিত্র্য আছে দৃষ্টির মেদুরতায়। সেখানেই অন্তরের প্রকাশ। সেখানেই প্রেমের সৃষ্টি।

“হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?” প্রশ্ন করলাম তোমাকে।

“মানে উদাসীনভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলে তো... তাই ভাবছিলাম কী ভাবছ?”

“গাড়িটা একটু থামানো যায় কি?”

“কেন?” অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে।

“থামাও না একটু...” আমার আবদারে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার ধারে।

গাড়ি থামতেই দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে পড়লাম। নীল আকাশের নীচে বাঁ দিকের সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর ছুটে বেড়াতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে। তুমি হয়তো ভাবছিলে মনে মনে... পাগল হয়ে গেলাম নাকি? এ আবার কার সঙ্গে এলাম? এতক্ষণ দুজনে সময় কাটালাম।

মনে মনে বলছিলাম, পাগল না হলে তোমার সঙ্গে এভাবে হঠাৎ বেড়িয়ে পড়ি? তুমি কী ভেবেছ আমাকে, তা কি এখনও জানি? কাল সারাদিন ধরে তোমার তালে ঘুরেছি রাজীব গান্ধী চক থেকে পালিকা বাজার হয়ে লোটাস টেম্পল। অবিরাম না-চেনা উদ্দেশ্যহীন চক্কর। আজ খেলব নিজের ছন্দে, মনের আনন্দে। মেলব পাখা। উড়বে আমার উদাস মনের ব্যাকুল বহ্নিশিখা। খেলব দু-হাত মেলে কাটিয়ে আকুল সাগর। স্বপ্নসৌধ গড়ব দুজন স্বপ্নরঙে বিভোর।

ভালোই লাগছিল খোলা আকাশের নীচে একমনে নেচে বেড়াতে। ভোরের আকশের সোনামাখা রোদে ভাসতে। পাওয়ার আনন্দ তো বন্ধনের মধ্যে নয়, মুক্তির অনাবিল স্রোতে।

দূরের পাহাড়ের চূড়াগুলোর ফাঁক দিয়ে সকালের সূর্যের মৃদু আলোর কিরণ, যেন সোনার গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে ফিকে সবুজের ওপর। তার স্পর্শে গায়ে হলুদ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে অবিরত। শুভরাত্রির শেষে আগামী দিনের নতুন কোনো এক শপথে। এতকাল ধরে তো শুধুই শপথের রথে চড়ে বেড়িয়েছি। বুঝিনি শপথের মানেটাই বা কী?

এবার হয়তো সময় হয়েছে সেই রথকে পেছনে ফেলে ছুটে চলার। মনের ময়ূর পঙ্খীতে চড়ে পাড়ি দিতে রূপের অরূপে। হৃদয়ের দুয়ার খুলে নতুন চেতনার রং ধূসর ক্যানভাসে খুঁজতে। তোমাকে পাশে নিয়ে আবার নতুন করে বুঝতে। বন্ধ জানলার কপাট খুলে খোলা আকাশের নীচে উড়তে। আমরা আবার ভাসব ওই পাখিদের মতো, অনন্ত নীলিমাকে দু-হাত বাড়িয়ে দূরের আকাশটাকে নিবিড় করে ছুঁতে। নিবিড় করে শুঁকব তার মুক্ত হাওয়ার ঘ্রাণ। সেখানেই লুকিয়ে আছে জীবনের প্রবল কলতান। অনুভূতিকে ওই হাওয়ায় ওড়া গাঙচিলের মতো কাছে টেনে নিতে।

“আরে... আরে... করছটা কী?”

ঘাসের গালিচায় ছুটতে-ছুটতে, আমি কথা ছুড়ে দিলাম তোমার দিকে “কেন ছুটে বেড়াচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ না?... তুমিও নেমে এস না আমার সঙ্গে”

ইচ্ছে থাকলেও হয়তো বিদেশ বিভুঁইয়ে অচেনা গাড়িতে লটবহর ফেলে নামতে চাইছিলে না। খোলা দরজার বাইরে পা মেলে চেয়ে রইলে আমার দিকে। বহুদিন পর প্রাণ ভরে ভোরের আকাশে মুক্ত বাতাসের

ঘ্রাণ নিলাম। কলেজ জীবনের অ্যান্ডারসন ক্লাবের মুহূর্তটাকে আবার নতুন করে পেলাম।

কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠছিলাম জীবনের এই মেকি বদ্ধ খাঁচায়। সৈকত, পিঙ্কু, পঞ্চভূতের পৃথিবীটা যেন সেই চেনা ঘেরাটোপে বন্দি করে দিয়েছিল আমাকে। সেখান থেকে ছুটি নিয়ে মুক্ত ঘাসের বুকে পাহাড়ের কোলে উড়ে বেড়াচ্ছিলাম আপন আনন্দে।

"এবার চলো। না হলে দেরি হয়ে যাবে।" সম্বিৎ ফিরল তোমার ডাকে। স্বপ্নের মায়া ফিরে এল বাস্তবের আঙিনাতে।

আবার গাড়িতে এসে বসা। আবার পথ চলা। কিছুক্ষণের মধ্যে সবুজ হারিয়ে গেল পাহাড়ি পথের আঁকাবাঁকা উতরাইয়ে। বুঝতে পারলাম সমভূমি ছেড়ে উত্তরণের পথে এবার।

কিছুক্ষণ চলার পর আবার বললে "একটু চা খেলে হয় না?"

বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না, চায়ের নেশাটা অতৃপ্ত আত্মার মতো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল তোমাকে।

"তোমাকে তো তখন থেকেই বলছি। তুমি বললে চা খাবে হোটেলে। এখন হলে মন্দ কী?"

রাস্তার পাশে ছাউনি দেওয়া ঝুপড়ির বেঞ্চিতে বসে পড়লাম দুজনে। ওপাশে দুই বিদেশিনী চা খাচ্ছে। খাঁকি প্যান্ট সাদা টি-সার্ট। একজন একটু স্বাস্থ্যবতী। অন্যজন ক্ষীণতনু।

চায়ের অর্ডার দিয়েছি, ওমনি হই-হই করে কিছু লোক ওই বিদেশিনী ও আমাদের ঘিরে ফেলল। কিছু বোঝবার আগেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি লোক, বছর পঁয়ত্রিশ বয়স হবে, বেরিয়ে এসে বলল "হামলোগ গরিব হো সকতে হ্যয়। ফিরভি হামারে কোই তো ইজ্জৎ হ্যয়?"

তরুণী দুটি বেশ ঘাবড়ে গেছে। ওদের দিকে তাকিয়ে বলল "হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার?"

"এ...এ... মেমসাব গালি মৎ দেনা"

স্বাস্থ্যবতী যুবতীটি ওদের দিকে তাকিয়ে বলল "বাট হোয়াট রং হ্যভ উই ডান?"

"বোলা না... গালি মৎ দে না। হামলোগ অংরেজি না জানে তো কেয়া? ফিরভি গালি মৎ দেনা মেমসাহাব"

বেশ বুঝতে পারছিলাম, কোথাও একটা কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। কিন্তু কোথায় হয়েছে ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে আমাদের আসার আগে।

কিন্তু কী?

এই লোকেরা ইংরেজি বোঝে না। নেহাতই পাহাড়িয়া গ্রামের মানুষ। বিদেশিরাও বুঝতে পারছে কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। কিন্তু কোথায়?

ওদের জিজ্ঞেস করলাম "কেয়া হুয়া?"

আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল "কেয়া বলু বাবু, কেয়া বলু বহেনজি... ইনলোগ নঙ্গা হো কর পাহাড় মেঁ চড় রহে থে... হামলোগ কে ভি তো বিবি-বচ্চে হ্যয়।"

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। কেনই বা এরা বিবস্ত্র হয়ে পাহাড়ে উঠতে যাবে? দেখে তো বিকৃত মস্তিষ্ক বলে মনে হচ্ছে না। আসলে কোথাও একটা কিছু ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।

ওই যুবতীদের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট ইংরেজিতে বললাম "হোয়াট ইজ দ্য ম্যটার? দে আর অ্যাংরি দ্যট ইউ ওয়ার ট্রাইং টু ক্লাইম্ব দ্য হিলস ন্যুড?"

তুমি একটু হকচকিয়ে গেলে। এই অযাচিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নয়। আমার চোস্ত ইংরেজি উচ্চারণে। এর আগে তো আমাকে এভাবে ইংরেজি বলতে শোনোনি কখনও। আমাদের পরিচয়ের শর্ত ছিল, একে অপরের সম্বন্ধে কিছু বলব না। আমি যে কনভেন্টে পড়েছি, তোমায় বলিনি।

ওদের মধ্যে স্লিম যুবতীটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল "নো। ইট ওয়াজ একজ্যাক্টলি নট সো অ্যাস দে থিংক। উই ওয়ার হিচ-হাইকিং টু ন্যয়নিটাল। উই নিডেড টু গো টু দ্য লু। বাট দেয়ার ওয়াজ নান অ্যারাউন্ড। উই অ্যাসিউমড দেয়ার ওয়ার নো ওয়ান অ্যারাউন্ড দ্য হিলস। সো উই টুক অফ আওয়ার ক্লোদস। দেন লিন্ডা ফেলট ইট মাইট বি ওয়াইজার টু ট্রাই এ মোর সেক্লুডেড স্পট। সিন্স নো ওয়ান ওয়াজ অ্যারাউন্ড উই ডিড নট কেয়ার টু পুট দ্য ক্লোদস অন এগেন। হোয়াইল ট্রাইং টু লুক ফর ইট, ওয়ান অফ দেম মাইট হ্যভ স্পটেড আস।"

মেয়ে দুটির মুখে ভয়ের স্পষ্ট ছাপ।

লিন্ডা বলে স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল "উই নেভার রিয়েলাইজড দে উড পাউন্স অন আস লেইটার হিয়ার।"

ওদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম "ইন ইন্ডিয়া লেডিস আর সাপোসড টু হ্যভ ক্লোদস অন অল দ্য টাইম।"

"ইভেন হোয়াইল গোয়িং টু দ্য লু?" লিন্ডার জিজ্ঞাসু চোখ।

"ওয়েল..." একটু থেমে বললাম "উই উইসুয়ালি পারশিয়ালি স্ট্রিপ হোয়াইল পারফরমিং... বাট নট ন্যুড কমপ্লিটলি।"

বুঝতে পারছিলাম এই মেয়েলি কথোপকথনে তোমার একটু অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু কিছু করার নেই। এরা বিদেশ-বিভুঁইয়ে অসুবিধায় পড়েছে। ওই লোকেরা এদের ভাষাও বোঝে না। আমি ছাড়া ওদের আর সাহায্য করবে কে? ওরা ভাবছে, চরিত্রহীন।

প্রশ্নটা মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। চরিত্রটা কি সামাজিক শর্তে বহিঃপ্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ঘরের দরজা বন্ধ করে আমরা পৃথিবীর আদিমতম রূপে চলে যেতে পারি। সংসার সেটা নিয়ে কিছুই ভাবে না। অথচ

বাইরে, জন্মের পর প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম করতে গেলেই সংস্কারে আঘাত। ভেবে হাসি পাচ্ছিল।

যুগে-যুগে দেশে-দেশে কতই না তার পরিভাষার বাহার। অথচ এ শুধুই সংস্কার। সভ্যতার মূল্যায়ন থেকে বিচ্ছিন্ন অংশীদার। ভাষা পালটেছে। সত্যিটা রয়ে গেছে নীরব মনে। বন্ধন ছিঁড়েই তার মুক্তি। না হলে মন জ্বলে খাক হয়ে যায়।

যে লোকটি তেড়ে এসেছিল, তার দিকে তাকিয়ে বললাম ‘‘উনলোগ টট্টি করনে কে লিয়ে জগহ ঢুন্ড রহা থা।”

“টট্টি করনে কে লিয়ে কেয়া নঙ্গে হো কর এলাকে মেঁ ঘুমনে পড়তা? কেয়া বোলতা মেমসাহাব? হমলোগ কো কেয়া উল্লু সমঝ কর রখা? যো বোলেগা ওহি বিসোওয়াস কর লুঙ্গা? ইয়ে সব বাহর কা আদমি হামলোগ কো বেওকুফ সমঝতে হ্যয়। আর আপ ভি উনলোগ কো বাত মেঁ আ গয়া?”

তুমি হয়তো বুঝছিলে ব্যাপারটা অন্যদিকে এগোচ্ছে। তাই এতক্ষণ নীরবতার পর এবার ওদের দিকে তাকিয়ে বললে ‘‘হমে তো উনলোগ সে অভিতক জান পেহচান ভি নেহি হুই। ইয়ে তো হামারা হি দেশ হ্যয়। আপ লোগ থোরা আরাম সে বৈঠিয়ে। ম্যয় উনহে সামঝাতা হুঁ।”

তারপর উঠে গেছিলে ওই লোকটির দিকে। ওকে, ওই লোকগুলো থেকে আলাদা করে দেখলাম কিছু বলছিলে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কী বলছিলে? একবার তোমার দিকে, একবার ওই মেয়ে দুটোর দিকে তাকাচ্ছিলাম। ওদের মুখে তখনও দুশ্চিন্তার আভাস।

ওদের ভীত সন্ত্রস্ত চেহারার দিকে ফিরে বললাম ‘‘ডোন্ট ইউ ওয়ারি। হি উইল সর্ট ইট আউট”

বিদেশ বিভুঁইয়ে এরকম একটা ঝামেলায় পড়বে আশা করেনি ওরা। কেমন যেন করুণভাবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখলাম ওরা চলে গেল। মনে মনে তোমায় সাধুবাদ দিলাম ঝামেলাটা সহজেই মিটিয়ে ফেলবার জন্য।

বেঞ্চে বসে বললে ‘‘কই চা টা তো দিল না?”

বাবুর চায়ের নেশাটা তখনও কাটেনি।

“কী হল? কী বললে?”

“দাঁড়াও... আগে চা টা খেয়ে নিই।” তারপর হাঁক দিলে “আরে ভাই চায়ে কাঁহা গয়া? ইয়ে দোনো লড়কিও কো ভি চায় দেনা”

বাবুর চা না খেলে কথা বেরোয় না। আবার তোমার দিকে তাকিয়ে বললাম ‘‘কী বললে ওদের?”

“ঠিক কী হয়েছিল এখনও তো বুঝতে পারছি না”

“হাঁদারাম... ওরা তো বললই কী হয়েছিল? বুঝতে পারলে না?”

“ঠাহর করেছি। কিন্তু বুঝতে পারলাম না ওরা উলঙ্গ হয়ে ঘোরাফেরা করছিল কেন?”

মনে হল তুমি বিদেশি সভ্যতার খুব একটা বেশি কিছু বোঝ না। কিন্তু এই মুহূর্তের হিরোটাকে জিরো করি দিই বা কী করে? তোমার কথা শোনার অনেক সময় এখনও পড়ে আছে।

তাই ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম “হোয়ার আর ইউ ফ্রম?”

“ইংল্যান্ড। উই আর ট্যুরিং ইন্ডিয়া টু সি ইটস কালচার। ইন ফ্যক্ট, হিচ-হাইকিং। আই অ্যাম ওয়েন্ডি। অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড লিন্ডা” রোগা পাতলা মেয়েটি জবাব দিল।

“হোয়ার ওয়ার ইউ অফ টু?”

“ন্যায়নিটাল। উই থট উই উড ওয়াক দিস ডিসট্যান্স। উই আর রানিং সর্ট অফ মানি। আফটার অল ইট ইজ নট টু ফার আওয়ে। অ্যান্ড দ্য ওয়েদার ইজ প্রিটি ফাইন।”

“হোয়াট ডু ইউ ডু?”

“উই আর স্টুডেন্টস অ্যাট ইউনিভার্সিটি অফ ব্র্যাডফোর্ড।”

“ইন হোয়াট?”

“সোসিওলজি।”

আড়চোখে তাকালাম তোমার দিকে। ভাবলেশহীন, চায় চুমুক দিচ্ছ। এদের কথোপকথনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

“ক্যন উই গিভ ইউ এ লিফট?”

“ওহ... ইয়েস... প্লিজ...”

“উই আর গোয়িং টু ভীমতাল। উই উইল ড্রপ ইউ সামহোয়ার ইন বিটুইন।”

“দ্যট উড বি লাভলি”

চা শেষ করে ওরা হ্যভারস্যক নিয়ে উঠে এল গাড়িতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমতল হারিয়ে গেল পাহাড়ের নীচে। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি এঁকেবেকে চলেছে ঘোরানো পথ ধরে। ডান দিকে কয়েকটা বোল্ডারের পরে বিশাল খাদ। জংলা গাছে ভর্তি। জাগতিক শূন্যতার ওপারে সারি সারি পাহাড়ের মেলা। প্রকৃতি উত্থানের চিহ্ন রেখেছে প্রতি পদক্ষেপে। নীচে কিছুটা সবুজ থাকলেও বেশির ভাগই রুক্ষ কালো চূড়া। যেন গোটা এলাকা শিবলিঙ্গ দিয়ে ঘেরা। দূর থেকে মনে হয়, যেন শিবের বলয়।

জীবনের বলয় যেমন সংস্কারে আচ্ছন্ন, শিবের বলয়ও কী পুরাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে! কিন্তু এই দুই বলয় ভেদ করে আমরা যে পথে চলেছি সে তো দিগন্ত ছোঁয়া। অনন্তের ঠিকানা কেউ জানে না। না

জানলেও তার ক্ষীণ রেখাটা কখনও দেখা যায়। সেটাই অনেক বেশি।

অনন্তকে বাঁধবার তাগিদে, প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে, ভুলেই গেছি গাড়িতে আমার সঙ্গে আরও তিন সঙ্গী আছে।

তুমি চুপ করে বসেছিলে।

ওদের মধ্যে যার নাম বোধহয় লিন্ডা, তোমার দিকে তাকিয়ে বলল ‘‘হোয়ার আর ইউ গোয়িং?”

“ভীমতাল।” সংক্ষিপ্ত উত্তর।

তুমি কি ইংরেজিতে অতটা পারর্দশী নও? তাই কথা বাড়াতে চাইছ না। না কি, ওদের গাড়িতে তোলার ব্যাপারে তোমার সম্মতি ছিল না। হয়তো ভেবেছিলে এই পথটা নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে আমার সঙ্গে একা পরিক্রমা করবে। সেখানে এ দুটি মেয়ে যেন কাবাব মে হাড্ডি।

আমি লিন্ডার দিকে তাকিয়ে বললাম ‘‘হোয়াট মেড ইউ কাম টু ইন্ডিয়া?”

ওয়েন্ডি বলে মেয়েটি ঝট করে বলল ‘‘টু সি দ্য কানট্রি।”

“ইস ইট ফর দ্যট ওনলি?”

লিন্ডা বলল ‘‘নট একজ্যাক্টলি। অ্যাকচুয়ালি উই কাম ফ্রম রিলেটিভলি ওয়েল অফ ফ্যমিলিস। ওয়েন্ডি ইজ ফ্রম ব্রমলি ইন কেন্ট। আই অ্যাম ফ্রম নটিংহ্যম। উই ওয়ার নেভার গুড স্টুডেন্টস। উই ডিডন্ট গেট এ চান্স এনিহোয়ার নিয়ার লন্ডন। নট ইভেন লাফবারা ইউনিভার্সিটি। সো উই মেট অ্যাট ব্র্যাডফোর্ড ইউনিভার্সিটি।” একটু থেমে বলল ‘‘প্রব্যবলি ইউ আর নট আওয়ার দ্যট ব্র্যাডফোর্ড ইস প্রিডমিন্যন্টলি রুল্ড বাই পাকিস্ট্যনিস অ্যান্ড ইন্ডিয়ানস। দেয়ার উই ফার্স্ট কেম ইন ডিরেক্ট কনট্যক্ট উইথ দ্য এশিয়ান কালচার।”

লিন্ডার কথাটা টেনে নিয়ে ওয়েন্ডি বলল ‘‘উই রিয়েলাইজড এশিয়া হ্যস এ রিচ হেরিটেজ দ্যন ইট ইজ প্রোজেক্টেড ইন আওয়ার পার্ট অফ দ্য ওয়ারল্ড। সো উই ডিসাইডেড টু টেইস্ট এ বিট অফ দ্য হেরিটেজ ইন আওয়ার ওন ওয়ে।”

জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ‘‘অ্যান্ড হোয়াট ডিড ইউ সি?”

একটু অদ্ভুত লাগছিল তোমাকে নীরব থাকতে দেখে। আশা করছিলাম, তুমি অন্তত আমাদের এই বাক্যালাপে যোগ দেবে। কিন্তু তুমি অটল। মনে একটু কষ্ট হলেও, সেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে ওদের দিকে তাকালাম।

“ইওর কনট্রি ইজ মোর ফিলসফিক্যল অ্যান্ড ট্র্যডিশনল। ইন ফ্যক্ট টুডেইস ইনসিডেন্ট প্রুভস দ্যট। ইট ওয়াস আওয়ার ফল্ট অফ নট পুটিং দ্য ক্লোদস অন। অ্যাকচুয়ালি উই ওয়ার নট আওয়ার এনিওয়ান ক্যুড বি অ্যারাউন্ড ইন দিস ফোরলোন পার্ট”

এবার পুরো ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছে।

নামে রাস্তাটা ন্যাশনাল হাইওয়ে এইট্টিসেভেন হতে পারে, কিন্তু চলাটা খুব একটা মধুর নয়। খুব ভালো মেনটেনড নয়। তারপর নিচু ইন্ডিকা গাড়ি। দোদুল্যমান ছোট্ট পাল্কিতে চড়ে ক্রোশ পার হওয়ার মতো। শুধু 'হুন...হুনা...' টাইপের কোনো আওয়াজ নেই চলার ছন্দে। কেবলই ঘন ঘন ব্রেকের আওয়াজ বারবার হেঁচকি তুলছে মসৃণতাকে বেসুরো করে।

কথা বলছিলাম নিছক বলার জন্য। কিন্তু তোমার নীরবতাও ক্যাটাফোনিক সিম্ফনি বাজিয়ে চলেছে আমার মনের ভেতর।

আর কতক্ষণ?

জেওলিকোটে এসে প্রথম তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল "এই ঝাকুনিতে পেটে ছুঁচো ডন মারছে। কিছু খেলে হয় না?"

সায় দিয়ে বললাম "আমিও এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম।"

অতএব আবার রাস্তার ধারে বেঞ্চে বসে পড়া। টোস্ট, অমলেট, চা। ভাবছি কখন হোটেলে গিয়ে পৌছব, কে জানে? খাওয়া শেষ করে উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ দূর থেকে কিছু পাহাড়ি লোককে আসতে দেখে লিন্ডা কিছুটা ভয় পেয়েই বলল "আই থিংক উই উইল টেক লিভ ফ্রম ইউ। উই ক্যন মেক আওয়ার ওয়ে থ্রু।"

ওয়েন্ডি লিন্ডার কথা টেনে নিয়ে বলল "থ্যাঙ্কস ফর সেভিং আস। অ্যান্ড থ্যাঙ্কস ফর দ্য লিফট টু।"

আবার কোনো ঝামেলায় জড়াবার আগেই সরে পড়তে চাইছে।

"টেক কেয়ার। এনজয় ইওর ট্রিপ ইন ইন্ডিয়া..."

ওরা হ্যভারস্যক কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ওদের অবয়ব মিলিয়ে যেতেই চোখে পড়ল একদল পাহাড়ি লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। নারী, পুরুষ, বাচ্চা, বৃদ্ধ লোকও আছে। সঙ্গে ভীমের মতো দশাসই এক কালো লোক।

কিছুটা ভয় পেয়ে গাড়িতে উঠতে যাব দেখি অসংখ্য মানুষ ভিড় করে আমাদের গাড়িটা ঘিরে ফেলল।

আবার কী হল?

এরা কারা?

ভীমের মতো লোকটা আমাদের দিকে এগিয়ে বলল "গুসতাকি মাফ কিজিয়ে। আপলোগ হামারে মেহমান হয়। থোরা পহলে যো হুয়া উসমে আপলোগকো তো কোই কসুর নেহি।"

এতক্ষণ ভয়ে কাঁপছিলাম। ওদের কথায় একটু নিশ্চিত হলাম।

লোকটি বলল ‘‘আপলোগ হামারে মেহমান। কুছ সময় হামারে সাথ বিতায়গি, তো বড়ি মেহেরবানি হোগি।”

তোমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। তুমি চোখের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে মন্দ কী? সত্যি তো। মন্দ কী? আমরা তো একসঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছি। সেই ফাঁকে এদের পৃথিবীটাও দেখা হয়ে যাবে। এবার ভয়টা পরিণত হল এক অজানা কৌতূহলে।

এরা ব্যাপারটা জানল কী করে? মনে হল, আজকাল তো মোবাইলের যুগ। দ্রুত খবর চলে এসেছে। ড্রাইভার বোধহয় ভাবছিল, কতক্ষণে আমাদের নামিয়ে দিয়ে আরও তিন-চারটে ট্রিপ মেরে দিতে পারবে। তা না, এখন এদের জন্যে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তোমার দিকে তাকিয়ে বলল ‘‘ইয়ে আদমি ইস গাঁওকে মুখিয়া হ্যায়। অব তো ঔর কুছ করনে নেহি সকেগা। আপলোগকো তো ইনলোগ কে সাথ থোড়া গুজরনে পড়েগা। যানা হ্যায় তো যাইয়ে, মগর দের মৎ কিজিয়ে।”

পাহাড়ি রাস্তা ধরে ভীমাকৃতি লোকটার পাশে গল্প করতে করতে হেঁটে চলেছি। পথের ধারে এখান-ওখান থেকে উঁকি মারছে কিছু নাম-না-জানা ফুলের সারি। পদ্মফুলের মতো বাহারি। কোথায় যেন একটা মাটির গন্ধ আসছে।

লোকটি চলতে চলতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল ‘‘আপলোগ তো শহর কে আদমি হ্যায়। সবলোগ ইঁহা সে গুজর যাতা। কোই নৈনিতাল। কোই ভীমতাল। উহ সব তো টুরিস্ট স্পট হ্যায়। হামলোগকা ছোটা গাঁও ভি তো একবার দেখ লিজিয়ে।”

পেছনে পর্বতমালা। সামনে একটু সমতল জায়গায় বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরি ছোট্ট একটা বাড়ি। ফুলের বাগান। সেখানে আমাদের জন্য একটা বেঞ্চি পেতে দিয়ে হাঁক দিল ‘‘আরে ও মুনিয়া... সাহাব, মেমসাব লোগকে লিয়ে কুছ চায়-পানি কা বন্দোবস্ত করো।”

“অভি আই...” ভেতর থেকে আওয়াজ ভেসে এল।

লোকটির সঙ্গে গল্প করছিলাম। বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল আশপাশের বাড়িগুলোর দিকে। কোনোটা একটু উঁচুতে। কোনোটা নীচে। কিন্তু সব বাড়িগুলোর ধাঁচ-ই এক। বড় বড় পাথর দিয়ে গড়া ছোট্ট বাড়ি। লোভ হচ্ছিল জায়গাটা ঘুরে দেখার...

অতিথি আপ্যায়ন শেষ হতে লোকটি বলল ‘‘হামারে আদমি আপলোগকো গাড়ি মেঁ ছোড় আয়গা।”

মনের ইচ্ছেটা রূপায়িত করতে বললাম ‘‘নেহি নেহি। উসকা জরুরত নেহি হ্যায়। হামলোগ তো ঘুমনে আয়ে। থোড়া ইয়ে জগহ ঘুম লেঁ। আপকে নাস্তাকে লিয়ে হামলোগ আভারি হুঁ।” মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললাম ‘‘চলে মুনিয়া... বড়িয়া খায়া।”

পাহাড়ের প্রান্তরে হেঁটে চলেছি। চলাটা যেন অনন্তের পথে। সময় হারিয়ে গেছে। প্রকৃতির মাঝে ভেসে বেড়াচ্ছি দুজনে। অনুভবে বিভোর। সময়ের অলিন্দে পাখনা মেলেছে আমাদের অনুভূতির নতুন ছন্দ।

কতক্ষণ এভাবে ঘুরেছি খেয়াল নেই। হঠাৎ তোমার কথায় চমকে উঠলাম ‘‘সন্ধে নেমে এসেছে যে। এখন না ফিরলে রাত হয়ে যাবে।”

ড্রাইভার আমাদের দেখে হাই-হাই করে উঠল ‘‘ইতনা দের কর দিয়া সাহাব। কিতনে সময় সে আপলোগ কো ঢুন্ড রহা হুঁ।”

গাড়িতে বসে বললাম ‘‘থোড়া দের হো গয়া। জগহ আচ্ছা লাগা। ইসলিয়ে থোড়া দেখ রহা থা। অব চলিয়ে।”

“কাঁহা যায়গা? অব তো আপলোগকো সারে রাত ইয়ে জগহ দেখনা পড়েগা। দিন ঢলনে কে বাদ ইধর গাড়ি চলানা মনা হ্যায়।”

“কেয়া!!?” দুজনের মুখ দিয়ে বেড়িয়ে এল একসঙ্গে।

“হাঁ সাব। হাঁ মেমসাব।”

তুমি বললে ‘‘চলিয়ে না। কৌন দেখেগা ইধর?”

“নেহি সাব। ইধর তো কোই নেহি দেখেগা। লেকিন ভীমতাল মে ঘুসনে সে পহলে পুলিশ চৌকি পকড় লেগা। ইয়ে গাড়িকা লাইসেন্স চলা যায়গা।” একটু থেমে বলল “হমে কুছ করনে কা নেহি হ্যায়। আপকো ইধর হি রুখনে পড়েগা।”

“ইধর কোই হোটেল হ্যায়?”

“হোটেল? কেয়া বোলতা মেমসাব? সুবহ জিধর নাস্তা কর রহে থে ওহ দুকান অভিতক খুলা হ্যায়। কুছ খা লিজিয়ে। ফির আরাম সে গাড়ি মেঁ শো যাইয়ে।”

কিছু করার নেই। খেয়েদেয়ে বসে রইলাম গাড়িতে।

সময় স্তব্ধ। হাতঘড়ির কাঁটা ঘুরেই চলেছে।

টিক... টিক... টিক...

রাত থেকে দিনে।

স্বল্প জ্ঞান বলছে, গতির সঙ্গে সময়ের একটা সমস্যা আছে। যেখানে গতি রুদ্ধ, সেখানে সময় স্থির, অচল। সচল ঘড়ির টিকটিক কেবলই অসহায় যান্ত্রিক নিগড়ে বাঁধা।

শরীর ছেড়ে দিলাম গাড়ির পেছনের সিটে। গাড়িটাই একমাত্র ছাদ। ড্রাইভার যে কোথায় হারিয়ে গেছে, কে জানে? বিধ্বস্ত, জর্জরিত মনে হচ্ছে। কেন যে সকালে ওই দোকানে চা খেতে নেমেছিলাম? না নামলে তো এই ফ্যাসাদে পড়তাম না। তোমার চায়ের নেশাটাই কাল হল। এখন গাড়িতে শুয়েই দেখতে হবে অগামী সকাল।

কার কপালে কখন কী লেখা আছে, কেউ কি বলতে পারে?

কথা বলতেও ভালো লাগছে না। অবসাদ, বিষাদ, ক্লান্তিতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

জেগে উঠলাম পাখিদের কলতানে।

মুহূর্তের জন্য মনে হল, আমি কোথায়? কয়েক সেকেন্ড... তারপর ধাতস্থ হয়ে বুঝলাম, এখনও জেওলিকোট গ্রামে, সেই গাড়িতেই রয়েছি।

পাহাড়ের শিবলিঙ্গের মতো শৃঙ্গের ফাঁক থেকে সূর্যের কিরণ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। দু-দিনের ক্লান্তিকে নিমেষে ভালোলাগা মুছে দিল নৈসর্গিক মায়ায়। যেখানে বেজে চলেছে নতুন সুর। এক নতুন ছন্দ। যেন সুর্যরশ্মির বন্দনাগানে 'রৌদ্রের গন্ধ' পাচ্ছি আপ্লুত হৃদয়ের গভীর গোপন কোণে। সরস্বতীর হাতের বীণা হয়ে নব আনন্দে আবার জেগে উঠতে 'নব রূপে নব রবি কিরণে'।

মনে হল পাপ না করেও প্রায়শ্চিত্তের ভাগীদার হয়ে ঈশ্বর বোধহয় এই নৈসর্গিক দৃশ্য উপহার দিচ্ছে ঘুস হিসেবে। ঈশ্বরের দেওয়া ঘুস। একে তো অস্বীকার করা যায় না। তার দানকে শিরোধার্য করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম তুমি তখনও গাড়ির বাইরে পাহাড়ি জংলা ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে।

"এই ওঠো। আমাদের ভীমতাল পৌছতে হবে।" আমার কথায় ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লে।

"আমি কোথায়?" তোমার মুখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস।

"রাস্তায়।"

ড্রাইভারকে জাগালে।

আবার রথ নামল পথে। দূর থেকে ভেসে আসছে পাখিদের কিচিরমিচির। মনে পড়ে গেল - পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।

ভীমতালের পথে চলা শুরু হল।

পেছনে পড়ে রইল ঈশ্বরের দেওয়া কষ্টের মধ্যে না-দেখা, না-পাওয়া, না-অনুভব করা এক অপরূপ স্মৃতি। অবিস্মরণীয়, চিরদিন মনে রাখার মতো।

তোমাকে...

কস্তূরী



সপ্তম চিঠি

কস্তূরী

ভীমের আপ্যায়ন থেকে পরিত্রাণ পেয়ে তোমার সঙ্গেই তাল খুঁজে পেলাম।

ভীমতাল।

আপাতত আমাদের গন্তব্য।

বোধহয় পাণ্ডবদের বনবাসের মতো একটা মনোরম আস্তানা খুঁজছিলাম তোমার সঙ্গে কয়েকদিন কাটাব বলে। ভীমের নামেই এই স্থান। বিশাল একটা লেকের মধ্যে একটা দ্বীপই শুধু এর আকর্ষণ নয়। প্রাচীন শিবমন্দির, ভীমেশ্বর মন্দির, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষকে এখানে টেনে আনে। কুমায়ুনের চাঁদ বংশীয় রাজা বাজ বাহাদুর এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, ভীমতালের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মহাভারতের এক অধ্যায়।

ভোয়ালি থেকে ভীমতাল যদিও মোটে এগারো কিলোমিটার, রাস্তার জন্য পৌঁছতে লেগে গেল এক ঘন্টার ওপর। এখন শুধু একটা বিছানা চাই। আর বাথরুম। আমার অবশ্য চা অত্যন্ত জরুরি। তুমি কাল থেকেই বুঝতে পেরেছিলে। জেলিয়াকোটে রাস্তার ধারে শুয়ে আমার আর শরীরে দিচ্ছে না।

ড্রাইভার আমার দিকে তাকিয়ে বলল ‘‘কাঁহা যায়েগা সাব?’’

‘‘মন্দির মার্গ মেঁ সনোলিথ রিসর্ট পর।’’

গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বললাম ‘‘তুমি মাল নিয়ে লবিতে গিয়ে বসো। আমি চেক-ইন করে আসছি।’’

নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চাইছিলাম তোমার কাছে। কেন যে এখানে এসেছি, তা-ও জানাতে চাইনি। আমাদের শর্ত ছিল।

রিসেপশনিস্ট বলল ‘‘কেয়া নাম বতায়া?’’

নামটা শুনেই বলে উঠল ‘‘ওহঃ! আপ তো প্রেসকে আদমি হ্যয়। আপকে এডিটার নে ফোন কিয়া থা হামারে মালিক কো। মালিক আপকে লিয়ে লাক্সারি কটেজ রখ দিয়া। আপকো তো কাল আনা থা। কেয়া হুয়া?’’

"থোরি সি মুসিবৎ মেঁ ফস গয়া থা।" রেজিস্টারে সই করতে করতে বললাম।

রিসেপশনিস্ট বেয়ারাকে বলল "সহাবকো দো নম্বর লাক্সারি কটেজ মেঁ লে জানা।" আমার দিকে ফিরে বলল "ইওর ফুডিং অ্যান্ড লজিং ইস ফ্রি। কমপ্লিমেন্টস ফ্রম আওয়ার ওনার। অলসো এ কার ইজ অ্যাট ইওর ডিসপোজাল এনিটাইম। জাস্ট ইনফর্ম দ্য রিসেপশন। টেক রেস্ট রিল্যাক্স অ্যান্ড এনজয়। আওয়ার ওনার উইল মিট ইউ লেটার।"

ঘরে ঢুকে বুঝতে পারলাম সব ক্লান্তি মুছে দিয়েছে তোমার অপার বিস্ময়। ঘরের অভিজাত্যে নয়, আমার স্বরূপ যে কী, সেটাই তখন আঁচ করার চেষ্টা করছিলে।

কে আমি?

সত্যি কি আমি তাই, যেভাবে দেখেছ?

না কি, অন্য কিছু?

যে লোকটা রাস্তার ধারে নির্দ্বিধায় রাত কাটাতে পারে, সে এই স্বপ্নপুরীতে তোমায় নিয়ে এল কী করে?

পরিচয় না জানার খেলাতেই তো যত মজা ভেবে মনে মুচকি হাসি। অপ্রত্যাশিত পাওয়ায় আনন্দ। না পেলে ভেঙে যায় ছন্দ।

তোমার অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম "বাথরুমে কে আগে যাবে? আমি না তুমি?"

প্রশ্নটা যেন হাওয়ায় ছোড়া। কোনো উত্তর না দিয়ে, স্যুটকেশ থেকে টয়েলেটারি সেট, প্যান্টি-ব্রা আর হাউসকোট নিয়ে বাথরুমে গেলে। হয়তো ঠিক ঠাহর করতে পারছিলে না আমার আমিটাকে। তোমার দ্বন্দ্ব অনেক বেশি। রাজকক্ষ স্বপ্নপুরী থেকে তোমাকে ফিরিয়ে এনেছে বাস্তবের আঙিনায়।

এই টানাপোড়েন জীবনের যাবতীয় অশান্তির মূল। ঘটনার স্রোত শুধু একটা মনগড়া সময়ের ব্যবধান। বয়েসের সঙ্গে যা ক্রমশ ক্ষয়ে যেতে থাকে। এক সময় নিমিত্তে এসে থেমে যায়।

মনে হল, দু-দিনের ধকলটা উতরে বোধহয় একটু স্বস্তি পেয়েছ। স্নান সেরে হাউসকোটে মোড়ানো তুমি তোয়ালে দিয়ে চুল মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছ। এখনও চোখেমুখে বিস্ময়। আমার স্বপ্নের জলপরী। প্রসাধনহীন। অপরূপা।

নাম দিয়েছি কস্তূরী। সে আমার সুপ্ত বাসনার ডানা-কাটা পরি।

"এবার শান্তি? রুম-সার্ভিসে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে একটু জিরিয়ে নাও। আমি ততক্ষণে স্নান সেরে আসি।"

প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান করে যখন বাথরুমের বাইরে পা রাখলাম, তোমায় দেখতে পেলাম না। বারান্দায় উঁকি মেরে দেখি তুমি পলকহীন চেয়ে আছ আকাশপানে।

"এখানে কী করছ? একটু ঘুমিয়ে নিলে না?"

"এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে?" তোমার বিস্ময়।

"কেন? ভীমতালে, রিসর্টে।"

"আমি কিন্তু নিতান্তই একটা সাধারণ মেয়ে..."

"কে বলল আমি অসাধারণ? সম্পর্ক কখনও সাধারণ বা অসাধারণ দিয়ে বিচার হয় না। এই যে কথাটা বললে, এটা সামাজিক নিয়মের ভুত-বর্তমান-ভবিষ্যতের একটা অঙ্গ। ভুত আর ভবিষ্যৎটাকে নাই-বা টেনে আনলে আমাদের চলার ছন্দে। তোমার সঙ্গে সময় কাটাতে চাই নিজেদের আনন্দে।"

"ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়েছি। হঠাৎ মশালা ধোসা খেতে ইচ্ছে করল। তোমার আপত্তি নেই তো?"

"আমিও মশালাধোসা ভালোবাসি"

শাঁখরাইলের এক অখ্যাত ছেলে তো ব্রিটিশ ব্রেকফাস্টের স্বপ্ন দেখতে পারে না। লেক মার্কেট এলাকায় মশালা ধোসা খেয়েই কাটিয়েছে এতকাল।

"যদি তোমার টায়ার্ড না লাগে, খেয়ে আমরা গাড়ি নিয়ে ভীমতাল লেকটা ঘুরতে যাব।"

"গাড়ি? গাড়ি তো ছেড়ে দিলে!"

"আরে বাবা, হোটেল থেকে আমাদের একটা গাড়ি দিয়েছে।"

এবার তুমি আরও অবাক। তোমার মুখের বিস্ময় দেখে বেশ মজা লাগছিল। মহিলাদের চিন্তাধারাকে এলোমেলো করে দিতে কার না ভালো লাগে?

এবার আর শাড়ি নয়। নীল জিনস আর সাদা টপস, মুখে হাল্কা লিপস্টিকের প্রলেপ। গাড়িতে উঠে বসলে। বেড়াতে এসেছি। প্রত্যেকটা মুহূর্ত উপভোগ করতে চাই।

ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললাম "ভীমতাল লেক ছোড় কর ঔর কেয়া দেখনে কা হ্যয়?"

"বহোৎ কুছ। ভীমতাল লেক কে পাস ঔর একঠো ছোটা সা লেক হ্যয়, নল দময়ন্তী তাল। আম আদমি কা বিসোয়াস হ্যয় ইধর কা রাজা নল উস লেক মেঁ ডুব মরা। ভীমেশ্বর মন্দির কা নাম তো আপলোগ জরুর শুনা হ্যয়। ঔর কুছ আগে হিড়িম্বা পর্বত হ্যয়। আপলোগ জরুর হিড়িম্বা কা নাম মহাভারতমেঁ পড়ে হোঙ্গে। উধর অব ভখন্ডি মহারাজকা আশ্রম হ্যয়। ঔর একঠো মন্দির হ্যয় কারকোটাকা পাহাড় মেঁ, নাগ মন্দির। ঋষিপঞ্চমী কা দিনমেঁ হাজারো আদমি নাগ কারকোটা মহারাজকে পূজা করতে হ্যয়।"

তুমি বাধা দিয়ে বললে "হমে মন্দির-ওন্দির দেখনে কা নেহি হ্যয়। হামে সিরিফ লেক ঘুমনা হ্যয়।"

দু-দিনের ধকলের পর আবার প্রকৃতিকে কাছে পাওয়া। প্রকৃতির কোলে মাথা রেখে নতুন ছন্দের বোধন। এই বোধহয় তোমার স্বপ্নে ছিল। আমি তাকে নিয়ে এলাম ভীমতালের আসরে।

লক্ষ করলাম, লেকের ধারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে তুমি পলকহীন চোখে চেয়ে আছ শান্ত জলরাশির দিকে। মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ। সেখানে দুটি বড় আর একটা ছোট্ট গাছ, যেন বিশাল জলরাশির মধ্যে একটা শান্তির নীড়ের ঐকতান শোনাচ্ছে।

এতদিন ভেবেছিলাম, অনামিকা আর আমার ছেলের বাইরে কোনো পৃথিবী নেই। তাহলে কি তোমাকে মন ভরে চাওয়াটাই মিথ্যে? প্রকৃতি আপনমনে গেয়ে যাচ্ছে সংসারের ঐকতান। ওই গাছের সারিগুলো যেন বাবা, মা আর একটি শিশু - এই পৃথিবী - এই আমাদের জীবন। তার চারধারে জলের মৃদুমন্দ তরঙ্গ পূর্ণতার মাঝে শোনাচ্ছে একাকিত্বের রব। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এক একটা ইউনিট। এই একক নিয়ে বাঁচা, মরা, হাসি, কান্নাই সময়ের ব্যাপ্তি নিয়ে গড়া অভিধান। সেটাই হয়ে ওঠে আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান।

সানগ্লাসটা চুলের ওপর তুলে, বললে ‘‘ভালো লাগছে?”

“কাকে?”

ওই নৈসর্গিক দৃশ্যের সমারোহ? নাকি তোমার ভিজে যাওয়া লিপস্টিকের প্রলেপ? তোমার সঙ্গে এই সৌন্দর্যে অবগাহন করতে ভালো লাগায় তো কোনো বাধা নেই। সময় নেই, আছে শুধু মুহূর্তের একটুকরো অনুভূতি।

“তুমি না বললেও, তোমার মুখ দেখে বেশ বুঝতে পারছি দু-দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে।”

“দেহের ক্লান্তি তো নিমেষে জুড়িয়ে যায়। কিন্তু মনের ক্লান্তি?”

“সেটা আমাদের দৈনন্দিন একঘেয়েমিও হতে পারে”

“এর স্থায়িত্ব কতখানি!” তোমার কোথায় যেন একটা সংশয়।

“মুহূর্তের জন্য। আচ্ছা বল-তো যে কোনো কিছুর স্থায়িত্ব কতখানি? সব কিছুই তো হারিয়ে যায় সময়ের স্রোতে। এমনকী আমরাও, আমাদের যাবতীয় বোঝাপড়া সমেত।”

“জীবন হারাতে পারে। প্রকৃতি হারায় না।”

“তা-ও হারিয়ে যায়। জাপানের একটা ভলক্যানো প্রকৃতিকেও ছিন্নভিন্ন করে দিল এক নিমেষে।”

তুমি ধ্বংসের গান শুনতে চাইছিলে না এই মুহূর্তে। জীবনের সুরে না-বাঁধা নতুন কোনো কিছু। যার শুরু জেলিয়াকোটে পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা দিনের প্রথম আলোর আভাসে, ঈশ্বরের ঘুসের মাধ্যমে। গেয়ে ওঠা নতুন কোনো সিম্ফনি। সে সিম্ফনি হয়তো বিথোভেন, মোজার্ট, চাইকভস্কি, স্ট্রস রচনা করেনি। সেখানে হয়তো আলি আকবর আর রবিশঙ্করের কোনো যুগলবন্দি নেই। আছে একটা সুদূর না-চেনা পথ। আর ভালোলাগার টুকরো মুহূর্ত।

"আচ্ছা, ওই যে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে লেকটা বয়ে গেছে, ওটা কোথায় গেছে বল-তো?" সানগ্লাসটা খুলে বললে।

গন্তব্যটাই যদি জানা হয়ে গেল, চলার তো সেখানেই ইতি। পথ যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে মুহূর্তটাও হারিয়ে যাবে। পড়ে থাকবে কেবল ফেলে আসা স্মৃতি। জীবনের ধূসর প্রান্তরে শূন্যতায় বিলীন আগামী পৃথিবী।

লেক থেকে বয়ে আসা হাওয়ায় ওড়া চুলে ঢাকা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম ''লেকের শেষ খুঁজে কী হবে? যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেটাই তো বেশ।"

নাকি লেকের ধারে রেলিংটাই শেষ? টপকালেই অনিশ্চয়তা, এক অজানা স্রোত। যে স্রোতে ভাসব বলে বেড়িয়েছি ঘর ছেড়ে। যে স্রোতে ভেসে চলেছি গন্তব্যহীন অজানায়। সুদূর যেন বারবার হাতছানি দিচ্ছে নিকটের, এক না লেখা দ্বৈত সুরে। ব্যবধানটা নিকটে আসছে জলরাশির অভিবাদনে।

সূর্য তখনও মধ্যগগনে আলোর বর্ষা ছড়িয়ে দেয়নি। তপ্ত উষ্ণতায়, ছায়ার আশ্রয়ের সন্ধানে, আমাদের নিবিড় কোমল আনন্দের তহবিলে হাত বসায়নি। শুধু স্নিগ্ধ জলরাশির মধ্যে মুক্তোর মতো আলোর ফুলঝুরি ছড়িয়ে দিচ্ছে। কোনো অচেনা দেওয়ালির উৎসবে মেতেছে, চেনা নিয়মের বাইরে। অচেনা হৃদয়ের নিঃশব্দ স্পন্দনে। তোমার সাথে একাকী জানি না কোন উপত্যাকায় হারাতে চাই। পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে অজানা জলের অতলে। হারিয়ে যাওয়া দৃশ্যের অন্তরালে।

জিভটা ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে আঙুল তুলে বললে ''আচ্ছা ওই দ্বীপটায় যাওয়া যায় না? ওখানে তো একটা বাড়িও দেখছি!"

"দেখি খোঁজ করে।" হারিয়ে গেলাম পেছনের ভিড়ে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললাম "ওখানে একটা রেস্টুরেন্টও আছে। নৌকোয় যাওয়া যায়। বেশি দূর নয় - নব্বই মিটার।"

"তাহলে চল না... ওখানে যাই" জল হাতছানি দিল তোমাকে।

আবার সেই জল। নৌকোয় বসে তোমার দিকে চেয়ে বহুদিন আগেকার একটা গান মনে পড়ে গেল,

কে প্রথম কাছে এসেছি?

কে প্রথম চেয়ে দেখেছি?

কিছুতেই পাইনি ভেবে

কে প্রথম ভালোবেসেছি?

তুমি না আমি?

তুমি না আমি...

সৌম্যদার বিয়েতে গোলাপটা তুলে দেওয়ার মধ্যেই কোথায় যেন একটা কম্পন শুরু হয়েছিল। হারিয়ে যাওয়া হৃদয়ের কম্পন। না-বোঝা, না-শোনা, হৃদয়ের অব্যক্ত স্পন্দন।

কে শুনেছিল প্রথম?

তুমি না আমি!

"চাইনিজ না কন্টিনেন্টাল?" কাজলকালো চোখের দিকে তাকিয়ে মেনু কার্ড হাতে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম তোমাকে।

"কন্টিনেন্টাল।" হাওয়ায় ওড়া চুল পেছনে ঠেলে বললে।

যখন মেনু কার্ড ওলটাতে ব্যস্ত, তুমি চেয়ে আছ নীল জলরাশি ছাড়িয়ে শৃঙ্গমালার দিকে। পাহাড়ের বেষ্টনিতে আবদ্ধ মৃদু কম্পনে আচ্ছন্ন জলের অতলে। যেখানে মুক্তো খুঁজতে গিয়ে ঝিনুকের মধ্যে হারিয়ে গেছে অনেকে। ডুবুরিরাই বলতে পারে।

মেনু কার্ডটা দেখছিলাম বটে, মন বলছিল, তুমি ভালোবাসো জলের কাছে বসে থাকতে। মনে আছে, একদিন রোয়িং ক্লাবে জলের পাশে বসে বলেছিলে 'জল আমার খুব ভালো লাগে'

কার না ভালো লাগে জল, ফুল, অরণ্য, পাহাড়, সমুদ্র?

কার না ভালো লাগে হৃদয়ের স্পন্দন কাছে বসে শুনতে?

কার না ভালো লাগে মাঝরাতে বসে তারা গুনতে?

তারা গোনার একটা জল্পনা করছি, হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

"হু ইজ ইট?"

"মৈ ইস হোটেলকা ম্যনেজার হু, মিঃ গোলেরিয়া। আপকে সাথ থোড়া মুলাকাত করনা হ্যয়। আ সকু?"

পাছে তুমি আমার আসল পরিচয় জেনে যাও, সেই ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম ''ম্যয় আপকা অফিস মে অভি আ রহা হুঁ।"

পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর চটি গলিয়ে 'আসছি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

মিঃ গোলেরিয়া অফিস স্যুইটে সাদর অর্ভ্যথনা করলেন ''আইয়ে... আইয়ে..."

মধ্যেবয়সি টাকমাথা লোক। পরনে সাদা সার্ট ও প্যান্ট। কাঁচা-পাকা গোঁফ সারা মুখের শোভা বাড়িয়েছে। কলেজ জীবনে অনেককেই ঠাট্টা করে বলতে শুনেছি 'হি ইস লুসিং হেয়ার'। ওকে দেখে মনে হল 'হি হ্যস গেইন্ড ফেস'। সেই ফেসের ফাঁকে অবশিষ্ট দাঁতের মহিমা ছড়িয়ে বলল ''ওয়েলকাম টু আওয়ার হাম্বেল রিসর্ট।" চেয়ারটায় আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে ''কুছ তকলিফ তো নেহি হো রহা হ্যয়?"

মাথা নেড়ে বললাম ‘‘বিলকুল নেহি। আপকে আদমি বড়ে দিল সে দেখভাল কর রহে হ্যায়।”

“ইয়েহি তো হামারে রিসর্ট কা মোটো হ্যায়। হর আদমি যো ইধর আয়, উসে আপনা বনা লো। লোক তো সভি নৈনিতাল মেঁ রহ কর ভীমতাল ঘুমনে আতে হ্যায়। আপ কেয়া নৈনিতাল ভি জায়েগা?”

মাথা নেড়ে বললাম ‘‘নেহি নেহি। নৈনতাল মেঁ তো বহোৎ রিসর্ট হ্যায়। হম তো ও সব রিসর্টকে কাহানি লিখনে কে লিয়ে ইঁহা নেহি আয়ে। মৈ তো জিধর আদমি কম আতে হ্যায়, উধর কে বারে মেঁ লিখনে আয়ে হুঁ।”

“ফির তো হামারে রিসর্ট কে বারে দো-পাঁচ বাত আচ্ছে সে লিখদে তো বড়ি মেহেরবানি হোগি।”

“জরুর। ইস লিয়ে তো ইধর আয়া হুঁ” আমি সায় দিলাম।

“আরাম সে রহিয়ে। জিতনা দিন দিল চাহে।” বেল টিপল। আর্দালি ঘরে ঢুকতে বলল “দো কাপ কফি দেনা। বড়িয়া সে”

আমি বাধা দিয়ে বললাম ‘‘কেঁও ইতনা তকলিফ করতে হ্যায়? আপকা আদমি তো অচ্ছে সে দেখভাল কর রহে হ্যায়।”

“ভাইসাব... আপ হামারে মেহমান। এক চায় ভি পিলা নেহি সকু তো হামারি গুসতাকি হোগা।”

“কল লাঞ্চ কে বাদ চলা জানে পড়েগা। ঔর কোই রিসর্টকে বারে মেঁ ভি তো লিখনা হ্যায়।”

“কাঁহা যা রহা হ্যায়?”

“বিনসার”

“ইয়ে তো নব্বই-শও কিলোমিটার। পাহাড়ি রাস্তা। করিব তিন সাড়ে-তিন ঘন্টা লগ যায়েগা। ইয়ে আপ ভোয়ালি সে আয়া না? উধর সে কৈঞ্চি রাতিঘাট হোকে কৈরানা ব্রিজ পার হো কর কাকারিঘাট সুলিয়াসারি হো কর আলমোরা পহচনা হ্যায়। ফির কপর খান সে গয়রাদ বেন্ড পার হোকে বিনসার পহচেগা।” মিঃ গোলেরিয়া এক নিশ্বাসে বলে গেল।

আমার কিছুই মাথায় ঢুকল না। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল ‘‘ফিকর মত কিজিয়ে। জান-পেহচান এক আচ্ছা সা কিড়ায় কা গাড়ি ঠিক কর দুঙ্গা। আপলোগ কিতনে বজে জানে মাংতে হ্যায়?”

“লাঞ্চ কে বাদ। করিব দেড়-দো বজে...” একটু থেমে বললাম “আপ কেয়া ইঁহা কে রহনেওয়ালে হ্যায়?”

“নেহি সাহাব। মৈ তো মুম্বাই কে আদমি হুঁ। উধর তো বহোৎ কম্পিটিশন য্যদা হ্যায়। ইসলিয়ে ইধর চলা আয়া। তভি ইধর কোই আদমি নেহি আতে থে। জমিন ভই সত্যে মেঁ মিল গয়া। সোচা, কিউনা ইধর-ই

এক রিসর্ট কর লে?” কফির কাপটা বেয়ারা ততক্ষণে টেবলে রেখে গেছে। সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল “লিজিয়ে সাব।”

কফিতে চুমুক দিয়ে ভাবছিলাম, রিপোর্টার হওয়ার অনেক পার্কস আছে। এই যে ফ্রি থাকা-খাওয়া শুধু দু-চার কলম গুছিয়ে লেখার জন্য।

মিঃ গোলেরিয়া কফিতে চুমুক দিয়ে বলল ‘‘আপকা পেপার তো সারে ভারত মেঁ বহোৎ চলতে হ্যয়। জরুর হামারে রিসর্ট কা কোই তসভির খিচা? ফিরভি...” ড্রয়ার থেকে একটা প্যাকেট বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

একটু ভ্যবাচ্যকা খেয়ে গেলাম। ঘুস দিচ্ছে না তো?

“ইয়ে হামারে রিসর্টকা কা ফোটো হ্যয়। মেহেরবানি কর দো একঠো ছাপ দে তো... ”

“জরুর... ইয়ে কোই বাৎ হ্যয়?” এই বিনা পয়সার আতিথিয়তার বাইরে এইটুকু করতে পারব না ওর জন্যে?

রিসর্টের স্টোরিটা তো একটা উপলক্ষ্য মাত্র। তোমাকে নিয়ে কোথাও বেরোবার জন্য মন আঁকুপাকু করছিল। তাই রিসর্টের স্টোরির নাম করে বেড়িয়ে পড়া। আমার মতো এক নগণ্য রিপোর্টারের কী ক্ষমতা আছে তোমাকে এই লাক্সারি ট্রিপে ঘোরানোর? হয়তো ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে চড়ে কোনো সস্তার হোটেলে থেকে ঘোরা যেত। কিন্তু অনামিকার কাছেই বা কী জবাব দিতাম? মাস-মাইনের চাকুরে, অত টাকাই বা জোগাড় হত কোত্থেকে? প্রশ্ন করত না অনামিকা?

“আপ ফিকর মত করিয়ে ভাইসাহাব। মৈ বড়িয়া সে ইয়ে রিসর্ট কা কাহানি লিখুঙ্গা। বিসওয়াস রখিয়ে। আপকো ভি এক কপি ভেজ দুঙ্গা।”

ঘরের বাইরে এসে মনে হল, এরা পাবলিসিটির জন্য লাখ লাখ টাকা ঢালছে। পেপারে, টিভি অ্যাডে। একদিন আমাকে একটু ফাইভ স্টার ট্রিটমেন্ট করাটা, এসবের কাছে কতটাই না নগণ্য। কিন্তু দু-কলম গুছিয়ে লিখতে পারলে আতিথেয়তার পরিসীমা সুদূরপ্রসারী। বাণিজ্যিক দিক দিয়ে এর ব্যাপ্তি অসীম।

ঘরে ঢুকতেই দেখলাম গোলাপি রঙের জগিং ড্রেস পরে খাটের ওপর পা ছড়িয়ে মোবাইলে কথা বলছ। আমাকে ঢুকতে দেখেই ‘আচ্ছা রাখছি’ বলে ফোনটা কেটে দিলে। বুঝলাম, আমার কাছে পরিচয় গোপন করলে।

ছবিগুলো স্যুটকেসে রেখে বললাম ‘‘লেকের ধারে একবার বেড়িয়ে এলে হয় না?”

“এই সন্ধেবেলা?” অবাক চোখে তাকালে আমার দিকে “ঘরে বসে থাকতে তোমার যেন মন চায় না।” একটু সরে পা জোড়া খাটের প্রান্তে ঝুলিয়ে একটু অনীহার স্বরে বললে “আবার জামাকাপড় পরতে হবে।”

“কেন, যা পরে আছ, তাই পরেই চল না কেন? এই ভর সন্ধেবেলা আমাদের দেখছেটাই বা কে?”

এবার তোমার চোখে-মুখে একটা প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল ‘‘বেশ। তবে চলো। গাড়িটা আছে তো?”

“ফোন করে দিচ্ছি। হোটেলেরই গাড়ি। কোথায় আর যাবে?”

জলের শব্দ ছাড়া বাকিটা নিস্তব্ধ। জ্যোৎস্নার শেষ আলোটুকু কেড়ে নিয়েছে অন্ধকার। সেই মৃদুমন্দ তরঙ্গে অন্তরের গভীরে এক নব প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুটছে। ঠিক তোমার হাতের রুপোলী থালার গোলাপটার মতো। হয়তো প্রস্ফুটিত হচ্ছে নতুন এক জাগরণের ছন্দে। গোলাপ কিন্তু কাঁটা নিয়েই জন্মায়। তাই শঙ্কা।

আলো-আঁধারিতে তোমার মুখটা ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না। একটা সিল্যুট যেন আমার মনের লেন্সে কায়া আর মায়ার যুগলবন্দি খেলছে।

কাকে ধরব?

এখন শুধু ভেসে যাওয়া অনুভূতির মায়া।

মন চাইছে অন্য কিছু।

না... না... মায়া নয়, কায়া।

তোমাকে একটু ছোঁয়া, একটু কাছে পাওয়া, সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে নিজের করে নেওয়া।

এই মুহূর্তে অতীত হয়ে যাক নির্বাক।

মায়া?

নাকি, আধো আবছায়ায় ছুটে চলা টুকরো মুহূর্ত মাত্র?

সেই বিপুল আঁধার ভেদ করে তোমার কণ্ঠ থেকে ভেসে এল,

নেই সেই পূর্ণিমা রাত

কিছু সুর কিছুটা আবেগ

এ কি শুরু না শেষ?

বোঝানোর নেই কোনো ভাষা...

ভুলকে সে ভুলে ভালোবাসা

সবই যেন ভালো লাগে...

কিছু বোঝাতে চাইছ আমাকে? হয়তো আঁধার আকাশে ওই তারার মধ্যে চেতনাটা একটা নতুন প্রদীপ জ্বালাবার চেষ্টা করছে। নেই-রঙের তুলিতে আঁকা এক ছন্দ, সুর, গন্ধ মাখা বর্ণচ্ছটায়। হয়তো মন হাতড়ে বেড়াচ্ছে একটা অস্পষ্ট ধূসর অবয়ব। নিভৃত অন্ধকারের মাঝে টিমটিম করে দিয়া জ্বালাতে চাইছে। একটা

অস্পষ্ট ছায়াকে ভরিয়ে দিতে চাইছে কায়ার সিল্যুটের মধ্যে মায়ার মোহজালে। দেখার আকাশে, অদেখাকে কাছে পাওয়ার এক নিভৃত অন্তরের নিঃশব্দ চাওয়া। চাওয়াটা যেন অনন্ত মহাশূন্যে ভাসছে... একটা নতুন রাগের না-লেখা স্বরলিপিতে... আবেগের ঘোরে... ভাষাহীন কোনো সুরে।

সে সুর তো তোমার।

সে সুর তো আমার।

সে সুর তো আমাদের দুজনের।

সে সুর তো যুগ-যুগান্তরের নিঃশব্দে গেঁথে যাওয়া মালা, অন্তহীন পথে। না-পাওয়া জীবনের রক্তিম অনন্ত রাগে। সুরের ঝর্ণার নিঃশব্দ প্লাবনে। যেখানে তান মিশে যায় লয়ে। যেখানে মন খুঁজে বেড়ায় দোসর অনাদি কালের পটভূমিতে। যেখানে কাল শুধু বারংবার কষ্ঠিপাথরে যাচাই করতে চায় তাকে, আগুনে। নীরব চাওয়ার মায়াময় বাহুডোরে। দিগন্তে বিস্তৃত শাশ্বত সত্যের রূপে।

আলতো করে পাশে বসে থাকা তোমার হাতে হাত রাখলাম। যেমন রেখেছিলাম বহুদিন আগে, ইডেনের নরম ঘাসের বিছানায়। একটু চাপ দিলাম। তুমি হাতটা সরিয়ে নিলে না।

ফিসফিস করে বললে ‘‘হোটেলে যাবে না?’’

সেই মুহূর্তে কল্পনা যেন নেমে এল বাস্তবের আঙিনায়। চাওয়াটা আর ওই দূরে দীপ জ্বালানো নক্ষত্রের স্বপ্ন দেখা, না-পাওয়া রাতের ঘুমে-জাগরণের দগ্ধ বহ্নি নয়। চাওয়াটাকে পেতে হবে বাস্তবের আঙিনাতে। তাকে মেলাতে হবে পরিপূর্ণতার প্রাসাদে। দেহ মন আজ এক হয়ে যাক ভীমতালের তীরে, অন্ধ তিমিরের গভীর সলিলে। আমাদের ভালোবাসার অঙ্গীকার থাকুক আজকের রাতের হিল্লোলে।

কটেজের দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠলাম!

একটা বিশাল ফুলের তোড়া টেবলের ওপর রাখা। পাশে রাংতায় মোড়া একটা বাক্স। ফুলের তোড়ার ওপর ছোট্ট একটা কার্ড। তাতে লেখা **ইট ওয়াজ আওয়ার প্লেসার টু সার্ভ ইউ... উইথ কমপ্লিমেন্টস ফ্রম সনোলিথ রিসট।**

বাথরুমে যেতে গিয়ে বললে ‘‘কে পাঠিয়েছে গো?’’

“হোটেল ম্যনেজমেন্ট।”

কী জানি কি ভাবছিলে সেই মুহূর্তে। বাথরুমে জলের শব্দ ইতি টেনে দিল আমার কল্পনার স্রোতে। রাংতা মোড়া বাক্সটা খুলে দেখলাম, যা অনুমান করেছিলাম আগেই। হুইস্কির বোতল। গ্লেন মর‍্যাঙ্গি সিঙ্গল মল্ট।

কটেজের বারান্দার সোফায় বসে চিকেন পকোড়া আর স্যাসেজ এর সঙ্গে হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছিলাম।

বেয়ারা জিজ্ঞেস করল ‘‘ডিনার কিতনে বজে দেগা? ঔর অভি অর্ডার দে দে তো বড়ি মেহেরবানি হোগা।”

“সাড়ে নও। অন্দর মেমসাব সে পুছ লেনা ডিনার মেঁ কেয়া খায়গি?”

এমনিতে বড় একটা সিগারেট খাই না। আজ যেন খেতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল। ফেরার পথে এক প্যাকেট কিনেও এনেছি। মনে হল, হয়তো বা মুহূর্তটা ধোঁয়ার মতো। পলক ফেলতে নিমেষে মিলিয়ে যায় বোঝবার আগেই। হয়তো আমাদের চাওয়া-পাওয়াটাও ঠিক একই পথ ধরে হাঁটে। সময়টাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায় একাকী নীরবে। রাতের গভীর যেন সেই অন্ধকারে উষ্ণ চাওয়ার কথা বলে। হুইস্কির মাদকতা সেই আগুনে আরও বেশি করে ঘি ঢালে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে তুমি জগিং ড্রেসটা ছেড়ে একটা পাতলা ফিনফিনে সুতির নাইটি পরে বসলে আমার পাশে।

সোফার হাতল ছুঁয়ে বললে ‘‘আমার ভডকাটা দিয়ে গেছে?”

“হ্যা” বোতলটার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম।

“তোমার অনেক পয়সা খসাচ্ছি? তাই না গো? আমার সঙ্গেও কিছু আছে। ক্রেডিট কার্ডও।”

“দরকার হলে চেয়ে নেব” উদাসীন, হুইস্কিতে চুমুক দিলাম।

তুমি স্যাসেজে কামড় দিয়ে, ভডকার গ্লাসটা হাতে তুলে সেই আঁধারের মায়াকে, কায়ার আকার দিয়ে ছিন্ন করে বললে “এখানে রাতটা তো বেশ। এমন রাত অনেকদিন আসেনি আমার জীবনে।”

সায় দিয়ে বললাম “আমারও... কখনো আসেনি আগে।”

সেই মুহূর্তে দুটি যুগল আত্মা মিশে গেল যুগ-যুগান্তরের স্রোতে। অনাদি কালের তেপান্তরে। সবাই তো সেই মুহূর্তে সেই কথাটাই বলতে চেয়েছে নীরবে, একাকী নিজের মনে। আজও অব্যক্ত থেকে গেছে না-বলা রেশ... চুপি চুপি একা, ব্যথার বেহাগের সুরে। তবুও উত্তর মেলেনি তার... যুগের প্রান্তরে চলার গতিপথে, সময়ের হাতে হাত রেখে, যুগ থেকে যুগান্তরে। আমরা তো খুঁজতে এসেছি সেই অচেনা মুহূর্তকে হৃদয় দিয়ে ভরে ।

আবার তোমাকে দেখলাম। অবয়বটা এখন বারান্দার আলোয় অনেক বেশি স্পষ্ট। ভীমতাল লেকের স্যিলুটের মতো ধূসর নয়। একটা উষ্ণ অনুভূতি ফণা তুলে উঠছে। ফিনফিনে নাইটির পেছনে লুকিয়ে থাকা অবয়ব বারবার সেই আগুনের সুর শোনাচ্ছে। এ তো মনের ভাবনা। তোমাকে বলিই বা কী করে সে কথা?

গ্লাসটা নামিয়ে রেখে হঠাৎ প্রশ্ন করলে “আচ্ছা আজকের রাতটা কি পৃথিবীকে ভুলে নিজের মতো করে নিতে পারি না?”

অনেক সংস্কার, বাধা লঙ্ঘন করে, ভীমতালের কোলে নিজেকে মেলে ধরতে। আমিও তো ঠিক সেটাই চাইছিলাম তোমাকে না-জেনে, না-চিনে নিজের মতো করে বরণ করে নিতে। আমার আবেগহীন উষ্ণতার শেষ প্রত্যুত্তর শুনতে।

মৃদু হেসে বললাম "ভডকা আর স্যাসেজটা চেখে দেখ। রাত তো এখনও ফুরিয়ে যায়নি। অনেক বাকি।"

"জীবনটাই তো রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। কবে শুনব ভৈরবীর সুর? কোন সে প্রভাতে?"

"আজকে না হয় দিনের শেষে তোমাকে উজাড় করে দিলাম। পাওয়া না-পাওয়ার হিসেব না হয় কাল বুঝে নেব।"

"ভোর হবে প্রতিদিনের মতো। তখনও কি তুমি থাকবে আমার না-বলা কথার স্রোতে?"

কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়ে হাত মেলে দিলাম তোমার কাঁধের ওপর। গালে নাক ঠেকিয়ে বললাম "ভালো লাগাটাই তো এই মুহূর্ত। তাকে কালকের চিন্তায় নষ্ট করে দিও না।"

সেই মুহূর্তে ভীমতালের অন্ধকার লেকের চারিধার বিলীন হয়ে গেল আমাদের যুগল চাওয়ার উষ্ণ বহ্নির উত্তপ্ত প্রলয়ে। যেন লেকের পাকস্থলী থেকে বেরিয়ে একটা সুনামি রচনা করছে আমাদের দেহের প্রতিটা কোষে। জ্বলছে দেহ, নীরব মন, চাইছে আলো, বাসনার স্রোতে। এই সুনামিটা ক্রমশ লেকের গভীর থেকে আমাদের দেহে কামনার লাভা ছড়াচ্ছে প্রতিটা কোষ জুড়ে।

আর নয়...

আর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারব না নিজেকে। বারান্দার গদি থেকে উঠে পড়লাম।

"কোথায় চললে?" সব জেনেও বোকার মতো প্রশ্ন।

"ঘরে..."

বড় বাতিটা নিভিয়ে দিলাম। বেড-সাইড ল্যাম্পের আলোটা একটা মায়াবি ঘোর সৃষ্টি করেছে। খাটে শুয়ে গোটা হাতটা দিয়ে চোখ দুটো আড়াল করলাম। নেশার রংটাকে আলো-আঁধারে উপভোগ করতে।

জানি না কতক্ষণ!

সৌম্যদার বিয়েতে তোমাকে দেখা মটকা শাড়ির আবরণ ক্রমশ হাওয়ায় উড়ে হারিয়ে যাচ্ছে কল্পনার মায়াবী স্বপ্নে। এখন আর বিয়েবাড়ির সাজে দেখতে পাচ্ছি না। তোমার হাতের গোলাপটাও যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। তুমি সজ্জাহীন, অপরূপা। সেই শ্যামলা অবয়বটা ভেসে রয়েছে চোখের সামনে। নিটোল চোখের গাঢ় দৃষ্টি, উষ্ণ অধর, তোমার শাঁখের মতো চিবুক, তোমার সুন্দর গলা, তোমার তুলতুলে জ্যোৎস্নার মতো কান, তোমার বিদ্রোহ করা স্তব্ধ স্তন, তোমার ঢেউ খেলানো কোমরের মধ্যে দীপ্ত গভীর নাভি,

আকর্ষণীয় পরিপূর্ণ নিতম্ব যেন পাহাড়ের বুক চিরে খরস্রোতা নদীর কুলকুল রবে হারিয়ে যাচ্ছে কোনো অজানা না-দেখা গহনে...

আমিও হারিয়ে গেছি স্বপ্নের বাসর সজ্জায়। লক্ষ করিনি, ঘরে এসেছ। বুঝতে পারলাম, যখন হাতটা সরিয়ে দিলে চোখ থেকে।

"কী স্বপ্ন দেখছিলে এতক্ষণ? আমি তোমার মায়াবী কল্পনা নই। জাস্ট জীবন্ত, রক্ত মাংস দিয়ে গড়া... তোমারই কস্তূরী।"

বলতে গিয়ে চুম্বন দিলে আমার কপালে।

"হুশ হয়েছে? স্বপ্ন থেকে ফিরে আসার সময় এবার এসেছে!"

দুজনের ঠোঁট গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। বুকে স্তনের দুর্বার চাপ অজানা ছবি এঁকে দিচ্ছে। নিতম্বের স্পর্শে উল্কাপাত। তোমাকে দুহাতে লেপটে নিলাম দেহে। আলো-আঁধারিতে তোমার শিথিল নাইটি লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে। আঁকিবুকি কাটতে শুরু করেছ সারা শরীরে। মুক্তি দিতে চাইছ আমাকে! চিরন্তন আভরণ থেকে নির্বেদ আলিঙ্গনের প্রতীক্ষায়...

সেই মুহূর্তে নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে থেকে বাঁধভাঙা বহ্নি ছড়িয়ে গেল দেহের প্রতিটা রন্ধ্রে। মুক্তি চাই। এই দেহ, এই মন, এই আবেগ, এই সময়, যেন সেই সুর গাইছে। আকাশ বাতাস, দেহ মন কেঁপে উঠল। আছড়ে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে দুজনের একাকিত্বকে। অনাদি বাসনার দ্বার উন্মুক্ত... ঝড় উঠেছে দেহে-মনে-শরীরে উষ্ণতার আকাশে।

দুজনেই অতীত ও ভবিষ্যৎ ভুলে এভাবেই হারিয়ে গেলাম বর্তমানের সেই প্রলয়ে। কালচক্র পিছনে ফেলে। আত্মার শ্বাস-প্রশ্বাসে। ঝর্ণার জলপ্রপাতে।

শ্বাসের সপ্তম নিখাদ জানান দিয়ে গেল, আমরা হারিয়ে গেছি পার্থিব চাহিদার অসীমে।

তোমাকে...

কৌস্তুরী



অষ্টম চিঠি

কৌস্তুভ

অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলাম।

সন্ধ্যা তখন ধীর পায়ে ছেয়ে ফেলেছে কিছুক্ষণ আগে দেখা হিমেল চূড়াগুলো। কালো আবরণ বিছিয়ে দিয়েছে দিগন্তের বনরাশির ওপর। গাঢ় হয়ে গুটি গুটি পায়ে নামছে রাত্রি। অন্ধকার আসছে কোমল আচ্ছাদন বিছিয়ে। রাতের অন্ধকারে সন্ধ্যাতারার আগরবাতি জ্বালিয়ে। শান্ত নীরবতার কোলে। স্থির, শিথিল। পাহাড়ের বধির বুকে গান বয়ে আনছে...

বেয়ারা হ্যাজাক নিয়ে এল।

আগেই শুনেছিলাম, এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই। আলো ভালো লাগছে না। কাল রাতে জ্বলে ওঠা দেহের আলোটা আজ যেন কেমন হিম হয়ে গেছে রাত্রির কোলে। এখন শুধু প্রতীক্ষা অমাবস্যার অন্ধকারটাকে একবার পরখ করে দেখার।

কালকের জ্বলে ওঠা উত্তপ্ত বহ্নি, আজ যেন মিশে গেছে নিশীথের স্বপ্নভঙ্গে। আজ আর দাবদাহ নেই। উষ্ণতা মিছেই ঘুরে ফেরা ছলনা। সৈকত থেকে তিমির হয়ে তুমি... কায়াটা ভিন্ন হলেও উষ্ণতার মধ্যে কোনো তফাত নেই! সেই দেহ, সেই চাওয়া, সেই উত্তাপ, সেই চিরপরিচিত জলপ্রপাত। সেখানে কোনো আমি নেই। আছে শুধু আমার উন্মুক্ত দেহের, আমার উদ্ধত স্তনের, আমার অনাবৃত যৌবনের সরব প্রতিধ্বনি। নিয়ত নিজেকে হারিয়ে ফেলার অভ্যাস।

"ইধর নেহি। দূর ওহ থম্বে কে পিছে রখ দে না।"

থাম্বার আড়ালে একটা বেতের মোড়ার ওপর হ্যাজাকটা রেখে বেয়ারা চলে গেল। রেখে গেল বারান্দার কোণে আলো-আঁধারির লুকোচুরি। নিজেকে আবার ভাসিয়ে দিলাম শূন্যতার ভেলায়।

সেখানেও আমি নেই!

ফেলে আসা যুগান্তরের পাণ্ডুলিপি রয়েছে নিত্য নতুন সাজে। লাজের সংজ্ঞা পালটে গেছে। পার্থিব সার ভেদ করলেও, পৌছনো যাবে না আমার হৃদয়ের অন্তরে। মুহূর্ত হারিয়ে গেছে কোনো এক প্রাণহীন হিম শীতল কোণে।

এই কী ভালোবাসা!

এই কী প্রেম!

হতে পারে এটাই প্রেমের পরিণতি। হতে পারে ভালোবাসার সদগতি। আমি তো মেতেছি ভালোবাসার গুঞ্জনে।

দেহের উত্তাপে সজাগ করতে মন চাইল সামনে রাখা কফির মগে একটা চুমুক।

মাসার জঙ্গল রিসর্টটা বিনসারের জঙ্গলের মধ্যে। চারদিকে ওক, দেওদার, পাইনের সমারহ। আরেকটা অচেনা গাছের দিকে তাকিয়ে বললাম "এ গাছটার নাম কী? তুমি জানো?"

"রডোডেনড্রন" সাবলীল জবাব।

আবাক হয়ে ভাবলাম, গাছের নামগুলো জানলে কোত্থেকে? তুমি কি বটানি পড়েছ? আমি তো কিছুই জানি না। এমনকী এখনও চিনি না তোমাকে। শুধু কাল রাতে তোমার দেহের খোলসটা নিঙড়ে ফেলে খুঁজেছি তোমাকে। রাতের কোলে বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া উত্তপ্ত আলিঙ্গন কখন যে ভেঙে পড়েছিল তোমার নির্ঝরের মতো বেরিয়ে আসা স্রোতে, গোমুখে মহাদেবের জটা থেকে হরিদ্বারের শান্ত গঙ্গার ফল্গুধারার গহ্বরে... বহুদিনের স্বপ্ন দিয়ে গড়া সৌধ মিটিয়ে দিয়েছিল পুঞ্জিভূত কামনার ক্ষয়ে যাওয়া ভিতে।

এই কী ভালোবাসা?

না কি, অন্ন, বস্ত্র, আচ্ছাদনের মতো জীবনের নিত্য পিপাসা?

তাহলে সৈকত তিমিরের থেকে তুমি আলাদা হলে কোথায়? এ হতে পারে না। ভালোবাসার অন্তঃপুর শুধু স্রোতের তরঙ্গ নয়। কোনে এক বর্ণমাখা কাব্য। শকুন্তলা-দুষ্মন্ত, পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা, লায়লা-মজনু, কিংবা ট্রেনের যুবক-যুবতীর মতো পুরনো কোনো গল্প। এ হতেই পারে না আমার স্বপ্নে দেখা স্বর্গ। এ হতে পারে না ভালোবাসার বিন্দু বিসর্গ। এ হতে পারে না কোনো মধুমাখা জ্যোৎস্না। এ হতে পারে না তোমার চোখের দিকে তাকানো মৃগনয়না। এ হতে পারে না সংসারের বালুচরের কোনো রেশ। এ হতে পারে না আমার দেখা, চেনা, জানা পুরনো স্বপ্নের নতুন মোড়কে ঢাকা এক-ই ছন্দের রেশ।

নন্দাদেবী, মৃগতুনি, মাইকটোলি ও ত্রিশূল পাহাড়ের সারিগুলো আবছায়ায় হারিয়ে যাচ্ছিল, দিনান্তের শেষে হামাগুড়ি দেওয়া রাতের আঁচলে। যেন অস্তরাগের শেষ ঝালাটা বাজিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের কোণে নীরবে। আমি যেন এখনও শুনতে পাচ্ছি বনবীথিকার পটভুমিতে পাহাড়ের গুঞ্জন। শুনছি পাহাড়ের কোলে নতুন শব্দের সারির ভেতরের গান। আমি যেন শুনতে পাচ্ছি, অন্ধকারের ধূসরে জীবনের নব-ঐকতান।

স্নানের পর গরম কফির স্বাদ বেশ আরামদায়ক। একাই বসে তাকিয়েছিলাম আঁধার নির্জনতার দিকে। সেখানে অনন্ত রাত্রি মহাসংগীত গাইছে। আমার নিঃশেষ হয়ে যাওয়া প্রাণ তার-ই প্রতিধ্বনি শুনছে।

চাওয়াটা তো অনেক দিন ধরেই জমাট বাঁধছিল। বাঁচার খিদে তো মিটছিল সৈকতের রোজগারে। দেহের খিদেটা তখনও নিষ্পেষিত। তাকে খুঁজতে গিয়ে, কাল রাতে হারিয়ে গেল স্বপ্নে পাওয়া নতুন সুর। বহুদিন ধরে খিদেটা তুষের আগুনের মতো ধিক-ধিক করে জ্বলছিল। কাল রাতে অহল্যা যেন মুক্তি পেল রামচন্দ্রের পূর্ণ আলিঙ্গনে।

স্বপ্নভঙ্গ হল মোহ থেকে সত্যের উদ্ঘাটনে।

স্নান সেরে সোফায় বসে কফির কাপটা তুলে নিলে হাতে।

"ইশ! ঠান্ডা হয়ে গেছে..."

"গরম করে দিতে বলি?"

"না থাক। পরে আরেক কাপ চেয়ে নেব।" একটু থেমে নির্জনতার দিকে তাকিয়ে বললে "কেমন লাগছে এখানে?"

"ঠিক বুঝলাম না?" আমি সরাসরি প্রশ্ন করলাম তোমাকে।

"মানে এই রির্সটটা।"

"ওই জাঁক-জমক করা স্যুটের থেকে অনেক ভালো। যাই বল না কেন, এই কাঠের ফ্লোর, এই ইটের প্যানেল করা দেওয়াল, ইলেকট্রিসিটি ছাড়া, ওই হ্যাজাকের আলোর একটা নিজস্ব মাধুর্য আছে। এখনকার হোটেল-রিসর্টে চাকচিক্যের মধ্যে কেমন যেন হারিয়ে যাই। মনে হয়, ওসব মেকি, সাজানো একটা মিথ্যে স্বপ্ন। আমি তো স্বপ্ন ছেড়ে নেমেছি পথের প্রান্তে। প্রকৃতির ছোঁয়ার অভাব এখনও পড়ে আছে সেই সুদূর দিগন্তে..."

জানি না তোমায় কতটা আঘাত দিলাম। অকপটে সত্যি বলে হয়তো তোমার স্বপ্নজাল দিয়েছি চুরমার করে। তবু এখনও যে তোমাকে ভালোবাসি, এরপরেও বলব কী করে? ভালোবাসা তো কাল রাতের মোহ ভরা নয়। কালকের বর্তমান, আজ ভবিষ্যৎ হয়ে গেছে সেকথা ভেবে কী হবে?

জবাব দিলে না। আমার মনের কথা শুনলে শুধু নিঃশব্দে। হয়তো বা চিনছিলে আমার আমিকে, নিজের মতো করে।

কীসে আনন্দ?

কীসে আমার মুক্তি?

কীসে পরিতৃপ্তি?

মোবাইলটা হাতে নিয়ে একবার চোখ বোলালাম। কোনো সিগন্যাল নেই! মানে বাড়ির লোকেরা এই মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পারবে না আমার সঙ্গে।

সভ্যতার থেকে নিমেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাচীনতাকে যেমন দেখা যায়, নিজেকেও হয়তো আরো একটু বেশি কাছে পাওয়া যায়।

এই মুহূর্তে...

সেই নির্জনতার বড় প্রয়োজন আমার।

কোলাহল আলো মেশা রিসর্টে নয়।

সেখানে আড়ম্বরের রূপটুকু কথা কয়।

ভালোবাসা?

তাও নয়।

এখন শুধু তুমি আমায় দেখে যাও আমার মতো করে।

সময় হয়েছে নিজেকে ফিরে দেখার। স্বপ্নের মায়া কাটিয়ে সত্যের নীরবতায়, অন্ধকারে।

সৈকত পিঙ্কুর পৃথিবীটা যেমন সত্য, কালকের রাতটাও তো তেমনই বাস্তবের আরেক লীলা। উত্তরসূরি গড়ার এক আজব কারখানা। এর মধ্যে তুমি কোথায় স্বতন্ত্র, আর আমি কোথায় আলাদা? কামনার পরিতৃপ্তির মধ্যে কে যেন হঠাৎ বাসনার ফিউসটা উড়িয়ে দিয়েছে নিমেষে। বারবার প্রশ্নটা ঘোরাফেরা করছে আমার প্রতিটা রক্তকোষে। দৈনন্দিন প্রাতকৃত্যের মতো এটারও কি চাওয়ার খুব প্রয়োজন আছে?

অন্ধকার নীরবতা অতীত আর বর্তমানকে একই জায়গায় এনে ফেলেছে। কামনা মিশে গেছে কালকের উষ্ণ কলেবরে।

মাঝখানে কিছুই নেই।

সময় নেই!

সমাজ নেই!

সংস্কার নেই!

চাওয়াটা যেন আমার-ই মনগড়া একটা মুহূর্তের দোলা। সেই দোলার মধ্যে নেই কোনো বৈচিত্রের খেলা। একটা দেহ আরেকটা দেহকে এক মুহূর্তে নিবিড় আলিঙ্গন করছে। সেটা তো যে কেউ হতে পারে? যে কোনো সময়? তুমি, তিমির, সৈকত অথবা অন্য কেউ। এই অন্ধকারে ঢাকা পাহাড়ের শিখর জুড়ে ভালোবাসার সঙ্গে তার সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্র যোগসূত্রটা, যেন আমার চিন্তার মায়াজালে একটা দোলাচল সৃষ্টি করেছে। সেই আবর্তে খুঁজছি নতুন কোনো দীপশিখা। হ্যাজাকের আলোয় এঁকে দেবে বলিরেখা?

এক না-পাওয়া কল্পনা। এখানে আমি নেই। তুমিও নেই। সেই পুরোনো পাণ্ডুলিপি বৃথাই পুনরুদ্ধারের আশা...

“কী ভাবছ?”

“কিছু না” আমার নির্লিপ্ত জবাব।

“কিছু তো একটা...”

“আচ্ছা, কাল রাতে আমার দেহটাকে না পেলেও কি তুমি আমায় ভালোবাসতে?”

প্রশ্নে চমকে উঠলে।

তোমার হয়তো অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি, আমার ভেতরে কী চলছে। কোন আবর্তে আমি নিঃশব্দে ঘুরপাক খাচ্ছি তোমার সঙ্গে বসে, এই মুহূর্তে।

“হ্যাঁ... মানে... ” আমতা আমতা করে “তুমি কি ভাবছ এটা ইনফ্যাচুয়েশন?”

“নাঃ... সেটা নয়, তা জানি। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের চাহিদার পূর্ণতা কি লুকিয়ে আছে? সেটাই ভাবছি...” একটু থেমে বললাম “যদি তাই হত তবে কি হঠাৎ এভাবে তোমার সঙ্গে একা বেড়িয়ে আসতাম এক কথায় ঝট করে?”

“জানি। হয়তো অজান্তে, আমাদের না-পাওয়াটাকে কাছে পেতে আমরা খুঁজছি নানা দিক থেকে। যা হারিয়েছি, যা পাইনি, তাকেই তো খুঁজে নেওয়ার জন্য তোমার সঙ্গে আসা। তোমার ভালো লাগাকে বুঝতেই তো তোমাকে ভালোবাসা।”

“আমি না হয়ে অন্য কেউ হলে?” আবার ভ্যাবাচ্যাকা খেলে।

“বলতে পারব না। এর আগে তো কখনও এমন হয়নি। তুমিই প্রথম...” হঠাৎ থেমে গেলে। ক্ষণিকের নীরবতা, বললে “হয়তো আমাদের জীবনের অস্থিরাতার প্রতিটা বাঁকে, এক না-জানা স্থায়িত্ব সবাই খুঁজে বেড়াই, অলক্ষ্যে। বিজ্ঞানীরা বলে এন্ডরফিনস। আমি বলি, কল্পনার একটা নিশ্চিত খেলাঘর।”

ধাক্কা লাগল।

কল্পনা!

দুজনেই একই কথা ভাবছি, নিজেদের মতো করে। আমার কাছে দেহটা যেন গলে-মিশে-পচে গেছে সময়ের স্রোতে। তুমি হয়তো এখনও পড়ে আছ দেহ-মনের যুগলবন্দির সন্ধানে। ছন্দটা মিললেও, চিন্তাধারার ব্যবধানটা কোথায় যেন আঘাত করছে।

সবটাই কি আমাদের কল্পনা? সবটাই কি অদেখাকে দেখা? না-পাওয়াকে পাওয়ার চেষ্টা? না-চেনাকে নতুন রূপে চেনা?

সম্বিৎ ফিরতে বললে ‘‘কিছু খাবার বলেছ?’’

“না, এখনও বলিনি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।”

“কী খাবে?”

“পেঁয়াজি। আরেক কাপ গরম কফি হলে ভালো হত।”

মুচমুচে পেঁয়াজির সঙ্গে গরমাগরম কফি।

আহঃ...

আগেরটা তো স্নান করতে গিয়ে ঠান্ডা হয়ে গেল। এবার একটু জমিয়ে বসে খাওয়া যাবে। অন্ধকারে নিস্তব্ধ অনুভবে। হয়তো কালকের বহ্নিশিখা আবার ঝিলিক দেবে আঁধারের আবছায়াতে। হ্যাজাকের মৃদু আলো-আঁধারিতে।

তবুও আশা আর চাওয়ার কি কোনো শেষ আছে কোথাও?

কখন যে কফি খাওয়া হয়ে গেছে দুজনেরই খেয়াল নেই। কখন যে পেঁয়াজির কয়েক টুকরগুলো প্লেটে শুকনো হয়ে পড়ে আছে লক্ষ্যই করিনি।

থাম্বার ওপাশ থেকে হ্যাজাকের আবছা আলো আমাদের সিল্যুটকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। দেখতে গিয়েও যেন দেখা যাচ্ছে না। হ্যাজাকের শব্দ, নিঝুম রাতে একঘেয়ে আঁধারে বেজে চলেছে বিরামহীন ছন্দে। বেহাগের সুর যেন না-চেনা ছন্দ বাজছে।

তোমার মুখ আবছা। মনে হচ্ছে তুমিও হারিয়ে গেছ কোনো একান্ত জগতে।

সেখানে আমি নেই।

তুমিও নেই।

শুধু আছে আত্মবিক্ষা।

কী ফেলে এসেছি, কী পেতে চাইছি...

যুগলের মহা-সন্ধিক্ষণ।

বনলতা সেন শুধু মনের কল্পনাস্রোতে ভেসে থাকা মুহূর্ত মাত্র। তাই নিয়ে যত ছন্দ, কাব্য, রোমান্সের ইমেজারিযত্রতত্র। কতই না বিশ্লেষণ। বহু লোকের অধিবেশন।

অতীতকে আঁকড়ে ধরে বর্তমানকে না-দেখার লুকোচুরি খেলা?

লক্ষ করছিলাম, ওই অন্ধকারের মধ্যে থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা হ্যাজাকের দিকে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসছে। আলোর পিপাসায়। অথবা পুরনো রীতির গতে বাঁধা নেশায়। মরীচিকার দিকে ছুটে বেড়ানোর কোনো না-চেনা আশায়। হঠাৎ চোখে পড়ল অনেক পোকা আলোর উত্তাপে আছড়ে পড়ছে বেতের মোড়ার চারপাশে। ডানা ঝাপটাচ্ছে তবুও উড়তে পারছে না। আধমরা হয়ে ছটফট করছে বৃথা। মৃত্যু ঠাঁই দিচ্ছে না।

উড়তেও দিচ্ছে না জীবন। মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে কাতরাচ্ছে ঝিঁ-ঝিঁ শব্দের ঘেরাটোপে। ঠিক যেন শহুরে গ্ল্যামার-সর্বস্ব জীবনে মরেও বেঁচে থাকা। লেপটে আছে দাওয়ার মাটিতে। ছটফট করছে, চেষ্টা করছে, তবুও পারছে না স্বভাবিক জীবনে ফিরতে। এর মধ্যে কোথা থেকে একটা ফিঙে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে উড়ন্ত গুটি কতক জীবন।

নির্জন পাহাড়ে ক্ষণজীবী পোকাগুলোর সঙ্গে এখনকার নগরজীবনের কী আশ্চর্য মিল। প্রকৃতি মানুষকে পোকার থেকে বেশি খুব কিছু দেয়নি। উত্তরণের তাগিদে মানুষ ছুটতে শুরু করে অবিকল পোকার নির্বুদ্ধিতায়। চেতনার অভাবে টের পায় না সীমা।

আমার স্বামী আছে। মেয়েও আছে। অন্নসংস্থানের অভাব নেই। তবুও সব ছেড়ে, কেনই বা তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি? কীসের টানে বাঁধা পড়লাম তোমার উষ্ণ বাহুডোরে?

সে তো ক্ষণিকের প্রাপ্তি। নাকি, চেয়েও না-পাওয়ার অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা। ওই পোকাগুলোর মতো।

আমাদের জীবনটাই আসলে আলোর নিশানায় ছুটে যাওয়া এক-একটি মুহূর্ত। সেই আলো আঁধারের বুক চিরে বেরিয়ে আসা এক স্বপ্নিল মায়া। তাকে এড়ানো নিতান্ত কঠিন। সে অনেক বেশি চালাক, কল্পনায় মসৃণ। নানা রূপের সাজে না-চেনা আবরণে অজান্তে না-পাওয়া স্বপ্নের সজীব মায়াজাল।

তোমারও কী ঠিক তাই মনে হচ্ছিল?

জানি না।

ওরা বলে ভালোবাসলে মনের কথা পড়া যায়। আমি তো এখনও কিছুই বুঝছি না।

সামনের পাহাড়গুলো মিশে গেছে অন্ধকারে। শুধু দেখছি ছটফট করা পোকাগুলোকে। আলোর রোশনাইটাও সুদূর দিগন্তে বলিরেখার মতো আবছা। একটা পোকাও তো আদৌ আলোটাকে স্পর্শ করতে পারছে না। আমিই বা কোন সাহসে তাকে ছুঁয়ে দেখব! ছুঁতে চাইলেও, ওটা যেন মরীচিকা হয়ে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। ধরতে গিয়ে, বুঝতে গিয়ে, জানতে গিয়ে, অনুভব করতে গিয়েও অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অজানা কোনো সময়। আমার ভাবনা থেমে গেছে সেখানেই। সেই মুহূর্তেই। তালহীন চিন্তার আশ্রয়ে।

এতক্ষণ একসঙ্গে কাটিয়েও তো তোমাকে চেনা হল না। এখনও তোমাকে পাওয়ার স্বপ্ন রয়ে গেছে। এতদিন পড়েছিলাম জাগতিক তন্দ্রায় মগ্ন হয়ে। কাল রাতে সেই তন্দ্রার স্বপ্নভঙ্গ। স্বপ্নের প্রাসাদটাকে নয় হাওয়ায় ছুড়ে দিলাম। বাসরের বাইরে বেরিয়েই নয় তোমাকে নিজের করে পেলাম। সময়ের বৈতরণি বইছে এখনও। কোথায় কোন মুহূর্তে তুমি আমার হবে?

"পেঁয়াজিগুলো যে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। আর কটা ভাজতে বলব?"

"না থাক" সংক্ষিপ্ত প্রাণহীন জবাব দিলাম। অনেক না-বলা কথাকে নীরবতা বলে দেয়। স্বপ্নে ওড়া গাঙচিলটা যেন ওই পোকাগুলোর মতো মুখ থুবড়ে পড়ল। আমি তো এখনও উড়তে চাই বিহঙ্গের মতো সর্বদাই সর্বক্ষণ। আমাদের জীবনটাও হয়তো ঠিক তাই।

ধরতে চাই...

উড়তে চাই...

পেতে চাই...

পেখম মেলে ময়ূরের মতো অবিরাম নেচে বেড়াতে চাই।

সেই নেশার ঘোরে ছুটছি, মরীচিকার পেছনে আলেয়ার স্বপ্নে।

সময়ের হিসেবটা যেন ওই তো সরলরেখা ধরে এগিয়ে চলেছে। কালকের মুহূর্তগুলো আজ বিগত, অতীত। আজকের বর্তমান কাল চলে যাবে অতীত দিনে, স্মৃতির পাতায়। পুব আবার ঢলে পড়বে গতানুগতিক, পশ্চিমের কোলে। আবার ওই পোকাগুলোর মতো ছুটব না-পাওয়া, না-দেখা, না-চেনা ভবিষ্যতের অন্ধকারে। আমাদের রোজকার জীবনকে ছাঁচে ফেলতে কোনো মিথ্যে স্বপ্নের সাজানো অঙ্কে।

কাল পর্যন্ত এই সরলরেখাটা ছুটে চলেছিল নিজের গতিতে, নিজস্ব রূপে, আপন ঢঙে সেজে ওঠার আনন্দে। দিনান্তের মেলায়। এই মুহূর্তে তাকে ভাসিয়ে দিয়েছি সত্যের ভেলায়। অনেক কিছু করার ছিল কাল পর্যন্ত। অনেক জায়গা তো দেখা হল। পৃথিবীর যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈচিত্রকে নানা ভাবে দেখা, পাওয়া, ধরে রাখা, সব মিলিয়ে মননের চেষ্টা। আজ সে সবই থেমে গেছে, বিনসারের অরণ্যের নৈঃশব্দ্যে। দেহমন ক্লান্ত, ধূসর।

দূরে যে নক্ষত্রগুলো আজ জ্বলছে, হয়তো তা নিভে গেছে সহস্র কোটি বছর আগে। ওদের দিকে চেয়ে একদিন বলেছিলাম তোমায় ''তারাগুলোর নাম বলতে পারো? কোনটা বিশাখা? কোনটা স্বাতী? কোনটাই বা অরুন্ধতী?''

"তা তো জানি না। তোমার হাতে হাত রেখে শিখে নেব কোনোদিন।"

ভালোবাসার দিগন্তে দাঁড়িয়ে আমরা তারা গোনার চেষ্টা করছিলাম সারাক্ষণ। সন্ধ্যাতারা তো আমরা দুজনেই জ্বালাতে চাই। কী করে বুঝব কোনটা আজও জ্বলছে, এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন সেটাই। বাকি তো শুধু মায়া। হাত বাড়ালেই বা কী করে পাই? তাকে ধরতে গেলে পার হতে হবে সহস্র প্রান্তরের ছায়া। যুগ-যুগান্ত ইতিহাসকে ধরে কি হাওয়ায় ভাসব?

হ্যাজাকের আলোটা তো সময়ের প্রতিবিম্ব নয়। হয়তো এই অন্ধকারটাই আসলে উজ্জ্বল। ভালোবাসা, আবেগ, চাওয়া, পাওয়া সব কিছুই সেই আলোর বাইরে। আলোর পানে কী পিপীলিকার মতো ছুটব দুজনে,

তার টানে?

অপ্রকাশিতটাই একমেবাদ্বিতীয়ম, সময়। সেখানে হারিয়ে গেছে আমাদের ক্ষণকাল। স্মৃতি-বিস্মৃতির দ্বারে করাঘাত করতে। মিছেই তাকে আমরা খুঁজছি জাগতিক ছকে। সেখানে শুধু বিশাল এক অন্ধকার মহাকালের মহামন্ত্র। আজও হইনি তো সেই মন্ত্রে দীক্ষিত। কী করে জানব আসবে কবে সেই সকাল? পাখির কলকাকলিতে ভরিয়ে দেবে আঁধারের ক্ষণকাল। সময়কে পেছনে ফেলে ছুটব বিভোর।

তুমি আমার দিকে তাকিয়ে, সেই আলো-আঁধারের মেলায় বললে ‘‘দেখেছ... পোকাগুলো কেমন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আমারাও তাকাচ্ছি না ওদের দিকে।’’

বিচলিত জবাব দিলাম ‘‘কেউ তো বাঁচাচ্ছে না ওদের।’’

“কেন বল-তো দেখি?” ফিরে তাকালাম তোমার দিকে।

“ওরা সময়ের গতিপথে হারিয়ে গেছে। মৃত্যুরও সময় নেই ওদের ফিরে দেখার। ওরা খুঁজছে অন্ধকার থেকে সাইফন করা কোনো কৃত্রিম আলো। তুলে আনতে চাইছে আঁধারের থেকে ধার করা যৎসামান্য আভা। তাই দিয়েই ভরাতে চাইছে অর্থহীন জীবনের শোভা।”

আবার বললাম ‘‘তবে ধার করা জ্যোৎস্নার আলোর পেছনে ছুটছে কেনই বা ওরা?’’

“মিথ্যেই খুঁজছে অনন্ত শূন্যে আলোর লৌহকপাটের সোনার চাবিকাঠি। বন্ধ দরজাটার বাইরে দাঁড়িয়ে চাইছে ওপারের না-দেখা, না-ফোটা সাদা দোপাটি।”

সেই মোহে তো ছুটছে সকলেই। মরছে। আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে ছুটতে চাইছে। দরজাটার কপাট কিন্তু বন্ধই থেকে যাচ্ছে। সোনার কাঠি গরমিল, তাই রুপোর চাবি সাজিয়ে। আমরাও তো ঠিক তাই। ছটফট করছি ওই ঝলসে যাওয়া পোকাগুলোর মতো। পাচ্ছি না নিজেদের ঠাঁই।

এত ঘোরাই সার। এত দেখা, চেনা, কাছে পাওয়া, আশা, ভালোবাসা, তবুও অধরা রয়ে গেল কালস্রোতে না-পাওয়া চাবিটার নেশা। চাবিটা তো হারিয়ে গেছে ওই মহাশূন্যের বুকে। এখনও তো তার ঠিকানা পেলাম না ইহলোকে। এই ক’দিন হাত ধরে পাশাপাশি চলে তোমার না-দেখা ধ্রুবতারাকে। সে কি সত্যি সত্যি নিভে গেছে বহুদিন আগে?

“ডেজা ভু।” হাওয়ায় শব্দটা ছুড়ে দিলে।

ফিরে তাকালাম। কী ভাবছিলে বল দেখি? পূর্বজন্মের সুফল-কুফল কি বিচার করতে বসলে এখন থেকেই? এ কী অতীতের আয়নায় বর্তমানের মুখ? না কি ভবিষ্যতের বালুচরে খুঁজে বেড়ানো সেই না-পাওয়া চিরসুখ?

কিছুটা বিষণ্ণ হয়েই বললাম ‘‘ওই যে পোকাগুলো হ্যাজাকের কাছে এসে মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করছে আমাদের জীবনটাও তো ঠিক ওদেরই মতো। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে বেঁচে থাকব। কেটে যাবে সময়ের প্রবাহ। ভূত থেকে ভবিষ্যতে, এভাবে কী কখনও!’’

“তার মানে?” তুমি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছিলে না, কী বলতে চাইছি আমি। তোমার আকাশ এখনও স্বপ্নময় ছবি। কী করে বোঝাব তোমাকে চেতনার সহজ রেখা?

“ভালোবাসার আসমানি রঙে ভাসব। দ্বৈত জ্যোৎস্নায় প্রতিদিন করব অবগাহন। জীবন থেকে মৃত্যুকে সাজাতে চাইব নিজেদের মতো করে। তারই মধ্যে কল্পনার মালা গাঁথা চলবে। ছবি আঁকব। স্বপ্ন দেখব প্রাণ ভরে। কেউ আপন, কেউ বা পর বলে কাছে টেনে নেবে। সরল বিশ্বাসে তাদের কোলে মুখ লুকোব।”

তুমি জবাব দিতে গিয়ে একটু থমকালে। আমার কথার ছন্দটাকে হয়তো বুঝতে চাইছিলে।

যেদিন তোমায় দেখেছিলাম, সেই মুহূর্তে কেন ভাবিনি এই কথাটা? সে কি তোমাকে মুহূর্তে পাওয়ার আশায়?

একটু ভেবে তুমি বললে ‘‘আইনস্টাইন-এর থিওরি অফ রিলেটিভিটিও কি তবে মিথ্যে?’’

“ঠিক বুঝলাম না। মিথ্যে হতে যাবে কেন?”

এই অন্ধকারের কি কোনো রোশনাই নেই?

রং নেই?

বর্ণ নেই?

অনুভূতি নেই?

সবটাই কী তবে মিথ্যে...

“কেন থাকবে না? এই নৈঃশব্দ্যের মধ্যেই তো জাগতিক দীপাবলি। আমাদের মনে নিছক কল্পনার মধ্যে নয়।”

“তবে কি সেটাও ভুল?” অবুঝের মতো প্রশ্ন করলাম।

“হয়তো নয়। কসমিক ফিলসফি নিয়ে আইনস্টাইন অনেক ভেবেছিলেন। আমি শুধু অঙ্কটার কথা বলছি। প্রাণীর পঞ্চেন্দ্রিয় তো জাগতিক কল্পনার আঁতুড়। ওই আঁতুড়ঘরটা খালি করে দিলে কাল রাতে। তবে কী নিয়ে বাঁচব আগামী প্রভাতে!”

“সবটাই কি তবে মিথ্যে? তোমার সঙ্গে বেড়িয়ে পড়া থেকে শুরু করে কাল রাতের ছোঁয়া?” প্রশ্ন আমার।

“আজ-কাল-পরশু যদি নাই থাকে। তবে কালকেটা আজ হয়ে যাবে, আজকেটা কাল।”

"তাহলে পরশুটা কোথায় দাঁড়াবে বল-তো দেখি?"

একটু থেমে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে "আমি অতশত জানি না। বুঝিও না। তবে যদ্দুর পড়েছি আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটির মূলে এই এর্নাজির পেছনে আলোর গতিপথ আর পদার্থ আছে। যদি সময়ের মধ্যে গতির ব্যাপ্তি না ঘটে, যদি সেই গতি কোনোভাবে থেমে যায় স্বপ্নের বাধায়। পদার্থ বা মাস শূন্যে ভাসে তাহলে ফরমুলাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে বলো তো?"

ইকনমিক্স নিয়ে অনেক তত্ত্বকথা পড়েছি। বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে ফিজিক্সও একটু-আধটু পড়তে হয়েছে। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে এর সামাঞ্জস্য নিয়ে এভাবে ভাবিনি কখনও। যদিও নিজের অজ্ঞতা আড়াল করতে চেয়ে বললাম "তোমাকে চাওয়া? সে-ও কী তবে থিওরিটিক্যালি ফলস?"

"এখন মনে হচ্ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্যের আলোয় সেটাও এক মহা-মিথ্যের মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়।"

চেতনার আগুনে জল ঢেলে দিলে। ফিঙে পাখিটা ফের অন্ধকারের বুক চিরে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আরও কয়েকটা পোকা। আলোর মায়ায় শিকার আর শিকারির খেলা। গতিময় জীবনের এ-ও এক অংশ। আহা! বেঁচে গেল পোকাগুলো। মুক্তি পেল। মিথ্যে রোশনাইয়ের পেছনে আর ছুটতে হবে না। অন্ধকার থেকে আলোর জলসাঘরে প্রাণ এভাবেই মুক্তি পায়।

এতদিন ধরে শুধুই ছুটছি। এই প্রথম থমকে দাঁড়ানো। বন আর পাহাড়ের ওপর ঢেকে থাকা অন্ধকার যেন অনন্ত সকালের আভা। আর কোনো অনুতাপ নেই। নেই কোনো চাওয়া। চাওয়া-পাওয়া একাকার হয়ে গেছে মুহূর্তের স্তব্ধ আমেজে। জড়তা কেটে গেছে। চাওয়াও হারিয়ে গেছে। না-পাওয়া এখন আমায় কষ্টকর ভাবনা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

হ্যাজাকবাতিটা ক্ষীণ হয়ে আসছে। অন্ধকারে ঢেকে যাবে আগামী মুহূর্ত। তার মাঝে ঝরে পড়বে সত্যের আলো।

আমাকে দেখতে পাচ্ছি।

সঙ্গে তোমাকেও...

হ্যাজাকটা নিভে গেল। এখন কোনো সরল অন্ধকার নেই। আলোয় ভরা ঝলমলে আকাশ। ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কিরণ ভরিয়ে দিয়েছে ভূলোক, অসীম আকাশকেও।

সেই আকাশে ভৈরবীর সুর শুনতে পাচ্ছি। যাকে এতদিন, এতকাল ধরে খুঁজছিলাম। আজ অন্ধকারের ছটায় সেই রাগ সুরের মূর্চ্ছনা শোনাচ্ছে, অজানা ছন্দের বন্দনাগানে। ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ভুলে চিরন্তনের স্বরলিপিতে লেখা অচেনা সুরের উচ্ছ্বাস মুখরিত কলতানে।

ভাবলাম, আমার তো তোমাকে প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু ওই ফিঙেটাকে। সে আমায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে রাখবে সময়ের রথে। মিথ্যে থেকে সত্যের বর্তমানে। সেখানে সময় গতিহীন, থমকে দাঁড়াবে অনন্ত মহাশূন্যে।

অন্ধকারে তোমার চোখের দিকে তাকালাম। কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেলে। মনে হল দুজনেই এই চক্রের অভিকর্ষ থেকে ছিটকে গেছি অজান্তে।

তোমাকে...

কস্তূরী



নবম চিঠি

কস্তূরী

বিনসারে যা ছিল দূরে, সেই ত্রিশূল অনেক কাছে।

কৌশানি রয়াল রিসর্ট। হোটেলে ঢুকেই দোতালার একটা ঘরে আমাদের লাগেজ তুলে দিল।

বললাম ‘‘তুমি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। আমি এখনই চেক-ইন করে আসছি।’’

চেক-ইন শেষ করতেই মোবাইলটা বেজে উঠল ‘‘আচ্ছা তুমি কোথায় বল-তো? পরশু থেকে মোবাইলে চেষ্টা করে যাচ্ছি, শেষমেশ পেলাম।’’ অনামিকার ক্রোধের কারণ আছে।

“বিনসারে ছিলাম। ওখানে মোবাইল সিগন্যাল কাজ করে না। এইমাত্র কৌশানিতে এসে পৌছলাম।”

“কবে ফিরছ?”

“এটা শেষ করেই দিল্লি হয়ে ফিরব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।”

“কবে?” অনামিকার তর সইছে না।

“ধরে নাও আরও তিন-চার দিন লেগে যাবে।”

“আর বেশি দেরি করো না কিন্তু। আমার হাতের টাকা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। না তুললে চলবে না এর পরে।”

“কাজটা তো শেষ করে যেতে হবে। তুমি কয়েকদিন একটু ম্যানেজ করে নাও। ফিরেই সব মিটমাট করে দেব।” একটু থেমে বললাম “টুবলু কেমন আছে। আর বাবা?”

“টুবলু ঠিকই আছে। বাবার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না ক’দিন ধরে। তুমি ফিরে এলে একটা থরো ইনভেস্টিগেশন করাতে হবে। খালি বলে, মাথাটা সব-সময় ভারভার হয়ে থাকে। সারাক্ষণই ঝিমঝিম করছে।”

“ব্লাড প্রেসার বাড়েনি তো? ডাক্তার খানকে একবার দেখিয়ে নাও না।”

“তা-ই ভাবছি ক’দিন থেকে। কাল নিয়ে যাব ওনার চেম্বারে।” অনামিকার স্বরে অনুনয় “তিন দিনের বেশি আর দেরি করো না। আমি জানি বাকিটা তুমি সাজিয়ে লিখে দিতে পারবে।”

ঘরে এসে দেখি বারান্দার সোফায় বসে কফি টেবলের ওপর পা রেখে একাই কফিতে চুমুক দিচ্ছ। তাকিয়ে ছিলে দূরের পাহাড়ের দিকে। ত্রিশূলের ওপারে সূর্যের শেষ আভা হোলি খেলছে। কলকাতায় দেখা তোমাকে উদাস লাগল।

আমারা দুজনেই সেরকম আছি। অথচ কত বদলে গেছে দুটো দৃষ্টি। ইতিমধ্যে সময়ের প্রবাহে ভেসে গেছে দুজনের বহু চেতনা। কাহিনি ভিন্ন পথে বাঁক নিয়েছে বারবার।

শহরের ভিড় আর বাড়িঘরের ফাঁকে বাজারের কোলাহল। সেখানে একফালি সূর্য ডুবে যাওয়ায় তোমার কৌতুহল দেখার মতো। আমার ভালোলাগার অনুভূতি দিয়ে তোমার মন স্পর্শ করার চেষ্টা ছিল। সূর্যাস্ত সেখানে গৌণ। তুমিই মুখ্য। স্বপ্নে তোমায়পাওয়া।

সেটা বদলে হয়েছে যুগ্ম-সম্পর্কের আরাধনা। সেখানে অনুভূতির কম্পনে বাজছিল দক্ষ মিউজিক অ্যারেঞ্জারের হাতে নতুন এক সিম্ফনি। এতদিন পর সে তার স্বরলিপি খুঁজে পেয়েছে ত্রিশূলের ওপারে, অসীম দিগন্তে। আমারা দুজনে শুধুই অর্কেস্ট্রার নীরব শ্রোতা। এখন তা প্রকৃতির লীলা, কোমল থেকে নিখাদের সপ্তমাঙ্গিক ঝালার মার্গে।

তোমাকে কাছে পাওয়ার স্বপ্ন মিশে গেছে, মহাকালের মেলায়।

কে তুমি?

কে আমি?

সে সুর শুনব পরে।

এই তবে ভালোবাসার অঙ্ক, সরগমের নিখাদ পেরিয়ে ভাসছে অনন্ত প্রেমের স্বপ্নে। সেখানে শুধু ভাসমান সময়। অনন্তের গভীরে, কালের বলয়-চেতনায়।

তুমি নিঃশব্দে একভাবে চেয়েছিলে ত্রিশূলের চূড়ায়। চারধার ঘেরা নিঝুম নিস্তব্ধ নিভে যাওয়া তারার আলো গুটিয়ে নিচ্ছিল নিজেকে। নীচ থেকে ওপরে শৃঙ্গের দিকে। নন্দাদেবীর বিস্তীর্ণ পর্বতমালা গ্রাস করে নিল অন্ধকার তারাহীন আকাশটাকে। জনহীন ধূসর অবচেতন প্রান্তরে।

"কী দেখছ?"

"তেমন কিছুই নয়। আর দেখবার কিছু নেই। সব হারিয়ে গেছে না-দেখা আলোয়। দেখা তো শেষ। এবার ঘরে ফেরা।"

কী হল তোমার? এত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়লে! এখানে তো আর কিছু দেখার নেই। আমি নীরব। তোমার চেতনা বুকে ধরে শব্দহীন পুলকে।

কফিটা শেষ করে প্রশ্ন করলাম ''না-দেখার পৃথিবীতে, আর কী কিছু দেখার আছে?''

আমার দিকে না তাকিয়েই বললে “পৃথিবীটা বড়ই ছোট। বলো না কেন সারা ভূমণ্ডল। ওখানেই নাকি লুকিয়ে আছে স্বর্গ! ওখানে আমাদের স্বপ্ন হবে সফল। কেনই বা মিছে খুঁজে বেড়াচ্ছি? সব চেষ্টা-ই তো বিফল।”

বুঝলাম বিনসারের রেশ এখনও রয়েছে তোমার নিরালা মনে। কী খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, তা-ও কি জানতাম? কী পেলাম, তা কি ঠিক চিনলাম? চেয়েছিলাম তোমাকে নিয়ে ভাসব ভেলায়। এই সফর বুঝিয়ে দিল সে শুধু সোনার পাথরবাটি, পৃথিবী নামক না-জানা ব্যাপ্তির মালায়।

শিউরে উঠলাম!

হৃদয়ের স্পন্দন অন্য সুর বেঁধে দিয়েছে মুহূর্তটাকে তখনই। ছন্দহীন এক অনাবিল আনন্দের জোয়ারে ভাসা। সেখানে ভাষা স্তব্ধ হয়ে স্বপ্ন মিছিল হারিয়েছে একা। নেই কোনো সুর... তাল... ছন্দ... লয়। সেখানে শুধু পড়ে আছে এক ভাসমান সময়। চেতনার নব অভ্যুদয়। সেই অনন্ত মহাকালের বুকে দাঁড়িয়ে দুজন, একা। এখান থেকেই বিশ্ব ছেড়ে মহাবিশ্বে পরিক্রমা শুরু। আমাদের জানা অঙ্কের সমাধান হারিয়ে গেছে ভূমণ্ডলে। সীমিত চিন্তার বলিরেখা পার হয়ে আমরা ভাসছি অসীম মহাশূন্যে।

সেখানে আমি নেই...

সেখানে তুমি নেই...

ভালোবাসা নেই...

কাল নেই...

অতীত নেই...

ভবিষৎ নেই।

সেখানে বর্তমান বলে কি সত্যি কিছু আছে?

তোমার পাশের চেয়ারটায় হেলান দিয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম “ভূমণ্ডল দেখে তো আর পেট ভরে না। তুমি একটু বসো। আমি মেনুটা দেখে আসি।”

বেরিয়ে যাওয়ার একটা আছিলা মাত্র। যে কাজে এসেছি সেটা শেষ করা দরকার। রিসর্টের মালিকের সঙ্গে দেখা হওয়া জরুরি। সংবাদপত্র তো পয়সা খরচ করে পাঠায়নি আমাকে প্রমোদ ভ্রমণের জন্য। পাঠিয়েছে বড় করে একটা অল ইন্ডিয়া কভার স্টোরি লিখতে। তার জন্য কিছু তথ্যও তো লাগে। লেখার হাতটা আমার জন্মগত, সে-কথা এডিটর বোঝে।

অনামিকার সঙ্গে একদিনে চাকরি পেলেও দুজনের জার্নালিস্ট কেরিয়ারের মধ্যে বিস্তর তফাত। বালিটিকুরি থেকে আসা মেয়েটা শুধু ডিগ্রিই করেছিল। চাকরি চেয়েছিল, পেয়েছে। সেই সঙ্গে আমাকে। ঘর-সংসার

দুটোই।

আমি হতে চেয়েছিলাম সাহিত্যিক। পেটের তাগিদে হয়ে গেলাম ফিচার লেখা ঔপন্যাসিক। দু-একটা গল্প-উপন্যাস, পত্রিকায় থাকার জোরে ছাপাও হয়েছিল কোনোদিন। কিন্তু তেমন ভাবে দাগ কাটেনি কখনও। সাহিত্যিক হওয়ার সাধ মিটেছিল বহু আগে। তাই নিজের শৈলীকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম অন্য পথে। সাহিত্যের বাসনা হারিয়ে গেল বাঁচার সচল রথে। বুঝলাম আমাকে দিয়ে সাহিত্য হবে না কোনোদিন।

তবুও তো কলমে ভাষা আছে। আছে লেখার জোর। সেটা আর কেউ না জানেলেও, সম্পাদক মহাশয় খুব ভালো করেই জানেন। নির্দ্বিধায় ছেড়ে দেন। ভ্রমণ ফিচার লিখতে সিদ্ধহস্ত। অনামিকাকে নিয়ে ছোট্ট সংসার বাঁচাতে নতুন সুরে লিখতে বসলাম আবার।

এখন অনামিকা পাক্কা গৃহবধূ। আর আমি এখানে-ওখানে রোজ খুঁজে ফিরি কাহিনির কানাগলি। নিত্যনতুন জমজমাট ফিচারে ভরাই পাতা। রমরম করে চলে, বাজার খায়। আমি পেশাদার বিক্রেতা। বিক্রির ছলেই তোমাকে নিয়ে চলা। তোমার সঙ্গে সময় কাটাব বলে রিসর্টের কাহিনি বলা। তবুও তো লেখার জন্য কিছু উপকরণ চাই। তাই এখন ছুতো করে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে রিসর্টের মালিকের কাছে যাই।

মালিক দিনদয়াল আগারওয়াল সাদর আপ্যায়ন করে বলল "আইয়ে স্যর। মেরা ভাই পহেলেই বতায়া থা আপলোগ ইঁহা আ রহে হ্যয়।"

"আপকা ভাই কৌন?"

"বিনসার কা মাসার জঙ্গল রিসর্ট মেঁ জাঁহা কল আপলোগ ঠহরে থে, উও তো মেরা ভাইকে হ্যয়। মেরা ছোটা জ্ঞাতি ভাই। মুম্বাই সে আ কর মৈনে ইঁহা রিসর্ট খুলা। তব ইয়ে ইতনা বড়া নেহি থা। ছোটা সে হি শুরু কিয়া। থোড়া চলনে মেঁ উসকো মুম্বাই সে ইঁহা লে আয়া। ফির ওহ্ ইধর কাম শিখকর মাসার জঙ্গল রিসর্ট ওহি কিয়া।"

"অব তো ইয়ে বড়া হো গয়া।"

"সবহি উপরওয়ালাকে মেহেরবানি। আপকা মেহেরবানি হোয়ে তো ঔর বড়া হো সকতা। আপকা কেয়া সেবা কর সকু?"

"কুছ নেহি। সব হি তো ইঁহা আচ্ছা হি হ্যয়।"

"কল সুবে সুরজ উঠনে সে পহলে উঠ যাইয়ে। ত্রিশূল কা উপর সনরাইজ আপ অপনে কমরে সে ভি দেখ সকতে হ্যয়।" তারপর কী মনে হতে বলল "আপলোগ নাস্তে কিয়ে হ্যয়?"

"অভি তক তো নেহি।"

“ফির আরাম সে ঘর মেঁ যাইয়ে। ঔর মুঝে আপ লোগকো সেবা করনে কা মওকা দিজিয়ে।” একটু থেমে রিসর্টের এক গোছা ছবি হাতে দিয়ে বলল “বড়া বড়িয়া সে লিখিয়ে ইস রিসর্ট কে বারে মেঁ, বড়ি মেহেরবানি হোগি।”

একটা ডিজিট্যল ক্যামেরা এনেছিলাম, কিন্তু কোথাও ছবি তোলা হয়নি। ভুলেই গেছি সে-কথা।

এমনকী তোমার ছবিও নয়!

ঘরে ফিরে দেখলাম, তুমি যেখানে ছিলে, সেখানেই বসে আছ। ঠিক তেমন ভাবেই। ততক্ষণে খবরের কাগজের আর্টিক্যল লেখা হয়ে গেছে আমার,মনে মনে। কিন্তু টাইপ করব কলকাতায় ফিরে ঠান্ডা মাথায় অফিসে বসে কোনোদিন এক সময়।

এখন শুধু তোমার সঙ্গে শেষের কয়েকটা প্রহর কাটানো। শেষবারের মতো ইহলোকের ব্যাপ্তির প্রান্তে। আজ সন্ধেটা তোলা আছে শুধু তোমার জন্য। না হয় সেই মুহূর্তটাকে সম্বল করে ভেসে বেড়াই, শেষ কল্পনার মায়ায়। আবার ফিরে যেতে হবে অনামিকার ছায়ায়। আজ পাড়ি দিলাম যুগান্তের পথে। কেনই বা ফিরে যাব ব্যর্থ মনোরথে?

কাল যখন ভোরের আলো ফুটবে। আবার না হয় হারাব নিজেকে ত্রিশূলের অসীম মহাশূন্যে।

হয়তো সেখানে থাকবে তুমি। হয়তো আমি। সেখানে থাকবে আমাদের অনন্ত গভীর ভালোবাসা। কালের নখদর্পণের চিহ্ন পেরিয়ে রয়ে যাবে অন্ধকার থেকে আলোয় পাড়ি দেওয়ার মুহূর্তটুকু। থাকবে না কোনো প্রত্যাশা। জেগে থাকব দুজনে। সুদূর দিবালোকে। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ভুলে অনাদি কালপ্রবাহের ঊর্ধ্বগামী স্রোতে।

যেখানে থালায় গোলাপ সাজিয়ে অতিথিকে বরণ করে নিতে হয় না কোনো আসরে। তবু তারই সুবাস ভেসে বেড়ায় দুজনের অন্তরে। সেখানেই থাকব যুগ থেকে যুগান্তরে।

অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম।

মধ্যরাত্রি।

অন্ধকারে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবছিলাম ব্যাগ থেকে একবার ডিজিট্যল ক্যামেরাটা বার করি। নাঃ... থাক। আর কিছু ফ্রেমে বন্দি করার কোনো মানেই হয় না।

কাশ্মীরি শাল জড়িয়ে বারান্দায় বসলাম। তুমিও গায়ে চাদর দিয়ে বসলে, পাশে। অন্ধকারে ঝিকমিক করছে বরফ-শৃঙ্গ। নীচের দিকে অনাবৃত অংশগুলো ঝিলিক মারছে হিম আলয়ের মাঝে।

আচমকা ধীর মন্থর গতিতে লক্ষ-কোটি মাইল নিমেষে পেরিয়ে, আছড়ে পড়ল এক আলোর রেখা। ত্রিশূলের তিনটে ফলায়। ভোরের প্রথম আলো মহাসংগীত বাজিয়ে গেল ওঙ্কারধ্বনিতে। মায়ের আঁচলে ঢেকে দিল ত্রিশূল। সোনালি আলোর আচ্ছাদনে। নীচে রক্তিম আভা উদ্ভাসিত। কৌশানির সোনাঝরা প্রত্যুষ। মুহূর্তের মধ্যে লাল আর সোনালি মিলেমিশে ঝর্নাধারার অবারিত প্লাবনে সব কিছু রঙিন। সূর্যের ছটা ভরিয়ে দিয়েছে লোকাতীত অন্ধকার। পেছনে ফেলেছে ক্ষণকালের মোহ। চিরকালীন রংমশাল আলোয় ভরিয়ে দিচ্ছে দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড।

দুজনে চুপ করে বারান্দায় বসে। সামনে চরাচর, ব্যাপ্ত মায়া। বহুদূর দেখা যাচ্ছে। দিগন্ত জুড়ে পিতৃসম হিমালয়। ত্রিশূলের রূপ স্পষ্ট হচ্ছে সোনাঝরা আলোর বন্যায়। ঝকঝক করছে আশ্চর্য চূড়াগুলো। এক-নাগাড়ে তাকাতে পারছি না। চোখে জ্বালা। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলাম না আর।

তোমার দিকে না ফিরেই বললাম "এই ত্রিশূল দেখলেই আমার শিবের ত্রিশূলের কথা মনে পড়ে যায় বারবার।"

নীরবে তাকালে। ভাষাহীন, মৌন। যেন বুঝতেই পারছ না, কী বলতে চাইছি। এবার হেসে বললাম "ত্রিশূলের মাহাত্ম্য জানো?"

তুমি নিঃশব্দ ঘাড় নাড়লে। হাসি মিলিয়ে গেল চেতনার পথে।

সিরিয়াস হয়ে বললাম "ত্রিশূলের তিনটে শূল হচ্ছে ট্রিনিটি। সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়। সময়ের ভাষায় অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। অথবা দার্শনিকের যুক্তিতে অবচেতন, চেতন আর অতিচেতন। এর বাইরে আর তো কিছু আমরা ভাবতে পারি না।"

তুমি তাকিয়ে ছিলে ত্রিশূলের দিকে। আলোর ঝলকানি দু-চোখ ভরে দেখছ। মনে তোলপাড় করছে ট্রিনিটি। গতকাল অন্ধকারের অনুভূতিটা মিশে যাচ্ছে সকালের আলোয়।

অথচ এ আলো আজকের নয়। এ আলো কালকেরও নয়। এ তো যুগ-যুগান্তরের ভাবনা দিয়ে গাঁথা অবিচল সময়ের রশ্মি। কোনোদিন হারাবে না দিন-রাতের লুকোচুরি খেলায়। চিরকাল রয়ে যাবে সত্ত্বার প্রহরায়।

তুমি হারিয়ে গেছ, সেই মহাশূন্যে কায়াহীন সময়ের অন্তহীন পথে। অনাদিকালের আচ্ছাদনে পুষ্পক রথে। তুমি যেন হারিয়ে গেছ, দিগন্ত বিস্তৃত কালের মায়ায়। তুমি যেন হারিয়ে গেছ, অসীম শান্তির ঘন বনছায়ায়। তুমি যেন হারিয়ে গেছ, শতাব্দীর সীমা ছাড়িয়ে মহাকাশের শূন্যে।

আজ তোমায় সম্পূর্ণ খুঁজে পেলাম উদ্ভাসিত প্রত্যুষে। তোমাকে বলার ভাষা আমার অজানা। কেটে গেছে স্বপ্নঘোর, নিভৃত বাসনা।

“তাহলে জীবন-মৃত্যু দিন-রাত বলে কি কিছু নেই?”

“এ শুধু আমাদের মনগড়া কল্পনা মাত্র!”

“তারপর?”

“জানি না তারপর কী।”

“ট্রিনিটির বাইরেও কিছু আছে? সভ্যতার পত্তন থেকে বিজ্ঞান হয়ে দার্শনিক তত্ত্বের ঊর্ধ্বে?”

জানা নেই তার খোঁজ। যুগধর্ম কী এতটাই সিদ্ধান্তহীন!

কী বলব তোমাকে? সভ্যতার শর্ত আজও তর্কের বিষয়।

নীরব দৃষ্টিতে তাকালাম তোমার দিকে।

দেখছি অপলকে, মুক্ত আলোয় চিন্তিত তোমাকে... কোন স্রোতে বিদীর্ণ তুমি ভেসে যেতে চাইছ...

কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল এক অস্ফুট স্তব।

“হ্যাঁ... একটাই শব্দ আছে এরপর। মহাওঙ্কারধ্বনি। ওখানেই সব শুরু, ওখানেই সব শেষ...”

এরপর আর কী বলব?

তোমাকে...

কৌস্তুভ



দশম চিঠি

কৌস্তুভ

কিছুই পাল্টায়নি!

সেই পুরনো কলকাতা ঠিক আগের মতোই আছে। বার্ধক্য ঢাকতে কিছু প্রলেপ পড়েছে মাত্র। গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে বর্ষায় হাঁটুডোবা জল। শরতে থিম-পুজোর বর্ণাঢ্য শোভায় নতুনত্ব নেই। শীতের সময় কয়েকদিন বেড়িয়ে আসা, শান্তিনিকেতনে বসন্ত-উৎসবের সেই চিরাচরিত প্রভাতফেরি। সৈকত আর পিঙ্কুকে নিয়ে নাকতলায় দোতালা বাড়ি। তেরো ভুতের অর্থহীন কচকচানি।

ঠিক আগে যেমন ছিল।

তোমাকে দেখার আগে।

ভালোলাগার আগে।

তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার আগে।

তোমায় নিয়ে আমার নতুন চেতনাকে পরিপূর্ণ করার আগে...

হাওড়া স্টেশন থেকে 'টা টা' করে চলে গেলে। একবার ফিরেও তাকালে না। বললে না 'আবার কবে দেখা হচ্ছে?'

আশা করিনি বলবে। কেননা আমিও তো তাকাতে চাইনি পেছন ফিরে। জার্নিটা স্মৃতি হয়েই থাক আমাদের জীবনে। তাকে ফিরিয়ে আনার কোনো মানেই হয় না দৈনন্দিন অঙ্গনে। চাওয়া-পাওয়ার গণ্ডিতে সে অপ্রয়োজনীয়। সপ্তর্ষির সীমা ছাড়িয়ে অনন্ত জিজ্ঞাসা সম্বল করেই থাকতে হবে ইহজগতে। আসবে মৃত্যু।

এখানে তো আমরা নেই। কোথায় বিলীন চেতনার নীরব অনুভূতি। কারও মধ্যে নেই কোনো ফেলে আসা হিসেব। স্মৃতির মণিকোঠায় রয়েছে এক অনন্ত অন্তহীন চেতনা।

সেখানে নেই কোনো পূর্ণতা...

সেখানে নেই কোনো শূন্যতা...

সেখানে নেই কোনো অতৃপ্তির ছোঁয়া...

সেখানে নেই কোনো ভালোলাগার মায়া...

নেই কোনো বিষাদে ঢাকা ধূসর মেঘ।

সময় স্থবির যৌথ-স্মৃতির দুয়ারে। অতীত মিশে গেছে চাওয়া-পাওয়ার ভালোলাগায়। বিচ্ছেদের ক্ষণ পরমুহূর্তেই অতীত হয়ে যাবে। আমরা থাকব স্মৃতির মজলিশে।

যে যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকব চিরকাল। তোমাকে এর পরেও আর কিছু লেখার আছে? বুঝে নেবে মহাকাল।

সৌম্যদার বিয়েতে তোমার-আমার প্রথম দেখা। সেই মুহূর্ত থেকেই ভালোলাগা। সেখান থেকে ভ্রমণ। সবটাই এক মুহূর্তের প্রতিফলন। দেশ-দেশান্তরে সেই আনন্দযজ্ঞে সাক্ষী থাক সময়ের আবর্তন। লেখা থাক আমার দেওয়া নাম-না-জানা পথের বার্তা। দিগন্ত রয়ে যাক মরীচিকার কোলে। অনন্ত খেলে বেড়াক মহাকালের দোলে। গাঢ় রাত্রির অমানিশা ভরে গেছে আলোয়। শূন্যের মাঝে পূর্ণতার দিশা। তাই দিয়ে গাঁথা হোক মহাকালের গ্রন্থি। জ্বলবে সে দীপ চিরদিন, উদ্ভাসিত হবে মঙ্গলালোকে।

পিঙ্কু বলল "আমাকে ছেড়ে এতদিন কোথায় গেছিলে মা?"

ওকে জড়িয়ে আদর করে বললাম "কোথাও তো যাইনি মা। আমি তো এখানেই তোমার পাশেই আছি..."

"আমার কেন যে মনে হল, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছ।"

"তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব মা? তুমিই তো আমার সব।"

পিঙ্কু কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত "তাহলে বোধহয় আমি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম"

"তুমি একা কেন? আমরা সকলেই ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখি।"

হঠাৎ কী মনে হতে বলল "আজ পড়তে বসে হেলিওসেনট্রিক শব্দটা পেলাম। ওটা কী মা?"

"কতদিন আগে পড়াশোনা ছেড়েছি। এখন কী আর মনে আছে? দেখিও তো, পড়ে বলব।"

ডিগ্রির লোভে ইকনমিক্স পড়েছিলাম। সেই সুবাদে পদার্থবিদ্যা নিয়ে কিছুটা চর্চাও ছিল। এখন মনে হচ্ছে, শুধু পরীক্ষায় পাশ করেছি, কিছুই শিখিনি। যে জন্য মেয়ের প্রশ্নটাও আজ দুর্বোধ্য। পিঙ্কু চোখে আঙুল দিয়ে সেই কথাটাই বুঝিয়ে দিল। অনেক কিছুই না-বুঝে, শুধু পুথিপড়া বুলি পাখির মতো মুখস্থ করে পরীক্ষার হলে বমি করে দিতে পারলেই কৃতী। তাতেই সামাজিক স্বীকৃতি। বড়াই করি নিজেদের জ্ঞান। সব বৃথা, অর্থহীন পার্থিব সম্মান।

আমি তো এ ব্যাপারে জানি না কিছু। শেখবার চেষ্টাও করিনি কোনোদিন। অর্থ বুঝতে এখন করছি মাথা নিচু। তুমি কি কিছু জানো? জিজ্ঞেস করা হয়নি তো তোমাকে কখনও। হয়তো অজানার উপলব্ধিতে এসব

কথা মাথায় খেলেনি। আমিই বোকা হয়ে গেছি। চেষ্টা করিনি শিখতে সারবস্তু। আজ অসহায়।

দিগন্তের সীমারেখা যখন ধাবমান মরীচিকার মতো দূরে সরে যাচ্ছে। যখন সীমা নিঃশেষে অসীমের মধ্যে দিশা খুঁজছে। যখন মুছে যাচ্ছে অনন্তের চেনা রেখাগুলি। ঘটনার প্রবাহ ক্রমশ সীমিত, অর্থহীন, বিলুপ্ত। ঠিক তখনই, সেই সময়, চেতানা যেন অতন্দ্র অন্ধকারের বুক চিরে আসা প্রশস্ত আলোয় ভরে গেছে। অক্ষমতা বারবার করাঘাত করছে মননে। বৃথাই খুঁজেছি তাকে অমোঘ সত্যের না-চেনা অন্ধকারে। অমৃত রয়েছে আমাদেরই মাঝখানে।

কী হবে জেনে, কোথায় চলেছি? সময়ের সঙ্গে চলার মাপকাঠিটা হারিয়ে গেছে, তবুও ছুটছি। সীমান্ত মুছে গেছে অজানার কোলে। স্তব্ধ হয়েছে প্রতিটি মুহূর্তে, পলে।

তুমি সেদিন আইনস্টাইনের কী সব তত্ত্ব বলছিলে? ঠিক বুঝতে না পারলেও, অনুভব করতে অসুবিধা হয়নি, কী বলতে চাইছিলে। বিনসারের ওই আঁধারে হ্যাজাকের আলো অনেক না-বলা কথা জানিয়েছিল। সেখানেই গোপন রয়েছে সত্য। আমাদের চেনাজানা অঙ্কের মধ্যে নয়। বিজ্ঞান আর দর্শনের যুগলবন্দি ছন্দের কম্পনে আলোকরেখা ঝরায়। সেখানেই রয়েছে সভ্যতার বন্ধন। এতকাল পড়েছি অনেক। এবার তোমার কাছে পেলাম নতুন দীক্ষা।

সবই আমাদের কল্পনা। জ্ঞানতত্ত্বের আসরে জ্বালাতে চাইছে স্ফুলিঙ্গ। কোনো কালের কোনো সময়ের অর্থহীন অজ্ঞতার ভোরে। বিজ্ঞান হাত ধরেছে দর্শনের নিশুতি অন্ধকারে। নিত্য নতুন ভাবনার ব্যঞ্জনায় পার্থিব স্বরলিপি লিখেতে চাইছে বৃথাই - যুগান্তরের সত্য থেকে যাবে সর্বদাই।

পিঙ্কুর প্রশ্নের উত্তরটা তো আমায় খুঁজে বার করতেই হবে। এ তো আর কালের প্রবাহে ভেসে যাওয়া মুহূর্ত নয়। এ তো এক ছোট্ট শিশুর মায়ের কাছে একান্ত আবদার। ওকে দেখাতে হবে সেই সত্যের বাহার।

আজকাল ইন্টারনেট থাকায় অনেক সুবিধা হয়েছে। গুগল সার্চ করলে অনেক তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় অনায়াসে।

কোপারনিকাস এই হেলিওসেনট্রিক শব্দটা আবিষ্কার করেন। যা সমর্থিত হয় গ্যালিলিও-র উপাখ্যানের স্তুতিতে। সেখানে জিওসেনট্রিক[1] থেকে হেলিওসেনট্রিক[2]- এর একটা পারাডাইম সিফট নিয়ে কতই না গুরুগম্ভীর তত্ত্ব।

আদৌ কী তা বাস্তবে প্রযোজ্য!

যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষ পরম্পরায় বলে চলেছে একই শব্দ। বারবার প্রতি পলে যুদ্ধ করছে, ব্যবচ্ছেদ করছে, ধর্ষণ করছে, ছিনিমিনি খেলছে - সেই অনাদি অনন্ত শাশ্বত সত্য। আমার নয় তোমার কিংবা পিঙ্কু সৈকত অথবা জন্মান্তরেও কোনো প্রজন্ম আজ চেতনার রঙে বিভোর হয়ে নেই। হারিয়ে গেছে সময়ের

তালে, ব্যাপ্তিটা না জেনেই। প্রবল গতিতে ছুটে চলেছে কালের প্রবাহ। রয়ে গেছে কালের বিস্তারে, অনন্ত গহ্বরে।

হয়তো সেখানেই আসল দ্বন্দ্ব।

অ্যারিস্টটল সেদিন একটা অচলকে সচলের বাহুডোরে বাঁধতে চেয়েছিল জাগতিক মাপকাঠিতে ভর দিয়ে। প্লেটোর কাছ থেকে ধারণাটা পেয়ে সে ছাড়াও ওই পথে পা দিয়েছিল অনেকেই। আগাস্টিন, ডেসকার্টিস, লক, হিউম, কান্ট, হেগেল থেকে মার্কস যুগের স্বার্থে চলেছে সেই অচলের পথে। নিজের তত্ত্ব বিন্যাস করেছে আপন ঢঙে। অ্যারিস্টটল মুক্ত চিন্তায় পথ হেঁটেছিল একুইনাসের সঙ্গে। একুইনাস তাকে সমর্থন করে নিরাকারের মধ্যে সাকারের ছন্দ আঁকতে চেয়েছে জাগতিক রূপে।

প্রশ্নটা তা নয়। প্রশ্নটা মানছি কি মানব না, সেটাই আসল। প্রশ্ন যুক্তি-তর্কের ফোয়ারায়। মহর্ষি সেজে সপ্তর্ষি খোঁজা মূর্খামির লক্ষণ। অনুভব করেও বুঝতে না-চাওয়া বাতুলতা ভরা আস্ফালন।

আমি মহর্ষি নই। দূরে... বহুদূরে... সপ্তর্ষির আলোয় পথ চলেছি। তুমি ছিলে সহচর। নক্ষত্র জ্বলছে কি জ্বলছে না, তা-ও জানি না। বিনসারের আঁধারে পেলাম আলোর নতুন ঠিকানা।

ভিক্টোরিয়ায় ফুচকা খেয়ে, প্রিন্সেপ ঘাটে বসে নাই বা গুনলাম স্বপ্নের অভিঘাতে নিভে যাওয়া তারাগুলোকে। কী হবেই বা একটা মিথ্যের বুনিয়াদ গড়ে সন্ধ্যাতারার আলোয়? নাই-বা খেললাম চাওয়া না-পাওয়ার খেলা। ধাবমান মরীচিকার পেছনে ছুটে বেরিয়ে বৃথাই সাজিয়ে না-সাজালাম তার ভেলা। বাস্তবের পক্ষিরাজে চড়ে নাই-বা সাজালাম মনের চাওয়ার গোলাপের থালা। অনন্ত কালের না-ছোঁয়া কল্পনার অসীমের সময়হীন রথে।

পিঙ্কু তো এখনও বর্তমান। সৈকত এখনও আমার প্রিয়জন। তুমিও আছ আমার সামনে। আমি হাতে তুলে নিয়েছি গোলাপ। যেখানে ছিলাম আমরা, সেখানেই আছি। সব ঠিকঠাক রয়েছে। কিছুই হারায়নি এই চাওয়ার মেলায়। না হয় মুহূর্তটাকেই বরণ করে নিলাম ওই গোলাপ সমৃদ্ধ রুপোলি ডালায়।

একাকী ঘরে বসে টিভিতে আজকের তাজা খবর দেখছিলাম।

ঘরে ঢুকে পিঙ্কু বলল "মা একটা কথা বলব?"

"বল না কেন, শুনি?"

"সূর্যাস্তের রাগ যখন সমুদ্রের বুকে চিকচিক করে, তখন কোন আলোটাকে দেখব?"

থমকে গেলাম।

টিভিটার মিউট বটন টিপে কয়েক সেকেন্ড। হাউসকোটটা ঠিক করতে করতে ভাবলাম, কী জবাব দেব পিঙ্কুকে? সময় কাটাচ্ছি উত্তরের অপেক্ষায়। নিজেকে নতুন করে সাজাবার উপায় খুঁজছি। কালের আভরণের

প্রতীক্ষায়। সময়টা শুধু আমার না-জানার পরিধি মাত্র। তাকে প্রকাশ করি কেমন করে? আজ সময় হয়েছে নতুন কিছু বলার, পুরনো শিকড় ছিঁড়ে। কী দেখতে হবে কাল? সেই চেতনাটাও তো শেখাতে হবে ওদের।

মুহূর্তকে সঙ্গী করে উত্তর দিলাম "দুটোই দেখবে।"

"কোনটা? সূর্য না তার রিফ্লেকশন?" উত্তরটা এখনও অস্বচ্ছ পিঙ্কুর কাছে।

"দুটোই। কারণ দুটো জিনিসই ঘটছে এক মুহূর্তে।"

তুমি তো পিঙ্কুকে চেন না। সৈকতের কথাও জান না। আমিও রয়ে গেলাম তোমার অজানা। তুমিও যেমন আমার চেতনায়।

এরপরে আর কি কোনো কথা বলা যায়? একটা মুহর্ত মাত্র, পার হয়ে যাবে কালস্রোতে সময়। জানা-অজানা মিশে যাবে সেই স্রোতে। আমরা চিনব নিজেদের, আপন আলোকে। তোমার চোখে খুঁজব জীবনের গান। আমার মদির চাহনিতে তুমি খুঁজে পাবে ভালোবাসার প্রাণ।

তখনও থাকব আমি।

তখনও থাকবে তুমি।

কায়ার আকার ছেড়ে ছায়ার ধূসরে।

সেখানেই অনন্ত মিশে যাবে, না-বলা ছন্দের সুরহীন স্রোতে। জ্বলবে আলো, ফুটবে গোলাপ, খেলবে তারা, অন্ধকারের ভোরে।

সেখানেই আছি আমি।

সেখানেই তুমি।

সময়ের কালবর্তে আলোকিত নির্জন দীপালোকে।

কী বলো?

মিথ্যে তো বলিনি পিঙ্কুকে? হয়তো, ও এখন ব্যাপারটা বুঝবে না জানি। কিন্তু একদিন চেতনা হলে কথার মানেটা ধরবে। আমিও তো তোমাকে জানতাম না, তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাবার আগে। হয়তো তোমাকে মন ভরে চাওয়া, তোমাকে ভালোবাসা, আমার চেতনাতে বহ্নিশিখা জ্বালিয়েছে অজান্তে অলক্ষ্যে।

কৌশানি থেকে সোজা চলে এসেছিলাম আবার কাঠগোদাম হয়ে দিল্লি। যাবার সময় কত কথা হয়েছিল। ফেরাটা ছিল নীরব অনুভূতির তাড়নায়।

না-ধোয়া নীল জিনস আর কোঁচকানো কালো টপস-এর দিকে চোখ ছিল না আমার। লিপস্টিকের প্রলেপ লাগাতে ভাবিনি দুবার। বাসি জামাকাপড়গুলো বাড়িতে গিয়েই ধোব। কে আর দেখছে আমাকে এখন?

আমার সবই দেখে নিয়েছ তুমি। আবরণে কি লুকোতে পারব?

"ঘোরাটা সার্থক হল বটে।"

"হ্যা।" অস্ফুট স্বরে মাথা নাড়লাম।

জীবনের বহু কাঙ্ক্ষিত চাওয়াগুলো এক সম্পূর্ণতার আলোকে বাসি। ঠিক আমার কাপড়গুলোর মতো আনন্দে, পুলকে।

"কী যে ভূত চেপেছিল মাথায়। হঠাৎ বেড়িয়ে পড়েছিলাম তোমার সঙ্গে নিজেকে চিনতে আবার..."

"একা কেন বলছ তুমি? সেও তো আমার। না বেরোলে কি জানতে পারতাম এত কিছু? বারবার ফিরে কি পেতাম তোমাকে?"

"তোমাকে কিংবা আমাকে..."

বেরিয়েছিলাম তোমাকে জানতে, বুঝতে, প্রয়োজন মতো ভালোবাসতে। জীবনের না-পাওয়াকে নিজের মতো করে, নিজের সুরে সাজাতে। ফেরার সময় বুঝতে পারলাম কিছুই আসে যায় না। স্বপ্ন শুধু মায়াবী মরীচিকা, ধরতে তাকে চাই না। নিজের জীবনকে অস্বীকার করে নতুন কিছুই পাওয়ার নেই। এই বলয় ভেদ করে মহাকালে ছড়িয়ে পড়েছি আমরা সবাই। চাওয়াটা তো কবেই থেমে গেছে। পাওয়াটাও পাখনা মেলেছে তারই পথ ধরে নতুন এক আকাঙ্ক্ষার স্রোতে।

তোমার সঙ্গে এই কটা দিন আনন্দেই কাটল বটে। তবুও তুমি এখনও অজানা আমার কাছে। তোমারও, অনুমান করি আমার মতো ঘর-সংসার ছেলেপুলে আছে। তুমি মানুষটা যেই হও না কেন? তাতে কী প্রয়োজন?

সৈকত কেমন? সেকথা ভেবে কাজ নেই।

ভালোবাসাটা কায়া ছেড়ে হারিয়ে গেছে, তাকেই নতুন করে সাজাতে চাই।

কী হবে এসব কথা এখন ভেবে? কী হবে বা আমার তোমাকে জেনে বা না-জেনে, পাওয়ার কোনো লোভে? স্বপ্নের গতিটা যখন থেমে গেছে, তার শেষ প্রান্তে মহাকালের অলক্ষ্যে।

সেখানে তুমি নেই...

সেখানে আমি নেই...

সেখানে সৈকত নেই...

সেখানে পিঙ্কুও নেই...

সেখানে গতি নেই...

সেখানে প্রগতিও নেই...

সেখানে তো আবেগ নেই...

যে জন্য সেখানে বিচ্ছেদ নেই...

পড়ে আছে শুধু এক মুহূর্তের বিশ্বাস। শূন্যতার মধ্যে ভাসমান সোনাঝরা সকাল। অনালোকিত অন্ধকারেই জ্বলবে রংমশাল।

আমরা যেন কায়াহীন নির্মোহ আত্মা। বাঁধা পড়েছি...

তার শেষ কোথায় সে তো জানি না।

তোমাকে...

কস্তূরী

---

1 পৃথিবী ভূমণ্ডলের কেন্দ্র বিন্দুতে

2 সূর্য ভূমণ্ডলের কেন্দ্র বিন্দুতে

অবশেষে



মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল, উলুধ্বনির উচ্ছ্বাস।

ওঙ্কারের শব্দটা ট্রিনিটি থেকে ছিটকে এসে আবার উচ্চারিত হচ্ছে সৌম্যের বিয়ের আসরে। সানাইয়ের আওয়াজ হারিয়ে গেছে মানুষের কোলাহলে। চারদিকে বেনারসি শাড়ি আর গিলে করা পাঞ্জাবির আতিশয্যে রঙের বন্যা অনুষ্ঠানে। কেউ আবার গরমে স্যুট-টাই পরেও হাজির হয়েছে। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য যেন হাত ধরাধরি করে যৌথ জীবনের মিলন রাগিণী গাইছে ।

সুরটা অজানা। তবুও হয়তো একটা রেশ এখনও প্রবহমান। সেই সুর গিয়ে মিশেছে ওঙ্কারে। আনার্য থেকে আর্য সভ্যতার চলনে। 'না' কখন 'হ্যাঁ'-তে রূপান্তরিত হয়ছে মন্ত্রোচ্চারণের ঝঙ্কারে। সৃষ্টির প্রথম শব্দ উচ্চারণের আগমনি সুরে। শূন্যতা থেকে পূর্ণতার প্রথম স্ফুটনে। এই আদি-অনাদি সত্য আজ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে একই সূত্রে বেঁধেছে। মণ্ডূক উপনিষদের ভাষায় 'অ'-এর পার্থিব আকার মিশে গেছে 'উ'-এর আকারহীন পথে। সেখান থেকে আকারহীন আবার ভেসে গেছে 'ম'-এর নিরাকারে। এক অনাবিল আলোকের ঝর্ণাধারায় মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে। সেখানে দেশ, স্থান, কাল, পাত্র মিশে গেছে সীমাহীন বিশ্বের আলোকিত দেবালয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটি মানুষকে একসূত্রে বেঁধে দেবে সংসার রথে মন্ত্রের শপথ। নতুন কোনো এক যাত্রার চিরন্তন অজানা পথে। বিন্দু থেকে সিন্ধুর দিকে ছোটার স্বপ্ন-প্রচেষ্টায়। মহাকালকে আবার ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে চাইবে এক অদৃশ্য মরীচিকার পেছনে ধাবমান স্রোতে। ইতিহাস হাসবে মহাকালের হৃদয়জুড়ে।

হাসবে সময় অট্টহাসে, নীরব ঝংকারে। আবার কোনো নোয়ার আর্কের নোঙরহীন ভাসা তীরহীন তরীতে। বিলুপ্তি থেকে আশ্রয়ের না-জানা দ্বারে। খুঁজবে আশ্রয় এই সংসার রথের ক্ষমাহীন তীরে।

কাঁদবে শুশুক গভীর নীলে তরঙ্গের গভীরে।

বিয়ের আড়ম্বর আর সুন্দরী মহিলাদের সাজের বহরে ভরে গেছে বাড়ি। গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, তামাশায় সময়টা সবাই উপভোগ করছে। শুধু দুজনের মিলন নয়। সামাজিক আসরও।

'কৌস্তুভ' ওর আসল নাম নয়।

কী আসে যায় ওর নামে? সে তো যে কেউ হতে পারে? অমল, বিমল, কমল, পারিমল কিংবা ইন্দ্রজিৎ, অভিজিৎ, প্রসেনজিৎ বা অন্য কেউ। নাম ওঙ্কারের প্রথম ধ্বনির একটা সূত্র মাত্র।

যে মেয়েটি রুপোলি থালা হাতে গোলাপ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল 'কৌস্তুভ'-এর দিকে, তার নামটাও অজানা। 'কস্তূরী' না হয়ে মঞ্জরী, সঞ্চারী কিংবা বিদিশাও হতে পারে। এ-সবই অবান্তর। একটা আকারকে পৃথিবীতে চিহ্নিত করা ছাড়া আর কিছু নয়।

ওদের নাম যাই হোক না কেন, যে কোনো নারী-পুরুষের ভালোবাসার অঙ্গীকারকে এক যুগল সূত্রে বেঁধেনিজের মনে অপরকে চিহ্নিত করার চলন বহুদিনের। আর পাঁচজনের মতো ওরাও কল্পনার আসরে সমাগত। তবুও আজ ওরা আলাদা।

কস্তূরী পরেছে ঘিয়ে রঙের মটকা শাড়ি। তার খয়রি পাড়ে ঢাকা নরম শ্যামলা হাত দু-আঙুলে গোলাপের ডাঁটি ধরে রুপোলি থালা থেকে নিয়ে কৌস্তুভের কোহিনুরের গিলে করা পাঞ্জাবির বোতামের ফাঁকে গুঁজতে যাচ্ছিল। দু চোখের দৃষ্টি হঠাৎ চার চোখে মিশে গেল। কল্পনা ঠিক তখনই বাস্তবে মিলল। কস্তূরী কাজল কালো চোখ দিয়ে দেখল এক পলকে।

মুহূর্তে কত চিঠিই না লেখা হয়ে গেছে সেই দৃষ্টির ঝলকে। সে সব চিঠি এক অর্বাচীন দর্শকের কাব্যগাথা। তাই নিয়ে সে লিখেছে তাদের মনের স্বপ্নকথা। কম্পিউটার তো বিবাহ বাসরে থাকে না। কাগজ-কলম নিয়ে লেখে না কেউ। মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে রূপ দেওয়া যায়অনেক স্বপ্নে আঁকা চিঠিতে। বলা যায় তাদের জীবনের অব্যক্ত কথা, দৃষ্টির রং দিয়ে এক বিশেষ সন্ধ্যায় আড়ম্বরের আলোকে। তাদের দৃষ্টি নিয়েই লেখা যায় কত কথা। যা হয়তো কোনোদিন হয়নি লেখা।

কত ভাবে বলা যায় না-বলা কথা। নিমেষে আঁকা হয়ে যায় সেই মুহূর্তে কাহিনির নতুন চিত্রপট।

চিঠিগুলো মনের অবচেতনের মুহূর্ত মাত্র। মনের দুয়ারে ফিরে দেখলে পাতাগুলো আসলে শূন্য! তবে কি কোনো কিছুই লেখা হয়নি রুপোর থালা এগিয়ে নিয়ে হাতে? কত কথাই না কস্তূরী লিখতে চেয়েছিল, নানা

রঙের কালি দিয়ে সেই মুহূর্তে। মনের খাতার পাতা এখন ধূসর প্যাপিরাস। মনের কলমে লেখা হয়নি একটিও শব্দ। লেখা হয়নি কোনো কাহিনি।

বোঝা যায়নি অনুভূতির কোনো প্রকাশ। মনের পটে কল্পনার পাতাগুলো সব-ই শূন্য রয়ে গেছে। কী হবে না-বলা লেখাগুলো আর বুকে ধরে রেখে? মনের স্বপ্ন দিয়ে আঁকা চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলাই তো ভালো। সাদা চিঠিটা কাহিনিতে ভরে কী বলবে কাকে? সেটাই তো চিনল না এখনও। কাহিনিটা শুধু পলকে গাঁথা এক কবিতার মালা। কাহিনি তো জীবনের না-পাওয়ার পূর্ণতর মুহূর্তের বরণডালা।

একটু ভাবলেই বোঝা যাবে, এ শুধু কল্পনার এক ঝলক। তাই নিয়ে লিখে যাওয়া ঘটনার প্রবাহ, ফেলতে এক পলক। দুজনের চিঠিতে ফুটে উঠবে তাদের পাওয়া না-পাওয়ার মোহ। প্রেমের সুরে সুর মিলিয়ে কত অন্তরের বাক্যহীন প্রবাহ। নানা রূপে আঁকা জীবনের স্রোতে ঢাকা। সব মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাবে দুজনে হৃদয়ের স্রোতে একা।

ঘটনাগুলো অনায়াসে সাজানো যেতে পারে পরপর একে-অপরের ছন্দে। কাহিনিটা ভুলে সুরটাই চিনবে লোকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বাস্তব আলোকে। চিনবে তাদের দৃষ্টির সত্য। যা মুহূর্তে থেমে গেছে। প্রিয়া থেকে কৌশানি শুধু মনগড়া স্বপ্নের শরিক। কিছুই ঘটেনি আসলে পলকের দেখায়। হতেও তো পারে, এই কাহিনি আরেক স্বপ্নের মিরিক। এ শুধু চাহনির মনগড়া গল্প, কারও নিজস্ব কল্পনার মায়া হতে পারে। বাস্তবে যে যেভাবে দেখতে চায়।

কৌস্তুভ এক দৃষ্টে চেয়েছিল কস্তূরীর কাজল নয়নে। যা কিছু লেখা হয়েছে তার অজানা কারও বা মনের কমপিউটারে। এক পলকের দৃষ্টি দিয়ে কল্পনা করা যায়। পাতার পর পাতা চিঠি কি টাইপ করা যায়? কম্পিউটারের গোটা একটা ফাইল কল্পনার চিঠিতে ভরা। কে যেন লিখে গেছে চিঠির সমারোহ নিমেষে।

লেখাই হয়নি কোনো রিসর্টের উপাখ্যান। এত ঘোরা, এত হাতে হাত মিলিয়ে চলা, সব-ই কারও এক নিছক কল্পনা। এবার মোছার সময় হয়েছে, মিথ্যের এ জল্পনা। মনের কম্পিউটারে পড়ে আছে একটা ফাইল মাত্র। অভ্র কিবোর্ড মুছে গেছে, পড়ে আছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এখনও।

বাইরে উলুধ্বনি। ‘বর এসেছে... বর এসেছে’ হাঁক পেড়ে সবাই হই-হই করে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। ওখানে কী হচ্ছে সেটা অনুমান করা খুব শক্ত নয়। বাইরে থেকে শোনা গেল শাঁখের আওয়াজ। উলুধ্বনিতে ভরে উঠল প্রাঙ্গণ। রজনীগন্ধার মালায় সজ্জিত সৌম্যকে গাড়ি থেকে নামবার জন্য বরণডালা সাজিয়ে মহিলাদের সমাগম হয়েছে।

কোলাহলের মধ্যে এই ঘরটাই এখনও শূন্য।

শুধু কৌস্তুভ আর কস্তূরী...

পলকহীন দুজনে চেয়ে আছে অপরের দিকে। না-চেনা মানুষটাকে মনের মাঝে সাজিয়ে নিচ্ছে। কোনো গল্প লেখা হয়নি ওদের মধ্যে এখনও। শুধু ওরা দুজনে একাকী। শুনছে হৃদয়ের নিঃশব্দ কুজন। ভাষাহীন চাহনির যুগল নীরব ঐকতান। সেখানেই ওদের ছন্দের রেশ ছুঁয়ে যায় ভাষাহীন অনুরাগে।

ঠিক সেই মুহূর্তে...

চারদিকের হইচই ছেড়ে আকাশটা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে ওদের সামনে। অথবা সবকিছুই আকাশ। আলোয় ভরে যাচ্ছে। এক নতুন অচেনা আলো। বিয়েবাড়ির বৈদ্যুতিক নিওনের রোশনাই নয়। এক অনৈসর্গিক আলোর ঝলমলে বর্ণচ্ছটা। যেখানে অন্ধকার মিশে গেছে আলোর প্লাবনে। ওঙ্কারের 'ম'-এর শেষ ধ্বনি, বারবার ঝংকার তুলছে সেই আলোকিত বিশ্বে।

ওরা বুঝতে পারছিল যে, বিয়ে বাড়ির হইচই, হা-হা-হি-হি ক্ষীণতর হয়ে আসছে। হারিয়ে যাচ্ছে আলোড়নের বাইরে।

ওদের চারপাশের শব্দগুলো দূর সমুদ্রপাড়ের ঢেউয়ের মতো, একটা অস্ফুট গুঞ্জন হয়ে পরিণত হচ্ছে শান্ত নীরব মৃদু তরঙ্গের না-শোনা রবে। তারপর আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। একটা অস্ফূট অব্যক্ত স্পন্দন যেন ফিস ফিস করে মাথার চারদিকে গোলাকার, ঘুর ঘুর করছে। সেই ফিসফিস করা না-বলা কথা যেন হারিয়ে গেছে, ওদের অপলক দৃষ্টির অকথিত কম্পনে।

কিছুই বলা হল না...

শোনা হল না কিছুই...

নিঃশব্দে হৃদয়ের কম্পনে বোঝা হয়ে গেল অনেক কিছু। নিমেষে, মুহূর্তের আবেশে। অনুভূতির চেতনার উন্মোচনে। সময়ের ব্যাপ্তিকে পেছনে ফেলে থেমে যাওয়া সময়ের ঊর্ধ্বলোকে...

উত্তরণের পথে!

এখন আর ওরা সৌম্যর বিয়েবাড়িতে নেই। মটকা শাড়ি কিংবা কোহিনুরের পাঞ্জাবিটারও কোনো অস্তিত্ব নেই। গোলাপটা এক অদৃশ্য পৃথিবীর দুয়ার খুলে দিয়েছে, থেমে যাওয়া সময়কে ধরে।

চারদিকে যেন এক অনন্ত শূন্যের মহাসংগীত শোনা যাচ্ছে। সৌম্যর বিয়েটা তো শুধু একটা উপলক্ষ মাত্র। ওদের চাওয়া পাওয়া অঙ্গীকারহীন রথে চেপে বসেছে। যেখানে স্পুটনিক পৌঁছয় না। যেখানে স্পেস রিসার্চ স্তব্ধ। সেই চলার শুরুও নেই। শেষও নেই। থেমে গেছে ক্ষুদ্র পরমাণু থেকে বিশ্বজাগরণের চেতনায়।

একে চেয়ে আছে অপরের দিকে। অপলক...

ওরা অবাক হয়ে দেখছিল। একটা ঘোর লাগা, হাল্কা কুয়াশার আবরণে চারদিক ঢেকে যাচ্ছে ধীরে। ছোটোবেলায় দার্জিলিঙের ম্যালে দেখা উত্থিত কুয়াশার রিপ্লে শুরু হয়ে গেছে।

সেই অনন্ত রশ্মির দিকে ওরা তাকিয়ে রইল। বিস্ময়ে কান পেতে, অনন্তের গুঞ্জনে, নিস্তব্ধতার সমুদ্রে। অবাক হয়ে, নাক দিয়ে সেই অপার্থিব কুয়াশার ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করল। অবাক হয়ে মুখের মধ্যে জিভের ওপর সেই শব্দের স্বাদ, সারা শরীরের ত্বক দিয়ে, সেই প্রোজ্জ্বল আলোটার স্পর্শ পেতে চাইল।

অনুভব করল ওদের চারদিকে একটা মায়াময় আবরণ ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওরা বুঝতে পারছিল, প্রকৃতি কী এক বিশাল কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আকাশ, বাতাস, চারদিকের লোকজন, শব্দ - সব যেন মিলেমিশে যাচ্ছে।

ওরা জানত না, তাই বুঝতে পারল না, সেই মুহূর্তে প্রকৃতি এক অদ্ভুত জগতে প্রবেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওরা জানত না, ওদের সামনে অভিনীত হতে চলেছে বিশ্বপ্রকৃতির এক অপূর্ব লীলা। অনুভূতির ষষ্ঠ মাত্রা আবরণ ভেঙে বেরিয়ে আসছে মহাবিশ্বের প্রথম উদ্ভাসে। তারই জন্মলগ্নে প্রকাশিত হচ্ছে রূপ রস শব্দ গন্ধ বর্ণ স্পর্শ - আদি জাগতিক চেতনা।

এযাবৎ কেউ শেখায়নি এই লীলার মাহাত্ম্য। অথবা সত্য। ওরা জানত না, তাই বুঝতেই পারল না, এই মুহূর্তে সাক্ষী বিশ্বপ্রকৃতির এক অতি বিরল না বোঝা খেলার।

ব্রহ্ম দ্বার খুলে দিয়েছে স্তবের প্রথম মহামন্ত্রে ‘ওঁ’।

সময় তার সরলরেখার অনুভূমিক গতি থামিয়ে চলেছে ভিন্ন মাত্রার অনৈসর্গিক উল্লম্ব চেতনায়। সময় নিজের স্বাভাবিক গতিপথ ছেড়ে, উড়ে চলেছে মহাকালের কোলে। দিগন্তের শেষ রেশ পেরিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে পার্থিব ব্যাপ্তির বাইরে। চতুর্থ মাত্রার প্রতি ধাবমান। ওদের চোখের সামনে তূরীয় লোকের অবগুণ্ঠণ উন্মোচিত হচ্ছে। উল্লম্ব সময়ের সীমাহীন অনন্তে। ওরা পাড়ি দিচ্ছে ভার্টিকাল টাইম-এ। এই পথে সময়ের কোনো গণ্ডি নেই, ব্যাপ্তি নেই, শেষ নেই।কোনো শুরুও নেই।

অনন্ত পথে, নাকি সময়ের যাত্রায় নেমে পড়েছে ওরা দুজনে, মহাকালের হাত ধরে।

কৌস্তুভ সামনের দিকে তাকাল। কস্তূরীর মুখটাই সে শুধু দেখতে পাচ্ছে। আর কিছু নয়। সেই অনৈসর্গিক কুয়াশায় হারিয়ে গেছে জাগতিক কস্তূরীর দেহের বাকি অংশ - তার সুন্দর গলা, শাঁখের মতো কান, দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ি ঢেউয়ের মতো মাদক বুক, তার মদির নাভি, তার স্বপ্নিল নিতম্বের হারানো ছন্দ।

কস্তূরীর চোখের দিকে আবার তাকাল। চাহনি অবাক করে দিল কৌস্তুভকে।

এই অতল দৃষ্টি সে এর আগে কোনো মেয়ের চোখে দেখেনি।

সেই দৃষ্টির মধ্যে

কোনো আমন্ত্রণ নেই...

কোনো বিসর্জন নেই...

কোনো ভড়ং নেই...

কোনো ছলাকলা নেই...

আবার কোনো অবহেলাও নেই।

অনেক না-থাকার মধ্যেও কী যেন একটা রয়েছে। এমন কিছু, যা সে এর আগে দেখেনি কখনো। এক স্থির দ্যুতিতে মেয়েটির চোখদুটি উজ্জ্বল।

শুকতারার মতো জ্বলজ্বলে,

সন্ধ্যাতারার মতো শান্ত নিবিড় স্বপ্নিল।

স্বপ্নে দেখা রাজকন্যার রূপকথা।

পাখির নীড়ের চেয়েও অনেক বেশি স্নিগ্ধ।

কৌস্তুভ অবাক চোখে চেয়ে রইল। কস্তূরী ভুলে গেছে তার না-পাওয়ার অঙ্ক। চাওয়ার মাত্রাহীন মোহনা। কৌস্তুভও ভুলে গেছে তার পুরোনো ঠিকানা।

আস্তে আস্তে ওরা দু'জন সেই স্নিগ্ধ অচেনা কুয়াশার মধ্যে গলে গলে মিশে যাচ্ছে। সেই সময় হঠাৎ ওদের মনে হল, সময় স্থির হয়ে গেছে। পেছনের অতীত আর সামনের ভবিষ্যৎ যেন হারিয়ে গেছে। সময় হঠাৎই একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়ে স্থির। সেই সঙ্গে বিন্দুটি যেন বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে।

না... না...

সামনেও নয়, পিছনেও নয়...

বরং উল্লম্বভাবে।

সময়ের বলিরেখা পথের গতি পালটে ফেলেছে। সরে যাওয়া মরীচিকার মতো দিগন্ত ছেড়ে শাশ্বত সত্যের ঊর্ধ্বলোকে।

সেখানে ওদের কোনো অতীত নেই।

সেখানে ওদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

সেখানে শুধু দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান।

সময় যেন সেই বর্তমানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে।

সেখানে কৌস্তুভ আর কস্তূরী ছাড়া কেউই নেই।

কিছুই নেই।

ভালো নেই...

মন্দ নেই...

আলো নেই...

অন্ধকার নেই...

শব্দ নেই...

বর্ণ নেই...

গন্ধ নেই...

স্বাদ নেই...

স্পর্শ নেই...

এক অকল্পনীয় রূপহীন অরূপ জগতের সিংহদরজা তাদের জন্য খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে মহাকালের পথ বেয়ে।

দুজনেই অবাক হয়ে দেখছিল বিশ্বপ্রকৃতির এই আজব খেলা। ওরা জানতেও পারল না, যা অনুভব করছে, তা ওদের চেনাজানা সময়ের অচেনা চতুর্থ তূরীয় মাত্রা।

যা চেতনার বাইরে থাকা উল্লম্ব সময় বা ভার্টিকাল টাইম।

দুজনের অন্তর থেকে বেরিয়ে এল, এক না বলা ওঙ্কারধ্বনি ‘তোমাকে...’

আলতো হাতে কস্তূরী গুঁজে দিল গোলাপটা কৌস্তুভের গিলে করা পাঞ্জাবির বোতামের ফাঁকে। তারপর উঠে, শিথিল পায় স্মিত হেসে চলে গেল ঘরের ও-প্রান্তে।

কে যেন কৌস্তুভের মনের কম্পিউটারে বোতামগুলো নিয়ে খেলছে তখনও। কস্তূরী তাকিয়ে আছে তার দিকে নীরবে, পলকহীন ভালোবাসায়।

এক্সপ্লোরার খুলে কেউ দেখছে ফাইলটার নাম ‘তোমাকে...’ কেউ খুলে দেখছে কারও স্বপ্নে গাঁথা গল্পের আকারে। কি-বোর্ডের বোতামগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে যাচ্ছে সেই আকারহীন রচয়িতা আনাড়ি ভাবে। সুরতরঙ্গের লহরার স্বরলিপি খুঁজছে। কিন্তু সে স্বরলিপি তো লেখাই হয়নি। এক পলকে, মুহূর্তে।

কস্তূরীর স্মিত হাসিটুকু যেন সপ্তসুর তুলছে না-জানা ঝংকারে। সে সুরের কোনো তাল-লয় নেই। সুর-তাল-লয় যেন বাঁধা পড়ে গেছে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ পেরিয়ে চেতনা থেকে অবচেতনে।

মনে হল কেউ বুঝি কৌস্তুভের মনের কি-বোর্ডে টাচ-প্যাডটায় হাত বুলিয়ে পয়েন্টারটা নিয়ে গেছে ‘তোমাকে...’ ফাইলটার দিকে। মাউস টিপে হাইলাইট করছে। তারপর ডান দিকের কোণায় হাত রেখে ‘ডিলিট’ বোতামটা নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক নাড়াচাড়া।

কী হবে সাদা স্ক্রিনের ফাইলটা কল্পনার খাঁজে রেখে?

কস্তূরীর দরজা দিয়ে মিলিয়ে যাওয়া অবয়ব শেষ বারের মতো দেখে আলতো চাপ দিল ‘ডিলিট’ বাটনে। মুছে গেল সব জমানো কল্পনা, হারিয়ে গেল গল্পটা, সেই না-লেখা চিঠি ‘তোমাকে...’

কৌস্তুভ অন্যমনস্কভাবে কস্তূরীর যাওয়ার পথে চেয়ে রইল। একবার রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকাল। ঘড়ির কাঁটা দুটো, থুড়ি তিনটে, মালিকের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করে উঠল।

কৌস্তুভ সেই ভাষা না বুঝেই আলতো হাসল। তারপর আপন মনে বলল, ‘‘সময়, তোমাকে...’’


ক্যানভাসে
অনিরুদ্ধ বসু

ক্যানভাসে

CANVASE
Published by **SMRITI PUBLISHERS**
Website: www.smritipublishers.com

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৪
প্রথম ই-বুক প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৪

প্রচ্ছদপটঃ অদিতি চক্রবর্তী
অলংকরণঃ স্বপন দত্ত

উৎসর্গ

আমার পিতৃ স্থানীয়
অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

যাদের সহায়তা এই লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
দেবাশিস বসু

ভূমিকা

ভিবজিওর শব্দটার অর্থ আমাদের সবারই জানা। সূর্যের সাদা আলোর বর্ণালির সাত রং-এর ইংরেজি আদ্যক্ষরগুলিকে পরপর সাজালে এই শব্দটি পাওয়া যায়। তার মানে সাদা রং ভেঙে এই সাতটি রং মেলে। বিপরীত ভাবে দেখলে, সাতটি বিভিন্ন রং মিলে তৈরি হয় সাদা রং।

পিওর ম্যাজিক!

আবার এই দৃশ্যমান রং-এর জগতের ওপারে আছে এক রংহীন জগৎ, অতি বেগুনি আর লাল উজানি আলোর এক ভিন্ন রাজ্য। সেখানে পৌঁছতে পারলে কোথায় রং? মানুষের চোখ সেখানে হয়ে পড়ে অকেজো। অনুভূতির অন্য স্তরে সেখানে বিরাজমান অন্য ইন্দ্রিয়ের অনন্য অনুভূতি।

মানুষও ঠিক এ রকম নয় কি? প্রতিটি মানুষের চরিত্রই তো কত রকম রং-এর, সাত বা সাতাত্তর, কেউ কি খেয়াল করে? কখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একটি বিশেষ রং, আর দর্শকরা বলে 'বাঃ!' কখনো বা ঝলসে ওঠে অন্য কোনো রং, আর সেই দর্শকরাই অবাক হয়ে বলে 'আরে, এরকম তো আগে দেখিনি!' আসলে সবই তো সেই জীবন নামক প্রিজমের খেলা। একই জন, বিভিন্ন প্রকাশ। আরও গভীরে যদি কেউ ডুব দেয়, তবে হয়তো পৌঁছে যাবে সেই রং-এর ওপারের অপ্রকাশ জগতে, যেখানে একজন বর্ণময় মানুষ হয়ে ওঠে অবচেতনের আবছায়া।

এই যে মানব চরিত্রের রং-এর খেলা, এটা দেখার এক টুকরো খোলা জানালা অনিরুদ্ধ বসুর এই উপন্যাসটি। অনিরুদ্ধ বরাবরই নতুন নতুন আঙ্গিক নিয়ে লেখে। লেখা নিয়ে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করে। এই উপন্যাসটি এক নতুন ধারায় লেখা। একই নারীকে নিয়ে সাতটি ছোটগল্প, আর তারপর সব মিলে মিশে একটি উপন্যাস – এ যেন সেই সাত রং-এর খেলা। ভিবজিওর মিলে মিশে সাদা।

তারপর কেন্দ্রীয় চরিত্রটি (প্রথাগত নায়িকা বলতে আমার কুণ্ঠা হচ্ছে!) এক সময় খুঁজে পায় তার রঙিন বাইরের খোলসের অন্দরের গভীর বর্ণহীন অন্তর্সত্ত্বাকে। এ যেন ভিবজিওরের ওপারের অতি বেগুনি বা লাল উজানি আলোর খোঁজ পাওয়া।

জানি না, আর কেউ এ ভাবে মানবী চরিত্র বিশ্লেষণ করে উপন্যাস লিখেছেন কি না। তবে বাংলা ভাষায় আমরা যারা মেন স্ট্রিমের বাইরে দাঁড়িয়ে, নতুন কিছু বলার বা লেখার চেষ্টা করছি, তারা স্বতঃস্ফূর্ত সাধুবাদ জানাচ্ছি অনিরুদ্ধকে, তার এই অসাধারণ প্রচেষ্টার জন্য।

আশা করি মননশীল পাঠকরাও একমত হবেন।

দুর্গাপুর

আগস্ট ২০১৪

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়

শুরু...

“আপনি আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখবেন?”

ফেসবুকের মেসেজ বক্সে মেসেজ দেখে চমকে উঠলাম। একজন মহিলার আবদার! কিন্তু কে এই মহিলা? প্রোফাইলে গিয়ে দেখলাম ‘ফেসবুকের অসংখ্য ‘ফ্রেন্ড’ এর তালিকার মধ্যে একজন। পরিচয় জানি না। তাকে চিনি না। তার আসল পরিচয়টাও যে কী, সেটাও তো অজানা! একটা ভারচুয়াল প্রোফাইলের ওপর কী গল্প লেখা যায়? জীবন থেকে বিচ্যুত এক অলীক কল্পনার মাধুরীতে ঢাকা একটা অস্পষ্ট অবয়ব। ধোঁয়াশায় ভরা এক নারী।

প্রোফাইলের ছবিগুলো দেখলাম। একবার... দুবার... বেশ কয়েকবার। সুন্দরী তো বটেই। এর আগে তো চোখে পড়েনি! হয়ত ব্রাউজ করতে করতে ছবিটা কখনও সামনে আসেনি। তাই ‘ফ্রেন্ড’ লিস্টে থাকলেও ঠিক চেনা হয়ে ওঠেনি।

“না জেনে কি গল্প লেখা যায়? সম্ভব না” মেসেজটা পোস্ট করে ভাবলাম, ঠিকই তো। না জেনে, না চিনে, না বুঝে কি কাউকে নিয়ে লেখা যায়? বাজারে গাঁজাখুরি গল্পের কমতি নেই। আমি আর সেই ভিড়ে নিজেকে জড়াই কেন? ভিত্তিহীন অসংলগ্ন সৃষ্টির অন্ধকারে? যেখানে স্বপ্ন আর বাস্তব তালগোল পাকিয়ে গেছে?! সৃষ্টির ব্যাপক প্রাণহীন উল্লাসে। হয়ত বা প্রাণ প্রাণোজ্জ্বল হয়ে ভাসছে – চাটুকারিতার দমকা বাতাসে। অস্তিত্বহীনতার শেষ সোপানে দাঁড়িয়ে নিজেদের ফলাও করা স্লোগানে...

“অন্তত আপনার বইয়ের কভার পেজে আমার ছবিটা ছাপাবেন?” মেসেজ-বক্সে কাতর মিনতি মাখা উত্তর।

মানে স্বপ্ন দেখতে চাইছে নিজেকে নিয়ে। কিংবা স্বপ্নে ভাসাতে চাইছে আমাকে। ঠিক কোনটা বুঝলাম না। তবে স্বপ্নের চেতনার এক বাস্তবিক রংমশাল জ্বালাতে চাইছে কোথাও একটা - চেতনার ক্যানভাসে। হয়ত চেতনার ওই সাদা ক্যানভাসে কিছু আঁকতে চাইছে। মনকে সাজাতে চাইছে রামধনুর সাতটা রং-এর বাহারে, নতুন করে একটা তুলির স্পর্শ টেনে দিতে। তবুও সে স্পর্শকে চেনা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না। ধরতে গিয়েও ক্রমশ অস্পষ্ট আকারটা আবার নিরাকার হয়ে যাচ্ছে।

ক্ষণিকের ভেসে ওঠা মুখটা আবার না-পাওয়ার ভাসমান আকাশে হারিয়ে যাচ্ছে নানা রং-এর রামধনুর বাহারের বাইরে - না-রং-এর তুলিতে আঁকা এক ছন্দ, সুর, গন্ধ মাখা বর্ণচ্ছটায়। বাস্তবের পৃথিবীর অর্থহীন

ঘনঘটায়। তবুও মন যেন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বার বাইরে অবলুপ্তির অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে একটা অস্পষ্ট অবয়ব।

নামটাও ঠিক কি না জানি না। এই ভারচুয়ালটির পৃথিবীতে কোনটা যে সত্যি আর কোনটা যে মিথ্যে বোঝবারও যো নেই!

ধরা যাক তার নাম নন্দিনী।

নামে কী আসে যায়? নন্দিনী না হয়ে পদ্মিনী, দর্পিণী, মৃগনয়নী হলেও কিই বা আসে যায়? একটা ছবির না-চেনা অবয়ব। দেখতে সফিস্টিকেটেড, বেশভূষায় আজকের যুগের বৈশিষ্ট্য, প্রসাধনে নিজেকে সুন্দর করে দেখানোর প্রয়াস। মনে হয় উত্তর চল্লিশের ধারে কাছে কিংবা হয়ত একটু বেশি।আধুনিকা গৃহিণীকে নিয়ে না চিনে অনেক কিছুই তো লেখা যায়। নাই-বা দেখলাম তাকে। নাই-বা চিনলাম তাকে।

লেখকের বাস্তবিক কল্পনার ডানা মেলে ভেসে গেলে, মন্দ কী? চেষ্টা করে দেখা যাক না কেন।

হয়ত একটা কাহিনিও হয়ে যেতে পারে?

প্রথম নন্দিনী

সময় যে আর কাটতেই চায় না। সকাল ন'টার মধ্যেই রান্না শেষ। ততক্ষণে অনীশ স্কুলে বেরিয়ে গেছে। এখন বড় হয়ে গেছে। স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয় না। আগামী বছর মাধ্যমিক দেবে। ঘর ঝাঁট দিয়ে, স্নান সেরে, হেয়ার-ড্রায়ারে বব চুলটা শুকিয়ে হাউস কোটটা ঠিক করতে করতে নন্দিনীর মনে হল, বিয়ে করেও শেষ পর্যন্ত ঘরটা আধুরা রেয়ে গেল। ছবিটা আঁকতে গিয়েও ক্যানভাসে ছবিটা আঁকা হল না। শুধু পড়ে রইল তার আদরের অনীশ। ওকে বুকে আগলে এতটা বছর কেটে গেল, অনীশকে মানুষ করতে করতে। নতুন করে ছবিটা আঁকতে গিয়ে অসমাপ্ত রয়ে গেল ক্যানভাসটা।

কেন যে এমন হয়?

যেদিন অর্ণবকে বিয়ে করেছিল, দুজনে মিলে নতুন একটা ছবি আঁকার স্বপ্ন দেখেছিল। ওর হাত ধরেই মাঝ সমুদ্রে ভেসে বেড়িয়েছিল দেশ থেকে দেশান্তরে। বিয়ের পর প্রথমবার অর্ণব তাকে নিয়ে গেছিল সঙ্গে করে। এক সপ্তাহের ওপর জাহাজে ভেসে বেড়ানো – কলকাতা থেকে হনলুলু। ট্রিপটা ছোট হলেও গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে অর্ণবের সাহচর্য। অন্যদিকে নতুন জীবনের স্বপ্ন। হনিমুনের মাধুর্যে অসীম সমুদ্র আর গভীর নীলের ক্রেডেলে, মধ্য প্যাসিফিকে অনীশের ভ্রূণ নিজের গর্ভে ধরে ঘরে ফিরেছিল নন্দিনী।

অর্ণব বলেছিল “আফটার দিস প্রব্যবলি ইউ কান্ট একম্প্যানি মি এনি মোর। ইন দ্য মিড ওসেন মেটারনিটি সার্ভিসেস আর নট ওয়েল গিয়ারড...”

সেই গিয়ার ঠিক রাখতেই, এত বছর ধরে, একা সংসারের গাড়ি সামলে আর জীবনের স্টারটার চাপা হল না। অনীশ দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই পিক-আপ নিয়ে ছুটবে। কিন্তু নন্দিনীর গাড়ি স্ট্যাটিক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সিডি ব্লকের বাড়িটার মধ্যে – সামনের মাঠটার দিকে উদাস চোখে যৌবনের বাতিগুলো আস্তে আস্তে নিভে যেতে দেখে, অপরাহ্ণের ধূসর ছবিটা ফুটে ওঠার দিকে উদাসীন ভাবে চেয়ে। না-পাওয়ার পাহাড়টাকে ক্রমশ মেনোপসের দিকে হামাগুড়ি দেওয়া তার পূর্ণ যৌবনকে পাথেয় করে, না পাওয়ার রংটাকে নতুন তুলির টানে ভরিয়ে দিতে, একটা না-চেনা ব্ল্যাঙ্ক ক্যানভাসে।

ক্যানভাসটা বোধহয় চিরকালই ব্ল্যাঙ্ক। তবুও বারবার নতুন রং দিয়ে তাকে ভরতে চেয়েছে। কিংবা সাজাতে চেয়েছে তাকে জীবন থেকে কুড়িয়ে আনা ধূসর মাটির প্রলেপ দিয়ে, সাজাতে তাকে নতুন রং-এর সম্ভারে। যতবারই আঁকতে চেয়েছে ছবিটা, আবার তা মিলিয়ে গেছে রং থেকে বেরং-এ, বর্ণ থেকে বর্ণহীন ধূসরতায়, পাওয়া থেকে না-পাওয়ার চিত্রগাথায়। রং-এর ঔজ্জ্বল্য থেকে বর্ণহীন ক্যানভাসে।

কোন রং-এর ছবি? কার ছবি? কীসের ছবি? কেনই বা তার নারী মন বারবার একটা ছবি আঁকতে চায়? জৈবিক জীবনে স্বাক্ষর আঁকতে চায় পূর্ণতার রঙে ভরা ক্ষুদ্র জীবনের পরিব্যপ্তিতে?

তখন ইন্দ্রনীলের ঠোঁটটা নতুন কিছু চাইত। নন্দিনীর কাঁপা কাঁপা ঠোঁটের রঙে মিলিয়ে ফাগুয়ার হোলি খেলতে।

"উঃ..." নন্দিনীর কাঁপা কাঁপা দেহের, বুকের ওঠা নামার ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে।

দেহ খুঁজত দেহ, ছন্দে আনন্দে আবেগের বন্দনা গানে। আজ এত বছর পরে, একটু ভারী হয়ে যাওয়া সুঠাম দেহটা কী আজও কাঁপে? অস্থির আবেগে একা ঘুম ভাঙা অন্ধকারে? মাঝরাতের ছটফটানি কী মিশে যায় চাতকের স্লোগানে! না-পাওয়ার ভাষাহীন বেদনার তানে? নিজেকে আবার খুঁজে দেখার অপরিচিত অভ্যুত্থানে?

ফোনটা বেজে উঠল "নন্দিনী... আমায় চিনতে পারছ?"

"কে?" স্মৃতির ঝাঁপিতে কোন চেনা সুরকে খুঁজছে নন্দিনী।

"চিনতে পারলে না?"

"না তো। কে আপনি?"

ওপার থেকে ভেসে এল একটা মুচকি হাসির শব্দ। তারপর একটা কাশির আওয়াজ। ঠিক ক্রনিক স্মোকারদের যেমন হয়।

"আরেকটু ভেবে দেখ। স্মৃতির পাতা থেকে..." নন্দিনীর মনে হল কেউ যেন কানামাছি খেলছে।

"নাঃ। চিনতে পারলাম না..."

"আর একটু ভেবে দেখ..."

বিরক্ত হয়ে নন্দিনী বলল "নামটা বলুন। তা না হলে ফোন কেটে দিচ্ছি"

ওপাশ থেকে ভেসে এল "বেশ। আমিই কেটে দিলাম। ভাববার সময় দিচ্ছি। ভেবে দেখ"

কলার নিজেই লাইনটা কেটে দিল নন্দিনীকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে। এক শূন্যতার মধ্যে আরেক শূন্যতা যোগ করে। সাদা পট সাদা রয়ে গেল। রঙিন হল না তুলির স্পর্শে। সেই শূন্যতার মধ্যে, নন্দিনী অতীতের পাতাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখার চেষ্টা করল, কে এই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। অতীত থেকে বর্তমানে এমন কাউকে মনে করতে পারল না, যে ধোঁয়াশায় রেখে নন্দিনীকে ফোন করতে পারে। এ জীবনে অনেক বসন্ত থেকে তাপদগ্ধ গ্রীষ্ম পার হয়ে এসেছে। কিন্তু হেঁয়ালি মেশানো অতর্কিতে হঠাৎ ফোন করতে পারে, এমন কারও কথা স্মৃতির র‍্যাম মেমরি থেকে ক্যাসেও নেই, যে তাকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

নারায়ণ নীচের বেল টিপতেই দরজাটা খুলে দিল নন্দিনী। নন্দিনীর হাতে থলিটা এগিয়ে বলল "আপনি বলেছিলেন কচি পাঁঠার মাংস আনতে। দোকানদার বলল পাঁঠার চেয়ে মুরগি বয়সে আরও বেশি কচি। তাই চিকেন নিয়ে এলাম"

"বেশ করেছ" ঝাঁঝিয়ে উঠল নন্দিনী। নারায়ণকে নিয়ে আর পারা গেল না। ও শুধরাবে না। তবুও তো একজন ফাইফরমাশ খেটে দেয়। তা না হলে তো নন্দিনীকেই রোজ রোজ বাজারে ছুটতে হত।

ব্যাগ খুলে দেখল অন্তত চিকেনটা কেটে এনেছে। ভাগ্যিস! বলা তো যায় না। হয়ত গোটা চিকেনটাই নিয়ে আসতে পারে! নারায়ণের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

অনীশ পাঁঠার মাংস ভালবাসে বলেই তো আনতে দেওয়া। উঠতি বয়সে একটু চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাবে না, তো কি বুড়ো বয়সে খাবে? যখন সব দাঁত পড়ে গেছে? নন্দিনী ভাবতেও পারে না অনীশ বুড়ো হয়ে যাবে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার অর্ণব বিয়ের কয়েক বছর পরেই হারিয়ে যাওয়ায়, তাকে ইতিহাসের সাজঘরে সাজিয়ে, অনীশকে নিয়েই বাঁচতে শিখেছে নন্দিনী।

কালকে আবার নিজেকে গিয়েই কচি পাঁঠা কিনে আনতে হবে। মুরগির মাংসটা ফ্রিজে ঢুকিয়ে নারায়ণের দিকে তাকিয়ে বলল "মুরগিটা বুড়ো নয় তো?"

"একদম নয়" নারায়ণ জিভ কেটে বলল "দোকানদার বলল একেবারে কচি... পোলট্রির মুরগি তো... কচি ঘাস খেয়ে বড় হয়ে উঠেছে"

পয়েন্টলেস। নারায়ণের যুক্তির পৃষ্ঠে কথা বলা বাতুলতা মাত্র। নন্দিনীর ক্ষমতা নেই নারায়ণের যুক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার।

"ভাবছিলাম তোকে কিছু শাকসবজি আনতে দেব। থাক...কালকে আমি যখন বেরব, তখন নিজেই কিনে আনব"

"বলুন না দিদিমণি...আমি কিনে আনি..."

"না থাক। আমিই কিনে আনব" একটু থেমে বলল "যা তো – ছাদের গাছগুলোতে একটু জল দিয়ে আয়। কতদিন দেওয়া হয়নি। আবার না মরে যায়..."

নারায়ণ বেরিয়ে যেতেই আবার ফোনটা বেজে উঠল "এখনও চিনতে পারলে না?"

মহা জ্বালাতন তো। আবার সেই লোকটা বলে চলল "বাঃ এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে? ইন্দ্রনীল আর শ্রীমিতাকে?"

নন্দিনী বাঁ হাতটা অন্যমনস্কভাবে গালের ওপর বোলাতে লাগল। কে এই লোকটা? কতটুকু জানে নন্দিনী সম্বন্ধে? যে ষোলো বছর আগেকার ঘটনাকে ফিরিয়ে আনছে এত বছর পর!

বহুদিন আগের কথা। তখনও নন্দিনীরা কলেজে পড়ে। সেদিন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। তখন ইন্দ্রনীলের কাকুলিয়ার ফ্ল্যাটে। নন্দিনীর বিবস্ত্র দেহটা তার প্রতিটা স্পর্শ দিয়ে উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে ইন্দ্রনীলের রোমশ দেহের প্রতিটা কণায়। আলো আঁধারিতে না বোঝা গেলেও, নন্দিনী বেশ অনুভব করছিল, ঢোঁড়া সাপটা ক্রমশ কেউটের আকার ধারণ করছে। খালি ছোবলটার অপেক্ষায় থর থর করে কাঁপছে নন্দিনীর দেহটা... আর কয়েক মুহূর্ত... এই বুঝি ইন্দ্রনীল একশো আশি ডিগ্রি ডিগবাজি খাবে...

এমন সময়, ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে বাইরের টিপটিপ বৃষ্টিকে দমকা হাওয়ায় রূপান্তরিত করে শ্রীমিতা ঘরে ঢুকে নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল "হাউ ডেয়ার ইউ স্লিপ উইথ মাই লাভার?"

নন্দিনী জানত শ্রীমিতা ইন্দ্রনীলের বাড়িতে পিজি থাকে। অন্তত ইন্দ্রনীল সেকথাই বলেছিল। থাকতেই পারে।'লাভার' শব্দটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল।

'লাভ' এর সংজ্ঞাটা ইন্দ্রনীলের কাছে কখনও জানতে চায়নি নন্দিনী। সেই মুহূর্তে শ্রীমিতাকে তার মানে বোঝানো বাতুলতা মাত্র। নন্দিনী নিঃশব্দে নিজের বিবস্ত্র দেহটাকে ইন্দ্রনীলের দেহ থেকে তুলে নিজের প্যান্টি, নীল জিনস আর কালো জ্যাকেটটা গলিয়ে কাকুলিয়ার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

এক অন্য জীবন! ফেলে আসা জীবনকে পেছনে রেখে আবার নতুন করে বাঁচতে চেয়েছিল তার মুছে দেওয়া ক্যানভাসে নতুন রং ছড়িয়ে। ইন্দ্রনীলকে পেছনে ফেলে, অর্ণবের হাত ধরে নতুন জীবন শুরু করে নতুন তুলিতে নতুন চিত্রপট আঁকতে।

সে তো বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু এই অজ্ঞাত ব্যক্তি আবার সে কথা মনে করিয়ে দিল।

"কে আপনি? আমি তো ওই নামের কাউকে চিনি না!"

"সত্যি?" ওপাশ থেকে একটা তির্যক হাসির আওয়াজ ভেসে এল।

যেন বিদ্রুপ করছে নন্দিনীকে। না কি, অন্ধকারের চাদরে মোড়া ওর সত্ত্বাটাকে। না, রি-সাইকল বিন থেকে বার করে আনছে বর্জিত নিজের আমিটাকে? যে আমিটাকে দেখেও দেখতে চায়নি এতদিন।

"কেন বারবার ফোন করে আমায় বিরক্ত করছেন? কে আপনি?"

"সেটা তো আপনারই বলবার কথা"

"আমি রাখছি। আমায় দয়া করে আর ফোন করবেন না"

নন্দিনী আর কথা না বাড়িয়ে কেটে দিল। মনে একটা ভয় দানা পাকতে শুরু করেছে এই ঘোস্ট কলারকে নিয়ে। অনীশকে নিয়ে একা থাকে। তাও আবার পাড়া বর্জিত সল্ট লেকের মত জায়গায়। এতদিন পর্যন্ত

শান্তিতেই ছিল। একা একাই থাকতে ভালবাসে। গান শুনে আর কম্পিউটারে ফেসবুক করে সময় কেটে যায়। কখনও রং আর তুলি নিয়ে এলোপাথাড়ি খেলা।

সেই সময়ের ছন্দের মধ্যে এ কোন দ্বন্দ্বে ফেলে দিল তাকে। দুপুরের খাওয়ার আয়োজন করতে করতে স্মৃতির ব্যাক-আপ ড্রাইভ-এ হাতড়ে বেড়াচ্ছিল সেই ঘোস্ট কলারের অস্তিত্ব।

সেদিন রাতে ইন্দ্রনীলের ফ্ল্যাটে তো আর কেউ ছিল না। থাকারও কথা নয়। কলকাতায় থাকার জন্য বাবার কাছ থেকে পাওয়া ফ্ল্যাটটা। পরে শুনেছিল ইন্দ্রনীল শ্রীমিতাকে বিয়ে করলেও শেষ পর্যন্ত সে বিয়ে টেকেনি। ইন্দ্রনীলের কথা আজ আর মনে পড়ে না। তাকে অতীতের রি-সাইকল বিনে ফেলে ক্যানভাসের ছবিটা মুছে দিয়েছিল। শুধু পার্মানেন্টলি ডিলিট করেনি। সেই আন-ডিলিটেড ছবিটা আবার যেন নতুন আঙ্গিকে ভেসে উঠছে।

ইন্দ্রনীলের ছবিটা বিনে ফেলে দিলেও, ইন্দ্রনীলের সঙ্গে সম্পর্কের মধুর অনুভূতিগুলো কী করে এত তাড়াতাড়ি মুছে দেবে? প্রথম জীবনের দৈহিক উন্মাদনা। রিপ্রেসড আধুনিক বাঙালি নারীর শরীরিক বন্দনা। নিজের অচেনা যৌবনের নতুন চেতনা। ক্ষুধার্ত শরীরটা প্রতিটা কোষের মধ্যে নারীত্বের অঙ্গিকার খুঁজছে। সৌন্দর্যের উপাসনায়, মনের বাসনার পূর্ণতায়। ঈশ্বরের দেওয়া অনুভূতিটার পার্থিব বহিঃপ্রকাশ।

শ্রীমিতাকে কী ইন্দ্রনীল প্রশ্রয় দিয়েছিল? বুঝতে পারেনি নন্দিনী। হয়ত দিয়েছিল বলেই শ্রীমিতা সদর্পে কথাগুলো বলতে পেরেছিল নন্দিনীকে। এখন মনে হয় নিশ্চয়ই দিয়েছিল। শ্রীমিতার সঙ্গে সম্পর্কটা কতদূর কিংবা কতখানি নন্দিনী বুঝে উঠতে পারেনি কোনোদিন। আজকেও নয়। সেই মুহূর্তে আগামীর ছবিটা ইন্দ্রনীল আঁকতে চেয়েছিল নন্দিনীকে নিয়ে। অন্তত নন্দিনীর তাই ধারণা হয়েছিল।

"আমার লুকানোর কিছু নেই। আমি ওকে আমার কাকুলিয়া রোডের বাড়িতে থাকতে দিয়েছি। তার মানে ওর সঙ্গে যে আমার কোনো রিলেশন থাকবেই, এমন নয়। এক ছাদের তলায় থাকা মানেই প্রেম নয়। ভবিষ্যৎটা কী তোমার সঙ্গে আঁকা যায় না?"

"কেন যাবে না?" ইন্দ্রনীলের দিকে ফিরে নন্দিনী বলেছিল।

"একটা সেয়ারড অ্যাকমডেশনে কোনো রিলেশনশিপ হয় না। আমাকেও তো বাঁচতে হবে" একটু থেমে বলেছিল "আমার মতো করে"

বুঝতে একটুও ভুল হয়নি যে শ্রীমিতাকেই ইঙ্গিত করেছিল ইন্দ্রনীল... কেন ভাঙল? কেন শ্রীমিতা আজও কাকুলিয়ার ফ্ল্যাটে থাকে, এসব প্রশ্নের মধ্যে ঢুকতে চায়নি নন্দিনী। ব্যাপারটা যখন তাকে কেন্দ্র করে নয়, তখন এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা অবান্তর।

"নিশ্চয়... তাহলে আমাকে নিয়ে বাঁচবে?"

“আপাতত, সেটাই তো চোখের সামনে ভাসছে”

সেই স্বপ্নে দেখা ছবিটা ক্যানভাসে রূপ দেওয়ার আগেই, সেই টিপ টিপ ভেজা রাতে তা মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গিয়েছিল সেই রাতে, শ্রীমিতার চিৎকারে। নন্দিনী বুঝেছিল, ওদের সম্পর্কটা যাই থাক না কেন, শুধু পিজি অ্যাকমডেশনে সীমাবদ্ধ নয়। দৈহিক খিদে ছাড়া নন্দিনী সেখানে বাড়তি। আর যাই হোক না কেন, ইন্দ্রনীলকে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা ছেলেমানুষি। যদি অন্য একটা সম্পর্ক হয়েও থাকে, একটা সম্পর্ক ভেঙে আরেকটা সম্পর্ক তৈরি হলেও স্থায়ী হয় না। সেটাও ভেঙে যাবে। কিংবা শ্রীমিতা সেটা ভেঙে দেবে। এক অস্থির জীবনের চোরাবালিতে ঘর ভেঙে শান্তির নীড় রচনা করার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র।

তারপর বহুবার নানা রঙে ছবি আঁকার নিরলস প্রয়াস। কত নতুন মানুষ। কত নতুন অভিজ্ঞতা। চলার পথে যে এত রং ছড়িয়ে আছে, জানা ছিল না। তবুও রংগুলো কুড়োতে গিয়েই একটা ছবি আঁকার স্বপ্ন দেখা। ছবি আঁকতে যে বড় ভালবাসে নন্দিনী। কিংবা সব নারীই একটা নিটোল ছবির স্বপ্ন আগলে সারা জীবন বাঁচতে চায়।

নন্দিনীও চেয়েছিল।

আজ এই ফোন পাওয়ার পর বুঝতে পারছে, হয়ত কিছুই মোছেনি। শুধু ব্যাক-আপ ডিস্কে পড়েছিল। এখন আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে। ফণা তোলার চেষ্টা করছে।

দুপুরের খাওয়ার পর ইউসুয়ালি ঘুমোয় না নন্দিনী। সিরিয়াল দেখে, বা ফেসবুক করে। যতক্ষণ পর্যন্ত অনীশ স্কুল থেকে না ফেরে। আজ আবার ফেসবুক খুলতেই ইন বক্সে একটা মেসেজ দেখে চমকে উঠল।

“অত সহজেই কি সব কিছু ভোলা যায়? ভুলতে পারবে শ্রীমিতাকে? ভুলতে পারবে ইন্দ্রনীলকে?”

কে মেসেজ পাঠিয়েছে? নামটা দেখল ‘মনের আয়নায়’। অবশ্যই ছদ্মনাম। প্রোফাইল খুলে দেখল অনেক ফ্রেন্ড লিস্টের মধ্যে মনের আয়নায়ও আছে। একাই ফ্রেন্ড, কেবল নন্দিনীর সঙ্গে। হয়ত এই ফেসবুক থেকেই নন্দিনীর হদিস বার করেছে। প্রোফাইলে শুধুই কতগুলো অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্টের ছবি। পেশায় লেখা আছে আর্টিস্ট। লোকটির নিজের কোনো ছবি বা তার চেনা পরিজনদের কোনো ছবি নেই!

বেশ কিছুক্ষণ প্রোফাইল নিয়ে নাড়াচাড়া করার পরও আর নতুন কোন তথ্য খুঁজে পেল না। কোন অজান্তে ফ্রেন্ড লিস্টে ঢুকে পড়েছে, এই নাম-না-জানা আর্টিস্ট। কী ছবি আঁকতে চাইছে জানে না। নন্দিনীকে কোথায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, তাও জানে না। একটা পরিচয়হীন অস্তিত্ব তার জীবনে উঁকি মারতে চাইছে, ব্যাক-আপকে রিকভার করে – তার বর্তমানের স্ট্যাবিলিটিকে ডি-স্ট্যাবিলাইজ করতে।

নন্দিনী জীবনের ছন্দ থেকে বিচ্যুত হতে চায় না। এই জীবন, তার চলমান ছন্দ, গতি, মাধুর্যটাই বাঁচার একমাত্র হাতিয়ার। সেটা ক্র্যাশ করুক সে চায় না। সুখের পৃথিবীতে এটাই যে তার একমাত্র সম্বল।

সম্বলটাকে হারাতে চায় না নন্দিনী। অনেক অন্ধকার পেরিয়ে অন্ধকারকে আর দেখতে চায় না সে। বেঁচে থাকতে চায় তার একান্ত নিজস্ব স্বপ্নের দিবালোকে।

কয়েক মুহূর্ত।

ব্লক করে দিল ‘মনের আয়নাকে’। হারিয়ে গেল শিল্পী। মুছে গেল আধুরা ক্যানভাসটা কালো রং-এর আঁচড়ের আগেই মাউসের একটা ক্লিকে।

সারাটা দিন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কাটল নন্দিনীর। সে কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারছিল না। সারাক্ষণ মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসছিলো সেই নামহীন ফোনটার কথা। কে হতে পারে? কে? কী চাইছে তার কাছে? ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে? কিন্তু কেন? কী ভাবে? না কি আরো সিনিস্টার কিছু? হাজার প্রশ্ন সারাদিন ওর মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে ভেবে পাচ্ছিল না, কী করবে? কার কাছে যাবে? একেক বার, একেক জনের নাম মনে ভেসে এল। কিন্তু কাউকেই সুটেবল মনে হল না। পুলিশের কাছে যাবে? কিন্তু পুলিশকে কী বলবে? সে ঠিক জানেও না, এটা সাইবার ক্রাইমের মধ্যে পড়ে কি না।

সারাটা দিন কেটে গেল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। সন্ধে গড়িয়ে রাত। একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে সময়টা কাটছিল নন্দিনীর। ডিনারে খাবারগুলো একটু নাড়াচাড়া করেই সে উঠে পড়ল। বিছানায় শোওয়ার পরেও তার সেই অস্বস্তি কাটল না। মনে হচ্ছিল, এখনই বুঝি আবার ফোনটা আসবে। উলটোপালটা চিন্তার ঘেরাটোপ টপকে কখন যে ঘুমের স্রোত এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সে ঠিক নিজেও জানে না।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল ফোনের তীক্ষ্ণ শব্দে। একটানা বেজে চলেছে ফোনটা। নন্দিনী ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। অজান্তেই ঘড়ির দিকে চোখ চলে গেল … পাঁচটা সতেরো! ভোর হয়ে গেছে!

ফোনটা আচমকা থেমে গেল। নন্দিনীর বুকটা ধক ধক করে চলছে। ফোনটা থেমে যাওয়ায় তার মনে হল সে নিজের হার্ট বিট শুনতে পাচ্ছে দামামার মতো জোরে জোরে।

ঠিক সেই সময় হঠাৎ আবার ফোনটা বেজে উঠল …

দ্বিতীয় নন্দিনী

“রুম নম্বর ৪৪৪”

চারতলার চুয়াল্লিশ নম্বর ঘরের দরজাটা বেয়ারা খুলে দিতেই নন্দিনীর মনে হল ডেমিয়েনের রেসারেকশন নয় তো? হলে ওমেন-এর বদলে আরও একটা সিরিস হলিউড ব্লকবাস্টার হয়ে যেত।

মনে মনে হাসল নন্দিনী। অত কী ভাবার সময় আছে?

বেয়ারাকে টিপস মিটিয়ে দিয়ে জিনস-টপস খুলে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। কিছুটা মুহূর্ত নিজের জন্য। তারপর মিঃ বিশ্বনাথের জন্য আসর সাজিয়ে ফেলতে হবে। সাজাতে হবে নতুন উন্মাদনার নতুন ক্যানভাস। মহামান্য অতিথি বলে কথা। ‘মহামান্য’কথাটা মনে হতেই হাসি পেল নন্দিনীর। মহামান্য-র সংজ্ঞাটা কেমন বদলে গেছে ছোটবেলা থেকে। যে পয়সা ছড়ায়, সেই মহামান্য। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে, নন্দিনীর কাছে যারা আসে, তারা সবাই মহামান্য। আজও এই দুনিয়ায় টাকার বিনিময় মান কেনা যায়।

এম জি রোডের দ্য ওবেরয়-তে তো যে সে লোক আসতে পারে না! একমাত্র মিঃ বিশ্বনাথের মতো সত্যিকারের ‘মহামান্য’ লোক ছাড়া। বিজনেস ট্রিপে ব্যঙ্গালুরুতে এলেই এই ৪৪৪ নম্বর কামরা ওর জন্য বাঁধা। বাঁধা কাজের শেষে নন্দিনীর নরম হাতের প্রলেপ। নন্দিনী ইজ ইম্যাকুলেট, ইরিপ্লেসেবল ইন দ্য ইভিনিংস ইন ব্যঙ্গালুরু। নট ইভেন দ্য ইভনিং বিজনেস ডিনারস আর অ্যাজ চার্মিং অ্যাজ ডিয়ার সুইট নন্দিনী।

রেন্ডি!

কথাটা বাজারে শোভা পায়। পাঁচতারা হোটেলের সুইটে নয়। এক ঘণ্টায় দু লাখ টাকা। ফিফটি পার্সেন্ট এজেন্সিকে দিয়ে নিট এক লাখ টাকা হাতে। আর মিঃ বিশ্বনাথের মতো রেগুলার কাস্টমারের সঙ্গে সারারাত কাটাতে পারলে ডিসকাউন্ট নিয়ে আট লাখ টাকা! কম কী? তারপরেও কেউ সাহস করবে ‘রেন্ডি’বলতে? কে বলে ইন্ডিয়া গরিব দেশ? নন্দিনীর তো মনেই হয় না।

কে কী নাম দিল, কী আসে যায়? সম্রাজ্ঞীর কী কোনও নাম থাকে? সে তো শুধুই সম্রাজ্ঞী। ভারতের উঁচু মহলের একচ্ছত্র রানি – নন্দিনী।

একটা ফিনফিনে আকাশি রঙের সিল্কের হাউসকোট পরে, ফ্রিজ থেকে বার করা বরফটাকে গ্লাসে ফেলে, ৪৪৪ নম্বর সুইটে মিঃ বিশ্বনাথের আসার আগে স্টক করা বার থেকে গ্লেনফেডিচ ঢেলে বারান্দায় গিয়ে বসল। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল আকাশের দিকে।

মেঘটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। মেঘের আড়াল থেকে পূর্ণিমার চাঁদটা আত্মপ্রকাশ করছে নিজ দ্যুতিতে। যেন শূন্যতা থেকে পূর্ণতা জানান দিচ্ছে। অন্ধকার থেকে আলোর নিশানা। হোক না সে ধার করা আলো। তবুও তো সূর্যের কিরণের প্রতিবিম্ব। সূর্যকে তাদের দুনিয়ায় ঝলসাতে দিয়ে, তার থেকে ধার করা কিরণ ছড়াবার মধ্যেও তো একটা স্নিগ্ধতা আছে।

মায়ের মুখে শুনছিল, কোনও এক পূর্ণিমা তিথিতে তার জন্ম।

জ্যোতিষ বলছিল "শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে ভোর চারটে চুয়াল্লিশ মিনিটে জন্ম। এ মেয়ের জীবন আলোয় আলোয় ভরে উঠবে"

বাবা বিদ্রুপ করে বলেছিল "এমন ধিঙ্গি মেয়ে, ছোট ছোট জামা পড়ে সারা পাড়া নাচিয়ে বেড়াচ্ছিস। পড়াশোনার বালাই নেই। তোকে দিয়ে কিসসু হবে না"

উঠতি বয়সের ঠিকরে পড়া দেহসৌষ্ঠব। মডার্ন ওয়ান-পিসের দৌলতে চাঁদের আলোর মতো ঠিকরে পড়ছে। সেই ছড়িয়ে পড়া পি এল লাইটের দ্যুতিতে যে তার চারপাশের অন্ধকারের মধ্যে পোকাগুলো কিলবিল করবে না, সে কথা ভাবাও ভুল। সে কিছুই করেনি। শুধু চাঁদের আলোর মতো দ্যুতি ছড়িয়েছে। সেই দ্যুতির রোশনাইয়ে যে কত হৃদয় মুখ থুবড়ে পড়ে ছটফট করেছে আলো আঁধারির বেলাভূমিতে তার হিসেব করেনি নন্দিনী। পড়ে থাকা আধমরাদের নিয়ে ভাবতে গেলে এগোনো যায় না।

ভাবেওনি!

বাবার তির্যক ব্যঙ্গ "যে ভাবে চলছিস কেউ তোকে বিয়েও করবে না। নেহাৎ মেয়ে হয়ে জন্মেছিস তাই তো ফেলে দিতে পারব না"

"তোমাকে আমার বিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমার কপালে যা আছে তাই হবে"ঝাঁঝিয়ে উত্তর দিয়েছিল নন্দিনী।

সেদিন বোঝেনি কথাটা তার জীবনে কতখানি সত্যি হয়ে দাঁড়াবে। সেকথা, প্রবহমান জীবন তাকে পরে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। জ্যোতিষ কী অর্থে কপালটাকে দেখেছিল প্রশ্ন করার সৌভাগ্য হয়নি নন্দিনীর।

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে সিগারেটটা টেবিলের অ্যাশট্রেতে নিভিয়ে মনে মনে হাসল। কোনটা যে আলো, আর কোনটা অন্ধকার, কে জানে? লেখাপড়া শিখে কয়েকটা ডিগ্রি পকেটে পুরে নন্দিনীর কি ক্ষমতা ছিল ঘণ্টায় দু-লাখ টাকা কামাবার? বাবার দেওয়া আদর্শের বুলিগুলো যতই নীতিবাগীশ হোক না কেন, কোথায় সে নীতির আলো জ্বলে, সেটা হয়ত সময়ই বলে দেবে।

তখনও স্কুলে পড়ে। যেদিন রাতে বাড়ি ফিরে বাবার তির্যক ব্যঙ্গ শুনতে হয়েছিল "এই ধিঙ্গি মেয়ে রাতে বেশ্যাবৃত্তি সেরে বাড়ি ফিরলেন!" সেদিন আর নিতে পারেনি। এনাফ ইজ এনাফ। ইট হ্যাস টু এন্ড। এন্ড

নাউ। দুজনের পথ ভিন্ন।

ঈশ্বরই দুজনের পথ আলাদা করে দিয়েছিল। একা একা নিজেই পথের ধ্রুবতারা খুঁজে নিতে।

ঘর থেকে বাইরে। নিশ্চয়তা থেকে অনিশ্চয়তায়। স্থিত চলমানতা থেকে অনির্দিষ্ট পথে হাঁটা। 'ডিসক্রিশন ইজ দ্য বেটার পার্ট অফ ভ্যালার'। নিজেকে সেই ডিসক্রিটলি ডিসক্রিট করে তুলতে গিয়ে ছুটে বেড়িয়েছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। নদীর মোহনা এক সময় মিশে গেছে বিশাল সমুদ্রের জলরাশিতে।

"আই উইল বি এ বিট লেট টুডে"মিঃ বিশ্বনাথের ফোন "হ্যভ ইউ রিচড দেয়ার অলরেডি?"

"ইয়েস। কোয়াইট এ হোয়াইল ব্যাক। টেক ইওর টাইম হোয়াইল আই এনজয় দ্য ফুল মুন"

"বাই অল মিনস... গো অ্যাহেড। উইথ এ ফুল স্টম্যাক। আই কান্ট সি ইউ উইথ এ সালেন ফেস হাঙ্গারি" হাসতে হাসতে ফোনটা কেটে দিল মিঃ বিশ্বনাথ।

পেট আর তার নীচের তাড়নাতেই তো গোটা পৃথিবীটা চলছে। পার্থিব বিশ্বের মহাচক্র তো এই গোলকেই ঘুরছে। আহাঃ! বাবা যদি একথা বুঝত। নীতিকথাগুলো ঝিপ ফাইলে কমপ্রেস করে ব্যাকআপ ড্রাইভে ফেলে রাখত। নন্দিনী আজও বুঝতে পারে না এইসব সত্যমিথ্যার নীতি কোথায় লেখা হয়েছিল। কারাই বা লিখেছিল? কেনই বা? সামাজিক একটা কোহেশন আনতে! অনেক পলিটিসাইজড ধর্ম, নীতি, আচার, কৃষ্টির মতোই এটাও কী একটা সেন্স অফ কন্ট্রোলের আত্মপ্রকাশ? মানে এগো অফ ডমিন্যন্স?

তাহলে তো নন্দিনীর এগোটা সব থেকে বেশি থাকা উচিত। এগোটাকে জাহির না করেও আন্ডার-কারেন্টের মতো একটা ডমিন্যন্স থেকে যায়! যা প্রেম, ভালবাসা, প্রীতি, সৌহার্দ্য সে ছড়িয়ে দিতে পারে মানুষের মধ্যে। উইদাউট এনি কনফ্লিক্ট।

৪৪৪ কিংবা ৬৬৬ কিংবা ডবলিউ ডবলিউ ডবলিউ!

সবই তো ডমিন্যন্স—এর শেষ কথা। কী ভাবে ডমিন্যন্সটা জীবনে খাটছে, সেটাই ভাববার। ৪৪৪-এ ফ্রি ডবলিউ ডবলিউ ডবলিউ আছে। তাই নিয়ে খেলতে উঠে গেল নন্দিনী।

সত্যি! তার জীবনটাও তো একটা গল্প। কেউ যদি তা নিয়ে লিখত। বেশ্যাকে নিয়ে মাঝরাতে ফুর্তি করা যায়। তাকে নিয়ে কী গল্প লেখা যায়! তবুও একটা চেষ্টা করে দেখা মাত্র।

"আপনি আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখবেন?"

লিখবে? কেউ? সব কথা কী বলা যায়? না, বললেই লেখা যায়? গল্প তো একটা ছকের মধ্যে পড়তে হবে। তা না হলে কী গল্প হয়?

সুইটের বেলটা বাজতেই, প্রায় ট্র্যানস্প্যারেন্ট নীল হাউস কোটটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে দরজার এপার থেকে বলল "হু ইজ ইট?"

"হু এলস? ইটস মি" বিশ্বনাথের জন্য দরজাটা খুলে দিতেই বিশ্বনাথ ঘরে ঢুকে নন্দিনীকে চুমু খেয়ে বলল "সরি ডিয়ার... আই অ্যাম লেট" ব্রিফকেসটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল "আই অ্যাম ডাইং। নিড টু পি। হ্যভ ইউ হ্যড সামথিং টু ইট?"

"নট কোয়াইট। ওয়াজ ওয়েটিং ফর ইউ। হাউ ক্যান আই উইদাউট ইউ?"

বাঙালি মেয়ের এই ঘরণীপানা বিশ্বনাথের ভাল লাগে। তাই তো নন্দিনী অনন্যা। তার প্রফেশনাল কাজের বাইরেও একটা মানুষ লুকিয়ে আছে। সেটা বিশ্বনাথ অনুভব করতে পারে।

ফ্লাশটা টেনে বাথরুম থেকেই বলল "দেন অর্ডার ফর সাম। মাস্ট বি কোয়াইট ফিলিং, হোয়াইল আই হ্যভ এ কুইক বাথ"

নন্দিনী রুম সার্ভিসকে ফোন করে ইটালিয়ান ভূরিভোজের অর্ডার দিল। বিবস্ত্র অবস্থায় সাওয়ার থেকে বেরিয়ে, বিশ্বনাথ নন্দিনীকে বলল "পাস মি দ্য বাথরোব ফ্রম দ্য ক্লজেট"

নন্দিনীর দেওয়া রোবটা জড়িয়ে সোফায় বসে বলল "টুডে হ্যস বিন এ হেক্টিক ডে"

হয়ত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, নন্দিনী সিঙ্গল মল্টের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল "রিল্যাক্স"

উলটো দিকের সোফায় বসে নিজের হাফ-ফিনিসড গ্লাসে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল "নো নিড টু মেনশন। আই আন্ডারস্ট্যান্ড"

বিশ্বনাথ নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলল "ইউ ওয়ার ওয়াচিং দ্য মুন ফ্রম দ্য ব্যালকনি?"

"ইয়েস... স্য দ্য ক্লাউডস পাস টু লাইট ইট ইন অল ব্রিলিয়ান্স। হ্যভ ইউ হ্যড টাইম টু সি দ্য মুন?"

"নট ইন রিসেন্ট টাইমস। হাউ অ্যাবাউট হ্যভিং এ মুনলিট ডিনার ইন দ্য ব্যলকনি?"

"হোয়াই নট?"

সদ্য আনা ইটালিয়ান ডিশ বেয়ারাকে ব্যলকনিতে রাখতে বলে গ্লাসটা ব্যলকনির টেবিলে রেখে, ডিনারটা সাজাতে লাগল। বিশ্বনাথও এসে বসল পাশের সোফায়। দুজনেরই খিদে পেয়েছে। কথা না বলে গোগ্রাসে খেতে থাকল।

শেষে রুম সার্ভিসকে তলব "সব লে জানা"

"অউর কুছ?"

বিশ্বনাথ একটা পাঁচশো টাকার নোট ওর হাতে দিয়ে বলল "কুছ নেহি। তুম যা সকতে হো"

বেয়ারা বেরিয়ে যেতেই বিশ্বনাথ বিছানাতে গা এলিয়ে দিল। আর বসে থাকতে পারছে না। সারাদিন ধরে মিটিং-এ বসে কোমরটা ব্যথা করছে। আড়চোখে দেখল নন্দিনীর ট্র্যান্সপ্যারেন্ট নীল হাউস কোটে মোড়া তন্বী দেহটা নিতম্ব দুলিয়ে, পেছনে দরজাটা টেনে, বাথরুমে মিলিয়ে গেল। কতক্ষণ বাথরুমে নন্দিনী ছিল সে

নিজেও জানে না। বেশিক্ষণ নয়। বডি ফ্রেশনার দিয়ে নিজেকে সুগন্ধি করে ফিরে এল বিশ্বনাথের আজকের দেখা ক্যানভাসে ছবিটাকে জীবন্ত করে তুলতে।

দেখল বিশ্বনাথ খাটে ঘুমিয়ে পড়েছে। হয়ত টায়ার্ড। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিক। রাত তো ফুরিয়ে যায়নি। বারান্দায় গিয়ে বসল পূর্ণিমার চাঁদকে আবার দেখতে। চাঁদের অনেকখানি মেঘে ঢেকে গেছে। কয়েক ঘণ্টা আগের মতো উজ্জ্বল নয়। যেন আলো আঁধারির লুকোচুরি খেলছে। মেঘটা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। বৃষ্টি আসতে পারে। কত তাড়াতাড়ি না আকাশের রং পালটায়! জ্যোতিষের কথা মনে পড়ল... "শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে ভোর চারটে চুয়াল্লিশ মিনিটে জন্ম। এ মেয়ের জীবন আলোয় আলোয় ভরে উঠবে"

কবে, কে জানে?

বিশ্বনাথ কী এখনও ঘুমিয়ে আছে? ঘরে ঢুকে দেখল, বিশ্বনাথ আগের মতোই শুয়ে আছে। হাত দিয়ে গা টা নাড়াতেই ছ্যক করে উঠল বুকটা। আলতো করে ধাক্কা মারতে বিশ্বনাথের হাতটা এলিয়ে পড়ল। ভয় কেঁপে উঠল বুকটা। এবার বেশ জোরে ঝাঁকানি দিল। দেহটা অসহায়ের মতো নিথর। এবার রীতিমতো ভয় করছে নন্দিনীর। নাকের কাছে হাতটা নিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করল। কোনো শ্বাসের চিহ্ন নেই! পালসও নেই!

ছুটে গিয়ে রিসেপশনে ফোন করল "কাম ইমিডিয়েটলি। ইমার্জেন্সি। হারি..."

লোকজন ছুটে এল। ইন-হাউস ডাক্তার ছুটে এল। অ্যাম্বুলেন্স এল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল কার্ডিয়াক ম্যাসেজ দিতে দিতে। প্রাণহীন দেহটা ততক্ষণে বিশ্বনাথ ধামে পৌঁছে গেছে।

নন্দিনী একা ঘরে ফিরে এল। ঠিক কী করবে বুঝতে পারছে না। পরিচয়টা গোপন করবে? না, মানবিকতার খাতিরে সামনে দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করবে? ৪৪৪ নম্বর কামরায় ব্যাগটা প্যাক করতে করতে ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। মৃতদের নিয়ে ভাবতে গেলে এগোনো যায় না। কিন্তু তাকে তো চলতে হবে।

অনেক... অনেক... অনেক দূর!

বিশ্বনাথ চলে গেলেও তো পড়ে আছে তার কয়েকশো পার্মানেন্ট ক্লায়েন্ট।

কৃষ্ণপক্ষ হলেও শুক্লপক্ষের রাগ গাইতে হবে। সে যে রোহিণী নক্ষত্রের জাতক। ঘন মেঘের মধ্যেও চাঁদের হাসি ফোটাতে হবে।

৬৬৬ অথবা ৪৪৪ - সময় কি ঘর যাই হোক না কেন!

সে তো যে সে লোক নয়! রাজার দুলালী নন্দিনী! কামধেনু আর বশিষ্ঠের কন্যা। ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্যা। আনন্দের প্রতিমূর্তি। তা ছড়ানোর মধ্যেই তার দ্যুতি। তার প্রস্তুতি আবার নতুন করে শুরু করে দিল রাজনন্দিনী নন্দিনী।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা ছোট্ট চামড়ার ব্যাগ করল। ছোট্ট, কিন্তু একটা কম্বিনেশন লক দেওয়া। উপরে লেদার ফিনিশ থাকলেও ভিতরে সূক্ষ্ম স্টিলের জাল দেওয়া ব্যাগটা সহজে কেউ কাটতে পারবে না। তারপর কম্বিনেশন ঘুরিয়ে ব্যাগটা খুলে একটা ছোট্ট মোটোরোলা সেল ফোন বার করল। এটা বিশেষ ফোন। মেরেকেটে দশটা নাম্বার আছে কি না সন্দেহ। অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া এ নাম্বারগুলোতে কল করা যায় না। আগে তার কখনো দরকার হয়নি। কিন্তু আজ সে নিরুপায়। আজ বাঁচতে হলে কল করতেই হবে এই নাম্বারগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকা, মুখহীন কায়াহীন মুস্কিল আসানদের। কোনটা কার নাম্বার, তার কোনো ধারণাই নেই। দরকারও নেই।

সে র‍্যানডামলি একটা নাম্বারে ডায়াল করল। ওপাশে রিং হচ্ছে – একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় হিন্দি গানের মিউজিক বাজছে। তারপর একজন সুকণ্ঠী মহিলার গলায় ভেসে এল "রিল্যাক্স। জাস্ট টেল মি ইওর প্রবলেম ডিয়ার"

তৃতীয় নন্দিনী

বাথরুম থেকে বেরিয়ে কোনও জামাকাপড় পরার আগেই মোবাইল বেজে উঠল। নন্দিনী দৌড়ে গিয়ে বেডসাইড টেবিল থেকে ফোনটা তুলে নিল।

"আজ আসব?" ফোনের কলার আইডি দেখে আগেই বুঝেছিল ফেরদৌস। গলার স্বরে স্পষ্ট হয়ে গেল।

তোয়ালে দিয়ে চুলটা মুছতে মুছতে বলল "নাঃ"

"কেন?"

"জাস্ট ওয়াণ্ট টু বি এলোন। আজ থাক। অন্য একদিন"

এসির ঠান্ডা হাওয়ায় গাটাকে শুকিয়ে নিতে ভারি আরাম লাগছে। সারাদিনের ঘেমো গায়ের ক্লান্তিটা ঝেড়ে ফেলতে পারছে। বেশ কিছুক্ষণ খালি গায়েই খাটের ওপর বসে রইল। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল করেনি। শোকানো গায়ে শিরশির করা হাওয়ায় মৃদুমন্দ কম্পন। আর বেশিক্ষণ এভাবে থাকলে ঠান্ডা লেগে যাবে। ড্রেসিং টেবিলে পড়ে থাকা হাউসকোটটা জড়িয়ে ফ্রিজ থেকে একটা গ্লাসে বরফ ঢালল। হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে কম্পিউটারটা সুইচ-অন করল।

অন্যান্যদের মতো সারাদিনের কাজের শেষে টিভির রিমোট বটনটা কোনদিনও টেপে না নন্দিনী। কারণ সারাদিনই তো ওই পৃথিবীতে পড়ে আছে। কাজের শেষে আবার সেই পৃথিবীতে ফেরত যেতে মন চায় না।

পর্দাটা টেনে খুলে দিল। তার মাল্টিস্টরিড অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে ধানমুন্ডি লেকের অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়। সারাদিনের ক্লান্তির পর হুইস্কিতে মৃদুমন্দ চুমুক দিতে দিতে ধানমুন্ডি লেকের ওপাশের বাড়িগুলোর রোশনাই দেখে, সময়টা বেশ কেটে যায়। পুরনো বাড়ির টিমটিম করা আলো আর নতুন মাল্টিস্টরিড-এর ঠিকরানো রোশনাই-এর রিফ্লেকশন যেন ঢেউ তুলছে ঢাকার এই অভিজাত পল্লিতে। মাঝে মাঝে অন্ধকারের মধ্যে হাওয়ায় নড়া গাছের ডালগুলো যেন অতীত আর বর্তমানের একটা যুগলবন্দি খেলে যাচ্ছে। যেন রাগ ললিত গৌরী মিশে যাচ্ছে রাগ আনন্দী কল্যাণের সঙ্গে। শাওনি কল্যাণের অসংলগ্ন একটা যুগলবন্দিতে।

মনে পড়ে, এই তো সেদিন এই অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিল। যখন এরশাদ সাহেব আচমকা চাকরির অফারটা পেড়েছিল। হাতে যেন একটা স্বর্গ পেয়েছিল। তার চ্যানেলের আর্ট ডিরেক্টরের চাকরি। বাংলাদেশে থাকার জায়গা চাই। এরশাদ সাহেব থাকার জায়েগা করে দিয়েছিল এখানে। ছন্নছাড়া জীবন থেকে একটা নিশ্চিন্ত বাসস্থান। সঙ্গে ভদ্রভাবে বাঁচার মোটা মাইনে।

মন্দ কী?

হুইস্কির নেশা একটু যেন লেগেছে। কিছুক্ষণ ধরেই ভাবছিল কম্পিউটার চালিয়ে গান শুনবে। কিন্তু কুঁড়েমির জন্য আর কম্পিউটার চালানো হয়ে ওঠেনি। এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। ধ্যত... ঘরে নিভৃতে দুদণ্ড বসে হুইস্কিও খাওয়া যাবে না! জ্বালাতন। ফোনটা অফ করেই রাখত, যদি না চাকরির খাতিরে সর্বদাই ওটা অন করে রাখার একটা অনুচ্চারিত শর্ত অজান্তে ফল্গুধারার মতো নিভৃতে বিচরণ করত।

"বাড়ি ফিরেছ?"

"হ্যাঁ। এই কিছুক্ষণ আগে"

"নেক্সট মাসে আমাদের কামবোডিয়া ট্রিপের কথা মনে আছে?" রেজ্জাক ওপাশ থেকে বলল।

মনে মনে ভাবল, এরা আর সময় পায় না! নেক্সট মাসে একটা আর্ট-এর ওপর ডকুমেন্টারি করার জন্য কামবোডিয়ার পরিকল্পনা কী সারা দিনের কাজের শেষে এখনই বসে না করলেই নয়? তবু কাউকে চটানো যাবে না।

"হ্যাঁ" সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

"কিছু প্ল্যান করেছ?"

ধ্যস!

এক মাস আগে থেকে প্ল্যান করার কী আছে? নিকুচি করেছে কামবোডিয়া ট্রিপ-এর। এত ঘটা করে একটা ডকুমেন্টারি করতে হবে। কাজের কাজ কিসসু হবে না। বিদেশে যাওয়া যেন একটা নেশা। সেই নেশার মাদকতায় যেন সবাই বুঁদ হয়ে আছে। কামবোডিয়া না হয়ে বলিভিয়া হলে কী আসে যায়? কে বোঝাবে? লোভের সো-কেসে পৃথিবীটাকে সাজিয়ে ফেলতে চাইছে বিদেশ থেকে ম্যল-ইম্বাইবড এই কালচার। 'ফরেনে' যাওয়ার যেন একটা উন্মাদনা। একটা কালচারের অঙ্গ।

কী আর করা যাবে?

"এখনও তো মাসখানেক বাকি। তাড়া কীসের?"

"একটা রেয়ার ডকুমেন্টারি বলে কথা। আগে থেকে প্ল্যান না করলে চলে?"

একটু বিরক্ত হয়েই বলল "সারাদিনের কাজের শেষে? এই ভর সন্ধেবেলা?"

"তাহলে সানডেতে চলে আসি। দুজনে বসে প্ল্যান করে নেওয়া যাবে"

"পরে কোনও একদিন প্ল্যান করে নেব। এখন ভালো লাগছে না"

রেজ্জাক বুঝল নন্দিনীর মুড এখন ভালো নেই। পরে এ নিয়ে কথা বলা যাবে।

"ঠিক আছে। রাখছি"

রেজ্জাক সাহেব এই ডকুমেন্টারির ডিরেক্টর। হয়ত সে সত্যি সত্যি এই ডকুমেন্টারিটা নিয়ে বড় বেশি চিন্তা করছে। তাই ফোন করেছে। এমন যদি কিছু হত, যাতে একজন মানুষ আরেকজনের মনের অবস্থাটা বুঝতে পারে - জীবনটা তাহলে কত সহজ হয়ে যেত। অনেক সময় মনের কথাটা বলে দিতে হয়।

সেখানেই অসম্পূর্ণতা।

শুধু রেজ্জাক বলেই নয়। নারী হিসেবে নিজের অসম্পূর্ণতাতেও খামতি। রামধনুর সাতটা রং-এর মধ্যে কোনও রং-ই পূর্ণতার গান গাইতে পারছে না। ছবিটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে। বরং বর্তমানের ছবিটা অনেক স্পষ্ট। কিংবা নিজের ক্লান্তিটা।

দূরে রবীন্দ্র সরবরের ওপাশে আট নম্বর রাস্তার ব্রিজের অ্যাম্ফিথিয়েটারের ওখানে বহু লোকের সমাগম। নিশ্চয়ই কোনো শো ভেঙেছে। প্রায়শই ওখানে প্রোগ্রাম লেগে থাকে।

ফোনটা কেটে কম্পিউটারটা চালিয়ে দিল। বাইরের দিকে তাকিয়ে হারিয়ে যাওয়া কতক্ষণ, কে জানে? ভুলেই গিয়েছিল স্ক্রিনটা আটকে আছে পাসওয়ার্ড-এর অপেক্ষায়। পাসওয়ার্ডটা টাইপ করে আবার হুইস্কিতে চুমুক দিল।

ধান্দার বাইরে একটা অস্তিত্ব খুঁজছে অনেকদিন ধরে। একটা নিটোল নির্ভেজাল অ-ব্যবসায়িক সম্পর্ক। এত বছর কাজের সূত্রে ব্যবসায়িক ধান্দাবাজি তো কম দেখল না। এরশাদ সাহেব যতই ভালবাসুক না কেন, চ্যানেলের আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে তার টুঁটিটাও বাঁধা। পলিটিক্যাল গিমিকস, আন্দোলন, রাইটস থেকে রেপ, খুন-খারাপির কাহিনি থেকে সেলেব্রিটি, চ্যানেলের মাথাদের পদলেহন – সবই যেন ক্যানভাসে এক একটা অসম্পূর্ণ ছবি। ঘেন্না ধরে গেছে।

ছোট বয়সে – কত আদর্শ!

যেন একাই একটা সম্পূর্ণতা খুঁজে নিতে পারবে। হয়ত কিছুটা পরিবর্তনও আনতে পারবে। কোথায় সম্পূর্ণতা? কোথায় পরিপূর্ণতা? সব স্বপ্নই যেন হাজার কোটির নিলামে চড়েছে। কাজের সুবাদে ধীরে ধীরে আদর্শের স্বরূপগুলোর সামনে আসা। কোটি কোটি দেশি-বিদেশি টাকা ঘুরছে লোকের আদর্শগুলোকে নিজের সুবিধায় খেলাতে। আদর্শটাকে রিসাইকল বিনে ফেলে মাস মাইনের চাকরিটাকেই পাথেয় করে জীবন চালিয়ে দেওয়া!

এই আর কী!

কিছুই পালটাবে না। মাঝখানে খবরের হাইপের অংশীদার হয়ে কিছু কামিয়ে নাও! ফুলে ফেঁপে রমরমিয়ে টাকা ছড়ানো চাঁইদের গুণগানে শামিল হও, অথবা মূর্খ পাবলিককে বোকা বানিয়ে ঝড় তোলার চিত্রপট সাজাও। পাবলিকের থেকে গালেবেল বস্তু আর কে আছে?

এক সঙ্গে ঢকঢক করে বেশ কিছুটা হুইস্কি গিলে নিল। দরজার এপার-ওপারের সীমারেখাটাকে আবার দেখবার সময় হয়েছে। ফেরদৌস তার থেকে বছর তিন-চারেকের ছোট হলে কী হবে, কাজে যোগ দেওয়ার বেশ কিছুদিন পরেই তার জীবনে এসে পড়েছে। এসে পড়েছে বললে ভুল হবে, দরজার চৌকাঠে রেখে নন্দিনীই তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

একা শূন্য ফ্ল্যাটে হাঁপিয়ে উঠছিল নন্দিনী। কাজের পৃথিবীটাকে ধানমুন্ডির ফ্ল্যাটের বাইরে রেখে, চার দেওয়ালের মধ্যে কেবলই ছটফট করছিল।

"আসতে পারি নন্দিনীদি?"

"আমার বাড়িতে?"

"হ্যাঁ। ডিনার খেতে"

একাকিত্বের নির্জন উন্মাদনায় দেহের অংশবিশেষ তখন জ্বলছে। মুক্তি চাই! পরিত্রাণ চাই! বাঁচবার রসদ চাই! সারাদিনের গতে বাঁধা চক্করে ক্লান্ত মনটা বাঁধ ভাঙা প্লাবনে উপচে পড়তে চাইছে। ভাসিয়ে দিতে চাইছে একাকিত্বে ঘেরা দেহমনের নিস্পন্দ আবেগকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফেরদৌসের ফোনটা এল।

"রান্না যে কিছুই নেই!"

"নিজের জন্য তো কিছু করেছ? তাতেই হবে..."

খালি হাতে আসেনি ফেরদৌস। জিঞ্জিয়ান থেকে একগাদা খাবার প্লাস্টিকের প্যাকেটে করে এনেছিল। খাওয়া থেকে আড্ডা। আফটার ডিনার কফি।

রাত তখন ক'টা কে জানে? ফেরদৌস বেরিয়ে যাচ্ছিল। দরজার মুখে ফেরদৌসকে বিদায় জানাতে গিয়ে নন্দিনীই বলেছিল "যেতেই হবে?"

ফেরদৌস ফিরে বলেছিল "ফ্ল্যাটটা তো তোমার থাকার দিদি..."

নন্দিনী প্রভকেটিভ একটা হাসি ছুড়ে বলেছিল "আজকের দিনের জন্য তোমায় বিনে পয়সায় ভাড়া দিতে পারি"

ফেরদৌসের রোমশ বুকের ওপরে মাথা রেখে বহুদিনের নিঃসঙ্গতার পুঞ্জিভূত জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পরেছিল নায়াগ্রার ঝরনা হয়ে। বাঁধ ভাঙা জৈবিক চাওয়ায়। নায়েগ্রার জলোচ্ছ্বাস মিশে গেল ইন্দ্রিয়ের প্রতিটা কোষে। তৃপ্তির নিখাদ ঝালায়। জীবনের অনেক না-পাওয়ার মধ্যে একটুকরো পাওয়া। সাময়িক পূর্ণ হল নন্দিনী। শুরু হয়েছিল তার ফেলে আসা নারীত্বের দেবী বরণ।

কিন্তু সেই চৌকাঠে আজও থেকে গেছে ফেরদৌস। এত বছরেও তাকে চৌকাঠ পেরতে দেয়নি নন্দিনী। এই একার পৃথিবীতে বাকি সবকিছুই গৌণ। একমাত্র সে ছাড়া। তার কাজের পৃথিবী থেকে ফেসবুকের 'ভারচুয়াল' পৃথিবী - তার কাছে একটা মুখোশ পরা কেউ। জানতেও চায়নি, ফেরদৌস এর বাইরের লোক কি না।

তার দুনিয়ায় সে একা।

হাতে হুইস্কি। সামনে কম্পিউটার।

ফোনটা আবার বেজে উঠল। আবার ফেরদৌস?! মনে মনে একটু বিরক্তই হল। তার একাকী জীবনে কেন ভাগ বসাতে চাইছে সে? দেহ আর মনের তফাতটাও বুঝতে শেখেনি!

একটু বিরক্ত হয়েই মোবাইলটা নিয়ে বলল "হ্যালো"

"অসময়ে তোমায় বিরক্ত করলাম নন্দিনী?"

"না... না..."

এরশাদ সাহেব বলে কথা। তার চ্যানেলের মালিক। কিন্তু এত রাতে?!

"একটা গোপনীয় কথা তোমারে কমু বইলাই ফোন করসি"

"হ্যাঁ...হ্যাঁ... বলুন স্যর"

"আমাগো চ্যানেলের একটা পাবলিসিটি দরকার। মানে এইসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র কইর‍্যা"

'কেন?' বলতে গিয়েও কথাটা চেপে গেল। এমন অনেক প্রশ্ন আছে, যা করা যায় না। এমন অনেক উত্তর আছে, যা এরশাদ সাহেব দিতে চাইবেন না।

"সিওরলি স্যর"

"একটা ভাল কইর‍্যা স্টোরি করতে কইসি। যেইটা লোকে খায়। তোমারে কিন্তু সামিমুলের সঙ্গে বইসসা সাজাইতে হইব..."

"নিশ্চয়ই স্যর। আপনি একটুও চিন্তা করবেন না স্যর"

"মনে রাইখ্য তুমি, আমি আর সামিমুল সারা ব্যাপারটা আর কেউ যাতে জানতে না পারে। প্লিজ কিপ ইট ইন মাইন্ড"

"আপনি একবার বলে দিয়েছেন। সেটাই বড় কথা"

এরশাদ সাহেব কথা না বাড়িয়ে লাইনটা ডিসকানেক্ট করে দিল। ঢকঢক করে আরও কিছুটা হুইস্কি গিলে ফেলল নন্দিনী। কী বোকাই না ছিল ছোটবেলায়! কতই না স্বপ্ন দেখত দেশের জন্য, বিশ্বাসের জন্য – আদর্শ, ইজম, ধর্ম, সংস্কার, রুচি, ভবিষ্যৎ সব তো ছোটবেলার শেখানো জোলো বুলি।

নেশায় মাথাটা আরও বেশি করে খুলছে।

এরশাদ সাহেবের অঙ্কটা কেমন পরিষ্কার ঠেকছে। ইন্টারন্যশনাল কোনো এজেন্সির কাছে টাকা খেয়ে, দেশে একটা আগুন জ্বালাতে চাইছে। যুদ্ধ চাই – কোথাও একটা। তা না হলে যে ইকনমি ফিরবে না! এই রিসেশন থেকে বাঁচার একমাত্র পথ।

শুধু ধানমুন্ডির ফ্ল্যাট নয়, গোটা বিশ্বটাই যেন একটা অদৃশ্য জেলখানায় বন্দি হয়ে পরিত্রাণ খুঁজছে। একটা অর্গ্যজম। ফেরদৌস যা দিতে পারবে না। এরশাদ সাহেব যা দিতে পারবে না। এক অদৃশ্য খাঁচায় বন্দি হয়ে নন্দিনীর মতো কিছু মানুষ পরিত্রাণ খুঁজছে। জীবনের বেঁচে থাকার মানে খুঁজছে। বাঁচতে চাইছে। এখনও স্বপ্ন দেখতে চাইছে। ওই মাটি, ওই আকাশ, ওই সমুদ্রের নীল পাথরবাটির মধ্যে।

নেশাটা কেমন গাঢ় হয়ে আসছে। রাতের অন্ধকার বাইরের আলোর রোশনাইকে ছাপিয়ে গেছে। ঘরের টেবিল ল্যাম্পের আলোটা নন্দিনীর মুখে একটা আবছায়া ছবি এঁকে দিয়ে যাচ্ছে। সেই আলো আঁধারির রঙেই অন্ধকারের ক্যানভাসে নন্দিনী কিছু আঁকতে চাইছে।

স্বপ্নটাকে?

বাস্তবকে? না, স্বপ্নে দেখা বাস্তবকে?

না কি, বাস্তব ছেড়ে নিজের স্বপ্নকে?

নন্দিনী জানে না কোনটা। শুধু জানে, মন কিছু একটা আঁকতে চাইছে বাইরের ম্রিয়মাণ আলো দিয়ে নতুন কোনও ক্যানভাসে।

ফেসবুকে 'লগ ইন' করতেই একটা স্ট্যাটাস চোখে পড়ল। 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' বলে কেউ একজন। লোকটির প্রোফাইল পিকচারে শুধুই নীল আকাশের ছবি।

স্ট্যাটাসে লেখা 'আমরা সবাই স্বপ্নের ফেরিওয়ালা'

নন্দিনী চুপ করে লেখাটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। একবার 'লাইক' দিল, কয়েক সেকেন্ড বাদে 'লাইক'-টা কেটে দিল … আবার 'লাইক' দিল, কয়েক সেকেন্ড বাদে আবার 'লাইক'-টা কেটে দিল …

তারপর যেন একটা সম্মোহনের ঘোরের ভেতর কমেন্টের বক্সে লিখে ফেলল 'বেচে কে, কেনে কে? স্বপ্নটা কার? ফিরিওয়ালা ঘুরে মরে মন ছারখার'

চতুর্থ নন্দিনী

এই প্রথম।

বুকটা কাঁপছে। দুরু দুরু। ছোটবেলা থেকে কত শিখেছে। তালিম নিয়েছে, রেওয়াজ করেছে। কিন্তু এই প্রথম স্টেজ পারফর্ম্যান্স। নিজের সাধনার আত্মপ্রকাশ। তাও আবার জি ডি বিড়লা সভাঘরে। ভাবতেও পারেনি কোনো দিন এখানে গাইবার সুযোগ পাবে।

কিছুটা শঙ্কিত হয়ে কল্লোলদাকে বলল "'আমার বড্ড ভয় করছে"

"ভয়ের কী আছে? সবাইকেই তো একদিন প্রথম পারফর্ম্যান্স দিতে হয়। দেখো, ঠিক উতরে যাবে"

সকালবেলায় রেওয়াজ বা মাঝে মাঝে নিজের একলা ঘরে বসে খালি গলায় সুর সাধা এক। আর হল ভর্তি লোকের সামনে পুরো তবলচি, এস্রাজ নিয়ে পারফর্ম্যান্স করার মধ্যে অনেক তফাত। মেট্রনম নিয়ে গলা সেধেছে মাত্র। সাউন্ড মনিটরিং-এর তো সে তেমন কিছুই জানে না।

একটু বিচলিত ভাবে তবলাবাদক পণ্ডিত তন্ময় মণ্ডলকে বলল ''আমি তো কিছুই জানি না, পারব তো?"

"কিচ্ছু ভেব না। আমি সব সামলে নেব। তুমি একাগ্র মনে গান গেয়ে যাও। ঠিক যেমন ঘরে বসে গাও। ভুলে যাও সামনে অডিয়েন্স আছে" তন্ময়ের আশ্বাস।

জি ডি বিড়লা সভাঘরের অনেক সিট ভর্তি। নন্দিনী বুঝতে পারছে না, একজন অনামী নতুন গায়িকার ক্লাসিক্যল গান শুনতে, কী ভাবে এত লোকের ভিড় হল? সে তো কোনোদিন ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সেরও গায়নি। দূরদর্শনেও ধরে কয়ে একটা সুযোগ করে নেয়নি। যেটুকু শিখেছে নিজের সখের বশে।

কল্লোলদার জন্যই এই সুযোগ। ঘরে বসে বসে যখন হাঁপিয়ে উঠেছিল, তখন কল্লোলদা হঠাৎ একদিন বলল "ঘরে বসে বসে গলা সাধলেই হবে? একটা দুটো প্রোগ্রাম করলে ভাল লাগবে"

"আমাকে কে প্রোগ্রামে গাইতে দেবে?"

"সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি রাজি তো?"

ইতস্তত করছিল নন্দিনী। ভয়ও পাচ্ছিল। তারপর মনে হল, ক্ষতি কী? শখের বসে যেটা শিখেছে, তাতে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ যখন নিজে থেকেই এসেছে, তাকে হেলায় ফেলার কোনো মানেই হয় না। অন্তত ফেসবুক নিয়ে খেলার চেয়ে, বাইরে প্রোগ্রাম করলে মন্দ কী?

কল্লোলদার সঙ্গে সেই কবেকার পরিচয়। এত বছর ধরে দেখছে নন্দিনীকে। নন্দিনী যে ক্লাসিক্যাল গান ভালবাসে আর নিয়মিত চর্চা করে সেটা ভাল করেই জানে। এর আগে তো কখনও বলেনি। এই প্রথম যখন বলল, ভবিতব্য সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। সারা জীবন ধরে তো ভবিতব্যের ক্যাসিনোতে বসে বাজি খেলছে। এটাও না হয় আরেকটা গ্যম্বল। দেখাই যাক না, কোথায় গিয়ে ঠেকে।

কল্লোলদা স্টেজের পাশে একজনের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। ছেলের আনন্দ আরও দ্বিগুণ। মায়ের গান এই প্রথম হলে বসে শুনবে। মা ফাংশানে গাইবে কখনও ভাবেনি। প্রথম সারিতে উদগ্রীব অপেক্ষায় বসে আছে মায়ের গান শোনার জন্য।

নন্দিনীর সুরের প্রথম আত্মপ্রকাশ। জি ডি বিড়লা সভাঘরের রিভার্ব সাউন্ড সিস্টেমে আরও দরদিয়া হয়ে জানান দেবে। নতুন কণ্ঠের উদাত্ত রাগে। সামনের অন্ধকারটা ভুলে গেছে। সেই দৃশ্য তো চিরকালই অন্ধকার। এক সময় দেখার চেষ্টাও করত। এখন আর করে না। কিংবা দেখতেই চায় না। সীমাহীন অন্ধকারের আঁকাবাঁকা পথের শেষে কী লেখা আছে, সেটাও জানে না। জানার আগ্রহটাও ক্রমশ কমে আসছে। ভবিষ্যৎটা যখন অজানা-অচেনা-অদেখা-অবোঝা, তখন আর ভেবে কী লাভ?

ঘণ্টা বেজে আলো আধারিতে মিশে গেল। সভাঘরের অন্ধকারের বুকে পর্দা খুলতেই আলোর ফোকাসটা গিয়ে পড়ল মাইক্রফোনের সামনে দাঁড়ানো ভাষ্যকার দেবাশিস বসুর মুখে। পরনে সাদা চুড়িদার, বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবি।

দেবাশিসের চিরপরিচিত উদাত্ত কণ্ঠে ভেসে এল নন্দিনীর একক অনুষ্ঠানের সম্বোধনী আহ্বানঃ

"সুজন বন্ধু, চৈত্র সন্ধ্যায় ভাবগম্ভীর এই সংগীত সভায় আপনারা স্বাগত। বলতেই পারেন রোজনামচার বারমাস্যা পেরিয়ে এ যেন অনেক অপেক্ষার তের পার্বণের আনন্দ-আস্বাদ। সত্যি তো, সুরের মতো বন্ধু আর আছে কী? সুখে সে হর্ষ, শোকে অশ্রু। এক বিনি সুতোর বাঁধন। নির্ভার নির্ভরতা।

আপনারা জানেন, আজেকের শিল্পী নন্দিনী। শুধুই নন্দিনী। না, পদবির ঘেরাটোপে বাঁধব না নন্দিনীকে। ওর অন্তরে সারাক্ষণ যে অনুরণিত হয় প্রাণের পদাবলি। অন্তর্যামীর সঙ্গে এ এক আন্তরিক যোগ সাধন। শাস্ত্রীয় সংগীতে সম্পূর্ণ সমর্পিত নন্দিনী প্রস্তুত। দুটো তানপুরা বেজে উঠবে আর কয়েক মুহূর্তে। মনে হয় বলিঃ

'অনন্ত ওই নীরবতার
শুভ্র বরণ সাজ...
সুর তুলুক সেই জমিতে
সূক্ষ্ম কারুকাজ'"

দেবাশিস বসুর উপস্থাপনা শেষ।

নমস্কারান্তে কারুকাজ শুরু হওয়ার আগেই বাসন্তী রং-এর স্বর্ণচুড়ি শাড়ি পরা নন্দিনী সবাইকে নমস্কার জানিয়ে ডায়াসে। তানপুরা বেজে উঠতেই নিজেকে গুছিয়ে নিল। সেই রেশে, তালে ভেসে এল দৃঢ় বলিষ্ঠ দরদি কণ্ঠে আলাপের সুর। রোজ সকালের রেওয়াজের জন্য শুরু থেকেই জড়তা নেই। সাবলীল সুরের আলাপ বন্দানায় ভেসে গেছে নন্দিনী। ভুলে গেছে দর্শকদের কথা। হারিয়ে গেছে তার নিভৃত প্রাণের সশব্দ পূজার আরতিতে। সভাঘরের অন্ধকার যেন মিশে গেছে তার নির্জন পথের একাকী নিভৃতে। ক্লিসে হয়ে যাওয়া নিষ্প্রদীপ জগতে শ্রোতাদের এক নিঃশব্দ উপভোগে।

কী এক ঘোরে গেয়ে চলেছে নন্দিনী। যেন কোনো জনহীন খোয়াইয়ে চাঁদনী রাতে আকাশের না-চেনা নক্ষত্রের খোঁজে। নিজের মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে আকাশের বুকে আজ জ্বালিয়ে দিচ্ছে সন্ধ্যাতারার বাতিগুলো। একটা... দুটো... তিনটে। ধীরে ধীরে বাতির আলোকিত রোশনাই-এর দেওয়ালি উৎসবে মেতে উঠেছে তার নিভৃত অন্তরের একক সন্ধ্যারতি। এতদিনের নিভৃত সাধনার প্রথম নৈবেদ্য - অন্তরের পূজার অর্ঘ্য। সুর সেখানে মিলে গেছে সুন্দরের উপাসনায়।

এখন আর সামনে কেউ নেই। কল্লোলদা নেই, ছেলে নেই, সামনে হলের দর্শকও নেই! শুধু দেখতে পাচ্ছে এক সীমাহীন গভীর অন্ধকারের মধ্যে পূর্ণতার ছবি। ক্যানভাসের সব রং-এর একচ্ছত্র প্রকাশ। হয়ত ওখানেই শান্তি লুকিয়ে আছে। হয়ত ওখানেই ইহলোক কোন মায়াময় মধ্যলোকে প্রবেশ করছে মানব জীবনের ধ্রুবতারার পথটুকু দেখিয়ে। চিরশান্তির বাণী শোনাচ্ছে এক ঘোরের মায়াবী লোকে। সেই অন্ধকারটাকে এখন আর ভয় করছে না। তার থেকে পালাতেও চাইছে না। বরং তাকে বরণ করে নিতে চাইছে দু হাত ভরে।

এখানেই ইহকাল।

এখানেই পরকাল।

সব কালের সংমিশ্রণ।

রাগ ললিত গৌরী দিয়ে শুরু। আলাপ থেকে ঝালা। মিশে যাচ্ছে বাসন্তী কেদার থেকে রাগ ভূপনাথ থেকে রাগ শাওনি কল্যাণে। সপ্ত রং-এর ব্যঞ্জনায় আঁকতে চাইছে ধূসর ক্যানভাসের ওপর একটা ছবি। সেটা কী মুহূর্তের! না কি, জীবনের ছবি, না একান্তই তার নিজের! নিজেই জানে না। কেবল একটা শব্দছবি আঁকার চেষ্টা। বর্ণের গীতমালায়। মিশ্র রাগেই যা হয়ত ফুটে উঠবে আপন মাধুর্যে।

ছোটবেলা থেকেই রাগাশ্রয়ী গান ভালবাসত। যখন বয়স বছর ছয় মা তখনই ভর্তি করে দিয়েছিল নাড়া বেধে তালিম নিতে। নিয়মিত সকালে রেওয়াজ করত নন্দিনী। এক সময় শেখা পরিপূর্ণ হল। কিন্তু জীবনের

স্রোতে ভাসতে ভাসতে ওটা অতীতের শখ হিসেবেই থেকে গিয়েছিল সীমিত চর্চার মধ্যে। তারপর কত ঝড় বয়ে গেছে জীবনে। গানটাও অতীতের পাতার মতোই ডুবে গেছে জীবনের চোরাবালিতে। ফিরে তাকানোর সময়ও পায়নি। এমনকী গতানুগতিক বিয়ে থেকে ছেলে হওয়া পর্যন্ত।

ইদানীং সিরিয়াল দেখেতে দেখতে একঘেয়েমি। আবার মনোনিবেশ করেছিল কম্পিউটারে। দুপুরবেলা ফেসবুক নিয়ে খেলা। সেটাও, সেরকম তার মধ্যে সেই স্পন্দন জাগাতে পারছিল না। কোথায় যেন একটা তার ছেঁড়া ব্যঞ্জনা। মুক্তি নেই। নিজের কাছ থেকে। অবসরে রেওয়াজটা আবার শুরু। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। শুধুমাত্র নিজের তৃপ্তি। কখনও মনে হয়নি তাকে বাইরে প্রকাশ করবে।

যেদিন কল্লোলদা এসে বলল ‘ঘরে বসে বসে সাধলেই হবে? একটা দুটো প্রোগ্রাম করলে ভাল লাগবে’ একটু অবাকই হয়েছিল। কল্লোলদা তার স্বামীর ছোটবেলার বন্ধু। স্বামীর অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে পরিবারের খবরাখবর নিতে আসে। কিন্তু এর আগে তো কখনও বলেনি।

কল্লোলদার অনেক কন্ট্যক্টস। তার ভিত্তিতেই এই প্রপোসালটা দিয়েছে। প্রথমে একটু দ্বিধা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সম্মতি। কল্লোলদা বেরিয়ে যেতেই যেন আবার নিজেকে নতুন করে খুঁজে পেল। নতুন চিত্রপটে। নতুন তুলিতে আঁকা রামধনু থেকে রং কুড়ানো। এক নতুন সাজে। নিজের একঘেয়েমির মধ্যে এক আলোকিত পথের নতুন দিশা। অভিষেকের মন্ত্রটাও নতুন। নিজ মহিমায় দীক্ষিত হতে, নতুন করে মালা গাঁথতেই তাঁর পূজার অর্ঘ্যে। নৈবেদ্য সাজাতে, ইহলোকের মাটিতে বসে অচেনা–অজানা মর্ত্যলোককে নতুন করে পেতে...

গান চলেছে। বিভোর এক অচেনা ছন্দে। কোনো মন্ত্রের মধ্যে নয়। কোনো কল্পনার স্বপ্নেও নয়। মায়ার পৃথিবীটা যেন কায়ার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে জীবালোকের দীপালোকে। অন্ধকার আর আলো মিলেমিশে একাকার। এক নব অনুভূতির নব আলোকে। এই আলোক দর্শনই তো জীবাত্মার পরমাত্মাকে চেনার প্রথম অভিষেক। আজ যেন নিজের কাছেই নন্দিনীর নতুন করে অভিষেক হচ্ছে। মনের রানি হয়ে মর্ত্যলোকের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে। স্বর্গলোকের তুলসিতলায়... ঈশ্বরের দেওয়া নিজেরই পরা বরণমালায়...

গান শেষ। রেশ রয়ে গেছে...

দেবাশিস বসু এলেন, বললেন “শুভ্র বরণ এক অনন্ত নীরবতার বুকে সুরের সূক্ষ্ম কারুকাজ বুনছিল নন্দিনী। এই স্বর এই সুরে যেন প্রভাতের স্তোত্র, সন্ধ্যার দেবারতি।‘সেলিব্রিটি’ হওয়ার দামাল দৌড়ে নেই নন্দিনী। সুরের আরাধনার সময়ও যেন সুরকেই বলেঃ

‘তুমি আমার ভোরের বেলা

ঝিম দুপুরের দান

শেষ বিকেলে লালের ছোঁয়া

নীল তারাদের গান’

আপনাদের মতো গভীর মননের শ্রবণ শিল্পীদের নিত্য আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে জীবনপথে এগিয়ে চলুক নন্দিনী। সস্তা জনপ্রিয়তা নয়, ও সার্থক হতে চায়, চায় পরিপূর্ণ হতে। ওর সব স্বপ্ন সত্যি হয়ে উঠুক একদিন, এই প্রার্থনা।

শুভ রাত্রি”

গান শেষ হয়ে গেছে।

নন্দিনীর আধুরা ছবিটা তখনও আঁকা হয়নি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো একে একে বেরিয়ে আসছে শ্রোতারা। সেও অনুভব করছে, তার যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। নিজের দিকে ফিরে মনে হচ্ছে, এই যুগ সন্ধিক্ষণে সে যেন অকুল সমুদ্রে ভাসছে একটা হাওয়ার আশায়, তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে জীবনের এক নির্দিষ্ট মোহনায়। খালি মোহনার ঠিকানাটাই জানে না। তারার পূর্ণতার মধ্যে সে যেন নিজের শূন্যতার রাগ শুনতে পাচ্ছে। হাজারও লোকের ভিড়ে কোথায় যেন অন্তরের নির্জনতা তাকে গ্রাস করছে। সে যেন সহস্র কোটি গাছের বনাঞ্চলে, এক বেলাভূমির তেপান্তরে নির্জনে দাঁড়িয়ে। ক্যানভাসে রং চড়িয়েছে ঠিকই, তবু সেই ক্যানভাসটা এখনও শূন্য।

শূন্যতার মধ্যে পূর্ণতা।

না কি, পূর্ণতার মধ্যেও শূন্যতা?

অনীশ মাকে জড়িয়ে ধরে বলল ‘‘কী দারুণ গেয়েছ মামি”

কল্লোলদা এগিয়ে এসে বলল “ফ্যন্টাস্টিক”

লাজুক হাসল নন্দিনী। কল্লোলদা লক্ষ করল, এত প্রশংসার মাঝেও নন্দিনীর মধ্যে কোনো অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস নেই। যেমন সে এতদিন ধরে দেখে এসেছে। শান্ত, সংযত, ধীর, অবিচল। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, যদি নন্দিনীর কাছ থেকে জানতে পারত ওই মন্ত্রটা, হয়ত নিজের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের একটা সুরাহা হত।

নন্দিনী বলল ‘‘গানের কোনো অনুষ্ঠান করব ভাবিনি। তোমার জোরাজোরিতেই আজ প্রথমবার পাবলিক ফাংশনে গাইলাম”

“বেশ করেছ। না করলে কি এমনভাবে দুঘণ্টার ওপর তোমার গান শুনতে পারতাম?”

অনীশ পাশ থেকে বলল “মা খ...উ...ব ভালো গায়”

ছেলে তো বলবেই!

নন্দিনীর মনে হল পেশাদারিত্বে নিয়ে যেতে পারেনি বলেই হয়ত মাধুর্য খুলেছে। নেহাত শখের জন্য গাওয়া। নইলে বাজারের নিলামে গানের সত্তাটাই বিক্রি হয়ে যেত। শখগুলো একান্তই আপনার। তাকে

বাজারে নিয়ে ফেললে তার গুরুত্ব বা মাহাত্ম্যটা মলিন হয়ে যায়। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তির মধ্যে তো শখ আর সাধনা থাকে না। বাজারি নিলামেই ওটার কেনাবেচা হয়।

কল্লোলদা বলেছিল বলে নেহাত শখের বসে এই প্রোগ্রাম করা। যত সুখ্যাতিই হোক না কেন, সে পথে পা বাড়াবে না।

বাড়ি ফিরে কম্পিউটার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ফেসবুকে দেখল বাজারি শিল্পীরা নিজেদের ফাংশনের ছবি আর খবরের কাগজের ক্লিপিং পোস্ট করছে। ওদের জন্য ভীষণ করুণা হল। প্রতিটা মুহূর্তে যেন অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছে। যেন-তেন প্রকারে মুছে যাওয়া ক্যানভাসের ছবিটাকে বারবার বিভিন্ন রং-এর মাধুরী মিশিয়ে আঁকার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোনো রং-ই যেন স্থায়ী নয়।

ছবিগুলো আজকে সবাই দেখবে। লাইকস পড়বে। কমেন্টস পড়বে। তারপর কাল সে সব ছবি মুছে যাবে। আবার পাত পেড়ে আদা-জল খেয়ে নেমে পড়বে, আরেকটা আসরের মত্ত বাসরসজ্জা সাজতে। সেই বাসরের আসরও একদিন শূন্য হয়ে যাবে।

এই ‘শূন্যতা’ আর ‘পূর্ণতা’-র যুগলবন্দিতেই জীবনটা পার। মহাকালের পাতায় কিছুই পড়ে থাকবে না। শুধু ক্ষণকালের এক অস্পষ্ট অবয়ব। আর নিজের জন্য কিছু স্মৃতি।

নন্দিনী সেই শূন্যতা-পূর্ণতার গোলকধাঁধায় থাকতে চায় না। সেখানে কোন রং নেই, মাধুর্যও নেই। বিকশিত আমিত্ব। ফেসবুকের আমিত্বের মজলিস থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল নন্দিনী। কম্পিউটার বন্ধ করে উঠে পড়ল।

রংহীন রং-এর মধ্যেই তো রঙিন মাধুর্য। সেই না-ফোটা তুলির আঁচড়ের মধ্যেই সে বিচরণ করতে চায় একাকী।

নিজের ক্ষুদ্র পৃথিবীতে।

সেই ছবিটা অস্পষ্ট হলেও, মুছে যাওয়া ছবির থেকে তো অনেক ভাল। কালহীন যন্ত্রণার বেহাগের সুর না বাজিয়ে মিশে গেল জয়ন্ত শ্রীর মধ্যে। এই সংমিশ্রণেই হয়ত সব রাগ, সব সুর, সব রং বাঁধা। সেখানেই লুকিয়ে আছে সব রাগ। তাদের মিলনের ক্যানভাসে। মিশ্রিত রাগের সমন্বয়েই হয়ত ব্ল্যাংক ক্যানভাসটা আবার নতুন করে প্রাণ পাবে।

সেই ছবির প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিকেই মন দিল নন্দিনী।

অন্যমনস্ক ভাবে সেতারটার গায় হাত বোলাতে বোলাতে দুচোখ ছাপিয়ে কান্নার একটা ঝলক। কেন, জানে না। দুঃখের না আনন্দের, তাও তার অজানা। বহুদিন আগে পড়া একটা শ্লোকের কয়েকটা লাইন হালকা কুয়াশার মতো তাকে আস্তে আস্তে ঘিরে ধরছে ...

যুজে ব্যাং ব্রহ্ম পূরব্যঃ নমভিরবীয় শ্লোক এতু অধ্যেব সুরেঃ।

শৃনন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আযেধীমানি দিব্যানি তস্থুঃ।।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদ্বিত্যাহতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেহনেয়ায়।।

পঞ্চম নন্দিনী

বৃহস্পতিবার, ৪ জুলাই।

আমেরিক্যান ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। দিনটা আজও ভুলতে পারে না নন্দিনী। যেন স্বাধীনতার একটা অধ্যায়। শুধু অ্যামেরিকার নয়, নন্দিনীরও। তার জীবনের কালো রং-এ লেখা রয়ে গেছে স্বাধীনতার সেই দিন।

দিনটা শুধুই অ্যামেরিকান স্বাধীনতা দিবস নয়। তারও...

বিয়ের বেশ কয়েক বছর পরে।তখন অনীশের কতই বা বয়স? বছর ছয়-সাত হবে।

একদিন অর্ণব এসে বলল "শিকাগো"

"মানে?"

"ওখানে জাহাজ পৌঁছে দিতে হবে। ভাবছি নায়েগ্রা ফলসটা একবার ঘুরে দেখে আসব। এবারের ট্রিপে তুমি আর অনীশও চল-না আমার সঙ্গে"

"ক মাস?"

"বেশি দিনের জন্য নয়। জাহাজ পৌঁছেই ফ্লাই ব্যাক করে চলে আসতে হবে। চলে আসার আগে যতটা সম্ভব অ্যামেরিকা ঘুরে দেখে নেব। বিশেষ করে নায়েগ্রা ফলসটা"

একা বাড়িতে ঘর সামলাতে আর ছবি আঁকতে আঁকতে ক্লান্ত। একটা ব্রেক চাই। নন্দিনী উচ্ছ্বসিত। অ্যামেরিকার সব থেকে দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে একটি। আনন্দে বুকটা কেঁপে উঠেছিল।

আগেও জাহাজে চড়েছে। তার মধ্যে আর নতুন আকর্ষণ নেই। প্রথম অ্যামেরিকার মাটিতে পা দিয়ে একটা রোমাঞ্চ ছিল। অনীশের উৎসাহ দ্বিগুণ। জাহাজে চড়া থেকে বিদেশে ঘোরা -পাখিটা খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে খোলা আকাশে।

অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বলল"এই উইকেন্ডে তো সবাই ফুর্তি করছে। চল-না এই উইকেন্ডটাই আমরা নায়েগ্রা ফলস ঘুরে আসি। পুরো উইকেন্ডটাই ওখানে কাটাতে পারব"

নন্দিনীর যেমন ছবি আঁকার নেশা, অর্ণবেরও ছবি তোলার। নন্দিনী নায়েগ্রা ফলস-এর স্মৃতি ক্যানভাসে ধরে রাখতে চায়, আর অর্ণবও ক্যামেরা বন্দি করে ফেলতে পারবে ওই মনোরম দৃশ্য।

মন্দ কী?

অনীশ বাপির দিকে তাকিয়ে বলেছিল ''হাউ লাভলি! আই অ্যাম গেটিং এক্সাইটেড অ্যাট দ্য থট"

অনীশ কেন? মনে মনে ওরা তিনজনেই এক্সাইটেড। নায়াগ্রার কথা এত শুনেছে। অ্যামেরিকাতে এসে আর কিছু দেখা না হোক, নায়েগ্রা ফলস না-দেখে গেলে, যাত্রা অসম্পূর্ণ।

বৃহস্পতিবার সকালে সবার আগে সাওয়ারে ঢুকে পড়ল নন্দিনী। যাওয়ার আগে অনেক কাজ বাকি। অর্ণব স্বাভাবিকভাবে সেগুলো ভুলে যায়। সেগুলো তো গুছিয়ে নিতে হবে। অনীশ তো স্বপ্নের আনন্দে আত্মহারা।

"ক্যামেরাটা নিয়েছ?"অর্ণব বাইরের ঘর থেকে হাঁকল "আমার হ্যান্ডব্যাগে ওটা নিয়ে নাও"। যাওয়ার আনন্দে ছবি তোলার নেশাটা আরও বেশি করে চাড়া দিয়ে উঠেছে।

নন্দিনীর তো সঙ্গে করে কিছু নিয়ে যাওয়ার নেই। শুধু মনের ক্যানভাসে ধরে রাখার জন্য একটা নির্মল মন নিয়ে গিয়ে দুচোখ ভরে দেখে আস্বাদন করতে হবে তার রূপ, রস, বর্ণ মুহূর্ত টুকুকে। পরে ইন্ডিয়াতে ফিরে যাতে স্মৃতির জলছবি আঁকতে পারে মনের ক্যানভাস থেকে।

"উফঃ! অত চিৎকার করার কিছু নেই। যাওয়ার আগে সবকিছু ঠিক করে নেব। লেট মি হ্যাভ মাই বাথ ফার্স্ট"নন্দিনী অর্ণবের ফোপরদালালিতে একটু বিরক্তই হল।

"মম... ক্যন আই ক্যরি মাই আইপ্যড প্লিজ?"

নন্দিনী উত্তর দিল না। ততক্ষণে সে সাওয়ারে।

দু-ঘণ্টার ফ্লাইট। শিকাগো থেকে বাফেলো।

অর্ণব নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলল "উই হ্যাভ লস্ট টু আওয়ার্স" -নিউ ইয়র্ক শিকাগো থেকে এক ঘণ্টা আগে।

নন্দিনীর হাতে চাপ দিয়ে অর্ণব বলল "হাউ অ্যাম আই গোয়িং টু টেক কেয়ার অফ দ্য জেট ল্যগ নন্দিনী?"

ইন্ডিয়া থেকে এলে টাইমের গন্ডগোলে সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। শিকাগোতে কয়েকদিন কাটিয়েছে। এখনও ধাতস্থ হতে পারেনি।

যখন শিকাগোতে পৌঁছল, তখন দুপুর আড়াইটে। অর্ণব হার্টজ কার রেন্টাল থেকে গাড়ির চাবিটা নিতে যাচ্ছিল। পেছন থেকে নন্দিনী বলল "হওয়াই ডোন্ট ইউ গেট এ কার উইথ জিপিএস?"

"দে ডোন্ট হ্যাভ ইট রাইট নাও নন্দিনী। বাচ্চার মতো করো না। হোটেলটা এখান থেকে বেশি দূর নয়"

অনীশ গাড়ির পেছনের সিটে বসে বলল "ড্যাড আই অ্যাম হাংরি। ক্যন আই হ্যাভ সাম নাট-নাগেটস প্লী...জ...?"

"ইয়েস... বাট নো সোডা"অর্ণব ড্রাইভিং হুইলে বসতে বসতে বলল।

একটু অস্বস্তি লাগছিল। ইন্টারন্যশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে এলেও জায়েগাটা তার অপরিচিত। ক'দিন শিকাগোতে চালিয়ে হাতটা একটু রপ্ত করে নিয়েছে। এদেশে ঘুরতে হলে নিজেকেই গাড়ি চালাতে হবে। এ তো আর ইন্ডিয়া নয়! যে সেফর ড্রিভেন কারে কেউ তাকে ঘোরাবে!

"অনীশ ডু ইউ রিমেম্বার হোয়াট ইউ হ্যভ প্রমিসড?"

"হোয়াট?"

"তোমার মাতৃভাষা কী?"

"বাংলা"

"আমরা বাংলায় কথা বলি। নয় কি?"নন্দিনী সিট বেল্ট লাগিয়ে অর্ণবের পাশের সিটে বসে বলল।

অনীশ এই কদিনেই গলগল করে ইংরেজি বলছে। শেষে দেশে ফেরত যাওয়ার আগেই না বাংলাটা ভুলে যায়! বয়েসটাকে তো বিশ্বাস নেই। এই বয়সে বাচ্চারা যা পারে তাই হজম করে নেয়। তাও আবার অ্যামেরিকান সভ্যতা বলে কথা! নিজের দেশকেই পাঁচ মেশালি বিদেশ করে ছাড়ল। আর বিদেশে এলে তো কথাই নেই। দেশকে ভুলতে কতক্ষণ?

পরের দিন অনীশ আরও উৎফুল্ল। কাল রাতে ড্যড কথা দিয়েছে ওকে হেলিকপ্টারে চড়াবে নায়াগ্রা ফলস-এর ওপর। এর আগে কখনও হেলিকপ্টার চড়েনি অনীশ। মনে মনে একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছিল। নন্দিনীর খুব ইচ্ছে ছিল না। অমন উঁচুতে। একটু ভয় ভয় করে... কিন্তু সেকথা অনীশকে বোঝানো যাবে না।

তখন সকাল এগারোটা। ওরা তিনজনে হেলিপ্যডের দিকে হাঁটতে শুরু করল। আগে ওজন নিয়ে কপ্টারে ঢুকতে হবে যে!কিছুক্ষণের মধ্যে কমলা রঙের হেলিকপ্টারটা আকাশে হারিয়ে গেল। কোথায় যে হেলিপ্যাডটা ফেলে এসেছে চারিদিক ঘুরে দেখতেও পেল না অনীশ।

অনীশ পেছনে মায়ের পাশে বসে ছিল। বাঁ হাতটা মুঠো করে, ডান হাতটা মায়ের হাতে জড়িয়ে দুরু দুরু বুকে সামনে তাকিয়েছিল। অর্ণব পাইলটের পাসে বসে মুচকি মুচকি হাসছিল।

"আমরা স্বর্গের কাছাকাছি!"

কপ্টারটা ফলস-এর ওপর ঘুরপাক খেতে অর্ণব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অনেকদিনের স্বপ্ন। বহুদিনের স্বপ্নকে আজ কাছ থেকে পাওয়া। ছোটবেলা থেকে কত পড়েছে। সেই স্বপ্নের স্বর্গ আজ চোখের সামনে।

নীল আকাশের বর্ণচ্ছটায় জল প্রপাতের ঘনঘটা। মুহূর্তটা যেন নির্বাক হয়ে থেমে। সেই চোখ জুড়ানো বর্ণ নন্দিনীর দুচোখে। হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টিতে মহাশূন্যের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে অর্ণব বলল "জলের রংটা কী?"

অর্ণব-এর কথা টেনে নিয়ে নন্দিনী বলল "সাদা? না গ্রে? না কি নীল?"

দৃশ্যটা নিজের মনের ক্যানভাসে ছবি করে রাখতে চাইছে। পরে দেশে ফিরে সেই রং-এর অ্যাক্রিলিক ব্যবহার করতে পারবে। ছবিটাকে স্পষ্ট ধরে রাখতে চাইছে মনে। নিখুঁত রং। যাতে তার প্রকাশের মধ্যে কোনো খামতি না থাকে। রং-টা চিরপরিচিত না হয়ে বাস্তব হওয়াটাই আবশ্যক।

"নীল"অনীশ বাবা মায়ের কথায় যোগ দিয়ে সরবে বলল "দেখ দেখ, আমি কিন্তু বাংলাতেই বলছি"

অর্ণব জবাব দিল না। ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বার করে কন্টিনিউয়াস মোড দিয়ে ধুপ-ধাপ ক্লিক করতে লাগল। এটুকু সময় যত ছবি তুলে রাখা যায়।

ছোটবেলা থেকেই অর্ণবের ফটোগ্রাফির অসম্ভব নেশা। কলকাতার ভিখিরি থেকে বর্ষাস্নাত এসপ্ল্যানেডের মেট্রো চত্বরের ছবি আজও বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে আছে কলকাতার বাড়িতে। তখন তো আর ডিজিট্যল ক্যামেরা ছিল না। অনেক কষ্টে টাকা জমিয়ে একটা নিকন এস এল আর কিনেছিল। এই মুহূর্তে সেকথা মনে করতে চায় না। যুগটা পালটে গেছে। নন্দিনী তখন জীবনে আসেনি। অনীশ তো নয়ই।

এখন আরেক পৃথিবী। তবুও ছেলেবেলার অভ্যাসটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ব্যাপ্তির মধ্যে নতুন সুর খুঁজছিল। আনন্দের সুর। জীবনের ভাল লাগার সুর। বিদেশে নিজেকে আবার নতুন করে পাওয়ার সুর। কেবলই মনে হচ্ছিল ছবিই যথেষ্ট নয়...

...আরও... আরও কিছু...

এই ভাল লাগার পরিমাপটা যেন সরগম থেকে নিখাদে পেখম মেলে ভাসতে চাইছে। মুক্ত পাখির মতো। ধরা থেকে অধরাকে আঁকড়ে ধরার উন্মাদ নেশায়...

আরও... আরও... আরও...

বিবরণহীন সৌন্দর্যের নীলিমায় হারিয়ে যেতে যেতে অর্ণবের হঠাৎ মনে হল 'যদি এই মুহূর্তে আমি কপ্টার থেকে ঝাঁপ দিই, ও কি আমায় চুমু খাবে? যদি দুহাত মেলে ভেসে বেড়াই, তবে কি বাধাবন্ধনহীন মুক্ত পাখিদের মতোই শূন্যে উড়তে পারব? যদি আর ফেরত না যাই, তবে কী ও আমায় অ্যাকসেপ্ট করবে?"

"আর ইউ অল রাইট?"পাইলটের কথায় অর্ণব যেন স্বপ্ন থেকে ফিরে এল বাস্তব সৌন্দর্যের মখমলে।

"উই আর নাও গোয়িং ডাউন"

"ওক...কে, ওক...কে, থ্যঙ্কস!"অর্ণবের স্বর স্পষ্ট শোনা গেল।

অনীশ সারাক্ষণ ধরে যেন ভুলতেই পারছে না কপ্টার রাইডের কথা। কত প্রশ্ন। নন্দিনীর উত্তর দিতে দিতে নাভিশ্বাস উঠে আসছে। এবার একটু বিশ্রাম দরকার।

"চলো আমরা হোটেলে যাই"অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বলল "স্নান করে একটু ঘুমিয়ে নিই"

“তোমরা একটু রেস্ট নাও। আমি আরও কয়েকটা ছবি তুলে আসি। ফেরার পরে আমরা ইভিনিং-এ ফায়ার ওয়ার্কস দেখতে যাব”

নন্দিনী মাথা নেড়ে গা এলিয়ে দিয়েছিল।

চারটে নাগাদ অর্ণব বেরিয়ে পড়েছিল। এই মুহূর্তে কারও সঙ্গে কথা বলতে আর ভাল লাগছে না। ঘরে শুয়ে সময় নষ্ট করতেও মন চাইছিল না। ভেতরে ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা তাকে গ্রাস করেছিল। সেই অর্গ্যজমিক নীল তাকে হাতছানি দিচ্ছে...

বারবার!

অর্ণব ফলস-এর জলের দিকে এগিয়ে চলল। যতটা এগোনো যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত ফলস-এর রেইলস তরুণীর হাইমেনের মতো তাকে থামিয়ে না দেয়...

...মাথাটা ঘুরতে লাগল। পা দুটো কেঁপে উঠল। একটা অস্বস্তিতে যেন মাটিটা হারিয়ে যাচ্ছে ... এটা কী প্রকৃতির আমন্ত্রণ? না কী হৃদয়ের কম্পন? বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে গেছে প্রশস্ত কপালের আবরণ।

অর্ণব ক্যামেরার লেন্স ওয়াইপার দিয়ে কপালটা মুছল। সারা জীবনের স্বপ্নের ক্যানভাসটা এস ডি কার্ডে বন্দি করে রাখতে চায়। আঙুল কেঁপে কেঁপে উঠছে শাটারের মৃদুমন্দ তরঙ্গে। কানে ভেসে আসছে হাজার তবলার বিরামহীন লহরা। হৃদয় কেঁপে উঠছে এক নিঃশব্দ আলোড়নে।

মুহূর্তের জন্য...

কোথায় যেন মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দেহটা রেলিং-এর ওপর শূন্যে ভাসছে... যেন এপার-ওপারের মাঝে দাঁড়িয়ে শুনছে একটা চেনা পৃথিবীর না-চেনা আলো-আঁধারের মিশ্র রাগ। ক্যামেরাটা হাত থেকে কালো নুড়ির মতো ফসকে পড়ল।

...আর দেখা গেল না।

অর্ণবের কানে দূর থেকে ভেসে আসছে হাজার মানুষের কোলাহল!

নীল মিশে গেল ধূসর থেকে অন্ধকারে...

ছবিটা আঁকতে গিয়েও আঁকা হল না নন্দিনীর। সেই ইন্ডিয়া থেকে যাকে নানা বর্ণে সাজাতে চেয়েছে চেতনার অবগুণ্ঠনের বিভোরে। সেই চেতনাটা আবছায়া মনের একটা ক্যানভাস। যেখানে জীবনের রং বারবার বর্ণহীন হয়ে যাচ্ছে। জীবনের মহা ব্যাপ্তির কালস্রোতের গতিপথ থেকে উদ্ধার করা একটুকরো মুছে যাওয়া রং। এই রং-এর রামধনুর মধ্যে কোথাও ছবিটা আছে। আছে ব্যথার একটা জলছবিও। অ্যাক্রিলিকে এঁকে লাভ নেই। কখন আবার মুছে যায়...

কিন্তু কোথায়?

ফেসবুকে নীল ধূসর থেকে অন্ধকারে মিশে যাওয়ার একটা ছবি কম্পিউটারে এঁকে পোস্ট করে দিল। যেন তার মধ্যেই জীবনের ঝংকার খুঁজছে।

ঝংকারটাই তো জীবন!

হয়ত তা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন আকারে। স্পন্দন জাগায় নানা রং-এর রামধনু ছড়ানো ব্ল্যাংক ক্যানভাসে। নন্দিনীর জীবনটা বোধহয় সেই চেনা ছবির অচেনা রূপ আঁকতে চাইছে এক বিশেষ লক্ষ্মণরেখার ঘেরাটোপের মধ্যেই। জাগতিক প্রাণোচ্ছল জীবনের প্রেক্ষাপটে একটা নিজস্ব বিউটি। বিউটি অ্যাট ইটস বেস্ট। আবরণে ঢাকা, ধোঁয়াশায় ঘেরা অস্পষ্ট এক স্বপ্ন!

এমন তো কোনো কথা নেই, যে সৌন্দর্যটা প্রকৃতির অ-দেখার মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে পারে? জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যেও তো তাকে খুঁজে নেওয়া যায়? না-ই বা বাধা পড়ে রইল পঞ্চবটী বনের কুটিরের চারপাশে এঁকে দেওয়া লক্ষ্মণরেখায়! সে তো পুরাণের কথা। গণ্ডির বাইরে পা বাড়ালেই রাবণের হাতছানি! কিংবা মোহময় স্বপ্নের হনন।

একজন ফেসবুকে ছবিটা দেখে কমেন্ট করল “আচ্ছা, আপনি কী স্বপ্ন দেখেন?”

“কেন?”

“ছবিটা দেখে মনে হল, আপনি স্বপ্নের তুলি দিয়ে ছবিটা এঁকেছেন”

নায়েগ্রা ফলস-এর রং-এর সমন্বয় কী স্বপ্নের প্রতিবিম্ব?

নন্দিনী তো বাস্তবের রং-টাই এঁকেছে। তার জীবনের কঠিন বাস্তব। তার জীবনের একটা অধ্যায়।

“কেন বলুন তো?”

“রং-টা ঠিক কেমন জানি লাগছে”

কোন রং দিয়ে আঁকা হলে ক্যানভাসটা প্রাণ পাবে? বেগুনি, ঘন নীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা, না কি লাল?

ওই রংগুলোই খুঁজছে লোকটা। ধূসর আর অন্ধকারের কোনো রং তো আলাদা করে নেই। মানুষ শুধু চেনা রং-এই ছবিটা দেখতে চায়। অজানা রং নিয়ে ভাবে না। কিন্তু সেই অজানা রং দিয়েই তো জীবনের ছবি আঁকা হয়।

সে রংটা কী?

সেই রং খোঁজাই তো আসল কাজ। অথচ সবাই ভুলে যায় সে কথা। হয়তো বা ক্বচিৎ কখনো, মাঝে মাঝে কোনো নিঝুম দুপুর অথবা স্তব্ধ মাঝরাতে হঠাৎ সেই রংটা স্মৃতির মশারি সরিয়ে উঁকি মারে একটা ছোট্ট মৌটুসি পাখির মতো। ডাক দেয় কোথাও চলে যাওয়ার।

অন্য কোথাও। অন্য কোনোখানে ...

নন্দিনী স্মৃতির আলপথ ধরে জীবনের ধানখেতের মধ্য দিয়ে হাঁটতে শুরু করল, সেই অজানা অচেনা গন্তব্যের সন্ধানে।

ষষ্ঠ নন্দিনী

“যুগটা পাল্টে গেছে। এখন আর কেউ পিওর ক্লাসিক্যাল নাচ দেখে না। কী হবে শিখে?” গীতাদি প্রশ্নটা ছুড়ে দিল নন্দিনীর দিকে।

নন্দিনীর অদ্ভুত লাগছে, সব কিছু যেন কিছুর জন্য করা। নিজের ভাল লাগার জন্য কিছু যেন করাটাই বৃথা। সবাই কোনো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু করতে চায়। নিছক আনন্দের জন্য কিছু শেখাটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যেতে বেশ লাগে। হোক না সে ক্ষণকালের স্ফূর্তি। তার মধ্যে যে অদৃশ্য তৃপ্তি লুকিয়ে আছে বোঝাবে কী করে?

“তবুও আমি শিখব”

“ভেবে দেখ। সেই পথটা কঠিন” গীতাদির অনীহাটা বেশ আঁচ করতে পারছে।

আশ্চর্য!

গন্তব্য না থাকলে বুঝি পথ চলার কোনো মানেই হয় না। মানে দিশা ছাড়া কোনো কিছু করাটাই নিছক পাগলামো। কত স্বার্থ কেন্দ্রিক বৈষয়িক আমাদের চিন্তাধারা! উদ্দেশ্য ছাড়াও ভাল লাগাটা যে জীবনের চলার পথে মানসিক ব্যাপ্তির জন্য অনেক শ্রেয়। কে বোঝাবে গীতাদিকে?

“তবুও...”

“আবারও বলছি ভেবে দেখ”

কিছুটা বিরক্ত হয়েই হাল ছেড়ে দিল নন্দিনী। শুধু গোঁড়ামি নয়, এই দিকপালদের মধ্যে একটা ঔদ্ধত্য, অহং আছে। নন্দিনীর অত তোষামোদি করা পোষাবে না। নাই বা পারদর্শী হল, তা বলে কি শেখা যায় না? এরা, সব কিছুই কুক্ষিগত করে রাখতে চায় নিজেদের মধ্যে। এটাই এদের অস্তিত্বের অহং, কিংবা বেঁচে থাকার অবলম্বন। ভাববার কী আছে? মন চেয়েছে... শিখবে... ব্যস। অত হিসেব নিকেশের কী আছে?

ছোটবেলায় পাড়ার ফাংশনে বেশ কিছু রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে প্রধান ভূমিকায় নেচেছিল। সে তো অনেকেই করে থাকে। সেটাকে নাচের পর্যায় ফেলতে চায় না নন্দিনী। নাচের তালিম পরে নিতে শুরু করেছিল ভারতনাট্যমের শিক্ষিকা করুণাদির কাছে। আল্লারিপু দিয়ে শুরু। তারপর কৌটুভম থেকে গণপতি বন্দনা। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর পড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়লে, আর এগনো হয়নি। এতদিন পরে আবার মনে হল নাচের তালিম নিলে মন্দ হয় না। এবার সিরিয়সলি নাচটা শিখবে। মরুতাপ্পা পিল্লাই-এর সুযোগ্যা শিষ্যা গীতাদির কাছে তাই যাওয়া।

বেশ। না হয় না-ই শেখাল। তাতে কী তার চর্চা বাধা পড়ে থাকবে?

হুজুগের বশে দুম করে একদিন ইউনিভার্সিটি ক্লাসিক্যাল ডান্স কম্পিটিশনে নাম দিয়ে ফেলল। এক সময় কিছুটা ভারতনাট্যম শিখেছিল। সেটাকেই ঘষেমেজে কিছুটা ইম্প্রভাইসেশন করে নেমে পড়ল কম্পিটিশনের ঘোড়দৌড়ে। বাজিমাত করল প্রথম পুরস্কার জিতে। সেটা কোনো মেডেল বা আর্থিক সহায়তা নয়। খাজুরাহ ডান্স ফেস্টিভ্যলে নাচার সুযোগ।

আনন্দে শৃঙ্গার যেন পাদমের ঝংকার তুলল মুদ্রার ছন্দে। ওইটাই নাচবে সে। ইভেন উইদাউট গীতাদি।

খাজুরাহ!

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে, শীতের মিঠে আমেজটা উপভোগ করছিল নন্দিনী। গতকাল দুপুরে ঝাঁসি থেকে ট্রেনে খাজুরাহ পৌঁছেছে। কাল সারাদিন হোটেলের বিছানায় শুয়েই কেটেছে। ট্রেন জার্নির ধকলে বেশ ক্লান্ত লাগছিল। বিছানায় শুয়ে হোটেলের লবি থেকে পাওয়া ব্রশিওরগুলো উলটেপালটে দেখছিল। ৯৫০ থেকে ১০৫০, এই একশো বছরের মধ্যে, মধ্য ভারতের চান্ডেলা রাজপুত রাজারা নাকি ৮৫ খানা মন্দির তৈরি করে। এখন ২২ খানা অবশিষ্ট রয়েছে। চান্ডেলারা নাকি বিশ্বাস করত জৈবিক ক্ষুধার পূর্ণতায় তান্ত্রিক মতে অসীমের কাছাকাছি পৌঁছনো যায়। আবার অনেকের মতে, ব্রহ্মচর্য থেকে জাগতিক গৃহী হওয়ার পথ প্রদর্শক হিসেবে, এই মন্দিরগুলো নির্মাণ করা হয়।

"কাল থেকে তালিম শুরু" ভেজানো দরজাটায় টোকা না দিয়ে দুম করে ঘরে ঢুকেই বলল নাটুভানারস ঋতব্রত।

নন্দিনী ভাবেনি আচমকা এভাবে কেউ ঘরে ঢুকবে। তাড়াতাড়ি নিজেকে গুছিয়ে নিল। সুতির নাইটিটা ঠিক করে উপর হওয়া দেহটাকে ব্রশিওরগুলো থেকে সরিয়ে উঠে বসে বলল "ঠিক আছে স্যার"

"ঠিক সকাল সাতটায়" ঋতব্রত বলল। তারপর ব্রশিওরগুলোর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল "কী দেখছিলে?"

"এই খাজুরাহর নো হাউ"

"ইরটিক। তাই না?"

"আমি ইতিহাসটা পড়ছিলাম"

"ইতিহাস জানতে এখানে কে আসে? সবাই তো ওই ইরটিক স্কাল্পচার দেখতেই আসে"

"আমি কিন্তু খাজুরাহ ডান্স ফেস্টিভ্যল অ্যাটেন্ড করতে এসেছি" নন্দিনীর একটুও ইচ্ছে ছিল না সদ্য পরিচিত ঋতব্রত ভাণ্ডারীর সঙ্গে গুলতানি করার।

"সে জন্যই তো আমাদের এখানে আসা" ঋতব্রত বসবার উদ্যোগ করতেই নন্দিনী উঠে পড়ল।

"সারাদিনের ট্রেন জার্নিতে বেশ ধকল গেছে। স্নান করতে যাব। ভাববেন না স্যার। পাক্কা সাতটায় কমন রুমে পৌঁছে যাব"

এর পরে ঘরে থাকলে অসৌজন্য প্রকাশ পায়। উপায় না দেখে ঋতব্রত ভাণ্ডারী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নন্দিনী। স্নান না ছাই। সন্ধেবেলা এক আধা পরিচিত লোকের সঙ্গে হোটেল রুমে বসে খাজুরাহর ইরটিক স্কাল্পচার নিয়ে গল্প করার কোনো ইচ্ছেই তার নেই।

উঠেই যখন পড়েছে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ যে ভাস্কর্যের ছবি দেখছিল, মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহলে, সেই ছবির সঙ্গে নিজের দেহের গঠনটাও মেলাবার চেষ্টা করছিল। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে নিজের মুখটা দেখল। মসৃণ গালে মেক আপ ছাড়া কোনো ব্রণর দাগ চোখে পড়ল না। চুলটা কাঁধ ছুঁয়ে যাচ্ছে। চোখের নীলচে আভায় যেন সমুদ্রের ঘোর লাগানো মাদকতা। উদাসীন চোখ দুটো যেন সাগরের ব্যাপ্তিকে স্নিগ্ধ শান্ত নিবিড় দৃপ্ত চাহনিতে ভেদ করতে চাইছে। ছোটবেলা থেকেই ডান দিকের নীচের চোখের পাতাটা একটু বেশি ঝোলা। যৌবনে পাড়ি দেওয়ার সময় এ নিয়ে একটু বিচলিত ছিল। এখন আর বড় একটা ভাবে না। মেদুর চোখের চাহনি যেন চোখের পাতার অসংলগ্নতাকে আড়াল করে দিয়েছে। পাতলা ঠোঁটের ওপর নাকের টিপটা মুখ আন্দাজে একটু ভারী। এক সময় রাইনোপ্লাসটি করাবে বলে প্লাস্টিক সার্জেনের কাছেও গিয়েছিল। উনি করতে চাননি।

"সেবেসিয়াস স্কিনে রাইনোপ্লাসটির রেসাল্ট ভাল হবে না"

পয়সা বেঁচে গিয়েছিল বটে। কিন্তু নাকের আদল নিয়ে মনে একটা খুতখুতানি থেকেই গেছে। সৌন্দর্যের মধ্যে ওটাই যেন একটা বেসুরো রাগ। নিজেকে সান্ত্বনা দেয় - এমন তো কোনো মহিলা নেই, যে পিকচার পারফেক্ট। কাছ থেকে দেখলে প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু অসংলগ্নতা খুঁজে পাওয়া যাবে। মুখের সৌন্দর্য থেকে দৃষ্টিটা নেমে এল দৈহিক গঠনের দিকে। ব্রেস্টটা বরাবরই একটু শিথিল। আন্ডারওয়ার্ড ব্রা দিয়ে তাকে ওপরে টেনে ধরে রাখতে চাইলেও বাইরের দিকে আরমপিটের দিকটা বিশ্রী ভাবে ফুলে ওঠে। বিদ্রোহটা বহিরমুখি না হয়ে অন্তরমুখি হলে, ওই ব্রশিওরের ছবিগুলোর মতোই তা আরও পুষ্ট, পরিপূর্ণ ও ভরাট লাগত। প্রায়শেই মনে হয়, ব্রেস্ট অগমেন্টেশন করিয়ে নিলে হয়ত ওপরে ভরাট হলে আরও বেশি মাধুর্য আসবে। কিন্তু অত টাকা তো নন্দিনীর নেই! বাবা তো দেবেনই না বখে যাওয়া মেয়েকে।

"শেষ পর্যন্ত কোনটা করবে ঠিক করলে?" রিহার্সাল রুমে ঋতব্রত নন্দিনীকে প্রশ্ন করল।

"ভরনম" সারা রাস্তা এই নিয়ে ভেবেছে নন্দিনী।

"তাহলে তো পাদ ভরনম করতে হয়। পাদ ভরনমে গায়কিটা অনেক প্রাধান্য পায়"

"আপনি যা বলেন স্যার" লাল সালওয়ার কামিজটা ঠিক করতে করতে নন্দিনী বলল।

“সেটা তো অনেকক্ষণের। আধ ঘণ্টা দম রাখতে পারবে?”

“পারব স্যার” নন্দিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

“তাহলে আদি তাল, যা আট বোলের, আর আট তাল, যা চৌদ্দটা বোলের, তফাতটা আগে বোঝার চেষ্টা কর”

“নিশ্চয়ই স্যার। আমি পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ সম্বন্ধে একটু একটু জানি”

“কী জান?”

“স্যার পূর্বাঙ্গ প্রথম ভাগটা। পল্লবী, মুক্ত পল্লবী আর চিত্ত সরস দিয়ে তৈরি”

মনে মনে খুশি হল ঋতব্রত। মেয়েটা বেশ কিছু জানে। লক্ষ করছে ভেতরে একটা জেদও আছে।

“আর উত্তরাঙ্গ?”

“চরণম আর চরণ সরস”

“মন দিয়ে শোন। যে অর্ডারে আমি নাচটা তালিম দেব তা হচ্ছে, পল্লবী কিংবা অনুপল্লবী, মুক্তাই স্বরনম, এরপর পল্লবীটাকে ডবল স্পিড আর ট্রিপল স্পিডে নাচতে হবে, তারপর আমরা চলে যাব চরণম-এর আটটা গ্রুপে। পারবে?”

“আপনি শিখিয়ে দিলে নিশ্চয়ই পারব স্যার”

সকাল থেকে লাঞ্চটাইম। এক নাগাড়ে তালিম নিয়ে চলেছে। ভুল হলে ঋতব্রত থামিয়ে দিয়ে আবার রিপিট করাচ্ছে। গীতাদি তাকে রিফিউস করেছে। তাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে, সে কোনো অংশে কম নয়।

ঋতব্রত শুধুই বোলের সঙ্গে নন্দিনীর হাত ও পায়ের মুভমেন্টস দেখছে না, নন্দিনীকেও দেখছে। খাজুরাহ ডান্স ফেস্টিভ্যালে আগেও বহুবার এসেছে অনেক ছাত্রী নিয়ে। কিন্তু এর আগে নন্দিনীর মতো জীবন্ত খাজুরাহ কখনও পায়নি। যখন সামনে জীবন্ত খাজুরাহ, বাইরের ভাস্কর্য দেখে কী হবে?

খাওয়ার পর ঋতব্রত বলল “এখন কী করবে?”

“একটু ঘুমিয়ে নিই স্যার”

“তাহলে আমরা পাঁচটা থেকে আবার রিহারসল শুরু করব”

“চারটে থেকে করলে অসুবিধা হবে? আরেকটু বেশি সময় পাওয়া যাবে। আমি তো রিসেন্টলি তেমন ফর্মাল ট্রেনিং-এর মধ্যে নেই। একটু বেশি তালিম দিলে যদি আরেকটু ভাল করতে পারি”

“বেশ। চারটের সময় রিহারসল রুমে চলে এস”

খাজুরাহর চিত্রগুপ্ত মন্দির আর বিশ্বনাথ মন্দির চত্বর সেজে উঠেছে বছরের নৃত্য মধুর নেশায় বিভোর হতে। চিত্রগুপ্ত মন্দিরের সামনে যে পাথর বসানো বিশাল জায়গাটায় চেয়ার পাতা রয়েছে, সেখানে ঋতব্রত স্যারকে বসতে বলে নন্দিনী বলল "স্যার, আপনি একটু বসুন। আমি একটু ঘুরে দেখে আসছি"

"আমি যাব তোমার সঙ্গে? তুমি তো এই মন্দিরের সব দিক চেনো না"

ঋতব্রত স্যার সঙ্গে থাকলে আবার ইরটিক আর্ট সম্বন্ধে লেকচার দিতে শুরু করবে। রিহার্সালের সময় স্যারের চোখের চাহনি দৃষ্টি এড়ায়নি নন্দিনীর। স্যারকে ভাস্কর্যের মাধুর্য বর্ণনা করার অবকাশ না দিয়েই বলল "না স্যার। আমি একাই দেখে আসি"

কী যে ভাল লাগছে! ভাবতেও পারেনি এখানে কোনোদিন নাচবার সুযোগ পাবে। জেতা কিংবা হারাটা বড় কথা নয়। নন্দিনীর মতো নভিস-এর এই প্রেস্টিজিয়াস ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাওয়াটাই বড় কথা।

কী সুন্দর এই চিত্রগুপ্ত মন্দিরের ভাস্কর্যের কারুকাজ। মন্দিরের আসল অংশ কিঞ্চিত উঁচুতে। দুটো ধাপে সিঁড়িগুলো সাজানো। প্রথম তেরো ধাপ পেরিয়ে একটু সমতল। সেক্ষণে পিংক-গ্রে-হলদে মেশানো পাথরগুলো, তার এই যাত্রার তপস্যাভূমি। সেখানে এখন এই বর্ণাঢ্য নৃত্য সমারোহের আয়োজন চলেছে। এরপর আরও তেরোটা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। তেরোটা সিঁড়ি কেন? প্রশ্নটা বারবার উঁকি দিলেও এ প্রশ্নের উত্তর ক'জন দিতে পারবে বলা মুশকিল। পরে কাউকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া যাবে। এখন তো ভেতরে যাওয়া যাবে না।

আসল মন্দিরটা অন্যান্য মন্দিরের মতোই। অনেকটা স্পুটনিকের আদলে। নন্দিনীর মনে হল, প্রতিটা মন্দিরের চূড়া হয়ত কোনো উপগ্রহ থেকে আসা উৎকৃষ্ট জীবদের নিদর্শন। একবার মনে হল, হয়ত এই মন্দিরের চূড়াগুলো ঠিক শিবলিঙ্গের মতো। পৌরুষের বহিঃপ্রকাশ। পৌরুষকে পূজা করাই আমাদের সব ধর্মে শিখিয়েছে। অবলা নারী চিরকালই অবদমিত থেকে গেছে এই পৌরুষের অহং-এ, যতই নারী স্বাধীনতা নিয়ে আন্দোলন করুক না কেন।

একের পর এক নাচ হয়ে যাচ্ছে। ভরতনাট্যম, কত্থক, কথাকলি, মণিপুরি, কুচিপুরি, ওডিসি, মহিনাট্যম। এদের দেখে নন্দিনীর ভয় করতে লাগল। পারবে তো? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল প্রাইজ পাক চাই না-পাক, এই আসরে নিজেকে মলিন হতে দেবে না।

ঋতব্রতর দিকে তাকিয়ে বলল "স্যার কাল থেকে আর সকালে আসব না। আরও বেশি করে তালিম নেব"

"আমাদের প্রোগ্রাম তো আরও দুদিন পরে"

"হ্যাঁ স্যার। দুদিন আরও বেশি করে তালিম"

নন্দিনীর একাগ্রতা দেখে খুশি হল ঋতব্রত। মেয়েটার দম আছে বটে। শুধু দম-ই নয়, চেষ্টার কোনো খামতিও নেই। সবাই সব কিছুতে মাস্টার নাও হতে পারে। চেষ্টা করতে বাধা কোথায়? নন্দিনীর প্রতি আকর্ষণটা আরও গাঢ় হচ্ছে। এতদিন শুধু ওর দৈহিক ভাস্কর্যের প্রতি সীমিত ছিল। এখন নিতম্ব থেকে স্তনভাণ্ডের সম্ভার ছাড়িয়ে, ক্রমশ ওর অন্তরে প্রবেশ করতে চাইছে। ঋতব্রত বেশ বুঝতে পারছে, মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুটা সামগ্রিক। জৈবিক আকাঙ্ক্ষা সংযত করা গেলেও, সামগ্রিক আকর্ষণকে থামানো বড়ই কঠিন।

পড়ন্ত শীতের ঝরন্ত বিকেলের মৃদুমন্দ বাতাস রিফ্রেশড নন্দিনীকে মাতিয়ে দিয়েছে বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে। আজকেই তার দিন। তাকে শ্রেষ্ঠ পারফর্ম্যান্স দিতে হবে। নাউ অর নেভার। গীতাদিকে দেখিয়ে দেবে সে কোনও অংশে কম নয়। ঘোরে নেচে চলেছে নন্দিনী। পল্লবী থেকে অনুপল্লবী থেকে মুক্তাই স্বরনম থেকে চরণম। একটা মাদকতা। একটা সতেজতা। সারা দেহের প্রতিটা অনুষ্টুপ দিয়ে আঁকতে চাইছে বোল-সংগম-মৃদঙ্গমের চৌদ্দ তালের অর্ঘ্য। যেন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দিয়েছে শিবের বন্দনায়। এ যেন বিশ্বনাথ মন্দির প্রাঙ্গণ নয়, দেবরাজ ইন্দ্রের মেহফিল। সে আর নন্দিনী নেই। হয়ত সে মেনকা, উর্বশী কিংবা রম্ভা। যার প্রতিটা শৈলী ছড়িয়ে পড়ছে রঙিন আলোর বর্ণচ্ছটায়। সুর-তাল-ছন্দ মিশে গেছে দেহের ভঙ্গিমার পরিপূর্ণ জৌলুসের পরিস্ফুটনে, বোলের বৃন্দে নৃত্যের তালে তালে।

নতুন ক্যানভাসে আঁকতে চাইছে এক অচেনা ছবি। নন্দিনীর না-দেখা নতুন ছবি। চিত্রকর সে। আবার চিত্রপটও সে। চিত্রকর আর চিত্রপট যেন এক হয়ে গেছে নতুন তুলির টানে। রূপ, রস, শব্দ, ছন্দ, বর্ণ - সব যেন মিলেমিশে একাকার, এক নতুন রং-এর জাদুর মায়াজালে।

"খুব ভাল নেচেছ" আচমকা হোটেলের ঘরের দরজা খুলে ঋতব্রত ঢুকল।

নন্দিনী সবে মেক আপটা তুলে নিজেকে রিফ্রেসড করতে বাথরুমে ঢুকছিল এই ধকলের পর। এখনও ঘোর কাটেনি। কিছুটা আবগ, কিছুটা উন্মাদনা, কিছুটা পর্যালোচনা, সব রং-এর সমন্বয় যেন একটা মোহময় আবেগ সৃষ্টি করেছে তার ক্ষুদ্র অনুভূতির সংগমে।

আচমকা ঋতব্রতকে ঘরে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হয়েছিল নন্দিনী। এর আগেও তাই করেছে। লোকটা কী অচেনা মহিলার ঘরে ঢোকার আগের শিষ্টাচারগুলো শেখেনি?

তবু ভদ্রতা বজায় রেখে বলল "থ্যাঙ্ক ইউ স্যার"

"স্যার নয়... ঋতব্রত দা"

"ওই একই হল"

নন্দিনী একটু একা থাকতে চাইছিল। কিন্তু এখন বোধহয় তা আর সম্ভব নয়। কিছুটা কৃতজ্ঞতা বোধে ঋতব্রতকে এখন অবহেলা করা সমীচীন নয়। আফটার অল ঋতব্রতর জন্যই সে মনোমতো পারফরমেন্স দিতে পেরেছে।

ঋতব্রত ডেস্কের সামনের চেয়ারে বসে। নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলল "মাসেণ্ট উই সেলিব্রেট?"

নন্দিনী চুপ করে তাকিয়ে আছে ঋতব্রতর দিকে। ঘোর থেকে বেঘোরে আসবার সময় নিচ্ছে। নন্দিনী এখনও জানে না সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। জিতেছে না হেরেছে?

এই দ্বন্দ্বের মধ্যে যখন সে দোদুল্যমান, ঠিক সেই মুহূর্তে ঋতব্রত নন্দিনীর ঘরের ফোনটা তুলে বলল "হুইস্কি মিলেগা? টিচার্স? এক বোতল ভেজ দো ঔর বেয়ারা কো... মেনু কার্ড লেকে..." তারপর নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলল "আজকে এখানে আমরা সেলিব্রেট করব। টু ইওর গুড লাক" একটু থেমে বলল "চিন্তা করো না। বিল টা আমিই পে করব"

মেনে নেওয়া ছাড়া নন্দিনীর আর বিশেষ কিছুই করার ছিল না। আজকের দিনে যদি স্যার তাকে ট্রিট দিতে চায়, না বলার তো কোনো অবকাশ নেই! আর বলবেই বা কেন? আজকে তো আনন্দের দিন। আজকে তো স্বপ্ন পূরণের একটা মুহূর্ত। আজ গুরু বন্দনার দিন। তার ক্ষুদ্র শখের মজলিসের পূর্ণতার স্বাক্ষর।

হুইস্কি এল। বেয়ারা এল। খাবার অর্ডার হল। নন্দিনী নিজেকে রিফ্রেসড না করেই গুরুর তালে ছন্দ মেলাল। আফটার অল পূজার দিনে কী পূজারিকে অবহেলা করা যায়! কখনওই নয়। সূর্যের বন্দনা গানে উচ্ছ্বসিত হলে এই দিনটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকত। কিন্তু শিবের উপাসনা যেন ফেলে আসা বিশ্বনাথ মন্দিরের রেশ টানতে চাইছে।

নন্দিনী গুরুর ছন্দে পা মিলিয়েছে। আজকের উৎকর্ষ, পারফরমেন্স, ঋতব্রত স্যারের সাহায্য না পেলে কখনই হত না।

"বুঝলে নন্দিনী, এই খাজুরাহ ডান্স ফেস্টিভ্যলে এর আগেও বেশ কয়েকবার এসেছি। কিন্তু এবার তোমার আসাতে এটা অন্য মাত্রা পেয়েছে"

নন্দিনী চুপ করে বসে আছে।

ঋতব্রত বলে চলছে "মন্দিরের ভাস্কর্য দেখে কি আর মন ভরে? কতগুলো প্রিমিটিভ মূর্তির ইরটিক লীলাখেলা। বোধহয় এখান থেকেই গ্রুপ সেক্স-এর কনসেপ্টটা শুরু। শ্রী কৃষ্ণের গোপিনীদের নিয়ে লীলা মাহাত্ম্য। এখানে তো আর গোপিনী নেই। কেবল তুমি ছাড়া" একটু থেমে হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে বলল "আমি সুন্দরের পূজারি... তোমার সৌন্দর্যের পূজারি"

অস্বস্তিতে নড়ে বসল নন্দিনী। ঋতব্রতর কথাগুলো যেভাবে মোড় নিচ্ছে, একটুও ভাল লাগছে না। ঠিক কী করবে, বুঝতে পারছে না। সৌজন্য বজায় রেখে খাওয়ার মাঝখানে স্যারকে চলে যেতে বলতে পারে না।

কথাটা ঘোরাবার জন্য বলল "স্যার আপনার কী মনে হয় আমার কোনও চান্স আছে? আমার নাচটা তো দেখলেন"

"কী করে বলি বল? আমি তো আর জাজ নই। আমি জাজ হলে তোমাকে ফার্স্ট করে দিতাম। এমন ভরাট চেহারা, এমন দৃপ্ত ভঙ্গিমা, এমন শার্প চোখের চাহনি, যেন বিশ্বনাথ মন্দিরে শিব আরাধনার কথা মনে করিয়ে দেয়। তোমারা উপোস করে শিব লিঙ্গে দুধ ঢাল। কখনও ইচ্ছে হয় না জীবন্ত শিবলিঙ্গে দুধ ঢালতে?"

"কী সব যা তা বলছেন স্যার। জীবন্ত শিবলিঙ্গে দুধ ঢালতে যাব কেন?"

"কেন নয়? পাথরের মধ্যে কী দেব বন্দনা সম্পূর্ণ হয়? মানুষই তো ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। সব আরাধনার শেষ আরাধনা এই মানুষ।সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই। বিশ্বনাথ মন্দিরে তোমার আজকের শিবের পূজা এখন সম্পূর্ণ করবে না?" বলতে বলতে চেয়ার থেকে উঠে এসে, খাটে বসা নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেল।

"কী করছেন স্যার!" নন্দিনী নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য বিছানায় রোল করে অন্য প্রান্তে যাওয়ার চেষ্টা করল। তখনই ঋতব্রত স্যার নন্দিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পরল। দুহাত দিয়ে চেপে ধরেছে নন্দিনীকে। সারা দেহ নন্দিনীর দেহের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে। নন্দিনী সমস্ত শক্তি দিয়েও তাকে সরাতে পারছে না।

আর তো দেরি করা যায় না। ঋতব্রতর হাত দুটো নন্দিনীর দেহে খেলে বেড়াচ্ছে। নন্দিনীর হঠাৎ গা টা রি রি করে গুলিয়ে উঠল। ঋতব্রতর ঘন ঘন শ্বাসে বমি পাচ্ছে। মানুষের পশুটাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাটা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে। দেহের সব শক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। শিথিল হয়ে যাচ্ছে দেহখানা। ঋতব্রতর নেশা মাথা থেকে নীচের দিকে ঘনীভূত হয়ে পতাকার উত্তরণ ঘটাচ্ছে দৃপ্ত বলিষ্ঠ মুক্ত স্বাধীনতায়। যেন মন্দিরের চূড়া তার নিম্নভাগে সদর্পে ইহলোকের জীবন্ত পূজা চাইছে। অনুরোধ নয় - চিরায়িত ধর্মের মতো দৃপ্ত অহংকারে। ঠিক যুগ-যুগান্তরের রক্ষকের আছিলায় ভক্ষকের বেশে।

আর সবুর করা নয়।

দেহের মধ্যে উচ্ছ্বাসের কম্পন, লালসার জাগরণ - টিচার্স হুইস্কি মাথায় এক ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে সুনামি ছড়াচ্ছে। সেই উড়িয়ে দেওয়া ঝড়ের উদ্দাম স্রোতে হারিয়ে যেতে যেতে নন্দিনী হঠাৎ অনুভব করল, হাল-দাঁড়-হীন ভেসে যাওয়া নৌকোর মতো, তারও আর কোনো ক্ষমতা নেই। সে এক ঘূর্ণিঝড়ের আবর্তে দিশাহারা। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল তার হারিয়ে যাওয়া ক্ষমতাকে ফিরিয়ে আনার। শেষ বারের মতো।

আরেকবার আজকের দিনে। শুধু এই মুহূর্তটুকু...

খাজুরাহর মন্দিরের ভাস্কর্যের তৃপ্তি, তার নিজের প্রতিটা কোষে নতুন চিহ্ন এঁকে দিতে চাইছে, বর্তমানের ঔদ্ধত্যে। যদি ঋতব্রত পূজারি হয়, নন্দিনী তবে দেবদাসী। মুক্তি চাই! মুক্তি চাই! নিজের শিবকে ভাসিয়ে দিতে চাইছে নন্দিনীর দুধ সাগরে। নন্দিনী হারিয়ে যাচ্ছে... অতল সমুদ্রের গভীরে... শিথিল যন্ত্রণার সীমাহীন গহ্বরে... সব বাধা ভেঙে ঋতব্রতর পৌরুষ যেন সেই আকাঙ্ক্ষিত গহ্বরে মহা সমারোহে শিবরাত্রি উদযাপন করতে চাইছে গুরু বন্দনার সপ্তম নিখাদে।

প্রবল ঝড়ের মধ্যে বিশাল নদীতে ছোট্ট নৌকা যেমন দিশেহারা, ওলটপালট হয়ে যায়, ঋতব্রতর বলিষ্ঠ দাপটে, নন্দিনীর পালছেঁড়া নৌকো তেমনি দিশাহারা। ঋতব্রত নন্দিনীকে আঁকড়ে ধরে উচ্ছ্বাসের অন্য মার্গে ভেসে যেতে চাইছে। শুধু প্রবেশ দ্বারের ছিটকিনি খোলাটাই বাকি!সে আর নন্দিনীকে দেখতে পারছে না। তার কাছে নন্দিনীর সুতিহীন দেহটাই যেন সূর্য মন্দিরের আরাধনার বন্দনা গান। জীবন্ত খাজুরাহ।

বৃথাই...

তার কানের কাছে হিসহিসিয়ে বয়ে চলেছে ঋতব্রতর দ্রুত শ্বাসের বিষধর কেউটের ফণা। কিছুই করার নেই। এলোমেলো ঝড়ে তার দেহের নৌকা টালমাটাল। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও সে আর দাঁড় বাওয়ার শক্তি খুঁজে পেল না। নিথর দাঁড়হীন নৌকাটাকে সঁপে দিল ঋতব্রতর লোলুপ দেহের কাছে।ঋতব্রতর দুরন্ত শরীরী বানের কাছে সে খড়কুটোর মতো ভেসে গেল ঘূর্ণিস্রোতে। নিজের করে নিতে না পেরে, সঁপে দিল নিজেকে সেই সর্বক্ষম আসুরিক শক্তির অবাঞ্ছিত মিলনযজ্ঞে।

ভোরের আকাশটা আর ভৈরবী গাইছে না। কনসোলেশন প্রাইজটাও যেন নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপ করছে। খাজুরাহ ফেস্টিভ্যালটা ম্লান হয়ে গেছে, দুরন্ত ঝড়ের অশান্ত দাপটে। কলা-সঙ্গম মিশে তছনছ হয়ে গেছে, দেবী বন্দনার শপথ থেকে নারীত্বের অবলুণ্ঠনে। সুপ্ত প্রতিভাকে, কে যেন পদলুণ্ঠিত করে সদর্পে এগিয়ে চলেছে কালহীন সময়ের খরস্রোতে। গীতাদির কাছে জিতেও, সে হেরে গেছে জীবন জোয়ারের চোরাবালিতে।

অসহায় নারীত্ব যেন প্রার্থনা জানাচ্ছে আগামী দিনের সূর্যের কাছে ‘দোহাই তোমার... আর কেউ যেন খাজুরাহর মতো আরেকটা ভাস্কর্য না করে!’

সপ্তম নন্দিনী

টনি নন্দিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল "ওয়েলকাম টু চেক ল্যপ কোক এয়ারপোর্ট"

নন্দিনী হেসে বলল "তোমার গলাটা ফ্লাইটের এয়ার হস্টেস-এর মতো শোনাচ্ছে"

টনি তার সাবেকি হাসি ছড়িয়ে বলল "হয়ত তোমার ফ্লাইটের সুন্দরী এয়ার হস্টেস নই, কিন্তু তবু হোস্ট তো! তোমাকে সারম্বরে এই গরিবের অতিথিশালায় বরণ করার জন্য। এটা আমার ডিউটি" একটু থেমে বলল "নট এ ফরম্যলিটি"

"একটুও পালটাওনি" নন্দিনী সানগ্লাসটা খুলে মুচকি হেসে টনির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল।

পরিচয়টা কী আজকের? সেই কত বছর আগের!

টনি কিন্তু একটুও পালটায়নি। শুধু চুলের রংটা সময়ের সঙ্গে কালো থেকে সাদায় পরিবর্তিত হওয়া ছাড়া। তার পঞ্চাশোর্ধ্ব চেহারার মধ্যস্থলে একটু মেধ জমেছে বটে, তবে পরিচ্ছন্ন ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটা একটা বয়সোচিত মাধুর্য এনে দিয়েছে। তার আবাহনী হাসি এই বয়েসেও বহু নারীর হৃদয়ে সুনামি তুলতে পারে, সেটা নন্দিনীর থেকে আর কে ভাল জানে? টনির নাভির মেদ সম্ভোগের সময় হয়ত কিঞ্চিত বিড়ম্বনা করলেও, সে ব্যাপারে নন্দিনীর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বরং সেটা তার কার্ডিয়াক ফাংশনের কতখানি পরিপন্থী হবে, সেটা নিয়েই চিন্তা বেশি।

সাদা স্যুট লাল টাই পরা টনি, তার লিমুজিনের পেছনের দরজাটা খুলে "আপনার সেবায় জাঁহাপনা..."

লাল টপস-এর ওপর সাদা স্ল্যাক্স আর সাদা জ্যাকেট মোড়া নন্দিনী সম্রাজ্ঞীর মতো পেছনের সিটে দেহটা এলিয়ে দিল। টনি লিমুজিনের দরজাটা বন্ধ করে উলটো দিকের সিটে বসে বলল "নিশ্চয়ই নতুন করে আর তোমাকে হংকং-এ অভ্যর্থনা করতে হবে না। বিশেষ করে যে নন্দিনীকে আমি কোলে করে ঢাকুরিয়া লেকে সন্ধেবেলা বেড়াতে নিয়ে যেতাম। সে তো এখন নিজেই নিজের স্বপ্নের বিক্রেতা!"

"এখনও ভোলনি?"

"আমি অতীতকে ভুলি না। তোমাকে ভুলব কী করে?"

সত্যি! অতীতকে কি ভোলা যায়?

নন্দিনী যখন কোলে, টনির বয়স তখন পঁচিশ। নন্দিনীর বাড়িতে কিছুতেই মন টিকত না। বিকেল হতেই কেঁদে কেঁদে কাকুলিয়া রোডের বাড়ি মাথায় তুলত। বাবা তো কাজের জন্য সব সময়ই বাইরে। মা-ই বাড়ির

সর্বময় কর্ত্রী। কোথায় ঘর সামলাবে, না নন্দিনীর আবদার রাখবে? অগতির গতি পাশের সাউথ সিটি কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র, পাড়ার টনি, নন্দিনীর আবদার পূর্ণ করার জন্য হাজির। গোলপার্ক থেকে রবীন্দ্র সরবার।

সেই খুদে বয়সের সাথী।

সে তো বহু বছর আগের কথা। এর মধ্যে অনেক বছর পার হয়ে গেছে। টনি এখন আর পাড়ার অল টাইম সোশাল ওয়ার্কার নয়, যার হাতে অফুরন্ত সময় পাড়ায় জনসেবা করে বেড়ানোর। টনি এখন আর যে সে লোক নয়! এখন সে হংকং-এর একগুচ্ছ নাইট ক্লাবের একছত্র অধিপতি। নন্দিনী এখন আর সেই কাকুলিয়া রোডের ছোট্ট খুকিটি নেই। সে এখন খবরের নাট্যকার।

যেখানেই থাকুক না কেন, নন্দিনীর মনে হয়, কলকাতাই তার প্রিয়। সেই আবেগ, সেই ঘনিষ্ঠতা, সেই সংবেদনশীলতা সে তো আর কোথাও পায়নি। অনেক দেশে বিচরণের মধ্যে এই সাবেকি শহরের হাতছানি সে উপেক্ষা করতে পারে না। তার মনে হয় বিদেশে থাকলেও, ওই পুরনো পলিউটেড সিটির মধ্যেই সে যেন নিজেকে খুঁজে পায়। পৃথিবীর এই একমাত্র জায়গা, যেখানে প্রতিটা মুহূর্ত মেপে পা ফেলতে হয় না।

নন্দিনী লিমুজিনের টিন্টেড গ্লাসের ভেতর থেকে বাইরে তাকাল। তারপর টনির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল "আমিও ভুলিনি। তোমার এই হংকং-এ অ্যাচিভমেন্টটা কেমন লাগে জানি না। তোমার সেই ছোটবেলার ওয়ার্মথটা আজও আমি অনুভব করি টনিদা। জানি না কেন, অনেক জায়গা তো দেখলাম – কোথাও কিন্তু সেই উষ্ণতা নেই। এভরিথিং ইজ সো ব্লাডি মেকানিক্যাল"

"শুনতেও ভালো লাগে" টনি স্যুটটা ঠিক করতে করতে নন্দিনীর দিকে কথাটা ছুড়ে দিল। লিমুজিনের পেছনের সিট আর ড্রাইভারের মাঝের কাচটা টেনে বলল "আমার ডেরায় ডেকে আনলাম আমার নতুন দুনিয়াটাকে দেখাতে। আজকে তোমার হনারে একটা পার্টি ডেকেছি। দেয়ার উইল বি লট অফ এমিনেন্ট পিপল ফ্রম অল ওভার হংকং। জাস্ট টু কমেমরেট আওয়ার গুড ওল্ড ডেইজ..."

নন্দিনী নিঃশব্দে বাইরে তাকিয়ে রইল। সেই ছেলেবেলার টনিদার উষ্ণতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। জীবনের অনেক চোরাবালি পেরিয়ে টনিদার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল। জীবনের উত্তাল ঝঞ্ঝায়, আবেগের প্রকাশটা এখন অনেক সংযত। এখন আর কথার আবেগে অনুভূতি ভাসে না। তার শব্দহীন নিস্তব্ধতা যেন নিঃশব্দে অনেক কিছু বলে যাচ্ছে ভাষাহীন মৌনতায়। যা হয়ত শব্দ দিয়ে ব্যঞ্জনা করতে গেলে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়বে।

সকালের সূর্য তখন মধ্যগগনে তার উষ্ণ রং-এর সংমিশ্রণ এঁকে দিচ্ছে। সেই রং-এর প্রতিটা যেন তার অন্তরের গভীরের উষ্ণতার ক্যানভাসে অস্পষ্ট একটা ছবি। তার শ্যামলা অবয়বটা যেন রামধনুর সপ্ত রং-এর মাধুর্য আত্মসাৎ করে, তার আত্মার এক নতুন বিকিরণ ঘটাতে চাইছে। শুধু নিজের প্রতি নয়, চেতনার নতুন

আলোকে। পৃথিবীর রং সময়ের ব্যাপ্তিতে প্রতি মুহূর্তে পালটে যাচ্ছে। তার শ্যামলা মাধুর্য যেন সেই অবক্ষয়ই কয়েক শতকের অ্যাংলো-স্যাক্সন সাম্রাজ্যের ঔদ্ধত্যের মধ্যে, একটা রং-শূন্য নতুন উষ্ণতা ছড়াতে চাইছে নতুন চেতনার রঙে।

টনির প্লাঙ্কেত রোড ভিলার বিশাল প্রাসাদে লিমুজিনটা ঢোকার আগে নন্দিনী তার চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ থেকে লিপস্টিকটা বার করে, গাড়ির আয়নায় দেখে আলতো করে ঠোঁটে বুলিয়ে নিল।

ওপাশের দরজাটা খোলার আতিথেয়তায় টনি গাড়ি থেকে নেমে নন্দিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল "মার্জনা করে এই গড়িবের কুঁড়েঘরে যদি আসেন জাহাপনাহ..."

কোনো জবাব না দিয়ে, মুচকি হেসে গাড়ি থেকে নামল। নন্দিনী কিন্তু টনির বেশভূষা বা তার বিশাল প্রাসাদ সম ক্যাসেলের দিকে দেখছিল না। সে ফিরে যাচ্ছিল তার বালিগঞ্জের অতীতে।

এন্থনি মিত্র বরাবরই বলত 'ইচ্ছে থাকলে পৃথিবী জয় করা যায়।' সে পৃথিবীটা যে কত বৃহৎ হতে পারে, তা নন্দিনীর চিন্তারও অতীত। অন্তত এত বছরে সে একটা জিনিসই শিখেছে। ভেতরে একটা তীব্র জেদ থাকলে বিশল্যকরণীকেও ঘাড়ে তুলে নেওয়া যায়। টনি হয়ত অন্তরের সেই অনুচ্চারিত সঙ্কল্পের বহিঃপ্রকাশ। সেও তো তার মতো একটা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চাইছে।

বছর কুড়ি বয়সের এক স্বাস্থ্যবতী যুবতী নন্দিনীর দিকে এগিয়ে এলো। টনি পরিচয় করিয়ে দিল "সিসিলি প্যং। এখন থেকে তোমার দেখভাল করবে। ঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে রিল্যাক্স কর। আধঘণ্টা পরে আমরা টেরেসে লাঞ্চ খাব"

সিসিলির দিকে তাকিয়ে বলল "শি ইজ মাই হনারড গেস্ট। আই অ্যাম শিওর ইউ উইল মেক হার স্টে ইন হংকং অ্যাস কমফোর্টেবল অ্যাস পসিবল"

ভিলার অন্দরে যেতে যেতে গাঢ় নীল টেলারড সুট পরা সিসিলি নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল "আই হোপ ইওর জার্নি ওয়াজ কমফোর্টেবল"

"পুরনো দিনের স্মৃতিতে কী এই পার্টির আয়োজন, না অন্য কিছু?" ভিলার টেরেসে নন্দিনী মিডিয়াম কুকড স্টেকটা কাটতে কাটতে প্রশ্ন করল।

নন্দিনী এখন তার ফর্মাল পোশাক ছেড়ে ফেলেছে। এমব্রয়ডারি করা বুটিকের নীল সালওয়ার কামিজ পরা ক্যাসুয়াল ড্রেসের ক্রিস্টালগুলো মধ্যদিনের সূর্যের প্রখর আলোকে জ্বলজ্বল করছে। টনি ভাবছিল এমব্রয়ডারিটা সত্যি সত্যি হিরের নয় তো?

টনির দ্বন্দ্ব বুঝতে পেরে নন্দিনী বলল "অমন করে কী দেখছ? আমার ডিজাইনার ড্রেস? ওগুলো হিরে নয়, স্বরোভস্কি ক্রিস্টাল"

এন্থনি মিত্র কিন্তু নন্দিনীর চেয়েও ক্যাসুয়াল জামা পরেছিল। সেই কোহিনুরের পাজামা-পাঞ্জাবি। নিশ্চয়ই ঢাকুরিয়া ব্রিজের তলার দোকানটা থেকে বানানো। স্যুটের চেয়ে এই বাঙালি পোশাক যেন তাকে আরও হ্যান্ডসম করে তুলেছে। নন্দিনীর সঙ্গে সেও নিশ্চয়ই ফিরে যেতে চাইছে তার অতীতের ফেলে আসা বালিগঞ্জের ছোটবেলার স্মৃতিতে। নন্দিনীর মনে হল এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মধ্যে টনি কিন্তু এখনও সেই সাবেকি বাঙালিটাই রয়ে গেছে। না হলেও, অন্তত এই মুহূর্তে নন্দিনীকে সেই পরিচয়টাই দিতে চাইছে।

টনি স্টেকে কামড় দিতে দিতে নন্দিনীর দিকে মুচকি হেসে বলল “আমাকে এতদিনে চেননি? অফ কোর্স দ্য পার্টি ইস এ সেলিব্রেশন ফর ইওর ভিজিট টু হংকং অ্যান্ড ইফ ইট হেল্পস ইন ইওর ড্রিমস কাম ট্রু”

“ড্রিমটাই তো হারিয়ে ফেলেছি টনিদা”

টনির প্রতিটা শব্দের মধ্যে একটা আন্তরিকতার ছোঁয়া লক্ষ করছিল নন্দিনী। টনির কী তার প্রতি কখনও আসক্তি ছিল? টনি যখন দেশ ছাড়ে, নন্দিনীর বয়স খুবই কম। টনি যে প্রায় কুড়ি বছরের বেশি বড়। তার প্রতি, নন্দিনীর অন্য কোনো অনুভব জন্মানোর বয়সই হয়নি। তরুণ যুবকদের দিকে দৃষ্টি যাওয়াটাই স্বাভাবিক। হয়েছিলও তাই। টনিকে অনেকটা অভিভাবকের মতোই দেখত।

কয়েকদিন পরে কাকুলিয়া রোডের সেই তরুণ টনি কর্পূরের মতো মিশে গেল। হারিয়ে গেল তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে স্মৃতির এক কোণে। হঠাৎই ভাগ্যক্রমে আবার দেখা হয়ে গেল।

একবার হংকং-এ চ্যানেলের একটা স্টোরি করতে এসে সারাদিনের খাটুনির পরে সে যখন সামিমুলকে নিয়ে ডিসকোতে রিল্যাক্স করছিল, হঠাৎ ওয়েটার এসে বলল “আওয়ার ওনার ওয়ান্টস টু মিট ইউ”

“আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড” নন্দিনী প্রতিবাদ করেছিল।

এই এক রাতের ইঙ্গিত তার কাছে নতুন নয়। রংটা নয় শ্যামলা – তাতে কী? ক’জনই বা তার মানুষটাকে নিয়ে মাথা ঘামায়। তার দৈহিক মাধুর্যই যেন তার মানসিক গর্ভের থেকে বেশি আকর্ষণীয়। না হওয়ারও কোনো কারণ নেই। তার ঢেউ খেলানো দৈহিক প্রাচুর্য আর মনমোহিনী হাসি যে কোনো পুরুষকে ধরাশায়ী করে দিতে পারে। অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই, তার সুঠাম বলিষ্ঠ দেহের উজ্জ্বল শ্যামলা দমকা হাওয়া বাড়িয়ে দিতে পারে যে কোনো পুরুষের উষ্ণতার পারদকে। যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে, নির্জনতা শান্তি ও সম্পূর্ণতার একটা ঘূর্ণি ঝড়ের দমকা স্তব্ধতা। তার সাড়ে পাঁচ ফিট দেহের উপস্থিতি যেন সেই জৈবিক পূর্ণতা থেকে অলৌকিক সমর্পণের একটা বাণী উচ্চারণ করছে। ঠিক যেমন প্রতিটা মানুষ তাদের বাহ্যিক পৌরুষকে অবদমিত করে নিজদের নিভৃতে সমর্পণ করতে চায়। নন্দিনী যেন তাদের দুঃখের আলো-অন্ধকার মেশানো নীরব নিভৃত একাকীর, এক না-আঁকা ক্যানভাস, পাওয়া না-পাওয়ার এক স্তব্ধ গোধূলি।

ওয়েটার চলে গিয়েও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসেছিল। হাতে একটা ছোট স্লিপ। ডিসকোর মালিকের হাতে স্পষ্ট বাংলায় লেখা "তুমি নন্দিনী না? আমায় ভুলে গেছ? তোমার টনিদাকে?"

তখনই স্বচ্ছ হয়েছিল যে, ডিসকোর মালিক তাকে এক রাতের মেহমান হওয়ার জন্য ডাকেনি। সে এমনই একজন, যার সঙ্গে তার শৈশব জড়িয়ে রয়েছে।

এন্থনি মিত্রর ঘরে ঢুকতেই, সে যেন তার শৈশব থেকে বিচ্ছিন্ন আরেক টনিদাকে দেখল। সারা ঘরটাই মেহগনি টিকের দেওয়ালে মোড়া। তার এক প্রান্তে একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি টেবিলের ও-প্রান্তে কালো স্যুট আর লাল টাই পরা ডিসকোর মালিক, একটা রিক্লাইনিং চেয়ারে বসে আছে। নন্দিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে উলটো দিকের চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করল।

নন্দিনী বসতেই হেসে বলল "নন্দিনী না? কত বড় হয়ে গেছ!"

"টনিদা! ভাবতেই পারছি না তুমি!"

"আমি ছাড়া আর কে হবে? ভিড়ের মধ্যে তোমাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি" একটু থেমে বলল "তোমাকে কি ভুলতে পারি!"

"কিন্তু এই ডিসকোতে তুমি আমায় দেখলে কী করে?"

এন্থনি মিত্র একটা বোতাম টিপল। কাঠের প্যানেলের একাংশ পর্দার মতো সরে গেল। ওপাশে এক বিশাল এল সি ডি টিভি। স্ক্রিনের এক-একটা অংশে ডিসকোর এবং নাইট ক্লাবের এক একটি অংশের ছবি। যেন ক্যানভাসের মধ্যে বিভিন্ন ছবির কোলাজ। কাঠের প্যানেল দিয়ে ঢাকা ছিল বলে আগে দেখতে পায়নি।

"আমি তো এই ডিসকোর মালিক। কীভাবে চলছে সে খেয়াল রাখতে হয় বৈকি" একটু থেমে পাইপটায় আগুন জ্বেলে বলল "যাক সে কথা। কতদিন পর! ভাবা যায় এখানে এভাবে!"

"হ্যাঁ। অনেকদিন পর"

"অনেক সময় লাগবে টু ক্যাচ আপ" পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে মুচকি হেসে বলল "হ্যভ আই লেফট ইওর ফ্রেন্ড অ্যাট লারজ এমিডস্ট এ ম্যাড ক্রাউড ইন ডিসকো?"

"হি ইজ নো ফ্রেন্ড অফ মাইন। উই হ্যভ কাম অন অ্যান অফিসিয়াল ওয়ার্ক ফর এ চ্যনেল আই ওয়ার্ক। কুড ইউ গিভ মি এ মোমেন্ট সো দ্যট আই ক্যান সে গুড বাই টু হিম বিফোর আই জয়েন ইউ?"

"শিওর"এন্থনি মিত্র মুচকি হেসে বলল "আই বেট হি ওন্ট বি প্লিজড..."

"হু কেয়ারস? উই হ্যভ ফিনিসড আওয়ার ওয়ার্ক ফর টুডে। নাউ ইটস মাই ফ্রি টাইম" নন্দিনী সামিমুলকে বিদায় জানাল।

এন্থনি মিত্র পরখ করার চেষ্টা করছিল, এত বছরে নন্দিনীর কতটা পরিবর্তন হয়েছে। দেশ ছাড়ার আগে স্কারট ব্লাউজ বা সালওয়ার – অতীতের স্মৃতিগুলো মনের ক্যানভাসে নানা রং-এর ক্যালিওডস্কপিক জলছবি এঁকে যাচ্ছিল। বহু বছরের হারিয়ে যাওয়া নন্দিনীকে সে আবার নতুন রূপে দেখছিল। নন্দিনীর বার স্টুলে বসে ড্রিঙ্ক করা, একদিকে স্প্লিট করা, হাঁটু পর্যন্ত কালো গড়ানো, ডিজাইনার ড্রেসে ঢাকা অবয়বটা যেন তার বর্তমান মড জীবনযাত্রার স্বাক্ষর বহন করছে।

সত্যিই নন্দিনী কত পালটে গেছে। কিন্তু কতটা? কোন পথে?

কিছুক্ষণ পর নন্দিনী যখন ফিরে এল, ওর দিকে স্মিত হাসি হেসে বলল "কলিগকে না হয় পরিত্যাগ করলে, ড্রিঙ্কটাকে পরিত্যাগ করতে হবে এমন কেউ বলেনি"

ইন্টারকমের বোতাম টিপে হুকুম করেছিল "কুড ইউ প্লিজ সেন্ড দ্য ড্রিঙ্ক অফ দিস লেডি টু মাই রুম অ্যালং উইথ এ বটল অফ ডম পেরিগনন ফ্রম মাই সাইড" চোখ টিপে নন্দিনীকে সোফায় বসার ইঙ্গিত করে বলেছিল "নিশ্চয়ই ও খুব মর্মাহত"

নন্দিনী সোফায় এলিয়ে ডিজাইনার ড্রেসেটা ঠিক করতে করতে বলেছিল "কী আর করা যাবে? এতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা। প্রফেশনের বাইরে কলিগের সঙ্গে সময় কাটানোর কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। নেহাৎ কিছু করার ছিল না। তাই..."

উলটো দিকের সোফায় বসে টনি মিত্র বলেছিল "হ্যাঁ। অনেক বছরের অনেক কথা পড়ে আছে"

"সত্যি। কত বছর পার হয়ে গেল, তাই না? তুমি কিন্তু বুড়িয়ে গেছ। তোমার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু আগের মতোই হ্যান্ডসম"একটু থেমে আন্তরিক ভাবে বলেছিল "কেমন আছ টনিদা?"

নন্দিনীর কথা উপেক্ষা করে টনি বলেছিল "খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। বলো, কী খাবে?"

"যা কিছু..." একটু থেমে বলেছিল "তোমাদের হংকং-এর স্পেশাল কিছু একটা"

"স্নেক সুপ এখানকার ডেলিকেসি"

"ওয়্যাক" নন্দিনী আঁতকে উঠল "তুমি কি চাও সারা সন্ধে আমি এখানে বসে বমি করি?"

"তাই হংকং-এর অথেনটিক ডেলিকেসির দিকে না ঘেঁষাই ভাল। বারবিকিউ পর্ক বরং বেটার হবে। আরেকটা ড্রিঙ্ক-এর অর্ডার দেব?"

"মন্দ হয় না"

অর্ধ সমাপ্ত ড্রিঙ্কটায় এক চুমুক দিয়ে নন্দিনী তার চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ হাতড়াতে হাতড়াতে বলেছিল "স্মোক করলে মাইন্ড করবে না তো?"

"একদম না। প্লিজ মেক ইয়োরসেলফ অ্যাট হোম"

"তুমি কি এই ডিসকোর মালিক?"

"আনফরচুনেটলি" সম্মতি দিয়ে টনিদা বলেছিল "অনেক ক'টার মধ্যে এই একটা। এটাই চেইনের সব থেকে বড়"আবার পাইপে টান দিয়ে বলেছিল "উড ইট বি ইমপ্রুডেন্ট ইন ইনভেডিং অন ইওর প্রাইভেসি ইফ আই আস্কড ইউ, হোয়াট স্টোরি ইউ আর আফটার ফ্রম দিস পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড?"

"ওয়ান অফ দ্য রুটিন মিডিয়া কভারেজ" সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ড্রিঙ্ক-এ চুমুক দিয়ে আসল কথাটা এড়িয়ে গেল নন্দিনী।

"তোমার স্বামী সংসার?"

"বিয়েই করিনি... তুমি?"

"আমি বিয়ে করেছিলাম বটে, কিন্তু হোয়াট ম্যন প্রপোসেস গড ডিসপোসেস। যখন আমি ওয়াশিংটন থেকে রিচমন্ডে ড্রাইভ করছিলাম, একটা মর্মান্তিক কার অ্যাক্সিডেন্টে ন্যন্সি মারা যায়। বরাতজোরে আমি বেঁচে যাই। আমার দুটি ফুটফুটে মেয়ে আছে। দুজনেই এখন স্টেটস-এ থাকে"

"মানে তুমি একা। একদম একা?"

টনি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তখনই ওয়েটার বারবিকিউড পর্ক নিয়ে ঢুকল "ট্রাই দিস। ইট ইজ টিপিক্যলি কুকড ইন ক্যন্টনিস ডিম সাম স্টাইল। ইট ইজ সেমি ফ্যাট পর্ক"

নন্দিনী পর্কে কামড় দিয়ে বলল "বেশ ভাল খেতে তো। এর আগে কখনও খাইনি"

টনি হেসে বলল "সেই নন্দিনী, যে আমাকে মৌচাক থেকে মিষ্টি কিনে আনার জন্য পাগল করে দিত। এখনো মিষ্টি ভালো লাগে?"

"ভুঁড়ি বাড়ার ভয়ে এখন টেইস্টটা একটু পালটে নিয়েছি। সুইট টু সল্টি। ইটস অল টু ডু উইথ ক্যলরিস"

টনি নন্দিনীর কথার গভীর অর্থ খোঁজার চেষ্টা করছিল। কিছু কি বোঝাতে চাইছে নন্দিনী? না কি, কথার পৃষ্ঠে কথা? সময় লাগবে নন্দিনীকে চিনতে। সারা রাত পড়ে আছে অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে যতক্ষণ না ভোরের ঊষা তাদের ফিরিয়ে আনে বর্তমানে।

নন্দিনী পর্কে আরেকটা কামড় বসিয়ে বলেছিল "এক সময় তোমার এই নাইট ক্লাবও বন্ধ হবে। কিন্তু আমাদের এত বছরের কথা শেষ হতে রাত পার হয়ে যাবে"

টনি মধ্য গগনের সূর্যের দিকে তাকিয়ে স্টেকে কামড় দিয়ে বলল "তোমার মনে আছে নাইট ক্লাবে এত বছর পরে দেখার কথা? আগেরবারের মতো এবার কিন্তু পর্ক নয়, স্টেক। টুডে ইভনিং ইজ টু এ সেলিব্রেশন অফ আওয়ার গুড ওল্ড মেমরিস"

"ইফ ওনলি আই নিউ দ্য এভিনিউস অফ সেলিব্রেশন" নন্দিনী স্টেকে কামড় দিয়ে এড়াতে চাইলেও, অন্তর্নিহিত দীর্ঘশ্বাসটা চোখ এড়ায়নি টনির।

"একটু তফাত। ইট ওয়াজ অল সল্টি হোয়েন দ্য ফার্স্ট টাইম উই মেট। নাউ ইট উইল বি সুগার কোটেড সল্ট"

নন্দিনীর বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না, টনিদা একটা টক-ঝাল-মিষ্টি সংমিশ্রণে পুরনো সুরকে নতুন রূপে ফেরাতে চাইছে।

জীবনটা কীভাবে পালটায়!

ক্যানভাসে ছবি আঁকা হয়, মোছা হয়, আবার আঁকা, আবার মোছা। এই রং-তুলির খেলার মধ্যেই জীবন এগিয়ে যায়। ফিরে দেখা হয় না, এতগুলো আঁকা মোছা ছবির মধ্যে কোনো ছবিটা ক্যানভাসে এখনও আছে।

নন্দিনীর থেকে সে কথা আর কে ভালো জানে?

"কী ভাবছ নন্দিনী ?"

টনিদার কথায় তাকাল নন্দিনী। টনিদার চোখ কি কিছু বলতে চাইছে?

নন্দিনী মোনালিসার মতো এক ঝলক হাসল। তারপর টনিদার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, কাটা কাটা গলায় মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলঃ

জীবনের ঝরে পড়া ধানগুলো

খুঁটে খুঁটে খেয়ে চলে স্মৃতির পাখিরা

ওগো ব্যাধ তুলো না গাণ্ডীব

তার চেয়ে হও তুমি নীল বাতিঘর

দেখাও দিশার আলো নিশার আঁধারে ...[3]

---

3 কবিতাটি আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা

ক্যানভাসে তুলি নিয়ে...

দেখা, না-দেখা নন্দিনী

ক্যানভাসটা এখনও শূন্য। কিছুই আঁকা হয়নি। কোনো ছবিই নয়। পাশে পড়ে আছে সাতটা বাটিতে সাতটা রং। যে কোনো রং দিয়ে ছবি আঁকা যেতে পারে। পূর্ণ ছবি। কিংবা আরও সাতটি বাটিতে নতুন রং তৈরি করা যেতে পারে। সেই রং-এর কোনো একটি বা একাধিক রং দিয়েও ছবি আঁকা যেতে পারে। সুন্দর ছবি। কল্পনার ছবি। বাস্তবের আঁধারে ফুটিয়ে তোলা একগুচ্ছ গল্পের মালা। ছবি দিয়ে রঙে আঁকা স্বপ্নের ডালা। হাওয়া থেকে কুড়িয়ে আনা শিশিরের ফোঁটার মালা। ক্যানভাসে জুড়ে দিতে পারে সূক্ষ্মতার মোহময় স্নিগ্ধ আমেজ।

বাঃ!

কেউ বলবে ‘অসাধারণ লেখা’। কেউ বা বলবে ‘হল না তো। গতের বাইরে বেরিয়ে এটা কী উপন্যাস হল?’ কেউ বা প্রশ্ন করবে ‘এ কোনো মহিলার ছবি? টুকরো টুকরো ফুল দিয়ে কী গাঁথা হয় পূর্ণতার প্রতিমূর্তি?’ পূর্ণতা তো সম্পূর্ণ এক গোলক। সেই গোলকের বৃত্তে কতগুলো রং-এর মধ্যেই কি তার বিকাশ? কেনই বা করতে হবে আধ-খেঁচড়া প্রকাশ? কেনই বা দিতে হবে তাকে নতুন সংজ্ঞা? যেখানে হয়ত নামটা হবে আজকের দিনের ভিন্সির ‘অনন্যা?’

নন্দিনী বলবে “এ তো আমার ছবি নয়। তোমার শূন্য ক্যানভাস পাশে নিয়ে কিছু রং-এর ডালি”

আমি বলব “এই শূন্যতার মধ্যেই তো জ্বলছে পূর্ণতার আসল রবি”

“আমি তো কিছুই দেখতে পারছি না”

“দেখার জন্যে যে চোখ চাই”

“আমি কী তবে অন্ধ?”

“মোটেই নয়। বাইরের ছবি সে তো সবাই দেখতে পারে। ভেতরে খুঁজে দেখ যদি একবার। তোমাকে খুঁজে পাবে নতুন রং-এর নতুন সম্ভারে প্রতিনিয়ত বারবার, যেখানে সব রং মিশে ধূসরে অনিবার”

“কোথায় খুঁজব আমি আমাকে?”

“যেখানে কেউ পৌঁছতে পারেনি, নিজের না-দেখা অন্ধকারের নতুন আলোকে। অতি বেগুনি বা লাল উজানি রং-এর আলো-আঁধারের দেশে”

“ছবিটা কী ওখানেই আছে?”

"পরখ করে একবার দেখো নিজের মনের ক্যানভাসে"

"খুবই কঠিন বুঝলে হে দোসর"

"যদি কখনও পাও একটুকরো অবসর"

"আমি চেয়েছিলাম একটা সাদামাটা লেখা"

"কী করে লিখব? শুধুই তোমার ছবি দেখে, না পেয়ে তোমার দেখা"

"তোমার কল্পনা দিয়ে তাকে তুমি আঁকো"

"যা দেখা যায় সবার চোখে, সেটাই কী একমাত্র সাঁকো?"

"কী আছে তবে না-দেখা আলোকে?"

"পরখ করে দেখ নিজের চিত্তের পুলকে"

"তাতে কী ঘুচবে আমার বাসনার ডালা?"

"চেনা রং-এর পাঁচ মিশালিতে নয় খেললে না-চেনা হোলি খেলা"

"তোমার কাছে তো সেটুকুই চেয়েছি চেনা-জানা কল্পনার ছোঁয়ায়"

"দেখি কী আঁকতে পারি, তোমার সুপ্ত বাসনার প্রত্যক্ষ কায়ায়"

বুঝলাম ছবিটা হয়নি গতের স্রোতে।

ও শুনতে চায় একটা চেনা কাহিনি নতুন আঙ্গিকে। আজকের দিনে কী সব নাম আছে 'রিমিক্স' 'রিথিঙ্ক' 'রিমার্জড' 'রিভিসুয়ালাইজড' 'ইম্প্রভাইজড'– নিজেদের অক্ষমতা কে ঢাকতে গালভরা কত নাম! তাই যদি শুনতে চায় সাতটা উপাখ্যানের যে কোনো একটাকে নিয়েই তো নভেল লেখা যায়। সাত সাতটা নভেল। রাইটিং ইন্ডাস্ট্রিতে এক বছরে সাত সাতটা কাহিনি বেরোবে। বছরে সাত থেকে চৌদ্দ খানা নভেল। নামী-দামি লেখক হওয়ার একমাত্র মূলধন।

শুধু ক্যানভাসটা খালি পড়ে থাকবে।

পূর্ণ হবে না শূন্য পূরণ।

খালি ক্যানভাসের দিকে চেয়ে ভাবছিলাম, এই সাতটা গল্পের মধ্যে যে কোনো একটাই নন্দিনীর কাহিনি হতে পারে। আবার কোনোটাও নয়। আরও সাতটা লিখলে?

লেগে যেতেও পারে। আবার, নাও লাগতে পারে। নন্দিনীর মনঃপুত হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। এই খেলার পারমুটেশন-কম্বিনেশনে একটা দুটো হিটও করে যেতে পারে পাবলিসিটির ব্যান্ডওয়াগনে ঢুকতে পারলে।

কী আসে যায় তাতে? অপূর্ণ ছবিটা বুকে আঁকড়ে ব্ল্যাঙ্ক ক্যানভাসটা নিয়ে বসে থাকব অন্ধকারে...

ছবি আঁকা হল না।

হয়নি কী?

সাদা ক্যানভাস এখনও সাদাই রয়ে গেছে। হয়নি রঙিন তুলির স্পর্শে। ছবিটা আমি হারিয়ে ফেলেছি, আলোর মুখ দেখানো অন্ধকারে। ক্যানভাস যেখানে মেঘের বুকে হারায়, সেই না-দেখা অলিতে-গলিতে। ছবিটা আজও বিকোয়েনি কোটি টাকার বাজারে। ফুটে উঠছে নিজ সৌরভে, পাঁকের মধ্যে পদ্ম হয়ে। যেখানে মনের গভীরে নতুন ছবিটা আজও জ্বলজ্বল করছে অন্ধকারে মণিকাঞ্চন হয়ে। সেখানে ওই ছবিটা ওঙ্কার তোলে মহাপ্রলয়ের ঔরসে। নগ্নচেতা নন্দিনীকে দেখছি খোলসহীন বেশে। স্বপ্ন মধুর ত্রাসে, উল্লাসে, হরষে, বিমর্ষে। নিজেকে দেখা, না-চেনার পরশে।

না-চেনা নন্দিনী আবার নতুন ভাবে দেখা দিয়েছে নিজের সৌরভে। ছবিটা যেন স্বপ্ন মাখা, আমার কবিতায় আঁকা, বলিষ্ঠ সুদৃঢ় একটা জীবন্ত আত্মা। সেখানেই আছে আসল নন্দিনী, তার আত্মার জীবন্ত প্রকাশ। যা এখনও হয়নি চেনা হাজার লোকের ভিড়ে। সেই ছবিটা তোলা থাক না-চেনার অলিন্দে, না-দেখা অন্ধকারের শিখরে, আমার না-লেখা গল্পের অশ্রুত বিন্যাসে।

হয়ত ক্যানভাসটা ব্ল্যাঙ্ক নয়। নন্দিনীই হয়ত তাকে ধূসর দেখছে। কিংবা তোমরা। যারা এই উপাখ্যান এতক্ষণ ধরে পড়ছিলে, নন্দিনীর মতো তারাও বলবেন ‘এটা কী হল? গল্প তো হল না। ক্যানভাসের পাশে রং নিয়ে নাড়াচাড়া করে অর্থহীন সময় কেটে গেল’

বেশ। মানলাম কিছুই হয়নি। ক্যানভাসটা আজও শূন্য। আমার দেখা ছবিটা তোলা থাক শেষের জন্য। তখন নয় ক্যানভাসে আমার রং-এর তুলিতে ছবিটা আঁকব। আপাতত তোমাদের নন্দিনীর কাহিনিগুলো এক রং-এর মালায় গাঁথি একটি কাহিনি করে।

শুধু তোমাদের জন্য।

সব রং দিয়েই আঁকা যায় একটি ছবি...

কে এই নন্দিনী?

ফেসবুকের এক অজ্ঞাত নাম। হয়ত অজানা, কিন্তু অচেনা তো নয়। জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নিজ রূপে, নিজ মহিমায়, আমাদের চেতনার না-আঁকা ক্যানভাসে। জীবনের নীল আকাশে ভেসে বেড়ায়, মুক্ত বিহঙ্গের মতো, চেনা গণ্ডির পরিব্যাপ্তি থেকে না-চেনা দিগন্তপারের সীমাহীন আলোকে। যেখানে সদ্য প্রস্ফুটিত এক নতুন জীবন, হেঁটে চলে পঙ্কিল আঁশ গন্ধে ভরপুর, ক্লেদাক্ত বিষাক্ত স্বপ্ন রং ছড়ানো, মায়াবী নির্মম পৃথিবীর আভরণে ঢাকা, আবরণহীন উলঙ্গ সত্তা হয়ে, বিষধর সাপের লেলিহান ফণার মুখ থেকে নিজেকে বারবার বাঁচিয়ে, স্বপ্ন ভরা জীবনের হাতছানিতে।

কে এই নন্দিনী?

হয়ত এরা সবাই নন্দিনী। হয়ত এরা কেউই নয়। আবার হয়ত এদের জীবনের গতিপথই না-আকা ক্যানভাসে না-দেখা নন্দিনীদের আসল রূপ।

কেমন কাব্যিক হয়ে যাচ্ছে, তাই না?

বাস্তবের নন্দিনী তো কবিতা হতে পারে না। বাস্তবের নন্দিনী তো আমার কাহিনির এক না-চেনা স্বরূপ। দেশ থেকে দেশান্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন আকারে তার বিচরণ, যার প্রকাশ চলার চোরাবালিতে, তার লাস্যময়ী পদক্ষেপের না-চেনা রঙে।

তোমাদের নন্দিনী সমাজের নগ্ন স্বরূপ। জীবিকার তাগিদে যাকে ছুটতে হয় দেশ থেকে দেশান্তরে। কখনও আলো, কখনও গভীর অন্ধকারে। স্মৃতির আমিগডালা থেকে হারিয়ে যাওয়া একটা অধ্যায়। তোমাদের চেনা নন্দিনী কোনোদিন সেখান থেকে মুছে যায়। আরেক চেনা নন্দিনী জায়গা করে নেয়। জীবন এগিয়ে চলে, সেই অচেনা নন্দিনীকে উপেক্ষা করে, চেনা নন্দিনীর হাত ধরে, নিজের সংকীর্ণ পসরার হিসেব গুছিয়ে নিতে।

থাক। অনেক হয়েছে জীবনতত্ত্ব।

এবার তোমাকে শোনাব এই সব নন্দিনীর আসল সত্য।

ক্যানভাসে আঁকা নন্দিনীর ছবি

এক

গর্ভের ঔরস থেকে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর মাদল।

প্রেসিডেন্সি নার্সিংহোমের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ডাক্তার নার্সদের ছোটাছুটির জেরে নন্দিনীর বাবার ত্রাহি অবস্থা। অঘটনের আঁচ করতে পারছে, কিন্তু কারও যেন ব্যাখ্যা করার সময় নেই। মেকনিয়াম স্টেইনড লাইকার। ফিটাল ডিস্ট্রেস। সিজারিয়ানের তোড়জোড় নিয়ে নার্সিং হোমে ব্যস্ততা।

মরতে মরতেও শেষ পর্যন্ত সুরক্ষা হল। নন্দিনী ভূমিষ্ঠ হল। জ্যোতিষেরা পরে বলেছিল চন্দ্র-মঙ্গল বিভ্রাটে এ গোলযোগ। গোলযোগ যখন মিটেই গেছে, গ্রহ চক্রের বিচার করে কী হবে? তবুও হাজরা রোডের প্রেসিডেন্সি নার্সিংহোমের দেওয়া সময় মেনে একটা ঠিকুজি করা হয়েছিল।

সে ঠিকুজি আজ কোথায় নন্দিনী জানে না। জানতেও চায়নি। ঠিকুজিটা হয়ত ঠিক ছিল। গণনা আজ অবধি কেউ করে উঠতে পারেনি। কিংবা করলেও মেলাতে পারেনি।

নন্দিনীকে বুকে আগলে মা ফিরে এসেছিল কাকুলিয়া রোডের বাড়িতে। স্নিগ্ধ, শান্ত, নিবিড় ঘরের কোণে। গোলপার্কের হৈ-হট্টগোল থেকে কিঞ্চিত দূরে। আপন বলয়ের ঘেরাটোপে।

তখনও কি শিশুটি জানত সীতাকে বারবার অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে সারা জীবন ধরে?

সেই ছোট্ট শিশুটি জানত না পৃথিবীর আলোটা কতটা ভয়াবহ, নির্মম, নিষ্ঠুর এই জীবনের নামে। পূর্ণতা থেকে শূন্যতার স্ট্রবস্ফিয়ারে। জানতই না, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, মায়ের আঁচলের বাইরে প্রাক কর্মের মাশুল গুনতে হবে সারাজীবন ধরে। জীবনের নগ্ন রূপ বারবার অত্মপ্রকাশ করবে নিজের স্বরূপে।

হরি ঘরে ঢুকে বলল “মহা মুশকিল তো। দিদিমণি কইলেন লেকে বেড়াইতে যাইবেন। কী করি বলেন তো? আমার কি দু হাত খালি আসে? বিকালের বাজার, রাতের রান্না, কত কিসু পোইরা আসে। কন তো কী করুম?”

মা জানত না কী ভাবে মেয়েকে ভোলাবে।

“এবার একটু বেশি দিতে হবে। কুড়ি টাকা লিখি?” হঠাৎ সরস্বতী পূজার চাঁদা নিতে হাজির পাড়ার রকের টনি বিল বইটা খুলে বলল।

মেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। মা আর কথা না বাড়িয়ে তড়িঘড়ি কুড়ি টাকার নোটটা টনির হাতে গুঁজে বলল “নাও... নাও... নাও... আমি গিয়ে মেয়েটাকে সামলাই। আর কত যে একহাতে সামলাব? মেয়েটা কান্নাকাটি শুরু করেছে। হরি কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমার হয়েছে যত্ত জ্বালা। কী যে করি?”

টনি চাঁদার বিলটা বন্ধ করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মায়ের কথায় ফিরে দাঁড়িয়ে বলল “আমি কি কিছু সাহায্য করতে পারি?”

“এই মেয়েটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেল”

“কী হয়েছে?”

“দেখ না আমার একটা হাতও খালি নেই। ওনাকে এখন ঢাকুরিয়া লেকে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে”

টনি হঠাৎ বলল “আমার তো কোনো কাজ নেই। আমিই নয় ওকে ঘুরিয়ে আনছি”

টনির কথায় ওর দিকে চোখ তুলে তাকাল। পাড়ার ছেলে। শুধু মুখটাই চেনা। রকে বসে আড্ডা মারে আর সিগারেট খায়। পুজোর সময় লাফিয়ে নেমে পড়ে। এ হেন বাউন্ডুলে ছেলের হাতে মেয়েকে একা তুলে দেবে? তারপর যদি কিছু হয়ে যায়? উনি শুনলে আর রক্ষা রাখবেন না।

মনোভাবটা বুঝতে পেরে টনি বলল “বিশ্বাস করতে পারছেন না তো? আপনার মেয়ে আমার কাছে ঠিক থাকবে। কোনো চিন্তা করবেন না। কিছুই তো করি না। নয় ওকে একটু ঘুরিয়েই আনলাম”

টনির দিকে আরেকবার তাকাল। হয়ত ঠাওর করতে চাইছিল ওকে ভরসা করা যায় কি না? বুঝতে পেরে টনি বলল “একটুও ভাববেন না। নিশ্চিন্তে থাকুন” ঘরের দিকে তাকিয়ে হাঁকল “নন্দিনী... নন্দিনী... এখানে আয়”

ততক্ষণে নন্দিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। নন্দিনীর সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে বলল “আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি? ঢাকুরিয়া লেকে?”

কয়েক পলক। নন্দিনী ঠাহর করার চেষ্টা করছিল টনির সঙ্গে যাবে কি না! তারপর হাতটা বাড়িয়ে এগিয়ে এল। টনি ওকে কোলে তুলে নিয়ে বলল “চল... চল... আমারা বেরু বেরু যাই” নন্দিনীকে কোলে তুলে নিয়ে বেরতে বেরতে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল “কিচ্ছু ভাববেন না। আপানাদের কাজ সেরে নিন। দেখবেন ততক্ষণে আমারা বেরু বেরু করে আবার ফিরে এসেছি”

সেই প্রথম নন্দিনীর সঙ্গে পরিচয়। তারপর যেন প্রতি বিকেলে নন্দিনীকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়াটা একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল, খালি পুজোর কয়েকটা দিন আর ইলেকশনের কয়েকটা দিন ছাড়া। সারা বছরের সিগারেট, চা আর গুলতানির খরচা ওই ক’টা দিন থেকেই তো উঠে আসে। সারা বছরের রোজগার। বাদ দেবে কী করে?

একবার ইলেকশনের রেসাল্ট বেরনোর পর টনির আর দেখা নেই। বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। টনিকে আর পাড়াতে দেখা যাচ্ছে না। নন্দিনীর মা বুঝতে পারছিল না, লোকটা বেমালুম গায়েব হয়ে গেল কী করে? জিজ্ঞেস করতে জানা গেল, পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। ও যে পার্টির হয়ে প্রচার করছিল, তার বিপরীত পার্টি ক্ষমতায় আসায় ওকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পুরে দেওয়া হয়েছে। এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। টনি আর পাড়ায় ফেরত আসেনি।

আর পাঁচ জনের মতো ধীরে ধীরে টনিও হারিয়ে গেল কাকুলিয়া রোডের জীবন থেকে। সব সম্পর্কই মুহূর্তের। চলে গেলে বা হারিয়ে গেলে, কেউ তো আর মনে রাখে না। হয়ত কোনো প্রসঙ্গ উঠলে স্মৃতির পাতা উল্টে পুরনো মুহূর্তকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। জীবন তার নিজ প্রবাহে এগিয়ে যায়। কে রইল আর কে রইল না, কে তার খবর রাখে? একমাত্র প্রিয়জন ছাড়া।

শুধু নন্দিনীই ভুলতে পারেনি তার বিকেল বেলার সাথী টনিদাকে। তার ঘরের গুমোট অন্ধকারের মাঝে সাঁঝের একটুকরো দিয়া। যে দিয়া নিজের অজান্তে জ্বলতে থাকে অবচেতনে। অলক্ষ্যে, মনের নিভৃত কোণে, তার ছোটবেলার সাথীটি যেন আজও কোলে তুলে 'বেরু বেরু' করছে ছোট্ট পৃথিবীর চিলতে ঘর থেকে বিশ্বের মুক্ত বাতাসে।

হারিয়ে গেছে টনিদা।

এখন আর 'বেরু বেরু' করতে যায় না নন্দিনী। একটু বয়স বাড়তেই, অনুভব করছে তার ক্রিয়েটিভ দিকের প্রতি আসক্তি। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার নেশা ছিল। অবসরে একলা ঘরে বসে কাগজ-ক্রেয়ন নিয়ে ছবি এঁকে যাচ্ছে আপন মনে। কিছুটা অস্বভাবিক হলেও রবীন্দ্রসংগীত বা আধুনিক গান নয় - ক্লাসিক্যাল গানের প্রতি ওর একটা টান অনুভব করেছিল মা, তাই তালিম নেওয়ার জন্য স্কুলে ভর্তিও করে দিয়েছিল।

"কী যে সারাদিন ঘরে পড়ে ছবি আঁকিস? অন্যদের মতো একটু বেড়াতে গেলেও তো পারিস" মা ঘরে ঢুকে আক্ষেপের সুরে নন্দিনীকে বলল।

"কে বলল বেড়াতে যাই না? যাই তো। সারাক্ষণ ওই এক চর্বিত চর্বণ আর কাঁহাতক ভাল লাগে? স্ট্যাগনেশন আমার ভাল লাগে না। ওই আকাশে ওড়া পাখিদের মতো, ভেসে বেড়াতে আমার ভাল লাগে"

পাগল মেয়েটা। কীসের ছবি আঁকতে চায়? কে জানে?

তার দেখা ক্যানভাসটা তো পূর্ণ। সেটাকে মুছে, শূন্যতার মধ্যে থেকে আবার শুরু করতে চায় না মা। কিছুতেই বুঝতে পারে না সাজান পৃথিবীটা আবার কেন নতুন করে সাজাতে চায় নন্দিনী? বড্ড চিন্তা

মেয়েটাকে নিয়ে। আর পাঁচজন যা করে, মেয়ে তা করে না। আর মেয়ে যা করে, আর পাঁচজন তা করে না। তুই কী দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন অন্য জগতের কোনো এক প্রাণী?

নন্দিনী যেন প্রস্ফুটিত ফুলের পাপড়ি মেলে ধরেছে অচেনা শিশিরের ফোঁটা পড়ার অপেক্ষায়... ভোরের সূর্যে কী কাকুলিয়া রোডের বাড়িতে, মুক্তর মতো শিশিরবিন্দু হয়ে ঝরে পড়বে? তবু মেয়েটা সেই বিন্দু দিয়েই সিন্ধু তৈরি করতে চায় নিজের স্বপ্নের মায়ায়।

"নে নে ওঠ... আমরা আইনক্সে সিনেমা দেখতে যাব। তারপর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়ে ফুচকা খাব"

ইন্দ্রনীল যেন অচেনা ছন্দকে চেনা সুরে বাধতে চায়। রবিবারের ছুটির দিন। প্রেসিডেন্সির ক্লাস নেই। বন্ধুরা মিলে সিনেমা দেখে হই-হুল্লোড় করবে না তো কখন করবে? কয়েকটা বাড়ি পরেই থাকে ইন্দ্রনীল। শুধু এক ক্লাসেই পড়ে বলে নয়, মাঝে মাঝে একসঙ্গে বসে হোম ওয়ার্কও সেরে নেয়। কলেজের ফাঁকি দেওয়া পড়াটুকু।

তা বলে রবিবারের বিকেলে ঘরে বসে থাকা! ভাবতেই পারে না।

নন্দিনী উঠে পড়ল। একবার যখন ইন্দ্রনীলের আগমন হয়েছে, ঘর থেকে না বার করে ছাড়বে না। ওর সঙ্গে তর্কে জড়ানোটাই বৃথা।

"তুই বোস। আমি চেঞ্জ করে আসি"

কিছুক্ষণ পরে নন্দিনী যখন সেজেগুজে এল, এ অন্য আরেক নন্দিনী। কালো জিন্স-এর ওপর লাল টপস। ওপরের ঠোঁটটা নীচের থেকে অনেক পাতলা। তার ওপর হাল্কা লিপস্টিকের প্রলেপ। চুল ছুঁয়ে যাচ্ছে কাঁধ পর্যন্ত। ডান হাতের ঘড়িটার সঙ্গে ঝুলছে আরেকটা চেন। চটিটা পায়ে গলিয়ে বলল "চল... চল... অন্যরা কোথায়?"

"রামকৃষ্ণ মিশনের গেটের সামনে অপেক্ষা করছে"

এই নন্দিনীকে ওরা চেনে। এই নন্দিনীকে নন্দিনী নিজেও চেনে। সিনেমাটা বোর। কিছু করার নেই। সবার সঙ্গে এসেছে। এত দাম দিয়ে টিকিট কেটেছে। দেখতেই হবে। হল থেকে বেরিয়ে এলগিন রোড ধরে ওরা চৌরঙ্গির দিকে হাঁটতে লাগল।

সৃজা নন্দিনীর দিকে ফিরে বলল "কেমন লাগল রে?"

"হোয়াট এ বোর। রিভিউ না পড়ে দুম করে সিনেমা দেখতে চলে এলি?"

"রিভিউতে তো ভালই লিখেছিল"

"টাকা খাইয়েছে। এই সিনেমাটাকে তুই ভাল বলবি?"

"আমি ভাল বলছি না। পেপার বলছে"

"গোলি মার পেপারের কথা। এই ভয়েই সিনেমা দেখতে আসি না। একবার বোর সিনেমায় ফেঁসে গেলে কিছুই করার নেই যতক্ষণ না সিনেমাটা শেষ হয়"

"এবার তো শেষ হয়েছে। চল ফুচকা খাই"

ওরা হাঁটতে হাঁটতে একটু এগিয়ে। ছেলেরা সঙ্গে নেই। পেছন ফিরে তাকাল। দেখল ইন্দ্রনীল আর কয়েকজন পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে। সবে কলেজে ঢুকল। এর মধ্যেই সিগারেট। ফুক ফুক করে টান দিচ্ছে।

নন্দিনী দাঁড়িয়ে ওদের দিকে ফিরে বলল "নে... নে... চল চল আর বিড়ি ফুঁকতে হবে না। একটু ফাস্ট হাঁট তো। এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়া যায়!"

ইন্দ্রনীল ও অন্যান্য ছেলেরা এগিয়ে এসে বলল "ছুটির দিনে বিড়ি ফুঁকব না তো কি তোদের থোবরা দেখব?"

নন্দিনী কিছু বলতে যাচ্ছিল। সৃজা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল "নো আরগুমেণ্টস প্লিজ। উই আর হিয়ার ফর ফান। নট কম্প্যারিসনস"

নন্দিনীও কম্প্যারিসন একেবারেই পছন্দ করে না। থোবরাটা ভাল না খারাপ সেটা ওর থেকে আর কেউ ভাল জানে না। লক্ষ্য কী করেনি ইন্দ্রনীল কেমন ড্যব ড্যব করে চেয়ে থাকে ওর দিকে। বোঝে না বুঝি - ন্যাকা। এখন দশচক্রে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে হিরোইজম দেখাচ্ছে। পড়াশোনায় ভাল হলে কী হবে? ওই পড়াশোনা আর গুলতানি ছাড়া ও আর কিছুই বোঝে না। আসানসোল থেকে এসেছে। কয়লা ব্যসবসায়ীর ছেলে। ওর কাছে এর বেশি রুচি আশা করাটাই ভুল। তার ওপর মফসসলের লোকেদের কাছে, মায়াবী কলকাতার উপঢৌকন একটা উপরি পাওয়া। নন্দিনীর ছবি আঁকাটা ওর কাছে টোটাল ওয়েস্টেজ অফ টাইম ছাড়া আর কিছু নয়। বেশ কয়েকবার সেই নিয়ে কটাক্ষও করেছে।

গরমে ঘেমে নেয়ে যখন বাড়ি ফিরল, মনে হল সারা বিকেলটাই ওয়েস্টেড। অথচ এটাকেই মা বলে স্বাভাবিক জীবন! স্নান সেরে পড়তে বসা। যতই ফুর্তি করুক না কেন, দিনের পড়াটা সেরে ফেলা চাই। নো ব্যাক লগস।

ওর মধ্যেই ভবিষ্যতের স্বপ্ন লুকিয়ে আছে। অনেক বড় স্বপ্ন দেখে নন্দিনী। জীবনের স্বপ্ন। রেস্টেলনের ইটালিয়ান লেদারে মোরা নরম কাউচে শুয়ে জীবনটাকে এয়ার কন্ডিশন-এর মন জুড়ানো ঠান্ডা হাওয়ায় নিজেকে মুড়ে রাখার স্বপ্ন। কেউকেটা হতে চায় না। কিন্তু জীবনের সব রং, রস, গন্ধ, ছন্দ, বর্ণ নিংড়ে

বাঁচতে চায়। হয়ত নন্দিনীর মতো আর সব মেয়েই চায়। সারাটি জীবন ধরে ফাগুয়ার হোলি খেলে যেতে। সেই হোলির রঙে রামধনুর সাত রং আঁকা হবে আকাশের ক্যানভাসে।

জীবনের তুলি দিয়ে...কিন্তু আঁকা হয় কী?

দুই

খাজুরাহ থেকে ফেরার পরই গুম মেরে গেছে নন্দিনী।

কথাটা কাউকে বলতে পারছে না বলে বুক ফেটে যাচ্ছে। মা-বাবাকে তো বলা যায় না। এমনকী ইন্দ্রনীলকেও বলা যায় না। এই ক'বছরে, বিশেষ করে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে প্রেসিডেন্সিতে ঢোকার পর থেকেই ইন্দ্রনীলের প্রতি হৃদ্যতাটা অন্য মাত্রা নিতে শুরু করেছে। বুঝতেও পারেনি কবে, কখন, কী ভাবে, বন্ধুত্বটা আন্ডারকারেন্টের মতো কখন মেটামরফসিস হয়ে গেছে। রঙিন মখমলে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ইন্দ্রনীলকে নিয়ে।

"কী হয়েছে তোর?"

"কিছু না তো"

"সারাক্ষণ গোমড়া মুখে থাকিস"

"কে বলল?"

"আমি কী দেখতে পাই না?"

ঋতব্রতর দৈহিক লালসার কথা জানলে ইন্দ্রনীল ওই নাচের মাস্টারটাকে যে রাম ঠ্যাঙানি দিত, সে ব্যাপারে নন্দিনীর একটুও সন্দেহ নেই। প্রেগনেন্সির চিন্তাটাও মাথায় ঘোরাফেরা করছে। নেক্সট পিড়িয়ড না হওয়া পর্যন্ত দুরু দুরু বুকে ভয় ভয় আছে। লুকিয়ে একটা প্রেগনেন্সি কিটও কিনে রেখেছে। প্রেগনেন্সি হলে তো জানাতেই হবে। তার আগে কাউকে বিশেষ জানাতে চায় না। তাছাড়া ইন্দ্রনীল জানতে পারলে সম্পর্কে একটা চিড় ধরতে পারে, সে ভয়ও আছে।

"প্রাইজ পেলি বললি, দেখালি না তো"

"এমন আর কী! ওটা তো কনসলেশন প্রাইজ। জিতিনি তো" নন্দিনী খাজুরাহ আর ডান্স ফেস্টিভ্যলের কথা ডিসকাস করতে চায় না।

একবার ভেবেছিল কলেজ ফেস্টের অরগ্যানাইজারদের কথাটা জানায়। তা না হলে, আর কত মেয়ে যে ভিক্টিম হবে, তার ইয়ত্তা নেই। পরে ভাবল, না থাক। জানালেই, জানাজানি হয়ে যাবে। তার থেকে খাজুরাহর কলুষিত রাতের স্মৃতি, খাজুরাহর হোটেলের বিছানায় মিশে থাক। তাকে কলকাতায় এনে কোনো লাভ নেই। বরং ক্ষতি। একটা কালো অতীতকে বয়ে বেড়াতে চায় না। কালোটা পরে থাক অন্ধকারের গহ্বরে। তাকে আলোয় এনে, আলোর মধ্যে, অন্ধকারের কালো লেপটে দিতে চায় না।

কালিমাখা ক্যানভাসটা মুছে আবার সাদা ক্যানভাসে নতুন ছবি আঁকতে চায়।

“অমন হাঁড়ির মতো মুখ করে থাকিস না তো। কাম অন... লেটস এনজয়” ইন্দ্রনীলের কথায় খেপে উঠল নন্দিনী।

“তোরা ছেলেরা ফুর্তি ছাড়া আর কিছু বুঝিস না” নন্দিনীর কণ্ঠে ঝাঁঝ।

ইন্দ্রনীল বুঝে উঠতে পারল না নন্দিনী এভাবে খেপে উঠল কেন? সে তো তেমন কিছু অশালীন কথা বলেনি। বুঝতে পারল না, এমন অনেক কিছু থাকতে পারে, যা বাইরের লোকের অজানা অথচ নন্দিনীর জানা। জানা তথ্যকে সর্বসমক্ষে আনতে পারছে না বলেই ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছে। তার কলা বন্দনা, শিব সূর্যের আরাধনা মাটি করে দিয়েছে ঋতব্রত। তাকে ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না। সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতি একটা ঘৃণা ভেতরে ভেতরে জলীয় বাষ্পের মতো, হৃদয় নামক একটা কন্টেনারে বন্দি হয়ে আছে।

মুক্তির অপেক্ষায়...

এটা নন্দিনীর ডিফ্লরেশন নয়। এর আগেও সে ইন্দ্রনীলের সঙ্গে বেশ কয়েকবার জৈবিক মধু চেখেছে। কিন্তু সেখানে একটা পারস্পরিক আবেগ ছিল, চাওয়া ছিল, ভাল লাগা ছিল, ভালবাসা ছিল। কোনো জোর জবরদস্তি নয়। তরুণ প্রাণের নতুন চাহিদার বন্দনা গান। নন্দিনীর কখনও মনে হয়নি, দৈনন্দিন নিত্য চাওয়ার মতো সেক্সটাকে বৈবাহিক বন্ধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখবে। খাওয়া, পড়া, বাসস্থানের মতো, এটাও মানুষের জন্মগত অধিকার।

কিন্তু এভাবে নয়!

প্রথমবারের কথা এখনও ভুলতে পারে না। তখন সবে প্রেসিডেন্সিতে ঢুকেছে। বর্ষাকাল, আকাশটা সকাল থেকেই মেঘলা। মা ব্রেকফাস্ট শেষ করে বেহালায় মামার বাড়িতে গেছে। বাবা সারাদিনের জন্য অফিসে। ইন্দ্রনীলও কলকাতায় পড়তে তার বাবার কাকুলিয়া রোডের বাড়িতে পাকাপাকি ভাবে জায়গা করে নিয়েছে। কলেজের নতুন বন্ধুকে পাড়ার চত্বরে পেয়ে, ঘনিষ্ঠতাও আরও বেড়েছে। মনটা সব দিক দিয়েই তাই ময়ূরের মতো পেখম তুলে নাচতে চাইছে।

জানলার গ্রিলের পাশে দাঁড়িয়ে, বহুদিন পর বৃষ্টিটা তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মেঘের দৌড় গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হারিয়ে গেছে অচেনার দেশে। নন্দিনীর স্বপ্নের ওয়ান্ডারল্যান্ডে। যেখানে পরিরা পেখম মেলে উড়ে বেড়ায়। যেখানে অনন্ত মেঘমল্লার বাজে স্থান, কাল, সময়ের ঊর্ধ্বে। হাজারটা ছন্দ যেন সারা দেহে শীতল স্পর্শের জলতরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। বুকে এঁকে দিচ্ছে সপ্ত সুরের রামধনুর রং সরগম থেকে নিখাদে। ছোটবেলায় বৃষ্টিতে ভেজা শাড়ির রেখাগুলো যেন ধুয়ে যাচ্ছে শনিবারের দুপুরের ঝিরঝিরে বৃষ্টির জলে। একা বাড়িতে, সেই ছন্দটাকেই ক্যানভাসে বন্দি করতে চাইছে, আকাশে ফুটে ওঠা রামধনুর সাতটা রং-এর বাহারে।

এমন সময় ইন্দ্রনীল হঠাৎ এল। জিনস সার্টটা জলে ভিজে গেছে। বৃষ্টির জলে চুলগুলো লেপটে আছে সারা মুখ জুড়ে।

"এই বৃষ্টিতে?"

"ঘরে বসে একা একা বৃষ্টির দিকে তাকিয়েছিলাম। ভাবলাম একা কেন? তুই তো ছবি আঁকতে ভালবাসিস। তোর সঙ্গে বসে জলছবি আঁকি"

"ছবি পরে আঁকবি। ভেতরে আয়... আগে জামাটা খুলে তোয়ালে দিয়ে গা হাত পা মুছে নে। নইলে ঠান্ডা লেগে যাবে" নন্দিনী তোয়ালেটা ইন্দ্রনীলের দিকে এগিয়ে বলল "নে। বেশি বকবক করতে হবে না। বাথরুমে গিয়ে জামাকাপড় চেঞ্জ করে গা টা পুছে নে"

"আমার জিনসটাও ভিজে গেছে। কী যে করি?"

নন্দিনী তার একটা নাইটি এগিয়ে দিয়ে বলল "এটা পরে বসে থাক। আমি জামাকাপড়গুলো ফ্যানের হাওয়ায় দিয়ে দিচ্ছি। কিছুক্ষণেই শুকিয়ে যাবে। পাগলা কোথাকার..."

ইন্দ্রনীল বাথরুম থেকে বেরতে, ওকে দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল নন্দিনী। সার্কাসের ক্লাউনের চেয়েও কিম্ভুতকিমাকার লাগছে। ইন্দ্রনীলের জিনস সার্ট ফ্যানের তলায় শুকতে দিয়ে বলল "থোবরাটা একবার আয়নায় দেখেছিস? একেবারে ট্র্যানভেস্টাইট"

'ট্র্যানভেস্টাইট' শব্দটা শুনে ইন্দ্রনীলের পৌরুষে ঘা লাগল। ওর বাবার পাজামা-পাঞ্জাবিটা দিলে কি এমন কথা বলতে পারত? নিজের নাইটিটা পড়িয়ে ওকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা শুরু করেছে নন্দিনী। সদ্য স্কুলের গণ্ডি পার করেছে। এখন পৌরুষের প্রতিটা ব্যঞ্জনা সরব। সেই পৌরুষকে আঘাত করলে কী মেনে নেওয়া যায়?

"তবে রে..." আচমকা নন্দিনীকে হ্যাঁচকা টান মেরে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে, ঠোঁটে ঠোঁট বসিয়ে দিল। কিছু বোঝবার আগেই অনেকটা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মতো, একটা শিরেশিরে আবেগ সারা দেহে ঝিলিক মেরে উঠল।

বাইরের গর্জনের আগের ঝিলিকটা যেন রামধনুর নতুন রং আঁকতে চাইছে নন্দিনীর সমস্ত দেহে। একটা স্পার্ক। আচমকা ইলেকট্রিক শকের মতো। যার শিহরণ স্পর্শের জায়গা থেকে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। এমন দিনে, পুরুষের আকর্ষণী ছোঁয়া, ঝিলিক মারছে দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরায়। এর আগে তো কখনও অনুভব করেনি! এই প্রথমবার, এত কাছ থেকে এমনভাবে ইন্দ্রনীলের দেহের স্পর্শটা অনুভব করছে। প্রতিবাদ! করতে গিয়েও কেমন অবশ হয়ে যাচ্ছে দেহটা। একটা অচেনা সুখের স্পর্শ যেন স্ফিংসের ট্রেসার

চেস্ট থেকে বার করে এনেছে কোনো অজানা পরিকে। কিংবদন্তি ভেনাস যেন নতুন স্তবগানে মুখরিত করেছে তার সমস্ত সত্বাকে।

ঠোঁটটা ওর ঠোঁটে চেপে আঁকড়ে ধরল ইন্দ্রনীলকে। সমস্ত শরীরটা দিয়ে ছুঁতে চাইছে। বুকটা থরথর। সমুদ্রগর্ভে এক বিরল ঘূর্ণি শুরু হয়ে গেছে। এই বুঝি আত্মপ্রকাশ করবে সুনামির আকারে।

করলও!

একবার যখন শিরায় ভলক্যানোর তাপ লেগেছে, সেই তাপ ঝর্নার জলে ভিজিয়ে দিতে না পারলে মুক্তি নেই। পরিত্রাণ নেই। ইন্দ্রনীল শুধুই তার পৌরুষ প্রমাণ করতে চেয়েছিল। নন্দিনী তার বিবস্ত্র দেহ দিয়ে, সেই পৌরুষের ওপর তার নারীত্বের স্ট্যাম্প এঁকে দিল সশব্দ জলপ্রপাতে।

ব্যথা লেগেছিল। কষ্ট হয়েছিল। তাতে কী?

কোনো অপরিমিত সুখ কী ব্যথা ছাড়া আসে?

বাইরে বৃষ্টিটা কিছু ধরেছে। ঝড়ের শেষে স্তব্ধ পরিপূর্ণ তৃপ্তির আবেশ কাটিয়ে অগোছালো জামাকাপড় নিয়ে বাথরুমের দিকে নন্দিনী। নিজেকে শুদ্ধ করে যখন ফেরত এল, ততক্ষণে ইন্দ্রনীল চলে গেছে।

কিন্তু রেখে গেছে প্রথম পুরুষ স্পর্শের অচেনা রেশ। যেখানে সহস্র সুরে পাখিরা গান গায়, যেখানে হাজার রং-এর মুক্ত-মাণিক্য বেরিয়ে এসেছে, যুগ-যুগান্তরের সযত্নে গোপনে লুকিয়ে রাখা ট্রেসার চেস্ট থেকে প্রকাশ্যে, দিবালোকে। নন্দিনীকে সাজাচ্ছে নারীত্বে অভিষিক্ত করে নতুন আভরণে।

এবার সেই অদেখা নারীরূপ আঁকার পালা।

ক্যানভাসটা টেনে নিয়ে বসল। নতুন করে পূর্ণ নারীর ছবি আঁকতে।

সেদিনের বর্ষার ঘনঘটায় ঝর্নার প্লাবন নিয়ে এলেও আজকের খাজুরাহর বন্যা বেঘর করে দিয়েছে তার শুদ্ধ পবিত্র আত্মাকে। ওইদিন যদি তার পূর্ণ নারীত্বের বিকাশ হয়ে থাকে, আজ সর্বনাশ।

"খেপছিস কেন?" ইন্দ্রনীল বুঝে উঠতে পারছে না, নন্দিনী হঠাৎ এত সেনসিটিভ হয়ে পড়েছে কেন? "এমন কী বললাম?"

"সব সময় ঠাট্টা ইয়ার্কি ভাল লাগে না রে" নন্দিনী ফের ঝাঁঝিয়ে উঠল।

"কী হল রে তোর? এমন খেপে যাচ্ছিস কেন?"

"মন মেজাজ ভাল নেই"

"কেন?"

"সব কথা কী তোকে বলা যাবে?"

“বেশ নয় নাই-ই বললি। তোর যা প্রাণে চায় কর। আমরা আনন্দ-ফুর্তি করব না” নন্দিনীর মুড অফ দেখে, ওকে আর না ঘাঁটিয়ে ইন্দ্রনীল বিদায় নিল।

নেক্সট মাসে নিয়ম মেনে পিরিয়ড হল। এ যাত্রায় বেঁচে গেল নন্দিনী। খাজুরাহর স্মৃতিকে অতীতে ফেলে কিছুদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এল। কলেজ পেরিয়ে প্রবেশ করল ইউনিভার্সিটিতে।

“কাম ইমিডিয়েটলি টু এ এম আর আই হসপিট্যাল”

ফোনটা হাসপাতাল থেকেই এসেছিল। কে করেছিল মনে নেই।

রক্তাক্ত দেহগুলো দেখে শিউরে উঠল নন্দিনী। চেনাই যাচ্ছে না। কেমন করে হল? প্রশ্ন করার আগেই ডাক্তারদের মুখ দেখে বুঝতে পারছে ব্যাপারটা সিরিয়স। নিজেকে সরিয়ে আনল রক্তাক্ত দেহগুলি থেকে। উদগ্রীব ভাবে চেয়ে আছে ডাক্তারদের দিকে। ওরা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে ওদের মধ্যে বয়জ্যেষ্ঠ লোকটি নন্দিনীকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

খুব ধীর, স্থির, শান্ত গলায় বলল “আপনি ওদের মেয়ে?”

মাথা নাড়ল নন্দিনী “হ্যাঁ”

“আপনার সঙ্গে আর কে আছে?”

“কেউ নেই, আমি একা। আমিই ওদের একমাত্র মেয়ে”

নার্সের দিকে ইঙ্গিত করতে, নার্স নন্দিনীর পাশে বসে ওর হাতটা নিজের হাতে নিল।

“আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, দে আর নো লঙ্গার অ্যালাইভ। দে ওয়ার ব্রট ডেড”

ইন্দ্রনীলের সঙ্গে সেদিন যদি বর্ষার ছন্দে ভেসেছিল, আজকে সেই বর্ষাই নিয়ে এল হঠাৎ বজ্রপাত। আচমকা যেন সাজানো পৃথিবীটা ভেঙে পড়ল। নন্দিনীর মুখ দিয়ে কথা বেরচ্ছে না। গা-হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। নার্স হাতে চাপ দিয়ে এক গ্লাস জল এগিয়ে দিল।

ইনিশিয়াল আঘাতটা কাটিয়ে উঠতে নন্দিনী আস্তে আস্তে বলল “কী হয়েছিল? আমি তো কলেজ থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম”

ডাক্তার ধীর শান্ত গলায় বলল “যদ্দুর শুনেছি ওরা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে রাস্তা পার হচ্ছিল। হঠাৎই গোলপার্ক থেকে বাঁ দিকে ঘোরা একটা লরি ওদের ধাক্কা মারে। বোধহয় অ্যাটলান্টও-অ্যাক্সিয়াল জয়েন্ট, মানে ঘাড়ে, সিভিয়ার ভাবে লাগে। ইনস্ট্যান্ট ডেথ। হাসপাতালে যখন নিয়ে এসেছে আমাদের কিছুই করার ছিল না”

একা বসে সে ধাক্কা হজম করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না নন্দিনীর। পরে অবশ্য কান্নাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো লোকের অভাব হয়নি। কেওড়াতলায় শেষকৃত্যের সময়ও অনেকে এসেছিল। ক্রিয়াকর্ম মিটে

যেতে, শূন্য ঘরে একা বসে নন্দিনী অনুভব করল, কুমিরের মায়া কান্নার সান্ত্বনাগুলো এক এক করে জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। রেখে গেল প্রাণহীন ঘরে একটা শূন্যতার বাতাবরণ।

সেখানে সে একা। সম্পূর্ণ একা। অনাথের নাথের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

বাবার পাওনাগণ্ডা ঠিক করার পর নন্দিনী বুঝতে পারছে, আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এবার তাকে কাজের সন্ধানে বেরতে হবে। কোথায় কাজ? সারা শহরে ভূরি ভূরি গ্র্যজুয়েট, পোস্ট গ্র্যজুয়েট একটা কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'ক্যচ' থাকা সত্ত্বেও সুরাহা করতে পারছে না। সেখানে তো সে সহায় সম্বলহীন সামান্য গ্র্যজুয়েট। দেহ বিক্রি ছাড়া তার কাছে আর কোনো পথ নেই। খাজুরাহর রাতের অভিষেক যেন তাকে বারবার হাতছানি দিচ্ছে এক অচেনা পৃথিবীর এন্ট্রেন্সে। এতে ইন্দ্রনীলের দুপুরের সঙ্গমের শান্ত স্নিগ্ধতা নেই। আছে খাজুরাহর রুঢ় বাস্তবের কঠিন ঝলক। ভাস্কর্যের মতোই প্রাণহীন, নিথর।

"এবার কী করবা গো দিদিমণি?" হরিদা জিজ্ঞেস করতে, উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না নন্দিনী।

তিন মাস বিনা ভাড়ায় থাকতে দিয়ে, বাড়িওয়ালা উঠেপড়ে লেগেছে, বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য। যেন মানুষের সব প্রেম পিরিত অর্থে সংলগ্ন। অর্থ আর ভবিষ্যৎ না থাকলে যে আবেগ-বিবেক-উচ্ছ্বাস সব কোথায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়! কঠিন বাস্তবের প্রখর রৌদ্রের তাপে মনুষ্যত্বের সূক্ষ্ম দিকগুলো শুকনো পাতার মতো ঝরঝরে হয়ে শুকিয়ে যায়। পড়ে থাকে একটা কঙ্কাল, যে জীবনকে বৃথাই আঁকড়ে ধরে জীবনের স্বপ্ন আঁকতে চায়, কালকের কথা না-জেনে।

"বাড়িটা তো ছেড়ে দিতে হবে হারুদা। তুমি কোথায় যাবে?"

"আমার কি যাওনের জায়গার অভাব আসে? আমি গাঁয়ে গিয়া দিন মজুর করুম। তুমি কী করবা এখন?"

কী করবে বুঝতে পারছিল না নন্দিনী। কলেজে নাম লেখানো আছে বটে, তবে কোনো ক্লাস অ্যাটেন্ড করা হচ্ছে না। আত্মীয় পরিচিতরা সান্ত্বনার পসরা বিলিয়ে, কাজের অজুহাত দেখিয়ে ডুব দিয়েছে। সহায়-সম্বলহীন একটি যুবতিকে করুণা দেখানো যেতে পারে, প্রয়োজন হলে ভোগও করা যেতে পারে, যদি সুযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু তার পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করা অর্থের অপব্যয় মাত্র। সামাজিক প্রগতি বলে কথা! মুখে হিউম্যনিটি মরালিটির যতই বুলি কপচানো যাক না কেন, কাজে-কম্মে করতে গেলে অনেক ঝক্কি। অতএব সময় মতো মানে মানে কেটে পড়ো।

"ঠিক বুঝতে পারছি না হারুদা"

"আমার সঙ্গে যাবা? আমাগো গেরামে?"

"আমি তো গ্রামে গিয়ে কিছু করতে পারব না। ওখানে থাকিও নি কোনোদিন..."

“দিদিমণি তোমারে দেইখ্যা বড় মায়া লাগে। কোলে-পিঠে কইরা মানুষ করসি। এখন তোমারে ছাইরা যামু কোথায়? কিন্তু তোমার লগে লগে থাকলে যে আমিও তোমার বোঝা হইয়া দারামু”

ফাইনাল ডিসিশন নেওয়ার আগে নন্দিনী ভাবছে। মন বলছে এ শহর ছেড়ে দূরে বহুদূরে কোথাও চলে যায়। যেখানে সে একটা রংহীন অস্তিত্ব - একটা ব্ল্যাঙ্ক ক্যানভাস। যখন ফিরে তাকাবার আর কিছু নেই, সেখানে অতীতকে পেছনে ফেলে একেবারে স্ক্র্যাচ থেকে আবার নতুন করে জীবন শুরু করে, যেখানে কেউ তাকে চেনে না। নিটোল শূন্য ক্যানভাসে একটা নতুন ছবি আঁকতে। পুরনো নন্দিনীকে পেছনে ফেলে আরেক নতুন নন্দিনী।

“ঠিক বুঝতে পারছি না হারুদা। একটু ভেবে নিই”

দমকা হাওয়াটা নোঙর উপড়ে ভাসিয়ে দিয়েছে জীবন সমুদ্রের মাঝ দরিয়ায়। কোনো মাঝি আর বৈঠা নেই অকুল দরিয়ায় হাল ধরার। সেই অকুল সমুদ্রের ভেঙে পড়া জলরাশির মধ্যে, নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে প্রবহমান স্রোতের গতিপথে।

ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আজকাল বড় একটা দেখা হয় না। ও-ই আর দেখা করে না। নন্দিনী বুঝতে পারছে, ইন্দ্রনীল ক্রমশ দূরে সরে গেছে। হয়ত আগের মতো সে সচ্ছলতা নেই বলেই। পকেটে পয়সা না থাকলে প্রেম-পিরিত সব উবে যায়। ক্ষণিকের উন্মাদনার মোহ, বাস্তবের তপ্ত কঠিন মাটিতে ঝলসে পুড়ে যেতে কতক্ষণ? দুনিয়ার যদি এটা রীতি হয়, ইন্দ্রনীল কোন ছাড়?

তবুও সাহস সঞ্চয় করে একদিন ফোন করল “কী রে? তোর খবর নেই। আমাকে ভুলে গেছিস?”

“নাঃ... ভুলব কেন? পড়াশোনার চাপে সময় করে উঠতে পারছি না। কেমন আছিস?”

“আমি ফোন করলাম বলে প্রশ্ন করছিস। এতদিন তো করিসনি?”

“তুই শোকে ছিলি বলে তোকে আর বিরক্ত করিনি”

“একদিন দেখা করতে চাই”

“কেন?”

“তুই এ প্রশ্ন করছিস! আমাদের সম্পর্কটা কী আজকের?”

“এক সময় সম্পর্কটা ছিল, অস্বীকার করছি না। কিন্তু সেটা তো তুই-ই নষ্ট করে দিলি”

“আমি আবার কী ভাবে নষ্ট করলাম?”

“নিজেকে বাজারে চড়িয়ে। ভাবছিস আমি কিছু জানি না। তোদের খাজুরাহর লীলাখেলা!”

এতদিন পর, ইন্দ্রনীল জীবনের একটা ফেলে আসা পুরনো চ্যাপ্টারের খোঁজ পেল কী করে?

হোয়েন ইট রেইন্স, ইট পোরস

এখন আর মাঝ দুপুরের নির্মল সুখের বৃষ্টি নয়। এখন দিনে রাতে বাঁধভাঙা প্লাবনের জোয়ারের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে নন্দিনী।

খাজুরাহর মূর্তিগুলো যেন পাষাণের মতোই বিদ্রুপ করছে, তাদের লীলা মাহাত্ম্য নিয়ে বিকৃত পরিহাসে। অতীত কখনও পিছু ছাড়ে না। সে খাজুরাহ থেকে শতাব্দী প্রাচীন চান্ডেলা সাম্রাজ্য। নাই বা হল আরেকটা খাজুরাহ। নাই বা সে গেল খেলাচ্ছলে আর কোনো ডান্স ফেস্টিভ্যাল অ্যাটেন্ড করতে। এক রাতের পৈশাচিক তাণ্ডব তার ক্যানভাসে রামধনু রং দিয়ে আঁকা, প্রাণোজ্জ্বল ছবিটার ওপর ঢেলে দিয়েছে অনন্ত রাত্রির কালি। মুছে দিয়েছে জীবনের রং। কালির প্রলেপ দিয়ে রংহীন অন্ধকারে। যেখানে হয়ত দিয়া জ্বলে। নন্দিনী-ই বুঝি পূজার আরতির নৈবেদ্য ঠিক মতো সাজাতে পারেনি। হাজার চেষ্টা করেও সে কালি মুছতে পারছে না।

ফোনটা নামিয়ে রাখল। ইন্দ্রনীলের সঙ্গে কথা বলে আর লাভ নেই। চেষ্টা করেও কিছুতেই সে দাগ আর মোছা যাবে না। অনেকটা ভাঙা কাচের মতো। একবার ভাঙলে আর জোড়া লাগে না। এক সহায় সম্বলহীন, একলা মেয়ের সামনে এখন একটাই ধ্রুবতারা - বাঁচার স্বপ্ন।

তার একমাত্র উপায় পুরনো ক্যানভাসটা ছিঁড়ে ফেলে, আবার নতুন ক্যানভাস নিয়ে বসতে হবে। নতুন শহরে। নতুন রং দিয়ে আবার তাকে সাজাতে হবে নতুন আলোকে।

হাজার হোক, সে এক রাডার-শূন্য এরোপ্লেন। তাকে ভেসে থাকতে হবে মাঝ আকাশে, আসল নক্ষত্রের সন্ধানে। ধ্রুবতারাকে সাক্ষী করে। সেই তার জীবনযানের পাইলট। তার বোয়িংকে নিয়ে ফ্লাই করতে হবে ওই দূর আকাশের সীমাহীনতার মধ্যে পূর্ণতার দেবালোকে। যেখানে ব্যথার প্রদীপটাও নিভে গেছে গাঢ় অন্ধকারে। দমকা হাওয়ার ঝাপটে। যেখানে অতীত পৌঁছতে পারে না বর্তমানের সাজানো নতুন ছবির উপঢৌকনে। যেখানে ভবিষ্যৎটাও পাওয়ার অরবিটের মধ্যে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ যেখানে এক সূত্রে বাঁধা এক অনন্ত সময়ের ব্যাপ্তির মধ্যে।

আকাশের তারারা যেখানে মিটমিট করে অবিরাম হেসে চলেছে, অবান্তর দিনরাতের খেলা ভুলে। হাসতে হাসতে সহস্র কোটি রং দিয়ে ছবিটা এঁকে ফেলেছে। যা কখনও কেউ মুছতে পারবে না, আর কালি মাখাতে পারবে না, মলিন করে দিতে পারবে না - যুগ থেকে যুগান্তরে।

সেই ইহলোক-পরলোকের মিশ্রণে নিশ্চিন্ত আলো-আঁধারে ছবিটা অম্লান হয়ে থাকবে এক পার্মানেন্ট ক্যানভাসে...

তিন

অনেক প্রতীক্ষার পর একটা পসিটিভ ই-মেল এল ব্যাঙ্গালুরু থেকে।

বেশ কয়েকদিন ধরেই কম্পিউটারে গুগল সার্চ করছিল। সাহস হয়নি ফোন তুলে কথা বলে। এই জগৎটা এমনিতেই অচেনা। তাও আবার, কলকাতার লোকের কাছে তো বটেই, আরও বেশি করে। ছোটবেলায় স্কুলের মিস্ট্রেস বলেছিলেন **হোয়েন অল ডোরস ক্লোজ, ওয়ান ডোর ওপেন্স। দ্যট ইজ ইওর ওয়ে** বন্ধ দরজাগুলোতে বারবার করাঘাত করে একটা সত্য উপলব্ধি করেছিল, তার গ্র্যজুয়েসন শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাকে এই কম্পিটিশনের বাজারে বেশি কিছু দেবে না। নিদেনপক্ষে, মামা-কাকার জোর না থাকলে, একটা সাধারণ চাকরি পাওয়াও মুস্কিল।

আর কী কী অ্যাসেট আছে, খুঁজে বেড়াচ্ছিল। যার ভিত্তিতে সে যে কোনো একটা কাজ পেতে পারে। একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল চোখের নীচে কতটা কালি পড়ে গেছে। নিজেকে দেখতে দেখতে আবার নতুন করে আবিষ্কার করল। খাজুরাহর ভাস্কর্যের কথা এখনও ভোলেনি। ওই বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর্যের থেকে তার দৈহিক মাধুর্য কী কোনো অংশে কম? ওই স্থাপত্য যদি বিশ্বের নজর কাড়তে পারে, সে পারবে না কেন?

জন্মাবার পর জ্যোতিষ বলছিল “শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে ভোর চারটে চুয়াল্লিশ মিনিটে জন্ম। এ মেয়ের জীবন আলোয় আলোয় ভরে উঠবে”

নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হল, সে কেন এক কোণে পড়ে আছে? বুড়ো ভিখিরির মতো, সারা দুনিয়াটাকে দেখছে ঘসা কাচের একচোখো চশমা দিয়ে - আবছা, ধোঁয়াটে! ঠিক যেমন, বুড়ো ভিখিরিরা সুতো দিয়ে বাঁধা একটা ঘসা কাচের চশমা পরে দেখার চেষ্টা করে। সবাই যেন তাকে ভিখিরির মতোই একলা ফেলে দিয়েছে জীবনের জলসাঘরের বাইরে।

তার মনে হল জীবনের রঙ্গমঞ্চে বেজে চলেছে মহাকালের বৃন্দসঙ্গীত। সেই আসরে মৃদঙ্গের বোল তুলছে নিয়তির অট্টহাস। মন্দিরার ঝংকার তুলছে, সহস্র কোটি সাকসেসফুল মানুষ। অ্যান্ড্রোমিডার বীণার তারে বেজে চলছে তার ফেলে আসা জীবনের মিষ্টি ধুন। এরপর হয়ত শুরু হতে চলেছে, আগামী দিনের কালপুরুষের মুখনিঃসৃত এক মহাসঙ্গীতের তান। সেই আসরে সবাই আমন্ত্রিত, একমাত্র সে ছাড়া।

মনে হতেই তার দুচোখ জলে ভরে এল। নিজের অসহায়তার দুঃখটা যেন নিশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে গেল শরীরে। তীব্র বেগে ছুটতে লাগল প্রতিটি শিরা-উপশিরায়, তন্ত্রীতে। ছুটতে ছুটতে সেই দুঃখ ক্রমশ বদলে

গেল রাগে। এক ভয়ংকর অনির্দিষ্ট রাগ।

কার উপর, ঠিক বুঝতে পারল না।

সমাজের ওপর?

জানে না।

নিয়তির ওপর?

মানতে পারে না।

নাকি অনির্দিষ্ট দিশাহীন ভবিষ্যতের ওপর?

বিশ্বাস করা কঠিন।

"প্লিজ সেন্ড ইওর প্রোফাইল উইথ পিকচারস" ই-মেলটা নতুন পৃথিবীর ডাক।

অজানা জগৎ। অন্ধকারের মধ্যে একটা আশ্রয়ের হাতছানি। যদি লেগে যায়... একটা আশ্রয় জুটলেও জুটতে পারে। কে জানে?

পাঠিয়ে দিল ছবি সহ বায়ডাটা ই-মেলে। একটাই প্রতিজ্ঞা - ইফ হোরডম ইজ হার ডেস্টিনি, সি উড বি দ্য বেস্ট ইন টাউন। ইফ অ্যাস্ট্রলজি হ্যাস এনি লজিস্টিকস, সি উড এমিট লাইট ইভেন ইন হার কারসড জব।

কয়েকদিন পর একেবারে সাহেবি কায়দায় উত্তর "উই আর প্লিজড টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন সিলেক্টেড টু বি এ পার্ট অফ আওয়ার প্রেস্টিজিয়াস অরগ্যানাইজেশন। প্লিজ মেক ইওরসেলফ অ্যাভেলেবল ইন আওয়ার অফিস ইন ব্যাঙ্গালুরু অ্যাস আর্লি অ্যাস পসিবল। ডিস্প্যাচিং ইয়োর ফ্লাইট টিকেটস বাই কুরিয়ার"

ব্যাঙ্গালুরুতে পস অফিসে অধীর প্রতিক্ষায়, দুরু দুরু বুকে। ভাগ্যে কী আছে জানে না। শেষ পর্যন্ত হবে তো? একটু পরেই ডাকবে সেই মহান অস্তিত্ব। তার ভাগ্যের নিয়ামক।

যথারীতি ডাক পড়ল। নিয়ে যাওয়া হল তাকে। রহস্যময় এক আলো-আঁধারি বিশাল ঘরে। ঢুকেই কোনায় একটা বড় ডেস্ক। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। ফাঁকা। আগে লক্ষ করেনি, ঘরের এক কোণের সোফা থেকে হেঁটে এল গেরুয়া-হলুদ আলখাল্লায় সর্বশরীর ঢাকা একটা অবয়ব। ঠিক বুঝতে পারল না, পুরুষ বা নারী। যেন কাষায়বস্ত্র পরিহীত পরম কারুণিক বুদ্ধদেব স্বয়ং আজ এই আলখাল্লা পরে তার জীবন-শ্রাবস্তির পথে এসে দাঁড়িয়েছেন। বেদনার আগুনে ধিকিধিকি জ্বলা তার অস্তিত্বকে দুঃখের বিষ পান করে অমৃতের স্রোতে তাকে ভাসিয়ে দিতে।

নন্দিনীকে আপাদমস্তক দেখে, দৃপ্ত পুরুষ কণ্ঠে, চোস্ত ইংরেজিতে "আই গ্যদার ইউ আর ফ্রম ক্যলকাটা"

লাজুক হলেও, ওর চোখে চোখ রেখেই নন্দিনী জবাব দিল "ইয়েস"

“হোয়াই ইন দিস প্রফেশন?”

“ফর মানি” একটু থেমে, কোনো ভণিতা না করেই “ফর সারভাইভ্যল”

“হু এলস ইজ দেয়ার ইন দ্য ফ্যমিলি?”

“নোবডি। মাই ড্যড অ্যান্ড মাম ওয়াজ কিল্ড ইন এন অ্যাক্সিডেন্ট। আই নিড এ জব উইথ ডিসেন্ট ইনকাম ফর সারভাইভ্যল”

“এনি ডিস্ক্রিসন্স?”

“নো অ্যাকসেপ্ট ওয়ান”

“হোয়াট?”

“আই ওয়ান্ট টু কেটার ফর অ্যান এক্সক্লুসিভ কমিউনিটি। অ্যান্ড নট বি ইনফেক্টেড উইথ এইডস”

ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নন্দিনীর চোখের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোঁজার চেষ্টা করছে আসল নন্দিনীকে।

নন্দিনী ভেবেছিল, হয়ত তাকে বিবস্ত্র হয়ে নিজের ঠিকরে পড়া যৌবনের প্রত্যক্ষ ডিসপ্লে দিতে হবে। সেই রকমই গল্পে পড়েছে, ব্লু-ফিল্মে দেখেছে। কিন্তু না। ওই আলখাল্লা পরিহিত মুক্তিদাতা বুদ্ধ সেদিকে গেলই না। ওর চোখের দিকে চেয়ে বলল “ফাইন। ডিস্ক্রিশন ইজ দ্য এমব্লেম অফ আওয়ার অরগ্যনাইজেশন। আই বিলিভ ইট ওয়াজ ক্লিয়ারলি মেনশনড ইন আওয়ার টারমস অ্যান্ড কন্ডিশনস” একটু থেমে, দৃপ্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে “অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই রেসপেক্ট অ্যান্ড হন্যার ইওর উইসেস, ইউ হ্যভ টু রেসপেক্ট আওয়ারস টু”

জিজ্ঞাসু নন্দিনী তাকাল ওর চোখে। ডেস্কের উলটো দিকের চেয়ারে বসে ইন্টারকমটা টিপে অর্ডার দিল “টু কফিস প্লিজ” তারপর নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলল “ইউ হ্যভ টু মেইন্টেন এ ডিসক্রিট লাইফস্টাইল হুইচ মিন্স ইউ কান্ট ইন্টারমিঙ্গল উইথ দ্য মাস। ইউ কান্ট বি স্পটেড আউট উইথ দ্য ক্রাউড। আওয়ার ক্লায়েন্টস প্রেফার দ্যট এক্সক্লুসিভনেস”

“অ্যাজ ইউ সে স্যর” সায় দিল নন্দিনী।

একটা মনমোহিনী হাসি, “ইউ ক্যন কল মি স্যর ওর ম্যডাম। মাই নেম ইজ জ্যোতিকিরণ। ইট হার্ডলি মেকস এ ডিফারেন্স। জেন্ডার বায়াস ইস ফর দোস, হু ফাইট ফর দেয়ার রাইটস। আই এঅ্যান্ড মাই অরগ্যানাইজেশন রিপ্রেসেন্ট দ্য আল্টিমেট ডিসায়ার অফ হিউম্যনিটি। অ্যান্ড অল দ্য পিপল হু আর এ পার্ট অফ দিস অরগ্যানাইজেশন, ইজ দেয়ার ফর দ্য সার্ভিস অফ হিউম্যনিটি ইন দেয়ার ওউন ডিসক্রিট ওয়ে। আওয়ার ক্লায়েন্টস আর এক্সক্লুসিভ। সো দোস কেটারিং টু দেম মাস্ট বি এক্সক্লুসিভ টু”

এবার কিছুটা বুঝতে পারছে এই অরগ্যানাইশেনের কর্তাকে। রেজিস্টার্ড এসকর্ট সার্ভিস - আগেই দেখেছিল ওয়েবসাইটে। এখন সাক্ষাতে বুঝতে পারছে তার উভয়লিঙ্গ মালিকের এক্সক্লুসিভনেস অ্যান্ড

অথেন্টিসিটি। আদিম প্রফেশনটার সামাজিক স্বীকৃতি নিয়ে সময় সময় ওঠা ঝড়টাকে একটা সামাজিক জায়গায় আনার চেষ্টা এই আপাত-বুদ্ধের কথায় প্রকট। যেমন বলিষ্ঠ তার কণ্ঠ, তেমনই চিন্তাধারা।

ততক্ষণে কফি এসে গেছে।

"সুগার?"

"ওয়ান"

নিজের হাতেই সুগার কিউবটা মিশিয়ে এগিয়ে দিল। কফিটা হাতে নিয়ে সবে চুমুক দিয়েছে, কতগুলো লিগ্যাল পেপার ছুড়ে বলল "হিয়ার ইজ দ্য কন্ট্র্যাক্ট। প্লিজ গো থ্রু দেম অ্যাট ইওর লেসার। সাইন বোথ কপিস অফ দ্য কন্ট্র্যাক্ট অ্যান্ড রিটার্ন ওয়ান টু মাই সেক্রেটারি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন"

নন্দিনী লক্ষ করল ওর ভাবলেশহীন মুখটা। কোনো জোরজবরদস্তি নেই। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অফিসিয়াল চুক্তি। নিলে নাও নয়ত নয়। মুক্ত পৃথিবীতে স্ব-ইচ্ছায় এই সংস্থায় জয়েন করো। যে কোনো প্রফেশনল অরগ্যনাইজেশনের মতো।

কফিতে চুমুক দিয়ে "ইফ ইউ এগ্রি, মাই সেক্রেটারি উইল গাইড ইউ অফ দ্য প্রোটকলস অফ দ্য মেডিক্যাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড আদার নেসেসারি ফরম্যলিটিস"

কফি শেষ। উঠে হাতটা এগিয়ে "হ্যভ এ নাইস ডে"

বেরিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা প্রশ্ন। নন্দিনী জিজ্ঞেস করল "আই ফরগট টু আস্ক ইউ অ্যাবাউট মাই একমডেশন..."

অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে যেতে শোনা গেল "ডোন্ট ইউ ওয়ারি। মাই স্টাফ উইল টেক কেয়ার অফ দ্যট। উই হ্যভ আওয়ার ওউন অ্যাপার্টমেন্টস"

যে অন্ধকার কর্নার থেকে এসেছিল, সেই সোফার ওপাশে একটা কাঠের প্যনেল ঠেলে হারিয়ে গেল তার পরিত্রাতা, তার এই মুহূর্তের নতুন জগতের দীক্ষাগুরু, তার আজকের বুদ্ধ।

নন্দিনী জেগে উঠল এক নতুন ভোরে, নতুন সূর্যের রং দিয়ে, এক নতুন ছবি আঁকতে। এ ছবি তো এর আগে কখনও আঁকেনি। এ যেন ফ্রেস ক্যানভাসে নতুন ছবি। ছবিটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, জানা নেই। তবু জীবন তাকে সেই ছবিই আঁকতে বলছে। যদি তাই হয়, সে ছবি সে আঁকবে তার সর্বস্ব দিয়ে। নন্দিনী যা কিছু করে, সব কিছুতেই একশো ভাগ উজাড় করে দেয়, কোনো ফাঁকি না দিয়ে। হয়ত সাকসেসটা শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। একাগ্রতার মধ্যেই পূর্ণতা। নন্দিনী সেই পূর্ণতার খোঁজে ডুব দিল।

শুধু মেডিক্যাল এক্সামিনেশন নয়, এজেন্সির নিয়ম অনুযায়ী অনেক ফটো সেশন সুট করে তার নতুন একটা প্রোফাইল তৈরি করা হল। এই ফটোসুটের মধ্যে অবশ্য পোশাক পরিবর্তন করে কোনো অশালীন

কিংবা অর্ধনগ্ন ছবি কিন্তু তোলা হয়নি। প্রত্যেক ছবি রুচিশীল ডিসাইনার ড্রেস পরিহিত। যদিও এই ডিসাইনার ড্রেসের আড়ালে তার ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স বুঝে নিতে সম্ভাব্য ক্লায়েন্টের কোনো অসুবিধাই হবে না। সেই সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে তার বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতার কথা, নৃত্যশৈলী থেকে ক্লাসিক্যাল শিখে বড় হয়ে ওঠা, কোনো কিছুই বাদ গেল না।

নন্দিনী বুঝতে পারছিল এই এক্সক্লুসিভ এজেন্সিতে, এক্সক্লুসিভ ক্লায়েন্টদের জন্যই তাকে তৈরি করা হচ্ছে। যে এক্সক্লুসিভ ক্লায়েন্টদের সে কেটার করবে, তাদের বায়ডাটা যাতে গুগল সার্চ করে আগে জেনে নিয়ে, তবেই ক্লায়েন্টের কাছে যাবে।

কিন্তু তার প্রথম ক্লায়েন্ট কুলদীপের সম্বন্ধে গুগল সার্চ করে তেমন কিছুই পেল না। খালি একটা লিঙ্কডিন প্রোফাইল - সেখানে নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখাই নেই। খালি ফিল্ম-ডিরেক্টর ছাড়া। মনে করার চেষ্টা করল, এর আগে কোথাও নামটা শুনেছে কি না! মনে করতে পারল না। প্রথম ক্লায়েন্ট তেমন হোমরাচোমরা কেউ নয়। হয়ত ইচ্ছে করেই, ফিল্টার করে, ওরা নন্দিনীকে তেমন কোনো হোমরাচোমরার কাছে পাঠায়নি।

এজেন্সির নিয়মটা খুব স্বচ্ছ। ওয়েবসাইটে কাউকে দেখে পছন্দ হলে ক্লায়েন্টদের অন-লাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করার সময় ক্রেডিট কার্ডে পুরো পেমেন্ট করে দিতে হয়। তাই নন্দিনীর অন্তত টাকা পয়সা কালেক্ট করার বালাই নেই। যেহেতু সে নতুন এবং এখনও কোনো স্টার রেটিং নেই, তার রেটও সবার থেকে কম। পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরো সন্ধের জন্য। সিনিয়র লোকেদের রেট অনেক বেশি। এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, পাঁচ ঘণ্টা, ওভারনাইট হিসেবে। তার আয়ের ফিফটি পার্সেন্ট এজেন্সি রেখে, তাকে ফিফটি পার্সেন্ট দেবে।

পঁচিশ হাজার দিয়ে বউনি, মন্দ কী?

প্রথম ক্লায়েন্ট। ভয় বুকটা দুরু দুরু করছে। সেদিনের ইন্টারভিউটা আসল পরীক্ষা ছিল না। আজকেই তার আসল অভিষেক।

তাজ ওয়েস্ট এন্ড। সিটি সেন্টারের কাছে ওল্ড রেস কোর্স রোডে অফিসারস কলোনির ভিক্টোরিয়া লে আউটে গলফ ক্লাবের পাশে। বিশাল গার্ডেনের ওপর দিয়ে গাড়িটা ২২ নম্বর সুইটের দিকে এগিয়ে চলেছে। নন্দিনী লক্ষ করল একটা প্রাচীন বটগাছ।

ঢোকার সময়ই, এন্ট্রেন্স রিসেপসন থেকে ক্লায়েন্টের কাছে খবর পৌঁছে ছিল। গাড়ি থেকে নামবার আগে নন্দিনী নিজের বেশ ভূষা আরেক বার ঠিক করে নিল। একটা সাদা ফুল লেংথর সিল্কের গাউন।ঝলমল করছে স্বরাভস্কিক্রিস্টাল বসানো কাজ।মুক্তোর হার।পড়ন্ত আলোর ফেলে আসা রোশনাই ঠিকরোচ্ছে। তার

ঔজ্জ্বল্য জাগাতে পারে শিহরণ। প্রথম ক্লায়েন্টের কামনার বাসরে নন্দিনীকে দেখলে মনে হবে, সে যেন এক স্বতন্ত্র নক্ষত্র। নিজ মহিমায় হাজির হয়েছে হাজার তারার দরবারে।

বেল বাজাতেই দরজা খুলে এক মধ্যবয়সি। ফরটিস-এর ওপারে। জুলফির কোণে কয়েকটা পাকা চুল। উঁকি দিচ্ছে। চুলগুলো ভেজা। ফরসা শরীর। খাকি হাফ প্যান্ট আর সাদা সার্টের ওপর তোয়ালে। সদ্য স্নান সেরে দাঁড়িয়েছে।

একটা আন্তরিক স্মাইল দিয়ে কুলদীপ সিং বলল "প্লিজ কাম ইন। আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং ইউ"

এক্সিকিউটিভ সুইটটা একটা ফ্ল্যাটের সমান। অন্তত তার কাকুলিয়া রোডের বাড়ি থেকে খুব ছোট নয়। নন্দিনী চেয়ে আছে অনেক এলোমেলো ভাবনা নিয়ে। ড্রয়িং রুমে সোফা ছাড়াও বিশাল এইচ ডি কালার টিভি। ওপাশের খোলা বারান্দায় কয়েকটা বেতের চেয়ার আর সোফা। কুলদীপ বলল "মেক ইওরসেলফ কমফরটেবল ইন দ্য ভারান্ডা, হোয়াইল আই জাস্ট ফ্রেশেন আপ"

বেডরুমে হারিয়ে গেল কুলদীপ।

বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে গার্ডেনের একাংশ দেখা যায়। শহরের মধ্যে এই প্রকৃতির ছোঁয়া যেন একটা অন্য মাত্রা এঁকে দিচ্ছে। ইফ ইউ নিড টু রিল্যাক্স আফটার এ হেভি ডে, হোয়াট বেটার প্লেস ক্যন দেয়ার বি, দ্যন দিস ওয়ান?

স্বপ্নের পৃথিবী। আগে নন্দিনী দেখেনি।

একদিন এমনিভাবে হারিয়ে যেতে চেয়েছিল ইন্দ্রনীলকে নিয়ে স্বপ্নের জগতে। যেখানে প্রকৃতির মধ্যে সে নিবিড় আবেগে আঁকড়ে ধরতে পারবে তাকে। উষ্ণ আবেগে কথা থেমে যাবে। দেহের স্পর্শ রোমাঞ্চের শিহরণ জাগাবে প্রতিটা কোষে। এই ঘাস, এই গাছ, এই ফুল, এই রিল্যাক্সিং সবুজের মধ্যে। একটা স্বপ্ন দিয়ে ক্যানভাসে ছবি আঁকতে চেয়েছিল। স্বপ্নের ছবি।

কিন্তু না...

স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে বিরাট ফারাক। আজকেও সেই ঘাস, গাছ, ফুল সবই আছে। শুধু ইন্দ্রনীল নেই। স্বপ্নটা হারিয়ে গেছে।

"হোয়াট ড্রিঙ্ক উড ইউ প্রেফার?" গলার শব্দে ফিরে তাকাল।

কুলদীপ ড্রেস কিছুই পাল্টায়নি, খালি চুলটা আঁচড়ানো ছাড়া। ভেসে আসছে একটা মিষ্টি সুবাস। শ্যানেল? না রোসাস? না ডিওর? নন্দিনীর ঘ্রাণে সেই তীক্ষ্ণতা নেই, যে পার্থক্যটা বিচার করবে।

কুলদীপ ঘরের ছোট্ট বারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রথমবার। কোনো অঘটন ঘটাতে চায় না। মিষ্টি হেসে বলল "বিয়ার"

“অ্যান্ড সামথিং টু গো উইথ...” একটু থেমে “এনিথিং দ্যট ইউ ডোন্ট ইট?”

“আই হ্যভ নো ফ্যডস”

“লেটস স্টার্ট দ্য ইভিনিং উইথ সাম মোমোস অ্যান্ড প্রন ককটেল স্যালাড”

মাথা নাড়ল নন্দিনী। কুলদীপ উলটো দিকের চেয়ারটা টেনে বসে বলল “আই লিভ ইন দেলহি। হোয়েনেভার আই অ্যাম ইন ব্যঙ্গালুরু আই প্রেফার দিস হোটেল। ইটস নিয়ার দ্য সিটি সেন্টার অ্যান্ড ইয়েট সো শিরিন। দ্য গ্রিনারি ইন ফ্রন্ট হ্যস ইটস ওউন চার্ম। আফটার দ্য হোল ডেইস ওয়ার্ক, আই লাভ মাই ড্রিঙ্ক গেজিং অ্যাট দ্য গ্রিনারি”

নন্দিনীকে চুপ দেখে, ওর দিকে তাকিয়ে বলল “হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? আই গ্যদার ফ্রম দ্য এজেন্সি দ্যট ইউ আর এ ফ্রেসার। আই লাভ ফ্রেসারস” তখনও নন্দিনী চুপ করে আছে। আবার প্রশ্ন করল “আই হোপ ইউ আর নট এ ভার্জিন?”

মনে বোধহয় একটা সংশয়। নন্দিনী বিয়ারে চুমুক দিয়ে বলল “রিল্যাক্স। ইউ উইল লেটার রিয়েলাইজ আই এম নট এ ভার্জিন। আই ওয়াজ জাস্ট লিসনিং টু ইউ। দ্যট ডাসন্ট মিন আই অ্যাম ডাম্ব”

খুশি হল কুলদীপ। একজন বোবা সুন্দরীর সঙ্গে সারা সন্ধে কাটাবার কোনো অভিপ্রায় নেই তার। নন্দিনী বুঝতে পারছে কনভারসেশন চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা এখানে আলোচনা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ফর্ক দিয়ে মোমোটা কেটে মুখে পুরে বলল “দ্য নাইট ইজ স্টিল ইয়াং টু লিসন টু মাই স্টোরি। হোয়াট আর ইওর ইন্টারেস্টস?”

নন্দিনীর কথা টেনে নিয়ে কুলদীপ বলল “সামিথিং অ্যাকিন টু ইওরস”

“হাউ ডু ইউ নো হোয়াট ইজ মাইন?”

“ইট ইজ রিটেন ইন ইওর প্রোফাইল। ইউ আর এ ক্লাসিক্যাল ডান্সার”

আশ্চর্য। লোকটা শুধু ফুর্তি করতেই আসেনি। তার সম্বন্ধে রীতিমত হোম ওয়ার্ক করে এসেছে। একটু হেসে নন্দিনী বলল “ওয়েল নট অ্যান এক্সপোনেন্ট। আদারওয়াইজ আই উডন্ট বি হিয়ার। বাট আই হ্যভ ওয়ান এ ফিউ অ্যাওয়ার্ডস”

“একচুয়ালি আই মেক মিউসিক ভিডিওস। অফকোরস নট এনি ক্লাসিক্যাল ওয়ান্স। দে ডোন্ট সেল। ইট ইজ এ বিট অফ ডান্স উইথ ইরটিক টিটিলেশন”

ক্লায়েন্ট ভাড়া করে এনেছে। চুপ করে কথা শোনাটাই কাজ।

এই বাজারে কড়কড়ে পঁচিশ হাজার টাকা কে দেয়?

কুলদীপ বলে চলেছে “আই অ্যাম হিয়ার ইন ব্যঙ্গালুরু টু ফিক্স আপ এ ফিউ ডিলস”

খুব ভাল কথা। এই ইরটিক ভিডিও ইন্ডাস্ট্রিতে তো মেয়ের কমতি নেই। নিজেকে জাহির করার জন্য আজকালকার মেয়েদের কি শুতে কোনো দ্বিধা আছে? তবে ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে তাকে তলব কেন? সেটাই ঠাহর করে উঠতে পারছে না। হতেও পারে হয়ত ব্যঙ্গালুরুতে তেমন কেউ নেই।

সূর্য আস্তে আস্তে ঢলে পড়েছে পশ্চিম প্রান্তে। আলো-আঁধারির সন্ধিক্ষণ যেন অন্য এক সুর শোনাচ্ছে। সেটা রাগ কল্যাণের সুর নয়। আজকের ঝংকার বিটস। সেখানে বিথভেনের সোনাটা নেই, নিখিল বন্দ্যপাধ্যায়ের রাগ ভূপালির আবেশ নেই, আছে ধীরে ধীরে জমে ওঠা ভডকার নেশা। যতক্ষণ না চেনা পথ ঘুরে দাঁড়ায় অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে। চেনা মোহনার শেষ হওয়া সময়ের সীমানায়। ততক্ষণ কথা চলবে। রাতের আকাশে চাঁদ হয়ত উঠবে। মোহহীন ব্যবসায়।

তারই প্রতীক্ষায় সময় গুনছিল। কুলদীপ ভডকার নেশায় বলে চলেছে “হোয়াই ডোন্ট ইউ বি এ পার্ট অফ মাই ভিডিও সুট?”

মালের ঘোরে অনেকে অনেক কিছু বলে। নন্দিনী জানে কাল সকালে সব ভুলে যাবে। বেশি খেলে কিছু করতে পারবে না। কাজটা যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারে তত তাড়াতাড়ি ছুটি। কুলদীপ কথা বলতে চায়। নন্দিনী যা দিতে এসেছে, মিটিয়ে বিদায় হতে চায়।

“উই ক্যন টক অ্যাবাউট ইট সাম আদার টাইম” নন্দিনী চেয়ার ছেড়ে ঘরের দিকে এগোতে গিয়ে বলল “আই ওয়ান্ট টু পি। হোয়ার ইজ দ্য টয়লেট?”

“বিসাইড দ্য বেডরুম”

স্ক্যণ্টিলি ক্ল্যাড নন্দিনী বেডরুমের কুইন সাইজ বেডের ওপর নিজেকে বিছিয়ে বলল “ওন্ট ইউ মেক লাভ টু মি?”

প্রথম ক্লায়েন্ট। প্রথম ডেট। প্রথম অভিজ্ঞতা। নতুন পথের দিকে নতুন রং দিয়ে আঁকতে চাইছে ফেলে আসা, মুছে ফেলা ক্যানভাসটাকে। শূন্য ক্যানভাসে আঁকতে চাইছে আর এক না-আঁকা ছবি। নিজের না-দেখা চিত্রমালা। যে ছবি শুধু সে-ই চেনে, আর কেউ নয়। এটাও জীবনের আরেকটা দিক। তার নারী সত্ত্বার আরেকটা স্বতন্ত্র চিত্রপট।

নেক্সট কল। আবার নতুন খেলা। আবার নতুন বেশে সাজা। ঠিক ক্যালিডিওস্কপের মতো নিজের নিত্য পরিবর্তনটা মন্দ লাগছে না। তার সঙ্গে বিভিন্ন পুরুষকে নতুন নতুন আঙ্গিকে দেখা। এজেন্সির ওয়েবসাইটে রেটিং লিস্টে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে নন্দিনী। পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ থেকে লাখ ছাড়িয়ে দু-লাখের দিকে। এর মধ্যে কিছু ফিক্সড ক্লায়েন্টও তৈরি হয়েছে। যেমন বিশ্বনাথ।

ইন্দ্রনীলের সঙ্গে যে সেক্সটা ছিল প্রাণের, আজ যেন সেই প্রাণটাই নেই। হায় রে বাৎস্যায়ন! এত ভঙ্গি এঁকেও মনের ছবিটা আঁকতে পারলি না। তবে কী শেখালি আপামর পুরুষ-নারীকে?

বিশ্বনাথের মৃত্যুর পরে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল নন্দিনী। এজেন্সির মালিক জ্যোতিকিরণ তাকে ফোনে আশ্বস্ত করেছিল "ডোন্ট ইউ ওয়াড়ই। উই উইল হ্যন্ডল ইট প্রফেশনালি সো দ্যট ইওর ইমেজ ইজ নট টারনিসড"

"আই নো" নন্দিনী বলল "বাট আই অ্যাম ওয়ারিড অফ দ্য পুলিস ইনভেস্টিগেশন"

গম্ভীর জ্যোতিকিরণ "আইল সি টু দ্যট, পুলিস উইল নট বদার ইউ"

জ্যোতিকিরণ সে ক্ষমতা রাখে। বিশ্বনাথের মৃত্যু থেকে নয় রক্ষে পাওয়া গেল, কিন্তু নিজের কাছ থেকে পালাবে কী করে? একটা দ্বন্দ্বে দোলায় যখন দুলছে, ঠিক সেই সময় এক বাংলাদেশি ক্লায়েন্টের মুখোমুখি হল।

এরশাদ সাহেব।

পঞ্চাশের ওপরে বয়েস। কাঁচা পাকা জুলফি। ডিকেনসন হোটেলের রয়াল অর্কিড সেন্ট্রাল। সাড়ে পাঁচ ফুট। ছোটখাট মানুষটা যখন নন্দিনীকে দরজা খুলে দিল, পরনে সিল্কের লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। গুগল সার্চ করে ওর সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেনি। তবুও তো বাঙালি। তার এই ব্যঙ্গালুরুর জীবনে এর আগে কখনও বাঙালি ক্লায়েন্ট পায়নি। এই প্রথম। তাই স্বভাবিকভাবে একটা কৌতূহল ছিল। অনেকদিন পর বাংলায় কথা বলা যাবে।

একটু চড়া হলুদ রং-এর বডি হাগিং সালোয়ার কামিজ। বাংলাদেশিরা একটু চড়া রং পছন্দ করে। প্রথমে ভেবেছিল ঢাকাই শাড়ি। ওয়ার্ডরোব থেকে বারও করেছিল। পরতে যাবে, হঠাৎ মনে হল, এ কী! এসকরট রাতে সহবাস করতে যাবে ঢাকাই শাড়ি পরে! কথাটা মনে হতেই পাগলামো দেখে নিজের মনেই হেসে ফেলেছিল। হলুদ সালোয়ারের মধ্যেও যেন অনাড়ম্বরের আড়ম্বর। বেশী প্রসাধন নেই। নন্দিনী তার সৌন্দর্যের মাধুর্যে স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। এই অন্ধকার জীবনে সে যেন অজানা নক্ষত্রের আলোকের দীপশিখা। যা পরশ পাথরের মতো দিয়া হয়ে টিমটিম করে জ্বলছে কোন এক অজ্ঞাত আকাশে।

"আসো। তোমার অপেক্ষাতেই সিলাম। এই লাইনে তো বাঙালি বড় একটা দেখি নাই। তোমার প্রোফাইল দেইখ্যা তাই পসন্দ হইল"

স্যুটের সোফায় নন্দিনী বসতেই এরশাদ সাহেব ব্যস্ত "নাস্তা করতে হইব তো। কী অর্ডার দিমু?"

"আপনার যা খুশি"

"সন্ধ্যাবেলা আমার আবার হুইস্কি সারা চলে না। তুমি হুইস্কি খাও তো?"

মাথা নাড়ল নন্দিনী।

"সঙ্গে একটু মাছভাজা কই?"

"আপনার যা ভাল লাগে"

এরশাদ মুখোমুখি বসে বলল "আমি বাংলাদ্যশের একটা টিভি চ্যনেলের মালিক। ব্যঙ্গালুরুতে সে কাজেই আইসি। একা একা সারা সন্ধ্যা কাটামু। তাই ভাবলাম তোমারে ডাইক্কা লই কথা কওনের লাইগ্যা। তুমি যা ভাইব্যা আইস ওসব কিসু নয়। মন খুইল্যা একটু বাংলায় কথা কইমু, এই আর কী"

আশ্বস্ত নন্দিনী। অন্তত আজকের দিনটা পোশাক ছাড়াই কোনো বিকৃত শখ মেটাতে হবে না। সব কিছুতে যেমন বিশ্রাম লাগে, তারও তো বিশ্রামের প্রয়োজন। আজ তার দেহের ছুটি। ছুটির দিনেও দু-লাখ। এক-লাখ এজেন্সিকে কমিশন দিলে হাতে রইল এক। শুধু কথা বলার জন্য এক-লাখ কে দেয়?

"এ সারা আর তোমার শখ কী কী?"

"এক সময় ক্লাসিক্যল গান শিখেছিলাম। নাচটা সেরকমভাবে শেখা হয়ে ওঠেনি। যদিও কয়েকটা প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পেয়েছি। এখন শখ বলতে একটাই, ছবি আঁকা" এয়ার কন্ডিশনরে একটু শীত। ওড়নাটা মাথায় জড়িয়ে বলল।

"সবি? কী সবি আঁক?"

"যা ভাল লাগে তাই"

"এই কাজ করতে মন চায়?"

প্রশ্নটা যে কোনো একদিন আসবে নন্দিনী জানত। এরশাদের মুখে প্রশ্নটা শুনে এই কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটাকে ভাল লাগতে শুরু করেছে। কোথায় যেন একটা পিতৃসুলভ আচরণ।

বাবাকে মনে পড়ছে। কত সুন্দরই না ছিল কাকুলিয়া রোডের ছোটবেলার দিনগুলো। না চাইতেই জীবনের ক্যসিনো হঠাৎই চাকতিটা ঘুরিয়ে দিল। যত টাকাই রোজগার করুক না কেন, দিনের শেষে মন যেন সেই স্বাভাবিক স্বচ্ছ সুন্দর জীবনটাই খুঁজে বেড়ায়। বুঝতে পারছে এরশাদ সেই জায়গাটাই নাড়া দিয়ে গেছে।

এরশাদের চোখে চোখ রেখে বলল "কে আর চায়?"

"তবে ক্যন?"

"বেঁচে থাকার জন্য তো টাকার প্রয়োজন"

ততক্ষণে মাছভাজায় কামড় দিয়ে এরশাদ হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বলল "হুইস্কি খাও?"

"এমনি খাই না। তবে ক্লায়েন্টের সঙ্গে থাকলে একটু-আধটু তো খেতেই হয়..."

হুইস্কির গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল "আজ আমার লইগ্যা একটু খাইয়া লও। পরানটা একটু জুড়াইয়া লও"

যদি হুইস্কি খেয়ে প্রাণটা জুড়াত! কেউ কী কখনও হুইস্কি খেয়ে নিজের থেকে পালাতে পারে? নন্দিনীর জানা নেই। তবুও অনেকেই দেবদাস হতে চায় নিজের থেকে পালিয়ে বেড়াতে।

হুইস্কিতে চুমুক, ভাজা মাছে কামড় দিয়ে নন্দিনী বলল "এভাবে কী ভোলা যায়?"

"ঠিক কইস। এভাবে ভোলা যায় না"

নন্দিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে ভীষণ করুণা হল। মনে হল কক্সবাজারে তার মেয়ের কথা। মনে মনে মেয়েকে মিস করছিল। তাই কী নন্দিনীকে ডেকে আনা? এরশাদ একটু আনমনা হয়ে নন্দিনীর থেকে চোখ সরিয়ে জানলার বাইরে আলোকিত শহরটার দিকে তাকিয়ে উদাস।

মায়াবী শহরটার রাতের আলোগুলো কোনো স্বপ্নের পসরা সাজাচ্ছে না। রূঢ় বাস্তবটাকে যেন আরও বেশি করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। সেটা মধ্যরাতের নেশায় বুঁদ হওয়া কোনো ইলিউশন নয়। বাস্তবটা সাবিনার সুখের কুশনে শুয়ে কক্সবাজারের এসির নিশ্চিন্ত আশ্রয় নয়। সামনে, তার চেয়ে কিছু বড় মেয়েটির চোখে যেন সে হঠাৎ সাবিনাকেই দেখতে পাচ্ছে। নন্দিনীর কাজল কালো গভীর দৃষ্টির মধ্যে কোনো উষ্ণ মাদকতা নেই, বরং স্নিগ্ধ চোখদুটো যেন কিছু বলতে গিয়েও অব্যক্ত, চিত্রবৎ।

"আমার লগে কাম করবা?"

হকচকিয়ে গেল নন্দিনী। এভাবে প্রশ্নটা আসবে ভাবতেই পারেনি। এরশাদের গ্লাসের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই চোখের দিকে। বেশি খেয়ে ফেলেনি তো? আগেও দেখেছে হুইস্কির নেশা মাথায় চাপলে প্রত্যেকেই বেশ উদার হয়ে যায়। পরের দিন নেশা নামতে ভুলেই যায় আগের দিন কী বলেছে।

নন্দিনী তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না বুঝতে পেরেই আবার প্রশ্ন "আমার লগে কাম করবা?"

এবার বোঝা গেল লোকটা নেশার ঘোরে নেই। সত্যি সত্যি কিছু বলতে চাইছে। শিওর হওয়ার জন্য প্রশ্ন করল "মানে?"

"আমার চ্যানেলে একজন আর্ট ডিরেক্টরের প্রয়োজন। তুমি কইলা না সবি আঁকা তোমার নেশা? আমার চ্যানেলে আর্ট ডিরেক্টরের কাম করবা? এই কামে টাকা সারা ভবিষ্যৎ নাই। আমার লগে কাম কইরলে একটা নতুন জীবন নিয়া বাঁচতে পারবা"

এভাবে জীবনের ক্যাসিনোর চাকতিটা হুট করে ঘুরবে ভাবতেও পারেনি। কয়েক মুহূর্ত। কে যেন ভেতর থেকে বলল, যা সামনে আসে সেটাই আগামী দিন। চলার পথে সে ছবিটাই আঁকতে হবে। সে যে ছবি আঁকতে চায়, জীবন তাকে সে ছবি আঁকতে দেবে না। চেষ্টা করেও, বারবার ক্যানভাসে রং ছড়িয়েও, ছবিটা

শেষ করতে পারছে না। হয়ত কোনোদিন ক্যানভাসটা পূর্ণ হবে, জীবন থেকে কুড়িয়ে নেওয়া হাজার রঙে। আপাতত ক্যানভাসের ছবির কথা না ভেবে রং সংগ্রহ করা যাক।

"বাংলাদেশে?"

"ঢাকায়। ওই খানেই তো আমার ঘর। কিসসু চিন্তা কইর না। ভিসা, থাকার জায়গা সব আমাগো কম্পানি বন্দোবস্ত কইরা দিব। যাইবা কি না কও?"

কে যেন ভেতর থেকে বলল 'লুফে নে... জীবন তোকে রং-এর ভেলকি দেখাচ্ছে। দেখে নে। দেখতে দেখতে দেখবি কোনোদিন জীবনের পথে রং কুড়তে কুড়তে আসল রংটা খুঁজে পেয়ে যাবি। রামধনুর সাতটা রং মিশিয়ে আরও কত রং তৈরি করা যায়! হয়তসব রং মিলিয়ে, একদিন শেষে ক্যানভাসে ছবিটা এঁকেই ফেলতে পারবি'

সত্যিই তো। এই কী আলোর জীবন? টাকা রোজগার করলেও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, সে এক গভীর খাদের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। যেখানে প্রাণ আছে, মান নেই; সুখ আছে, শান্তি নেই; প্রাচুর্য আছে অথচ ভোগের অবকাশ নেই। এ জীবন তার হতেই পারে না। হয়ত একটা মাত্র রং দিয়ে আঁকা ছবি। কিন্তু এ ছবি তো তার নয়! তার ছবি তো সপ্ত রং-এ তুলির স্পর্শে ফুটে উঠবে নানা বর্ণে। সব বর্ণই যে রঙিন হবে, এমন নয়। ধূসরও হতে পারে। কঠোর ধূসর মায়াজাল। কঠোরতার সঙ্গে আগেও দেখা হয়েছে। আবার নয় কঠোরে কোমলে আরেকটা গ্যম্বলিং ডেনে গিয়ে ক্যাসিনোর কোনায় বসে চাকতি ঘোরাবে। রাতে বিবস্ত্র হয়ে মাতালদের অতৃপ্ত খিদের কাছে তো অহরহ নিজেকে সঁপে দিতে হবে না!

সারা জীবন ধরে হারের খেলাই তো খেলে গেছে। যখনই জেতার বাজি ধরেছে, তখনই হার পিছনে তাড়া করেছে। জীবন যে গোলাপের, মখমলের বিছানা নয়, সেটা বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর-ই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু সারাটা জীবন কাঁটার মালা পরে বাঁচতে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই? স্বপ্ন যখন মরীচিকা – এই বিশাল মরুভূমির মধ্যে একটুকরো জলের খোঁজ করতে বাধা কোথায়? স্বপ্ন যেন তার দেশের যাদুকাঠিটা বুলিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে মায়াবী এক রোশনাইতে। ছোট্ট হাতটা বাড়িয়ে বসে আছে তারার দিকে চেয়ে, কবে আবার আলো জ্বালাবে অন্ধকারের বুকে? কবে তারাগুলো নেমে আসবে মাটিতে? কবে চুমু খেয়ে আদর করে বুকে তুলে নেবে মায়ের মতো ছোটবেলার ঘুমপাড়ানি গানে?

সেই মরীচিকাকে পাথেয় করে, আজও এগিয়ে চলেছে তারার স্বপ্নের কল্পনায়...

যে কল্পনা প্রতিটা মানুষকে ঘিরে জল্পনা দেখায়, সেই অমলিন শান্তির দূত হয়ে চাওয়াটা হাতছানি দিচ্ছে মহাবিশ্বের তাপহীন আকাশে। একটা অখণ্ড পাওয়ার স্বপ্নের নির্মল স্রোতে। ক্লেদাক্ত, বিষাক্ত দেহটাকে

পেছনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে – যেখানে অনাবিল অন্ধকারের মধ্যেও আলোর ফ্লাড লাইটে ভরে যায় অস্তিত্বের প্রতিটা কণা।

সেই স্বর্গটাকে খোঁজবার সময় হয়েছে...

“যাব। তবে একবার জ্যোতিকিরণের সঙ্গে কথা বলতে হবে”

চার

এ এক অন্য জগৎ।

ব্যঙ্গালুরুর হাই প্রোফাইল ক্লায়েন্টদের সঙ্গে স্টার হোটেলে সন্ধে কাটানোর থেকে ঢাকার ধানমুন্ডির এরশাদ সাহেবের দেওয়া ফারনিসড ফ্ল্যাট। ছিমছাম দু কামরার নিজের একাকী আশ্রয়। জানলা দিয়ে তাকালেই সামনে ধানমুন্ডি লেকের মনোরম দৃশ্য। রাতে জেগে থাকতে হয় না, নিজের বিছানায় নরম বালিশে নিশ্চিন্ত রিট্রিট। সারাদিনে আর বাড়ি থাকে কোথায়? নয় চ্যনেলের স্যুট নিয়ে ব্যস্ত, নয় আউটডোরে বেরিয়ে যেতে হয় কোনো স্টোরি করার জন্য। অনেক সময় বেশ কয়েকদিনের জন্য। তখন তালাবন্ধ পড়ে থাকে শূন্য ফ্ল্যাটটা।

"সব ঠিকঠাক আসে তো? আমাগো বাংলাদ্যশের লগে একটু মানাইয়া লইতে হইব। আমারে সব সময় পাইবা না। কোনো দরকার হইলে জেনারেল ম্যনেজাররে কইয়া দিও। আমি তো ফোনে সব সময় আসি"

নতুন সহকর্মী। নতুন পরিবেশ। মানিয়ে নিতে একটু সময় লেগেছিল। নতুন কাজ শিখতে বুঝতে হুড়হুড় করে একটা মাস পার হয়ে গেল। তেমন করে নিজের জন্য সময় পেল না নন্দিনী।

ছাড়পত্র চাইতে গেলে জ্যোতিকিরণ বলেছিল "হোয়ারেভার ইউ গো, ইউ ওনট গেট মানি অ্যাজ ইট ইজ হিয়ার"

"বাট আই অ্যাম লুকিং ফর এ ডিফারেন্ট ওয়ে অফ লিভিং..." তখনও বুঝতে পারছিল না, জ্যোতিকিরণ তাকে ছাড়বে কি না।

"ফাইন। হোয়াটেভার মেকস ইউ হ্যপি। ইউ কেম হিয়ার অ্যাট ইওর ওন উইল। ইউ ক্যন লিভ অ্যাট ইওর ওন উইল। ইফ এভার ইউ ওয়াণ্ট টু কাম ব্যাক টু দিস অরগ্যনাইজেশন, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু ডু সো"

কোনো ফেয়ারওয়েল পার্টি হয়নি। কেউ নন্দিনীর অনুপস্থিতির জন্য দু-কথা বলেনি। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমন নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে। বন্ধনহীন জীবনের এটাই বৈশিষ্ট। থেকেও যেন কোথাও সে নেই। হয়ত বন্ধন একটা মায়া ছড়ায়। সেই মায়াটাই যে অনেক সময় এগিয়ে যাওয়ার পরিপন্থী। এই মায়ার মায়ায় ক'জন পারে বন্ধন ছিন্ন করে নতুন পথে পাড়ি দিতে? যতক্ষণ না মৃত্যু এই বন্ধন থেকে চিরমুক্তি দেয়?

সাহিনা, রোশেনারা, জাহানারা-রা কাজের বাইরে ভাব জমাতে চাইলেও, নন্দিনী সব সময়ই নিজেকে একটু আলাদা করে রেখেছে। মেয়েদের বড্ড কৌতূহল। বিশেষ করে অন্যদের জীবন নিয়ে। কিছুটা সেই

কৌতূহল থেকে দূরে সরে থাকার জন্যই। অতীত নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে চায়নি। পুরনো ক্যানভাসটা মুছে ফেলেছে। সেই অস্পষ্ট অপূর্ণ ছবিটা আর আঁকবার ইচ্ছে নেই।

অফিসে বসে আগামী স্যুটের সেটস-এর যখন পরিকল্পনা করছিল, হঠাৎ ফেরদৌস ঘরে ঢুকে বলল ‘‘একটু ডিস্টার্ব করলাম’’

চোখ তুলে নন্দিনী ফেরদৌসকে দেখল। নীল রং-এর জিনস, সাদা শার্ট পরা ছেলেটা তো খুব খারাপ দেখতে নয়। নন্দিনীর থেকে বয়সে একটু ছোটই হবে। ফর্সা মুখের ওপর চাপা দাড়ি, বাবরি চুল, মোটা গোঁফ। কমবয়সি চে গুয়েভেরাকে মনে করিয়ে দেয়। তাকাতেই ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নন্দিনীর চোখ দুটো থেমে গেল। আহামরি কিছু দেখতে নয়। তবুও চোখের স্থির চাহনির মধ্যে কোথায় যেন একটা ম্যাগ্নেটিক অ্যাট্রাকশন আছে, যা আগে চোখে পড়েনি। কাজের ফাঁকে এক-আধবার দেখা হলেও তেমনভাবে আলাপ হয়নি। কিংবা সুযোগ হয়নি। অনেক লোকের মধ্যে চোখে পড়ার কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না।

“ঠিক আছে। বলো”

“আমার ডিরেক্টর সামিমুল সাহেব আমাকে একটা লোকাল কভারেজের কয়েকটা সিকোয়েন্স সাজাতে বলেছে। কিন্তু আমার স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী বাইরে আরও কয়েকটা সটস লাগবে। বাজেটের দিক দিয়ে তা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ ওই সেটগুলো না থাকলে সিকোয়েন্সটা ইনকমপ্লিট হবে। আমায় একটু সাহায্য করতে পারবে?”

“এখন আমি ব্যস্ত আছি। তুমি যদি অফিসের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারো, চেষ্টা করে দেখতে পারি”

“ঠিক আছে। ক’টা নাগাদ?”

“আটটা তো বাজবেই। কাল সকাল থেকে স্যুট হবে। আজকের মধ্যে পুরো স্কিমটা সাজিয়ে দিয়ে যেতে হবে”

“বেশ। আমি আটটায় এখানে চলে আসব”

সেই প্রথম ফেরদৌসের সঙ্গে কাজের সূত্রে সামনাসামনি। রাত হয়েছে। বেশি রাত করলে আফিসের গাড়িটাও মিস হয়ে যাবে। একলা রাতে এই শহরে পাবলিক ট্র্যান্সপোর্টে যেতে নন্দিনীর একটু ভয় ভয় করে। তাই ফেরদৌসের দিকে চেয়ে বলল ‘‘স্ক্রিপ্টটা শুনে একটু ভাবতে হবে। এত রাত হয়ে গেছে। তার থেকে চল আমার বাড়িতে। সেখানে বসেই শুনব’’

ফেরদৌসের সিকোয়েন্স শোনার জন্য এরশাদ সাহেব তাকে মাইনে দেয় না। তাই ফেভারটুকু কাজের সময়ের বাইরেই করতে হবে। নন্দিনী যে সময় দিয়ে শুনবে তাতেই উৎফুল্ল ফেরদৌস ‘‘তাহলে দিদি

আজকের ডিনারটা আমি খাওয়াব। যাওয়ার পথে টেক অ্যাওয়ে নিয়ে নিচ্ছি''

ফেরদৌসকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে, টুক করে স্নানটা সেরে নিল। সারাদিনের প্যাচপ্যাচে গরমে স্নান না করলে সোয়াস্তি নেই। স্নান সেরে, একটা কাফতান পরে, হুইস্কি হাতে কর্নার ল্যাম্পের পাশে বসে বলল ''একটু খাবে? তোমরা তো মুসলমান!''

"হলে মন্দ হয় না। ড্রিঙ্কসের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই"

মন দিয়ে ফেরদৌসের সিকোয়েন্স শুনল। তারপর কাগজ কলম নিয়ে সেটের স্ট্রাকচার আঁকতে আঁকতে বলল ''হয়ে যাবে। মন দিয়ে সেটসগুলো দেখ। সাজিয়ে দেওয়া যাবে''

ফেরদৌস লক্ষ করছিল নন্দিনীর মধ্যে একটা অসম্ভব সৃজনশীলতা। যা আছে তাকে একত্র করে সাজাতে জানে, প্রায় শূন্য থেকে পূর্ণতায়। একটা বেসিক কাঠামো থেকে সবাই তো কিছু করে দিতে পারে। কিন্তু শূন্য থেকে পূর্ণতার ছবি ক'জন আঁকতে পারে?

যা অন্যে পারে না, নন্দিনী তা পারে।

"তুমি তো দারুণ ক্রিয়েটিভ দিদি। তোমার মতো যদি ক্রিয়েটিভিটি আমার থাকত। এখন তো এই চাকরির জাঁতাকলে ঢুকে নিজের কিছুই করতে পারি না। ওরা যা বলে নিজের বিচার বিবেচনাকে বাইরে রেখে করে দিই। প্রশ্ন করলে চটে যায়, বলে বাচাল, বেশি কথা বলে। তাই আর প্রশ্ন করি না। কথায় আছে না, বোবার শত্রু নেই"

বেশ লাগছে ছেলেটিকে। ওর মধ্যে একটা সহজ ছেলেমানুষি সরলতা আছে। একটা পঙ্কিল দুনিয়ার গোলকধাঁধায় লাট্টুর মতো চক্কর খেতে খেতে, এখন আর কঠিন হিসেবি লোকদের ভাল লাগে না। সরলতাই বেশি করে আকর্ষণ করে। ফেরদৌস ম্যচিওরিটির মধ্যে, সেই ছেলেমানুষিটাকেই আগলে রেখেছে।

ভাল লাগতে শুরু করেছে ফেরদৌসকে।

সেদিন ডিনার খেয়ে এবং খাইয়ে ফিরেছিল ফেরদৌস। তারপর কিছুটা নন্দিনীর প্রশ্রয়, কিছুটা নিজের আকর্ষণে, ওরা যেন পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসছিল। ডিনার খাওয়া থেকে সিনেমা যাওয়া থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্ভেজাল আড্ডা, ঢাকার একাকী জীবনে নন্দিনী একটা সাথি খুঁজে পেয়েছিল। ফেরদৌস কিন্তু নন্দিনীর অতীত নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেনি। ভবিষ্যৎ নিয়েও কোনো স্বপ্ন দেখেনি। শুধু বর্তমানটাকেই আঁকড়ে অবসরটুকুকে আস্বাদন করতে চাইছিল।

নন্দিনীর মনে হল এই অতীতের দিকে না তাকিয়ে, ভবিষ্যতের কথা না ভাবার মধ্যে অনেক শান্তি আছে।

কী বোকাই না ছিল কম বয়সে! ইন্দ্রনীলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখত। সেই স্বপ্নের তুলি দিয়ে ক্যানভাসে ছবি আকার চেষ্টা করত। স্বপ্নের তুলি দিয়ে যেই না রংটা ছবিতে লাগিয়েছে, ওমনি কোথা থেকে একটা ঝড়ের দাপটে ছবিটা মুছে গেল। আবার ছবি আঁকার চেষ্টা করল আরেকটা রং দিয়ে, সেটাও মুছে গেল।

এখন আর ছবি আঁকার কথা ভাবে না। খালি পরে থাক ক্যানভাস। এখন শুধুই রং মিশিয়ে যাওয়ার পালা। সাতটা থেকে চৌদ্দ থেকে আঠাশ থেকে এক হাজার আঠাশ। বাইনারি আকারে বাড়ুক রং-এর সংমিশ্রণ। তারপর নয় ছবি আঁকা যাবে।

কিন্তু উত্তাল যৌবন কী আগামীর স্বপ্নে বসে থাকার মতো স্থির? রাতের অস্থির দেহটা স্যাম্পেনের কর্ক খোলার মতো ভাসিয়ে দিতে চায় বোতলবন্দি তরলটাকে বহুদিনের জমে ওঠা খরস্রোতে। দিনের পর দিন, একাকী নিভৃতে মাঝরাতের পুঞ্জিভূত দেহের প্লাবিত মূর্ছনায়। সেখানে কোনো স্বপ্ন নেই। আছে শুধু মুহূর্তটুকু। তাকে অস্বীকার করে কী করে? মুক্তি চাই! নিজের ভেতরে জমে ওঠা মেঘের বর্ষণ চাই, ছাপিয়ে পড়া বাঁধভাঙা প্লাবনে।

তাই, সেদিন যখন ফেরদৌস বেরিয়ে যাচ্ছিল, নন্দিনী নিজেই বাধা দিয়েছিল। একটু হকচকিয়ে গেলেও আশ্চর্য হয়নি ফেরদৌস। কত রাতে একলা বিছানায় নন্দিনীদির ছবিটা দেখেছে মনের ক্যানভাসে। সেই ছবি, তার একা ঘরে ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তারপর অন্ধকারের ক্যানভাসে, মনের স্বপ্নের ছবিটা সাজিয়ে, নিজেকে মুক্ত করেছে কামনার আগ্রাসী আক্রমণ থেকে। তবুও মুখ ফুটে কিংবা আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে পারেনি নন্দিনীদিকে নিয়ে জেগে থাকা মাঝরাতের ট্র্যাভিওলি ফাউন্টেনের স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা।

তাই যখন নন্দিনীদি বলল ‘‘যেতেই হবে?’’

“তুমি বললে যাব না”

হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল শোবার ঘরে। কোনো ভণিতা না করেই নিজের সুতিহীন দেহটাকে তুলে দিয়েছিল ফেরদৌসের হাতে। সেখানে ফেরদৌস তার থেকে ছোট নয়। নন্দিনীও বড় নয়। ফেরদৌস পুরুষ, নন্দিনী নারী। সঙ্গমের মধ্যেই দুজনের পূর্ণতা। পুরুষের দৃপ্ত পৌরুষের স্বাদ নন্দিনীদিকে দিয়ে, ফেরদৌস বুঝিয়ে দিয়েছিল কাজের ক্ষেত্রে সে জুনিয়র হতে পারে, নন্দিনীদিকে তার একাকী চাওয়ার পরিপূর্ণতায় পৌছতে সে কিছু কম নয়!

ফেরদৌসের মনে হয়েছিল তার এতদিনের আকাঙ্ক্ষাটা যেন, শেষমেশ একটা ছবি হয়ে ভেসে উঠল, তার স্বপ্নে দেখা, না-আঁকা ক্যানভাসে। নন্দিনীদির উষ্ণতাকে ভরা বর্ষার প্লাবনে নিরাসক্ত করেছিল শ্রাবণ ধারার ভরা বর্ষণে। সেই আচমকা বর্ষার প্লাবনের জোয়ারের মাধুর্যটা, নিজের মতো করে উপভোগ করেছিল

নন্দিনী ধানমুন্ডির ফ্ল্যাটে বসে। নিজের আপাত পূর্ণতার মধ্যে। ব্যাঙ্গালুরুর লাখ টাকার ঝলসানির থেকে অনেক অনেক অনেক বেশি মধুর। তার অতৃপ্ত নারীত্বের এক ঝলক পূর্ণতা।

তার জাগতিক কায়ার বিশুদ্ধ দেবী বন্দনা। সেটাও তো কোনো প্রথাগত অনুষ্ঠানের মতো আরাধনা। নিভৃতে। হলেই বা। আরাধনা যে সব সময় একটা বিগ্রহকে করতে হবে, কে বলেছে?

তখন কী আর জানত, এই নিভৃত আরাধনা যে একদিন বিভীষিকা হয়ে মুখে থাপ্পড় মেরে মুছে ফেলবে তার রঙানো ক্যানভাস। তখন ধূসর জীবনের ক্যানভাসে, আরেকটা ছবি আবার নতুন করে আঁকতে হবে, নতুন চিত্রপটে।

পাঁচ

আশ্চর্য হয়ে দেখছিল নন্দিনী। শুধু প্রাচীন ভাস্কর্য নয়, এ এক অন্য অভিজ্ঞতা।

রেজ্জাক যেদিন ফোন করে বলেছিল 'নেক্সট মাসে আমাদের কামবোডিয়া ট্রিপের কথা মনে আছে?' সেদিন অতটা গুরুত্ব দেয়েনি ওকে। রেজ্জাক মাসখানেক আগে থেকেই ভাবতে শুরু করেছিল। সারাদিনের ক্লান্তির পর, মাসখানেক পরের একটা ডকুমেন্টারি নিয়ে ভাবার একটুও ইচ্ছে ছিল না নন্দিনীর। এখানে দাঁড়িয়ে এখন বুঝতে পারছে, রেজ্জাক কেন এতদিন আগে থেকে প্ল্যান করছিল।

রেজ্জাক বলল ''আগে জায়গাটা ঘুরে দেখে নেওয়া যাক। একটা প্ল্যান করে এসেছি। তবে সেটা তো নেট-এর ডাটার ওপর। আসলে জায়গাটায় না এলে রিয়েলিটিটা বোঝা যায় না''

"আমিও গুগল সার্চ করে করে কিছুটা জানার চেষ্টা করেছি"

"রিসেন্টলি কোনো একটা নিউসে পড়লাম নোয়েল হিডালগো ট্যন বলে একজন অস্ট্রেলিয়ান রিসারচার আরকিওলজিক্যাল এক্সকাভেশন করতে গিয়ে এই এংকোরওয়াট মন্দিরের আরও অনেক পুরনো পেন্টিং পেয়েছে। এগুলো নাকি ৫০০ বছরেরও বেশি পুরনো। প্রব্যবলি সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরির, যখন বৈষ্ণবাইট হিন্দু থেকে থেরাভাইট বুদ্ধিজমে কনভারটেড হয়েছে এই মন্দিরটা"

"কীসের পেন্টিং?" শুনেই উৎসাহিত নন্দিনী। তার ভেতরের আর্টিস্টটা এখনও মরে যায়নি।

চাকরির জন্য ডকুমেন্টারি করা এক জিনিস, আর যদি তা নিজের ইন্টারেস্টের সঙ্গে মিলে যায়, তবে যেন উৎসাহটা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। নন্দিনী পুজো-আচ্চা কোনোদিনই করেনি। ধর্ম কিংবা মন্দির সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহও তার নেই।

"সবই আছে। জন্তুজানোয়ার, দেবদেবী, নৌকো, এই মন্দিরের ভাস্কর্য - সব। এই এংকোরওয়াট মন্দির তৈরি হয়েছিল খামার রাজত্বে, সম্ভবত টুয়েলফথ সেঞ্চুরিতে। এই পেন্টিংগুলো সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরির হবে। নেটে যেটুকু পড়েছি রাজা এং চ্যন বুদ্ধিজমে রেস্টরেশন করার সময় এগুলো হয়ত আঁকিয়েছিলেন। সেগুলোর ডিজট্যল ইম্প্রিন্ট-এর ছবি যদি কোনোভাবে তোলা যেত... ডকুমেন্টারিটাকে অন্য এক মাত্রায় নিয়ে যাওয়া যেত" রেজ্জাক তার স্টিল ক্যামেরাটার লেন্সটা পরিষ্কার করতে করতে বলল।

কত কিছুই না দেখার আছে এ পৃথিবীতে। প্রত্যেকটা দৃশ্য যেন একটা জীবন্ত ছবি। নন্দিনীর দুঃখ হল। আহা! আগে যদি জানত। সঙ্গে করে ক্যানভাস তুলি নিয়ে আসতে পারত। কাজের জন্য হুট করে ব্যাগ প্যাক করে বেরিয়ে পরেছে। মন থেকে ছবি আঁকা আর প্রত্যক্ষ দর্শনে ছবি আঁকার মধ্যে অনেক তফাত।

কী আর করা যাবে! ঘুরে ঘুরে ৯০০ বছরের প্রাচীন সভ্যতা দেখতে লাগল।

পড়েছিল ইউনেস্কো এটাকে হেরিটেজ সাইট হিসেবে ডিক্লেয়ার করেছে। সুপ্রাচীন এই হিন্দু মন্দিরটা এংকোরওয়াটের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে নন্দিনী এগিয়ে চলেছিল মুল মন্দিরটার দিকে। হঠাৎ মনে হল, একজন গাইড নিলে তো ভাল হয়। রেজ্জাককে বলতে গিয়ে ফিরে দেখল রেজ্জাক নেই। কোথায় গেল? মরুক-গে। নিজেই একজন গাইড খুঁজে বার করল। শুধু নিজের জানার জন্য নয়। ডকুমেন্টারি করতে গেলে শুধু গুগল সার্চ যথেষ্ট নয়। গাইডের ভার্সনটাও জানা দরকার।

গাইড যেন গুগলের বাইরে নিয়ে গেছে নন্দিনীকে।

স্পষ্ট ইংরেজিতে নরেন্দ্র পং বলে চলেছে "ইউ মাইট বি আওয়ার দ্যট দিস টেম্পল ওয়াজ বিল্ট ডিওরিং দ্য রেন অফ সূর্যভরনাম ২ এন্ড লেইটার ফারদার কন্সট্রাকশন বাই উদাদিত্তভরনম অ্যারাউন্ড ১১১৩ টু ১১৫০। বাট দ্য হিস্টরি ডেটেস ব্যাক ফারদার টু ২০০ এ ডি, হোয়েন ইন্ডিয়ান ব্র্যাহ্মিন ট্রেডারস এস্ট্যাব্লিশড দ্য টাউন অ্যাস কিংডম অফ ফুনান। ডেডিকেটেড টু লর্ড বিষ্ণু, দিস ওয়াজ দ্য স্টেট টেম্পল অরিজিনালি কলড 'বরাহ বিষ্ণুলোক'। ২৭ ইয়ার্স লেইটার সূর্যভরনাম টু ওয়াজ স্যাকড বাই চামস, দ্য ট্র্যাডিশনল এনিমি অফ খামার্স ইন ১১৭৭ অ্যান্ড জয়ভরনাম সেভেন রেস্টরড ইট। দ্য আউটার ওয়াল এনক্লোজেস এন এরিয়া অফ ২০৩ একরস। ফ্রম দ্য আউটার গ্যলারি হোয়ার উই আর নাউ, উই উইল প্রসিড টু দ্য ইনার গ্যলারি"

নরেন্দ্র পং-এর সব কথা যে মাথায় ঢুকছিল, তা নয়। ওকে নিজের মতো বলতে দিয়ে নন্দিনী আপন মনে মন্দিরের ভাস্কর্য দেখে চলেছে। মন চাইছে, ওই সদ্য আবিষ্কৃত ছবিগুলোকে দেখার। ডকুমেন্টারির জন্য না হলেও, নিজের ছোটবেলার ছবি আঁকার শখের জন্য তো বটেই। কে যেন তাকে ভেতর থেকে টানছে। হয়ত তার অন্তর্নিহিত শিল্পীসত্তা ফিরে যেতে চাইছে আজ থেকে ৫০০ বছর আগের পৃথিবীতে।

নরেন্দ্র পং তার স্বভাব-প্রফেশনল ভঙ্গিতে বলে চলেছে "দিস প্লেস ওয়াজ চোজেন বিকস অফ ইটস স্ট্র্যাটেজিক মিলিটারি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল পোটেনশিয়াল। দো সাম সে, দ্য এরেঞ্জমেন্ট অফ দ্য টেম্পলস রিসেম্বল্ড দ্য স্টারস ইন দ্য কন্সটেলেশন অফ ড্র্যাকো অ্যাট দ্য টাইম অফ স্প্রিং ইকুইনক্স ইন ১০,৫০০ বি সি, ইন অর্ডার টু হারমনাইজ দ্য আর্থ উইথ দ্য স্টারস, হুইচ ইউ উইল সি লেইটার ইন দ্য স্কাল্পচারস অফ ডেভাস অ্যান্ড অসুরাস"

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেও নরেন্দ্র পং-এর কথাগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং। ভাবতে আশ্চর্য লাগছে সেই যুগে নক্ষত্রদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোনো স্থাপত্য নির্মাণ-এর কনসেপ্টটা। যা অজানা, অচেনা, অদেখা। বোধহয় যুগ যুগ ধরে তাই মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। সেই অদেখা ছবিটা, যুগ থেকে যুগান্তরে, মানুষ আঁকতে চেয়েছে, তার মনের বিশ্বাসের রং দিয়ে। কখনও বা সুরে, কখনও বা সাহিত্যে, কখনও বা দর্শনে, কখনও

বা শিল্পকলার কারুকার্যের বিন্যাসে। অসম্পূর্ণতা থেকে না-চেনা সম্পূর্ণতার পথে। ইহলোক থেকে অজানা লোকের স্পর্শের আশায়। নক্ষত্রের মানচিত্রের মধ্যে যেন ঈশ্বরের আলোক রেখার রং আছে। হয়ত ক্যালিডিওস্কপের মতো, মুহূর্তে মুহূর্তে সে রং বদলায়। তবুও অতৃপ্ত জীবন খুঁজে বেরয় সেই না ছোঁয়ার স্পর্শ।

রোমান ফিলসফার দার্শনিক মারকাস অরেলিয়াস বলেছিলেন ফর দেয়ার ইজ ওয়ান ইউনিভার্স আউট অফ অল, ওয়ান গড থ্রু অল, ওয়ান সাবস্টেন্স অ্যান্ড ওয়ান ল্য, ওয়ান কমন রিজন অফ অল ইনটেলিজেন্ট ক্রিচার্স, এন্ড ওয়ান ট্রুথ

হয়ত এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে পূর্ণতার ক্যানভাসটা বারবার আঁকতে চেষ্টা করেছে মানুষ। তাই এই এংকোরওয়াট মন্দির। তাই এই ইতিহাস। তাই এই ডকুমেন্টরি।

"ম্যাডাম, আর ইউ ফলোয়িং মি?" নন্দিনীর অন্যমনস্কতা চোখ এড়ায়নি নরেন্দ্র পং-এর।

"ডেফিনিটলি। ইন ফ্যক্ট আই ওয়াজ ট্রায়িং টু ভিসুয়ালাইজ দেয়ার কনসেপ্ট ইন মাই ওউন ওয়ে"

খুশি হল নরেন্দ্র পং। এ জন্যেই এশিয়ানদের গাইড হতে ওর ভাল লাগে। ওরা দর্শনে চলে যেতে পারে, যা অ্যাংলো-স্যক্সনরা পারে না। অ্যাংলো-স্যক্সনরা টেম্পল-এর টেকনিক্যল ডিটেলস নিয়ে বেশি ইন্টারেস্টেড। আর এশিয়ানরা, টেম্পল ভুলে ওই ড্র্যাকো নক্ষত্র নিয়েই হয়ত হাজারটা প্রশ্ন করে ফেলবে। যেন দুটো পৃথিবীর যোগসূত্রটাই তাদের কাছে বেশি ইন্টারেস্টিং।

নন্দিনীর মনের ভাব বুঝতে পেরেই টেকনিক্যল ডিটেলসে না গিয়ে নরেন্দ্র পং বলতে লাগল ''দ্য মেগালম্যনিয়াক কিংস অফ দ্যট এরা ডিজাইন্ড দিস টেম্পল টু ওয়ারশিপ গডস। ইন অ্যালাইনমেণ্ট উইথ দ্য ড্র্যাকো স্টার, দে কন্সট্রাক্টেড দ্য থ্রি ডাইমেন্সনল ইয়ান্ত্রাস, হুইচ ওয়ার অ্যান এন্ডিভার টু অ্যালাইন হিউম্যনস উইথ দ্য ডিভাইন''

নন্দিনী যেন এই সুযোগটাই খুঁজছিল। মন্দিরের আরকিটেকচার সম্বন্ধে জানার ওর খুব বেশি আগ্রহ ছিল না। নরেন্দ্র পং-এর কথার রেশ টেনে বলল ''দ্যট ইজ প্রেসাইসলি হোয়াট আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড এবাউট''

একটু হাসল ছোটখাটো কাম্বডিয়ান নরেন্দ্র পং ''ইউ হ্যভ একোড দ্য ড্রিমস অফ জয়াভারম সেভেন ফুল অফ ডীপ সিম্প্যথি ফর দ্য গুড অফ ওয়ার্ল্ড, সো এস টু বেস্টও অন মেন দ্য এমব্রসিয়া অফ রেমেডিস টু উইন দেম ইমর্মট্যালিটি। বাই ভারচিউ অফ দিস গুড ওয়ার্কস উড দ্যট আই মাইট রেস্কিউ অল দোস হু আর স্ট্রাগলিং ইন দ্য ওসেন অফ এক্সিস্টেন্স''

"টেক মি টু দোস মিস্টিক করনারস অফ দ্য টেম্পল" নন্দিনী নরেন্দ্র পং-এর কথাটা টেনে নিয়ে বলল।

"সিওর আই উইল, অ্যাস ইউ প্রেফার"

দেওয়ালটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছিল নন্দিনী। শত পদ্মের কলির মধ্যে বিকশিত শিব।

আগে ঠিক বুঝতে পারেনি নন্দিনী। নরেন্দ্রর কথায়, পুরো মন্দিরটার মানচিত্র দেখে বুঝতে পারল, পদ্মের পল্লবের মতো ১০৮টা টাওয়ার দিয়ে তৈরি এই মন্দির কমপ্লেক্সটা। সেই প্রস্ফুটিত পদ্মের কেন্দ্রভাগে, মাউন্ট মেরুর মতো সেন্ট্রাল টাওয়ার হয়ে বিরাজ করছে, একমেবাদ্বিতীয়ম অধিপতি শিব। তাকে ঘিরে, টাওয়ারের দেওয়ালে রয়েছে ২০০০ ভঙ্গিমায় অপ্সরার প্রতিমূর্তি।

নরেন্দ্র বলে চলেছে আমাদের সুপ্রাচীন ইতিহাসের একাংশ - কবে তা হয়েছিল স্থলে, কবে হয়েছিল জলে, কবে হয়েছিল মহাব্যোমে। বত্রিশটি নরক আর সাঁইত্রিশটি স্বর্গের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে কবে 'সি অফ মিল্ক'-এর আবির্ভাব ঘটে। নন্দিনীর তাতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না।

সে তাকিয়েছিল ওই অপ্সরাদের প্রতিমূর্তিতে।

যুগ থেকে যুগান্তরে, অনাদি সৃষ্টির 'বিগ ব্যং' থেকে এই অপ্সরারাই সৃষ্টি করেছে অমর চিত্রলেখা। স্বপ্নের ছবির পটভূমি হয়ে এঁকেছে স্বপ্ন মধুর স্বপ্নময় মধুরেখা। সৃষ্টির উল্লাসে গেয়েছে স্বপ্নসংগীত সুমধুর রেণুমাখা। কালস্রোতের প্রবাহে যা আজও অমলিন, নব রসে নতুন সম্ভারে আঁকা। যেখানে সহস্র কোটি বছরের রং মিলে গেছে এক অনাবিল ছন্দের প্লাবনে। যেখানে শতক থেকে শতকে রাজা মহারাজারা এঁকেছে তাদের বিশ্বাসকে ছুঁতে - পূর্ণতার অশ্রুত অবগাহনে; প্রাচীন থেকে নবীনে, পুরাতন থেকে নতুনে। যেখানে সুপ্ত গীত, হয়েছে সংগীত, মহাকালের ঔরসে। যেখানে প্লাবন ঝঞ্ঝা বাতাস হয়েছে নীল নীলিমার দিগন্তে। সেখানে আজ খেলে জীব, সেই আরাধনার বন্দনা স্তুতি গানে। আঁকে জীবনের ছবি ক্যানভাস ভরে, অশ্রুত সেই নামে। যেখানে পাখনা মেলে অচেনার আলো ওদের শেখানো প্রবাদে, হারিয়ে যায় চেতনার সুর হাজার রিয়েলের দামে।

নন্দিনী রিয়েল দিয়ে ছবি আঁকতে এখানে আসেনি। মন বহুদিন ধরে ক্যানভাসে একটা ছবি আঁকতে চাইছে। কোনো ছবিটা শ্রেয়? আর কোনো ছবিটা প্রেয়? যদি খাজুরাহর ছবিটা শ্রেয় হয়, তবে কেন ব্যাঙ্গালুরুর ছবিটা প্রিয় হবে না? সময় হয়ত সঠিক উত্তর দেবে।

সময়ের সীমা পেরিয়ে নন্দিনী ততক্ষণে পৌঁছে গেছে আজ থেকে পাঁচশ বছর আগের লংভেক সম্রাট এং চ্যন ১-এর রাজ্যে। যেখানে ক্রং চাকতমকের বাইরে মেকং, বাসাক আর টনলে সাপ নদীর প্রয়াগে, ছোট্ট একটি গ্রামে থাকত একটি অষ্টাদশী মেয়ে জোরানি। যেখানে তা[4] আর ইয়ের[5] ভালবাসায় বড় হয়ে উঠছিল সে। অপ্সরা না হলেও, আদর্শ নারী হতে চেয়েছিল সে। সবাই ভালবাসত তাকে। শোভনও ভালবেসেছিল জোরানিকে।

ছেলেবেলার খেলার সাথি পো শোভনের হাত ধরে বেরিয়ে যেত মেকং নদীর ধারে। নদীর পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলত "খনহম চাউলসেট চচেক চিময় চীইময় থম্মচিয়েটি[6]"

"এ এন্তাউ ফংডের[7]" জোরানি জবাব দিত।

"পেল ডেল এনাক ইন্টারমিংল চিউময় থম্মচিয়েটি এনাক মিউলটো ডছিয়া রিউয়েং পি পপক মুওয়[8]" শোভন হেসে বলত।

আহ্লাদে লাল হয়ে যেত জোরানি। কাঁপা কাঁপা সুখে বুকটা কেঁপে উঠত শোভনের কথায়। নিজের অজান্তে ধীরে ধীরে কখন যে সেই ভাল লাগাটা ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে, বুঝতেও পারেনি। উঠতি বয়স। ভরা যৌবনের বাঁধভাঙা প্লাবনে ওরা দুজন ভেসেছিল এক স্বপ্নের পথে। ছেলেবেলার স্মৃতিকে যৌবনের টেরেসে উন্মুক্ত করে দিতে উভয়কে কাছে পাওয়ার অঙ্গীকারে।

কিন্তু না।

কাম্বডিয়ান সমাজটা অত্যন্ত রক্ষণশীল। সেই রক্ষণশীল সমাজ মেনে নিতে পারেনি তাদের এই প্রেমের বন্ধনের অঙ্গীকার, কিংবা আদি অনন্ত বাসনার বাস্তব প্রস্ফুটন। মানতে পারেনি ওদের অবাধ প্রেমকে।

"আনাক ট্রাউভতে চাকচেন পি কীট[9]" তা চিৎকার করে উঠেছিল।

এটা যে কাম্বডিয়া সংস্কারের পরিপন্থী।

শান্ত জোরানি তা-এর কথার প্রতিবাদ করতে পারেনি। মনে মনে, মেনে নিতেও পারেনি। চুপিসারে শোভনের সঙ্গে দেখা করেছে, কথা বলেছে, পালিয়ে যেতে চেয়েছে অন্য এক শহরে, যেখানে তাদের কেউ চেনে না। শোভনও চেয়েছিল জোরানিকে নিয়ে হারিয়ে যেতে।

জোরানিকে নিয়ে ইলোপ করার আগেই হারিয়ে গেল শোভন। কোথায়, তা কেউ জানে না। জোরানিও নয়। বুঝতে পেরেছিল তা গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শোভনকে গায়েব করে দিয়েছে।

জোরানিকে শাসন করে তা বলেছিল "ছাপ্পি থ্যঙ্গাইনহ আনাক মিন আচ বড়েই সেভা রোম আম্পি কার তেমনাকেং আনাক কান্তে কেমেংগোসরেই[10]"

হারিয়ে গেছিল শোভন। হারিয়ে গেছিল তার বুকভরা স্বপ্ন। হারিয়ে গেছিল তার ছোট্ট মনের অপার ভালবাসার সাথি। হারিয়ে গেছিল তার অষ্টাদশী নারীত্বের একটু চাওয়া। পূর্ণতার ক্যানভাসটা ছিঁড়ে ফেলে, একটা অসম্পূর্ণ ছবি আঁকড়ে আঁকতে হয়েছিল মনের রামধনুর হারিয়ে যাওয়া দিগন্তের অসমাপ্ত ক্যানভাস। সপ্ত রং-কে মুছে ফেলে একটা ধূসর অস্পষ্ট ছবি নিয়ে খেলা করেছিল মনের ক্যানভাসে।

দেওয়ালের ওই অপ্সরাদের লীলাচার কখন ধোঁয়াটে জোরানির সামনে। কল্পনার অপ্সরারা জোরানির যুগ থেকে আগামী যুগের যুগান্তরে ওই মন্দিরের ভাস্কর্যের স্বর্গভূমির সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে মর্ত্যের অসম্পূর্ণতার স্থাপত্যে বিরাজ করতে।

“আর ইউ অ্যাপ্রিসিয়েটিং দ্য বিউটি অফ দ্য স্কাল্পচারস?” সম্বিত ফিরল পং-এর কথায়।

“ওয়েল আই হ্যড এ ভিসন অফ দ্য ডিসাস্টার অফ ড্রিমস”

নন্দিনীর কথাটা বুঝতে পারেনি পং। ওর দিকে তাকিয়ে বলল ‘‘আই কুডণ্ট কোয়াইট ফলো’’

“দ্য পিকচারস আর সো পিসেস। রিয়ালিটি ইজ ডিফারেন্ট”

এত বছর ধরে গাইডের কাজ করছে নরেন্দ্র পং। এর আগে কখনও কোনো টুরিস্টের কাছে এরকম কথা শোনেনি। ঘাবড়ে গেল নন্দিনীর কথায়। ঠিক কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। ফ্যলফ্যল করে চেয়ে রইল নন্দিনীর মুখের দিকে। মুখ দিয়ে কথা বেরচ্ছে না। হঠাৎই যেন সারাদিন বকবক করা গাইডটা বোবা হয়ে গেছে।

নন্দিনী ওর চোখের তাকিয়ে বলল ‘‘হিয়ার উই আর স্ট্যন্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য প্রেসেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েটিং দ্য বিউটি অফ দ্য পাস্ট। অর সিয়িং দ্য প্রেসেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েটিং ইট। আই জাস্ট হ্যড এ ভিসন অফ দ্য পাস্ট’’

“ভিসন? হোয়াট কাইন্ড অফ ভিসন?”

“অফ দ্য স্যক্রিফাইসেস অফ দ্য কমন লেডিস, ইন বিল্ডিং দ্য এপিটোম অফ দ্য ডিভাইন, দ্য মিথ অফ দ্য অপ্সরাস অফ আওয়ার ড্রিমস ইন রিয়ালিটি”

অতীতের কাহিনিটা বলল নরেন্দ্রকে। মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে ভাবল নরেন্দ্র - মেয়েটা কী পাগল হয়ে গেছে? না কী জাতিস্বর? জাতিস্বরের কথা বইয়েতে পড়েছে। কিন্তু সাক্ষাতে কাউকে দেখেনি। নরেন্দ্রর গুলিয়ে যাচ্ছে পাগল আর জাতিস্বরের সংজ্ঞার ব্যঞ্জনাটা।

নন্দিনী বলল ‘‘বিলিভ মি। আই হ্যভ সিন ইট উইথ মাই ওউন আইস’’ যদিও বেশ অনুভব করছে নরেন্দ্র পং তাকে বিশ্বাস করছে না।

বিশ্বাস করুক চাই না করুক, নন্দিনীর অতৃপ্ত আত্মাটা যেন আবার জেগে উঠেছে। মন্দির থেকে ছুটে বেরিয়ে এল খোলা প্রাঙ্গণে। এই ১০০০ বছরের স্থাপত্যের মধ্যে অসম্পূর্ণতা আছে। যতই তা যুগ যুগান্তরের সাক্ষ্য বহন করুক না কেন। একটা সভ্যতা, একটা কৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

ঈশ্বর তো হিন্দুত্বের আঁচলে কিংবা থেরাভেডা বুদ্ধিজমের কোলে অবস্থান করে না। ঈশ্বর তো মানুষের সম্পূর্ণতার একটা ভরাট ক্যানভাস। রং? সে নয় পরে ভাবা যাবে, কোন রঙে সে ছবি আঁকা হয়েছে। আত্মাকে অতৃপ্ত রেখে অপ্সরার ছবি গড়লে নারীত্ব পূর্ণতা পায় না।

তার ভিসনটা যেন আজকে সেকথাই বুঝিয়ে দিয়েছে। নন্দিনী এই অসম্পূর্ণতার মধ্যে থাকতে চায় না। যেমন অসম্পূর্ণ করে রেখে দিয়েছিল তার নারীত্বকে, খাজুরাহর জৈবিক সাক্ষর। সেই সত্ত্বা কিংবা আত্মা নিয়ে

ছুটে বেরিয়েছে ব্যঙ্গালুরু থেকে ঢাকা। জীবনের চলার ক্যাডেন্সে প্রতি মুহূর্তে কোথায় যেন একটা ছন্দপতন।

নরেন্দ্র পং বুঝতে পারছিল না কী করবে?

নন্দিনীর পেছন পেছন বেরিয়ে এল খোলা আকাশের নীচে।

"কোথায় চলে গেছিলে?" রেজ্জাকের স্বরে ফিরে তাকাল নন্দিনী।

"প্রশ্নটা আমারও" পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিল নন্দিনী।

"আমি তো পারমিশন করাতে গেছিলাম। ওই যে নতুন পেন্টিংগুলো রিসেন্টলি পাওয়া গেছে, ওগুলো যাতে ডকুমেন্টারির জন্য ফিল্মিং করতে পারি। আগে থেকে তো পারমিশন করিয়ে আসিনি। তাই করাতে গেছিলাম। ডকুমেন্টারিটা তা না হলে ইনকমপ্লিট থেকে যেত"

নন্দিনীর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই রেজ্জাকের এই ডকুমেন্টারি নিয়ে। পাঁচশ বছরের পুরনো ছবিটা যেন চেনা অরবিট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে তাকে অচেনা সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে।

হাসি পেল রেজ্জাকের কমপ্লিটনেস এর স্থূল ব্যাখ্যা শুনে। ধীর শান্ত গলায় বলল "কোনোদিনও কমপ্লিট হবে না"

রেজ্জাক বুঝতে পারল না, নন্দিনী কী বলতে চাইছে। নন্দিনীর তির্যক উক্তি যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে নন্দিনী তার দুনিয়ায় আর নেই। কোনো এক অন্য দুনিয়ায় হারিয়ে গেছে। নিজের স্বপ্ন ছবির চিত্রপটে। তার এতদিনের পরিশ্রম কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এই মুহূর্তে ওর কাছে মূল্যহীন।

রেজ্জাকের বোঝার বাইরে, কিছুক্ষণ আগের উৎসাহে ভরা নন্দিনী হঠাৎ ফিউস হয়ে গেছে কেন?

কী এমন ঘটল তার এই কিছুক্ষণের অনুপস্থিতিতে যা নন্দিনীর এই পরিবর্তন ঘটাল?

এই মহিলাকে নিয়ে

---

4 ঠাকুরদা

5 ঠাকুমা

6 আমার প্রকৃতির সাথে মিশে যেতে খুব ভাল লাগে

7 আমারও

8 তোকে ঠিক মেঘ পরীর মতো দেখতে লাগে যখন তুই প্রকৃতির সাথে মিশে যাস

9 তোমায়ও কে ছাড়তে হবে

10 আজকের থেকে তোমার একলা ঘোরা বারণ, নষ্ট মেয়ে কোথাকার

ছয়

টনিদার ভিলার বাগানে সেলিব্রেশন পার্টি। কত লোক। নন্দিনী তাদের কাউকেই চেনে না। টনিদা এক এক করে সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছে। সেলিব্রিটি, চিত্রতারকা থেকে মন্ত্রী, আমলা, সঙ্গীত শিল্পী। সস্ত্রীক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা তো বটেই।

"মিট মাই চায়েল্ডহুড ফ্রেন্ড নন্দিনী"

এর আগে এত ইমপরট্যান্স পায়েনি নন্দিনী। সামিমুলের চোখ তাই দেখে ছানাবড়া। আশ্চর্য হয়ে দেখছে এলিট অফ হংকং-দের। মিডিয়ায় কাজ করার দৌলতে বাংলাদেশের একাধিক হোমরাচোমরাদের একাধিক পার্টি অ্যাটেন্ড করেছে, কিন্তু তা বলে অভিজাত হংকংবাসীদের সঙ্গে তার তুলনা! প্রাচুর্যের আতিশয্য, আগে এভাবে দেখেনি। এরাই দেশের ভবিষ্যতের নিয়ামক। এরাই সাধারণের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয় নিজেদের প্রভাবে। আবার এরাই সাধারণের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দেয় অন্য কোনো জৈবিক নেশার তাড়নে। আম জনতার দাবি নিয়ে যারা ক্রমান্বয়ে মিডিয়ায় ঝড় তোলে, তারা কতই না গৌণ। এরাই পরোক্ষভাবে মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, আগামী দিনের পশ্চাতে নিয়ামক হয়ে।

এরশাদ সাহেবের কথায় গল্পটা সাজাতে, নন্দিনী আবার ফিরে এসেছে সামিমুলকে নিয়ে। সেটাও তো, এদের মতো কোনো এক মিলিয়নেয়ারের ছকের দাবাখেলা। এই অদৃশ্য নিয়ামকদের কাছে নিজেকে কেমন অসহায় মনে হল। এরা গল্পের থিম তৈরি করে, স্ক্রিপ্ট লেখে। আর সেই থিমের বিন্যাস দিতে সামিমুল, নন্দিনীর মতো কত লোক নেমে পড়ে মাস মাইনের বিনিময়ে এদের ভাষাকে জনসমক্ষে পৌঁছে দিতে।

"এত জায়গা থাকতে হংকং কেন?" সামিমুলকে নন্দিনী প্রশ্ন করেছিল অঙ্কটা না বুঝেই।

"গল্পটা তো এখন হংকং-এরই। গেটওয়ে বিটুইন কমিউনিস্ট চায়না অ্যান্ড ক্যাপিট্যালিস্ট ওয়ার্ল্ড"

নন্দিনী অত ইজম বোঝে না। চ্যানেলের জন্য একটা আলোড়ন তৈরি করা স্টোরি তৈরি করতে হবে, এটুকুই এরশাদ সাহেব বলেছেন। সেই আলোড়নটা, দুই ইজমের যুগলবন্দির মধ্যে কী করে আসবে, নন্দিনীর মাথায় ঢোকেনি।

"অতশত বুঝি না। কী নিয়ে স্টোরি করবে, কিছু ঠিক করেছ?"

"একটা ছক মাথায় এসেছে। কিন্তু কীভাবে তাকে সাজাব ঠিক বুঝতে পারছি না"

"ছকটা কী?"

“পৃথিবী জোড়া এই চাইনিজ ইকনমির বাড়বাড়ন্তের পেছনে কাদের হাত আছে, সেটাই ইনভেস্টিগেশন করে তুলে ধরতে চাইছি”

“চাইনিজ কালচারের উৎকর্ষ নিয়ে স্টোরিটা করলে হয় না?” নন্দিনী তার নিজের মতো করে ইনোসেন্টলি জিজ্ঞেস করল।

“ধুস। ওই সব কালচারাল কচকচানি কে শুনতে চায়? মসলা চাই - বুঝলে নন্দিনী, মসলা চাই। মিডিয়া কোনো কালচারের ধ্বজা ধরে চলে না। মিডিয়া চলে সেনসেশনের ওপর। সেটাকেই স্টোরি করে বাজারে ছাড়তে হয়। সেটাই খায়”

দমে গেল নন্দিনী। ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এই ইকনমির কচকচানির মধ্যে সেনসেশনটা কোথায়? আর এর মধ্যে নিজের ভূমিকাটাও ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছে না।

“হোয়ার ডু আই ফিট ইন?” সামিমুলের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

“গল্পের ছবিটাকে রং দিয়ে সাজাতে”

মানে ছবিটা আঁকা হয়ে গেছে। শুধু রং বোলাতে হবে। তার নিজস্ব কোনো কেরামতি নেই। নিছক গুছিয়ে গল্প সাজানোর চিত্রপট তৈরি করা ছাড়া। ক্যানভাসে ছবি সাজাবার স্বপ্নেই তো নন্দিনীর এতগুলো বছর কেটে গেল। কিন্তু সেটা তো পূর্ণতার ছবি।

সামিমুল এ কোনো ছবি সাজাতে তাকে এ কাজে ভিড়িয়েছে?

“এত গুনি মানুষ আমাদের চ্যানেলে থাকতে, আমি কেন?”

“ক্রমশ প্রকাশ্য...”

কথা বাড়ায়নি নন্দিনী। চাকরি করতে এসে একটা জিনিস বেশ বুঝেছে, প্রশ্ন করা বাতুলতা মাত্র। অনুচ্চারিত ভাষাটা খুব স্পষ্ট। মাইনে পাচ্ছ, কাজ করে যাও - অত প্রশ্ন কোর না। প্রশ্ন করলে কোনো অরগ্যানাইজেশন চলে না। সামিমুলের, নন্দিনীর চেয়ে, অনেক বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সে আরও বেশি কিছু করে দেখাতে চায়, যাতে এরশাদ সাহেব আরও বেশি খুশি হয়, তার সীমিত চৌহদ্দির মধ্যে।

হঠাৎ নন্দিনী মারফত এন্থনি মিত্রের এই বিশাল বলয়ের পরিব্যাপ্তির মধ্যে এসে হকচকিয়ে গেছে। ঢাকায় নন্দিনীর ক্ষুদ্র আর্ট ডিরেক্টরের জীবন থেকে সে যেন এক অন্য নন্দিনীকে দেখছে।

ব্যুটিকের সাদা ডিজাইনার কাফতানটায় ঝলমল করছে স্বারাভস্কি ক্রিস্টালের কাজ। ভিলার গার্ডেনের ফ্লাড লাইটের আলোর ঝিলিকে ঠিকরে উঠছে, আর এক অন্য সম্পূর্ণ অচেনা নন্দিনী। শতেক তারার মাঝে আপন আলোয় প্রোজ্জ্বল। যেন নিজেই একটা নক্ষত্র। নিজ মহিমায় বিচরণ করছে জমায়েত হওয়া নক্ষত্রের দরবারে।

নন্দিনীর যে এত সুদূরপ্রসারী কনট্যাক্ট আছে, সামিমুল ভাবতেও পারেনি।

টনির পরনে লাল সার্টের ওপর সাদা স্যুট, সাদা টাই, সাদা জুতো। মুখে একটা স্মিত হাসি নিয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করছে ‘‘মিট মাই চায়েল্ডহুড বেইব নন্দিনী। নাউ সি ইজ এ গ্রোন আপ লেডি। আফটার অল আই অ্যাম অ্যান ওল্ড ম্যন’’

অতিথিদের মধ্যে থেকে একজন মধ্যবয়সি মহিলা বলে উঠল ‘‘হু সেইড ইউ আর ওল্ড? ইউ আর টুয়েন্টিটু ক্যরেট গোল্ড’’

নন্দিনীর মনে হল, হয়ত মহিলা কথাটা ভুল বলেনি।

অজানা পরিবেশ। তার মধ্যে নিঃশব্দে সবাইকে দেখছিল নন্দিনী। আস্তে আস্তে পার্টির হাওয়া জমে উঠেছে। রঙিন পানীয়র রঙে সেজে উঠছে পার্টির মুখর পরিবেশ। যেন মহিলাদের বন্দনার আরাধনা চলছে তরল গরলের আন্তরিকতায়...

“ম্যম ইউ লুক গরজিয়াস” আচমকা এই কমপ্লিমেন্টে ফিরে তাকাল নন্দিনী। জমে ওঠা নেশার আসরে একজন আর্লি থারটিস ভদ্রলোক তার দিকে কথাটা ছুড়ে দিয়েছে।

ব্যাঙ্গালুরুতে এসকরট সার্ভিসের অভিজ্ঞতায় এই কমপ্লিমেন্টস গুলো কেমন যেন ক্লিসে হয়ে গেছে। রঙিন জলের নেশার মাদকতায়, সন্ধ্যার ক্ষ্যান্তমনিও হয়ে ওঠে অপরূপা। সে তো শুধু আজ সন্ধের জন্য। সাজানো অপ্সরা কালকেই আবার হারিয়ে যাবে জীবনের চোরাবালিতে। আজকের স্তুতিকাররা ডুব দেবে দিনের আলোর সঙ্গোপনে, আপন মহিমায় অস্তিত্বের মাহাত্ম্যকে প্রাধান্য দিয়ে, কালকের নেশার হ্যং ওভার কাটিয়ে নিজেদের মুখোস পরে।

তারপর?

একটা নিরবচ্ছিন্ন অঘোর ঘুমে নতুন স্বপ্ন দেখা। যা আজ, কাল হয়ে যাবে অতীত। যা আজ, নতুন কালে তা হয়ে যাবে বাসি। তবুও এ খেলা যেন কলিযুগের কালান্তরের খেলা। যতদিন না সত্যযুগ এসে মুছে দেবে এই অবক্ষয়ী মাদকতা। ঘুচিয়ে দেবে অতৃপ্তির চাদরে মোড়া নারীত্বের শ্লেষের মোহময় সুবাস।

এসব এলো কথার গুরুত্বটা ওই রঙিন জলের বালতিতে ফেলে দেয় নন্দিনী। জীবনের ছকের এক্কা-দোক্কার অঙ্কগুলো আর ভাল লাগে না। অপরূপা বেশের আড়ালে যে উড়ে বেড়াচ্ছে, তার অসম্পূর্ণ ক্যানভাসের অভ্যন্তরে ক্লেশে ঢাকা অবয়ব।

“থ্যঙ্কস” নন্দিনী মিষ্টি হেসে প্রত্যুত্তর জানিয়ে সরে গেল।

একটু ফাঁক দেখতেই, সামিমুল নন্দিনীর কাছে এসে বলল ‘‘তোমার টনিদা তো দেখছি এখানকার বেশ দাপুটে মানুষ। আগে জানতাম না তো!’’

"আমিও জানতাম না। আর জানলেই বা আমার কী? ওর সঙ্গে তো আমার ছেলেবেলার সম্পর্ক। আমাকে বাচ্চা বয়সে কোলে করে রবীন্দ্র সরোবরে ঘোরাতে নিয়ে যেত"

"তোমার হন্যারে এত বড় পার্টি দিচ্ছে, তার মানে সম্পর্কটা বেশ অন্তরঙ্গ"

"সেটা টনিদার মর্জি। আমি তো পার্টি দিতে বলিনি"

সামিমুল নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলল ''এদের মধ্যে কয়েকজনকে যদি আলাদা করে ইন্টার্ভিউ নেওয়া যেত স্টোরিটা খুব জমত'' একটু থেমে বলল ''তোমার টনিদাকে বলবে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে?''

ধ্যস...

এখানেও ধান্দা? এরা কী ধান্দা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না?

এদের স্পাইন্যাল কর্ড থেকে পেরিফেরিতে প্রতিটা পদক্ষেপেই যেন ধান্দার বীজ পোঁতা আছে। একটা চেনা মধ্যাকর্ষণের বলয়ের মধ্যে ঘুরছে এরা। এদের এই রংগুলো চেনা। তাই দিয়ে কখনও ছবি আঁকা যায় না। চেনা ছবি - যা অস্পষ্ট হতে বেশিক্ষণ লাগবে না। মধ্যাকর্ষণের বলয়ের মধ্যে রংটাকে চিনে নিতে হলে, খেলতে হবে শুশুকের মতো। আগের পেশার খেলাটা যেন এখন নেশা হয়ে যাচ্ছে, খুঁজে বেড়ানো রং-এর দিশায়। যা দিয়ে, নন্দিনী আঁকতে চায় তার না-আঁকা ছবি।

নন্দিনীর মনে হল এই বড় বড় সব টাইকুনরা পার্টিতে কেন আসে? নিজের অস্তিত্ব কে জিইয়ে রাখার জন্য? অনেকে আবার পার্টিতে আসে সামি মুলের মতো ধান্দা করতে।

"না।এতদিন পর দেখা।আমি ব্যক্তি গত কিংবা পেশাগত কোনো ধান্দা নিয়ে টনিদাকে কিছু বলতে পারবনা। আমার কী একটা ডিগনিটি নেই? জাস্ট বিকস উই হ্যভ এক্সিডেন্টালিমেট"গম্ভীর ভাবে জবাব দিল নন্দিনী।

নন্দিনীর দৃঢ়তা দেখে থমকে গেল সামিমুল। বেশ কিছুদিন হল ওর সঙ্গে কাজ করছে। ইনটেলিজেন্ট, ডিলিজেন্ট, সিন্সিয়ার, হার্ড ওয়ার্কিং। তবুও কোথায় যেন স্বতন্ত্র। ঠিক বুঝে উঠতে পারল না এরশাদ সাহবে কেন ওকে এই কাজটার সঙ্গে যুক্ত করেছে।

এরশাদ শুধু বলেছিল ''এটা কিন্তু সিক্রেট অপারেশন। আমারা তিনজন ছাড়া কেউ যেন জানতে না পারে...''

সিক্রেসির কারণটা না জানলেও কিছুটা আঁচ করতে পারে। এটা গ্লোবাল দাবা খেলার ছোট্ট একটা দেশীয় কভারেজ। ঠিক শিওর না হলেও, পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত চাইনিজ কম্যুনিজমের ভিতের গোড়াতে, অন্য

কোনো শক্তির প্রভাবের একটা অস্পষ্ট ছবি ভেসে উঠছে। খালি বুঝতে পারছে না, ওই আগামী দিনের ক্যানভাসে, কে বা কারা ছবিটা আঁকছে?

না বুঝেও ছবিটা আঁকতে হবে। সেখানেই এই জারনালিস্ট জীবনের সব থেকে বড় ট্র্যাজেডি। এরশাদ যে শুধু শুধু ছবি আঁকতে চাইছে, তা নয়। নিশ্চয়ই পেছনে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের একটা অজানা অঙ্ক রয়েছে। গ্রে জারনালিজম। বুঝেও, তার ভাগীদার থাকতে হচ্ছে পেটের তাগিদে।

সেদিন এন্থনি মিত্রর ডিস্কোতে যাওয়ার আগে, নন্দিনীকে নিয়ে বেশ কিছু স্যুট করেছে। ডিজিট্যল ভিডিও ক্যমে ফটোগ্রাফি সামিমুলের। ভাষ্যকার কাম ইন্টার্ভিউয়ার নন্দিনী। স্টোরি আর স্ক্রিপ্ট তার তৈরি। আর তার চিত্রপটের ব্যকগ্রাউন্ড কনসেপ্ট, কম্পসিশন নন্দিনীর। শুধু ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই ইউনিটে।

এরশাদ সাহেব ডেলিবারেটলি সিক্রেসি মেন্টেন করতে চেয়েছে। গভীর সিক্রেসি।

হংকং-এর বিজনেস ডিসট্রিক্টে বেশ কিছু ইন্টার্ভিউ নিয়েছে। অনেকের সঙ্গে কথাও বলেছে। বিশেষ করে চাইনিজ ইকনমি কী ভাবে গ্লোবাল ইকনমির ওপর প্রভাব বিস্তার করছে।

একজন তো অকপটে বলেই ফেলল ''বিফোর দ্য চাইনিজ অকুপেশন অফ হংকং, দেয়ার ওয়াজ এ ভাইব্রেন্ট ইকনমি ইন ভোগ। আফটার দ্য ব্রিটিশ হ্যন্ডিং ওভার চায়না, দ্য প্রেসেন্ট রেজিম হ্যস টেকেন এ ফুল কন্ট্রোল অফ আওয়ার মানি মার্কেট। নাউ ইট ইজ মোর অফ কিপিং দ্য রেইন্স ইন দেয়ার কন্ট্রোল, রেদার দ্যন প্লেয়িং ইন টিউন্স উইথ দ্য ডাউ জোন্স''

"সো আরেন্ট ইউ হ্যপি উইথ দ্য প্রেজেন্ট সিনেরিও?"

"ওয়েল উই হ্যভ টু ওয়ার্ক উইথ দ্য প্রেসেন্ট সিস্টেম। ইট ইজ ইমমেটিরিয়াল হোয়েদার উই লাইক ইট অর নট। ইট ইজ দেয়ার ওয়ে অফ মেন্টেনিং দেয়ার সুপ্রিমেসি ওভার ডাউ জোন্স, বেসিক্যলি দ্য অ্যামেরিকান ইকনমি। বিফর ইট ওয়াজ এ মোর ফ্রি মার্কেট। নাউ ইট ইজ মোর অফ এ স্টেট কন্ট্রল্ড মার্কেট"

"হোয়াট ডু ইউ ফোরসি ইন নিয়ার ফিউচার?"

"দ্য ইকনমি উইল বি টাইটলি রেগুলেটেড বাই দ্য স্টেট। অন হুইচ প্রিন্সিপ্যল দ্য কনট্রি উইল অপারেট, ইট ইজ ফর টাইম টু ডিসাইড। বাট ইট ওন্ট বি দ্য সেম অ্যাজ বিফোর"

বুঝতে পারছে, ওরা একটা র‍্যডিক্যল পরিবর্তনের আশংকা করছে। কিন্তু কী সেই পরিবর্তন, ঠিক বুঝতে পারছে না। হয়ত এরশাদ সাহেব এই পরিবর্তনের ছকে কোনো দাবা খেলছে। দাবার পুরো চালটা ঠিক আঁচ করতে পারছে না। এও বুঝতে পারছে না, বাংলাদেশের মতো একটা নগণ্য দেশ, কী ভাবে এই বড় খেলার হিসসা হতে পারে?

নন্দিনী বুঝে উঠতে পারছিল না এসব নিয়ে নিউজ তৈরি করে কী লাভ? সামিমুলের কথামত ইন্টার্ভিউ শেষে নন্দিনী বলল ‘‘এসব ইকনমিক প্যচপ্যচানি নিয়ে স্টোরি করে কী হবে?’’

“ঠিক বুঝতে পারছি না। এরশাদ সাহেব বললেন। বোধহয় বড় টাকার খেল আছে। মরুক গে... আদার ব্যপারি জাহাজের খবরে দরকার কী?”

নন্দিনী বেশ বুঝতে পারছে, ইকনমির অংশটুকু না বুঝলেও, এর মধ্যে কোনো বড়সড় টাকার রফা আছে। তা না হলে এক সন্ধেতে মাছ ভাজা খাওয়া আর গল্প করার জন্য কেউ নন্দিনীকে দু-লাখ টাকা দেয়? হয়ত এই আন্ডারহ্যন্ড কিছু ইকোয়েশন আছে বলেই, প্রাইভেসি মেন্টেন করতে ইন্ডিয়া থেকে নন্দিনীকে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের মতো বিদেশে, নন্দিনীর নাড়ি-নক্ষত্র তার হাতের মুঠোয়। তাই অন্দরের কাহিনি জানলেও বিশেষ কিছু করতে পারবে না।

এখন আর এরশাদকে ভাল লাগছে না। ব্যঙ্গালুরুর হোটেলে বসে যতই ঔদার্য দেখাক না কেন, জ্যোতিকিরণের থেকে কোনো তফাত নেই। অন্তত জ্যোতিকিরণের মধ্যে কোনো হিপক্রেসি নেই। এসকরট সার্ভিস চালাচ্ছি এবং মহিলাদের ইচ্ছেয় দেহ ব্যবসা করাচ্ছি - ব্যাপারটা স্ট্রেট কাট। করলে করো না করলে ছেড়ে দাও। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

এ তো ঘোমটার তলায় খেমটা নাচা। আরও বেশি মারাত্মক!

“সাবাইকে বাদ দিয়ে, আমাকে ঠিক করল কেন এরশাদ সাহেব?”

সামিমুল ভিডিওটা কেসে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল ‘‘বলতে পারব না। তবে কিছুটা আঁচ করতে পারছি’’

“কী?”

“বোধহয় লোকাল কাউকে নিলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। তুমি যেহেতু ইন্ডিয়ান, তোমাকে নিলে কোনো চিন্তা নেই”

“লোকালি জানলেই বা?”

“আমি কী করে বলব? নিশ্চয়ই ইণ্টারন্যল সিকিউরিটির কোনো প্রবলেম আছে”

কীসের প্রবলেম?

নন্দিনীর মাথায় ঢুকল না।

শুধু এটুকু বুঝতে পারছে, নিজের অজান্তে কোনো ইন্টারন্যশনল দাবার বড়ে হয়ে যাচ্ছে। এক অসম্পূর্ণতা থেকে আরেক অসম্পূর্ণতা। তার ওপর, এই বড় চক্করে জড়াবার ভয়টাও সঙ্গোপনে মনের ভেতরে ধুকপুক করছে। ধান্দার ফাঁদ পাতা সারা বিশ্বে। নিজের সরল বিশ্বাসে, সে বারবার সেই ফাঁদে

পড়ছে। এই ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে জীবনের মধ্যে তো শান্তির রং নেই! শুধু আছে এগিয়ে যাওয়ার একটা দিকশূন্য র‍্যাট রেস।

সেখানে নন্দিনীর স্বপ্নের ছবিটা তো কোনোদিনও আঁকা হবে না। পড়ে থাকবে কিছু অগোছালো রং। সেই রং দিয়ে বারবার নানা রং-এর মেলায় একটা ছবি আঁকার চেষ্টা হবে, যা ক্লিসে হয়ে গেছে জীবনব্যাপী চেনা মানচিত্রে। তার মধ্যে কোনো মাধুর্য নেই। আছে শুধু ক্ষয়ে যাওয়া মানব সভ্যতার আপ্রাণ অস্তিত্ব রক্ষার ব্যর্থ প্রয়াস, যা সময়ের ঝড়ে বিলীন হয়ে যাবে। সাদা পট সাদা থেকে যাবে। হবে না রঙিন তুলির স্পর্শে।

মহাকাল হাসবে অট্টহাসে পাগলদের মূর্খতার দাপানি দেখে। কালের নিয়মে, জীবন পার হয়ে, সবাই একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। সাদা ক্যানভাসটা হেসে উঠবে বিদ্রূপে - দ্য গ্লরি ইজ গন, ইয়েট ইউ হ্যভ ফেইল্ড টু ড্র এ সাউন্ড পিকচার অফ কমপ্লিটনেস? ইতিহাস পার হয়ে যাবে, যুগ থেকে যুগান্তরে। সব দৌড় মুছে যাবে মহাকালের পটে। ছবির কথা থাক, নিজের সিগনেচারটাও থাকবে না কোনো ঐতিহাসিকের অগোছালো ধূসর পাণ্ডুলিপিতে।

এই জীবন নিয়ে এত বড়াই করি আমরা?

পার্টির শেষে, ভিলার এয়ারকন্ডিশনড লাউঞ্জে, সাদা ইটালিয়ান লেদারের কাউচে বসে ড্র্যাম্বুই খেতে খেতে টনিদা বলল ‘‘সো হোয়াট নেক্সট? চাকরিতে ফিরে গিয়ে আবার দিনগত পাপক্ষয়?’’

“তাছাড়া আর গতি কী?”

“এক দেশ থেকে আরেক। এক চাকরি থেকে আরেকটা বেটার চাকরি। দেন হোয়াট?”

“ভাবার সময় পাইনি টনিদা। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর শুধু সারভাইভেলের জন্য ছুটে মরেছি। নো মির‍্যাকেলস হ্যভ হ্যপেন্ড। এর নামই বোধহয় জীবন। আই নাউ টেক লাইফ অ্যাজ ইট কামস। মেক বেস্ট আউট অফ দ্য ওয়ার্স্ট”

“এই বয়সে আফটার অল দিস ওয়েলথ, হোয়েন আই গো টু বেড, দেয়ার ইজ অ্যান এলিমেন্ট অফ লোনলিনেস দ্যট এনগালফস মি। আই মিস মাই ওয়াইফ অ্যান্ড দ্য কিডস”

নন্দিনী বেশ বুঝতে পারছে টনিদার অসম্পূর্ণতা। সঙ্গে নিজেরটাও। যা বেশ কিছুদিন ধরেই তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। এভাবে তো জীবন চলতে পারে না। তাকে টেনে হিঁচড়ে চালানো যেতে পারে।

“ঘর তো সব মেয়েই খোঁজে। পায় কজন টনিদা?”

“কাউকে পেলে না?”

মাথা নাড়ল নন্দিনী। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল ড্র্যাম্বুই -এর গ্লাসটার দিকে চেয়ে। তারপর টনিদার দিকে তাকিয়ে বলল ‘‘ফিরে যাব ভাবছি। ফর বেটার অর ফর ওয়ার্স। কিন্তু খাওয়া থাকার একটা

সংস্থান না করে কি ফেরত যাওয়া যায়? দিস ফরেনার্স আর নট মাই কাপ অফ টি”

“আমার এক বন্ধু কলকাতায় আলট্রা লাইফ মেরিন্স-এর ওনার। বেসিক্যলি ওরা কারগো শিপমেন্ট নিয়ে ডিল করে। যদি তোমার এটুকু ফেভার নিতে আপত্তি না থাকে, আই ক্যান টক টু হিম” একটু থেমে পাইপে টোব্যকো ভরতে ভরতে বলল “অফ কোর্স, দ্য পে মে নট বি হ্যন্ডসাম। বাট ইট উড বি রিসনেবল টু স্টার্ট অফ উইথ”

নন্দিনী ভাবছিল। ফট করে উত্তর দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। দিতেও চায় না। এরশাদ সাহবে সম্বন্ধে যা আঁচ করছে, নাও হতে পারে। তাহলে এই চাকরিটা ছেড়ে অনির্দিষ্টের পথে পাড়ি দেওয়াটা কী ঠিক হবে?

“কয়েকদিন ভাবতে দাও। লেট মি পন্ডার ইট ওভার অ্যাট নাইট ওভার এ ফিউ পেগস”

সেদিন এই নিয়ে আর কথা না হলেও, হোটেলের ঘরে এসে নন্দিনী ভেবেছে। এতদিন ধরে তো বাঁচার তাগিদে, ভাগ্যের ক্যাসিনোতে নিজেকে বসিয়ে খেলেছে। এখন হয়ত বা সময় হয়েছে জীবনের হাল ধরার। নারীর পূর্ণতা অর্থ উপার্জনের মধ্যে নয়। নারীর পূর্ণতা একটা নিটোল সংসারের অরবিটে। টনিদা যেন কক্ষপথ শূন্য নন্দিনীকে, সেই অরবিটে ফিরিয়ে আনার ডাক দিয়েছে। তার একাকী শূন্যতার মধ্যে, যেন মাঝরাতের অন্ধকার সেই গান শোনায়। টনিদা তার থেকে কত্ত বড়। সে যদি এত জাগতিক সার্থকতার মধ্যেও বেহাগের সুর শুনতে পায়, নন্দিনীও হয়ত একদিন শুনতে পাবে।

খালি দেরি না হয়ে যায়!

হংকং-এর কাজ শেষ হয়ে গেছে। এবার ঘরে ফেরার পালা। ঘর? নিজের মনেই হাসল নন্দিনী।

“কালকে সকাল সাতটায় ফ্লাইট। ঘুম থেকে উঠতে দেরি করো না” সামিমুল মনে করিয়ে দিল।

“কটায় পিক আপ করতে আসবে?”

“ফাইভ এ এম শার্প”

ফোনটা ডিস্কানেক্ট করে নন্দিনী ভাবল, কোথায় সে ফিরে যাচ্ছে? একটা হিপক্রিটিক চক্রে মানুষের অর্থলিপ্সার আরেকটা চোরাবালিতে, এই উন্মাদ ছোটার রেসকোর্সে, একটা সাজানো জকি। দিব্যি দেখতে পাচ্ছে এরশাদ সাহেবের চেসবোর্ডের অঙ্কটা। কোনো বিদেশি নিয়ামক দেশ যেন তাকে কিনে নিয়ে, কারোকে চেকমেট করতে চাইছে মোটা টাকার লেনদেনে। এরশাদ সাহেবের কথাগুলো মনে পড়ল ‘আমাগো চ্যানেলের একটা পাবলিসিটি দরকার। মানে এইসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র কইর‍্যা’। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তো লোকাল ব্যাপার। এ খেলা তার থেকে অনেক বেশি মারাত্মক। এরা পৃথিবীর বুকে

নিজের অপূর্ণতাকে কভার-আপ করতে, নিজেদের স্বপ্নের ব্লু প্রিন্ট আঁকতে চাইছে তাদের নিজের মতো করে, একটা পুরনো চেনা ছবি খালি নতুন ক্যানভাসে।

ইতিহাস তার সাক্ষী। দু হাজার বছর ধরে কত লোক, কত ধর্ম, কত রাজা-বাদশা থেকে শুরু করে বর্তমান পৃথিবীর নিয়ামকরা সেই একই ছবি, নানা রঙে ক্যানভাসে আঁকতে চেয়েছে, দুনিয়ার মানচিত্রকে পাল্টে দিয়ে। তারপর কালস্রোতের দুর্বার ঝাপটায় হারিয়ে গেছে মহাশূন্যের ধাঁধায়। ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তাদের সাজানো ক্যানভাস মহাকালের প্রলয়স্রোতে।

রেখে গেছে এক অসীম শূন্যতা।

এখন কত রাত, কে জানে? পর্দা ফাঁক করে দেখল বাইরে রাতের আলোয় ঝলমল করছে হংকং সিটি। রঙিন নগরীটা যেন বিষাদের ছবি আঁকছে। পর্দা টেনে পোশাকহীন, বাথরুমে ঢুকল। বাথ সোপটা মাখতে মাখতে স্বপ্নের তুলি দিয়ে মনের ক্যানভাসে ছবি আঁকতে চাইছে। মধ্যরাতের একাকী স্তব্ধতায় নিজেকে আরেকবার খুঁজে নেওয়ার শেষ প্রহরের ঝালা। ছবিটা অস্পষ্ট হলেও এক আবছায়া সিল্যুট। আড়ম্বরহীন তাকে। তার নিজের আবছায়া প্রতিবিম্ব। এখনও স্বপ্ন দিয়ে আঁকা ক্যানভাসটা শূন্য। নিজের অস্তিত্বকে নতুন রঙে সাজানো! এক নতুন রূপে, নতুন তুলি দিয়ে আঁকা নতুন চিত্রপটে।

দূরের হংকংসিটিরকোলাহল এখানে পোঁছয় না। আবরণহীন অবয়বটাও বাথ সোপের ফ্যানায় চাপা পড়েছে। শুধু ক্লান্তির মধ্যে একটাই দ্বন্দ্ব। ছবিটা আঁকার আগে যে স্কেচটা আসবে, সেটা কী রং-এর? উষ্ণ জলের মিঠে আমেজে সন্ধিক্ষণের কাঁসর ঘন্টার আওয়াজটা হয়ত দূরে কোথাও বাজছে। কিংবা কাছে।

নিজের মধ্যে...

চোখে যেন একটা অজানা রং ভাসছে। পেছনের ফেলে আসা চেনা-জানা বাহারি রং-এর বাইরে। সামনের না-জানা আগামীর অনিশ্চয়তার মধ্যে নয়। অন্তরের স্পষ্টতার মধ্যে।

ঝাপসা অস্পষ্ট একটা ছবি। চিনেও যেন অচেনা। রংহীন একটা অবয়ব। শুধু রঙটাই প্রয়োজন, আঁকা শুরু করতে।

কী সেই রং ?

সাত

অসমাপ্ত ছবিটা মনে গেঁথে তার আশ্রয় খুঁজতে বেরল নন্দিনী। কিছু রং একত্র করেছে নিজের মনের অ্যাটাচি কেসে। কিছু খুঁজে নিতে হবে আগামীর থেকে। কিন্তু ছবিটা তো কোনো একদিন শুরু করতেই হবে।

"ফ্রেইটের কোটটা পাঠিয়ে দিয়েছ?"

"এই প্রায় হয়ে গেছে স্যার। লাস্ট চেক করছি। এক ঘণ্টার মধ্যে মেল পাঠিয়ে দেব"

"আমাকে ফাইন্যাল কপিটা দেখিয়ে নিও। দেখো যাতে আজকের মধ্যে চলে যায়। অর এলস উই মাইট লুস দ্য ডিল"

"পসিটিভলি স্যার। হয়ে গেছে। জাস্ট ফাইনাল চেক করছি"

ইন্টারকমটা ডিসকনেক্ট করে দিল আলট্রা মেরিন্সের মালিক সুখেন্দু বড়ুয়া। ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের ফারনিসড এয়ার কন্ডিশনড ঘরে সুখেন্দু স্যরকে পাঠাবার আগে শেষ বারের মতো কম্পিউটারের এক্সেলে চোখ বোলাচ্ছিল নন্দিনী। ফাইন্যাল চেক শেষ হতেই বেলটা টিপল।

ভজহরি ঘরে ঢুকতেই কম্পিউটার থেকে মুখ তুলে বলল "এক কাপ চা দে তো"

টনিদা ঠিকই বলেছিল। ভ্যগাবন্ডের মতো এভাবে ঘুরে বেড়িয়ে কোনো লাভ নেই। কমপ্লিটনেসটা ওই ঘরের মধ্যেই। আর সেই ঘরটা যদি জন্মভূমিতে হয়, তার থেকে ভাল আর কী হতে পারে?

অনেক ভেবে এরশাদ সাহেবের চাকরিটা ছেড়ে, টনিদার বন্ধু সুখেন্দু বড়ুয়ার আলট্রা মেরিন্সে যোগ দিয়েছে। নিজের পুরনো শহর চেনা কলকাতায়। অনেক তো ঘোরা হল। অনেক তো দেখা হল। অনেক তো বোঝা হল। ছবিটা যে এখনও অস্পষ্ট সিল্যুট। মনের ক্যানভাসে কিছু রং চড়িয়েছে বটে, কিন্তু কিছুই আঁকা হয়নি। এখনও ক্যানভাসটা অসম্পূর্ণ। এবার সময় হয়েছে জড় করা রং দিয়ে ছবিটা আঁকতে শুরু করার।

হেস্টিংসে একটা ছোট্ট দু কামরার ফ্ল্যাট দিয়েছে আলট্রা মেরিন্স। এই কমপ্লেক্সে বাঙালি নেই বললেই চলে। তবে ফ্ল্যাটের ড্রয়িংরুম থেকে সন্ধের হুগলী নদী, কিংবা নতুন রঙে আলোর মালায় সেজে ওঠা বিবেকানন্দ সেতুর দিকে তাকিয়ে থাকতে খারাপ লাগে না।

সেই সামেনের আলো-আঁধারি বিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতার দিকে তাকিয়ে ছিল নন্দিনী।

দূরে ওপাশের রামকেষ্টপুর ঘাটের টিমটিম করা আলোগুলো জ্বলজ্বল করছে। একটা আবছায়া অন্ধকার মেশানো অতীত পেরিয়ে ওটাই একমাত্র ছবি।

পেছনের ঘর থেকে ঝলমলে রাতের কলকাতাকে দেখা যায় না। দেখবার ইচ্ছেও নেই নন্দিনীর। ওখানে পড়ে আছে তার স্মৃতি বিজড়িত সুখ-দুঃখের ইতিহাস, যা আজ ট্যানড, বিক্ষিপ্ত জীবনের ছন্দে। হয়ত ইন্দ্রনীল তার সুখের নীড় সাজিয়েছে, ওই আলো ঝলমলে শহরের কোনো এক ফ্ল্যাটে অন্য কেউ। সেখানে হাজার হাঙরের মতো ঋতব্রতরা অন্য কোনো নারীদের নিয়ে ভেঁজে চলেছে নতুন সঙ্গমের বোল, কোনো নাট্যমের পুরনো আকুতিতে। বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই নন্দিনীর সেই পৃথিবীতে।

রামকেষ্টপুর ঘাটের টিমটিম আলোয় সে দেখতে পাচ্ছে আগামীর ক্যানভাস। নিজের একটা অচেনা ছবি। যা আলো ঝলমলে রং-এর বাইরে। তার মনের গভীর গোপন কোনায় গাঁয়ের বধূর মতো তুলসীতলায় সন্ধ্যারতির ছবি। প্রকৃতির।

মোবাইলটা বেজে উঠল। ওপাশে সুখেন্দু স্যর।

“বলতে ভুলে গেছিলাম। কালকে অফিসে আসার আগে তোমার বাড়ির কাছেই মেরিন হাউস হয়ে এস তো একবার। আমাদের আর্জেন্টিনার এক্সপোর্ট লাইসেন্সটা আটকে আছে। যদি পার ক্লিয়ারেনন্সটা করিয়ে নিতে...”

“কার সঙ্গে দেখা করব স্যর?”

“ঠিক বলতে পারছি না। খুঁজে নিও। আমাদের অ্যাপ্লিকেশন-এর রেফারেন্স নম্বরটা এস এম এস করে দিচ্ছি। ওখান থেকে ট্র্যাক করে নিও”

“শিওর স্যার”

ফেনটা ডিসকানেক্ট করে দিল সুখেন্দু বড়ুয়া।

কোথায় যাবে বুঝতে পারছিল না নন্দিনী। মেরিন হাউসের রিসেপশনে জিজ্ঞেস করতে বলল ‘‘ফরেন ক্লিয়ারেন্স সেকশনে চলে জান। ওরা বলতে পারবে’’

“ওটা কোথায়?”

“লিফটম্যানকে জিজ্ঞেস করুন। বলে দেবে” বেশি সময় নষ্ট করতে চাইল না মহিলা।

“দাঁড়ান এখনই বললে তো আর বার করা যাবে না। সময় লাগবে। লবিতে গিয়ে বসুন। আপনার নাম আর মোবাইল নম্বরটা এখানে লিখে রেখে যান। খুঁজে দেখি। আপনাকে ডেকে নেব”

টিপিক্যাল গভর্নমেন্ট অফিসের বড়বাবুদের মতো কথা। কিছুই করার নেই। সুখেন্দু স্যর যখন কাজটা করে যেতে বলেছেন, বসে থেকে করে যেতেই হবে। অগত্যা লবিতে বসে মানুষের আনাগোনা, কথোপকথন দেখা ছাড়া, আর কী করার আছে?

কতক্ষণ যে এভাবে কেটে গেছে খেয়াল করেনি নন্দিনী।

পাশের লোকের কথায় ঘাড়টা ঘোরাল ‘‘এখানে সময়ের কোনো দাম নেই’’

ঠিক বুঝে উঠতে পারল না এটা স্বগতোক্তি, না নন্দিনীকে উদ্দেশ করে বলা। আবার আপাদমস্তক দেখল লোকটিকে। বছর তিরিশের মতো বয়স। ক্লিন শেভন। পরনে একটা লাইট খয়রি ট্রাউজার ও সাদা হাফ সার্ট।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মুখ তুলে নন্দিনীর দিকে ফিরে বলল ‘‘আপনি কতক্ষণ ধরে বসে আছেন?’’

“প্রায় হাফ অ্যান হাওয়ার তো হলই”

“আই অ্যাম ওয়েটিং ওভার অ্যান আওয়ার জাস্ট টু গেট এ সিম্পল থিং ডন”

“আপনি কী কোনো দরকারি কাজে এসেছেন?” বলে ফেলেই নন্দিনীর মনে হল, কেন যে দুম করে কথাটা বলে ফেলল? সচরাচর অচেনা লোকের সঙ্গে এরকম দুমদাম কথা তো বলে না।

“আমি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। প্রত্যেক পাঁচ বছরে আমাদের লাইসেন্স রিনিউয়াল করতে হয়। সেই জন্যই এসেছিলাম। এখন তো দেখছি এদের আঠেরো মাসে বছর। প্রবলেমটা হচ্ছে আমাকে আজকেই রিনিউ করতে হবে। কালকের ফ্লাইটে আমায় মুম্বই গিয়ে শিপ বোর্ড করতে হবে”

“আপনার হাতে তাহলে সময় নেই”

“যা কিছু আজকের মধ্যেই করতে হবে। আই ডোন্ট হ্যভ এ চয়েস” অ্যাক্সেন্ট শুনে মনে হচ্ছে কনভেন্টে পড়া।

লোকটির কথাটা টেনে নিয়ে বলল ‘‘আপনার তো তাহলে শিরে সংক্রান্তি’’

“বলে কথা। লাইসেনস ছাড়া আমি শিপ বোর্ড করতে পারব না। আই অ্যাম জাস্ট অ্যাট এ লস। আই হ্যভ নো আদার অল্টারনেটিভ। কিছু তো করার নেই। যতক্ষণ হোক, বসে কাজটা শেষ করে যেতে হবে” নন্দিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল “আপনি কীসের জন্য এখানে?”

“অফিসের একটা কাজে এসেছি”

“তাহলে ভাগ্যবান বলতে হবে। এমন কোনো কম্পালশন নেই যে আজকের মধ্যে শেষ করতে হবে”

“বলতে পারেন। অন্তত আপনার মতো অতটা আরজেন্সি নেই”

সত্যি কী নেই? নতুন চাকরিতে জয়েন করেছে। কাজটা কমপ্লিট করে না যেতে পারলে, ভাল ইম্প্রেশন ক্রিয়েট করতে পারবে না। টাইমের দিক থেকে কম্পালসন না থাকলেও, ক্রেডিবিলিটির দিক থেকে আছে। কোথায় যেন একটা অলিখিত দায়বদ্ধতা থেকে যায়।

এক... দেড়... দুই ঘণ্টা। ঘড়ি দেখে লাভ নেই। দু-দুবার নন্দিনী উঠে গিয়ে খোঁজ নিয়েছে। একটাই তির্যক উত্তর ‘‘আমার কী আর কোনো কাজ নেই? দেখছেন না কত কাজ পড়ে আছে? লবিতে গিয়ে বসুন। সময়মতো ডেকে নেব’’

অগত্যা আবার অপেক্ষা। খিদেও পাচ্ছে। সকালে কুঁড়েমির জন্য ব্রেকফাস্ট করাও হয়নি। ওই লোকটি বসে থাকতে থাকতে কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে। নন্দিনী ওর পাশে বসে বলল ''কী জানি কখন হবে। আমার খিদে পেয়েছে। এখানে কোনো ক্যান্টিন আছে?''

নন্দিনীর কথায় ঝিমুনিটা কেটে গেল। তাকিয়ে বলল ''হ্যাঁ। চলুন আমিও যাই। আমারও ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে''

ক্যান্টিনে বসে দুজনে দুটো থালি অর্ডার দেওয়ার পর লোকটি বলল ''আমার নাম অর্ণব। অর্ণব চৌধুরী''

"নন্দিনী" পদবিটা এড়িয়ে গেল নন্দিনী।

মহিলাদের কী কোনো স্ট্যটিক পদবি হয়? নামটারও বা কোনো মূল্য আছে? একমাত্র কাউকে সম্বোধন করা ছাড়া। ঠিক যেন সাদা কানভ্যাসে একটা রং লাগানোর মতো। যে রং লাগাও, সেটাই। যে নামই দাও না কেন, সেটাই সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য। তার সঙ্গে মানুষটার এক সামাজিক পরিচয় ছাড়া আর কতখানি সংযোগ, সেটা ভাববার বিষয়।

"কী অদ্ভুত জীবনটা, তাই না? আপনার সঙ্গে দেখা হল, বেশ কয়েকঘণ্টা একসঙ্গে কাটালাম, তারপর যে যার পৃথিবীতে হারিয়ে যাব। অনেকটা ছবি আঁকার মতো। ছবিটা আঁকলাম। তারপর কোনো এক দমকা হাওয়ায় ছবিটা উড়ে গেল" অর্ণব নিজের মনেই আওরাল।

"সব ছবি যে টেম্পোরারি, কে বলল? পার্মানেন্টও তো হতে পারে..."

অর্ণব ঠিক বুঝে উঠতে পারল না নন্দিনী কী বলতে চাইছে। মাংসে কামড় দিয়ে নন্দিনীর চোখের দিকে তাকাল।

মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দৌলতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘোরার সৌভাগ্য হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলাদের নিবিড় সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য যে হয়নি, এমনও নয়। তবে এর আগে এমন তীক্ষ্ণ বলিষ্ঠ দৃষ্টিতে কোনো মহিলাকে তার দিকে তাকাতে দেখেনি।

কাজল চোখ দুটো যেন অন্তরের প্রতিবিম্বের ক্যানভাস। কোনো কবির ছন্দে আঁকা কল্পনা নয়। কোনো আর্টিস্টের কল্পনার তুলি দিয়ে আঁকা স্বপ্নের ছলনা নয়। কোনো সুরকারের নতুন রাগের বন্দনা নয়। জীবন্ত বাস্তবের রংহীন জলছবি। সেখানে কোনো উদ্দাম যৌবনের আকর্ষণ নেই। আবার পরিত্যক্ত কোনো অবহেলা নেই। কোনো আমন্ত্রণ নেই। কোনো বিসর্জন নেই। কোনো ভড়ং নেই। কোনো ছলাকলাও নেই। একটা স্বভাবিক জীবন্ত ছবি। কোনো ক্যানভাসের রং মাখানো জলছবি নয়।

শুধু একটা অতি সাধারণ মেয়ের, নিবিড় গভীরতা।

"পার্মানেন্ট কী করে হবে বলুন? আপনার কাজ হয়ে গেলে আপনি চলে যাবেন। আমার কাজ হলে আমিও চলে যাব। তারপর কাল বাদে পরশু অন্য কোনো দেশে পাড়ি দেব। সব কিছুই রেলেটিভ, ক্ষণস্থায়ী। কোনো কিছুই পার্মানেন্ট নয়"

"আপনি থাকেন কোথায়?"

"বাড়ি একটা আছে কলকাতায়। পৈতৃক বাড়ি। আমার তো সেখানে আপন কেউ নেই। কলকাতায় এলে ওখানে উঠি। বাকি সময় বন্ধ থাকে। একজন এস্টেট এজেন্টকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছি। ওরাই দেখাশোনা করে। বিল মেটায়। আপনি?"

"এই কাছেই হেস্টিংসে কম্পানির ফ্ল্যাটে। যে ভাবে এগোচ্ছে মনে হচ্ছে যদি লাকে থাকে টি-টাইমে কাজটা উদ্ধার হবে"

টি টাইমের কিছুটা আগেই কাজটা শেষ পর্যন্ত হল।

যে বাবু লাইসেন্সিং বিভাগে আছেন ফাইলটা দেখে বলল "ইশ! এতদিন ধরে পড়ে আছে! আসলে এখানে যে কাজ করতেন তিনি রিটায়ার করেছেন। এই থ্রি উইক্স হল আমি জয়েন করেছি। সব ব্যাকলগ এখনও দেখে ওঠা হয়নি। আপনি বাড়ি চলে যান। কালকে আপনাদের আলট্রা মেরিন অফিসে আর্জেন্টিনার এক্সপোর্ট লাইসেন্সটা চলে যাবে বাই কুরিয়ার"

সুখেন্দু স্যারকে কথাটা জানাতে ওপাশ থেকে বললেন "এখন আর অফিসে এসে কী করবে? কাজটা যখন হয়ে গেছে, বাড়ি চলে যাও। কুরিয়ারের জন্য অপেক্ষা না করে, কালকে বরং আসার আগে ওনার কাছ থেকে এক্সপোর্ট লাইসেন্সটা হাতেনাতে নিয়ে এসো"

বাড়ি চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ মেরিন হাউস থেকে বেরবার মুখে অর্ণবের সঙ্গে আবার দেখা।

"শেষ পর্যন্ত হল?"

"হ্যাঁ। শেষমেশ কাজটা নামল। আপনার?" স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নন্দিনী বলল "সারাটা দিন যা ধকল গেল"

"আমারটাও হয়েছে। তদবির তাগাদা দিয়ে করিয়ে নিলাম"

"এখন কোথায়? বাড়ি?"

"বাড়ি গিয়ে কী হবে? ওখানে তো রান্না করার কেউ নেই। এই চক্কর মেরে হোটেলে খেয়ে বাড়ি ঢুকব"

নন্দিনীরও তো সন্ধেবেলা কিছু করার নেই। একা একা হাঁপিয়ে উঠেছিল। অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বলল "বেশ তো চলুন না আমার ফ্ল্যাটে। আহামরি কিছু খাওয়াতে পারব না। তবে বাড়িতে যা আছে খাওয়াতে পারি। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে..."

বলে ফেলেই ভাবল, এরকম হঠাৎ আলাপে আগে তো কাউকে এভাবে ফ্ল্যাটে ডাকেনি। হঠাৎ অর্ণবকে আমন্ত্রণ জানাল কেন?

মাঝে মাঝে মানুষ এমন অনেক কিছুই করে ফেলে যা তার হিসেবের বাইরে। কেন করে, এটা জানতে পারলে হয়ত নিয়তির কেমেস্ট্রিটা জানা সম্ভব হত। দুম করে যখন বলে ফেলেইছে, তখন তো আর ফেরত যাওয়া যায় না। তেমন কী আর করতে পারে? তার ভয় পাওয়ার কী আছে? অন্যান্য শহরের তুলনায়, কলকাতায় সে অনেক বেশি সিকিওরড।

ফ্ল্যাটের সোফায় হেলান দিয়ে অর্ণব নিজের কার্ডটা এগিয়ে দিয়ে বলল ‘‘এটা রাখুন। আপনার নিশ্চিন্তির জন্য’’

কার্ডটা নিয়ে একটু হেসে নন্দিনী বলল ‘‘আমি এমনিতেই নিশ্চিন্ত। তা না হলে আপনাকে বাড়ি বয়ে ডেকে আনতাম না। কম বয়েসে বাবা-মাকে হারাবার পর এতদিন তো একাই চলেছি। আমার খুব একটা ভয়ডর নেই’’ একটু থেমে কার্ডটা লেদার পার্সে ঢুকিয়ে বলল ‘‘পরে যোগাযোগের জন্য রেখে দিলাম। আমি সদ্য এই চাকরিটায় জয়েন করেছি। এখনও কার্ড ছাপা হয়নি। আপনার নম্বরে একটা মিসড কল দিচ্ছি। সেভ করে রাখুন’’

নম্বরটা সেভ করতে করতে অর্ণব বলল ‘‘নামটা?’’

“নন্দিনী”

পরিচয়টা যে শেষ পর্যন্ত রেজিস্ট্রি অফিসে পৌছবে, ভাবতেও পারেনি। কথায় আছে **ম্যারেজেস আর মেইড ইন হেভেন, সেলিব্রেটেড হিয়ার অন আর্থ**

সেই হেভেনটা আর্থে নেমে এল একাকী সোহাগ রাতে।

নন্দিনী প্রশ্ন করেছিল ‘‘হঠাৎ আমাকে পছন্দ হল কেন?’’

অর্ণব নন্দিনীর কপালে চুমু এঁকে দিয়ে বলেছিল ‘‘ইউ আর ডিফারেন্ট’’

“কী ভাবে?”

“তোমার মধ্যে আমি নারীত্ব পেয়েছি” নন্দিনী থেকে সরে বেডসাইড টেবল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে বলল “ইউ আর নট দ্য ফার্স্ট লেডি উইথ হুম আই হ্যভ ইন্টার‍্যাক্টেড অর স্লেপ্ট উইথ। দেয়ার হ্যভ বিন মেনি ফ্রম ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। কিন্তু তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা তুমি নিজেও জানো না”

নন্দিনী চুপ করে আছে। এর আগে তো এমনভাবে কেউ তাকে দেখেনি। এর আগে তো এমন কথা কেউ আগে বলেনি। কী এমন আছে ওর মধ্যে, যা ও জানে না অথচ অর্ণব জানে?

মনের জানলার তো চারটে দিক আছে। নিজের জানা, সকলের জানা। নিজের জানা, সকলের অজানা। কোনো সে দিক, যা নিজের অচেনা, অথচ অন্যদের জানা?

নন্দিনীকে চুপ করে থাকতে দেখে কোনো ভণিতা না করেই অর্ণব বলে চলল ‘‘নারীত্ব শুধু ফিসিক্যল ডিস্পসিশন দিয়েই হয় না। তার বাইরে সম্পূর্ণতার ছবিটা দেখার চোখ চাই’’

“সে ছবিটা কী?” নন্দিনী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

“সমর্পণ, রিসেপশন, আবেগ, স্বতঃস্ফূর্ততা, সেন্সুয়ালিটি কত কিছু আছে”

নন্দিনী হেসে বলল ‘‘আজকেই তো বিয়ে হল। এর মধ্যেই এত কিছু দেখে ফেললে?’’

“সব দেখেছি কে বলল? সারা জীবন তো পড়ে আছে সব দেখার। ফটোগ্রাফারের চোখ তো। কিছু কিছু দেখতে পাই”

“তুমি ফটোগ্রাফার? জানতাম না তো”

“পেশাদারি নয় - শখের। সে নেশা হোক আর পেশা হোক, দেখার দৃষ্টিটাই আসল”

নন্দিনী একটু আশ্চর্য হল। এভাবে তো এর আগে কেউ অন্যরকম ভাবে দেখেনি তাকে।

ইন্দ্রনীলের কাছে ভালবেসে নিজেকে সমর্পণ করেছে নন্দিনী। খাজুরাহতে তার দেহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঋতব্রত। ব্যঙ্গালুরুতে নিজেকে নিলামে চড়িয়েছে লাখ-দুলাখের বাজিতে। সব জায়গাতেই সে থেকে গেছে একটা দেহ। কোথাও তো কেউ তার অন্তরের ছবি দেখতে চায়নি কিংবা আঁকতে চায়নি। দেহটা যে জীবনের চলার পথে একটা সামগ্রী, সে ভাবেই নিজেকে নিয়ে এগিয়ে চলেছিল নন্দিনী।

চমকে উঠল অর্ণবের কথায়। অর্ণব যেন নন্দিনীর নতুন একটা ছবি, নিজের ফটোগ্রাফিক দৃষ্টি দিয়ে আঁকতে চাইছে, নন্দিনীর না-চেনা ক্যানভাসে। যে ছবি নন্দিনীর এখনও অচেনা। পরিচ্ছন্ন ক্যানভাসে নিটোল একটা স্বপ্নের ছবি। ভবিষ্যতের ছবি। আগামী দিনের শান্তির ছবি। আগামী দিনের পূর্ণতার প্রতিমূর্তি।

“কোথায় একটা অজানা মিল আমাদের জুড়ে দিয়েছে। তুমি ফটোগ্রাফার, আমি পেইনটার। তোমার মতোই শখের। ছবি আঁকা আমার বরাবরের নেশা”

“মিডিয়ামটা যাই হোক না কেন, দেখাটাই আসল। কে কী ভাবে দেখছে। মাইক্রিস্কোপিক, না টেলিস্কোপিক, না বার্ডস আই ভিউ দিয়ে...”

নন্দিনীর মনে হল, অর্ণবের কথার মধ্যে একটা নিজস্ব দৃষ্টি আছে। ওর নিজস্বতা। পেশার বাইরে, এই দৃষ্টিটাই ওকে একটা স্বতন্ত্র জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে। সেই জন্যই বোধহয় ভগবান ওদের দুজনকে একই মালায় গেঁথে দিয়েছেন একটা পূর্ণতার ছবি আঁকতে। দৃষ্টির শার্পনেসে, মনের রং-এর সংমিশণে।

রজনীগন্ধার মালাটা একদিন বাসি হয়ে যাবে। একদিন তরতাজা ফুলগুলো শুকিয়ে খসে পড়ে যাবে। ফুলশয্যাটাও ফুলের সাজ হারিয়ে ফেলবে সময়ের ব্যাপ্তিতে। পড়ে থাকবে কিছু মধুর স্মৃতি, কিছু হারানো অতীত। কিন্তু জীবনের ছন্দের স্পন্দনে সাঁকোর মতো জড়িয়ে থাকবে এই অদৃশ্য মালার বর্ণাঢ্য সম্ভার। সেটাই পাথেয়, যা আগামী দিনের ক্যানভাসে একটা পূর্ণতার ছবি আঁকবে। মলিন হবে না সময়ের বিবর্তনে।

কিন্তু সময়ের প্রবহমানতা কী ক্যানভাসে একটা নির্দিষ্ট ছবি আঁকতে দেয়?

আট

আসানসোলের আফতার গার্ডেনে বড় হওয়া বড়লোক বাপের ব্যাটা ইন্দ্রনীল কলকাতায় পড়বে। এ যেন ক্লাস এইট পাস কয়লা ব্যবসায়ী রুদ্রনীল সেনগুপ্তর হাতে চাঁদ পাওয়া। তার অনেক ফ্ল্যাটের মধ্যে ছেলের থাকার জন্য উপহার দিয়েছিল কাকুলিয়া রোডের এই ফ্ল্যাটটা। সঙ্গে একজন ফুল-টাইম কাজের লোক।

"হস্টেলে সিট পেলাম না" বিমর্ষ হয়ে বলেছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী, তার পরিচিত আসানসোলের মেয়ে শ্রীমিতা "দেখি এবার একটা পিজি অ্যাকমডেশন খুঁজতে বেরতে হবে"

"কেন? আমার বাড়িতে থাকলেই তো পার। অবশ্য তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে" একটু থেমে বলেছিল "এক ঘরে থাকতে হবে না। থ্রি রুমড ফ্ল্যাট। সঙ্গে ফুল টাইম কুক"

"কত দিতে হবে?"

"থাকার জন্য কিছু দিতে হবে না। খাওয়া খরচটা শেয়ার করলেই হবে"

আইডিয়াটা মন্দ নয়। রেডিমেড পিজি অ্যাকমডেশন। একটু ইতস্তত করছিল। একজন ছেলের সঙ্গে একই ফ্ল্যাটে থাকবে? পরে মনে হল পিজি অ্যাকমডেশনে যে কোনো ছেলের সঙ্গে থাকতে হবে না, এমন গ্যারান্টি কি কেউ দিতে পারে? একজন অচেনা ছেলের সঙ্গে থাকার থেকে, ইন্দ্রনীলের সঙ্গে থাকা অনেক ভাল। খুব পরিচিত না হলেও, একেবারে তো অচেনা নয়।

প্রথম আলাপ হয়েছিল জুবিলি রিসর্টে একটা ইন্টারস্কুল পার্টিতে। শ্যামলা হলেও মুখশ্রী আর ভরাট শরীরটার দিকে নজর পড়েছিল ইন্দ্রনীলের। উঠতি যৌবন, রঙিন পিতৃদেব, পারিবারিক সূত্রে ইনহেরিট করা মহিলা সংস্পর্শ ইন্দ্রনীলের কাছে নতুন নয়।

মা আপত্তি করলে বাবা প্রতিবাদ করত ''এই বয়সে মেয়েদের সঙ্গে মিশবে না তো কী শেষ বয়সে মিশবে? যখন আর কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না, তখন আর মিশে কী করবে?''

"তবু ছেলেটা যে এত মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াচ্ছে, পড়াশোনায় ক্ষতি হবে তো" মায়ের সবসময়ই চিন্তা।

"আমার ছেলে বলে কথা। সব করেও দেখো ভাল রেসাল্ট করবে। ঈশ্বর যখন দিয়েছে ওটায় কি কোট ঝুলিয়ে রাখবে? ব্যবহার না করলে যে অচল হয়ে পড়বে" রুদ্রনীল তার পথেই ছেলেকে দীক্ষিত করেছিল।

মায়ের ভয় করত, সচল রাখতে গিয়ে গুটিকয়েককে না বাঁধিয়ে ফেলে। অবশ্য রুদ্রনীল সেনগুপ্তও বদ্যির ব্যাটা। খালাস করাতে সিদ্ধহস্ত। নিজে তো কম মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করেনি। এও মায়ের অজানা নয়, পেটে

বাচ্চা এলেই কয়েকটাকে চুপিসারে খালাস করিয়েছে। সতীসাধ্বী স্ত্রী নীরবে দেখে গেছে। এত বছরে ওনার রাগটাও তো কম দেখেনি। তেমন কিছু বলতে গেলে খতম পর্যন্ত করে দিতে পারে। অতএব করিতকর্মা বাপের সুযোগ্য পুত্র পড়ার ফাঁকে রঙিন দুনিয়ায় ভাসবে, এ আর আশ্চর্য কী?

জুবিলি রিসর্টে সেই জন্যই যাওয়া। অবশ্য শ্রীমিতার সঙ্গে সে রকম কিছুই হয়নি। রিমঝিম আলাপ করিয়ে দিয়েছিল শ্রীমিতার সঙ্গে ‘‘আমার স্কুলের বন্ধু শ্রীমিতা’’

“তুমিও কী রিমঝিমের মতো লরেটো কনভেন্টে পড়?”

“হ্যাঁ” সম্মতি জানাল শ্রীমিতা।

“ও খুব ভাল গান করে” রিমঝিম বলেছিল।

“রবীন্দ্রসংগীত?”

“না আধুনিক” শ্রীমিতা বলেছিল।

“হিন্দি গান জান?” মাথা নেড়েছিল শ্রীমিতা।

রাত গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পার্টির ভিড় আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছে। এটা স্কুলের ছেলেমেয়েদের পার্টি। তাই বাবা-মায়েদের কড়া হুকুম ন’টার মধ্যে ফিরতে হবে। বেশিভাগ ছেলেমেয়েই তাদের অভিভাবকদের হাত ধরে গুটি গুটি পায় বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে।

শ্রীমিতাকে নেওয়ার কেউ নেই। রিমঝিমের দিকে তাকিয়ে বলল ‘‘আমি চলি রে’’

“যাবি কী করে?”

“একটা রিক্সা নিয়ে চলে যাব”

কথাটা ইন্দ্রনীল শুনতে পেয়েছিল। বলল ‘‘তাড়া কীসের? আমার গাড়ি আছে। আমি নামিয়ে দেব। তোমার গান তো শোনা হল না। চল, আমরা মাঠে গিয়ে বসি। তোমার কয়েকটা গান শুনব। তারপর তোমাকে আর রিমঝিমকে বাড়িতে নামিয়ে দেব’’

ইতস্তত করলেও, শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রনীলের পিড়াপিড়িতে বেশ কয়েকটা গান শুনিয়েছিল। কথামত জুবিলি রিসর্ট থেকে বেরিয়ে, শ্রীমিতাকে ওর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে, ওরা গাড়ি নিয়ে চলে গেছিল।

আলাপটা অতটুকুই।

তারপর প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সুবাদে ক্যাম্পাসেই দেখা। তবু তো ইন্দ্রনীল চেনা না হলেও কিছুটা অন্তত চেনা। এক মফসসলের শহর থেকে কলকাতায় পড়তে আসা। তাই ইন্দ্রনীল যখন প্রপোসলটা দিল, শ্রীমিতার মনে হল মন্দ কী? পিজি অ্যাকমডেশনে যখন অচেনা লোকের সঙ্গে থাকতে হবে, ইন্দ্রনীলের সঙ্গে থাকলে ক্ষতি কী?

অতএব কাকুলিয়া রোড।

একই ছাদের তলায় দুটি পৃথক ঘরে অবস্থান। কলেজ জীবনে বিভিন্ন বন্ধুদের আনাগোনা। তাদের মধ্যে পাড়ার নন্দিনীরও। শ্রীমিতা গান গাইত। আশা ভোশলে থেকে গীতা দত্তর পুরনো দিনের গান। কিংবা সুনিধি চৌহান থেকে শ্রেয়া ঘোষাল। নন্দিনী চুপ করে শুনত। কিন্তু কখনই ওদের কাছে প্রকাশ করেনি যে ওর ক্লাসিক্যল গানে তালিম আছে। চুপচাপ শুনে ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়েছে। যেহেতু এক পাড়াতেই বাড়ি, তাই অনেক সময়ই ফেরার তাড়া ছিল না। এমনও হয়েছে, যখন ওরা সবাই চলে গেছে ইন্দ্রনীল, শ্রীমিতা আর নন্দিনী একটু বেশি রাত পর্যন্তই একসঙ্গে বসে আড্ডা মেরেছে। ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেনি, যে ইন্দ্রনীল আর শ্রীমিতার মধ্যে ফ্ল্যাটমেট ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে।

সম্পর্কটা ফ্ল্যাটমেটের পর্যায়ই ছিল। আসানসোল ছাড়ার পর কলকাতার নতুন পরিবেশে পৈতৃক সূত্রে ইন্দ্রনীলের জাগ্রত পৌরুষ তখনও অচেনা শহরে মাথাচারা দিয়ে ওঠেনি। নতুন শহর, হালচাল বুঝতে টাইম লাগবে। বড় শহরে বৈচিত্রময় অত মহিলার মধ্যে, কে যে কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে, ইন্দ্রনীল তখনও ঠাহর করে উঠতে পারেনি। ভয় শুধু একটাই - এডস না হয়ে যায়!

নিজের তৃপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল নিজেকে। শ্রীমিতাও ডুবে ছিল তার মেয়েবন্ধুদের নিয়ে নিজের জগতে। সাংসারিক কথাবার্তা ছাড়া, দুজনের মধ্যে তেমন কোনো সংযোগই ছিল না।

রবিবারের দুপুর। ফুল টাইম কাজের লোক বৈকুণ্ঠ সেদিনের জন্য ছুটি নিয়ে নিজের ভিটে নন্দীগ্রামে গেছে ছোট ছেলেটাকে ডাক্তার দেখাতে।

"কাল বিকেলে আসব। তোমাদের খাবার সব রান্না করে রেখে গেছি ফ্রিজে। সময়মত মাইক্রোওয়েভে গরম করে খেয়ে নিও"

সকালের রান্না গরম করে খেয়ে, নিজের ঘরে আন্ডারগারমেন্ট পরে ঘুমিয়েছিল ইন্দ্রনীল। হিউমিডিটি মেশা ভ্যপসা গরমে কোথাও বেরবার প্রশ্নই ওঠে না। সুপুত্র যাতে গরমে কষ্ট না পায়, সেইজন্য কিছুদিন আগেই রুদ্র সেনগুপ্ত তার ছেলের ঘরে এসি লাগিয়ে দিয়েছে। সেই এসির শীততাপনিয়ন্ত্রণে দাবদাহ ভ্যপসা গরমে ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। বিছানায় শুয়ে টিভি চালিয়ে এলোপাথাড়ি চ্যানেল ব্রাউস করছিল ইন্দ্র।

হঠাৎ দরজায় টোকা।

"আসতে পারি?" বুঝতে অসুবিধা হল না শ্রীমিতার কণ্ঠস্বর।

যেমন ছিল তেমনই বিছানা থেকে না উঠে নবাবি চালে বলল ''কাম ইন''

শ্রীমিতা এই বেশে দেখে একটু ভ্যবাচ্যকা খেয়ে গেল। এক বাড়িতে থাকলেও, এ অবস্থায় ইন্দ্রনীলকে এর আগে কখনো দেখেনি। লক্ষ করেছে, বরাবরই ইন্দ্র সৌজন্য রক্ষা করেছে। হয়ত কিছুটা সচেতন হয়েই,

যে একই ছাদের তলায় তার সঙ্গে একজন মহিলা থাকে। সম্পর্ক না থাকতে পারে, সৌজন্যের যাতে কমতি না থাকে। শ্রীমিতা বুঝে উঠতে পারছিল না, কী করবে? বেরিয়ে যাবে, না থাকবে? আন্ডারগারমেন্ট পরা কোনো পুরুষ যে আগে দেখেনি, তা নয়। কিন্তু ইন্দ্রনীলকে এভাবে আগে দেখেনি বলেই তার বেশি দ্বিধা।

"এই ভ্যপসা গরম অসহ্য লাগেছে। আর পেরে উঠছি না। তোমার ঘরে তো তবু এসি আছে। আমার ঘরের পাখাটাও গরম হাওয়া দিচ্ছে। আর পারছিলাম না"

"এখানেই থাক। আমার কোনো প্রবলেম নেই। এই গরমে তোমার জন্য ভদ্র-সভ্য হতে পারব না। ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড!" ইন্দ্রনীল রাজকীয় ভঙ্গিতে উত্তর দিল।

'লীভ ওর লিভ' - সামনে দুটো রাস্তা। এই দোটানার মধ্যে, শ্রীমিতা এই সংস্কারের বেড়াজাল পেরিয়ে গরমের মধ্যে বাঁচতেই চাইছিল। খাটের ওপাশে বসে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে বলল "রবিবার দুপুরে স্টার জলসায় ভাল সিনেমা থাকে"

ইন্দ্রনীল স্কিপ করে দেখল গত উইকে রিলিজ করা, হল থেকে বিলুপ্ত, নতুন সিনেমা 'উন্মাদ' চলছে।

"এটা ভাল সিনেমা?" কিছুটা ব্যঙ্গের সুরেই বলল ইন্দ্রনীল।

"ধ্যত। ভাবলাম কোনো ভাল সিনেমা থাকবে। ...বন্ধ করে দাও। নট ওয়ারথ অন এ সানডে আফটারনুন। বরং তোমার সঙ্গে গপ্প করি। এতদিন তো এক বাড়িতে থেকেও তোমার সঙ্গে গপ্প করার সময় হয়নি"

"তুমি তোমার পৃথিবীতে থাক। তাই বিরক্ত করি না"

এই প্রথম ভালমত ইন্দ্রনীল শ্রীমিতাকে দেখল। একটা ফিনফিনে সাদা-নীল নাইটি পরে বসে আছে বিছানার অন্য প্রান্তে। সাগরের নীল যেন মিশেছে ওর শ্যমলা দেহসৌষ্ঠবের লাবণ্যে। ধূসর সাদার মধ্যে উর্বর নীল, যেন এসির ভ্যপসা গরমে সতেজতার বাণী শোনাচ্ছে, নিঃস্পৃহ আবেশে ভরা জতুগৃহে। ভালো লাগছে শ্রীমিতাকে। পর্দার ফাঁক থেকে খসে পড়া, আলো-আঁধারিতে ঢাকা রোদ্দুর রঙে মাখা, দেখানো হাসির ঠোঁটে ছোঁয়া না-চেনা পল্লবে।

আসানসোলে কিঞ্চিত আলাপ, কিছুটা অতীতের বিলাপ, কিছুবা তুষ্টির শৃঙ্গারে প্রলাপ, জুবিলি রিসর্টে মধুর গীতি সম্ভাষণে। কিছু আবোলতাবোল কথার মধ্যেও ছিল না একটুও বাতুলতা।

ওর চিবুকে তিল, জোরা ভ্রুরুর ভাঁজে ফুটে ওঠা উৎকণ্ঠা, যেন আজ নতুন রং-এর প্লাবন ছড়াচ্ছে নীল-সাদা ভেদ করা, অসীম নীলিমায় হারিয়ে যাওয়ার নতুন সুবাসে। দগ্ধ উষ্ণ দ্বিপ্রহরে দুজনে বসে একাকী নিরালায় না-দেখা নতুন সাজে। ঋতুর তুলিতে মুহূর্তে আঁকা একটা চিত্র, নতুন ক্যানভাসে। না-চেনা স্বপ্ন সৌধের ভিত্তির বিন্যাসে।

সেদিকেই তাকিয়ে ছিল ইন্দ্রনীল।

নীল নাইটিটা যেন পাহাড়ের দুই মেরুকে সন্তর্পণে আড়াল করে রেখেছে। সেই উপচে পড়া পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে, তার পাশে ইন্দ্রনীলেরও সুপ্ত পৌরুষ আবার ফিরে আসছে। নজর এড়ায়নি শ্রীমিতার।

"আমি কী থাকব, না চলে যাব?" একটু বিচলিত হয়ে শ্রীমিতা ইন্দ্রনীলের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

"চলে যাবে কেন? এই গরমে, ঠান্ডা হাওয়া খেতেই তো এসেছ" বুঝতে পেরে ওর দিকে তাকিয়ে বলল "লজ্জা পাচ্ছ কেন? জামাকাপড় খুলে ফেললে দেখবে এই ভ্যপসা গরমে কত্ত আরাম" নিজেই স্বগতোক্তি করল "আহঃ কী আরাম!"

"তোমারা আরামে থাকতে পারো। আমরা পারি না"

"গরমটা সবার দেহেই সমান ভাবে লাগে" তির্যক জবাব।

এই প্যচপ্যচে গরমে, নাইটিটাও দেহের সঙ্গে আষ্ঠেপৃষ্ঠে লেপটে, গরমটাকে যেন আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মনে মনে শ্রীমিতারও তাই মনে হচ্ছিল। আহা! যদি গরমে সব খুলে এসিতে শুয়ে থাকা যায়! হয়ত পরিত্রাণ পাওয়া যাবে এই কামড়ে ধরা হিউমিডিটি থেকে। হঠাৎ মনে হল, পরিত্রাণ খোঁজার থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই ভাল। ইন্দ্রনীল অবাক হয়ে গেল, হঠাৎ শ্রীমিতাকে মাথার ওপর দিয়ে নাইটিটা সরিয়ে ফেলতে দেখে।

"কী করছ?"

"এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন?"

ইন্দ্র অপলক চেয়ে আছে। স্বল্পবসনা শ্রীমিতা। এতদিন একই বাড়িতে থেকেছে। এভাবে তো আগে কখনও দেখেনি। আজ যেন নতুন ভাবে দেখছে। শ্রীমিতার যে এমন দেহসৌষ্ঠব আছে, পাশে থেকেও এর আগে তো চেনেনি! মনের ক্যানভাসে একটা নতুন ছবি, একটা নতুন স্বপ্ন।

সত্যিই তো - এক যাত্রায় পৃথক...

শ্রীমিতাও চেয়েছিল ইন্দ্রনীলের রোমশ পায়ের দিকে। এর আগে তো এভাবে ইন্দ্রনীলের ম্যনলিনেস পরখ করার সৌভাগ্য হয়নি। যদিবা কখনো বাথরুম থেকে তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে, তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে ঢুকে গেছে।

অনুভূতির জন্য সময় ও পরিবেশ লাগে।

আজকে এই বেশে এসি ঘর যেন, সেই মোহময় আবেশ সৃষ্টি করেছে। সুপুরুষ তো বটেই, ওর রোমশ সুঠাম পা দুটো যেন ওর দিকে ক্রমশ আকৃষ্ট করছে তাকে। দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে হাঁটু ছাড়িয়ে, ইন্দ্রনীলের কায়াবস্ত্রের চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইন্দ্রনীল টিভিতে খেলা দেখছিল। শ্রীমিতা কী করছে, সেদিকে খেয়াল নেই। হয়ত স্বল্প বস্ত্র পরিহিত বলেই, লজ্জায় ওর দিকে তাকায়নি। পাছে অন্য কিছু ভেবে বসে। শ্রীমিতার

দৃষ্টিটা ক্রমশ ওর রোমশ বুকের ওপর ঘোরাফেরা করছে। ভেতরে ভেতরে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বাসা বাঁধছে। পুরুষ সংস্পর্শের।

স্কুলে পড়ার সময় একবার অয়ন গাছের ফাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল। কশে থাপ্পড় মেরেছিল অয়নকে। বাড়িতে এসে লজ্জায় মুখ ঢেকেছিল নিজের ঘরে। এখন মনে হচ্ছে অয়নকে থাপ্পড়টা না মারলেই পারত। যৌবনের চাওয়াটা তাহলে আধুরা থেকে যেত না। আজ যেন সেই অতৃপ্ত চাওয়াটা কিছু চাইছে। অথচ ইন্দ্রনীলের সেদিকে হুঁশ নেই।

আলতো করে চাপ দিল ইন্দ্রনীলের হাতে। শ্রীমিতার ছোঁয়ায় ফিরে তাকাল। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেও নিজের মনে খেলা দেখতে লাগল। শ্রীমিতার হাত খেলে বেড়াচ্ছে ইন্দ্রনীলের বুকে। সেখান থেকে মুখে। দৃষ্টিটা ঢেকে দিচ্ছে। নাঃ... আর খেলা দেখা যাবে না। ওর দিকে ইন্দ্রকে ফিরতে দেখে, শ্রীমিতা সাহস করে নিজের দেহটা ছড়িয়ে দিল। বাইরের তপ্ত প্রবাহ এসি ঘরে, বাড়িয়ে ফেলেছে দুজনের চাওয়ার পারদটাকে। বহুদিনের ফেলে আসা অভ্যসটা আবার যেন মাথা চাড়া দিচ্ছে, শ্রীমিতার আহ্বানে।

দুই দেহের উপচে পড়া ভলক্যানোর লাভা ইরাপ্ট করতে চাইছে সুনামির বর্ষণে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সুনামির ঝড়ে ভেসে গেল ওরা দুজনে। খরাতপ্ত রবিবাবারের দুপুর যেন মেঘমল্লার বাজাচ্ছে তৃপ্তির সৌরভে। ভালবাসার নতুন গুঞ্জনে। সুর তাল লয় যেন মিশে গেছে নতুন চাওয়ার মূর্ছনায়। দেহের বন্দনায়। কামনার আরাধনায়।

শ্রীমিতা ভেবেছিল এটাই প্রেম। জানতও না, যে ইন্দ্র চুপিসারে তখন নন্দিনীর ক্যানভাসে নতুন ছবি আঁকছে। সেদিন দুপুরে ওর সমর্পণটাকে, প্রেম বলেই ভুল করেছিল শ্রীমিতা। তার রেশ টেনে নতুন ছবিও আঁকতে শুরু করেছিল মনে মনে।

"পেয়িং গেস্ট না অন্য কিছু? ঠিক করে বলত" ভেতরে ভেতরে নন্দিনীর কোথায় যেন একটা সংশয়।

"পেয়িং নয়, ফ্রি। আমাদের দুজনের বাড়ি আসানসোলে। আগে থেকেই চিনতাম। কলকাতায় থাকার জায়েগা পায়নি বলেই আমার বাড়িতে থাকে" নন্দিনীকে আশ্বস্ত করছিল ইন্দ্রনীল।

ভরসা করে কী ভুল করেছিল নন্দিনী? এখন আর বিগত অতীতের ডিসেকশন করে কী হবে? অনেক বছর তো পার হয়ে গেছে। স্মৃতির র‍্যাম মেমরিতে ঢুকে, খালি ক্যস-এর মধ্যে, ফেলে আসা জীবনের হার্ড ডিস্কে আবার সার্চ করল নন্দিনী।

কে ওই অজ্ঞাত কলার?

ভাসা ভাসা হলেও, মনে পড়ছে সেই বর্ষামুখর রাতের কথা। ইন্দ্রনীলের একতলায় এক ভাড়াটে পরিবার থাকত। সময়ের ব্যাপ্তিতে কাকুলিয়া রোডের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও, ওই পরিবারের মধ্যবয়সি কর্তা

কিন্তু নন্দিনীকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছিল। আজ এত বছর পরে সে-ই বার্ধক্যের আঙিনায় বসে নিশ্চয়ই এই ছ্যবলামোগুলো করছে ফোনে। আবার যদি ফোন করে বিরক্ত করে, পুলিসে জানাতে বাধ্য হবে।

"দিদিমণি অনীশ দাদাবাবু আজ রাতে খাবে না"

"কই আমাকে তো কিছু বলেনি"

"যাওয়ার আগে তো তাই বলে গেল আমাকে। বলল, কোথায় নেমতন্ন আছে বন্ধুদের সঙ্গে"

নন্দিনী বুঝতে পারছে ছেলেটা বড় হয়ে উঠছে। সব কথা মাকে বলে না। নায়েগ্রা ফলস থেকে ছেলেকে বুকে নিয়ে ফেরার পর ওকে ঘিরেই তো এত বছর কেটে গেছে। এবার বোধহয় সেই ছবিটাও ধীরে ধীরে মুছে যাবে।

জীবনের রং দিয়ে আঁকা রঙিন ক্যানভাসটা আবার ধূসর হয়ে যাবে। এবার ছবি আঁকবে - আর কাউকে নিয়ে নয়; নিজেকে নিয়েও নয়। ঘরে পড়ে থাকা খালি ক্যানভাসটা টেনে রংগুলো সাজাতে লাগল নন্দিনী। বহুদিনের ফেলে আসা অভ্যাসটা যেন আবার হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

নিজের মনের কল্পনাকে বাস্তবের ক্যানভাসের ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে। যা জীবনের ঝঞ্ঝায় মুছে যাবে না। অমলিন হয়ে থাকবে ঝড়জলের দাপটে, স্বপ্নে ছোঁয়া বাস্তবের চিত্রপটে।

সেখানে আর কেউ নেই। শুধু পড়ে আছে নন্দিনী। আর তার সামনে একটা খালি ক্যানভাস।

নিজের মনের সব রং মিলিয়ে ছবিটা নিজেই আঁকতে শুরু করল নন্দিনী।

নয়

"চাকরিটা কী ছাড়ার প্রয়োজন আছে?" আলট্রা মেরিন্স-এর মালিক সুখেন্দু বড়ুয়া কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে ডেস্কের উল্টো দিকের চেয়ারে বসা নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। প্রশ্নটা এরশাদ সাহবেও করেছিলেন ঢাকার চাকরিটা ছাড়ার আগে।

জীবনের চলার পথে পরিবর্তন মাস্ট - সেটা শুধু কাজের প্রেক্ষাপটেই নয়, মানসিক ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। এই পরিবর্তনের খোলস পাল্টাতে পাল্টাতে প্রতি মুহূর্তে নারীর নতুন রং-এর মাধুরী, নব রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই রং-এ একটা ছবি তৈরি হয় - জীবনের ছবি। যা গোটা জীবনটাকে একই সূত্রে একটা ক্যানভাসে বন্দি করে রাখে - জীবনের আসল ছবিতে। সেই ছবিটাই অবচেতনে আঁকার চেষ্টা করে নারী মন, বারবার বিভিন্ন রং-এর সংমিশ্রণে। রং ভরা হয়, রং মুছে দেওয়া হয়, আবার নতুন রং দিয়ে সাজানো হয়, আবার তা মুছে যায় - ছবিটা যেন কিছুতেই সম্পূর্ণ হতে চায় না। আধুরাই থেকে যায়। হয়ত কোথাও সন্তর্পণে সে চিন্ময়ী রূপ আঁকা হচ্ছে।

কিন্তু কোথায়?

এরশাদ সাহেবকে নন্দিনী বলেছিল "অনেকদিন তো বাইরে বাইরে কাটানো হল। এবার কলকাতায় ফিরতে চাই। একটা চাকরির অফার পেয়েছি। তেমন আহামরি কিছু নয়। তবে কলকাতায় থেকে খেয়ে পড়ে চলে যাবে"

"তোমার যদি মন চায়, যাও। আমার কী কওনের আসে। তবে এইখানে থাকলে তোমার ভবিষ্যৎ অনেক ভাল হইত। তোমার মতো ব্রাইট মাইয়াদের এইখানে অনেক প্রস্পেক্ট আসে"

প্রস্পেক্ট মানে তো গোলামির সিঁড়ির আরেকটা নতুন ধাপ। নন্দিনীর মনে হয়েছিল চিরকাল নিয়তির ক্রীতদাস হয়ে জীবন কাটিয়েছে। একবার... অন্তত একবার নয় নিজের মতো করে জীবনটা বাঁচল।

এরশাদ সাহেবকে বলেছিল "আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না। এক বয়ে যাওয়া জীবন থেকে আমাকে তুলে এনে আপনি আমায় নতুন জীবন দিয়েছেন। এখন মন চাইছে নিজের একটা ছোট পৃথিবী গড়তে। নাই-বা থাকলাম এই ওঠার র‍্যট রেসে। সবাই তো তার পেছনেই ছুটছে। আমি নয় ফিরে গেলাম আমার ছোট্ট বাসায়..."

"বাসায় যাইবা? যাও। বাসা তো আমাগো গোটা পৃথিবীটাই। তার মধ্যে যদি আলাদা কইর‍্যা কোনো বাসা পাও, খুইজ্যা লও। আলাদা বাসা কী আমাগো জীবনে কিসু আসে? তবু আমরা সেই স্বপ্নে সারাজীবন ধইর‍্যা

ছুইট্যা মরি”

আজ এত বছর পরে ফিরে তাকালে মনে হয়, এরশাদ হয়ত ঠিকই বলেছিল। অনীশের বড় হওয়ার সঙ্গে নন্দিনী এটা আরও বেশি করে বুঝছে। বাসাটা হয়ত বাইরে নেই। বাসাটা সন্তর্পণে লুকিয়ে আছে মনের গভীর গোপন কোনে। সেখানেই এবার খোঁজবার পালা। নিজের রং দিয়ে সাজাতে হবে তাকে, নতুন তুলির ক্যানভাসে। যে ক্যানভাস অমলিন অক্ষত থাকবে সময়ের বিবর্তনে। ঠিক চিরবসন্তের নব-পেল্লবের মতো। পলাশের ফাগুনের হাওয়ায় খুলে দেবে মনের বন্ধ দরজাগুলো আগামীর জলছবি এঁকে।

“বিয়ে করেছি। সংসার করতে চাই” নন্দিনী জবাব দিল।

“সংসার করেও তো চাকরি করেও করা যায়। আজকাল তো সব মেয়েই তাই করছে”

“আমার হাসব্যন্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। কখন কোন দেশে কতদিন থাকে। ওর সঙ্গে তাল দিতে গিয়ে চাকরিটা ঠিক মতো করতে পারব না স্যার”

“যাতে তোমার শান্তি। তোমার মতো কাজের মেয়ে কী সারাদিন ঘরে কাটাতে পারবে?” কিছুটা হতাশ ভাবেই বলেছিল “দেখ চেষ্টা করে দেখ। যদি কোনোদিন ফেরত আসতে চাও, দ্য ডোরস আর ওপেন ফর ইউ”

এক সময় বন্ধ দরজায় বারবার করাঘাত করেছে। কেউ ফিরেও তাকায়নি। তারপর জীবন এক নতুন দরজা খুলে দিয়েছিল ব্যঙ্গালুরুতে। জীবনের রং-এর বিভিন্ন শেডস-এ একটা পথ তো খুলেই যায়। সেই পথটাই তখনকার একমাত্র পথ। পছন্দের না অপছন্দের বিচার করে লাভ নেই। সেই পথেই হাঁটতে হবে।

নতুন ঠিকানায়...

সল্ট লেকের সিডি ব্লকে অর্ণবের অগোছালো পৈতৃক বাড়িতে নতুন সংসার ঠিক মতো করে সাজাবার আগেই, অর্ণব ঘরে ঢুকে বলল ‘‘হুইসেল বেজে গেছে’’

নন্দিনী বাথরুম থেকে বেরিয়ে ভেজা চুলটা আঁচড়িয়ে সিঁথিতে সিঁদুর লাগাতে গিয়ে অর্ণবের কথায় পেছন ফিরে বলল ‘‘তার মানে?’’

“হনলুলুর হুইসেল। এক সপ্তাহের মধ্যে টোকিও থেকে জাহাজ নিয়ে সেইল করতে হবে প্যাসিফিকে। হওয়াই পৌঁছে দিতে হবে” নন্দিনীর মুখটা গাঢ় ভায়োলেট হয়ে যেতে দেখে বলল “আমার সঙ্গে চল না। হনিমুন করা তো আর হল না। প্যাসিফিকেই মিড ওশেনে আমাদের হনিমুন হয়ে যাবে”

শুনতেই নন্দিনীর মুখে ফিকে লাল রং ফুটে উঠল। একেবার রামধুনুর রং-এর দুই এক্সট্রিম।

মলিন সন্ধেবেলায়, কে যেন আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে নতুন রামধনু মাখা আলতায়। সিঁথিতে না পরা সিদুর কে যেন মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে নৈমিত্তিকতার আছিলায়। মুখটা জ্বলজ্বল করছে সেই অন্তরের

আবিরের রঙে। ফাগুয়ার হোলি খেলতে, অসময়ের ফাগুনে, আলো ভরা দিনের সূর্যকিরণ মাখতে নতুন সোনাটায়। হতে গিয়েও যে মালা বাসি হল না প্রখর দিবার উষ্ণতায়।

জীবনের রং কী আঁকতে পারে প্রকৃতিক নিয়মের আছিলায়?

কৌটো থেকে চিরুনি দিয়ে সিঁথিতে সিঁদুরটা লাগাতে লাগাতে নন্দিনী বলল ‘‘কতদিনের জন্য?’’

“আট দিন হনলুলু পৌঁছতে। তারপর এক সপ্তাহ ঘোরা অ্যান্ড দেন ফ্লাই ব্যাক” অর্ণব মোবাইলে টেক্সট করেতে করতে বলল।

“আ... ট... দিন! তুমি তো কাজে ব্যস্ত থাকবে। সমুদ্রের নীল-এর দিকে তাকিয়ে বোর হয়ে যাব না তো?”

“আমি সঙ্গে থাকলেও বোর হবে?” অর্ণব ফোন থেকে চোখ না সরিয়েই প্রশ্ন করল।

নন্দিনী সিঁথির সিঁদুরটা ঠিক করে বিছিয়ে, অর্ণবের কাছে এসে বলল ‘‘এই আট দিন কোথাও তো বেরতে পারব না। জাহাজেই থাকতে হবে’’

“ক্ষতি কী? আট দিন ধরে সকাল-বিকেল-রাত্রি আমার আদর খাবে” ফোন থেকে চোখ সরিয়ে, সদ্য বিবাহিতা পূর্ণযৌবনা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল।

“মাঝখানে কোথাও হল্ট নেই?”

“প্যাসিফিকে কোথায় হল্ট করবে? যদি না সমুদ্রে সুইম করতে চাও? অবশ্য সুইম করতে জানলেও প্যাসিফিক ওশেনে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না” একটু থেমে বলল “হল্ট সেই গিয়ে হনলুলুতে। কয়েকদিন হাওয়াই ঘুরে বেড়াব। তারপর ফ্লাই ব্যাক”

“মানে, ওয়ান ওয়ে জার্নি ইন দ্য সি?”

“প্রেসাইসলি”

নন্দিনীর কেমন যেন আরষ্ট লাগছে। এর আগে কখনও শিপ-এ চড়েনি। এবারে একেবারে লং ভয়জে। নিজেকে কীরকম ফেরডিন্যান্ড ম্যাগেলেনের মতো মনে হচ্ছে। যেন সে স্ট্রেটস অফ ম্যাগেলেন পার করে, কেপ হর্ন-এর পাশ দিয়ে, পৌঁছে যাবে প্যাসিফিক ওশেনে। ওর পক্ষে এটা নতুন ডিসকভারি হতে পারে, অর্ণবের পক্ষে তো নয়।

ঠাট্টা করে নন্দিনী বলল ‘‘ওখানে আবার আর একটা বউ নেই তো? আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট অল পিপল ইন মেরিনস হ্যাভ আ ওয়াইফ ইন এভ্রি পোর্ট’’

অর্ণব খুব ক্যাসুয়ালি বলল ‘‘তুমি যে রকম ভার্জিন নও, আমিও তো তোমার মতো নিউবি নই’’

“নিউবি! হোয়াটস দ্যট?” নন্দিনী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"দ্যট ইজ দ্য পান অফ আওয়ার পেট্রিয়ারকল কালচার। এ চ্যস্ট লেডি ইজ কলড এ ভার্জিন। দেয়ার ইজ নো ওয়ার্ড ফর মেল চ্যস্টিটি। বিকস দ্য পেট্রিয়ারকল সোসাইটি ডসেন্ট বিলিভ মেলস ক্যন লুস দেয়ার চ্যস্টিটি। দে আর অফেন রেফারড অ্যাস নিউবিস। আই কনফেস আই অ্যাম নট এ নিউবি। আই হ্যভ স্ক্রুড নিউমারাস লেডিস ইন মাই লাইফ। বাট দ্যট ডসন্ট মিন দে ডিসারভ টু বি মাই ওয়াইফ" একটু থেমে বলল "আই হ্যভ ওয়ান ওয়াইফ অ্যান্ড দ্যট ইজ ইউ"

কত সহজ সরল অকপটে অর্ণব কথাগুলো বলে গেল। ক'জন পুরুষ বিবাহিত স্ত্রীর সামনে এমন সত্যি কথা অকপটে বলতে পারে? নিজেও তো অর্ণবকে বলতে পারবে না, সে কতজনের সঙ্গে শুয়েছে। পারবে কী? ঈশ্বর যখন আকাঙ্ক্ষা দিয়েছে, সেটা পরিতৃপ্ত করা অযৌক্তিক নয়। পিওরিটির দোহাই দিয়ে করতেই বা যাবে কেন? আর পাঁচটা বাসনা মেটানোর মতো এও তো এক বাসনা। এর সঙ্গে সতীত্ব, সিন্সিয়ারিটি, ডেডিকেশন-এর কী সম্পর্ক আছে? নন্দিনী আজও বুঝে উঠতে পারল না, এ দুটোকে এক মেরুতে কে এনেছে?

এই সাবেকি চিন্তাধারা একটা রক্ষণশীল ক্লাস আগলে রেখেছে। হয়ত বৈবাহিক বন্ধনকে ধরে রাখতে এটাই এক মাত্র অস্ত্র। কিছু বলতে গেলে কেউকেটারা অনেক তত্ত্বকথা শুনিয়ে দেবে।

ভয়টা অন্য জায়গায়। অর্ণবকে এডস-এর টেস্ট না করিয়েই বিয়ে করেছে। বিয়ের আগে তো আর হবু স্বামীকে বলতে পারে না 'তোমার এডস টেস্ট করা আছে?' অন্তত জ্যোতিকিরণের সঙ্গে থাকতে তার রেগুলার মেডিক্যল টেস্টের মধ্যে এডস টেস্টটাও হত। আফটার অল, হাই লেভেল এস্করট এজেন্সিতে কাজ করলে, দিস টেস্টস আর এ মাস্ট। লোকে কয়েক ঘণ্টার জন্য এত টাকা দিচ্ছে কী এডস নিয়ে ফেরার জন্য?

"তাহলে সিঁদুরের একটা দাম আছে, বল?"

"অফ কোর্স। আই অ্যাম ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট মাই আইডিয়াস। আই ডোন্ট ফেইন পিউরিটি অফ হিপক্র্যাসি। দেয়ার আর প্লেনটি অফ লেডিস টু ফাক, বাট ওনলি ওয়ান টু ফুলফিল এ ড্রিম অফ এ হোম"

ড্রিম!

স্বপ্ন তো নন্দিনীও দেখত ছোটবেলায়। কাকুলিয়া রোডের জানলার ফাঁক দিয়ে রাতের অন্ধকার আকাশটা দেখা যেত। ওই অন্ধকার আকাশে ছোট্ট নন্দিনী একটা অন্য ভাষা শুনতে চাইত। জানলার কার্নিশ ছাপিয়ে যেটুকু আকাশ দেখা যেত, সেটাও যেন অন্ধকারের আস্তিন পেতে গুম মেরে বসে থাকত প্রতীক্ষায়। তারাদের? যে, ওকে জ্বলতে দেখে লাফিয়ে উঠবে আনন্দে?

অন্ধকারেরও আলোর একটা ঔজ্জ্বল্য দেখতে চেয়েছিল। কিংবা কোনো অদৃশ্য জগতের রাজপুত্তুরকে। তারাদের সিঁড়ি বেয়ে কারা যেন ফিসফিস করে ডাকত 'আয়...আয়...' মনমাঝির বৈঠা নিয়ে হাতে, সপ্তর্ষির

পিঠে চড়ে, আকাশগাং পাড়ি দিতে, কোনো এক অচেনা রূপনগরের দেশে। এক মোহময় অজানার হাতছানি, এক পার্থিব চাওয়ার অলৌকিক নিঃশব্দ আহ্বান।

নাম না-জানা তারাগুলো স্বপ্নের দরজা খুলে, ছোট্ট নন্দিনীর মনে আলোর সিঁড়ি বিছিয়ে, স্বপ্ন পরীদের নাচের ক্যানভাস আঁকার ভেল্কি দেখিয়ে, গাইত ঘুমপাড়ানি গানঃ

আমার মনের বইঠা ধর রে তুই নারী
আমি হাজার সমুদ্দুর পার হয়ে তোরে ছুঁতে পারি।
ভাসে আমার মন বৈঠার তরী
যেখানে উজলা ফসল ভরে তোর ভরা গাঙের বুকে
আমি কেনে নির্জলা তোর পিরিতির সুখে?
তোর মন বইঠা আমি বাইব রে তোর মাঝি
দেখাইতে তরে স্বপ্ন গাঙের তরি
আমার মনের বইঠা ধর রে তুই নারী
আমারে কোন স্বপ্নের তীরে ভিড়াইলি?

তাদের আলোর প্রদীপের সিঁড়ি বেয়ে, আকাশগাং-এর রাজপথ ধরে, দুহাত বাড়িয়ে, ওদের দেখান রাজপথে, ওই ক্ষীণ অথচ দৃপ্ত আলোর দিকে, তারাদের আলোর সিঁড়ি ধরে, একা হেঁটে চলেছিল নন্দিনী। গুটিগুটি পায় ছোট্ট নন্দিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে মহানন্দে হাততালি দিয়ে, হই হই করে উঠে, দ্বিগুণ জোরে মিটমিট করে জ্বলে উঠেছিল তারাগুলো। জ্বালিয়ে দিয়েছিল জোনাকির ফুলঝুরি - আকাশগাঙে আনন্দের মধুকর ডিঙাতে গিয়ে বসতে ওই স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুরের পাশে।

"তোমার জন্য কত যুগ ধরে বসে আছি আমি" রাজপুত্তুর নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলত "এত দেরি করলে কেন?"

"তোমাকে তো খুঁজে পাচ্ছিলাম না"

"কেন? আমি তো যুগযুগান্তর ধরে এই নৌকোয় ভেসে বেড়াচ্ছি"

"আমি তো দেখতে পাইনি"

"তুমি কী দেখতে চেয়েছিলে? আনমনা বেপথে হারিয়ে যাওয়া মনটাকে দেখার জন্য দৃষ্টি লাগে, এক নিপুণ শিল্পীর নিজের আলোয় দেখা ছবিটা, অকলুষিত ক্যানভাসে"

হয়ত তাই। একটা নিজস্ব দৃষ্টি লাগে। সেই দেখার হাতেখড়ি কী সেই কম বয়সে তুলি তুলে নেওয়ার প্রবণতা? সেই স্বপ্নভেলার জাগতিক হাতেখড়ি। সেই স্বপ্নের ভেলায় চেপে ওরা দুজনে ভেসে গিয়েছিল

বিস্তৃত মহাকালের স্রোতে।

অন্ধকার আকাশে ঝিকমিক করছে অজস্র তারা। সেই তারার আলোয় তৈরি হয়েছে এক অপূর্ব মায়াময় মূর্ছনা। কারা যেন হাজার হাজার সন্ধে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে সারা আকাশজুড়ে। কয়েকটি তারা সেই অন্ধকারের স্বপ্নলোকের সাগরে, এক এক করে জ্বালিয়ে দিচ্ছে ঝিকমিকে আলোর রংমশাল। দু-একটা বড়সড় তারা, ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে দেখছে এই অন্ধকারের বুকে অন্যান্য তারাদের সন্ধ্যারতি। কয়েকটা মেজো ধাঁচের তারারা, রজপুত্তুরের সঙ্গে সাধারণ মেয়ের উচ্ছল স্বপ্নবিহার দেখে, মিটমিট করে হেসে, ছিটিয়ে দিচ্ছে হাজার আলোর ফুলকির উলুধ্বনি। সেই দেখে, বাচ্চা তারাগুলো খিলখিল করে হেসে কুটিপাটি। নৌকোর চারপাশে দাপাদাপি করে, পুকুরপাড়ের উলঙ্গ শিশুদের মতো, ঝাঁপিয়ে পড়েছে আকাশগঙ্গায় স্নান করতে।

রাজপুত্তুর আলতো করে তার হাতটা নন্দিনীর কাঁধে বিছিয়ে বলল ‘‘আমার সঙ্গে যাবে?’’

“কোথায়?”

“যেখানে মেঘেরা খেলে বেড়ায় ওই নীল আকাশের কোণে। যেখানে পাখিরা কিচমিচ করে ছোট্ট একটা নীড়ে। যেখানে স্বপ্ন কখনও মুছে যায় না ওই মেঘপরিদের দেশে। তোমায় ওখানে পৌছতে হবে অমলিন এলোকেশে”

“যাব... যাব... যাব...”

এতদিন পরে বুঝি আবার সেই যাবার ডাক এল। নতুন সুরের ঝংকার বিটস-এ নতুন গান শোনাল। স্বপ্নমাখা নীল সমুদ্রে জাহাজে ভেসে নীল আকাশের কোলে।

নির্নিমেষ কঠোর অর্ণব এবারে কিছুটা মমতায় করুণ হয়ে বলল ‘‘পোর্টে গেলে কোনো ওয়াইফ পাবে না, লাইফ পাবে’’

“কী লাইফ?”

“ইপু হেকে... ইলি ইলি... উলি উলি... পুলি... কালা আউ... মেলে ইনোয়া”

“অ্যাঁ!” নন্দিনী বুঝে উঠতে পারছিল না, অর্ণব কী ভাষা বলছে।

“হ্যাঁ”

“মানে?”

“পুয়া আহিহি... কাও উইকা” মোবাইলটাকে খাটে ফেলে নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরল অর্ণব।

“এ...মা... দিন দুপুরে - এ কী করছ?” নন্দিনী নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। লোকটা বোধহয় পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে।

"আমার কিন্তু একটাই বউ এখানে। ওখানে আছে শুধু মেলে আলোহা ওয়ে..." একটু থেমে বলল "এটা কিন্তু রেগে বিট নয়, এগুল ট্র্যাডিশনল হাওয়াইন মিউসিক" বলতে বলতে দুহাত দিয়ে নন্দিনীর মুখটা ধরে ঠোঁটে চুমু খেল।

এর আগে এত পুরুষের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছে নন্দিনী। কিন্তু আজকে যেন প্রথম অনুভব করল সে এক নারী। সম্পূর্ণ নারী। যে ছবিটা সে দেখেছিল ছেলেবেলায়। স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুরের হাত ধরে ভাসতে ভাসতে ভেলায়। ওর চিবুকটা তুলে নিবিড় ভাবে তাকিয়েছিল নন্দিনীর দিকে। তারপর খুব আস্তে আস্তে রাজপুত্তুর ঠোঁটটা এগিয়ে আনছিল তার মুখের কাছে। হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে 'হুম্ হুম্' শব্দ করে স্বপ্নটা ভেঙে দিয়েছিল, জানলার কার্নিশ দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা পেঁচা। তার কানে 'হুম্ হুম্' শব্দটা 'ওঁ ওঁ' এর মতো শুনিয়েছিল।

গুমরানো কান্নায় ঘুমটা ভেঙে গেছিল। অক্ষমের হতাশার দীর্ঘশ্বাসের শীতল বাতাস যেন কোথা থেকে অন্ধকার ভেদ করে, জানলার ফাঁক দিয়ে, তার স্বপ্নটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছিল। তারপর অযুত জীবনের নিযুত ব্যর্থতার কালো কালো ধুলোর একটা ঝড়, যেন তার শ্রান্ত দেহের ফাঁক ফোঁকরে ঘুঘুর বাসা বেঁধেছিল এতকাল ধরে। শ্লথ শিথিল অনিশ্চয়তায় জীবনটাকে ভাসাতে ভাসাতে, ভুলেই ছিল সে নারী। শুধু একটা রক্তমাংস দিয়ে গড়া কুমোরটুলির সাজানো প্রতিমা নয়। তারও একটা সত্তা আছে। একটা আত্মা আছে। আছে একটা কোমল নারী মন।

অর্ণবের আলিঙ্গনে, তার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। একটা অচেনা কান্নার দলা তার গভীরের অলিন্দ-নিলয় থেকে উঠে এল। সেই কান্নার দলাটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগল তার গলা বেয়ে, তার সুষুম্নার ব্রহ্মনাড়ি ভেদ করে, স্পাইনাল কর্ড ছাড়িয়ে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে, স্মৃতির ভাণ্ডার অ্যামিগডালার অন্দরে। পৌঁছে গেল তার ইমোশনের গোপন কুঠরিতে, তার চেতনার অন্দরে, তার গভীর আপনার নিজের মন্দিরে - তার একান্ত আপন আত্মার ট্রেজার চেস্টে। ভরা বর্ষার জিয়া ভেড়ালির মতো, পাহাড় থেকে লাফিয়ে নামা সুবনসিরির মতো, ভরা অন্ধকারে ঢাকা তার বেপথে হাঁটা মনটাকে এলোমেলো করে, ভেতরের ইমোশনটাকে আলুথালু করে, ভাসিয়ে দিল অর্ণবের নিবিড় চুম্বন। জাগ্রত অবোধ মনটা আস্তে আস্তে ডুবে গেল এক তলহীন অন্ধকার ঘূর্ণীতে।

'ওঁ ওঁ'

পেঁচার ডাকটার যেন নতুন মানে খুঁজে পাচ্ছে। গভীরের এক নতুন শব্দ মন্ত্রোচ্চারণে। পেঁচার ডাক সে আগেও শুনেছে। কিন্তু এরকম তো কখনও মনে হয়নি। কোথায় যেন একটা শান্তির ওংকার ধ্বনি। হয়ত এত

বছর পরে, স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে একটা যুগলবন্দি টানতে চাইছে। তার দুচোখ বেয়ে নেমে এল এক আশ্চর্য কান্না।

কে যেন সেই কান্নার একটা নতুন ক্যানভাস আঁকছেঃ

নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্য

দশ

এতদিন জলে কাটানোর পরে অবশেষে একটু স্থল।

প্রথম প্রথম ভাল লাগলেও, শেষের দিকে নন্দিনী একটু হাঁপিয়েই উঠেছিল। এক সপ্তাহের ওপর শুধু জল আর জল আর জল। অবারিত নীল-এর সীমাহীন জল পার হয়ে মাটির ছবিটা দেখে মনটা আবার ময়ূরের মতো পেখম তুলে নেচে উঠল। যেন অনেক দিনের প্রতীক্ষায় শেষমেশ একটা মোহনায় পৌঁছেছে।

সত্যি কী?

"অ্যাট লাস্ট উই হ্যভ রিচড আওয়ার ডেসটিনেশন" অর্ণব দূর তিরের দিকে তাকিয়ে বলল।

"এটাই কী হনলুলু?"

"হাওয়াইয়ের ক্যপিট্যাল। আগে এখানে দু-বার এসেছি। কিন্তু তোমাকে নিয়ে আসার মজাটাই অন্য"

"হনিমুন ইন হাওয়াই" নন্দিনী নিজের মনে স্বগতোক্তি করল।

"হনিমুন ইন শিপ। তুমি বললে না লাস্ট পিরিয়ডটা মিস করেছ? হনলুলুতে নেমে একটা প্রেগ্রেন্যন্সি কিট কিনে একবার টেস্ট করিয়ে নিও"

নন্দিনীর মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। যতই অবজ্ঞা করুক না কেন, এক্সপ্রেশনের প্রতিটা স্তরে অজান্তে অলক্ষ্যে রংগুলো বারবার ফুটে ওঠে।ইনেভিটেবল রেসাল্ট অফ এ কনজুগ্যল ব্লিস। ভাবলেই নারী মন একটা সম্পূর্ণতার ছোঁয়া পায়। অজান্তে, রক্তিম পলাশের রং ছড়ায় জনসমক্ষে, আপাতবাস্তব ছবিটায়। হয়ত ভেতরে ভেতরে ধিক ধিক করে সুপ্ত চাওয়ার আগুনটায়, ফাগুন লাগাতে চায় বাইরের আলতা রং-এর স্পর্শ দিয়ে।

এইটুকু জীবনে এত জনের সঙ্গে ইন্টারকোর্স করেছে নন্দিনী। এর আগে তো কখনও এমন মনে হয়নি। এমনকী এই এতদিনে, দিনে একবারের বেশি অর্ণবের সঙ্গে সহবাস করার সময়ও নয়। তাহলে কী দৈহিক মিলনের মধ্যে সে রং নেই, যে রং ছড়িয়ে আছে তার ফসলে? ফসলটাই আসল। দেহের পরিতৃপ্তিটা একটা সাময়িক খিদে মাত্র। যার ছবি আঁকতে গিয়েও কোনো সৃষ্টি কোনোদিন অমরতা পায়নি।

যৌনতা কী তবে আমাদের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা প্রপাগেশন অফ জিনের মাধ্যমে, অন্তরের সুপ্ত ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ নয়? আর পাঁচটা নারীর মতোই কী নন্দিনীর অবচেতন, সেই অমরত্বের পিয়াসী?

"দ্য সুনার দ্য বেটার। আবার কোথায় কাজে দূরে চলে যাবে। আমারও তো একটা অবলম্বন চাই" নন্দিনী অর্ণবের চোখে, চোখ রেখে বলল।

“হোয়াই নট?”

অনেক রং-এর মেলায় এই রংটা দিয়ে কী নন্দিনী ক্যানভাসটা পূর্ণ করতে চাইছে? অখণ্ড নীলে আরেকটা রং ছড়াতে।

এক সপ্তাহ ধরে, পাথরবাটির নীল বারবার হাতছানি দিয়েছে। মিশে যেতে বলেছে ওই অখণ্ডতার গর্ভে। ঝাঁপিয়ে পড়ে নয়। দুচোখ ভরে আস্বাদন করতে তার সীমাহীনতাকে। তাই করেছে নন্দিনী। অর্ণব যখন জাহাজের কাজে ব্যস্ত, ক্যানভাস নিয়ে ডেকে বসে আঁকতে চেষ্টা করেছে সামনের দৃশ্যপট। পরম সুখে চেয়েছে দিগন্তহীন নীলিমাকে বন্দি করে রাখতে ক্যানভাসে। নন্দিনী দেখতে-দেখতে আঁকতে-আঁকতে হারিয়েছে আর এক স্বর্গে।

সেই ছোটবেলায় এক ঝলক দেখা স্বপ্নের স্বর্গ।

সেই স্বপ্নের রাজপুত্তুর তাকে ভেলাতে করে নিয়ে গেছিল মাঝ দরিয়ায়। সেখানেও ছিল এমনই অখণ্ড নীল। মুখে ভরে ছড়িয়েছিল দুষ্টু-মিষ্টি হাসি। নিবিড় ভাবে তাকিয়েছিল নন্দিনীর চোখের কাজলে। বলেছিল ‘‘স্বর্গটাকে পেতে গেলে তো পিরিতির সমুদ্রে ভাসতে হবে’’

“সেটা কোথায় গো?” গাঢ় চোখের পাতা মেলে ওর দিকে তাকিয়েছিল নন্দিনী।

“ওই সাত সমুদ্র তের নদীর পারে”

একটা সমুদ্র পার হতে গোটা সপ্তাহটা কেটে গেল। সমুদ্রের নীল-এর দিকে তাকিয়ে, নন্দিনী হিসেব করার চেষ্টা করছিল সাত সমুদ্র তের নদী পার হতে কদ্দিন লেগে যাবে - তার স্বপ্নের আঁতুড়ঘরে পৌঁছতে। আকাশে ভেসে বেড়ানো গাংচিলগুলো কী ওর থেকে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবে ওখানে? যেখানে সে স্বপ্ন খুঁজে বেড়াচ্ছে এতদিন ধরে।

সেই স্বপ্নের ছবিটা সে আঁকতে চায় ব্ল্যঙ্ক ক্যানভাসে।

“আমায় তুমি নিয়ে যাবে সেখানে?”

রাজপুত্তুর হাত ধরে বলেছিল ‘‘এস আমার সঙ্গে’’

হাত ধরে ভেলায় চেপে হারিয়ে যেতে যেতে স্বপ্নটা ভেঙে গেছিল ওই লক্ষ্মীপেঁচার শব্দে। তারপর এত বছর পার হয়ে গেছে। সেই সুখের স্বপ্নটা আর ফিরে আসেনি।

সেই স্বপ্নটাকে আজও খুঁজে চলেছে নন্দিনী।

জাহাজ হ্যান্ডওভারের পর অর্ণব বলল ‘‘অ্যাট লাস্ট ফ্রি। চল তোমাকে হনলুলু দেখিয়ে আনি’’ টুরিস্ট অ্যাট্র্যাকশনস এর লিস্টটা হাতে নিয়ে বলে চলল ‘‘কত কিছুই তো দেখার আছে। সব তো আর দেখা যাবে না। যে কটা ঘুরে দেখা যায়’’

পার্ল হারবার এন্ড ইউএসএস এরিজোনা মেমোরিয়াল, ওয়াইকিকি, লিওন আরবরেটাম আর মানোয়া ফলস, আওলানি প্যালেস, আলা মোয়ানা পার্ক, কুইন এমা সামার প্যালেস, ফসটার বটানিক্যল গার্ডেন, প্ল্যনেটরিয়াম আর বিশপ মিউসিয়াম, মিশন হাউস মিউসিয়াম, পু উলাকা স্টেট পার্ক, স্পিটিং কেভ অফ পোর্টলক দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে নন্দিনী বলল ‘‘দিস আর রেমেনেন্টস অফ অ্যামেরিকান অকুপেশন অফ হাওয়াই। এমন কিছু নেই যেটা ট্র্যডিশন্যল?’’

এংকরওয়াটের স্মৃতি মনে পরে যাচ্ছিল। সেখানে একটা প্রাচীন কালচারকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। নন্দিনী যেন সব সময় কৃত্রিমতার বাইরে আনস্প্যয়েল্ট ফর্মটাকে খুঁজছে। এই কদিন অর্ণবের সঙ্গে ঘুরেও তো সেটা পেল না। যা দেখল, সেগুলো তো মিউসিয়ামগুলোর মতোই অ্যামেরিকান ইনফ্লুয়েন্স সাজানো। সেখানে তো হনলুলু নেই। সেখানে তো হাওয়াই নেই। একটা সদ্য পাঁচমিশালি কালচারলেস আয়োজন তাদের আধিপত্যের জয়ধ্বনির ট্রাম্পেট বাজাচ্ছে। অথচ নন্দিনী সেই আদি অকৃত্রিম সভ্যতার ছবিটাই খুঁজছে। সেটাই তো একটা দেশের আসল ক্যানভাস।

অর্ণব বুঝল নন্দিনী প্রাচীন হাওয়াইকেই খুঁজছে।

“আজ শনিবার না?”

“হ্যাঁ”

“তাহলে চল তোমায় ওয়াইকিকি বীচে নিয়ে যাই”

“শনিবারে কী স্পেশাল আছে?”

“আগে যখন একবার এসেছিলাম, প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিবার সন্ধেবেলা সেখানে হুলা ডান্স হত। খোঁজ নিয়ে দেখি। এখনও হয় বোধহয়” একটু থেমে বলল “ঠিক নামটা মনে করতে পারছি না। সম্ভবত কুহিও বীচ টর্চ লাইটিং মনে হচ্ছে”

নাচের কথায় নন্দিনী ফিরে গেল তার ভরতনাট্যমের দিনে। হয়ত খাজুরাহ ডান্স ফেস্টিভ্যলের স্মৃতি বেদনাদায়ক। তবু রক্তে নাচের বীজটা যে আজও বিলীন হয়ে যায়নি। তাই আজও নাচের কথা শুনলে মনটা ময়ূরের মতো নেচে ওঠে। সে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য নৃত্য, যাই হোক না কেন।

ওয়াইকিকি বীচে উলিনিউ আর কালাকাউয়া এভিনিউর সংযোগে ওরা খুঁজছিল কুহিও বীচ হুলা মাউন্ড। বেশি খুঁজতে হল না। বড় বড় বট গাছের ফাঁকে ডিউক কাহানমোকুর স্ট্যচুর কাছে পেয়ে গেল। এখন সাড়ে পাঁচটা। ছ’টা থেকে প্রোগ্রাম শুরু।

“এত জায়গা থাকতে এখানে নিয়ে এলে কেন?” নন্দিনী অর্ণবকে জিজ্ঞেস করল।

“এটা ফ্রি। তাছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশে হুলা নাচ দেখার একটা মজা আছে”

ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা বাজতেই ভিড়ের মধ্যে থেকে লাল-হলুদ সেরিমোনিয়াল কেপ পরা একজন মধ্যবয়সি লোক এক বিশাল হাওয়াইয়ান শাঁখ দিয়ে সূচনা করল। তারপর ধীর সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে বীচের ডায়াসের ধারে এক এক করে মশালগুলো জ্বালিয়ে দিল।

তারপর, সূর্যাস্তকে পেছনে ফেলে ওই শিখায় শুরু হল সপ্ত রঙে সাজা যুবক-যুবতিদের বাজনার তালে তালে হুলা নৃত্য। কিছুক্ষণ পর কণ্ঠ মিলল বাজনার ছন্দে - আলো ওয়ে, হিলা ওয়ে, পুয়া আহিহি... ছন্দের মধ্যে দেহের বন্দনা।

রঙিন ভেল্কির মধ্যে নন্দিনী আসল রংটা খুঁজছিল। সূর্যাস্তের আলো-আঁধারে, জ্বলে ওঠা মশালের আলোতে, নানা রং-এর ছন্দ বন্দনা মন্দ লাগছিল না। তবু নন্দিনীর মনে হল, এর মধ্যে কোথাও যেন একটা কৃত্রিমতায় মোড়া এই প্রোগ্রাম।

অর্ণবকে বলল ''স্পেলনডর আছে বাট লাইফ নেই''

"কেন? এটাই তো হুলা ডান্স। গানগুলো ভাল লাগছে না?"

"গানগুলোর নিজস্ব একটা বিট আছে। মন্দ নয়। কিন্তু নাচের মধ্যে কোথায় যেন প্রাণ নেই"

নন্দিনীর শিল্পীমন ছন্দের বন্দনা জানে হৃদয়ের স্পর্শে। কোথায় যেন প্রোগ্রামটা তাকে ছুঁতে পারছে না। সেই গভীর কোণে, যেখানে সরগম থেকে নিখাদ মিশে যায় রামধনুর সাতটা রঙে। যেখানে মন জেগে ওঠে তালের মূর্ছনায়, চোখ ভরে যায় নৃত্যের পশরায়। যেখানে দেহ বসে থাকতে রাজি নয় দর্শকের আসনে। যোগ দিতে চায় ওদের তালে পা মেলাতে অন্তরের ছন্দে। অতৃপ্ত মনটা আরও কিছু চায়।

"হাওয়াই-এর কোনো ট্র্যাডিশনাল ডান্স প্রোগ্রামে নিয়ে যেতে পারবে?"

"এক সময় যে সাবেকি হুলা ডান্স হত, এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। শুনেছি ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে অ্যামেরিকান মিশনারিরা হাওয়াইতে এসে সেই নাচ বন্ধ করে দেয়"

"কেন?"

"ঠিক জানা নেই। শুনেছিলাম ওদের ধারণা হয়েছিল, সেই সময়কার হাওয়াইয়ান নাচের কস্টিউম আর জাইরেশন মানুষের মধ্যে সেক্সুয়াল ফিলিংস উদ্রেক করে"

"তাই কী?"

"কী জানি! আগেরবার এসে যেটুকু শুনেছিলাম, এই নাচ দেবতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। ঠিক আমাদের ভরতনাট্যমের মতো। সেই সংস্কৃতির দেবীপূজা কী করে যে পাদ্রিদের কাছে ইরটিক হয়ে গেল, কে জানে?"

"যত...ত...সব। ধর্মের নামে ভণ্ডামি। কবে যে ধর্মের নামে সংস্কৃতিকে কিনে নেওয়ার নেশাটা ঘুচবে, কে জানে?"

অর্ণব হেসে বলল ‘‘কোনোদিনও নয়। আফটার অল রিলিজিয়ান ইজ দ্য হায়েস্ট অর্ডার অফ পলিটিক্স। শুনেছি ওরা হাওয়াইয়ান রয়েলটিকে ক্রিসচ্যনিটিতে কনভার্ট করার পর, রাজা এদেশে ট্র্যাডিশনাল হুলা ডান্স বন্ধ করে দেয়’’

নন্দিনী আবদার করে বলল ‘‘তবুও খুঁজে দেখ না, এখনও কোথাও হয় কি না। কোনো রিমোট ভিলেজে’’

অবশেষে ছোট্ট একটা গ্রামের খোঁজ পাওয়া গেল হনলুলুর বাইরে সমুদ্রের ধারে।

“পাকালা ভিলেজ। সেখানে এখনও গ্রামীণ পরিবেশে সাবেকি প্রথা বর্তমান। যাবে?”

শুনেই নন্দিনী লাফিয়ে উঠল ‘‘চল না একবার ঘুরে আসি। এতদিন ধরে যে জায়গাগুলো দেখলাম, সব তো টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন। এবার একটু নন-টুরিস্ট স্পট ঘুরে দেখি’’

“সেখানে কিন্তু ভাল থাকার জায়গা নেই। পারবে ওই পরিবেশে থাকতে?”

“পারব” নন্দিনী জোর গলায় বলল।

অবশেষে তারা হো’আনুআনু বের ধারে পাকালা ভিলেজে পৌঁছল। কয়েকশো লোকের বসবাস। সেখানে বাঁশের মাচার ওপর বাঁশে তৈরি খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর। চারদিকে নারকেল গাছের সারি। ফাঁক দিয়ে অকৃত্রিম বিস্তারে সমুদ্র।

“লাভলি!” নন্দিনী সিঁড়িতে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল।

নারকেল গাছের আলোছায়ার ফাঁক দিয়ে সমুদ্দুরের কোলে ঘুমিয়ে পড়ার আগে, সুয্যিমামা ছোট্ট শিশুটির মতো ফিক ফিক করে হাসছে। লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে দূরের সন্ধের সঙ্গে। লাল ধুলো মেখে হুটোপাটি। পালিয়ে বেড়াচ্ছে দূর থেকে ধেয়ে আসা অন্ধকারের আস্তিন গোটানো নীল সমুদ্রের পারে।

“তুমি বস। আমি কয়েকটা ছবি তুলে আসি” অর্ণব ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিয়ের এতদিনের মধ্যে নন্দিনী অর্ণবের ছবি তোলার নেশাটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। কাঁধে সব সময়ই ক্যামেরাটা ঝুলছে। যখন পারছে দুমদাম ক্লিক করে যাচ্ছে। প্রকৃতি থেকে নন্দিনী। এই ক’দিনে নন্দিনীর কত যে ছবি তুলছে তার ইয়ত্তা নেই। বেরতে বেরতেও সিঁড়িতে বসা বেশ কয়েকটা ছবি তুলে ফেলল।

তাই দেখে নন্দিনী হেসে উঠে বলল ‘‘জংলি ড্রেসে এই জংলির কত ছবি তুলবে?’’

“এখনও জংলি হইনি। রাতে হব”

পড়ন্ত দিনের লাল সূর্যের আভা নন্দিনীর মুখে ছড়িয়ে, কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই হাঁটা দিল।

এই গ্রামীণ পরিবেশে নন্দিনী মনের ক্যানভাসটা মেলে ধরল রং-এর খোঁজে। দূর দিগন্তের বেগুনি আভা, সাগরের নীল, নারকেল গাছের সবুজ, সূর্যের হলদে কিরণ, আর নিজের পরা লাল-কমলা স্কার্ট ব্লাউসকে, কে যেন এক সূত্রে বাঁধতে চাইছে নিজের মনের সপ্ত রঙে। মন ভেসে চলেছে ওই স্বপ্ন পরিদের দেশে। যেটা মিলেছে মেঠো পথের বাঁকে। প্রকৃতি যেন নিজের দরজা খুলে ডাক দিচ্ছে 'আয়...আয়...আয়... আমার কোলে। শোনাব তোকে আজকে রাতের গান। আমার তালে ছন্দ মেলাবি, ভরবে রে তোর প্রাণ। সমুদ্দুরের সুরে গাইবি আবার নতুন গান'

গানটা নন্দিনীর গাওয়া হল না।

সন্ধে নামতেই পুরুষ মহিলারা চারধারে মশাল জ্বেলে নিউতে[11] মাই তাই[12] নিয়ে বসে পরল। ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যারতি শুরু হবে। নাচের তালে প্রকৃতির বন্দনা। কিংবা প্রাচীন দেবতার আরাধনা।

ওদের পরনে গাছের ছাল দিয়ে তৈরি পা'উ, গাছের পাতা, ফুলের লেই, কুকুই নাট। সেই আভরণ ছড়িয়ে পরেছে গলা থেকে হাতের কব্জিতে, পায়ের বেষ্টনীতে ছন্দের বন্দনা, নূপুর নিক্বণে। ওদের কাছেই শুনল নাচের শেষে এই পরিধানের পবিত্রতার কথা। নাচের শেষে এই বেশ তারা অর্পণ করবে দেবী লাকার চরণে। ওদের সংস্কৃতিতে পুরুষ মহিলা কারো ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনো আবরণ নেই। মহিলাদের অনাবৃত স্তনে কোনো কামনা নেই। এটাই পবিত্র ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ।

ইচ্ছে থাকলেও অর্ণব ছবি তোলা থেকে বিরত। সাবেক গ্রামবাসী সভ্যতার অসভ্যতা ভাল চোখে নেয় না। নন্দিনী লক্ষ করছিল ওই তরুণীদের নিষ্পাপ স্তনের মাধুর্য। যেটা ওদের কাছে দেবী লাকার বরমাল্য। অকৃত্রিম নৈসর্গিক পরিবেশে দৈহিক সৌষ্ঠবের এক বিশেষ মাধুর্য আছে।

লোকমুখে শুনেছে, এক সময় ওরা এভাবেই থাকত। প্রকৃতির কোলে, প্রাকৃতিক বেশে, গানে-নাচে প্রাকৃতিক বন্দনায় ভরে থাকত ওদের সহজ সরল জীবন। যতদিন না অ্যামেরিকান মিশনারিরা সভ্যতার ভয়াবহ কুটিল থাবায় ওদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করে। কৃষ্টির নামে সাম্রাজ্যের বিকাশ, আর ধর্মের নামে, ওদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিলীন করে দিতে চাইল, এক কাল্পনিক ঈশ্বরকে সামনে খাড়া করে। সভ্যতা এল। সঙ্গে নিয়ে মানুষের অন্তরের কুটিল নগ্নতা। প্রাকৃতিক সাজে সাজা নারীদের বিক্রি করতে সক্ষম হল ইরটিজমের নগ্নতায়। নিয়ে এল সিফিলিস। নিয়ে এল কুটিল সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ অহংকারর উন্মাদ তাণ্ডব। বিক্রি হয়ে গেল ওদের রাজাধিরাজ। বিক্রি হয়ে গেল কোমলতা। বিক্রি হয়ে গেল নিষ্পাপ সারল্যে ভরা বনলতার কোলে বড় হওয়া মাধবীলতা।

বাজনার তালে তালে, সারি দিয়ে নেচে চলেছে কমবয়সি পুরুষ ও নারী। মধ্যবয়সি ও বৃদ্ধরা একপাশে বসে মাই তাই-এর নেশায় ডুবে যাচ্ছে। অদ্ভুত লাগল, কেউ কিন্তু কোনো ধরনের তামাক সেবন করছে না। মাই মাই-এর নেশায় নাচের ছন্দে নন্দিনীর সারা দেহে অনুভূতির রং ছড়িয়ে, পাকালা গ্রামের দেবী বন্দনায়, মন নেচে উঠল নতুন ছন্দে। আনন্দের স্পর্শ চুমু খেয়ে যাচ্ছে দেহের প্রতিটা কোষে। সভ্যতার নাগপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকৃতির কোলে মিশে যেতে।

নন্দিনীকে একটু তাড়াতাড়ি খেতে দেখে অর্ণব কানে কানে ফিসফিস করে বলল ‘‘এটা হুইস্কি নয়। এর আগে কখনও খাওনি। কত স্ট্রং জান না। একটু ধীরে সুস্থে খেও’’

“আমার কিসসু হবে না। এই মস্ত সময় সংযমের কোনো মানেই হয় না” নন্দিনীর ভেতর থেকে যেন আনন্দের ঐকতান সুরধ্বনি তুলছে ছন্দে হারিয়ে যাওয়ার স্রোতে।

পাশে বসা কিছু কমবয়সি গৃহবধূদের দিকে ফিরে বলল ‘‘ইজ দেয়ার এ নেম ফর দিস ডান্স?’’

ওদের মধ্যে একজন বলল ‘‘দ্য নেম অরিজিনালি ওয়াজ হুলা কাহিকো, দো দ্য ফর্ম মে হ্যভ চেঞ্জড নাউ। আই ডু নট নো অ্যাবাউট ইট ইন ডিটেলস’’

“ডোন্ট ইউ লিভ হিয়ার?”

“নো। আই স্টাডি ইন সান ফ্রান্সিসকো। আই হ্যভ কাম টু ভিসিট মাই গ্র্যন্ডমা। অল আই নো ইজ, দে হ্যভ এ স্ট্রিক্ট লেজিসলেচার। ডিওরিং সেরিমনিস, ইফ এনি মিস্টেক্স আর মেড, ইট ইজ কন্সিডারড ইন আওয়ার ট্র্যাডিশন অ্যাজ এ ভেরি ব্যড ওমেন। গডেস লাকা উইল নট ফরগিভ দেম”

ঠিক দেশীয় ভরতনাট্যমের মতো। কোথায় যেন আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অদ্ভুত মিল খুঁজে পাচ্ছে নন্দিনী। এক সময় ভরতনাট্যম শেখা নন্দিনী দেবতার স্তুতির ঘরানাটাও অনুভব করছে। দুঃখ হচ্ছে ভেবে, এই সাবেকি ঘরানাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কীভাবে পিষে দিয়ে গেছে ধর্মের নামে।

ধ্যত...

এসব ভেবে কী হবে?

ভাবনার জটগুলো ক্রমশ শিথিল। নেশার ছন্দে আবছা হয়ে আসা নাচের তালে আনন্দ। উঠে পড়ল নন্দিনী। ওদের দলে ভিড়ে পা মেলাতে উদ্যোগী হল। ওরা হাত ধরে অকৃত্রিম, টেনে নিল ওকে। ঘোরে, ওদের পায়ে পা মিলিয়ে, নিজের আনন্দে নেচে চলেছে নন্দিনী। এখানে কোনো রং নেই, তবু যৌবন আছে। এখানে কোনো ভড়ং নেই, প্রাণ আছে। কোনো ছবি নেই, তবু মনের চোখে দেখা একটা আবছা ক্যানভাস আছে।

নাচ শেষ হতে না-হতেই, এক বৃদ্ধা মহিলা উঠে এসে নন্দিনীর হাতটা চেপে ধরল। বিড়বিড় করে কী যেন বলে যাচ্ছে। ওদের ভাষা কিছুই বুঝতে পারছে না। হাতটা ধরেই রেখেছে। কিছুতেই ছাড়ছে না।

প্রতিবাদ না করে বৃদ্ধার পাশে দাঁড়িয়ে।

নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে চলেছে ‘‘এনুএনুয়ে এ... আনা প্যালেমো’’[13]

একটু থেমে আবার বলল ‘‘প্যালেমো এ... আনা হুলা হুলা’’[14]

আবারও বিড়বিড় করে বলল ‘‘লা লিও কানে এ... আনা আলানা’’[15]

নন্দিনীর হাত চাপ দিয়ে আবার ওই তিনটে পঙক্তি বিড়বিড় করে বলতে বলতে, এক সময় নন্দিনীর হাত ছেড়ে গাছের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

মাই তাই-এর নেশা, নাচের ক্লান্তি। ভাষা বুঝলেও তা নন্দিনীর বোধগম্য হত না।

সান ফ্রান্সিসকোতে পড়া মেয়েটার দিকে এগিয়ে গিয়ে নন্দিনী জিজ্ঞেস করল ‘‘হোয়াট ওয়াজ দ্য ওল্ড লেডি সেয়িং?’’

“সি ইজ মাই গ্রন্ডমা। সি ইজ ক্রেজি। অল নাটস। সি গোস অন উইথ হার ওন প্রেডিকশনস অল দ্য টাইম। নোবডি গিভস হার এনি হিড”

“স্টিল! হোয়াট ওয়াজ সি সেয়িং?”

“সি সেইড ‘রেনবো উইল সিঙ্ক’‘ডার্কনেস অফ ডান্স উইল কাম’‘সান অফ মিউসিক উইল রাইজ’”

ঘোরে এমনিতেই মাথাটা ঝিমঝিম করছে। মেয়েটির কথাগুলোই ঠিকভাবে বুঝতে পারছে না। তার ওপর গ্র্যান্ডমার কথাগুলো যেন সব কিছুকে কেমন ওলটপালট করে দিল। বুঝতে পারেনি ড্রিঙ্কটা এত স্ট্রং। খড়ের চালের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তে চাইছে। একটু ঘুম। বাস্তব থেকে স্বপ্নে যেতে। কিছুক্ষণ আগেই স্বপ্নের দেশে চলে গেছিল। গ্র্যান্ডমা তাকে ফিরিয়ে এনেছে বাস্তবের কঠোর আঙিনায়। হোক সে পাগল। হয়ত কথাগুলো নিছক পাগলামি। আবার নাও হতে পারে। নন্দিনীর মনে হল হঠাৎ তার হাত ধরেই বা পাগলামো করতে যাবে কেন বুড়ি?

‘‘কাম... টেস্ট আওয়ার কী-আহ-ভে[16]’’ মেয়েটি ডাকল।

“ওয়ান্ট টু স্লিপ” অর্ণবের দিকে ফিরে বলল “তুমি খেয়ে নাও। আমি শুতে যাচ্ছি”

পেছন ফিরে না তাকিয়ে হেঁটে চলল খড়ের চালের ডেরায়। কোনো এক অজানা কারণে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। গ্র্যান্ডমার কথায় এক অজানা আশংকায় বুকটা ছটফট করছে।

কীসের ভয়?

কে জানে?

ভয় হয়ত একটাই।

সুখের স্বপ্নটাকে ভাঙতে চায় না। সেও আর পাঁচজনের মতো স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চায় বাস্তবকে দূরে সরিয়ে রেখে।

---

11 নারকেল মালা

12 হাওয়াই এর ড্রিঙ্ক

13 রেনবো উইলসিঙ্ক

14 ডার্কনেস অফ ডান্স উইলকাম

15 সান অফ মিউসিক উইল রাইজ

16 সিফুড

এগারো

কিন্তু না।

স্বপ্ন ভেঙে বাস্তব ফিরিয়ে আনে মাটির পৃথিবীতে। পূর্ণতার মজলিস থেকে শূন্যতার ক্রুর ক্যানভাসে। ছবিটা আঁকতে গিয়েও ছবিটা সম্পূর্ণ হয় না। মুছে যায় জীবনের চোরাবালির স্রোতে। আলো থেকে অন্ধকারের রিক্ত নিঃস্বতায়।

রং মিলিয়ে, বারবার ছবিটাকে নন্দিনী আঁকতে চেয়েছে আলোর উদ্ভাসে। হয়ত দীপ্ত আলোর রোশনাইতে সেভাবেই আমরা সবাই রং নিয়ে খেলি। নন্দিনীও খেলছিল সেভাবে। দিনের আলোর বর্ণচ্ছটার দৃপ্তিতে। কিন্তু নিকষ কালো অন্ধকারের গভীর অলিন্দেও তো সপ্ত রং-এর ক্যালিডিওস্কপ ঘোরে। সেখানেই রং-এর বর্ণালি মিশে যায়। কালোয়। আঁধার করে আলো-কে।

সেই ধূসর কালো অন্ধকারটাই সঙ্গী। সাত বছরের অনীশকে বুকে আগলে, অর্ণবকে অ্যাটলান্টিকের ওপারে ফেলে, নায়েগ্রা থেকে কলকাতায় ফিরেছিল নন্দিনী। অ্যামেরিকাকে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেশন করতে দিয়ে, নিজের ইচ্ছার পরাধীনতাকে ফেলে, অকল্পিত স্বাধীনতায় নিঃস্ব, শূন্য, অর্ণবহীন সল্ট লেকের বাড়িতে। তিল তিল করে এই ক'বছরে গড়ে তোলা ছবি, জীবনের রং দিয়ে আঁকা ক্যানভাস যে হঠাৎ একটা তুলির টানে এক নিমেষে মুছে যাবে, ভাবতেও পারেনি।

অথচ এমনই হল।

অর্ণবের ছোটবেলার পাড়ার কল্লোলদা উদাস নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল ''এরপর?''

"জানি না। ভাবি না" কল্লোলদার দিকে ফ্যাকাসে দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে বলল "ভাবতে চাই না। আচ্ছা, ভেবে কী কোনো লাভ আছে?"

"হয়ত নেই। যেটুকু আছে, তার মধ্যেই গুছিয়ে নিতে হবে"

"পড়ে আছে শুধু এই সল্ট লেকের প্রাসাদটা। সেখানে অনীশ, নারায়ণ আর একা আমি"

'একা' শব্দটায় কী বেশি জোর দিয়েছিল নন্দিনী? মাঝে মাঝে নিজের অজান্তে অনেক শব্দের ব্যঞ্জনা বেরিয়ে আসে, যা মনেও রাখা যায় না।

সেদিন আর বেশি কিছু বলতে পারেনি কল্লোলদা। সেই মুহূর্তে বলাও যায় না। হয়ত বলতে চাইছিল 'তোমার বয়স এখনও কম। সারা জীবন পড়ে আছে। অনীশের কথা ভেবে কী আবার জীবনের দিকে তাকানো যায় না?'

ছন্নছাড়া জীবনটাকে মালা দিয়ে গেঁথে তো ক্যানভাসটাকেই সজীব করতে চেয়েছিল নন্দিনী। আর পাঁচটা মেয়ের মতো স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিল অর্ণব আর অনীশকে নিয়ে। স্বাভাবিক জীবনের ছবি। সংসারের ছবি। ভালবাসার তুলি দিয়ে আঁকা চেনা ক্যানভাসে।

যেদিন অনীশ হল, অর্ণবের সে কি উচ্ছ্বাস!

"উ...লি আমার সোনাটা। তোকে নিয়ে আমরা সারা পৃথিবী ঘুরব জাহাজে করে"

ঘোরাটা অসমাপ্ত রেখে চলে গেল। শূন্যতা থেকে পূর্ণতা, আবার শূন্যতা - জীবনের একটা সার্কেল। তার থেকে কেকের মতো একাংশ কেটে নিলে, সেটাও জীবন, সেটাও স্বপ্ন, সেটাও সম্পর্ক, প্রত্যেকটা অংশই এক-একটা রং। বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্যালিডস্কপের চোখে খেলে যাচ্ছে নানা বর্ণে - একটা সম্পূর্ণ ছবি আঁকছে। কোনো রং-ই এককভাবে পূর্ণ নয়। তাই অসমাপ্ত ছবিটা শেষ হওয়ার আগেই, হারিয়ে যাচ্ছে রংহীন ধূসরে।

তবুও, এই সাত বছরে জীবনের স্লাইসে অনেক রং তো ছিল। যখন নন্দিনী গাড় নীল রঙের শাড়ি পরে বেরবার জন্য তোড়জোড় করত, অর্ণব প্রতিবাদ করে বলত ''না...না... এ শাড়িটা ভাল লাগছে না''

"কেন?" নন্দিনী তির্যক তাকিয়ে প্রশ্ন করত।

"কেমন ডিপ্রেসিং... বর্ষার কালো মেঘের মতো। তোমার চেহারাটাকে ম্লান করে দিয়েছে"

"তো কী পরব?"

"সামথিং ব্রাইট অ্যান্ড এনকারেজিং"

শাড়িটা পালটে হলুদ শাড়িতে নিজেকে মুড়িয়ে নন্দিনী বলত ''এটা? চলবে তো?''

"বাঃ... এটা তো বেশ। তোমাকে দারুণ মানিয়েছে। আই লাইক ব্রাইট কালারস। আই ডোন্ট ফ্যান্সি ডার্কনেস। উইথ ইউ অ্যান্ড অনীশ অ্যারাউন্ড স্প্রিং ইজ অন দ্য কারডস। ইওর ড্রেস রিফ্লেক্টস দ্য ইটারনাল কালারস অফ দ্য পারপেচুয়াল স্প্রিং"

নন্দিনী ঠাট্টা করে বলত ''স্প্রিংটা তো মনে। ওটা কী শাড়ির রঙে?''

"হয়ত ওই রংটাই স্বপ্ন দেখতে শেখায়... কে জানে?"

"এত রং নিয়ে স্বপ্ন দেখার কিছু নেই। রং ছাড়াও আমি থাকব। অনীশ থাকবে"

ওরা থেকে গেল। নিজের রঙটাই মুছে দিল অর্ণব।

বাইরের রং-এর প্রতি অনীহা বলেই কি, নন্দিনী অন্তরের রং খুঁজতে চাইছিল? কিংবা শুধু বাসন্তী রং দিয়ে নয়, সব রং দিয়েই একটা ছবি আঁকতে চাইছিল। হয়ত অর্ণবের কাছে রং-এর মাধুর্য তার বহিঃপ্রকাশের মধ্যে। নন্দিনী হয়ত সেখানে অন্তরের রংটাই খুঁজতে চেয়েছিল।

"বউ সুন্দর রঙে সাজলে কার না ভাল লাগে?"

"শুধু বাইরের রংটাই দেখলে? মনের রংটা দেখলে না?"

নন্দিনীর কথায় লজ্জা পেয়ে যেত অর্ণব। অর্ণবের ফটোগ্রাফারের দৃষ্টি বাইরের রংটাই খুঁজছিল। নন্দিনীর শিল্পীর অনভুতি তাকে অন্তরের ক্যানভাসটা আঁকবার রং ধরিয়ে দিচ্ছিল।

সাত বছরের বিবাহিত জীবনে, রামধনুর রং-এর বাহার দিয়ে জীবনটা আঁকলেও, মুহূর্তের মধ্যে নায়েগ্রা ফলসের রেইলস। সীমিত রেসিস্টেন্সটা হঠাৎই কে যেন বিদীর্ণ করে দিল এক মুহূর্তে - ভাসিয়ে নিয়ে অর্ণবকে বহু রং-এর সংমিশ্রণ থেকে ধূসর অন্ধকারে। সব রং মিশে গেল এক বর্ণহীন কালোর ধূসরে - নিউটনের কালার থিওরির মতো।

"কী করবে? কিছু ঠিক করলে?" কল্লোলদা আবার প্রশ্নটা করল।

"কী বলতে চাইছেন কল্লোলদা? আবার বিয়ে করতে?"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল কল্লোলদা "তোমার আর অনীশের সারা জীবন পড়ে আছে। তোমার কথা ভুলেও, অন্তত অনীশের কথা ভেবে তো একটা স্ট্যাবিলিটি খুঁজতে পারো। আমি জানি যেখানেই থাকুক না কেন, অর্ণব তাতে খুশি হবে"

"আনস্ট্যাবিলিটির মধ্যেই স্ট্যাবিলিটি - এটাই তো আমার জীবন কল্লোলদা। এর বেশি আশা করাটাই ভুল। এইটুকুর মধ্যেই অনীশকে মানুষ করতে পারব"

সিদ্ধান্তে নন্দিনী যে দৃঢ়, একটুও বুঝতে অসুবিধা হয়নি কল্লোলদার। আলট্রা মেরিন্সে ফিরে যায়নি নন্দিনী। যদিও অফারটা খোলাই ছিল। অর্ণবকে ততটা সময় দিতে পারবে না ফুল টাইম চাকরি করলে। পৈতৃক সূত্রে অর্ণবের যা প্রপার্টি আর এতদিনে সে যা কামিয়েছে, সঙ্গে সল্ট লেকের সিডি ব্লকে অর্ণবের বাড়িটা নিয়ে কিছু না করেও মায়ে-বেটায় দিব্যি চলে যাবে। কিন্তু কিছু না করে কী থাকা যায়?

নীচের তলায় আবার রং তুলি। ছবি আঁকার ক্লাস। এতদিন কাজগুলো করেছে পেটের তাগিদে। এবার করবে মনের তৃপ্তির জন্য। নিজেকে রোজগারের দাস না করে, মনের আবরণের বিকাশে ঢেকে দিতে চাইল, তার থেমে যাওয়া জীবনটাকে। আর র‍্যাট রেসে ছোঁটা নয়। এবার একটু বিশ্রাম চাই অনীশকে নিয়ে। অনীশটা মানুষ না হলে, তার জীবনে আর রইলটা কী?

টনিদা কলকাতায় এলেই তার বাড়িতে ওঠে। এখানে হংকং এর কোনো আভিজাত্য নেই। আছে একটা নির্মল সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবেশ। ওই কৃত্রিম মাদকতা থেকে নন্দিনীর স্নিগ্ধতাটাই ওকে বেশি টানে। চুল আরও সাদা। মেদ বেড়েছে। টনিদা ঠিক আগের মতোই। ছোটবেলায় কাকুলিয়া রোডের বাড়িতে যেমন। পাজামা পাঞ্জাবি পরে সেই ঘরোয়া। এন্থনি মিত্রের পৃথিবীটা পালটে গেলেও, সে পালটায়নি।

সিডি ব্লকের বারান্দায় বসে সামনের মাঠটার দিকে তাকিয়ে পাশে বসা নন্দিনীকে বলল ‘‘তুমি একদিন বলেছিলে মেক বেস্ট আউট অফ দ্য ওয়ার্স্ট- ইজ দিস দ্য বেস্ট অফ দ্য ওয়ার্স্ট?’’

“অ্যাট লিস্ট ফর মি। অনেক তো ঘোরা হল, অনেক তো দেখা হল, একদিন একটা সম্পূর্ণ সংসারের ভাবনা নিয়ে তোমার অফার। কলকাতায় ফিরেছিলাম। মাঝে জীবনে আরেকটা অ্যাডিশন অনীশ। এখন ওকে নিয়ে দিব্যি আছি। এর বাইরের সব রংগুলো তো ক্লিসে, একটা চেনা ছবি”

“তোমার অনীশের ছবিটাও তো চেনা”

“ওই যে মাঠের গাছগুলো, ওগুলোও কিন্তু নিজের মতো একা দাঁড়িয়ে। ওদের ভরাট করে রেখেছে সবুজ পাতার রং”

“ওই বসন্ত থেকে শরৎ পর্যন্ত। শীত পড়লে পাতাগুলো ঝরে পড়বে। তখন পড়ে থাকবে শক্ত গাছের গুঁড়ি”

“শীতের কথা ভেবে কী হবে টনিদা? জীবনের সাইকেলটা তো ঋতুর মতো ঘুরতেই থাকে। ছবি আঁকা শেখাচ্ছি তো। এখন আরও বেশি করে বুঝতে পারছি, জীবনের রংগুলো অনেকটা নিউটনের কালার হুইলের মতো। সাতটা রং দিয়ে আরও সাত হাজার রং তৈরি করা যায়, কিন্তু এত রং দিয়েও সম্পূর্ণ ছবিটা আঁকা যায় না”

টনিদা গরম কফিতে চুমুক দিয়ে বলল ‘‘তুমি কি এখন কোনো ছবি আঁকছ?’’

নন্দিনী চুলটাকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে বলল ‘‘হ্যাঁ... একটা ছবি অনেক বছর ধরে আঁকছি। অর্ণব যাওয়ার পর থেকেই...’’

“আমাকে দেখাওনি তো”

“এখনও শেষ হয়নি। শেষ হলে দেখাব। ইনকমপ্লিট ছবি দেখে কী করবে? তার থেকে কমপ্লিট হলে দেখ”

“হোয়েনেভার ইউ থিংক ইউ হ্যভ কমপ্লিটেড”

টনিদা বুঝতে পারছে, নন্দিনী সারা জীবন ধরে বারবার ছবি আঁকতে চেষ্টা করে বিফল। শেষ পর্যন্ত রং তুলি নিয়ে ক্যানভাসে। স্বপ্ন কিংবা সেখান থেকে কুড়িয়ে আনা বাস্তবের ছবি আঁকতে চায়। সবুজের সমারোহ একদিন মাল্টি ডাইমেনশনাল রঙে আত্মপ্রকাশ করবে নতুন ছন্দে। সেই নানা রং-এর ছন্দের স্বপ্ন নিয়ে নন্দিনী থাকতে চায় তার ক্ষুদ্র দুনিয়ায়। তার স্বল্প জীবনের ছবিটায় পূর্ণতার স্বাক্ষর রাখতে।

টনিদা নিজের জীবনে বারবার পূর্ণতার ছবি আঁকতে চেয়েছে। শেষমেশ অজগরের মতো শূন্যতাই তাকে গ্রাস করেছে। জীবনের এই সায়াহ্নে, শূন্য-পূর্ণর দোলাচলে যা অসমাপ্ত থেকে গেছে পাওয়া না-পাওয়ার

চোরাবালিতে।

নন্দিনী যদি পারে আঁকুক। সে তো সারা জীবন ধরে আঁকতে চেয়েও পারেনি। তার পরিপাটি সাজানো ক্যানভাসটা এখনও ফাঁকা। নন্দিনী অন্তত তার জীবনের স্বপ্ন নিয়ে সেই পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাক তুলির টানে।

ছেলে ও ছবি নিয়ে নন্দিনী যখন আপন পৃথিবীতে মশগুল, একদিন কল্লোলদা বলল ‘‘ঘরে বসে তো রেগুলার শখের রেওয়াজ করছ। নয় এবার বাইরে একটা প্রোগ্রাম করলে’’

“হঠাৎ?”

“নাঃ। অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম। তোমাকে নিয়ে একটা ক্লাসিক্যাল প্রোগ্রাম অরগ্যানাইজ করলে মন্দ হয় না”

“আমাকে নিয়ে?”

“অবশ্যই। তুমি চিন্তা করো না। আমার ওপর ছেড়ে দাও” কল্লোলদার কনফিডেন্স দেখে নন্দিনী আশ্চর্য।

কল্লোলদা সব অরগ্যানাইজ করেছিল। নন্দিনীকে বলেছিল ‘‘রেওয়াজটা ভালভাবে করো। অন্তত আমার কথা ভেবে’’

করেও ছিল। যা কিছু করে সবেতেই সে তার ক্ষমতার সর্বস্ব দিয়ে করে। ফলও মিলেছিল হাতেনাতে।

“দারুণ হয়েছে” ছেলে তো বলবেই। কল্লোলদার প্রশংসাটাই মন ছুঁয়ে গেছিল।

“চেষ্টা করেছি কল্লোলদা” নন্দিনী লাজুক, বিনয়ী।

“মারভেলাস! এবার আর কী? আদাজল খেয়ে নেমে পড়। ডোভার লেন মিউসিক কনফারেন্স থেকে অন্যান্য জায়গায় তো এবার পারফর্ম করতে হবে”

“না কল্লোলদা। আপনি বলেছিলেন বলে একটা করলাম। এটা আমার অনেক শখের মধ্যে একটা। শখ দিয়ে নাম-টাকা কামানোর কোনো মোহ-ই আমার নেই” একটু থেমে বলেছিল “সবাইকে যে কেউকেটা হতে হবে, কে বলেছে? আর পাঁচজন সাধারণের মতোই থাকতে চাই”

হায় রে!

নন্দিনীর মতো জীবনের গূঢ় সত্যটা যদি আর সবাই বুঝত। জীবনটা তাহলে কত সহজ হয়ে যেত।

নন্দিনী তার ছেলেবেলার বন্ধু অর্ণবের বিধবা। হয়ত এখনও জিনস, টপস, সালওয়ার, স্কার্ট, শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়। হয়ত অন্যান্য বউদের থেকে আলাদা। সিগারেট খায়, ড্রিঙ্ক করে। কিন্তু এত বছরের মধ্যে একদিনও ওকে পার্টিতে গিয়ে বেলেল্লাপনা করতে দেখেনি কেউ। নিজের ছোট্ট সংসারে ছেলে অনীশকে নিয়ে ছবি এঁকে বা রেওয়াজ করে দিব্যি কাটিয়ে দেয়। গুটিকয়েক লোকের সঙ্গে মেশে।

নন্দিনীর বাইরের জগৎ সীমিত হলেও, অন্তর যেন তার বেষ্টনী ভেদ করে অসীমকে ছুঁতে চাইছে। সুপ্ত আত্মার মহাব্যোমেকে ছোঁয়ার চেতনায়। এত বর্ণের মধ্যেও কোথায় যেন বৈধব্যের ধূসরতা। কিংবা উচ্ছ্বাসকে বিসর্জন দিয়ে এক নিজস্ব ঔদাসীন্য। সেটাই নন্দিনীর ছবি।

নন্দিনী কী বোঝাতে চাইছে সেটা সম্পূর্ণভাবে অনুভব না করতে পারলেও ওকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই কল্লোলদা বলল "তুমি তোমার মতোই থাক। অন্য কেউ হতে চেও না"

থাকতে চাইলেও, কল্লোলদা যা বুঝেছে তার বিশ্লেষণে না গিয়েও, নন্দিনীর এখনও নিজের প্রতি সংশয়। রং ছেড়ে কিংবা সব রং-কে একত্র করে নন্দিনী তার গোপন ক্যানভাসে যে ছবিটা আঁকতে চাইছে, সেটা কী তার আসল রূপ? না, তার আমি-র প্রতিচ্ছবি? না কি, পাঁচমিশালি রঙে মাখামাখি নিজের সীমিত দিব্যদৃষ্টি? সৃষ্টি তো মনের আয়নার জলছবি। কিন্তু সেটা কী আসল নন্দিনীকে নিখুঁত করে?

একদিন শেষ হবে। দেখাবে তার এত বছর ধরে আঁকা একটাই ছবি টনিদাকে। যাকে কখনো বলতেই পারেনি ওটা তারই ছবি। সেলফ পোর্ট্রেট। নিজেও জানে না ক্যানভাসের সেই ছবিটা কবে শেষ হবে!

বারো

বসন্তের অপরাহ্ণের মিঠে আমেজের রেশ মেখে সিডি ব্লকের বাড়ির বারন্দায়। মাঠের ওপারে লাল পলাশের দিকে আনমনা নন্দিনী। অপার লালের সমারোহ। কোথাও একটা কোকিল ডাকছে কুহু কুহু। ডাকটা চেনা হয়েও অচেনা রাগ মুলতানির সুর শোনাচ্ছে। শুধু জাতিটা আউদব সম্পূর্ণ কি না বোঝা যাচ্ছে না। তবুও ঋতুস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহের বাইরে, কোথায় যেন হারানো কোকিলের ডাক, নতুন সুরে বাজছে। চিনেও অচেনা একটা নতুন বিট। পলাশের রংটাকে চেনাচ্ছে নতুন আঙ্গিকে।

অন্যমনস্কভাবে মোবাইল ফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। সময় হয়েছে স্ট্যানফোর্ড থেকে অনীশের ফোন আসার...

"কী করছ মম?" ফোনটা বেজে উঠতেই ভাইবারে ওপাশ থেকে ভেসে এল ছেলের গলা।

"কিছুই না। বারন্দায় বসে লাল পলাশের দিকে চেয়ে আছি"

"ইটস স্প্রিং। দ্য ফ্লাওয়ারস মাস্ট বি ব্লুমিং অল ওভার" অনীশের অ্যামেরিকান অ্যাক্সেন্ট শুনে চমকে উঠল!

অনীশ আজ সুদূর অ্যামেরিকাতেই নয়, হয়ত মাটির কৃষ্টি থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হয়ত এটা হওয়ারই ছিল। এত তাড়াতাড়ি যে হবে, বুঝতে পারেনি। কিংবা হয়ত বুঝতে চায়নি। হয়ত সাব-কন্সিয়াসলি, নায়েগ্রা ফলসে অর্ণবের মৃত্যুটা তাকে এখনও অজান্তে তাড়া করে বেড়ায় বলেই কী?

যেতে দিতে মন না চাইলেও কি ধরে রাখা যায়?

অনীশকে ওর নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তো ছেড়ে দিতে হয়েছে। দেশ তো তাদের মতো উঠতি ছেলেদের জন্য কোনো ইকনমিক কমফর্ট জোন তৈরি করেনি। উঠতি বয়সে নিজে বাবা-মাকে হারিয়ে তেমন পড়াশোনা করতে পারেনি। পেটের তাগিদে জ্যোতিকিরণের শরণে আশ্রয় খুঁজে নিতে হয়েছিল। শুধু চেয়েছিল, নিজের অপূর্ণতার রেশ যাতে অর্ণবের মধ্যে না পড়ে। ওকে নিজের মতো করে এগিয়ে যেতে হবে নিজের লক্ষ্যে। আর স্ট্যানফোর্ড ইউনিভারসিটিতে পড়ার সুযোগ তো সবাই পায় না! সঙ্গে স্কলারশিপ। বাধা দেওয়া বাতুলতা।

নন্দিনী জানে, অনীশ আর ফিরবে না। যদিও বলে গেছে ''দেখ মা, কারিকুলাম শেষ করে আবার ফিরে আসব। তোমাকে একা ছেড়ে কি আমি থাকতে পারব? কখনই নয়''

"এলেই ভাল" নিস্পৃহ ঔদাসিন্যে নন্দিনীর মন বলছিল অর্ণব এদেশে আর ফিরবে না।

ওপাশ থেকে মায়ের গলা না শুনতে পেয়ে অনীশ ভাইবারে বলল ‘‘কী হল মম? ইউ আর সাইলেন্ট?’’

“নাঃ। তোর কথাই ভাবছিলাম”

“হিয়ার আই অ্যাম ডুয়িং এ লট ইন অল্টারনেটিভ স্প্রিং ব্রেক”

“ডোন্ট ওভার ডু। শরীর ঠিক আছে তো?”

“পারফেক্ট। অ্যাবসলুটলি জাস্ট ফাইন। উইথ দ্য স্প্রিং ব্লুমিং আই উইশ ইউ ওয়ার হিয়ার”

“জাস্ট এনজয় ইওর হলিডেস”

“ট্রায়িং টু। জুলি ইজ দেয়ার টু গিভ মি কম্প্যানি ইন ইওর অ্যাবসেন্স”

“এই জুলি কে? আগে তো বলিসনি!”

“ওহ মম... আই জাস্ট ফরগট। জুলি ইজ মাই গার্লফ্রেন্ড”

“তোরা ভাল থাকিস। গিভ মাই রিগারডস টু জুলি”

“ইউ টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ। আই মিস ইউ মম”

“আই মিস ইউ টু”

ইন্টারনেট ফোনটা ডিসকনেক্ট করে মনে হল, সত্যি কি অনীশ তাকে মিস করে?

হয়ত করে।

কিছুদিন পর, হয়ত আর করবে না। ও কিন্তু অর্ণবের মতো অনীশকেও মিস করে যাবে। না করলেই বোধহয় ভাল ছিল।

মুছে যাওয়া জীবনের রংগুলোকে আর আঁকড়ে ধরে কী লাভ? কোনো রং দিয়েই তো ছবিটা আঁকা হল না। কিংবা হলেও অসম্পূর্ণ। হাজার রং-এর মেলায় ছবিটা ধোঁয়াশায়মেশে।ক্ষণিকের পাওয়াটা আবার না-পাওয়ার স্পেসশিপে চড়ে হারিয়ে যায় রামধনুর রং-এর সংমিশ্রণে, আরও হাজার রং-এর মেলায়।

রং পরে থাকে।

ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যায় একটা অস্পষ্ট সিল্যুটের মতো। চেনা অচেনার পাঁচমিশালিতে একটা অস্পষ্ট অবয়ব। অন্ধের মতো দিনের আলোতেও তাকে খুঁজে বেড়াতে হয়। মন সেই চেনা রামধনুর রং নিয়ে একটা অচেনা ছবি আঁকতে চায়।

নন্দিনীও চেয়েছিল।

এতদিনে সেই ছবিটা সম্পূর্ণ হয়েছে। নিজের মনের ডানা উড়িয়ে, পাখনা মেলে ভেসে এত রং দিয়ে আঁকা ছবিটার মধ্যে একটা অধ্যায় শুধু বাকি। সেই ক্যানভাসে নিজের চেতনার ছোঁয়া দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা

করার। তার দেবী বরণ। সময়ের আবর্তের গোলোকে ঢুকে প্রাণের স্পন্দন দিয়ে ক্যানভাসের ছবিটাকে জীবন্ত করে তুলতে হবে।

সেই ম্যজিক ওয়ানডের আশায় পলাশের রং-এর মেলার দিকে তাকিয়েছিল নন্দিনী।

কত জনই না জীবনে এল, গেল - কত রং-এর বাটি নিয়ে। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়ে আঁকতে চেয়েছে। নন্দিনীর জীবনের ছবি। হয়ত কেউ প্যলেট পর্যন্ত নিয়ে যেতেও সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ক্যানভাসের পরিপূর্ণতা আনতে পারেনি। সেই রং-এর মূর্ছনায় নন্দিনীকে রেখে গেছে অসমাপ্ত, অপরিপূর্ণ। বারবার ক্যানভাস সাজিয়ে, রং তুলি নিয়ে, ছবিটা আঁকতে গিয়েও হয়নি। ছন্নছাড়া রংগুলো ঝরে পড়েছে। প্যলেট থেকে জীবন নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া অতীত। পাহাড়ি নদীর পথে হারিয়ে গেছে মোহনাহীন গন্তব্যে। চোরা স্রোতের আবর্ত রঙগুলো শুষে নিয়েছে। গভীরের অন্ধকারে। সেখানে মিশ্রিত রং-এর সমন্বয়, অন্ধকারের কালোতে।

নন্দিনী তো সেই কালো দেখার জন্যই ছবিটা এত বছর ধরে আঁকছিল না। আলোর সন্ধানেই তো তার এই প্রয়াস।

আলোর রং ছড়িয়ে তো ইন্দ্রনীলও এসেছিল। ফাগুয়ার হোলির স্বপ্নমাখা জীবনের প্রথম প্রেম। মাঝরাতে কেঁপে কেঁপে ওঠা। শরীর আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল ইন্দ্রনীলকে নিয়ে। দেহের প্রতিটা কোষ, প্রতিটা রোমকূপে আনন্দ নিয়ে যৌবনে পাড়ি দেওয়া এক নারী। সম্পূর্ণরূপে চেয়েছিল ইন্দ্রনীলকে। পেল শুধু দেহটা। কয়েক মুহূর্তের উত্তেজনা। আর পেল, ইন্দ্রনীলের সযত্ন নিভৃত আবরণে অচেনা রং। ভিত না থাকতেও গড়ে ওঠা স্বপ্নের মিনার। চূর্ণ হল জীবন স্রোতের রুক্ষ বেলাভূমিতে। সিঁথির সিঁদুর রঙিন না করেই, ফাগুয়ার লাল মুছে গেল ক্যানভাস থেকে।

হয়ত সবার জীবনে ঋতব্রত আসে না। কিংবা এলেও এভাবে প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু ক্যসিনোতে দাঁড়িয়ে নন্দিনীর জীবনের মোড়টাই ঘুরিয়ে দিয়েছিল। হেঁটেছিল অন্যান্য মেয়েদের থেকে ভিন্ন পথে। জ্যোতিকিরণের সঙ্গে। একটা চেনা অথচ অজানা সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হতে। আরেক রং-এর জলছবি আঁকতে, বাঁচার পথে। সেই রংটাও তো একদিন হারিয়ে গেল, একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের আশায়।

প্যলেটে রং নিয়ে ক্যানভাসে নতুন ছবি আঁকতে গিয়ে তার অস্তিত্বে যে এরশাদ সাহেবের রঙটা বাড়তি, বুঝতে সময় লেগেছিল। কম্বোডিয়াতে সেটা উপলব্ধি করলেও, তার সিলমোহর বসাল হংকং-এ টনিদা। ক্যানভাসটা মুছে নতুন ভাবে আঁকার রসদ তুলে দিল নন্দিনীর হাতে। বাঁধতে তাকে শাশ্বত আকাঙ্ক্ষিত আলোকে। অবিরল ছোটা নয়। বিরাম স্বাভাবিক জীবনের নতুন স্বপ্নে। আলট্রা লাইফ মেরিন্স-এর নগণ্য একটা কর্মচারী।

কিন্তু শাশ্বত নারী মন তো নানা রং-এর বৈচিত্র্য চায় না। চায় বন্ধন। চায় বন্ধনের মধ্যে রং-এর স্পন্দন। সুনিবিড় শান্তির নীড়। চায় বন্ধনের লক্ষ্মণরেখায় সীতার পবিত্র বিচরণ। সেখানেই শান্তি। সেখানেই মুক্তি। সেখানেই ইহজীবনের স্বর্গ। অতীতের ঝঞ্ঝাকে পেছনে ফেললেও, অর্ণবের সুনিবিড় ভালবাসার কোলেই স্বপ্নের ক্যানভাসটা সঁপে রঙিন করতে চেয়েছিল রামধনুর রং-এর সমন্বয়ে। নতুন ছন্দে, নতুন স্পর্শে, নতুন কল্পনার দিব্য আলোকে। সেই আপাত পূর্ণতার র‍্যাকস্যাকে অনীশের আগমন যেন নতুন ক্যাডেন্স জুড়ল এযাবৎ কম্পোজ করা আরেক নতুন সিম্ফনিতে।

এখানেই বেশিরভাগ নারীর জীবনের চেনা গল্পটা শেষ হয়ে যায়। চেনা রং-এর বাহারে চেনা ছবি আঁকে - পারিবারিক ছবি, ছেলে, বৌমা, নাতি-নাতনির ছবি। চেনা ক্যানভাস। চেনা বিন্যাস। চেনা পরিণতি। সেটাই গতানুগতিক। বিক্ষিপ্ত রং প্যালেটে থাকলেও তার মিশ্রণে ফুটে ওঠে একটা 'চেনা পূর্ণতার' পরিচিত ছবি। যে কারও হতে পারে। নন্দিনী, পদ্মিনী, রুক্মিণী বা মৃগনয়নীর ছবি।

জন্মাবার পর জ্যোতিষভাষ্য "শুক্ল পক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে ভোর চারটে চুয়াল্লিশ মিনিটে জন্ম। এ মেয়ের জীবন আলোয় আলোয় ভরে উঠবে"

হয়ত সেই আলোটা খুঁজতেই নন্দিনীর ছবিটা পদ্মিনী, রুক্মিণী বা মৃগনয়নীর মতো হল না। অর্ণবকে অ্যামেরিকান ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে-তে স্বাধীনতা দিয়ে অনীশকে বুকে আগলে ফিরে এল অন্তরের ছবিটা খুঁজতে। আবার নতুন আলোর সন্ধানে। বৈচিত্র্যর মধ্যে নিজের সৃজনশীলতাকে ভাসিয়ে দিতে ছবিতে, সুরে, নৃত্যের তালে। নিজের বৈচিত্র্যটাকে আরেকবার আর্কাইভ থেকে বার করে স্ক্যন করতে রানিং ক্যসের রেজিস্ট্রিতে। কোনো ডেডলি ভাইরাস বা ট্রজেন যাতে সেখানে বাসা বেঁধে না থাকে।

শুরু হল সেই রেস্টরড আর্কাইভ দিয়ে নিজের একটা ছবি আঁকা। তার একান্ত নিজের আপনার ছবি। র‍্যমের ক্যস থেকে সব কিছু মুছে, তার পিউরিফায়েড সেরিব্রাল কম্পিউটারের অ্যামিগড্যলা দিয়ে আঁকা, একান্ত পরিপূর্ণতার ছবি।

ছবিটা আঁকা শেষ হয়ে গেছে। শুধু উন্মোচনটাই বাকি, শেষ তুলির ছোঁয়া আর নিজের স্বাক্ষরের অপেক্ষা...

পলাশের পাতাগুলো কেমন স্থির। একটুও কাঁপছে না। একটা স্তব্ধ দ্বিপ্রহর বসন্তের আঙিনায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে। হয়ত সতেজ ফুলগুলো রং ভুলে নতুন রং-এর প্রতীক্ষায়। স্তব্ধ বিস্ময়ে। রংহীন রং-এর ফাগুয়ায়, আরেক সুর ভাঁজতে কিংবা আরেকটা ছবি। যা ঋতুরাজ চলে গেলেও মলিন হবে না ঋতুস্রোতের মহাপ্লাবনে। সেখানে হয়ত কোকিল ডাকবে নতুন কোনো এক সুরে। হয়ত চিরবসন্ত আঁকবে নতুন প্যালেটে

কাল প্রবাহের রংহীন চিরশান্তির ছবি। সেখানে কোনো চেনা রং নেই। বাসন্তী, লাল সব মিলেমিশে একাকার এক অজানা রং-এর সংমিশ্রণে।

রংটা একটা আকার নিচ্ছে নন্দিনীর অবচেতনে। মাধুর্য নিয়ে বিকশিত সেই অচেনা রং-এর প্লাবন। একা বারান্দায় বসে আর্কাইভগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া।

হঠাৎ এত বছর পর মনে পড়ে গেল, হনলুলুর পাকালা ভিলেজ। নাচের শেষে পাগলি মামার হাত চেপে ধরা। ভবিষ্যদ্বাণী। এতদিন পরেও স্পষ্ট কথাগুলো।

মামা নন্দিনীর হাত চেপে বারবার বিড়বিড় করে বলেছিল, রেনবো উইল সিঙ্ক। রামধনুর রং বুঝি সত্যি অস্তাচলে। তাই গাছের পাতাগুলো হাওয়ার অভাবে স্তব্ধ বিস্ময় অপেক্ষা করছে, ডুবে যাওয়া রামধনুর রং-এর নতুন রূপ দেখতে। অনীশের চলে যাওয়ার পর জীবনের শেষ পলাশের লালটাও ধূসর হয়ে গেছে।

আরও বলেছিল, ডার্কনেস অফ ডান্স উইল কাম।এত বছরেও মনে পড়ে না শখ করে আর কখনও ভরতনাট্যম নেচেছে কি না। খাজুরাহর স্মৃতিটা বিষধর সাপের মতো ছোবল দিয়েছে নাচের প্যাশনটাতে। চেষ্টা করেও জাগাতে পারেনি বিস্মৃত প্রতিভা।

শেষ কথাটার ট্র্যান্সিলেটেড ভার্সনটা আবারও মনে পড়তে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। সান অফ মিউসিক উইল রাইজ। এই একাকী জীবনের ধূসরতার মধ্যে ছন্দ আঁকতে, এখন সে তো গানের মধ্যেই ডুবে গেছে। যদিও কল্লোলদার অনুরোধ সত্ত্বেও আর প্রোগ্রাম করেনি। তবুও মুক্তির পথে সেটাই তার জীবনের নব সূর্যের অভ্যুদয়।

মামাকে অন্যরা ক্রেজি বললে ও হয়ত সত্যি পাগল ছিল না। অভিজ্ঞতার মোড়কে সারল্যের সততায়, বোধ হয় সত্যিটাকেই আগাম দেখতে পেয়ে ছিল।আর পেয়েছিল বলেই হয়ত অচেনা নন্দিনীর হাত চেপে সেটাই বলতে চেয়েছিল। অনেক সময় অনেকে অনেক কিছু বলতে চায়। আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তাধারার অর্বিটের বাইরে আমরা তা শুনতে চাই না, বা বুঝতে পারি না।

নন্দিনী বারান্দার বেতের সোফা ছেড়ে উঠে হাউস কোটের গিঁটটা বেঁধে স্টাডির দিকে এগোল। বেডরুমের পাশের এই ঘরটা তার স্টাডি কাম কম্পিউটার রুম, রেওয়াজ রুম কাম স্টুডিও। এখানেই সে দিনের বেশি সময় কাটায়। এটাই তার সৃষ্টি ও কৃষ্টির পৃথিবী, যেখানে সে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে তার সৃষ্টির মধ্যে। অর্ণব যখন বেঁচে ছিল, এটাই ছিল ওর অবসরের পীঠস্থান। নায়েগ্রা ফলস থেকে ফেরার পর, সেও এটাকেই নিজের দিন যাপনের বিচ্ছিন্ন মন্দির করে ফেলেছে।

এত বছর ধরে, তার নিভৃত রাজ্যে, সে সব সৃষ্টি ভুলে, একটাই ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে। তার নিজের ছবি। অন্তর দিয়ে গড়া তার অন্তরের প্রতিমা। নিজের আলোয় নিজেকে দেখার চেষ্টা করেছে। সেলফ

পোরট্রেট আঁকার চেষ্টা করেছে, তার অদেখা অবয়বটাকে খুঁজে পেতে। নিজের অচেনা প্রতিবিম্বকে দেখতে চায় সৃষ্টির ক্যানভাসে।

খুব কম লোকই জানে ছবিটার কথা। খুব কম লোকেরই অধিকার আছে, তার এই পৃথিবীতে প্রবেশ করার। এমনকী টনিদারও নয়।

একবার টনিদা জিজ্ঞেস করেছিল ‘‘ও ঘরে কী আছে?’’

“আমার জীবন। মানে আমার পাগলামোর অ্যাসাইলাম” ঠাট্টা করে নন্দিনী উত্তর দিয়েছিল।

“ঠিক বুঝলাম না” টনিদা ভুরু তুলে নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে ছিল মুচকি হেসে।

“দেখাব গো দেখাব। তোমাকে একদিন দেখাব। আমার স্বপ্নের ক্যানভাসটা”

“কবে?”

“যেদিন ছবিটা শেষ হবে”

গতকাল ঠিক রাত সাড়ে বারোটায় ছবিটা কমপ্লিট। এতদিন ধরে এত রং দিয়ে আঁকা ছবি। ছবিটার ওপর রং-এর শেষ আঁচড় দেওয়ার আগে নন্দিনী নিষ্পলক চেয়ে বসেছিল।

হয়েছে তো?

পেরেছে তো মনের ক্যানভাসের প্রতিচ্ছবি নিখুঁত আঁকতে?

ঠিক যেমনটি চেয়েছিল।

ফ্যালফ্যাল করে নিজের সৃষ্টির দিকে চেয়ে বিহ্বল। আত্মতৃপ্তিতে মনটা ভরে গেছে।

হ্যাঁ। ঠিক যেমন চেয়েছিল, তেমনই হয়েছে।

মনের মাধুরী দিয়ে আঁকা অমলিন। তার দৃপ্ত বলিষ্ঠ নারীত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ছবির নীচে নিজের স্বাক্ষর আঁকতে গিয়ে থমকাল।

নাঃ... থাক।

কাল ফাইন্যাল দেখে আঁকবে।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে...

আজ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ছবিটা কমপ্লিট করতে এসেছে। কাপড়ে ঢাকা ছবিটা খুলে সামনে দাঁড়াল। দেখছে মনের তুলির স্পর্শে আঁকা নিজেকে।

এই কি সে নন্দিনী?

থমকে তাকাল।

একবার...

দুবার...

অনেকক্ষণ ধরে

বারবার...

মনের মধ্যে ডুয়েল বিটস-এর লহরা বাজছে। এটা কোনো প্রচলিত মধুর রাগ নয়। কোনো পরীক্ষিত স্তুতি নয়। কোনো চেনা সুরের মাদল নয়। এই ছন্দকে সময়ের ব্যাপ্তিতে, চিন্তার উর্বর বিন্যাসে, ক্রিটিকের দৃষ্টিতে, সুপ্ত ইমোশনের স্ফুলিঙ্গের দৃপ্তিতে কোনো চেনা গতের কৃষ্টির মধ্যে বন্দি করা যায় না।

তার অন্তরের ডামাডোলের শেষ স্বাক্ষর। একান্তই নিজস্ব।

এটাই সে।

আসল নন্দিনী।

চোখের পলকে পেইন্ট ব্রাশটা হাতে তুলে নিল। রং-এর প্যালেটটা খুঁজছে। সব রং দিয়ে ছবিটা আঁকা হয়েছে। শুধু একটাই রং বাকি। এই মুহূর্তে সে রংটাকে চিনতে পারছে। সব রং যেখানে গিয়ে মিলেছে সেটাই তার রং। তার আসল রং। বাকি রংগুলো সত্য হলেও তার ক্যানভাসে এদের কোনো জায়গা নেই। এগুলো এখন তার সম্পূর্ণতার পথে বাড়তি। এগুলোকে মিশিয়ে মেলাতে হবে একটাই রঙে।

সাদা রং দিয়ে ধীরে ধীরে ছবিটাকে মুছে দিচ্ছে নন্দিনী। তার প্রাণ প্রতিষ্ঠার শেষ স্বাক্ষর এঁকে দিচ্ছে সুপ্ত চেতনার জাগরণে। এত বছরের আঁকা ছবিটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে তার শেষ রং-এর তুলির স্পর্শে। তার শেষ স্বাক্ষর বহন করে, নিজের হাতে গড়ে তোলা নিজের প্রতিমাটাকে নিজের তুলিতে বিসর্জন দিয়ে, তাকে মুক্তির মন্ত্র শোনাতে। সেখানেই তার আকৃতি, প্রকৃতি, বিকৃতি। সেখানেই সে অমলিন। সদর্পে সীমাহীন। নিজের চেতনার উদ্ভাসে। সেখানেই সে পরিপূর্ণ রংহীন ক্যানভাসের প্রত্যক্ষ বর্ণহীন আকারে। তার নিজেকে চেনার প্রস্ফুটিত দৃপ্তলোকে। সেখানেই তার ক্যানভাস পূর্ণ উজ্জ্বল, দ্বিপ্রহরের দিবালোকে। আপন মহিমায় উদ্ভাসিত, নিজের মলিনতার না-চেনা শ্লোকে।

ছবিটাকে সাদায় ঢেকে, একটা ব্ল্যঙ্ক ক্যানভাসকে পেছনে ফেলে নন্দিনী আবার বারান্দায় এসে বসল।

অপারাহ্ন তখন পুরিয়া ধানেশ্রীর সুর শোনাচ্ছে নতুন তানে। এই সুরটাকে নন্দিনী চিনতে পারছে - চেনা সুর নয়, তবুও বড্ড চেনা। সে সুর একটাই মন্ত্র দিয়ে যাচ্ছে কানে কানে - সূর্য এখনও ডোবেনি। এখনও পাখিরা দিন শেষের শেষ রবির কিরণ ছুঁয়ে ফেরেনি নীড়ে। এখনও সারা পৃথিবী মুখরিত নিজেদের কোলাহলে, অট্টরোলে। এখনও যা হয়নি সংগীত, হবে কালকের গীত, নন্দিনীর চেতনার অনুরণনে। সেটাই সংগীত, সেটাই ছবি, নন্দিনীর আগামীর গীত। নিস্তেজ অপরাহ্নে।

তাকিয়ে রইল পলাশ গাছটার দিকে। গাছের পাতাগুলো কেমন নিঃসাড়, প্রাণহীন, স্তব্ধ। বসন্তের আঙিনাতে। সেখানে ঝরে যায় বিস্মৃত বকুল নব কলেবরের সৌরভে। সেখানেই ফোটে নব পল্লব, কিশলয়ের জাগৃতিতে। সেখানেই আছে যত সৌরভ। ফুলঝরা ওই বাগানে। যেখানে অনাবিল স্নিগ্ধ শান্তি খেলে বেড়ায় এই বিশ্ব চরাচরের বুকে। যেখানে সব ক্যানভাস মুছে যায় এক ব্যথাভরা চিরন্তন সুখে। যেখানে স্থিত জাগ্রত জীবাত্মা। সেখানেই প্রকাশ রংহীন অন্তহীন পরমাত্মার, নতুন রং-এর উন্মোচনে।

নন্দিনী সূর্যাস্তের শেষ কিরণের দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। স্বাদ নেই, তবু একটা বর্ণ আছে। সে বর্ণটা অর্থহীন এখন নন্দিনীর কাছে। সিগারেটের ধোঁয়াটায় সোয়াস্তি নেই, মুক্তি নেই, আরাম নেই। যেন সব রং মিলে কুণ্ডলী পাকিয়ে বাষ্পে মিশে যাচ্ছে। সিগারেটটা বারান্দার বাইরে ছুড়ে দিতে গিয়ে চোখ পড়ল পলাশ গাছটার দিকে।

শীত তো এখনও আসেনি। তবুও পাতাগুলো কেমন ঝরে ঝরে পরছে বসন্তের স্তব্ধতায়। ঝরা পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে নন্দিনীর মনে হল এটাই বসন্ত। এটাই তো জীবনের সত্যিকারের ক্যানভাস।

মন বলছিল, আরেকটা ছবি আঁকবে, এই স্তব্ধ বদ্ধতার মুখরতায়। সাদা ক্যানভাসে রঙিন বসন্তের আকারহীন ছবি। সেটাই তো সত্যের প্রতিমূর্তি।

তার জীবনের না-ছোঁয়া, এতদিনে চেনা, আসল ক্যানভাস।

তার সদ্য চেনা নিজের ছবি।

যে নন্দিনীকে অন্যরা কেন, সে নিজেও চিনত না। আজ যেন সে সেই অচেনা নন্দিনীকে চিনতে পারছে। মনের ক্যানভাসে।

ক্যানভাসে ছবিটা আঁকা হল...

হয়ত অনেক রং দিয়ে অনেক ছবি আঁকা যায়।

এই সাতটা গল্পের সাতটা নন্দিনীদের মধ্যে কেউ কিংবা সকলেই ইন্ডিভিজুয়ালি বলতে পারে ‘‘এটা আবার কোন ধরনের উপন্যাস হল?’’

“নয় কেন?”

“বেশ তো আমার জীবনের একটা সিকোয়েন্স নিয়ে গল্প শুরু করেছিলে। ওটাই কন্টিনিউ করে যেতে পারতে। তাহলেই তো একটা উপন্যাস হয়ে যেত। আমার মধ্যে আবার অন্য নন্দিনীকে টানলে কেন?”

“ক্ষতি কী? কত ভ্যরাইটি আছে লেখাটার মধ্যে”

“ধ্যত... ভ্যারাইটি না ছাই। মাথামুণ্ডু নেই। এভাবে কী কেউ নভেল লেখে?”

“হয়ত লেখে না। লিখলেই বা ক্ষতি কী?”

“এভাবে তো আগে কখনও লেখা হয়নি”

“নয় আমিই লিখলাম...”

“এ মা! তুমি কী বোকা। এই সাতটা নন্দিনীর গল্প নিয়ে সাত-সাতটা নভেল হয়ে যেত। এক সঙ্গে সাতটা নভেল ছাপিয়ে বার করলে কত...ত টাকা পেতে, বল তো? রাইটিং ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার নাম সব জায়গায় ঘোরাফেরা করত”

“নামের কথা বাদ দাও। আমি তো রাইটিং ইন্ডাস্ট্রির লোক নই। আমার ওই পৃথিবীতে কোনো কদরও নেই। তবে কেন ওদের কথা ভেবে আমি লিখব?”

“ওদের কথা না ভাবলেও আমাদের কথা তো ভাবতে পারতে?”

“ভেবেছি তো”

“কই? আমাকে তো সম্পূর্ণভাবে পেলাম না তোমার লেখায়? তুমি তো একটা নন্দিনী থেকে আরেকটা নন্দিনীতে স্কিপ করেছ”

“তাতে অসুবিধে কোথায়? সবার মধ্যে তো একটাই নন্দিনী”

“এমা! তা কখনও হয় নাকি!”

“কেন হতে পারে না?”

“হতে যাবে কেন? হয় না। আমরা প্রত্যেকেই এক একটা নিজস্ব অস্তিত্ব”

"মানছি তোমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন। আমি তো বিভিন্ন নন্দিনীকে এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছি"

"বাঁধবার কী দরকার ছিল? সব নন্দিনীকে একসঙ্গে বেঁধে তো আমাদের নিজস্বতাকে নষ্ট করে দিলে। আমরা তো প্রত্যেকেই এক একটা স্বতন্ত্র চরিত্র। আমাদের নিজস্বতা নিয়ে। কী দরকার ছিল আমাদের নিজস্বতাকে ইগনোর করে সবাইকে একটা নন্দিনীর ছাঁচে ফেলতে?"

"এই সব মিলেই তো আসল নন্দিনী"

"তাও কখনও হয় নাকি? প্রত্যেক নারীর একটা নিজস্বতা আছে। একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। একটা নিজস্ব জীবন আছে। একটা নিজস্ব মনন আছে"

"আছে বৈকি"

"তাহলে সব নন্দিনী এক হয়ে গেল কী করে?"

"নিজেদের ভারে"

"ধ্যত... কী যা তা বকছ। তোমার প্রব্লেমটা কোথায় জানো? সবাইকে এক ছাঁচে দেখতে চাইছ"

"সবাই তো মিলমিশে এক। তাই নয় কী?"

"মোটেই না। সবার একটা নিজস্বতা আছে। তোমার প্রত্যকেটা নন্দিনীর মতো। প্রত্যেকেই এক অন্য নারী"

"আমি তো সেই নারীত্বকেই আঁকতে চেয়েছি আমার ক্যানভাসে"

"তোমার ক্যানভাসে তো একটাই নারী। এবার ক্যানভাসটা মুছে ফেলে অনেক মেয়ের ছবি আঁকবে?"

"না আঁকব না। সব মেয়েই আমার কাছে একটা ছবি। আমার গল্পে লেখা আমার মনের তুলির ক্যানভাসে আঁকা নন্দিনী"

"কী করে সব নন্দিনী একটাই হয়ে যায়?"

প্রশ্নটা বড্ড জটিল। ওদের বোঝাই কী করে?

সব নন্দিনীরা ভিন্ন হলেও, আমার উপাখ্যানের নন্দিনী অনন্যা। এটা তো ছকে বাঁধা কোনো গতানুগতিক নভেল নয়। অন্তরের চেতনা।

কেমন করে বোঝাই ওদের, কোথায় পরিতৃপ্তি?

যেখানে চেনা স্রোত মেশে অচেনার মোহনায়। সেখানেই আছে পরিতৃপ্তি নিভৃত সাধনায়। সেখানেই আছে আগামী দিন, নব চিন্তার ভোর। সেখানেই আছে সুপ্ত শান্তি, চেতনার নতুন উত্তরণ। সেখানেই আছে, ফেলে আসা ক্লিসে হয়ে যাওয়া চেতনার আঙ্গিক থেকে নব জাগরণের নতুন উন্মোচন।

আমি শুধু ক্যানভাসে সাতটা রং মিলিয়ে একটাই ছবি আঁকার চেষ্টা করছিলাম। নিজের মতো করে। কিন্তু সাত রং-এর সমন্বয়ে পূর্ণ নন্দিনীর ছবিটা তো সে নিজেই মুছে ফেলল। হয়ত নিজে সম্পূর্ণতা পেয়ে গেছে বলেই। তাই এখনও ক্যানভাসটা সাদা থেকে গেছে। সব রং দিয়ে তুলি বুলিয়েও ছবিটা অসম্পূর্ণ।

লেখার সব নন্দিনীই তো সম্পূর্ণতা খুঁজছিল। তাহলে কী ছবি আঁকতে গিয়েও গল্পের নন্দিনী সম্পূর্ণতা পেল না? কিংবা আমার লেখা নিয়মিত গতের পরিণামে পৌঁছল না?

এদের মধ্যে কোনো এক নন্দিনী তির্যক ভাবে বলল ‘‘ছবিটা রাখলেই পারতে...’’

“কী রং-এর ছবি?”

“তোমার ওই সাত রং-এর রামধনু দিয়ে আঁকা ছবি”

“নন্দিনীর যে কোনো রং-ই পছন্দ হল না”

“ওই রং মিশিয়ে আরও তো কত রং তৈরি করা যেত”

“হয়ত যেত। কিন্তু নন্দিনীকে ওই ছবিতে ধরা যেত না। কিংবা নন্দিনী নিজেই নিজেকে এঁকেও ধরতে পারেনি”

“কেন?”

“সেই রংগুলোও তো অস্থায়ী”

“কেন?”

“সেগুল তো নন্দিনীর তৈরি করা রং। রং-এর খেলায় সেগুলোও টিকত না”

“তবুও তো ছবিটা থেকে যেত। তোমার চোখে আমাদের ছবি”

“থাকত কী?”

“কেন থাকত না?”

“রং নিয়ে খেলেছ কখনও?”

“ওটা তো আর্টিস্টদের কাজ”

“ওরা খেলে রং নিয়ে, মনের কল্পনাকে ক্যানভাসে ধরে রাখতে” একটু থেমে বললাম “কল্পনাটাকে একটা ক্যানভাসে ধরে রাখতে চায় নিজেদের দেখা চোখে”

“তার জন্যই তো ছবি আঁকা হয় ক্যানভাসে”

“যা কালের চক্রে হারিয়ে যায় বিবর্ণ হয়ে। কারণ সত্যি ছবির তো দুটোই রং হয়”

“কী সেই রং?”

“সে দুটো রং-এর কথা বলেই আমি লেখা শেষ করব। ক্যানভাসে ছবি আঁকতে পারলেও সে ছবি চেনা সহজ নয়। তুমি আলোতে দেখলে একটা রং। অন্ধকারে দেখলে আরেকটা। আমার নন্দিনী, শেষ বার সিগনেচার দিতে গিয়ে নিজের আঁকা ছবিটা আলোতেই দেখেছিল, অন্ধকারে নয়”

“কী দেখেছিল?”

আমার মতো নন্দিনীও তার জীবনের রং মিলিয়ে একটাই ছবি আঁকতে চাইছিল। তার নিজের মনের ছবি। কিন্তু ক্যানভাসে তার আঁকা শেষ হওয়া ছবিটাতে, শেষ তুলি বোলাতে গিয়ে তার সামনে ফুটে উঠেছিল আসল ছবিটা। যা ছবিটাকে প্রাণ দিতে পারে। যার কোনো রং নেই।

সেই ছবিটাকে তো ক্যানভাসে বন্দি করা যায় না। জীবন্ত প্রাণের অন্তরের চেতনাকে, কী কেউ কখনও ক্যানভাসে ধরে রাখতে পেরেছে?

সম্পূর্ণ ক্যানভাসের আসল রং

একটা অস্পষ্ট অবয়বকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে কোথায় পৌঁছে গেলাম!

ফেসবুকের মতো ভারচুয়াল জগতের এক অচেনা মহিলার অনুরোধে, তাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে শুরু করেছিলাম। মহিলা কাল্পনিক না হলেও, গল্পটা কাল্পনিক। সেই কাল্পনিক উপাখ্যানে বাস্তবের একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করছিলাম। না-চেনা নারীকে ক্যানভাসে ফোটাতে চেনা রূপে। রামধনুর সাতটা রং-এর সিঁড়ি বেয়ে নারীর বিভিন্ন রূপের বিন্যাসে। বেগুনি থেকে লাল-এর বিস্তৃত স্পেকট্রামে। জীবনের চলার পথে, এক একটি নারীর নিজস্ব ভূমিকায়।

কিংবা সামগ্রিকভাবে সব ভূমিকাই সমন্বিত অন্তর্নিহিত চেতনার সংমিশ্রণে। প্রত্যেকের নিজস্ব মননের নিজ নিজ রূপে, অন্তরের ব্যাপ্তিতে। চেনা রূপের অচেনা চেতনার রং-এর পারমুটেশন-কম্বিনেশনে।

এই নারীদের মধ্যে যে কোনো মহিলাই, ফেসবুকের সেই অচেনা নারী হতে পারে। কিংবা এদের মধ্যে কোনোটাই নয়। অন্য আরেকজন। অন্য এক বিন্যাসে। নাম যাই হোক না কেন। নন্দিনী, পদ্মিনী, দর্পিণী, মৃগনয়নী, শঙ্খিনী, কৌশানি, রিনি কিংবা অন্য কেউ। নামটা অবান্তর। গল্পের খাতিরে, নামটা নন্দিনী দিয়েছিলাম।

ফেসবুকের ম্যসেজ-বক্সে ম্যসেজ করলাম ‘‘গল্পটা লেখা শেষ হয়েছে’’

উত্তর এল ‘‘আমাকে নিয়ে?’’

“তোমাকে নিয়ে কি না বলতে পারব না। তবে একজন মহিলাকে নিয়ে। সে তুমিও হতে পার, আবার নাও হতে পার। অন্য কেউও হতে পারে। আবার সবাই হতে পারে”

ওপাশ থেকে কোনো উত্তর এল না। বোধহয় কনফিউজড হয়ে গেছে। কিংবা যা এক্সপেক্ট করেছিল ঠিক তা পায়নি।

কার যে কী এক্সপেক্টেশন, বোঝা মুশকিল। তাকে খুশি করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। একজন খুশি হলে, আরেকজন খুশি নাও হতে পারে। হয়ত এই মহিলা নিজের অবয়বের একটা বাস্তব জলছবি দেখতে চাইছিল। কিংবা তার কল্পনার রং-এর ক্যানভাসে নিজের রঙিন ছবিটাই দেখতে চাইছিল।

আমি বোধহয় ক্যানভাসে ছবিটা আঁকতে পারিনি। শেষমেশ আমার গল্পের নন্দিনী সাদা রং টেনে তৈরি ক্যানভাসটা মুছে দিয়েছে।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। মহিলা অসন্তুষ্ট জেনে তাকে আর বিরক্ত করিনি।

হঠাৎ এক শনিবারের সকালে ম্যাসেজ বক্সে একটা ম্যাসেজ দেখলাম ‘‘আমাকে নিয়ে গল্প লেখেননি, তো কাকে নিয়ে লিখলেন?’’

“একজন মহিলাকে নিয়ে”

“আমি তো সেই মহিলা”

থমকে গেলাম। কী উত্তর দেব?

ওর হয়ত নিজের সম্বন্ধে একটা ডেফিনেট ধারণা ছিল। কিংবা নিজের চোখে দেখা একটা স্বপ্ন ছবি। কিংবা নিজস্ব চেতনার প্রোজ্জ্বল ছবিটা দেখতে চাইছিল, নান রং-এর মেলায়। নিজের চেতনার প্রতিবিম্ব। হয়ত সেই চেনা আকারের ছবিটাকে নিরাকারে নিয়ে গেছি বলেই ক্ষোভ।

বললাম ‘‘তোমার গল্পই তো লিখেছি। কিংবা তোমাদের সকলের গল্প’’

“হু...” সংক্ষিপ্ত উত্তর।

কী করে বোঝাই ওকে, এই চেতনাটাই তো আসল ছবি। সত্যিকারে ছবি। মানুষের মনের আসল রং। যা ক্যানভাসে ধরে রাখা যায় না। কিংবা ধরে রাখলেও চেনা যায় না। অথবা সাজিয়ে মুছে ফেলতে হয়। তখন সব রং মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় রংহীন রং-এর খেলায়, ভেসে যায় জাগ্রত চেতনার ধূসর দ্বিপ্রহর বেলায়।

আকাশে ওড়া পাখিটা ডাক দেয় ভেসে যেতে স্বপ্নের বাস্তবে, প্রশস্ত মহাবিশ্বের দিক ছেড়ে, নিজের অন্তরের না-চেনা দিগন্তে। যেখানে চির বসন্ত ছবি এঁকে দেয় অনন্ত কালস্রোতের মহা নির্বাণে। যেখানে সুপ্ত শ্বাস ফেলে নিশ্বাস, জাগতিক রশ্মির কিরণে। যেখানে চিরশান্তি হাতছানি দেয় জীবলোকের আলোকে।

সেটাই তো আসল ক্যানভাস। যাকে আমরা বারবার ধরতে চাই অবচেতনের ছবিতে।

কত লোক মিছে ঘুরে ফেরে দিশাহীন ভাবে ওই আকাশের মিছিলে। অযুত জন তাকে আঁকতে চায় নিযুত কথার মালা দিয়ে, নিজের রঙে মেশা ধ্বজার কেতন উড়িয়ে। নাকি আরও... আরও... আরও বেশি - সহস্র, লক্ষ, কোটি কোটি? অঙ্কের শূন্যগুলো পার হয়ে, শূন্যের গোলকে। হারিয়ে যায় অঙ্ক-বিহীন ভাবের খেলায় এক স্বপ্নমাখা দেশে।

সে দেশে সবাই জাদুকর, বুনে চলেছে নকশিকথা কালের অরবিট ছাড়িয়ে ভূলোক থেকে দ্যুলোকে, মনের রং-এর ব্যাপ্তিকে ছাড়িয়ে, সুপ্ত চেতনা থেকে জাগ্রত আলোকে, বিশ্ব ভেদ করে মহাবিশ্বের মহাব্যোমের ক্যানভাসে। আঁকছে মহাকালের মানচিত্রে, রংহীন ছবি তাদের ম্যাজিক ওয়ান্ড বুলিয়ে।

পরিরা এসে বলে ‘‘কার ছবি আঁকতে চাও এ সুন্দর স্বর্গে?’’

“তোমাদের ছবি”

"আমাদের ছবি তো তোমার ভেতরে"

"চিনিনি তো তাকে এতদিন"

"ডেকে আনো তোমাদের চিত্রকার নন্দিনীকে। সেই চিনিয়ে দেবে তোমাকে, আমাদের না-চেনা কালোত্তীর্ণ শূন্যতার পূর্ণ ছবি"

নন্দিনী আসতে চায় না।

সে স্বপ্নলোক পেরিয়ে পৌঁছে গেছে নিজের দীপালোকে। নিষ্পলক চেয়ে থাকে বসন্তের রঙিন ঝরা পাতার ফাঁক দিয়ে রংহীন পাতার সুপ্ত আলোকে। সেখানেই তো আছে জীবনের সব চাওয়ার ঠিকানা। রং থেকে মুক্ত হওয়া সাদা মেঘের মোহনা। যেখানে চিরবসন্তের কোকিল গায় সময় কালের বাইরে। যেখানে মর্ত্যের মোহ স্পর্শ করে না নিষ্কলুষ শান্তির দুয়ারে।

সেটাই তো রংহীন পরিদের আসল নিবাস। তাই ওদের অনন্ত আনন্দ, উচ্ছ্বাস।

মর্ত্যের জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতরা বিহ্বল তাকিয়ে থাকে নন্দিনীর দিকে ''শেষ পর্যন্ত আসল রংটাকে চিনলে?''

ঘরের ভেতরে, ফেলে আসা ক্যানভাসটার দিকে না তাকিয়ে মুচকি হাসে নন্দিনী।

পণ্ডিত হেসে বলে ''ওই যে ছবিটা এত বছর ধরে রং দিয়ে আঁকছিলে, একবার যদি চোখে স্পেক্ট্রোস্কোপ লাগিয়ে দেখতে। ওটা তো শুধু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ঢেউয়ের মেলা। ছোটো বড় ঢেউয়ে পালটে যাচ্ছে শক্তির খেলা। তুমি এতদিন চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে ভাবছিলে রং নিয়ে খেলছ! হে... হে... হে...''

নন্দিনী বোঝে রং-এর কারিগর চিত্রকরদের মিরাজটাকে। খুঁজতে খুঁজতে, মিশতে মিশতে, এক সময় হারিয়ে যায়।

পণ্ডিত কানে কানে ফিসফিস করে ''এই যে লালের মেলা দেখে লাফাচ্ছ, নানা বিশেষণে তাকে সাজাচ্ছ, কখনও বিপ্লবের বন্যার সাজে, কখনও প্রবহমান রক্তকণিকার স্রোতে, কখনও বা দয়িতার লাজুক লালিমায় - ওটা তো সব থেকে দুর্বল রং। আর ওই বেগুনি রংটা? ওটা যে লালের থেকে অনেক জোরালো, সে খবর রাখ?''

নন্দিনী কতদিন ধরে তো এই রং নিয়েই খেলেছে। কখনও চিত্রপটে, কখনও জীবনের মাঠে। খেলতে খেলতে রং-এর মাধুর্য মলিন হয়ে গেছে এত রং-এর মেলায়। আর সেই মলিন কঠোর রুক্ষ পৃথিবীতে যে রংটা সব থেকে ভেজাল, সেই সাদা রং নিয়েই সবাই মাতামাতি করে।

সাদা দেখলেই তো মানসিক পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা শ্যামলা ক্রীতদাসরা লাফিয়ে ওঠে। সাদা চামড়া দেখলেই ভয়ে জড়োসড়ো কেঁচো হয়ে পা চাটতে শুরু করে। নয়ত লালসা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আ-দেখলার মতো। যেন পৃথিবীর সব সম্ভার লুকিয়ে আছে ওই সাদার আড়ালে। নয়ত সাবেকি প্রথার না-বোঝা নিয়মের

বন্ধনে নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে, তাকে পবিত্রতার মোড়কে উপঢৌকন সাজিয়ে, বিয়ে থেকে শ্মশানে সঙ্গী করে, মর্ত্য থেকে স্বর্গের স্পর্শ পেতে।

অথচ ওই সাদাটাই হচ্ছে সব থেকে ভেজাল। সব রং মিশেই তো ওর সৃষ্টি।

এই তো কালই তার বাগানের মালীটাকে নন্দিনী জিজ্ঞেস করেছিল ‘‘সারাদিন তো গাছপালা নিয়ে আছ। জান কী এই গাছের রংগুলো সব দুটো রং-এই মেশে?’’

গাছের চারায় জল দিতে দিতে মালী বলেছিল ‘‘অতশত বুঝিনে দিদিমণি, পষ্ট দেখছি গোলাপটা লাল আর রজনীগন্ধাটা সাদা। আর তুমি কি না মোটা মোটা বইয়ের ছাইভস্ম কতা আমায় শোনাচ্ছ। আমি যে মাথামুণ্ডু কিসুই বুঝিনে’’

প্রথম জীবনে কত ছেলের মুখেই না শুনেছে জীবনানন্দর কবিতা **চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা**

আজ যেন পণ্ডিত, কবির কল্পনার বনলতা সেনকে নতুন করে চেনাচ্ছে নন্দিনীকে। অন্ধকারে সব রং মিলেই তো কালো দেখায়। নয় কী? কবি বুঝি রং হারিয়ে, অন্য রং না খুঁজে পেয়ে, তার চিরতৃপ্তির শান্তিকে, সব রং-এর মিশ্রণে মিশিয়ে ফেলেছে।

ওই যে কালী মন্দিরে দেবীর বন্দনা হচ্ছে, তারাও কিন্তু সব রং-এর সংমিশ্রণে গড়া পাথর প্রতিমার বন্দনা গানের আরাধনায় ব্যস্ত **মা কী আমার কালো রে...** তারপর দুচোখ ভাসিয়ে হৃদমাঝারে কালীমূর্তির ধ্যান করতে করতে বলছে **এ কালো সে কালো নয় গো শ্যামা, ভুলাবি কী মা মায়ার জালে?** কৃষ্ণভক্তরা তাদের সুরে তাল মিলিয়ে গাইছে **কালাচাঁদের রূপ দেখলে কী আর কেউ ওকথা বলতে পারে?**

তাদের বন্দনাগান শুনে পণ্ডিত মুচকি মুচকি হাসছে।

এই বসন্তের স্তব্ধ ঝরা পাতাগুলো নন্দিনীকে আরেক সুর শোনাচ্ছে। এতদিন ধরে যে রংগুলো নিয়ে ক্যানভাসে আঁকিবুঁকি কাটছিল, আজ ওই সাদা ক্যানভাসটার দিকে ফ্যলফ্যল করে তাকিয়ে, বাইরে এসে লাল পলাশ গাছ থেকে পাতাগুলোকে ঝরে পড়তে দেখে নন্দিনীর মনে হল, এতদিন কী বোকাই না সে! এতদিন ধরে সাতটা রং-কে সাতশো রং-এর প্যালেটে মিশিয়ে, সে কী রং-এর ছবি আঁকার চেষ্টা করছিল তার ক্যানভাসে?

আজ মুক্ত জীবনের আঙিনায় দাঁড়িয়ে তার মনে হল, জীবনের সব রংগুলো তো সাতরং-এর ক্যালিডস্কপিক খেলা। সেই খেলা ভাঙার খেলার দেওয়ালিতে, সাতটা রং যতই ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে যত রকম প্যাটার্ন তৈরি করুক না কেন, শেষমেশ মিলে যাচ্ছে একটাই রঙে। তার মনের লুকানো ভেলায়, তাকে নিয়ে যেতে ছোটবেলায় ওই স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুরের দেশে।

নিরাকারের বর্ণহীন আকারে - শ্বেতশুভ্র শান্তির বর্ণহীন মহাবিশ্বে।

নন্দিনীর মনে হল, এই বর্ণহীন বর্ণটাই তো আসল বর্ণ। তার জীবনের সাত-সাতটা রং-এর ঝলকানির রূপ যেন মিলেমিশে একাকার। ধূসর বর্ণহীন অনাড়ম্বর। যেখানে হাসি-কান্না, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ স্থবির। জাগতিক শেষ বর্ণ মিশেছে মহাজাগতিকের প্রেমে। সেখানেই তার সম্পূর্ণতা। সেখানেই তার পরিপূর্ণতা। সেখানেই সে আসল নন্দিনী।

তারপর?

কোনো গভীর কোণ থেকে একটা সুর ভেসে আসে ঘুড়ি লক্ষে দু-একটা কাটে মা, হেসে দাও গো হাত চাপড়ি।

নন্দিনী সেই দু-একটা কাটা ঘুড়ির ওপর ভর করে পৌঁছে গেল এক অবাক জগতে, সব আলোর ওপারে, এক আলো-উজানির দেশে, গুণ ছাড়িয়ে নির্গুণের রাজ্যে...

যেখানে আলো নেই তবু আলোর বন্যা, যেখানে গন্ধ নেই তবু সুগন্ধের ঝর্না, যেখানে কেউ নেই, তবু যেন কার অমৃতস্পর্শে দেহ মন আনন্দে শিহরিত হয়ে ওঠে প্রতি পলে। যেখানে স্তম্ভিত জাগ্রত মহাবিশ্ব বরণ করে নেয় তার সত্বা আর আত্মাকে পরম স্নেহে। কানে কানে নিঃশব্দে শোনায় এক গম্ভীর প্রণবধ্বনি শান্তির আলোকে, মহাবিশ্বের পরম সত্যের অমৃত কথাঃ

'ওঁ প্রত্যাগ্যানন্দং ব্রহ্মপুরুষং প্রণবস্বরূপং

অ-কার উ-কার ম-কার ইতি

ওঁ স্বর্বভূতস্থং একং বই নারায়ণং পরমপুরুষং

অকারণং পরমব্রহ্মং ওঁ

ওমিতি ব্রহ্ম ওমিতি ব্রহ্ম...'


স্ফুলিঙ্গ
অনিরুদ্ধ বসু

স্ফুলিঙ্গ

SFULINGA

Published by **SMRITI PUBLISHERS**
Website: www.smritipublishers.com

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৫
প্রথম ই-বুক প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৫

প্রচ্ছদপটঃ অদিতি চক্রবর্তী
অলংকরণঃ স্বপন দত্ত

উৎসর্গ

আমার দাদা
স্বপন গুহ

যাদের সহায়তা এই লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে

আশিস কুমার চট্টপাধ্যায়
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
শান্তনু চক্রবর্তী
স্বপন দাস

ভূমিকা

অনিরুদ্ধ বসুর নতুন উপন্যাসটির ভূমিকা লেখার আগে পাণ্ডুলিপিটি পড়ে শেষ করলাম। বইটা পড়ার সময় এবং পড়ার পরে এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো। এক কথায় অনুভূতিটা বোঝানো যাবে না। বিরক্তি, রাগ, দুঃখ, হতাশা এবং আশা, সব কিছু আবেগের আঁচে আর যুক্তির ছুরিতে তালগোল পাকিয়ে গলার কাছে একটা অব্যক্ত কান্নার দলা হয়ে আটকে গেল।

সত্যি কথাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে রীতিমতো সাহস লাগে। সর্বক্ষেত্রে বাঙালির পিছিয়ে যাওয়াটা দুঃখের, কিন্তু ভয়ের নয়। সাময়িক পিছিয়ে পড়াটা জাগতিক নিয়মের মধ্যেই পড়ে। পিছিয়ে পড়লেও আবার এগোনো যায়, যদি ...

এই যদিটাই এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। এই যদিটা যখন মানসিক ক্লীবত্বে পরিণত হয়, তখনই হয় ভয়। বাংলা এবং বাঙালির ভবিষ্যতের জন্য ভয়। মানসিক জড়তা জন্ম দেয় এক আশ্চর্য উন্নাসিক কূপমণ্ডুকত্ব। তার প্রধান লক্ষণ অতীতকে আঁকড়ে ধরে ভবিষ্যতকে অস্বীকার করা। 'এই বেশ ভালো আছি' মানসিকতা যখন মিশে যায় 'ওল্ড ইজ গোল্ড' আর 'আমি বা আমরাই শ্রেষ্ঠ' মনোভাবের সঙ্গে, তখনই ঘটে একটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ বা জাতির অবক্ষয়। তখন কেউ এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলে তাকে প্রথমে উপেক্ষা, তারপর বিদ্রুপ এবং তারপর ছোট করার চেষ্টা করা হয়।

অনিরুদ্ধ বসু তার নতুন উপন্যাস 'স্ফুলিঙ্গ'-তে এই কঠিন অপ্রিয় কাজটি করার চেষ্টা করেছে। কলা বা কৃষ্টি ক্ষেত্রে বাংলা ও বাঙালি যে ক্রমাগত পিছিয়েই যাচ্ছে, মধ্যমেধার রাজত্বে যে নতুন প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেওয়ার একটা ঘোর চক্রান্ত চলছে, অনিরুদ্ধ বসুর সাহসী কলমে তা উঠে এসেছে।

কিন্তু অনিরুদ্ধ বসু শুধু কালো রঙটাই দেখায়নি। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্মশানভূমি থেকে আলোর পাখি ফিনিক্সের উঠে আসার মতো তার উপন্যাসের প্রটাগনিস্টের লড়াই করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার গল্পও শুনিয়েছে।

আজ অনিরুদ্ধ বসুর উপন্যাসটির ভূমিকা লিখতে বসে একটাই কামনা করছি, এই কাল্পনিক **'স্ফুলিঙ্গ'** সত্যের দাবানলে পরিণত হয়ে বাংলার কৃষ্টিজগতের পুঞ্জীভূত জঞ্জালে খাণ্ডবদহনের সৃষ্টি করুক, যাতে সেই পোড়ামাটির গর্ভ থেকে ফিনিক্সের মতো নতুন প্রজন্মের প্রতিভাশালী অঙ্কুরগুলি জন্মায় এবং কালক্রমে মহীরূহে পরিণত হয়।

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়

দুর্গাপুর

আগস্ট ২০১৫

এক

"ফিফটি-ফিফটি"

একটা পথ, অন্যটা রথ। রথে চড়তে গেলে, পথকে তো সাথি করতেই হবে। রথ তো আজকের এম্পায়ারে তাকে রানির আসনে বসিয়ে দিতে পারে। তা বলে পথকে ফিফটি পারসেন্ট? তার থেকে টুয়েন্টি-এইট্টি কিংবা থারটি-সেভেন্টি হলে ঠিক হত না? দেওয়ালি ভাবল, রথের থেকে পথের দাম বেশি হয়ে যাচ্ছে না তো? রথে চেপে বিজয়ের পথে হাঁটতে গেলে, ভেদাভেদ না করেই এগোতে হবে, এটা দেওয়ালির জানা।

"বালিতে এক উইক। চার দিন শোভন রায়চৌধুরির সঙ্গে। তিনদিন আমার সঙ্গে" কোনও রকম ভণিতা না করেই বলল দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য।

মিডিয়া জগতের সেলিব্রিটি দিগ্বিজয় উপলক্ষ মাত্র। শোভন রায়চৌধুরিই আসল। ম্যাগনো ইন্ডিয়ার কর্ণধার বলে নয়। আসলে ম্যাগনো ইন্ডিয়া চালায় ওর দাদা পুরুষোত্তম রায়চৌধুরি। সেই বিশাল সাম্রাজ্যের অকর্মণ্য ওয়ারিশ শোভন এখন বাঙালি কৃষ্টির কর্ণধার হয়ে 'নারী উত্তমে' ভূষিত হতে চাইছে। হয়ত কালেদিনে 'বঙ্গোত্তম'-ও জুটে যেতে পারে, ঠিক মতো তদবির করতে পারলে। না... না... না... নিজের প্রতিভার ব্যাপ্তিতে নয়। ওর দাদার 'পাঁচ মেশালি অধ্যবসায়'-এ, বাঙালি সংস্কৃতির দিকপালরা ওর হরির লুঠের অর্থ গিলতে, ক্রীতদাসে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই হরির লুঠ থেকে দেওয়ালিও বঞ্চিত হবে না, সে জানে।

মৃদু স্বরে কিছুটা আমতা করে, শ্যামলা চোখ মেলে, ভ্রুটাকে ওপরে তুলে বলল "কত?"

"যাওয়া থাকা আনন্দ ফুর্তি সব অন দ্য হাউস। প্লাস দু লাখ টাকা দিনে" দিগ্বিজয় উত্তর দিল।

মানে সাতদিনে চোদ্দ। একটা বাংলা সিনেমায় উদয়াস্ত পরিশ্রম করে দেওয়ালি এর ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে না। নামেই হিরোইন। পয়সার ব্যাপারে লবডঙ্কা। ওই 'হিরোইন' তকমাটা আছে বলেই তো এত টাকার জোগান, এত ফরেন ট্রিপ। রোজগারের বাজারে নামলে কী বাছ বিচার করা চলে? এটাও তো এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি। তফাতটা শুধু নামের - পাবলিক, না প্রাইভেটে এন্টারটেনমেন্ট। এর কী কোনও রূপ আছে? পাবলিক অর প্রাইভেট? যেখান থেকে টাকা আসছে, সেটাই আজকের এন্টারটেনমেন্ট-এর ব্যাখ্যা। স্বার্থক বিনোদন।

"কবে?"

"নেক্সট উইকে এনি শুটিং শিডিউল?"

মোবাইলের অ্যাজেন্ডা হাতড়ে দেওয়ালির নাঃ... ফ্রি। কয়েকটা ফিতে কাটা ছাড়া... সেটাও ইজিলি ক্যান্সেল করে করে দেওয়া যায়। তার কম্পেনসেশন... না।

"কত?"

"তিনটে ফিতে কাটা মানে সেভেন্টি ফাইভ..."

"ঠিক আছে। শোভনকে বলব, আরও এক লাখ এক্সট্রা দিতে। তাহলে কনফার্মড?"

মাথা না নেড়ে কী কোনও উপায় আছে? 'না' হলে এই ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকতে পারবে না। শোভনের অর্থজালে রাঘববোয়াল থেকে চুনোপুঁটি - সবাই বসে আছে। এই চক্রব্যূহ ছেড়ে পালাবে কোথায়?

"আমরা তিনজন, না অন্য কেউ আছে?" সন্দেহ নিয়ে দেওয়ালি প্রশ্ন করল। বলা যায় না তো। এরা আবার কাকে ভিড়িয়ে নেবে!

ভারতের বাইরে বালির সমুদ্রতটে কে কী করছে, সে খবর বাংলায় চট করে কেউ রাখে না। সঙ্গে অন্য কেউ থাকলে আবার মুস্কিল। ইন্ডাস্ট্রিতে গসিপ ছড়াতে দেরি হবে না। চেনা দুনিয়ার বাইরে অলক্ষ্যে কে কী করে বেড়াচ্ছে, সে খবর রাখতে না-পারলেও, একটা মসলা পেলে তাকে রং চড়িয়ে ফলাও করে গল্প ফাঁদার লোকের অভাব নেই। কম্পিটিশনের বাজার। কাদা ছিটিয়ে, নিজের লাইন ফিট করে নেওয়ার মতো 'বন্ধু' তো কম নেই! ছোট হলেও, এই দুনিয়ায় তার তো একটা ইমেজ আছে। সেটা যাতে কেউ এক্সপ্লয়েট করে ফায়াদা না লুটতে পারে, তাই সাবধান।

"না... না... আমরা তিনজনই। আসলে বালির উদয়ন ক্রিকেট ক্লাবের অ্যাডভাইসর হিসেবে ওরা আমায় ডেকেছে। মিটিং অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছি। ওখানে যখন ব্যস্ত থাকব, শোভন তোমায় কম্প্যানি দেবে" দিগ্বিজয় আশ্বাস দিয়ে বলল।

"একেবারে সচিন থেকে উদয়ন!" দেওয়ালি মুচকি হাসল।

"প্রাচীন থেকে নবীন" মুখের কোণে শুকনো হাসি। চোখ দুটো অপলক, স্থির, শীতল। ওই চোখের দিকে তাকালেই দেওয়ালির অস্বস্তি হয়। একটু বেফাঁস হলেই চোখটা সাপের মতো ছোবল মারবে। মানুষ দিগ্বিজয় চোখের মধ্যেই নিজেকে জানান দেয়।

দেওয়ালি-ই শুধু ওর আসল রূপটা দেখতে চায় না। দুধ কলা একত্র হয়ে ধান্দার তাগিদে সমুদ্রতটে কিছুদিন কাটানো যায় বটে, ওর ছোবল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে। তবে ওই পর্যন্তই। রথে চড়তে গেলে, পথের ওপর দিয়েই তো যেতে হবে। পথের ধারে চাটাইয়ে শুয়ে পড়লে তো আর রথে চড়া হবে না।

টলি ক্লাবে দিগ্বিজয়ের সঙ্গে লাঞ্চ সেরে আর সময় নষ্ট করল না দেওয়ালি। বালিতে নয় অনেক রাতের ঘুম যাবে, কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে না-ও হতে পারে। কিন্তু এখনকার ঘুমটাকে মাটি করতে চায় না। শুটিং

থাকলে তো বড় একটা ঘুমের সুযোগ হয় না। গলফ রোডের ঘরে এসি চালিয়ে তার সাদা স্ল্যাক্স, লাল টপসটা ছুড়ে দিল ক্লোজেটে। জি স্ট্রিংস আর ব্রা। খাটের দিকে এগোতে গিয়ে চোখ গেল শ্যামলা তন্বী দেহটার দিকে।

টিপিক্যাল বাংলা টাচ। খুব কী পাল্টেছে?

যখন সাইন্স কলেজে কেমিস্ট্রি পড়ত, বয়স আরও কম ছিল। অনেক বেশি ছিপছিপে। নদীয়া থেকে আসা শ্যামলা রং-এর মেয়েটি যে কাউকে খুব আকৃষ্ট করতে পেরেছিল, এমনও নয়। কাজল কালো চোখ দিয়ে অন্য মেয়েদের দেখত, বয়ফ্রেন্ডের মোটর বাইকে চেপে হুস করে বেরিয়ে যেতে। শিথিল পায়ে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকত। কখন বাস আসবে। ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি করে লেডিস সিটটা ম্যানেজ করতে পারলে নিশ্চিন্তি। হস্টেলে ফিরে ক্লান্ত ঘেমো গা'টাকে শাওয়ারে চুবিয়ে ফ্যানের তলায় বসতে পারলেই একটু সোয়াস্তি। উইকএন্ডে বাবা-মাকে দেখতে যাওয়া। কষ্ট থাকলেও, সামনে একটা স্বপ্ন ছিল। না... না... - তারকা হওয়ার নয়। ভাল ছাত্রী হওয়ার। শুধু টাকা রোজগার করার নয়, প্রকৃত মানুষ হওয়ার।

আজ বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই মোবাইলটা বেজে উঠল। সিএলআই-তে নামটা দেখেই চমক। এতদিন পর রাজাদিত্য!

নিঃস্পৃহ গলায় "হ্যালো"

"কেমন আছ?"

"ঠিকই আছি" দেওয়ালি সংক্ষিপ্ত। রাজা নিশ্চয়ই এই ভর দুপুরে কুশল জানতে ফোন করেনি। কারণটা কী!

"কোথায় আছ? শুটিং?"

"নাঃ... ঘুমোতে যাব"

"এই ভর দুপুরে!"

"অফ টাইমে না তো কখন!" বাঁ হাতটা আপন মনে নাভির চারপাশে বোলাতে বোলাতে জবাব দিল।

এবার আর কোনও ভণিতা না করেই রাজাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলল "তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল..."

"বল" দেওয়ালির বাঁ হাতটা অভ্যাসবশত জি স্ট্রিং-এর মধ্যে খেলতে লাগল। একা থাকলেই নিম্নাঙ্গ নিয়ে খেলার সূক্ষ্মতা রপ্ত করে ফেলেছে।

"দেখা হলে ভাল হত"

"এ উইকে শুটিং-এর ডেটস আছে। নেক্সট উইকে দেশের বাইরে"

“একদিনও কী সময় করতে পারবে না?”

“এখন হবে না। বরং ফিরে তার পরের উইকে জানাব”

“বেশ... তাই...”

সময়ের সঙ্গে অনেক কিছুই না পাল্টে যায়। আজ দেওয়ালি স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে রাজ সিংহাসনে বসতে। আর রাজাদিত্য অতীতের ঝাঁপি নিয়ে আজ দেওয়ালিকে বাঁধতে চাইছে। যখন চলমান জীবনটা ধীরে ধীরে বর্তমানের শূন্যতায় ডুব দেয়, তখন ফেলে আসা অতীতকে কেন বারবার ফিরিয়ে আনা।

খেলতে খেলতে কখন যে তলাটা ভিজে গেছে, খেয়ালই করেনি। এই সোয়াস্তি ঘুমে বেশ সাহায্য করবে। অন্য কেউ থাকলে ঘুমটা ঠিক মতো হয় না। নিজের ঘরে, নিজের বিছানায় আনায়াসেই নিজের মতো ঘুমিয়ে পড়া যায়। পৌঁছনো যায় স্বপ্নের সেন্টার স্টেজে।

বেশ কয়েকদিন ধরে একটা স্বপ্ন ঘুমের ঘোরে বারবার ফিরে আসছে। কখনও তেমন গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু স্বপ্নের টুকরোগুলো কেমন যেন। একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে সে একা দাঁড়িয়ে, গাঢ় অন্ধকারে। কোথাও এক ফোঁটা আলো নেই। সে পথ খুঁজছে বেরবার। কোনও পথ নেই! ক্রমশ সেই গুহার পাথরগুলো সরে যাচ্ছে। তার মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে অথচ চোরাবালি নয়! নীচে জ্বলছে অগ্নিপিণ্ড। তা থেকে উল্কার মতো স্ফুলিঙ্গ ছিটকে আসছে। তারপরই... ঘুমটা ভেঙে যায়। আজও আচমকা সেভাবেই ছিটকে উঠল নিজে।

অন্ধকারের মধ্যে ফ্যালফ্যাল করে সিলিঙের দিকে চেয়ে। কোথায় যেন একটা তীব্র যন্ত্রণা পরিত্রাণ খুঁজছে এত পাওয়ার মধ্যেও। তৃপ্তির মধ্যে অতৃপ্তিটা কোথায় জানে না দেওয়ালি। সামনে জীবন্ত তারার মেলা হাতছানি দিচ্ছে। আর কয়েকটা ধাপ পেরলেই তো সাকসেসের গোল্ডেন ক্রাউন। যার মোহে তার চারপাশের চরিত্রগুলো সকাল থেকে সন্ধে পাগলের মতো ছুটছে একটু লাইমলাইটের নেশায়। তবু কেন নাছোড়বান্দা স্বপ্নটা সময় পেলেই গ্রাস করতে চায়!

আর অন্ধকার নয়।

বেড সুইচটা অন করতেই বেডরুমে একটা মায়াময় পরিবেশ। এর থেকে বেশি আলোর কী কোনও প্রয়োজন আছে? এই আলো আঁধারির খেলা বেশ মোহময়। একটু শীত করছে। এতক্ষণ এসি চলছে, ঘরটা ঠান্ডা। এসিটাকে অফ করে মিউট মোবাইলটা নিয়ে মিসড কলগুলো স্ক্যান করতে লাগল।

প্রচুর! পরে দেখা যাবে।

বেডসাইড টেবিলে রাখা প্যাকেট থেকে সিগারেট ধরাল। এই আলো-আঁধারির মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা নেই। তার জীবনটাও তো ডাঃ জেকিল আর মিঃ হাইডের মতো ডুয়ালিটিতে ভরা। আলোর রোশনাইয়ে সে

উজ্জ্বল তারকা। আবার একই মানুষ অন্ধকারের আস্তিনে পা ফাঁক করা লাখ টাকার এসকর্ট। নিজের অস্তিত্বটা চারপাশের মতোই মোহময়। হিপক্রিসির মনুমেন্টে বসে নিজেকে সাজাচ্ছে নানা আভরণে।

একা ঘরের এই শ্যাডোয়ি অ্যাটমসফিয়ারে তার সেমি-ন্যুড প্রোফাইল অনেক বেশি ন্যাচারাল। শ্যামলা দেহটাই যেখানে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু নয়, সেখানে সে অনেক বেশি স্বাভাবিক। যেমন ছিল ছোটবেলায় তার সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে।

নামটা বাবা-মা-ই রেখেছিল দেওয়ালি। কালীপুজোর দিনে জন্ম, তাই। দিয়া হয়ে জ্বললেও দেওয়ালির ফুলঝুরির মতো মনে স্বপ্ন ভাসত একদিন রোশনাই হওয়ার। হাজার আলোর মাঝে নক্ষত্র হয়ে... আলোর বন্যায় ভরিয়ে দিতে নিজেকে।

বাবার কাছে শুনেছে, তাদের আদি ভিটে বাংলাদেশের ফরিদপুরে। সেই একাত্তরে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হল, বাবা-মা ভিটেমাটি ছেড়ে পেট্রাপোল পার হয়ে পালিয়ে আসে কলকাতায়। তারপর বাঘাযতীনের উদ্বাস্তু কলোনি থেকে ঠাই করে নেয় মহানগরীতে। যদিও দেওয়ালির শিক্ষায় কোনও খামতি রাখেনি। অনেক স্কলারশিপ পেয়েছিল। লরেটো বউবাজার থেকে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করায় বিদ্যাসাগর কলেজে কেমিস্ট্রিতে অনার্স।

কাজের তাগিদে বাবাকে চলে যেতে হয় নদীয়ায়। দেওয়ালিকে সল্ট লেকের সুইমিং পুলের পাশে একটা পিজি অ্যাকমডেশনে রেখে। খোলামেলা জায়গায় শহরের ঘিঞ্জির বাইরে কিছুটা হলেও প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে পারত। হয়ত স্কুপ বা গঙ্গোত্রীতে বসে কারও সঙ্গে আড্ডা মারেনি, তবুও একাকী জীবনে ঘরে বসেই দেখত, উলটো দিকের মাঠে, অন্যরা বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ফুচকা, ভেলপুরি খাচ্ছে। ওই মডার্ন ছেলেমেয়েদের অনাড়ম্বর শ্যামলা তন্বী দেওয়ালির দিকে ফিরে তাকানোর সময়ও ছিল না। তাই একা পিজি অ্যাকমডেশনে আর পাঁচটা মেয়ের মতো আরেকটা স্বভাবিক অনাড়ম্বর জীবন।

ওই কাজল কালো চোখ দুটোর মাদকতাকে বোঝবার মতো কোনও পুরুষ সামনে এসে দাঁড়ায়নি। নিবিড় হয়ে বলেনি 'তোমাকে চাই'। নারীত্বের সংজ্ঞাটা মিশে গেছিল না-পাওয়ার দাবি মেটাতে।

তবুও 'আজকের ভালবাসা'-র মায়াবী অন্ধকার ভেদ করে মোবাইলটা বেজে উঠল। এবারে রণদীপ।

"চক্কর কেয়া হ্যয়? দিনভর বহতবার ফোন কিয়া, ফোন রিসিভ নেহি কি?" বিরক্তিটা স্পষ্ট।

"সো গয়া থা" আমতা আমতা উত্তর।

"আজ কেয়া শুটিং নেহি হ্যয়?"

"নেহি। আজ হলিডে"

"ফির তো সাম মে আর রহে হ?"

“কাহাঁ?”

“জার্মান কনসলেট কে পার্টি মে...”

ভুলেই গেছিল, সন্ধেবেলা জার্মান কনসলেটে পার্টি। কার্টসি রণদীপ ভুটোরিয়া। সোশালাইট। প্রায়শই এরকম কনসলেটের পার্টিতে দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়। নিজেও আইটিসি সোনার থেকে হায়াত রিজেন্সি অথবা তাজে রেগুলার পার্টি চলে। সেখানে কেউকেটাদের ছড়াছড়ি। লোকটার যে কীসের ব্যবসা কে জানে। কী একটা ট্রাস্ট আছে। আগে দেওয়ালির এসব জায়গায় ডাক পড়ত না। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, প্রায়ই ডাক পড়ছে। বোধহয় র‍্যাট রেসে জাতে উঠছে। এসব পার্টিতে থাকা মানেই কলকাতায় স্ট্যাটাস সিম্বল। যদিও শুনেছে, পরখ করার দুর্ভাগ্য হয়নি। এই স্ট্যাটাসের অন্তরালে পার্টিগুলো মানেই, কলকাতার উঁচু মহলের রাতের সঙ্গী নির্বাচনের স্বয়ম্বর সভা।

বিয়ে তো এখনও হয়নি। আপাতত করার ইচ্ছেও নেই। তবে মাঝেমাঝে স্বয়ম্বর সভায় বসে লাভটাই বা কী? একা ঘরে, পা ফাঁক করে শুয়ে নিজেকে নিয়ে খেলা করার মধ্যে আত্মতৃপ্তি থাকতে পারে, কিন্তু সোয়াস্তি ছাড়া মালকড়ি নেই। কলকাতার হোমরাচোমরাদের দামি ফ্ল্যাটে রাত কাটালে অনেক, অনেক, অনেক বেশি...

আত্মতৃপ্তির কোন জায়াগাই নেই। যদি না, অর্থটা মাপকাঠি হয়।

“ভুল গয়া থা। ওকে... আই উইল বি দেয়ার বাই এইট থার্টি টু নাইন”

“পসিটিভ” ফোনটা কেটে দিল রণদীপ ভুটোরিয়া।

শেষের শব্দটার মধ্যে আবেদনের থেকে হুকুমের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।‘সেলিব্রিটি’-র রাজমুকুট পড়তে গেলে এমন অনেক হুকুমের দাস হতে হয়। এক সময় চুনমুনদি থেকে অনুশ্রীদি অনেক করেছে। শুনেছে, অনুশ্রীদি এই করে তদানীন্তন পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে সানি পার্কে একটা ফ্ল্যাটও বাগিয়ে নিয়েছে। সো-বিজ দুনিয়ায় মধ্য গগনে বিরাজ করা পদ্মপর্ণাদি, এখনও প্রদীপ গোয়েঙ্কার মিস্ট্রেস। দেওয়ালি কোন ছাড়... বিকিকিনির বাজারে, মধ্যরাতের ‘ভালবাসা’র কী কোনও অভাব?

ফোনটা কেটে দেওয়ালির মনে হল, কোনটা ভাল জীবন? কেমিস্ট্রি মাস্টার্সে গোল্ড মেডেল পাওয়ার পরে পিএইচডি-তে ঢুকে, স্বামী বাচ্চা নিয়ে ঘর সংসার করে আর পাঁচটা মেয়ের মতো নর্মাল জীবন কাটিয়ে দেওয়া, নাকি খ্যাতির সপ্তম স্বর্গে রাজরানি হয়ে থাকতে গিয়ে অলিখিত স্লেভারি?

এখন ভেবে আর কী হবে? ভাগ্য যে পথ বেঁধে দিয়েছে, সেই পথেই চলতে হবে। দেওয়ালি আর পেছন ফিরে তাকাতে চায় না। পেছনের দিকে হাঁটতে গেলে, পিছিয়ে পড়া ছাড়া আর কিছুই হয় না। তার থেকে,

সামনের দিকে তাকানোই শ্রেয়। ফর গুড অর ফর ওয়ার্স। ঈশ্বরের দেখানো পথে বাধা দিতে গেলে অশান্তি ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। যেমন রাজাদিত্য। হঠাৎ এতদিন পর ফোন করল কেন?

দেওয়ালি যে আর পেছনে হাঁটতে চায় না। রাজা অতীত। আজ রণদীপ ভুটোরিয়া কিংবা দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য বা শোভন রায়চৌধুরি। ওরাই বাংলা কৃষ্টির ধ্বজাধারী। আর সবার মতো ওই পথেই হাঁটতে চায় দেওয়ালি। অত ভাবার সময় নেই, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে। ইট ইজ বেটার টু লিভ ফর টুডে, দ্যান থিংক অ্যাবাউট টুমরো।

আলো-আঁধারি ঘরে বাড়তি আলো না জ্বালিয়ে, পর্দাটা খুলে দিল। বাইরে, নতুন সাজে সাঁঝের কলকাতার সারি সারি ত্রিফলা আলোর রোশনাই হাতছানি দিচ্ছে। এই শহর তাকে চুম্বকের মতো টানে। উপেক্ষিত শান্ত স্নিগ্ধ রূপমাধুর্য, তন্বী শ্যামলা দেহের অনাবিষ্কৃত যৌবন পাখনা মেলে ভেসে বেড়াতে চায় কলকাতার আকাশে বাতাসে, দিনে রাত্রে, রূপকথার পরি হয়ে...

সব কিছুই তো তার ভবিতব্যের নিয়মে চলেছে, কেবল আসল স্ফুলিঙ্গটা ছাড়া।

দুই

"আর কদ্দিন ফেলে রাখবেন অঞ্জনদা?"

ম্যাগনো ইন্ডিয়ার সল্ট লেক সেক্টর ফাইভের অফিসে অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে কফিটা এগিয়ে দিয়ে বলল শোভন রায়চৌধুরি।

ঝাঁ চকচকে অফিসের ঘরটা কাঠের প্যানেলে মোড়া। মেহগনি টিকের ডেস্ক ছাড়িয়ে ওপাশে একটা ছোট্ট লাউঞ্জ। ওধারে বাথরুম। ডেস্কে ফাইলপত্র না থাকলেও অত্যাধুনিক কম্পিউটার। লাগোয়া অ্যানেক্সে একটি বোর্ড রুম। বাইরে, সুন্দরী মহিলারা কম্পিউটারে বসে টাইপ করে যাচ্ছে। এরা কেউই ম্যাগনো ইন্ডিয়ার প্রকৃত কর্মী নয়। এরা শোভনের সংস্কৃতি ব্যাপ্তির সহায়ক। তার নামের সৃষ্টিকে জনসমক্ষে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাইনে করা কর্মচারী। এদের কাছে অঞ্জনবাবুর পরিচয় 'অঞ্জন স্যার' - শোভনের সাহিত্য বিন্যাসের মুল কান্ডারি।

যখন কলকাতার রথী-মহারথীদের নীচের তলার বিশাল ব্যাঙ্কয়েট হলে লাঞ্চে ডাকা হয়, কিংবা অঞ্জন স্যারের লেখা, শোভনের নামে প্রকাশিত বই-এর ঘটা করে ওপেনিং হয়, এরাই অতিথি আপ্যায়ন থেকে বইয়ের উন্মোচন, যাবতীয় কাজ, মুখে হাসি ছড়িয়ে করে। পেছনে সেই হাসিটা তির্যক হলেও, সামনে কিন্তু এরা উজ্জ্বল বিনম্র। তথাকথিত 'জ্ঞানীগুণী' ব্যক্তিদের আতিথ্যে সদা তৎপর। এরাই শোভনের সংস্কৃতি বিন্যাসের নেপথ্যে ম্যাগনো ব্রিগেড।

দু-ভাইয়ের বেশ কিছুদিন ধরেই ফলাও কারবার। ম্যাগনো ইন্ডিয়ার দুর্বার বৃহত্তর ব্যাপ্তির নেশায়, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য, উচ্চপদস্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে হাতে রাখতে হয়। তাই পুরুষোত্তম রায়চৌধুরি ওদের চাকরিতে শামিল করতে এতটা ব্যস্ত। রিটায়ার্ড উচ্চপদস্থ আমলারা অরগ্যানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে এক্সপ্যানশনে অনেক সুবিধে। ছোটভাই শোভন তখন ম্যাগনো ইন্ডিয়া নিয়ে সময় নষ্ট না করে, কলকাতার সাংস্কৃতিক ব্রিগেড নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় মশগুল। লোকে নয় পুরুষোত্তমকে চিনুক তার কর্মদক্ষতার জন্য, শোভনকেও লোকে চেনে, এই সংস্থার ঔদার্যের জন্য। পার্টি হোক, কি সুন্দরী নায়িকা থেকে গায়িকা, কেউ বলবে না, শোভনের দিল নেই। খোস মেজাজে দিলখুশ হয়ে, ম্যাগনোর ম্যাগনাম অ্যামাউন্ট উদার হস্তে বিলোতে কার্পণ্যই করে না।

অস্তিত্ব সঙ্কট?

মধু না ছেটালে কি মৌমাছি আসবে?

“লিখছি তো বেশ কিছুদিন ধরে। লিখতে গেলে তো পড়াশোনা করতে হয়” অঞ্জনদা হাফ টাকে পাকা চুলটা পেছনে সরিয়ে, কফিতে চুমুক দিল।

“আর কদ্দিন? সামনে এতগুলো অনুষ্ঠান - গোদের মতো বিলেত অ্যামেরিকার বং-সং, নর্থ অ্যামেরিকান বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের ফাংশন, তার ওপর বিষফোড়া কলকাতা বুক ফেয়ার তো আছেই”

অঞ্জন হেসে লাট- “কিচ্ছু চিন্তা করো না। সব ঠিক সময়মতো হয়ে যাবে”

“রাজীব বলছিল, বই শুকতেও তো সময় লাগবে...” শোভনের দ্বিধা কাটছে না।

“ঠিক হয়ে যাবে। আমি রাজীবের সঙ্গে কথা বলে নেব” অঞ্জন কনফিডেন্ট।

প্রকাশক রাজীব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অঞ্জনের অন্য একটা অঙ্ক আছে। রাজীব চট্টোপাধ্যায়ের মিত্র ভারতী প্রকাশনার লভ্যাংশের কর্ণধার অঞ্জন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে যত মহিলা এসেছেন, তাঁদের চর্বিতচর্বণ করে কিছু অর্ধসত্য মিশিয়ে, বাজারে ছাড়তে ওর জুড়ি নেই। সেই শূন্যতা বিক্রি করাই অঞ্জনের প্রতিষ্ঠার মুল। এ ব্যাপারে সে নিজেকে সিদ্ধহস্ত ভাবে। সেখানে কেউ বাদ যায় না। ওর নিজস্ব শূন্যতা ভরাতে রবীন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ, সব অ্যান্টিক মশলাই মজুত। অন্তরালে ঘটনা যাই থাক না কেন, তা অবান্তর। নামী লোকেদের বাংলাবাজারে দামি করে তুলতে ওস্তাদ।

সেই রসালো কেচ্ছা নতুন প্রজন্ম গোগ্রাসে গিলে বলে, ‘আগে তো এমন রবীন্দ্রনাথকে জানতাম না। অঞ্জনবাবুর লেখা পড়েই তো ব্যাপারটা জানলাম’। এর মাঝে পাবলিসিটির জন্য টাকা আর শোভনের সাংস্কৃতিক মহিলা ব্রিগেড। সেই যজ্ঞে আড়াল থেকে ঘি ঢালেন ‘ঋত্বিক’ অঞ্জন। একেবারে যে বোঝে না শোভন, তাও নয়। কিন্তু কিছুই করার নেই। ওদের ছাড়া, সে তো অসহায়।

“আগেরবার যখন তোমার জন্য ভারতীয় গীতাঞ্জলি লিখে দিয়েছিলাম, ঠিক সময় শেষ করিনি?”

“তা করেছিলে। কিন্তু তখন তো এতগুলো প্রোগ্রাম ছিল না”

“হলেই বা। আমিও তো তোমার সঙ্গে যাব। শেষ না করলে কি তুমি আমায় নিয়ে যাবে?”

বড় গাছের সঙ্গে অজস্র পরজীবী লতাগুল্ম জড়িয়ে থাকাও প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম। অত্যাধুনিক জীবনযাপনও তাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। নগরসভ্যতা প্রকৃতি থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, সেটুকুও টের পাওয়ার উপায় নেই।

ধুরন্ধর অঞ্জন জানে কী ভাবে শোভনের কাছ থেকে পণ্যমাশুল আদায় করে নিতে হয়। দেয়ার ইজ নো ফ্রি লাঞ্চ। শুধু ক্যাশে নয়, কাইন্ডেও। চুলটা কী এমনি এমনি পেকেছে? কম ঘাটের জল তো খেল না। তাইতো এখনও জলে ভাসছে - রঙিন না সাদা, সে শুধু স্তাবকরাই বলতে পারবে। ভাসতে ভাসতে নিজের জীবনের নোঙরটাই জমি খুঁজে পেল না। এখন ওই কচি-কাঁচাদের নিয়ে ফুর্তিতেই আনন্দ।

মিষ্টি হেসে মোলায়েম করে শোভন বলল "নিশ্চয়ই যাব। এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হয়?"

ধান্দার জগতে কখনই নয়।

সঙ্গে সাংস্কৃতিক জগতের কচি থেকে মাঝবয়সি অনেক দিকপালই যাবে, যদি প্রোগ্রামের অফার পায়। ওখানে ফ্রি খাওয়া-থাকা-আপ্যায়ন। বাকি খরচ ম্যাগনোর সৌজন্যে। এমনি এমনি সবাই শোভনকে পাত্তা দেয় না। এদের আশীর্বাদে ধন্য শোভন যাদুকর ইমেজে তাই বঙ্গ বরেণ্য, আজকের বাজারে অনন্য। খালি একটু ফাঁকি রয়ে গেছে। এখনও কোনও ভূষণ-শ্রী জুটিয়ে উঠতে পারেনি। ঠিক জায়গায় ঢালতে পারলে সেটাও যে কোনোদিন জুটে যাবে। সেই আশাতেই দিন গোনা।

"আজকে কোনও ডিনারের নেমন্তন্ন নেই?" অঞ্জন প্রশ্ন করল।

"নাঃ... আজকে কোনও পার্টি নেই"

"তাহলে ছোট করে একটা হয়ে যাক। চল আজকে আমরা চারজনে মিলে তাজের সুকে খেয়ে আসি"

"আর দুজন কারা?"

"ইমা আর অবন্তী"

খুবই পরিচিত নাম। পরিচিত মুখ।

কিন্তু খাওয়ার পরের অংশটার কথা মনে হতেই, শোভনের সারা গা রি রি করে উঠল। ইমা উঠতি রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেও, ওই লিকপিকে মেয়েটার সঙ্গে শোয়ার কথা মনে হতেই, শোভন আবার একবার ভিরমি খেল। দু-একবার যে কিছু করেনি, তা নয়। কিন্তু ওই শুটকি মাছের মতো দেহটাকে ভোগ করার মধ্যে কোনও মজা নেই। অঙ্গটাকে চাঙ্গা করতেই সারা রাত কত রঙ্গ করে পার হয়ে যায়।

টাকা ঢালব আমি। আর আমার দিকে রদ্দি মাল ছুড়ে ভোগ করবে তুমি? এ না হলে অঞ্জনদা! লেই-এর মধ্যে ক্ষীরটা তুলতে ওস্তাদ। এত চেষ্টা করেও অঞ্জনদার মতো পাক্কা খেলোয়াড় হতে পারল না। ঠিক সময়মতো হয়ত তাজের সুইটেই চিত্রতারকা অবন্তীকে নিয়ে সটকে পরবে। অবন্তীকে নিয়ে তো আর তার এঁদো নাকতলার বাসায় রঙিলা হওয়া যায় না! তাজের সুইটের বিলটাও ভরতে হবে সেই শোভনকে। অথচ অঞ্জনদাকে চটানোও যাবে না।

"বেশ। দেখো ওরা ফ্রি আছে কি না" নিরুৎসাহে অঞ্জনদার দিকে কথাটা ছুড়ে দিল।

ভবিতব্যটা বুঝতে পেরেই তৎক্ষণাৎ শোভন বলল "অত দূরে কেন আবার অঞ্জনদা? তার থেকে চল না হায়াতে একটা সুইট বুক করে নিই। নিরিবিলিতে ঘরে বসে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে"

"তুমি যা বলবে" অঞ্জনদা প্রতিবাদ না করেই সায় দিল। রাতে অন্তত পাঁচ তারার সুইটে সুখভোগ করে নেওয়া যাবে। কষ্ট করে আর নাকতলার স্যাঁতস্যাঁতে বাড়িতে ফিরতে হবে না। আনলিমিটেড হুইস্কি অ্যান্ড লেডিস কম্পানি, বাই কার্টসি অফ ম্যাগনো...

মনে মনে ভাবল শোভনের মতো শয়ে শয়ে মালদার লেখক বাজারে আসুক। নিজের উপেক্ষিত প্রতিভাকে আবার জাগ্রত করতে পারবে এদেরই ঔদার্য, অসহায়তার সৌজন্যে। অস্তিত্বহীন নিজেকে ফিরে পেতে এরাই তো তার বার্ধক্যের পেনশন। এই বয়সে শুধু পঞ্জিকার কিঞ্চিত পেনশনের ওপর ভরসা করে টেনশন নিতে চায় না অঞ্জন।

কফির কাপটা টেবিলে নামিয়ে মোবাইলের কন্ট্যাক্ট লিস্ট খুঁজে বোতাম টিপল।

"ইম আজকে কি কোনও প্রোগ্রাম আছে?"

"না অঞ্জনদা। কেন?"

"চল, ডিনারে যাই"

"শুধু আমি?"

"শোভন-ই হোস্ট করছে। অবন্তীকেও ডেকে নিচ্ছি..."

শোভনকে না বলতে পারবে না ইমা। এর আগে মাঝরাতে হুইস্কি খেয়ে, কাব্যিক হয়ে, তাকে অনেক কবিতা হজম করতে হয়েছে। ইমা জানে, আজও তাকে হজম করতে হবে। দিনে রবীন্দ্রনাথ, রাতে সত্যনাথ। আজকের দিনে নাথ ছাড়া যে কেউ চলতেই শেখেনি। অনাথের দিন নয় অদ্য। কোনও এক নাথের কৃপা না হলে আজকের যুগে কোথাও পৌছনো যাবে না। এতএব নিজেকে রবীন্দ্রনাথের মোড়কে মুড়তে হলে, আজকের গতি সত্যনাথ, থুড়ি শোভনকে, সঙ্গ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই মন্দার বাজারে শোভনই একমাত্র ভরসা। চিটফান্ড চক্কর স্ক্যানারে আসার পর থেকে স্পনসরশিপগুলো ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ রবীন্দ্রসংগীতের জন্য পয়সা ঢালতে রাজি নয়। শোভনের দয়া দাক্ষিণ্যে যে কটা প্রোগ্রাম পাওয়া যায়।

যেদিন লিলুয়ার নিম্নবিত্ত পরিবারের একরত্তি মেয়েটা সকাল সন্ধে গানের রেওয়াজ করত। পরে রবীন্দ্র ভারতীতে একনিষ্ঠায় গানের সাধনা। সেদিন ভাবেনি কোথায় পৌঁছবে। বুক ভরা স্বপ্ন। মন জুড়ে আশা। সেই আশার সিঁড়ি ধরে অতর্কিতে একদিন তারা বাংলায় একটা ব্রেক। জীবনের আরেক অধ্যায়। রেওয়াজের নিষ্ঠা ছেড়ে খ্যাতির শিখরে পৌছনোর অদম্য তাড়না। নাম, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি ছোটার ইচ্ছেটা বহু গুণ বাড়িয়ে দিল। ক্রমাগত দিনের রেওয়াজ আর রাতের ঘুম কেড়ে নিতে লাগল গতির সঙ্গত।

টপ... টপ... টপ...

অ্যান্ড টু দ্য টপ।

টাকা আর নামের নেশা মাঝরাতের খ্যাপা কুকুরের মতো তাড়া করে। বোধোদয় হয়নি। নিশ্চিন্ত শান্তি মোহময় স্বপ্নের আঁতুড়ঘরে আর নেই।

অঞ্জনদা, শোভন, পার্টি, দেহ দান - এ এক আশ্চর্য তারকা খচিত মহল। খ্যাতি আছে। মূল্যের বিনিময়ে কেনাবেচায় শান্তি হারিয়েছে, শৃঙ্গে পৌছনোর অসাধ্য সাধনায়। বাজারে টিকে থাকতে হবে। এটাই রীতি, এটাই নীতি। ওপরে ওঠার সংস্কৃতি। ইমার একটাই রাস্তা। হ্যাঁ বলা, না হয়, পথ দেখা। সাজানো বাগান কি কেউ ফেলে যেতে পারে?

"কোথায় যাব?"

"হায়াত। ঠিক আটটায়। পরে রুম নম্বর বলে দেব"

অঞ্জনদা ফোন কেটে দিল। ভাবল, শোভনের, টাকার ভেল্কি, নাকি মাধুর্য। অনেক অনিচ্ছুককেও তাহলে বাগে আনা যায়। আজকাল মহিলারা রূপে-গুণে চট করে মুগ্ধ হয় না - হয় চাঁদি, নয় খ্যাতির মোহ। সারা জীবন লেখালেখি করে তো একটাকেও রাখতে পারল না। দুটো যদি বা কাছাকাছি এসেছিল, শেষ পর্যন্ত টিকল না। অবশ্য দুজনের কেউ-ই ওর পাণ্ডিত্যর লেভেলটা বুঝতে পারল না। মায়ের প্রতি দায়বদ্ধতাও নয়। সব মহিলারাই নিজের সুবিধে আর চাঁদি চেনে।

চমকালেই স্তুতি। না হলে বিস্মৃতি।

এমনকী সরকারবাবুও জ্ঞানের পরিধিটা বুঝল না। লাথি মেরে বার করে দিল বড়বাজার থেকে। অথচ কী না করেছিল বড়বাজারের জন্যে? বড়বাজারকে, কে বাজারে বিকিয়েছে? মুনাফা নিয়েই বাবু খালাস। অঞ্জন যদি মাঝখানে ভাগ বসিয়ে টু পাইস কামায়, তাতে বাবুর কীসের গোসা? সবাই কামাচ্ছে, শুধু সে কামালেই রাগ?

ভাগ্যিস সঞ্জয় বোস ঠাই দিয়েছিল তার পত্রিকায়। তা না হলে তো প্রফেসর, সাংবাদিক, সাহিত্য ও নারী রসিক এবং ছলনাময়ীদের অপরূপা সাজিয়ে বেচনেওয়ালা অঞ্জন বিলুপ্ত হয়ে যেত। ঠাই হত অচিনপুরের ঠিকানায়। যদি না বয়সকালে ফোকাসটা ঠিক করত। নারীকে বিকৃত রূপে সাজাবার সীমাহীন ক্ষমতা যে শেষমেশ কোথাও ঠাই পাবে, ভাবতেও পারেনি। যদি না, কর্ণ ঘোষ সহকারী হিসেবে ভেড়াত সঞ্জয় বোসের কাগজে। কর্ণ ঘোষের মৃত্যুর পর, সেই তো এখন অলিখিত বাদশা। যদ্দিন শোভনের মতো দিলদরিয়া সংস্কৃতিসেবী আলোকিত করবে বানভাসি কালচার, ততদিন তার বিকৃত রতির গতিপথে বেঁচে থাকবে ইমা, অবন্তী।

শোভনের দিকে চেয়ে বলল "ময়ূর পাখনা মেলতে প্রস্তুত। তুমি আছ তো?"

অঞ্জনদাকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া, শোভন ইমা সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড নয়। ইমা না হয়ে, পদ্মপর্ণা হলে, তবু পয়সা উসুল হত। কাউকে হাতে রাখতে গেলে, মাঝে মাঝে, দুধের স্বাদ ঘোলেও মেটাতে হয়। সেই ঘোলের নিমের রস শুটকি ইমা। কী আর করা যাবে? কেউকেটা হতে গেলে তো এদের বরণ করে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

শোভনকে চুপ করে থাকতে দেখে, অঞ্জন বলল “দাঁড়াও দেখি অবন্তী কোথায়?”

কন্ট্যাক্টস খুঁজে অবন্তীকে ফোন “ব্যস্ত?”

“না, মেক আপ রুমে। শট-এর এখনও দেরি আছে”

“সন্ধেবেলা ফ্রি আছ? শোভনের সঙ্গে কোথাও বসা যেতে পারে...”

“প্যাক আপ করতে করতে দশটা হয়ে যাবে”

“চলে এস হায়াতে। বেরোবার আগে আমাকে বা শোভনকে ফোন করে নিও। সুইট নম্বরটা বলে দেব”

“ঠিক আছে” ফোনটা কেটে দিল অবন্তী।

সাধারণত এইসব ছোটখাটো চুনোপুঁটি নিয়ে সময় নষ্ট করা ধাতে নেই অবন্তীর। বাংলা সিনেমায় এখন সেরা কমার্শিয়াল পাঞ্চ। ভরা যৌবন। বিবাহ বিচ্ছেদের পর ঝাড়া হাত-পা। এই সব ইনসিগ্নিফিকেন্ট মুরগি নিয়ে সময় নষ্ট করতে মন চায় না। রাত কাটাতে হলে প্রদীপ গোয়েঙ্কার মতো মালদার পার্টির দিকেই ঝোঁক। এরা তো খাইয়ে, ফুর্তি করেই খালাস। শুনেছে প্রদীপ মালকড়িও ছাড়ে। ভাগ্যক্রমে কয়েকটা সিটিং দিতে পারলে, পদ্মপর্ণাদির মতো মনি স্কয়ারে একটা ফ্ল্যাটও বাগিয়ে নিতে পারবে। বাংলা সিনেমার যা দুর্দশা!

চিটফান্ডের ধাক্কায় প্রায় পঞ্চাশখানা ছবি আটকে। যেগুলো রিলিজ করে, সেগুলোও চলে না। কে জানে, কদ্দিন কাজ থাকবে? তার আগে সব গুছিয়ে নিতে হবে। কৃষ্ণনগরের মধ্যবিত্ত ঘরে বড় হওয়া অবন্তী, এর থেকে আরে বেশি কী-ই বা আশা করতে পারে? তাই বাংলাবাজারের ব্যাপারিদের চটাতে চায় না। উলটোসিধে লিখে দিতে পারে। এই লাইনে থাকতে গেলে সব্বাইকে গুড হিউমারে রাখতে হবে। বিগড়ে গেলেই সর্বনাশ। কে যে কোথা থেকে কী বাঁশ দিয়ে দেবে, বলা তো যায় না।

“সব ফিট করে দিলাম। এবার সুইটটা বুক করে ফেল”

“হু” আমসত্ত্বের মতো মুখে শোভন সুইট বুক করতে তৎপর।

ঘরে গিয়ে ধুমসি মোটা বউ-এর পাশে সিরিয়ালের সামনে বসে থাকার চেয়ে তো অনেক ভাল। তবু তো, এই সব কচিকাঁচাদের দেখা, ছোঁয়ার মধ্যে, কিছুটা তৃপ্তি আছে। এখনও তো বুড়িয়ে যায়নি। বউ-এর মধ্যে ভ্যারাইটি না থাক, এই ছুকরিগুলোর মধ্যে তো অন্তত কিছুটা আছে।

দুধ না থাকে, থাক। নেই মামার চেয়ে, কানা মামা ভাল।

তার জন্য দেওয়ালিকে নিয়ে বালি ট্রিপটা তো দিগ্বিজয় ফিট করে ফেলেছে। তখন শ্যামলা গাইয়ের দুধের স্বাদ উপভোগ করা যাবে। আপাতত ঘোলের মধ্যেই...

তিন

লেক টেরেসের লাল-মেঠো বাড়ির বারান্দায় বসে গাছের ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত সূর্যর দিকে চেয়ে ছিল শুভ্রা। সূর্যের শেষ রশ্মির মতো, তার সংগীত জীবনের খ্যাতিও কী এখন অস্তগামী? মন মানতে না চাইলেও আপাত দৃষ্টিতে তাই তো মনে হচ্ছে।

একদিন সৃজিত গোস্বামীর কবিতায় সুর ঢেলে বাজার মাতিয়ে দিয়েছিল। রাতারাতি নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রসংগীত থেকে আধুনিক। নিজস্বতার জন্য, গলার বৈশিষ্ট্যে, খ্যাতির পারদ তরতর করে চড়ছে তখন। কণ্ঠের ব্যঞ্জনায় অকৃপণ ভাবে অর্থের ঝোলাও ভরতে লাগল। খ্যাতির শিখরে। এক নামেই পরিচয় - শুভ্রা মিত্র।

সে তো এখন ফেলে আসা অতীত। নাম খ্যাতির সঙ্গে ব্যবসাও গ্রাস করল শুভ্রাকে। প্রফেশনল সিঙ্গার। পয়সা ফেললেই গান। কে সুর দিচ্ছে, কী দিচ্ছে, সে সুরে আদৌ রেকর্ডিং করা উচিত কি না - সে সব ভাবার সময় কোথায়? লোকে নাম শুনেই টাকা ফেলে যাচ্ছে। ডিমান্ডের সঙ্গে রেটও হু হু করে উঠছে। যতদিন দম আছে কামিয়ে নাও। দিন ফুরিয়ে গেলেও নাম বেচে ভেল্কি। না হলে, হারিয়ে যাও। হারতে চায় না শুভ্রা।

"তোমার জন্যে একটা সুর দিয়েছি। শুনবে?" স্বনামধন্য মিউসিক ডিরেক্টর স্বামী জয়ন্ত সরকার মুখের দিকে তাকিয়ে।

"রেডি করে রাখ। আজকে বিকেলে দুটো প্রোগ্রাম আছে। রেস্ট নিচ্ছি। পরে শুনব" জয়ন্তকে থামিয়ে দিল।

"বেশ... যখন সময় পাবে বোলো" চুপসে গেল জয়ন্ত। পিড়াপিড়ি করতে গেলে, মুখঝামটা খাবে। শুভ্রার টেম্পার তার থেকে আর কে ভাল চেনে?

প্রোগ্রাম দুটো যে খুব দূরে, তাও নয়। বাড়ির কাছেই। প্রোগ্রামটা খুব বড় নয়। উদ্যোক্তারা এই বাজারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা পিজিআর-এর ব্যানারে, যেখান থেকে তার সবচেয়ে বেশি অ্যালবাম বেরিয়েছে। জি ডি বিড়লা সভাঘরে। ওর কর্তা নাদিম সাহেব-ই এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। তার এত বছরের সংগীত জীবনের অদৃশ্য কান্ডারি। উনিশ-বিশ হলেই বিপত্তি। বাকি প্রোডাকশনগুলোও থামিয়ে দেবে। তবুও ওকে খুশি করে চলতে হবে। হার চিপ্পু। রেকর্ড কম্প্যনির লোকেরা যেমন, চিরকাল।

রয়ালটি চাইতে গেলেই বলে "কোথায় আর আপনার সিডি বিক্রি হচ্ছে? কিছুই তো হচ্ছে না"

“বন্ধু বান্ধবদের কাছে খবর পাচ্ছি প্রচুর সেল হয়েছে”

“ওরা আপনাকে খুশি করার জন্য বলছে। কিসসু বিক্রি হয়নি। বিক্রি না হলে রয়ালটি আসবে কোত্থেকে?”

তার প্রাপ্য না দিয়ে একাই লুটবে। তবুও কিছু বলা যাবে না। এ নতুন কিছু নয়। আগেকার যুগের নামী গায়ক গায়িকাদের নিয়ে একই খেলা খেলেছে। তখন অবশ্য ওদের উপায় ছিল না। বেশি রেকর্ড কম্পানিও তো ছিল না। যে ক'টা ছিল, তারা নামী গায়ক-গায়িকাদের দুইয়ে ভিখিরির মতো কিছু টাকা ছুড়ে দিত। যুগ পাল্টেছে। কিন্তু সেই ট্র্যাডিসন আজও চলিয়া আসিতেছে ।

শুভ্রা মিত্র কোন ছাড়!

তবুও মিউসিক প্রোডাকশন জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ওই নাদিম সাহেবই। চটালেই বিপদ। অন্যটা, নজরুল মঞ্চে গোদাফোনের বাৎসরিক সর্ব শিল্পীর সমন্বয়। ভালই মালকড়ি দেয়। কখন স্টেজ পাবে, কোনও গ্যারান্টি নেই। বসে থাকতে হবে হাসিমুখে। ওরা বিগড়লে নেক্সট বার ছাঁটাই - অ্যাসিওরড ইনকাম গন। কোথায় এদের তুষ্ট রাখা - আর কোথায় জয়ন্তর আবিষ্কৃত সুর!

এত বছরে, প্রাধান্যের মাপকাঠি বুঝতে শিখেছে শুভ্রা। আর সময় পেল না? ঠিক এই সময়-ই জয়ন্ত তার নতুন সুর শোনাতে এসেছে। নিকুচি করেছে সুরের। এই সব বড় বড় অরগ্যানাইজারদের খুশি রাখা গানের থেকে অনেক বেশি ইম্পরট্যান্ট। এরাই তো শুভ্রা মিত্রকে নামে, মানে, ধনে, সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

ওরা ইম্পরট্যান্ট? না, জয়ন্তর সুর?

ঘরের লোক - ফ্রি টাইমে শুনে নিলেই হবে।

“আপনাকে আমি প্রথম দিকে স্টেজ দেওয়ার জন্য অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছি, যদিও শেষের দিকে হলে, প্রোগ্রামটা বেশি জমত। আপনাকে তো আবার গোদাফোনের প্রোগ্রামে যেতে হবে” নাদিম সাহেব একগাল হেসে শুভ্রা মিত্রকে অভ্যর্থনা জানাল।

বিক্রি না থাকলে কি নাদিম সাহেব এত খাতির করে? মুখে যাই বলুক না কেন। এ দুনিয়ায় যার বাজার কাটতি বেশি, তার খাতির, আদর-আপ্যায়ন, সম্মান, কথার গুরুত্ব, প্রাধান্য পায়।

শুভ্রা মিত্র তার মনমোহিনী হাসি ছড়িয়ে বলল “নাদিম সাহেব আপনার এই ঔদার্যের জন্যই তো আমরা বেঁচে আছি”

কী বুঝল নাদিম সাহেব, কে জানে? নাদিমকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল “ডিটিভির ‘পামাগারেসা’ তে আমাকে জাজ করার ব্যাপারে কথা বলবেন?”

“নিশ্চয়ই। আপনাকে তো আগেও বলেছি বন্দোবস্ত করে দেব”

রয়ালটি না চাইলেই হল। অন্য যেখান থেকে পারে কামিয়ে নিক, তাতে নাদিম সাহেবের কী আসে যায়? রিয়ালিটি শো না মাথা। শালা সব বাপ-মায়েরা, ছেলে-মেয়েদের ইস্টার না করে ছাড়বে না। এই এত বছর তো দেখছে। কই? এই রিয়ালিটি শো থেকে কি কোনও স্টার উঠে এসেছে? দু-একজন ছাড়া। বাকিরা কিছুদিনের জন্য মিডিয়া পাবলিসিটি কামিয়ে সুড়সুড় করে ল্যাজ গুটিয়ে গর্তে ঢুকবে। যতসব আকাটের কনসার্ট। তবে বাজারে স্পন্সর থাকলে, দু-একটা প্রোগ্রাম জুটেও যেতে পারে। নয়ত ওই যে কী সব বিগ-বস ভাটের মনোরঞ্জন টিভি স্পন্সরদের দৌলতে চলছে, ওখান থেকে কালেভদ্রে কিছু কামিয়ে নিতে পারে।

ব্যস। ওইটুকুই। আর বিশেষ কিছু হবে না। শুভ্রা জাজ হয়ে বেশ কিছু কামিয়ে নিতে পারবে।

করুক গে। তার লাভের ভাগে হাত না বসালেই হল।

শুভ্রা একটু আক্ষেপ করে বলল “কবে থেকে বলে রেখেছি। এখনও কনফার্ম করতে পারলেন না...”

“আরে হবে হবে। ঠিক সময়মতো করে দেব। আমার এই ফাংশনটা উতরে দিন”

সাহস করে জিজ্ঞেস করতেও পারল না, এই ফাংশনে গাইবার জন্য দক্ষিণা পাওয়া যাবে কী না। নাদিম সাহেবকে এতদিনে হাড়ে হাড়ে চিনে গেছে। ফোকটে গান গাইয়ে টিকিট বিক্রির টাকা পকেটস্থ করতে ওর জুড়ি নেই। তবু বাঁচোয়া, অন্তত গোদাফোন অতটা চিপ্পু নয়। আগেই মালকড়ি দিয়ে গেছে।

জয়ন্ত চুপিসারে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। টাকা আর ধান্দার কাছে সৃষ্টির কোনও দাম নেই। শুভ্রাকে বোঝানো বোকামি।

গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য নয়, রাস্তার ওপারে সারি সারি আদ্যিকালের বাড়িগুলো। সেগুলো হয়ত অতীতের সাক্ষর বহন করছে, কিন্তু তাও শুভ্রার কাছে ম্লান।

এক সময় কতই না স্বপ্ন দেখত নামী শিল্পী হওয়ার। হয়েছেও। কিন্তু এ যুগে তেমন সুরকারও নেই, গীতিকারও নেই। জয়ন্ত যে এত এক্সপেরিমেন্টাল সুর দেওয়ার চেষ্টা করে, সেটাও তো ধোপে টেকে না।

ধ্যত। সুর সাধনা করে কী হবে?

টাকা চাই।

কত, সে নিজেও জানে না। নতুন কিছু নিয়ে বসার সময়ও নেই। অত সময় নষ্ট করে কী হবে, যখন পুরনো গান পারমুটেসন-কম্বিনেশন করেই লক্ষ্মী ঘরে আসছে।

হয়ত তাই দিয়ে আরও বেশ কিছুদিন চালিয়ে যেতে পারত। বাধ সাধল গানের পাইরেসি। ইউ-টিউবে গান আপলোড করে পুরনো গান শুনে নেওয়া। মিউসিক ওয়ার্ল্ড বন্ধ হয়ে গেল। কমে গেল সিডির কাটতি। চাহিদা থাকলেও সামর্থ্যের অভাবে ফাংশনের জোয়ারে ভাটা পড়ল। চিটফান্ড স্ক্যাম আর ইকনমিক রিসেশন ফাংশনের স্পন্সরশিপে ঘা দিল। এক ওই বিদেশের বং-সং সম্মেলন ছাড়া তেমন বড়সড় কামাই নেই।

বিক্রির অভাবে রেকর্ডিং কম্প্যানির রয়ালটিও ক্রমশ কমতে লাগল। আগে তবু সিনেমাগুলোতে প্লে-ব্যাক করে কিছু আসত। এখন চিটফান্ড হাত গোটানোয় সেখানেও খরা। হলে সিনেমা চলছে না। আবার তাদের মতো নামী, দামি, প্লে ব্যাক শিল্পীকে ভিড়িয়ে এক্সট্রা খরচ! নৈব নৈব চ। জুনিয়ার কাউকে ফোকটে চান্স দিয়ে কৃতার্থ করেই খালাস।

বাজার মন্দা। রিসেশন। পুঁজির সংকট, সেইসঙ্গে সভ্যতারও।

সর্বাণীর পথেই হাঁটার ভাবনা নিয়ে নিজের প্রোডাকশন কম্পানি খুলে পুরনো গানের সম্মিলিত প্যাকেজ। সেও তো বাজারে কাটল না। তবু টিকে থাকতে হবে। আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড। নাঃ, শ্রোতার মাইন্ড থেকে নিজের প্রতিষ্ঠাকে খোয়াতে রাজি নয় শুভ্রা। রাজীব চট্টোপাধ্যায় বইমেলায় মিত্রভারতী স্টলে তার প্রোডাকশনের সিডি রাখলেও বিক্রি নেই।

তখন অঞ্জনদা-ই প্রোপসালটা দিল "চল না একসাথে মিলে কিছু প্রোগ্রাম করি"

"স্পন্সর করবে কে?"

"কেন শোভন করবে? ওর টাকার কী কমতি আছে!"

শোভনের স্পন্সরশিপে নিজের অস্তিত্বরক্ষা। এছাড়া আর উপায় কী? শোভনের মতো কিছু মালদার লোক এখনও টাকা ঢালতে প্রস্তুত বলেই শুভ্রা, সর্বাণী, ইমার মতো কিছু শিল্পী এখনও বাজারে টিকে আছে।

অঞ্জনদা বলল "বাজারে এখন রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ খাচ্ছে। ওগুলোর প্যাকেজ করে গীতি-আলেখ্য লিখছি। ভিড়ে যাও আমাদের সঙ্গে। ওটাই খাবে"

মিডিয়ার লোক অঞ্জনদা। পত্রিকার এডিটর। সৃষ্টি করতে না পারুক, এত বছর ধরে কী খাওয়াতে হবে, সেটা ভালোই রপ্ত করেছে। মনে পড়ে, লুল্লু নামের ভূতটিও কেবলমাত্র গাল পাড়ার যোগ্যতাতে এডিটরির মতো লোভনীয় প্রস্তাব পেয়েছিল।

দিগ্বিজয় ভটচাযের বউ মায়া বলে 'ওটাই ব্র্যান্ড... অঞ্জনদার ব্র্যান্ড ওটা বিক্রি করেই হারিয়ে যাওয়া অঞ্জনদার আবার লাইমলাইটে ফেরা'

আজকাল সবাই, সব কিছুই ইনস্ট্যান্ট চায়। ইনস্ট্যান্ট প্রেম, ইনস্ট্যান্ট সেক্স, ইনস্ট্যান্ট কালচার। অঞ্জনবাবুর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ বাঙালি। নিজের যখন কিছু বলার নেই, তখনও টিকে থাকাটাই আসল কথা। সৃষ্টি কৃষ্টি গৌণ। বলেই বা শুনছে কে? তবু বলছি, এটাতো বোঝাতে হবে।

"ঠিক আছে অঞ্জনদা। আপনি স্ক্রিপ্ট লিখুন। আমাকে কী গাইতে হবে, বলে দেবেন" শুভ্রা সম্মতি দিল।

"বেশ। লিখে ফেলছি"

এত মনীষী থাকতে রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দ কেন বাজারে খায়, এটা শুভ্রার বোধের বাইরে। কোথাও এক অদৃশ্য মার্কেটিং পাওয়ার এদের লাইমলাইটে নিয়ে এসেছে। অত ভেবে কী হবে? যা খাচ্ছে, তাতেই নিজেকে ভাসিয়ে দাও। এখন আর কষ্ট করে নিজেকে রিমডেল করতে চায় না। যেমন চলছে চলুক।

কখন দুপুর পেরিয়ে বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে গড়িয়েছে, খেয়াল করেনি। গিটার হাতে জানলার বাইরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল জয়ন্ত। অন্ধকার হয়ে এসেছে। আলো জ্বালানো হয়নি। শুভ্রা কখন যেন বেরিয়ে গেছে। দুটো প্রোগ্রাম শেষ করে ফিরবে।

কত কিছুই না পালটে যায় সময়ের সঙ্গে। সেই কবে আলাপ। সংগীত অ্যাকাডেমি থেকে বেরচ্ছিল শুভ্রা। হঠাৎ এক রোগা পাতলা ছেলে, মুখে একরাশ দাড়ি, কোথা থেকে উদয় হয়ে বলল "কয়েকটা সুর দিয়েছি। শুনবেন?"

তুমি কে হে হরিদাস পাল? কোত্থেকে উদয় হলে বাবা? পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল শুভ্রা। ছেলেটি নাছোড়বান্দা, পথ আগলে, "একবার শুনেই দেখুন না..."

বাসন্তী দেবী কলেজে পড়ার সময়, যে দু-একটা ছেলে আলাপ জমাতে চায়নি, এমন নয়। কলেজের ফাঁকে বন্ধুদের সঙ্গে শাড়ির দোকানগুলোতে উইন্ডো শপিং করে দিব্যি সময় কেটে যেত। পরে অবশ্য রোজগারের তাগিদে শাড়ির দোকানে একসময় চাকরি নিয়েছিল। সিলেক্ট স্টোরসের পাশের রকে গুলতানি করা কিছু ছোকরা আলাপ জমাবার চেষ্টা করত- "প্রিয়াতে নুন শো লেগেছে। চলুন না দেখে আসি" ওদের উদ্দেশ করেই বলা।

"চল না, সবাই দল মিলে দেখে আসি" মৌমিতার বেশি চুলকানি "কণিকা ম্যামের ক্লাস করে কী হবে? আবেগে গদগদ হয়ে আবার ডায়াস থেকে উলটে পড়বে"

কণিকা ম্যাম একটু বেশি আবেগপ্রবণ। বিদ্যাপতি পড়াতে পড়াতে ডায়াসের চৌহদ্দি ভুলে বেশ কয়েকবার আছড়ে পড়েছিল। কণিকা ম্যামের ক্লাস না হয় ডুব মারা গেল। তা বলে এই অচেনা ছোকরাগুলোর সঙ্গে সিনেমা দেখা! ভাবতেই পারে না শুভ্রা!

"তোর বেশি চুলকানি হয়েছে তো তুই যা না। সবাইকে ভেড়াচ্ছিস কেন?" শুভ্রার মুখঝামটা দিয়ে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

"কারণ টার্গেট তুই। আমরা সব ফাউ। তুই গেলে ওরা আমাদের সকলকে ফ্রিতে সিনেমা দেখাতে পারে" মৌমিতা নাছোড়বান্দা।

"তুই ভিড়ে যা। আমি শাড়ি দেখি"

কলেজ জীবনে এসব হয়েই থাকে। তা বলে সোজা পথ আগলে সুর শোনাবার চেষ্টা। এ তো উঠতি কবিদের থেকেও বেশি উৎপাত।

"একবার শুনেই দেখুন না। ভাল না লাগলে চলে যাবেন"

কী আর করা। টালিগঞ্জের সংগীত অ্যাকাডেমির সিঁড়িতে বসে শুনতেই হল উঠতি সুরের ঝলক। মন্দ নয়। কিন্তু এসব শুনে কী হবে? কোথায় গাইবে? কাকে শোনাবে?

প্রোপসলটা জয়ন্তই দিয়েছিল "চলুন না সবাই মিলে একটা ব্যান্ড তৈরি করি। আমার নাম জয়ন্ত। গিটার বাজাই। আমাকে না চিনলেও, আমার বাবার নাম নিশ্চয়ই শুনছেন - অভিষেক সরকার"

এই তাহলে অভিষেক সরকারের সুপুত্র। এবার ভাল করে দেখল জয়ন্ত সরকারকে। টিপক্যাল আঁতেল মার্কা চেহারা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। কবি কবি ভাব। যদিও ছন্দের খুব একটা অভাব নেই।

"লিখেছে কে?"

"আমারই এক বন্ধু মৈনাক"

এমনিতেই স্বর্ণযুগের পর আর তেমন কিছু খাচ্ছে না। দু-একজন জীবনমুখী গান গেয়ে কিছু ঝটকা দিয়েছে বটে, তবে সেভাবে কিছু হয়নি। বিশেষ করে নারীকণ্ঠ তো আসেইনি। কোথাও সেভাবে ব্রেক নেই।

পাশে পড়া গিটারটা তুলে নিল জয়ন্ত। দুজনের জুটির প্রথম হিট কী ভুলে গেছে শুভ্রা? 'ছোটবেলার বৃষ্টি' গানটা সারা ফেলেছিল। এই সংগীতের হাত ধরেই তো ডানপিটে ডান্ডাগুলি খেলা মেয়েটাকে, ছাদনাতলায় বসাতে সক্ষম হয়েছিল জয়ন্ত। সে কবেকার কথা। দেখতে দেখতে চোদ্দটা বছর পার করে দিল। এই রক অ্যান্ড রোল জীবন সমুদ্রে, সাকসেস আর ফেইলিওর, হাতে হাত মিলিয়ে চলেছে। তখন কত সময় ছিল শুভ্রার, তার নতুন ভেঞ্চার শোনার। কবেকার কথা। সে সময় কত স্বপ্ন। নতুন কিছু করার... নাম হল। প্রতিষ্ঠা হল।

সময়ের সঙ্গে মানসিকতার কত পরিবর্তন হয়েছে। তখন ছিল নতুন সৃষ্টির মাধুর্যের স্বপ্ন। এখন খালি টাকা। তিমিরদা যেদিন স্বপ্নময় গোস্বামীর কবিতা নিয়ে নতুন গান ফাঁদল। রাতারাতি সুপারহিট।

ঘরের বাড়তি আসবাবের মতো জয়ন্তর সৃষ্টিও এখন বাড়তি। অন্ধকার ঘরে গিটারের স্ট্রিং-এর ওপর এলোমেলো হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। চেনা কর্ডটা কী বেসুরো লাগছে? নাকি কোনো বিট-ই আর লাগছে না। নিজের কেরিয়ারের বিটটা কেমন ছন্নছাড়া, অফ-বিট।

কায়দা করে অনেকগুলো সিনেমার মিউজিক ডিরেক্টরের কাজ বাগিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু কোনও গানই তেমনভাবে লাগল না। হিট-এর থেকে ফ্লপ-এর সংখ্যা অনেক বেশি। নেহাৎ নেটওয়ার্কিং আর মিডিয়া

হাইপের জেরে এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। শুভ্রা তবু ফাংশন করে রোজগার করতে পারবে। কিন্তু তার কী হবে? তার দেওয়া সুর যদি হিট না করে তো ফোরসড রিটায়ারমেন্ট ছাড়া কোনও গতি নেই।

আর্তনাদের মতো মোবাইলটা বেজে উঠল।“ফ্রি আছিস? চলে আয় আমার ফ্ল্যাটে। দিব্যেন্দু, শুভব্রত, সুদীপ্তরাও আসছে। জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে। ছোড়দা একটা সিঙ্গল মল্টের বোতল দিয়ে গেছে। গ্লেন মর‍্যাঙ্গি” মৈনাক উত্তেজিত।

ধুস, নিকুচি করেছে সুরের। খাও পিও মস্ত রহ। ফির জো হোনা ওহি হোগা। পার্সটা পকেটে পুরে, গাড়ির চাবি নিয়ে পায়ে চটি গলিয়ে বেরিয়ে গেল।

চার

"ইতনে জলদি কেয়া? রাত তো অভি বাকি হ্যায়। কাম অন... ফর মাই সেক হ্যাভ আনাদার পেগ"

অবন্তীর দিকে হুইস্কির গ্লাসটা এগিয়ে দিল গজেন্দ্র ধনি। হো চি মিন সরণিতে, গোল্ডেন পার্ক হোটেলের উলটো দিকে, গজেন্দ্র ধনির ফ্ল্যাটে সন্ধের আসর জমতে শুরু করেছে। কাল মর্নিং শিফটে কোনও শুটিং নেই। অবন্তী ভাবছিল বাড়ি গিয়ে নিশ্চিন্তে লেট মর্নিং পর্যন্ত ঘুমবে। দুপুর থেকে কন্টিনিউয়াস শিফটে কাজ।

এখন সে গুড়ে বালি। গজেন্দ্র ধনি বললে তো আর চলে যাওয়া যায় না। বাংলা কমার্শিয়াল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একচ্ছত্র অধিপতি। শুধু কী তাই? কতদিন আগে, যখন তার মাত্র দশ বছর বয়স। গজেন্দ্র ধনির প্রোডাকশন হাউস চামুণ্ডেশ্বরী ফিল্মস প্রথম সিনেমাতে তাকে শিশু শিল্পী হিসেবে ব্রেক দেয় 'স্বপ্ন বন্ধন' ছবিতে। তা না হলে আসাই হত না, এই রুপালি পর্দার দুনিয়াতে। তাও যে সে লোকের সঙ্গে কাজ নয়। শুভ্রজিৎদা আর পদ্মপর্ণাদি। আধুনিক বাংলা ছবির দিকপাল। কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন যাদের ছবি দেখে বড় হয়েছে। শুভ্রজিৎদা তখন তার কাছে হার্টথ্রব। অবশ্য তখন বাজারে কাটতি চিত্র পরিচালক নিরঞ্জন সাহার ছবিগুলো। চামুণ্ডেশ্বরীর পয়া পরিচালক। আজ সেই নিরঞ্জন সাহা কোথায়? চামুণ্ডেশ্বরী ফিল্মস আর গজেন্দ্র ধনি আজও জ্বলজ্বল করছে। অথচ নিরঞ্জন সাহা কোথায় হারিয়ে গেছে। আজকের দিনে টিকে থাকতে গেলে তো গজেন্দ্রর আবদার গিলতেই হবে।

একগাল মিষ্টি হাসি ছুড়ে, হুইস্কির গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলল "লাস্ট পেগ ধনি সাহাব। কাল সারে দিন শুটিং হ্যায়। জ্যাদা রাত নেহি কর পাউঙ্গি"

এখন অঙ্কটা স্পষ্ট - মালকড়ি ছাড়ো, তবে রাত কাটাতে পারি।

তার দেহের বুঝি কোনও দাম নেই?

স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া, আজকে রাতে, কারও মেহমান হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। বাজারে নিজের কাটতি বুঝে এখন আর ফোকটে রাত কাটবার কোনও মানে নেই। দু-চার খেয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে পারি। তার বেশি কিছু নয়। এক সময় কেরিয়ারের স্বার্থে অনেক কিছু করতে হয়েছে। তবে এখন মোটামুটি টপে পৌছনোর পর নায়িকার রেটের মতো, তার দামও বেড়ে গেছে।

"ডোন্ট ইউ ওয়ারি। মেরা ড্রাইভার তুমহে ঘর তক ছোড় আয়েগা"

"জরুরত নেহি। মেরা ড্রাইভার হ্যায়"

"ফির শোচনে কা কেয়া? এনজয়... মেক ইওরসেলফ অ্যাট হোম। দ্য নাইট ইজ স্টিল ইয়ং"

তেরো বছর আগে, তখন আর কতই বয়স, বড়জোর বছর পনেরো। এই চামুণ্ডেশ্বরী ফিল্মস-এর মনিকান্ত মোহতা তাকে আবার ডেকে নেয়, তাদের ‘উইনার’ ছবিতে হিরোইন করে। আরেক নতুন শিল্পী রোহিত-এর বিপরীতে। সুপার-ডুপার হিট। হঠাৎই যেন টিমটিম করে জ্বলা, কৃষ্ণনগরের মফসসলের মেয়েটা, একটা ছোট্ট শহরের চৌহদ্দি ছেড়ে এসে পড়ল প্রখর আলো ঝলমলে জগতে। ইনস্ট্যান্ট সাকসেস!

কিন্তু জীবন কখনও সরলরেখায় চলে না। নদীর মতো এঁকেবেঁকে বয়ে যায় অনির্দিষ্টের পথে।

“আপনার উইনার তো দারুণ হিট করেছে”

অবন্তী গদগদ। সিনেমা পাড়ায় কেউ তাকে নামে চিনে তারিফ করছে, তার কাছে এটা বিরাট ব্যাপার। যেখানে পদ্মপর্ণাদি, অনুশ্রীদি, শুভ্রজিৎদার মতো উজ্জ্বল তারকারা টলি আকাশে নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছে, সেখানে তার মতো নগণ্য হিরোইনের সঙ্গে কেউ দু-দণ্ড কথা বলতে পারে, ভাবতেই বুকটা কেঁপে উঠল। স্টার না হলেও কেউ তো তাকে চিনতে পেরেছে। এটাই বা কম কী!

কোনো প্রত্যুত্তর না দিয়ে মুচকি হাসল “আপনি?”

“সঞ্জীব। সঞ্জীব বিশ্বাস”

এই প্রথম অবন্তী ভালভাবে তাকাল সঞ্জীবের দিকে। চৌকো মুখ। রোগা হলেও বেশ ভারিক্কি চেহারা। মাথা ভর্তি চুল। হিরো হওয়ার মতো চেহারা না হলেও দেখতে মন্দ নয়।

“আমি অবন্তী। অবন্তী চ্যাটার্জি” ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। বুকের ভেতরে কী রকম যেন করছে। এর আগে কোনও ছেলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে তো এমন হয়নি।

বুকের ধড়ফড়ানি বাড়িয়ে সঞ্জীব বলল “চা খাওয়ার ফুরসত আছে? চলুন তাহলে ক্যান্টিনে গিয়ে বসি”

ভাবার সুযোগ না দিয়ে টেকনিশিয়ান স্টুডিওর ক্যান্টিনের দিকে পা বাড়াল। ফিরেও দেখল না অবন্তী পেছনে আসছে কি না। সঞ্জীবের মেয়ে পটাবার কনফিডেন্স দেখে আশ্চর্য হল অবন্তী। যেন ধরেই নিয়েছে, অবন্তী তার পেছন পেছন আসবে।

“আপনি বুঝি হিরো হতে এসেছেন?”

“হিরো? এই থোবড়া দেখে কেউ আমায় হিরো করবে?”

পর্দার হিরো আর জীবনের হিরোর মধ্যে যে অনেক তফাত, ষোড়শীর বোঝার ক্ষমতা ছিল না।

“তাহলে এখানে জিরো হয়ে ঘুরঘুর করছেন কেন?” অবন্তী মুচকি হাসল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল “মুম্বাইতে বেশ কিছুদিন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের কাজ করছি। ভাবছি এবার ছবি বানাব”

“এখানে? মুম্বাইতে নয় কেন?”

"মুম্বাইতে অনেক বড় বাজেটের ফিল্ম হয়। কেউ আমায় সুযোগ দেবে না। কলকাতায় পেলেও পেতে পারি"

"আহা রে। আমি যদি করিয়ে দিতে পারতাম। আমি তো পদ্মপর্ণাদি, অনুশ্রীদি, শুভ্রজিৎদার মতো তারকা নই। প্রথম হিরোইন হিসেবে ছবি হিট করে গেছে। কে আমার কথা শুনবে?"

"আমি তো বেশ শুনছি" সঞ্জীব মুচকি হাসল।

"আমার ভাগ্যি। আমায় তো কেউ গুরুত্বই দেয় না"

"আমি তো দিচ্ছি। তাই তো চা খেতে এলাম"

বেশ লাগছে ছেলেটিকে। বয়েসে তার থেকে বড় হয়েও তাকে কত গুরুত্ব দিচ্ছে। স্টুডিও পাড়ায় অবন্তীর তেমন খাতির নেই। নেহাৎ একটা ছবি হিট করে গেছে বলে দু-একজন একটু কনগ্র্যাচুলেট করেছে। ব্যস, ওই পর্যন্ত। ওদের কাছে এখনও বাচ্চা মেয়ে। বাচ্চাদের লজেন্স-চকলেট দেওয়া যায়, পাত্তা নয়।

ভালোলাগার রেসটা কখন যে ভালোবাসার আকার নিল বুঝতেই পারেনি। সিনেমার স্বপ্ন ভুলে তখন অনিকের দেখভাল, সঞ্জীবের ঘরসংসার সামলানো। সতেরো বছর বয়সেই অবন্তী পাক্কা গিন্নি। সংসার টানতে, জীবিকার টানে সঞ্জীব ফের মুম্বাইতে।

যত রাত বাড়ছে, গণ্যমান্যরা নাইটকে রঙিলা করতে একে একে ঢুকছে। গজেন্দ্র ধনি হাসিমুখে আপ্যায়নে ব্যস্ত। ড্রিঙ্কসের ফোয়ারা ছুটছে, সঙ্গে স্ন্যাক্স, খাবার। হিসেবি হাসি, মাপা কথা। পরিচিত মুখগুলো। যাদের প্রত্যেক পার্টিতেই দেখা যায়। যাদের ছবি রোজ সকালের পেজ থ্রি, ট্যাবলয়েডে।

অবন্তীর মাঝেমধ্যে মনে হয়, এরা তো ভিখারির চেয়েও অধম। এরা কি কখনও বাড়িতে রান্না করে খায়? পরের ঘাড় ভেঙে খাওয়াটা এদের মজ্জাগত। জাত সেলিব্রিটি। মিডিয়া খুশিমতো সেলিব্রিটি তৈরি করতে পারে, কিন্তু জিনিয়াস নয়। অবন্তীও সেই অভ্যাস এতদিনে রপ্ত করেছে। বিগশট হোস্টরা এদের সাকসেসের মাপকাঠি। টাকা খসিয়ে তো ওদেরই ধন্য করছে! শুধু মেধাহীন অবসরযাপন নয়।

প্রথম প্রথম বুঝত না। মোদ্দা কথা, টিকে থাকতে গেলে, সার্কিটে থাকতে হবে। যত মুখ দেখাতে পারবে, তত ছবিতে চান্স। বেশি সুযোগ। যত বে-আব্রু দেখাবে, তত কাটতি। নাম হওয়ার সঙ্গেই দাম বেড়ে গেছে। খোলার রেট এখন অনেক।

আগে তো খবরের কাগজে সাপ্লিমেন্টে ছবি বার করতে হলে রিপোর্টারদের সঙ্গেও শুতে হত। এখন দিন পাল্টেছে। ওসব সি গ্রেড লোকেদের পাত্তাই দেয় না। ডিরেক্টর হলে এক রেট, প্রোডিউসার হলে আরেক। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট শোভন রায়চৌধুরির মতো মালদার পার্টি হলে, অনেক বেশি। অবন্তী আজকাল এদেরই প্রেফার করে। এমনিতেই সিনেমার বাজার মন্দা। লাইনের অনেকেই পলিটিক্সে ঢুকে পড়েছে পার্মানেন্ট ইনকামের

জন্য। অবশ্য সবাই পড়তি। রূপ গেছে, যৌবন ধুঁকছে, দেহের কদরও নেই। কারও আবার ডিভোর্স হয়ে গেছে। বাচ্চা বড় হওয়াতে খরচ আরও বেশি। স্ট্যাটাস মেন্টেন করতে গেলে টাকা চাই।

অবন্তীর অত খারাপ অবস্থা নয়! সাড়ে পাঁচ ফিট নিটোল দেহে, এখনও ভরা যৌবন। ভরাট বুক, নিতম্ব। গজদাঁতের ফাঁকে মিষ্টি হাসি। এখনও ফুরিয়ে যায়নি যে, খাতায় নাম লেখাবে। চিটফান্ড ধুঁকলে হবে কী। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের কী টাকার অভাব! পা ফাঁক করে, যা পারো কামিয়ে নাও। ব্যাপারটা সিম্পল। বউ হয়ে সঞ্জীবের সঙ্গে শুলে, খাওয়া-পরা ফ্রি। অন্যদের সঙ্গে শুলে, কাঁড়ি কাঁড়ি মালকড়ি।

অনীক হওয়ার পর সিনেমা কোথায়? পাঁচ বছর কোনও ছবিই করেনি। শুধু হেঁসেল ঠেলা, ফাই-ফরমাস খাটা, অনিকের দেখভাল। আর মাঝরাতে সঞ্জীবের মনোরঞ্জন। পাকা গিন্নির মতো তা-ই তো করছিল। আর ঘরে বসে মুটিয়ে, টিভি দেখে, সময় কাটিয়ে, হাঁপিয়ে উঠছিল। সঞ্জীবের তখন রোজগারপাতি তেমন নয়। তাই যখন অংশু গাঙ্গুলি টেলিফিল্মের অফার দিল, সঞ্জীব আপত্তি জানাতে পারল না। সংসার চালাতে গেলে টাকার দরকার। পরে 'তাড়াহুড়ো প্রেম' আর 'নায়িকার গপ্প' দুটো টেলিফিল্ম জুটে গেল। অ্যাক্টিং কী করেছিল, নিজেই জানে না। কিছু আমদানি। ক্ষতি কী?

সব-ই তো বৃহত্তর মনোরঞ্জনের অঙ্গ। সঞ্জীব-ই তো তার পরিধি দেখিয়েছে রুপোলি পর্দার বাইরে।

"আপকা লাস্ট প্রোডাকশন তো বক্স অফিস মে কামাল কর দিয়া" একগাল হেসে ওয়াইনের গ্লাস হাতে দীপশিখা গজেন্দ্র ধনির দিকে মন্তব্য ছুড়ে দিল।

নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বেশ কয়েকটা সিরিয়াল করার পর, জয়ন্ত রাজার পরিচালনায় দু-একটা ছবিতে হিরোইনও হয়েছিল। শুনেছে, ঝগড়াটে বদ-মেজাজের জন্য ইন্ডাস্ট্রি ক্রমশ একঘরে করে দিয়েছিল। তারপর মুম্বাইতে গিয়েও কিছু করতে পারেনি। ফেরত এসেছে। নায়িকার চেহারা নেই। এখন যদি গজেন্দ্রকে মস্কা মেরে আর কিছু পাওয়া যায়।

পার্টি নয়তো, ধান্দার মজলিস। বেশ কিছু পড়তি তারকা খিলখিল করে হাসছে। আসলে হাউই। দম ফুরিয়ে গেছে। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় বুকের আঁচল খসে পড়ছে। কারণে-অকারণে পুরুষের গায়ে ঢলাঢলি। যদি কিছু হয়...

এসব ব্যাপারে অবন্তী খুব ডিসক্রিট। এসব ওর পোষায় না। চান্স দাও। তোমার বাগানবাড়িতে নাইট ডিউটি দেব। মালকড়ি ছাড়ো। আমি প্রস্তুত। এসব পাবলিক বেলেল্লেপনা অসহ্য। কমপ্লিটলি আনপ্রোডাক্টিভ।

"কেমন আছিস? কাজকর্ম ঠিকঠাক চলছে তো?" শুভ্রজিৎ ঢুকেই অবন্তীকে জিজ্ঞেস করল।

একগাল হেসে মাথা নাড়ল অবন্তী। এই শুভ্রজিৎদার সঙ্গেই তো তার প্রথম ছবি 'স্বপ্ন বন্ধন'। এখনও শুভ্রদা তাকে সেই ছোট্ট খুকিটি মনে করে। বিয়ে হল, বাচ্চা বড় হচ্ছে, নামী হিরোইন হল, তবু শুভ্রজিৎদার

কাছে সে 'স্বপ্ন বন্ধন'-এর সেই ছোট্ট মেয়েটা।

"শুনছি ভালো কাজকম্ম করছিস। চালিয়ে যা..." শুভ্রজিৎদা কদ্দুর তার আর সঞ্জীবের খবর জানে, বোঝা গেল না। এড়িয়ে গেল। অবশ্য আশা করেনি পাবলিকলি এসব ডিসকাশন করবে।

ঝানু লোক শুভ্রজিৎদা। এতদিন ইন্ডাস্ট্রিতে আছে। মেপে কথা বলে। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব। কিন্তু তলে তলে গোটা ইন্ডাস্ট্রিটাকে কবজা করে রেখেছে ও আর গজেন্দ্র ধনি। ওদের পথে না হাঁটলে, সন্তর্পণে চেপে ছেঁটে দেবে। গজেন্দ্র, বিজিত মুখার্জি ও অন্যান্যরা ওর সঙ্গেই ভিড়ে গেল। বোঝাই যায়, ওদের টিকিও ধরে রেখেছে অলক্ষ্যে।

গজেন্দ্র বেয়ারাকে ইঙ্গিত করল। ডবল সিঙ্গল মল্ট হাতে তুলে নিয়ে পুরু গোঁফের ফাঁক দিয়ে মুচকি হাসি। বিজিতের দিকে তাকিয়ে বলল "তোমার নতুন স্ক্রিপ্ট কদ্দুর?"

"নামিয়ে এনেছি"

"কী নিয়ে?"

"এবার নটি বিনোদিনীর ওপর"

"চলবে?"

"তোমার আশীর্বাদ থাকলে সুপার-হিট হবে"

কোনও জবাব না দিয়ে মুচকি হাসল। বাংলা ছবির একচ্ছত্র নায়ক হলেও অবন্তীর মতো ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই জানে, পুরো ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল করে শুভ্রজিৎদা আর চামুণ্ডেশ্বরীর দুই কর্ণধার, গজেন্দ্র আর মনিকান্ত।

সব সম্পর্ক শুধু ধান্দার আলিন্দে ঘোরাফেরা করে। অল্প বয়সে যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন কি বুঝতে পেরেছিল? সে বয়সে জীবনের কতটুকুই বা দেখেছে। বিয়ে হওয়ার পরই প্রেগন্যান্ট। ঘর সংসার আর অনীকের দেখভাল নিয়ে বেশ কেটে যাচ্ছিল। এক সঞ্জীব ছাড়া, ফিল্মি দুনিয়ার সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক নেই। হঠাৎ এক দুপুরে, পাঁচ বছর পর, তার প্রথম হিট ছবির পরিচালক মনি কিনাগির ফোন "সিনেমা করবে?"

বুকটা কেঁপে উঠল। আড় চোখে দেখল অনীক দিব্যি ঘুমচ্ছে। আশাও করেনি, কোনও পরিচালকের কাছ থেকে ডাক পাবে। হয়ত প্রথম ছবিটা হিট হয়েছিল বলেই মনির তাকে মনে পড়েছে।

আমতা আমতা করে বলল "জানি না"

"জানো না মানে? দারুণ স্ক্রিপ্ট। সালজবারগে বেশ কিছু আউটডোর শুটিং আছে"

আউটডোর শুটিং-এর কথা শুনে, আরও ঘাবড়ে গেল। তখন সে ঝাড়া হাতপা। এখন বিয়ে হয়েছে, বাচ্চা আছে। দুম করে ঘরসংসার, ছেলে ছেড়ে চলে যাওয়া যায় নাকি!

“সঞ্জীবকে জিজ্ঞেস করতে হবে”

“বেশ। জিজ্ঞেস করে আমাকে ফোন কোরো”

ভেতরে চাপা উত্তেজনা। প্রপোসালটা একঘেয়ে জীবনে এক নতুন হাওয়া এনেছে। ডাক দিচ্ছে ফেলে আসা জগৎ। বাইরের টান, সঙ্গে বিদেশে যাওয়ার প্রথম সুযোগ। এই টানাটানির সংসারে মুফতে তো কেউ টাকা দেয় না। ঘরে বসেও রোজগার হয় না। সঞ্জীবের স্বল্প রোজগারে যদি একটু সাহায্য হয়, মন্দ কী?

সঞ্জীবকে কথাটা পাড়তেই বলল “না... না... সিনেমা করবে কেন, সংসার ফেলে”

অবন্তী বোঝাবার চেষ্টা করল “তোমার এখন রোজগারপাতি ভালো নেই। কিছু টাকা তো ঘরে আসবে। অনীককে মানুষ করার জন্যও তো টাকার দরকার”

রাতে শুয়ে কথাটা ভাবতেই সঞ্জীবের মনে হল, ভুল তো কিছু বলেনি। মুম্বাইতে কাজ করে, হাতে যে কটা কাজ ছিল, তাও প্রায় শেষ। সামনে রোজগারের পথও নেই। হপ্তাখানেকের তো বাইরে কাজ। সে ঠিক অনীককে ম্যনেজ করে নিতে পারবে। মনির নতুন ছবি ‘লাভ’ সই করল অবন্তী। ঘর গিয়ে দাঁড়াল বাইরে।

সালজবারগ!

অবন্তীর কাছে স্বপ্নের দেশ। আসার আগে সঞ্জীব বলেছিল, এটা নাকি মোজার্ট-এর জন্মভূমি। মোজার্ট-এর নাম শুনছে মাত্র। তাঁর বাজনা শোনা হয়নি। অত বিদেশি গান বোঝে না। তবে রোমাঞ্চ লাগছে এই ভেবে, যেখানে এক সময় ‘সাউন্ড অফ মিউজিক’-এর শুটিং হয়েছিল, সেখানেই কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। অ্যাল্পসের আন্টারসবারগ পাহাড়ের কোলে টেক। ওই ঠান্ডায় ঘনঘন কস্টিউম পালটে কোট ছাড়া শট দেওয়া রীতিমতো কষ্টকর। তবুও ভূস্বর্গের মনমোহিনী সৌন্দর্য, সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। গা গরম রাখতে, শটের ফাঁকে ক্রু-র লোক ব্র্যান্ডি দিচ্ছে।

নতুন নায়ক কিরণ চ্যাটার্জি বেশ মিশুকে।

উঠেছিল হোটেল টরেনার হফে। সস্তার হোটেল। খুব পরিষ্কার, তাও নয়। সেটাই অবন্তীর কাছে স্বর্গ। ইউনিটের এত লোক নিয়ে বাংলা ছবির প্রযোজক এর থেকে আর ভালো আর কোথায় রাখতে পারে? ডবল বেডেড রুম। যদিও ইউনিটে সে একা মহিলা, এক নতুন অ্যাকট্রেসের জন্য আলাদা ভাড়া খরচ করলে বাজেট বেড়ে যাবে। তাই নায়ক কিরণ তার সঙ্গে।

“ভালো শট দিয়েছ” কিরণ বলল।

“ঠিক হয়েছে তো! জুতো পরে বরফের ওপর নাচা... পা স্লিপ করে যাচ্ছিল। এসব পাহাড়ি এলাকায় তো আগে কখনও আসিনি” অবন্তী স্বাভাবিক ভাবেই বলল।

“ভয় নেই। ঠিক মতো করে যাও। ধরার জন্য তো আমি আছি” কিরণ মুচকি হাসল।

বিয়ের আগে, কোনও পুরুষের সঙ্গে থাকতে হয়ত ইতস্তত করত। কিন্তু এখন ওসব জড়তা কেটে গেছে। কী আর এমন হবে? বড়জোর সম্ভোগ করবে, ব্যস। কতদিন সঞ্জীব সহবাস করেনি। ও কি ভুলে গেছে বউয়েরও খিদে থাকতে পারে? শেষের দিকে তো বেশিরভাগ সময়টাই মুম্বাইতে। এই ঠান্ডায় যদি কেউ গা-টা একটু গরম করে দেয়, মন্দ কী। করলও।

অবন্তীর চাওয়া বুঝতে অসুবিধা হয়নি কিরণের। এই কনকনে শীতে, রামচন্দ্রের উষ্ণ ছোঁয়ায়, অহল্যা যেন তার হারানো তৃপ্তি ফিরে পেল। শুটিংয়ের কাজটা আরও সহজ হয়ে গেল।

যত রাত বাড়ছে পার্টি তত জমে উঠছে।

ঢলাঢলি... কোলাকুলি... আলাপ... সংলাপ... বিলাপ... প্রলাপ...

যে যার মতো হিসেব বুঝে নিচ্ছে। শো-বিজ আজব পৃথিবী।

অবন্তীর দম বন্ধ হয়ে আসছে।'লাভ' হিট করার পর ওকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। খুব ভালো করেই জানে, যতদিন বাজারে কাটবে, অফারের কমতি থাকবে না। জায়েগা বুঝে প্রয়োজনে সিটিং দিয়ে যাও। এসব পার্টি স্ক্যামের মধ্যে থাকতে চায় না। বেফাঁসে মিডিয়া কিছু লিখে দিলে, তার লাভলি গার্ল, সহজ সরল ইমেজটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সঙ্গে আগামী ছবির সম্ভাবনাও।

গজেন্দ্রর ভিড়ে উঁকি মেরে বলল "জানা হ্যায়। কাল শুটিং"

"কুছ খায়া তো?"

"থোরা বহুত"

রাতের অন্ধকারে গাড়ির ব্যাক সিটে গা এলিয়ে মনে হল, এই সাত বছরে অনেক পথ পার হয়ে এসেছে। একদিকে পাওয়া, অন্যদিকে হারানো। এই খেলা চলতেই থাকবে। কালকে দুটো সিনেমা ঝুলে গেলেই ফাঁকা। মেক হে হোয়াইল দা সান শাইনস।

অভাবের দুনিয়াটাকে মফসসলের মেয়েটা খুব কাছ থেকে দেখেছে। সেখানে আর ফেরত যেতে চায় না। সে গ্ল্যামার থাকুক, চাই না থাকুক। ভবিষ্যৎকে বেঁধে ফেলতে হবে ক্ষণিকের স্টারডমে। সেখানেই পূর্ণতা।

পাঁচ

বহু ফ্ল্যাশের ঝলকানি জানান দিল, দেওয়ালি এসেছে। একটু দেরি হয়েছিল। সাজের কোনও খামতি নেই। জার্মান কন্সলেটের পার্টি বলে কথা। রণদীপ ভুটোরিয়ার বিশেষ আমন্ত্রণে হাজিরা।কালো ফুল-লেংথ গাউনের ওপর মুক্তর সেট।শ্যামলা চেহারায় অন্য মাত্রা দিয়েছে।

কী আশ্চর্য!

বিদ্যাসাগর কলেজে কিংবা সল্ট লেকে পিজি অ্যাকমডেশনে থাকা কালীন তো কাউকে এভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। আকর্ষণের ব্যাপারটাই জানত না। ইট ইজ নট হাউ ইউ লুক, বাট হাউ ইউ ক্যারি ইওরসেলফ। শো-বিজ দুনিয়ায় ঢুকে, সেটাই শিখেছে। নিজেকে কী করে আকর্ষণীয় আর দামি করে তুলতে হয়, ম্যাগ্নেটিজমের মূলমন্ত্র। আনকোরা দেওয়ালিকে সেটাই শিখিয়েছিল মনি কিনাগি।

অবজ্ঞা থেকেই মাথায় ভূত চেপে গেছিল জনমোহিনী হওয়ার। কী করে রাজাবাজার সাইন্স কলেজের স্নাতকোত্তর কেমিস্ট্রিতে রিসার্চ ছেড়ে অভিনেত্রী হয়ে গেল, নিজেই জানে না। ছোটবেলায় কিছু নাটক করেছিল। ক্লাসিক্যাল নাচও শিখেছিল, তবে ছবিতে অভিনয় করার কথা কোনদিনও ভাবেনি। সাব-কন্সাসে উপেক্ষাই বোধহয় জেদটা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

“সিরিয়াল করবি?” দেওয়ালির মনের ইচ্ছেটা জেনেই তপতী কথাটা পাড়ল।

বারো বছর আগের কথা এখনও ভোলেনি।“কে নেবে?”

“আমার মামা, সিরিয়ালের বড় ডিরেক্টর অবিনাশ সেনগুপ্ত”

একেই বলে কপাল।‘জুয়াখেলা’ সিরিয়ালে চান্স পেয়ে গেল। রিসার্চের স্বপ্ন শেষ। শুরু হল জীবনের আরেক অধ্যায়। প্রথম সিরিয়ালে তেমন কোনও দাগ ফেলতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় সিরিয়াল ‘লগ্নের অতিথি’ সুপারহিট। ছয় বছর ধরে চলল। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। চাঁদের আলোয়, মায়া, অধরা - একটার পর একটা মেগা। বদমেজাজি দীপশিখা যত সিরিয়াল থেকে বাদ পড়ছে, দেওয়ালির কদর তত বাড়ছে।

“দেওয়ালিদি একটু এদিকে...” মিডিয়া নানা অ্যাঙ্গেলে। আগামী দিনের জন্য। বেশ কয়েকটা ট্যাবলয়েড ছবিগুলো বিক্রি করে কিছু কামিয়ে নেবে।

পেজ থ্রি-তে ছবি না বেরলে কী সেলিব্রিটি হয়! না হলে কী লোকে ফিতে কাটার জন্য গ্যাঁটের টাকা খরচ করে ডেকে নিয়ে যাবে? কন্সিউমার সোসাইটিতে সব-ই ইন্টার রিলেটেড। দেওয়ালি কন্সিউমারিজমের

একনিষ্ঠ পূজারি।

বাংলা টিভির প্রোগ্রামিং ডিরেক্টর মৃন্ময় ঘোষ এগিয়ে এল "একটা স্লট পাওয়া যাবে? ইন্টারভিউ নিতাম"

মিষ্টি হেসে জবাব "দু মাসের মধ্যে কোনও ফুরসত নেই"

"একটু যদি সময় দাও..."

যতদিন স্টার হয়নি, অফুরন্ত সময় ছিল। মিডিয়াতে ফোকটে বকবক। এখন সময় মানে কামাই। নয়তো রেস্ট। ফোকটে পাবলিসিটির পেছনে সময় নষ্ট করার মানেই হয় না।

"আমি তো আপনাদের মধ্যেই আছি। সময়মতো দু-চার কথা রেকর্ড করে নেবেন। আলাদা করে সময় বের করা মুস্কিল"

ধুরন্ধর মৃন্ময় ঘোষকে পাশ কাটিয়ে গেল। চেনা পাপী। আগে 'হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকার সাপ্লিমেন্টারি ট্যাবলয়েড দেখত। পাবলিসিটির নামে কত টাকা বাঁ হাতে আত্মসাৎ করেছে আর কত মেয়ে নিয়ে মুফতে ফুর্তি করছে, দেওয়ালি ছাড়াও অনেকের জানা। দেওয়ালি সে পথ কোনদিনও মাড়ায়নি। একমনে কাজ করে গেছে। কপালে থাকলে নাম হবেই। সেদিন যদি মৃন্ময় ঘোষকে প্রয়োজন না হয়ে থাকে, আজ-ই বা সময় নষ্ট করবে কেন?

সিরিয়ালে সহজেই চান্স পেয়েছিল। রুপোলি পর্দার ঝক্কিটা অনেক বেশি। জমি পাওয়া ততটা সহজ ছিল না।

তৃষ্ণা রায়ের ছবিতে যদিও বা প্রথম সুযোগ জুটল, মুক্তি পেল আট বছর পরে। তখন তো সে প্রতিষ্ঠিত। ন-বছর আগে মনি কিনাগির 'অগ্নিকন্যা', পরের বছর দিবানাথ চক্রবর্তীর 'গণ্ডগোল', তারপরে 'তোমায় ভালবাসি'। সবগুলোতেই সাইড রোল। নায়িকা হওয়ার সুযোগই পাচ্ছিল না। তবু হাল ছাড়েনি। স্থায়িত্বের জন্য ধৈর্য আর অধ্যবসায় প্রয়োজন।

শেষমেশ 'অবেলায়' ভাগ্যের ক্যাসিনো জ্যাকপট দিল। নতুন ঝংকার। অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা তাকে সহ-নায়িকা থেকে নায়িকার আসনে বসিয়ে দিল। আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। কোনও এক কারণে বেশ কয়েকটা ছবি আজও মুক্তি পায়নি।

বিবর্তনের ঘূর্ণিঝড়ে যখন জীবনের উড়োজাহাজটা মাঝ-আকাশে টালমাটাল, ঠিক সেই সময়, ছবি করতে গিয়েই, রাজাদিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, অন্তরঙ্গতা। সে আরেক কাহিনি। আজ রাজাদিত্যর ফোন পেয়ে দেওয়ালির মনে হল, এখন তো তার এগোবার সময়। কেন-ই বা রাজাদিত্য। অতীত স্মৃতির ব্যাকড্রপ।

"আরে ইধর তো জরা আও" রণদীপ ভুটোরিয়া ভিড়ের মধ্যে থেকে ঈগলের মতো তুলে আনল দেওয়ালিকে "পহচানতে হো?"

“কলকত্তে মে প্রদীপ গোয়েঙ্কা কো কৌন নেহি পহচানতে?” ওয়াইনের গ্লাস হাতে গোয়েঙ্কা সাহেবের সামনে।

কাঁচাপাকা গোফের ফাঁক দিয়ে সাহেবের স্মিত হাসি “পরদে মে কই বার দেখা। মুলাকাত নেহি হুয়া। ইউ আর এ ফাইন অ্যাক্ট্রেস”

“থ্যাঙ্ক ইউ” মনমোহিনী হাসি।

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, রণদীপ তাকে এর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিল কেন। কলকাতার অন্যতম ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট প্রদীপ গোয়েঙ্কা। নাম জানলেও, পরিচয় হয়নি। ইন্ডাস্ট্রিতে কানাঘুষো, ব্যবসা এবং রুলিং পার্টিকে তোষামোদ করা ছাড়া, মেয়েদের প্রতি দুর্বলতার কথাও। কিন্তু পদ্মপর্ণাদি থাকতে আবার সে কেন?

নাও তো হতে পারে।

ছয়

ধ্যত, সময়টাই ঠিক যাচ্ছে না। কিছুই ঠিক লাগছে না।

এখন আবার আরেক উটকো ঝামেলা। কোন হিরোইন কোন চিত্রপরিচালক-নাট্যকার-বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে হোটেলে ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়ে হাত কেটে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে, তার পেছনে ছোটো। কভার স্টোরি কর। মশলা মিশিয়ে বাজারে ছাড়ো।

মিডিয়ার চাকরি বলে কথা...

একেবারে খোদ মালিক ধূর্জটি রায়ের ইন্সট্রাকশন। এখনও কোনও প্রফিটের মুখ দেখেনি। বিবিপি-র সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পেরে উঠছে না। সেলস আরও বাড়াতে হবে। লসে রান করা চ্যানেল জাস্ট অ্যাবাউট, ব্রেক ইভেন করে টিকে আছে, স্টাফদের মাইনে দিয়ে। অ্যাড থেকে সেরকম প্রফিটেবল এক্সপেন্স উঠছে না। অতএব সেলস, প্রোগ্রামিং সব মাথাদের সজাগ করে দেওয়া।

মৃন্ময় ঘোষের ত্রাহি দশা। দেওয়ালির ফোকটে টাইম দেবার মতো সময় নেই। যেটুকু পাবলিসিটির দরকার ছিল, হয়ে গেছে। এখন নো মানি, নো টাইম। তাই মৃত্তিকা-ধীমানের কাহিনির পেছনে ছোট। নিউ টাউনের হোটেল থেকে অ্যাপোলো। টিমকে ভিড়িয়ে দাও রসালো কাহিনি ফাঁদতে।

“গুছিয়ে স্কুপটা বানাতে হবে। এমন কিছু চাই যা অন্য মিডিয়ার আগেই বাজারে যাবে” সৈকত ঘরে ঢুকে বলল।

বাংলা টিভির সিইও সৈকত চ্যাটার্জিও চিন্তিত। খুব ভালো করেই জানে, প্রোডাক্টিভ না হলে যে কোনও সময় বালির ভিতে নড়বড় করা চ্যানেলটাই উঠে যেতে পারে। বালি সরলেই, গভীর খাদ। ধূর্জটি রায়ের কী? ও জানে টুপি পরিয়ে, নতুন করে কী করে আবার বিজনেস ফাঁদতে হয়। সৈকত তো মিডিয়া ছাড়া আর কিছুই জানে না। চ্যানেল বন্ধ হলে খাবে কী? আগামী সিনেমাগুলোর প্রোডিউসারও হারাবে।

ধূর্জটি পাত্তি বোঝে। টিকে থাকার জন্য, ভেনচার ক্যাপিটায়ালিস্টদের ভাঁড়ারে মুনাফা গুঁজে দেওয়া। না হলে অন্য বিজনেসের ফাইন্যান্স পাবে কোত্থেকে? স্কুটার নিয়ে ফেরি করা লোক-ই জানে, রাস্তায় নামার কষ্টটা। সে সৈকত হোক, আর যেই হোক আবেগ, বিবেকের কোনও ব্যাপার নেই।

“রূপসা, রিঙ্কু, মহুয়া, অরিন্দম সব্বাইকে লাগিয়ে দিয়েছি। এক দল সুইসওটেলে গেছে, আরেক দল অ্যাপোলোতে” মৃন্ময় সৈকতকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল।

“তোমার”

“তুমি খাও না। আমি আরেকটা অর্ডার দিচ্ছি” বস বলে কথা। সৈকতদাকে আগে না দিয়ে খাওয়া যায়?

বেশি দিনের আগের কথা নয়।

‘হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া’ থেকে ছাটাই-এর পর ত্রাহি অবস্থা। যা উপরি কামিয়েছিল, এ এম আর আই-তে মায়ের চিকিৎসার জন্য সব নিঃশেষ। একটা গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম থেকে ব্রেন ডেথ। বাঁচার কোনও আশাই ছিল না। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছিল। শুধুমাত্র ডাঃ বিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতযশে মাকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। এতদিনের হারামের কামাই মায়ের চিকিৎসায় সদব্যবহার করে পাপক্ষালন। চব্বিশ ঘণ্টার নার্স। চাকরি নেই। সংসার চলবে কোত্থেকে?

শালা ডাঃ অরিজিৎ বসুর চিঠিতেই চাকরিটা গেল। কী আর এমন করেছিল? বিশ্বজিৎদার দেখানো পথে, বাঁ হাতে সেও টু পাইস কামিয়ে নিচ্ছিল। অনেকেই তো এমন কামায়। আদর্শবাদী অরিজিৎ বসুর সেটা সইল না।

বাঁশ!

নিজে না দিলেও, সেভাবেই এসেছিল।

সে সময় মিডিয়ার পুরনো ঝানু খেলোয়াড় সৈকতদাই তো বাংলা টিভিতে সুযোগ দিয়ে সংসারটাকে বাঁচিয়েছিল। সেকথা ভোলে কী করে মৃন্ময়?

“অ্যাফেয়ারের কথা অনেকদিন ধরেই জানি। মৃত্তিকা একটা চিজও বটে। সব সময় লাইম-লাইটে থাকতে চায়। ফর রাইট অর রং রিজন্স”

“ভালোই তো। না হলে, আমাদের চলবে কোত্থেকে? পলিটিক্যাল স্ক্যাম আর সেলেব বিক্রি করেই তো চ্যানেল চলছে। না হলে কবে বন্ধ হয়ে যেত। অবশ্য তোমার ব্যাপারটা একটু আলাদা। মাঝেমধ্যে সিনেমা করে, উপরি কিছু হয়”

“চলে কোথায়? ওই নামকেওয়াস্তে। বুড়ি ছুঁয়ে রাখা। হতে চেয়েছিলাম ফিল্ম ডিরেক্টর। হয়ে গেলাম টিভি ডিরেক্টর”

“তবুও তো সিনেমার নামে প্রোডিউসারের ঘাড় ভেঙে কিছু কামিয়ে নিতে পার এধার-ওধার থেকে। আমার তো তাও নেই। কেবল মাসমাইনে ছাড়া”

এক সময়, মৃন্ময় ঘোষেরও অনেক উপরি ছিল। খেলাটা শিখেছিল লেট বিশ্বজিৎ দাসগুপ্তর থেকে। যখন ওরা দুজনেই ‘হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া’ তে কাজ করত। স্বর্গত বিশ্বজিৎ দাসগুপ্তই বাজারে প্রথম খবরের কাগজের সাপ্লিমেন্টের কনসেপ্টটা আনে। চনমনে রসালো কেচ্ছা। আধা-নগ্ন ছবি দিয়ে ভরিয়ে দাও আট পাতা সাপ্লিমেন্ট। বাজারে ছাড়তেই কেল্লা ফতে। রমরম করে খেয়ে নিল পাবলিক। এই পাবলিসিটির কত

ডিমান্ড। উঠতি সেলেবরা ছবি বার করতে যে কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত। নেক্সট দিনে ছবি ছাপাবার জন্য দিনেরাতে পা ফাঁক করে শুয়ে পড়তে উদগ্রীব। শুধু দর হাঁকো, বান্দা হাজির।

দিনে সেলেব, রাতে ধান্দার সওদাগর।

অজান্তাকে আজও ভুলতে পারে না মৃন্ময়। আচমকা একদিন বিশ্বজিতের ঘরে হাজির। ওর ঘরেই মৃন্ময় কফি খাচ্ছিল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল অজান্তার দিকে। উপচে পড়া বুক, পরিপূর্ণ নিতম্ব, উচ্ছ্বল যৌবন।

"একটা ছবি যদি বার করেন..." আমতা করে অনুনয়।

"রোজই তো কত মেয়ে আসে। সবাইকে দিয়ে গ্ল্যামারের কাজ হয় না" বিশ্বজিৎদা ওকে পাত্তাই দেয়নি।

"আমাকে দিয়ে হবে" অজান্তা নাছোড়বান্দা।

"তুমি কী ভাবে স্পেশাল?"

টপসের বোতাম দুটো খুলে বলেছিল "বিশ্বাস না হলে পরখ করে দেখে নিতে পারেন"

মৃন্ময়কে দেখে গম্ভীরভাবে অজান্তাকে বলেছিল "ওখানে গিয়ে বস। এটা অফিস"

মৃন্ময় কী করবে বুঝতে না পেরে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে পড়েছিল "আসি বিশ্বদা। পরে কথা হবে" কফিটা শেষ না করেই বেরিয়ে এসেছিল।

বাকির অংশটুকু অনুমান করা কঠিন নয়। ভোগ কী জিনিস, বিশ্বদার কাছ থেকেই শেখা। শেষ পর্যন্ত স্ক্যামে ট্যাবলয়েড ছাড়তে বাধ্য হল। তার গদিতে উঠল মৃন্ময়।

ফর মেন মে কাম অ্যান্ড মেন মে গো, বাট আই গো অন ফর এভার - মানুষ পাল্টাতে পারে, কিন্তু মিডিয়ার খেলা পালটায় না। চলতেই থাকে এক নিয়মে।'হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া'-র মসনদের পদে থাকা যে মানুষই হোক না কেন, খেলে চলে বিশ্বজিৎদার নামাবলি পরে।

বিশ্বদার শেষ, মৃন্ময়ের শুরু।

গুরুর প্রসাদ পায়নি বটে, গুহ্যবিদ্যাটা ভালোই শিখিয়েছিল। শুধু শেখায়নি লাইফ লাইন। গদিতে বসে সদর্পে সেই খেলা খেলতে গিয়ে যে দু-একবার যে হোঁচট খেতে হয়নি, এমন নয়। তাতে কী? এই টেরা পথে একটু হোঁচট খাবে না, তা কি হয়?

চিত্রশিল্পী রিয়া ঘোষাল তাদেরই একজন। মাঝরাতে টালিগঞ্জে ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়ে কষে সপাটে চড়।

"গেট আউট অফ মাই কার, ইউ স্কাম" রিয়ার চিৎকার আজও ভোলেনি।

কেউ না জানলেও, অতীতের এমন টুকরো স্মৃতি মাঝেমধ্যে আর্কাইভ থেকে উকি দিতে চাইলেও, আমল দেয়নি। লটঘট করতে গেলে এমন একটুআধটু মুখ ঝামটা গা ঝেড়ে উড়িয়ে দিতে শিখেছে। ট্যাবলয়েড মানে

পাবলিসিটির নামে মেয়েমানুষ আর টাকা। ডাক্তার, উকিল থেকে পাবলিসিটি হাংরি মানুষ মানেই, পাত্তি ফেল, তবেই খবর।

তবে দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য বা বিমান চাটুজ্জের কাছে তা নেহাৎ কম। অ্যাচিভমেন্ট? সোজা কথা। নিজের ঘরের নিভৃত থেকে জনসমক্ষে আসতে গেলে মালকড়ি ফেল। তবেই সেটা খবর।

বিমানদা তো শুধু গুছিয়ে খবর লিখেই খালাস। দিগ্বিজয় এক ডিগ্রি ওপরে। ব্ল্যাকমেলিং-এ মাস্টার। তার কুমড়োর মতো গিন্নি, মায়া ভট্টাচার্য নেট-ওয়ার্কিং করে ক্লায়েন্ট ধরে। অনেক সময় টাউট দিয়ে উইক পয়েন্ট খুঁজে বার করে তাকে কাজে লাগায় আমদানির জন্য। ব্যালেনশড ইকোয়েসশন।

আহাঃ!

মৃন্ময়েরও যদি ওরকম মডার্ন হাইস্কুলে পড়া ইংরেজি বলা ভাষ্যকার বউ থাকত! সবার তো, মায়ার মতো একদা ভাষ্যকার বউ জোটে না। ঠিক জানে, ইন্ডিয়ার কোন প্রান্তে জাল বিছিয়ে মুরগি তুলতে হবে। একেই বলে ইংলিশ মিডিয়ামের মহিমা।

রিয়া মারাত্মক কি না, পরখ করার সৌভাগ্য হয়নি। তবে চিনতে ভুল হয়েছিল।

রিয়া ঘোষাল।

অন্য সব সেলেবদের থেকে নন-সেলেব হয়েও আলাদা। ছিপছিপে ছোটখাটো চেহারা। কিছু ক্ষমতা আছে, মানতেই হবে। টালিগঞ্জের বস্তি থেকে উঠে আসা। নিজের চেষ্টায় কলকাতা সেলিব্রিটি মহলে জায়েগা করে নিয়েছে। প্রতিভার থেকে নেটওয়ার্কিং বেশি।

যুগের মাপকাঠিতে প্রতিভার বিন্যাস কোথায় স্থান করে নেয়, সময়ই বলে দেবে। কিন্তু নেটওয়ার্কিং যে আপেক্ষিক স্টারডমের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, সেটা পেজ থ্রির পাতা ওলটালেই বোঝা যায়। পার্টি, মদ, ঢলাঢলি, ছবি ছাপানো, টিভিতে ইন্টারভিউ, এগুলোর যে একান্ত প্রয়োজন, আজকের যে কোনও সেলিব্রিটি বলে দেবে। মোদ্দা কথা, স্টে ইন নিউজ বাই এনি মিন্স। দ্য কি টু লাইমলাইট। মাহাত্ম্যের আছিলায় আরও কিছু গুছিয়ে নেওয়া।

গুছিয়ে নিতে পেরেছে কি না, রিয়াই বলতে পারবে। তবে টালিগঞ্জের এঁদো গলি থেকে কলকাতা কিংবা ইউরোপের কোনায়, নিজেকে তো মেলে ধরতে পেরেছে। তখন কতই বা বয়েস। স্কুল ছেড়ে কলেজে। আকাশ কর্মকারের কাছে ছবি আঁকা শিখছে। অনেক সময়ই দেরি হয়ে যেত।

“মেয়েটা ছেলে চড়িয়ে বাড়ি ফিরল। খেতে দাও গো...” বাবার প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপে গা টা রিরি করলেও, মুখ বুজে সহ্য করেছে।

একলা ঘরে কাঁদলেও, সে কান্না শোনার কেউ ছিল না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। করে দেখিয়ে দেবে সে বেশ্যা নয়। দিয়েওছে।

তাইত সেদিন মৃন্ময়কে কষে থাপ্পড় মারতে পেরেছিল। বাবার বিদ্রুপকে যদি নিঃশব্দে থাপ্পড় মেরে থাকতে পারে, মৃন্ময় কোন ছাড়?

"হবে হবে, সব হবে। জায়েগা মতো ঢেলে যাও আর খেলে যাও..." সৈকত সান্ত্বনা দিল।

"সৈকতদা আপনি তো বস। আমি নিতান্তই চুনোপুঁটি"

ধান্দাবাজির খেলায় সৈকতদার জুড়ি নেই মৃন্ময় জানে। অনেক ঘাটের জল খাওয়া সৈকত চাটুজ্জে সব ঘাটের কিনারা না জানলেও, কিছুটা তো জানে।

আসল কাহিনিটা কিন্তু মৃন্ময় জানে না, কিছুটা সৈকত।

কাহিনির গোড়াপত্তন বড়বাজার থেকে। ওর আস্তিনে বড় হওয়া সরকারবাবুর ব্লু আইড বয় বিমান চট্টোপাধ্যায়। চাপ দাড়ি। ভারী চেহারা। তুখোড় বুদ্ধি। খবর পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত। যত রাতেই শুতে যাক না কেন, পাক্কা দশটায় অফিসের বোর্ডরুমে হাজির।

"আজকের অ্যাজেন্ডা..."

নাম করে করে প্রত্যেককে দিনের মাস্টার প্ল্যান আর কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে। স্পেসিফিক দায়িত্ব। এবার সারাদিনের কাজে নেমে পড়। দুপুরে মোবাইলে কাজের অগ্রগতি নিয়ে খবরাখবর। সন্ধেতে সবাইকে একত্রিত করে ফাইন্যাল কভারেজের আগে চেক আপ। ডিসিপ্লিনড, ছকের অঙ্কে নিখুঁত কাজ।

সে সময় দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য কোথায়? মামুলি স্পোর্টস রিপোর্টার। বিমলের ওপর সরকারবাবুরও কথা বলার অধিকার নেই। বড়বাজার বকলমে চালায় বিমান। মাইনে ভালই, তবে উপরি নেই। তখনই মাথায় কুবুদ্ধি চাপল। অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যদি, তার ক্ষুদ্র জায়গা থেকে, টু-পাইস কামিয়ে নিতে পারে, সে নয় কেন?

"আজকে ফ্রি আছ? ডিনারে যাবে?" পেয়ারের হেলথ রিপোর্টার বিদীপ্তাকে ফোন।

"কী যে বলেন বিমানদা? আপনি ডাকলে না এসে পারি"

গ্র্যান্ড হোটেলের চৌরঙ্গী বারে গ্লেনলিভেট ১৫ তে চুমুক দিয়ে বিমান বলল "এক্সট্রা ইনকাম চাই"

দিনুভাইয়ের রক্ষিতা, মিরাকেল কিওর নার্সিং হোমের জেনারেল ম্যানেজার, বিদীপ্তা মুখোপাধ্যায়, টেকিলা সানরাইসে চুমুক দিয়ে বলল "কী ভাবে?"

"মুরগি জোগাড় কর। যারা খবর ছাপাবার জন্য উন্মুখ। যত বেশি প্রমিনেণ্ট কভারেজ, তত দাম। ডোন্ট ওয়ারি। তোমাকেও কমিশন দেব। ছেলে দুটোকে মানুষ করতে গেলে কী আর দিনুভাইয়ের টাকায় চলে?"

“চলছে না তো। একটা ফ্ল্যাট কিনব ভাবছি। নার্সিং হোমের টপ ফ্লোরে কি সারা জীবন কাটিয়ে দেব? একদিন দিনুভাইয়ের চাহিদাও ফুরবে। তখন আমি কোথায়? কিন্তু কী ভাবে?”

“আমি তো সব জায়গায় গিয়ে এসব ডিল করতে পারি না। তুমি করবে। পেমেন্ট হাতে নিয়ে, তবে লেখা দিয়ে যাবে। আমি খবর ছাপিয়ে দেব। যে যত বেশি দেবে, তত প্রমিনেন্ট কভারেজ। হিসাব সাফ। গ্যারান্টি দিচ্ছি, কাগজের হেলথ কভারেজ তুমি ছাড়া আর কেউ পাবে না”

একদিকে নাম, অন্যদিকে টাকা। দুটোর লোভ থেকে ক’জন বাঁচতে পারে? বিদীপ্তার ক্ষমতা নেই, না বলার। নেমে পড়ল বিমানের ইন্সট্রাকশনে কাজে। বিমানদার ব্যাকিং-এ রেগুলার লেখা বেরনোর জন্য নিজের নামডাকও বাড়ছে। বাড়ছে ডাক্তারদের কাছে কদর। নিজেকে লাইমলাইটে আনার লোকের তো অভাব নেই। টাকা আসছে। লেখা বেরচ্ছে। কাঁচা টাকার আমদানিতে ফুলে ফেঁপে উঠছে বিমান বিদিপ্তা দুজনেই।

ক্ষমতা হাতে থাকলে সদব্যবহার না করা মানে, দুনিয়াদারির ভাষায় বোকামি। তিন তারকা, একজন চিত্র জগতের, দু-জন মিডিয়ার। জলের দামে বিশাল জমি কাম বাংলো হাসিল করল শান্তিনিকেতনে। দিগ্বিজয়ের সঙ্গে পদ্মপর্ণার ওঠাবসা। তারকা জগতের বাইরেই তো পদ্মপর্ণার আসল রোজগার, কলকাতার উপর মহলের বাবুদের থেকে। মিডিয়েটর দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য। সে কথা অন্দরমহলের অনেকেরই জানা। বিমানেরও অজানা নয়।

কী অঙ্কে ওরা দুজন বেরিয়ে গেল, আর ও ফেঁসে গেল, বুঝতে পারলেও, তখন আর কিছুই করার নেই। বুঝতে ভুল করেছিল রাজ নেওটিয়াকে। কোর্ট কেসে ফাঁসিয়ে দিল। ততক্ষণে সরকারবাবু সব জেনে গেছে। রাজের বন্ধু প্রদীপের সঙ্গে পদ্মপর্ণার সম্পর্কের কথা অজানা নয়। কাক কাকের মাংস খায় না। দুই ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বাদ কেন? কোন অঙ্কে পদ্মপর্ণা বেরিয়ে গেল, আজও জানে না বিমান। আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু ধুরন্ধর দিগ্বিজয়ের এমন কী জাদু, যে পদ্মপর্ণাকে দিয়ে তুরুপের তাস খেলে, সরকারবাবুর প্রিয় হয়ে গেল?

সব খবর জানতে পেরে, মনে মনে ভীষণ ক্ষুণ্ণ হলেও, পেয়ারের পাত্র বিমানের চাকরি খায়নি সরকারবাবু। পূর্বপুরুষের রক্ত তো বইছে শরীরে। ওদের মতো না হলেও, ব্যবসার কিছু তো বোঝে। নয় ভুল করেইছে। অন্তত আরেকবার তো সুযোগ দিয়ে দেখা যেতে পারে। মনিকান্ত বসুকে সরিয়ে, নতুন স্টেলার বড়বাজার চ্যানেলের দায়িত্ব ওর হাতে তুলে, দ্বিতীয় সুযোগ দিল।

“খবরটা রেডি হলে আমাকে জানিও। যত তাড়াতাড়ি স্কুপটা বার করা যায়” সৈকতদা মৃন্ময়কে মনে করিয়ে দিল।

“পাক্কা” মৃন্ময় তৎপর। আগের বারের মতো এবার আর চাকরিটা খোয়াতে চায় না।

সে সময়টা অন্ধকার।

‘হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া’-তে স্বনামধন্য প্লাস্টিক সার্জেন অমিত গাঙ্গুলির অবিচুয়ারি ছাপাতে অনুরোধ করেছিল অরিজিৎ বসু।

“অরিজিৎদা অবিচুয়ারি খায় না। খাওয়াতে হলে মাল খসাতে হবে” মৃন্ময় তখন মোটা টাকা কামাচ্ছে খবর ছাপিয়ে।

“উনি তো আমাদের সকলের মাস্টার। আমি আমার জন্য বলছি না। উনি কলকাতার প্লাস্টিক সার্জারির জনক। ওনার একটা অবিচুয়ারি বার করা যাবে না?”

“অরিজিৎদা, ওসব প্লাস্টিক সার্জেনের অবিচুয়ারি খায় না। সেলিব্রিটি খায়। সত্যি কথা বলতে গেলে তো মাল খসাতে হবে...”

সত্য বলতে গেলে চাঁদি ছুড়তে হবে!

অরিজিৎ থমকে গেল। এর নাম বুঝি মিডিয়া। সত্য-মিথ্যা বোঝে না। মাল ফেল, সত্যকে মিথ্যা করে দিতে পারে, মিথ্যাকে সত্য। সত্য মিথ্যা চাঁদির নিলামে। খালি অরিজিৎই কিনতে চায়নি তাকে কোটি টাকার দামে। উড়ন্ত ফানুসের জীবন্ত স্বপ্নে।

মৃন্ময় অজ্ঞ। স্বপ্নে ভাসা টাকার নিলামে। সেটাই কাল হল।

অরিজিৎ বসুকে বুঝতে পারেনি। যে-সে লোক নয় সে। নয় কোনও সংকীর্ণ কালের ভেসে থাকা সংক্ষিপ্ত সময়। সে ঠেকাতে সক্ষম আজকের রবের শব, নতুন বর্ণচ্ছটায়। সে ভাঙতে পারে ইতিহাস, প্রত্যয়ে, নিজ দুর্জয়, নিঃশব্দ রূঢ়তায়।‘হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া’-র কর্ণধার অমিত জৈনকে একটা প্রেমপত্র। নিজেও জানতে পারেনি, তাতে লেখা হয়ে গেল মৃন্ময়ের ছাড়পত্র। শেষ হয়ে গেল মৃন্ময়ের আলো-আঁধারির খেল। শেষ হয়ে গেল বিশ্বজিৎদার থেকে শেখা দুনম্বরি সুরের মেল।

সে অনেকদিন পরে। সৈকতদা সবে ধূর্জটি রায়ের হাত ধরে মৃতপ্রায় বাংলা টিভিকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। সৌগত দত্ত নিরুদ্দেশের পর, টিভি তখন ডুবন্ত অবস্থায়।

হঠাৎ মৃন্ময়ের ফোন “কী ব্যাপার?”

“চাকরি নেই। তুমি শুনলাম বাংলা টিভিতে সিইও হিসেবে জয়েন করেছ”

“হ্যাঁ। কিন্তু এখন তুই কোথায়?”

“ভারচুয়ালি রাস্তায়। সে এক লম্বা গপ্প। পরে বলব। এখন কোনও রোজগারপাতি নেই”

“আমার নতুন চ্যানেলে কাজ করতে চাস? এটা প্রিন্ট মিডিয়া নয় কিন্তু...”

“তাইতো ফোন করেছি। যা কিছু একটা দরকার। নইলে সংসার চলবে কী করে? বাড়িতে মায়ের জন্য চব্বিশ ঘণ্টার নার্স...”

“চলে আয়। ব্যবস্থা হয়ে যাবে”

কথায় আছে না, রতনে রতন চেনে। সৈকতেরও মৃন্ময়কে চিনে নিতে একটুও ভুল হয়নি।‘হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া’ না হোক। বাংলা টিভি সৈকতের মজলিসের গুলবাহার। সেই গুলদিস্তায় আরেকটি ফুলের সংযোজন, মৃন্ময় ঘোষ।

চায়ে চুমুক দিয়ে সৈকত বলল “বেশ জমিয়ে স্টোরিটা বানাতে হবে। যাতে বিবিপি-কে টেক্কা মেরে দেওয়া যায়”

“কিন্তু ধীমান মুখোপাধ্যায় তো ওদের লোক”

“সেটাই তো আসল খেল। শুধু মৃত্তিকা নয়, ধীমানের ব্যাকগ্রাউন্ডও খুঁটিয়ে সাজাতে হবে। এ তো প্রথম নয়, পাবলিসিটির জন্য মৃত্তিকা এর আগেও এমন অনেক কিছু করেছে”

“নিজের কব্জি কেটে ফেলা?”

“কতটা কেটেছে, সেটা তো খুঁজে বার করতে হবে। হয়ত চামড়ায় দুটো আঁচড় মেরে ড্রাম পেটাচ্ছে। এদের পক্ষে সবই সম্ভব। অনেকটা পলিটিকাল নেতাদের মতো”

“এর নাম সেলিব্রিটি”

“সেলিব্রিটি-ফেলিব্রিটি এসব রাখ তো। আমাদের স্টোরি বানাতে হবে। বিবিপি চ্যানেলের সঙ্গে টেক্কা মারতে হবে। ধীমানের স্টোরি মৃত্তিকার থেকেও বেশি খাবে”

কে ঠিক, কে ভুল, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, এসব নিয়ে সময় নষ্ট করার অবসর নেই ধূর্জটি রায়ের। পাত্তি চাই। রুগ্ন চ্যানেলকে টিকিয়ে রাখতে গেলে বিবিপিকে ধরাশায়ী করতে হবে। কম্পিটিশনের খেলায় এটাই সত্যি।

“টেনশন করো না সৈকতদা। সব ম্যানেজ করে নেব”

সৈকত উঠে পড়ল। মৃন্ময়কে যা বোঝানোর হয়ে গেছে। ধূর্জটি রায়ের বাংলা টিভির পাঙ্গার খেলা শুরু। ঠিকমত খেলতে পারলে হাই টিআরপি। খুস ধূর্জটি। খুস পড়ে থাকা স্টাফেরা। টানাপোড়েনে কম ঝাড় তো খায়নি।

কোথায় ছিল সৈকত আর ধূর্জটি রায়, যখন বাংলা টিভির অঙ্ক কষেছিল বিমানদা, সৌগত দত্ত ও মনু ঘোষের সঙ্গে? প্রখ্যাত সেকালের চিত্রতারকা কাম ফিল্ম ডিরেক্টর সুপর্ণা সেনকেও ছাতার তলায় আনতে সক্ষম বিমানদা।

শ্যামবাজারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টারের ছেলে ধূর্জটি রায় তো তখন স্কুটার নিয়ে ভাগ্য গড়ার জন্য লড়ে যাচ্ছে। পকেটে রেস্ত না থাকলেও বুদ্ধি তুখড়। ফিট মাস্টার জেনারেল। গ্যাঁটে মালকড়ি না থাকলে কী হবে, ইয়ারের বন্ধু তরুণ পাঁজার তো রেস্ত আছে।

মাল ওর, বুদ্ধি ধূর্জটির। খেলা শুরু। লোককে পটিয়ে কী করে ইনভেস্টমেন্ট জোগাড় করতে হয় ধীরে ধীরে সেই খেলাই রপ্ত করছে। ভেনচার ক্যাপিটালিস্ট জোগাড় করে কম্প্যানি বানাও। তাদের কিছু মুনাফা ধরিয়ে আরেকটা কম্প্যানিতে ইনভেস্ট করাও। সোজা কথা, মাছের তেলে মাছ ভাজ। মাছ কী করে ভাজতে হয়, ধূর্জটি ভালই জানে। নইলে কী শ্যামবাজার থেকে এই লেভেলে উঠে আসতে পারে? হতে পারে জালি। জালি হয়ে এন্টারপ্রেনিওর হতে গেলে তো জালি বুদ্ধিরও দরকার। সেখানে ধূর্জটি সিদ্ধহস্ত।

সৈকতকে এখন ঘরে বসে কয়েকটা ইম্পরট্যান্ট ফোন সেরে ফেলতে হবে। শুনেছে ধীমানের শ্বশুরের সঙ্গে রাজ নেওটিয়ার বন্ধুত্ব। রাজ যে সে লোক নয়। কলকাতার শিল্পপতিদের মধ্যে অন্যতম একজন। শেষে না বিমানদার মতো ফাঁসে। স্টোরি বানাতে গিয়ে ধূর্জটিকে না আবার অসুবিধায় ফেলে। ধূর্জটির অনেক কারবারই তো সোজা নয়। অনেকে না জানলেও, সৈকত তো কিছুটা জানে। ছিপ ফেলে, টোপ বিছিয়ে, ধূর্জটির অন্ধকার দুনিয়াকে হাতিয়ার করে ওর কাছ থেকে বাংলা টিভির সিইওর চাকরিটা হাতিয়েছে।

রাজ জানবে না, এ হতে পারে!

এতদিনে মিডিয়ার খেলাটা কিছু তো রপ্ত করেছে। পাবলিককে স্টোরি গিলিয়ে মুনাফা লুটে বেরিয়ে যাও। বাইরে যাই দেখাও না কেন, ওপর মহলে সংযোগ অটুট। সেই অঙ্কে যাতে গড়বড় না হয়। শেষে স্টোরি করতে গিয়ে বোলতার চাকে না ঢিল ছুড়ে ফেলে। বে-জায়গায় ঢিল পড়লে, ধূর্জটির বাংলা টিভি ডুবতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

সোজা রাজকে ফোন "সৈকত চ্যাটার্জি ফ্রম বাংলা টিভি"

"কেমন আছ সৈকত? সব ভালো তো?"

কলকাতায় বড় হওয়া আর পাঁচজন অবাঙালির মতো রাজও বাংলায় সড়গড়। যদিও লা মারটিনেয়ার স্কুল ও সেন্ট জেভিয়ারস কলেজের প্রাক্তনি, হারভারড বিজনেস স্কুল থেকেও ম্যানেজমেন্টে একটা ডিগ্রি আছে। অবাঙালি হলেও বাংলায় স্বচ্ছন্দ।

"আপনাদের আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে। একটু দরকারে ফোন করেছিলাম"

"কী?"

"ধীমান-মৃত্তিকার খবরটা নিশ্চয়ই শুনেছেন। এটাই লেটেস্ট হট স্কুপ। স্টোরি করছি। আপনার আপত্তি নেই তো?"

“আমার আপত্তি থাকবে কেন? তোমরা মিডিয়ার লোক। স্কুপ বেচেই তো তোমাদের টিকতে হবে” রাজ নির্লিপ্ত “তবে এমন কিছু প্রোজেক্ট কর না... বেশি নয়...”

“বিবিপি টিভি তো জমিয়ে খবরটা বাজারে ছাড়বে। এমন কিছু দিতে হবে, যা ওরা পারবে না”

“দেখ, ধীমানের শ্বশুর আমার অনেক দিনের বন্ধু। আমায় ফোন করেছিল। একটু চেপেই খবরটা... তুমি বুঝবে...”

“আপনি যা বলবেন...” রাজ বাড়াবাড়ি চাইছে না।

মনগড়া সাজানো গল্প বানাতে হবে। মিডিয়ায় এত বছর, ভালোই জানে মসলা দিয়ে কী ভাবে পরিবেশন করতে হয়। ফোনটা রেখে ভাবল, মৃন্ময় যা করছে করুক। তাকে অফিসে বসেই গল্প ফাঁদতে হবে। পরে টিম ফেরত এলে, ফিল্টার করে ঢুকিয়ে দিলেই হবে।

ধীমানকে প্রায়রিটি না দিয়ে মৃত্তিকাকেই বেশি করে তুলে ধরতে হবে। মৃত্তিকাও তো তাই চায়, পাবলিসিটি। এই মাগিগুলো রাতবেরাতে ফুর্তি করবে। নতুন নতুন অঘটন ঘটাবে। শুধু একটু কভারেজের আশায়... এদের লাইমলাইটে থাকার একটাই পথ।

সাত

“কাল সকাল আটটায় একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিও তো” মায়া ভট্টাচার্য একটু থেমে বলল “টয়োটা গাড়িটা”

“ঠিক আছে” মিনমিন করে শোভন উত্তর দিল।

কথা না বাড়িয়ে মায়া মোবাইলটা কেটে দিল। শোভন মুখটা বেজার করে ড্রাইভারকে ফোন করল। কিছুই করার নেই। দিতেই হবে। মায়ার স্বামী দিগ্বিজয় হিরোইন সাপ্লাই করছে ফুর্তি করার জন্য, এটুকু তো করতেই হবে। মালকড়ি না ছাড়লে, এরাই বা পাত্তা দেবে কেন? দিগ্বিজয় ক্যাশে। ওর বউ কাইন্ডে। দিগ্বিজয় ছাড়া কী দেওয়ালি, পদ্মপর্ণা, এদের ভোগ করতে পারত?

সুবিমল সকালের ফ্লাইটে চেন্নাই থেকে আসছে। ওকে এয়ারপোর্ট থেকে পিকআপ করে সারাদিন ওর সঙ্গে টোটো। বিকেলের ফ্লাইটেই চলে যাবে। শোভন থাকতে নিজের পেট্রল পোড়াতে যাবে কেন?

“এবার অনেকদিন পর এলে”

“হ্যাঁ দিদি। কলকাতায় আর আসাই হয় না”

“খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। যাওয়ার পথে নভটেলে ব্রেকফাস্টটা সেরে নেব” উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল।

ছেলেটা ওদের জন্য কত করে। একদিন নয় ভালোমন্দ খাওয়াল। সুবিমলদের মতো ভারতের সব বড় শহরে কিছু ছেলে আছে বলেই তো আজ দিগ্বিজয়ের এত রমরমা।

ব্রেকফাস্ট টেবলে জিজ্ঞেস করল “নতুন মুর্গি উঠল?”

“উঠবে না? ছিপ তো সবসময়ই ফেলে বসে আছি। চাড় ছড়িয়েও যাচ্ছি। এই শালা থাকতে চাড় গিলবে না, এ কখনো হয়? এবার কমিশানটা বাড়াও দিদি। দিনকাল যা পড়েছে। জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। পুরনো রেটে আর চলছে না”

“সে নয় হবে। দাদার সঙ্গে কথা বলে নিই”

“নয় ওদের রেট বাড়িয়ে দিচ্ছি। তোমরা তো সব মালদার লোক নিয়ে ডিল করো। আরেকটু বেশি দিতে ওদের আপত্তি হওয়ার কথা নয়”

দক্ষিণের হিরোইনরা অনেক হট। কলকাতারগুলোর থেকে ওদের ডিমান্ড অনেক বেশি। কলকাতার মালদার এলিটরা ওদেরই বেশি পছন্দ করে। নো হ্যাসেলস। স্ক্যামের কোনও ব্যাপার নেই। উইকেন্ডে ফ্লাই

করে আসবে। দু-রাত্রি আনন্দ-ফুর্তি করে মাল কামিয়ে শুটিং-এ ফিরে যাবে। দে আর মোর ইরটিক দ্যন ইভেন দ্য বেস্ট হিরোইনস ইন টাউন। অ্যাবসলিউটলি গরজিয়াস ইন বেড। দে নো হাউ টু স্যাটিসফাই মেন।

বাইরে মায়ার পরিচয় ভাষ্যকার, আবৃত্তিকার হলেও এর থেকেই আসল ইনকাম। টাকা না ফেললে কী প্রদীপ প্রকাশনীর প্রদীপ মণ্ডল দিগ্বিজয়ের বই ছাপাবে? সে দিগ্বিজয়ের যত কন্ট্যাক্ট থাকুক না কেন। ঘুঘু লোক প্রদীপ মণ্ডল। বই আর পাবলিসিটির খরচ ঠিক তুলে নিতে জানে। কখনো কী ভেবেছিল, মডার্ন হাই স্কুলের মেয়ে এভাবে কামাবে?

দিগ্বিজয় যখন বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে পাস করে সেন্ট জেভিয়ারসে পড়ে, তখনও মায়ার সঙ্গে আলাপ হয়নি। চব্বিশ বছর বয়সে চাকরি সূত্রেই আলাপ। দূরদর্শনে আর্কাইভ ঘাঁটতে এসে মায়ার মুখোমুখি।

"আর্কাইভ সেকশনটা কোনদিকে বলতে পারেন?"

মায়া সবে সকাল নটার নিউজ পড়া শেষ করে ক্যন্টিনের দিকে যাচ্ছে। আঙুল নেড়ে বলল "ওই দিকে"

স্বল্প পরিচয়। তারপর বেশ কয়েকবার এসেছে। তখন ছন্দাদি বাংলা নিউজ পড়ে। হুকুম ছিল, বিল্ডিং ছেড়ে না যাওয়ার। ভাস্বতীদি আর বৈশালীদি কামাই করলে বা দেরি করলে, মায়ার ডাক পড়ত। হাতে অফুরন্ত সময়। উঠতি বয়স। বিল্ডিং-এ বয়স্কদের মাঝে হাঁপিয়ে উঠত।

নিজে থেকেই দিগ্বিজয়ের সঙ্গে আলাপ জমাল। হ্যান্ডসাম ছেলে। টাইম পাস করলে মন্দ কী! প্রেসিডেন্সিতে পড়াকালীন কোনও ছেলের সঙ্গে তেমন ইয়ে হয়নি। দিগ্বিজয়ের স্পর্শে ভাবটা আরও গাঢ়। পরে প্রেম থেকে বিয়ে। মাইনে তেমন নয়। যেনতেন প্রকারে টাকা করার নেশা চেপে বসল।

কলকাতার আকাশে টাকা উড়ছে। খালি ধরতে জানা চাই।

"দিদি তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না"

"এমনিতেই যা মুটিয়েছি এবার খাওয়া কন্ট্রোল না করলে নড়তে-চড়তে পারব না" মায়া চায়ে চুমুক দিল।

"আজকের প্রোগ্রামটা কী?"

"আমার একটা নতুন আবৃত্তির সিডি বার করার কথা হচ্ছে। ভাসান অডিও থেকে। ওখানে যাব। মালকিনকে কনভিন্স করতে হবে সাউথ ইন্ডিয়ার বাঙালিদের মধ্যে তুমি একটা অ্যাসিওরড সেল দিতে পারবে। কী ভাবে কনভিন্স করবে, সেটা তোমার ব্যাপার"

"এনিথিং ফর ইউ, মাই সুইট দিদি। রিল্যক্স। আমার ওপর ছেড়ে দাও"

ভাসান অডিওর অফিসে ঢুকতে গিয়েই ঋষিকা ও দুর্জয় প্রসাদের সঙ্গে দেখা। মায়া একগাল হেসে জিজ্ঞেস করল "নতুন সিডি বেরচ্ছে নাকি?"

"হ্যাঁ ওই একটা বেরচ্ছে" ঋষিকা হেসে জবাব দিল।

"কীসের?"

"আমার পঞ্চকবির গান। সঙ্গে দুর্জয়ের ভাষ্যপাঠ। তোমার?"

"একটা আবৃত্তির সিডি বার করার কথা চলছে। এখনও ফাইন্যালাইজড হয়নি"

মায়া বেশি কিছু বলল না। সেই দুর্জয় ছেলেটা আসার পর থেকে তার কম্পেয়ারিং-এর কাজে ভাগ বসিয়েছে। লেডিস মার্কা ছেলেটাকে সহ্য করতে পারে না। মুখে মধু ঝরছে। তলে তলে নিঃশব্দে গুছিয়ে নিতে ওস্তাদ। সবার সঙ্গে লাইন ফিট করে রেগুলার প্রোগ্রাম করে যাচ্ছে। অবশ্য এখন আগের মতো বাজার নেই। চিট ফান্ডের স্ক্যামের পর স্পন্সর অনেক কমে গেছে। এমনিতেই বাজার মন্দা। সেখানেও যদি ভাগাভাগি করে নিতে হয়, মায়া যাবে কোথায়?

কথা না বাড়িয়ে সুবিমলকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

বিয়েটা যখন ভেঙে গেল তখন গানের দিকেই মনোনিবেশ করেছিল। বুড়োটার কাছেই দিনরাত পড়ে থাকত। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন অবশ্য বুড়ো ছিল না। রীতিমত হ্যান্ডসাম সুপুরুষ। দ্বিতীয় বিয়ের বন্ধন কাটিয়ে মুক্ত। অ্যাকাউন্টেসি নিয়ে প্রাথমিক জীবন শুরু করলেও, হিসেবের খাতা নিয়ে পড়ে থাকতে মন চায়নি। না পড়াশোনায়, না সংসারে। মুক্তিই বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র। নাটকের গান প্রাণ যন্ত্র। ডাঃ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের গানের দিকপাল।

সে কবেকার কথা। মাঝে কতগুলো বছর পার হয়ে গেল। কত স্রোত অজানা বাঁক নিল। তবুও এখনও ওরা স্বামী-স্ত্রী।

বেরতে গিয়ে মোবাইলটা বেজে উঠল। সিএলআই-তে নামটা দেখে ঋষিকা দুর্জয়ের থেকে সরে গেল।

"আসছ তো?"

"হ্যাঁ, কাজ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাব"

"ফেরার সময়, লাঞ্চের জন্য চাইনিজ কিনে এনেছি"

"গিয়ে কথা হবে"

দুর্জয়কে রূপজিৎ সম্বন্ধে জানাতে দিতে চায় না। গসিপে ওর জুরি নেই। ঋষিকার প্রাইভেট লাইফ যদি বাজারে গিয়ে পড়ে টক অফ দ্য টাউন হতে কতক্ষণ! সেলিব্রিটি হওয়ার বিড়ম্বনা কী কম। সব সময় গা বাঁচিয়ে একটা ইমেজ প্রোজেক্ট করে যাও। দৈনন্দিন পেজ থ্রির হেডলাইন্স হলেও, স্ক্যাম ফাঁস হয়ে গেলেই

লিড নিউজ। মিডিয়ার সঙ্গে যতই দহরম-মহরম থাক না কেন, স্কুপ পেলে সব ভুলে ওটার পেছনেই ছুটবে। এর নাম মিডিয়া! বন্ধু বা শত্রু কিছুই বোঝে না। গপ্পো বিক্রি করলেই কাটতি। পাবলিক খায়।

"শেষ পর্যন্ত পুরো টাকা দেবে তো?" ঋষিকা তখনও সন্দিহান।

"ঋষিদি তোমায় তো আগেই বলেছি, ওরা দেবে। না হলে, ওদের পাবলিসিটির দৌড়ে জল ঢালতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। ভুলে যেও না আমরা এখন সেলিব্রিটি। আমাদের বিক্রি করেই ওদের মুনাফা" ধূর্ত দুর্জয় খেলাটাকে রপ্ত করেছে।

"কিছু অ্যাডভানস দিয়েছে, তোর পেড়াপেড়িতে। তবে পুরোটা না দিলে তো প্রোডাকশন আটকে যাবে। মার্কেটে সিডির যা বাজার, টাকা না পেলে ভাসান কিছুই করবে না। দেখলে তো, কী ভাবে রাইম মিউজিক ডুবল"

"রাইমের ব্যাপারটা আলাদা। পড়ন্ত ইন্ডাস্ট্রিতে সুনীলদা এত স্পন্সরশিপ দিয়ে ফেলেছিল, আজ না হলে কাল ডুবতই। এখানে তো লাইফ বোট সব সময়ই আছে"

"সে আবার কে?" ঋষিকা দুর্জয়ের দিকে তাকাল।

"কেন তোমার শোভন রায়চৌধুরি। একটু পাবলিসিটির জন্য টাকা লোটাতে সব সময়ই প্রস্তুত। তুমি একটু ইনিয়ে-বিনিয়ে বললেই দিয়ে দেবে"

"শোভনদা দিলদরিয়া লোক। সব সময় কী চাওয়া যায়? না... না... না... আমি শোভনদার কাছে চাইতে পারব না। তুমি বরং তোমার স্পন্সরের কাছ থেকে ম্যানেজ কর" গাড়িতে উঠে বলল "তুমি কোথায় যাবে?"

"গলফ গ্রিনে, রূপঙ্করদার বাড়িতে। আইসিসিআর-এর প্রোগ্রামটার স্ক্রিপ্ট ফাইনালাইজ করে নিতে। তুমি?"

"আমার একটু কাজ আছে। তোমায় গলফ গ্রিনে নামিয়ে..."

"লর্ডস বেকারির সামনে নামালেই হবে। ওখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেব"

সাউথ সিটির দু-কামরার ফ্ল্যাটে ঢুকে রূপজিতের কথার জবাব না দিয়ে, শাড়ি আর হ্যান্ড ব্যাগটা সোফার ওপর ছুঁড়ে দিল। বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে ঋষিকা বলল "উফঃ যা গরম না। একবার স্নান করে নিই। বাথরুমে তোয়ালে আছে তো?"

"হ্যাঁ, আজই ফ্রেস তোয়ালে রেখেছি"

রূপজিৎ ঋষিকার ব্রায়ের ফাঁক দিয়ে উপচে পড়া স্তনের দিকে তাকিয়ে... যতক্ষণ না বাথরুমের দরজার ওপারে হারিয়ে গেল... এই স্তন কতবার দেখেছে, হাতে নিয়ে খেলেছে। তবু যেন আশ মেটে না। বারবার

চোখটা ওখানেই ঘোরাফেরা করে। ঋষিদি বয়স বারার সঙ্গে একটু মুটিয়েছে। থুড়ি... মুটিয়েছে কথাটা ভালো লাগে না। বরং ভরাট হয়েছে, কামনা জাগায়। এটাই তো যোগসূত্র।

"ওয়ারড্রব থেকে নাইটিটা দাও না রূপ" বাথরুমের দরজা ফাঁক, আবদার ঝরে পড়ল।

তোয়ালে মোড়া দেহটার দিকে এক পলক তাকিয়ে ওয়ারড্রবের দিকে। শ্যামলা শরীরটা বাথরুমের জানলার ফাঁক দিয়ে দুপুরের প্রখর আলোয় ঝলমল করছে। ওটাই রূপকে চুম্বকের মতো টানে।

যেমন টেনেছিল প্রথম আলাপে। কলামন্দিরে ঋষিদির একক আসরে মিডিয়া কভারেজ করতে গিয়ে। গ্রিনরুমে প্রথম দেখাতেই আকৃষ্ট হয়েছিল রূপজিৎ।

ঋষিকা রূপজিতের দিকে ঢলতে আঁচলটা অভ্যাসবশত সরে গেল। কিছুটা সময় দিয়ে ঠিক করে বলল "একটু ভালো করে লিখ। বেশ বড় করে, ছবি দিয়ে..."

"চেষ্টা করব। তবে জানেন তো সব কিছুই এডিটরের ওপর"

"একটু বলে দিও না। তুমি বললে, না করতে পারবে না"

ঢেকে যাওয়া ক্লিভেজে চোরাচোখে তাকিয়ে রূপজিৎ বলল "পরে তোমাকে নিয়ে একটা ফুল পেজ কভার স্টোরি করব"

দৃষ্টিটা এনজয় করল ঋষিকা। অভিজিৎ ঋষিকার কোনও একক প্রোগ্রামে আসে না। হয়ত কমপ্লেক্স।

"কবে তোমার সময় হবে ঋষিকাদি? একটু সময় নিয়ে ভালো করে স্টোরিটা করতে হবে..."

"যবে তুমি বলবে" ঋষিকার তখন অত কাজ নেই।

"তাহলে তোমার বাড়িতে একদিন চলে যাব"

"না... না... আমার বাড়িতে নয়। অভিজিৎ পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ওর ডিস্টার্ব হবে"

"তোমার অসুবিধা না থাকলে, আমার বাড়িতে চলে আসতে পার। আমি একাই থাকি। ওখানে ডিস্টার্ব করার কেউ নেই"

"কোথায়?"

"সাউথ সিটি"

সেই প্রথম সাউথ সিটির ফ্ল্যাটে পদার্পণ। তারপর কত দুপুর যে অপরাহ্নে গড়িয়েছে। কিন্তু সেই দুপুরের সুখস্মৃতি অন্তরালে থেকে গেছে। যে কাহিনি সকালের ট্যাবলয়েড বা খবরের কেন্দ্রবিন্দু। তার নেপথ্যে আরেক হিসেবের দুনিয়া।

অবশ্য রূপজিতের সঙ্গে সম্পর্কটা শুধু হিসেবের নয়। কিছুটা চাহিদাও বটে। অভিজিৎ বুড়ো হলে কী হবে, ঋষি তো এখনও সতেজ। তার তো সাধ-আহ্লাদ আছে।

হাউসকোটটা পেঁচিয়ে ভেজা চুল মেলে ডাইনিং টেবলে বসে বলল "এসিটা আরও বাড়িয়ে দাও। প্রচণ্ড গরম"

চাইনিজ লাঞ্চ টেবলে বিছিয়ে রূপজিৎ বলল "তোমার গরম একটু বেশি। খেয়ে নাও। সব গরমের সমাধান হয়ে যাবে"

কী আদরই না করতে পারে রূপজিৎ। আহাঃ, এমন আদর যদি অভিজিৎ করত! ঠোঁটে বুকে চুমু খেয়ে নাভির কাছে নামতেই ঋষিকার সুড়সুড়ি লাগতে শুরু করল "আহঃ... আস্তে... আস্তে..."

আস্তে আস্তে বুক থেকে মুখটা ভগাঙ্কুর স্পর্শ করতেই আনন্দে আবেগে শিউরে উঠল। ফুল এসির মধ্যেও উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়ছে। খেলুক। আর একটু... তারপর...

রূপজিতের রোমশ বুকে মুখ ডুবিয়ে, শিথিল চুম্বনে জাগিয়ে তুলছে ওর হাফ ব্যানার স্ফুলিঙ্গকে। যার নিষ্ক্রমণ ভিন্ন নিস্তার নেই ওর। নিজেরও... শখ। আনন্দ। তৃপ্তি। রিচুয়াল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না। ঘুম ভাঙল মোবাইলের আওয়াজে... "ঋষিকা বন্দ্যোপাধ্যায়?"

"হ্যাঁ"

"বেলভিউ থেকে বলছি। আপনার স্বামী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আইসিইউ-তে ভর্তি"

"কেন? কী হয়েছে?" উঠে বসল।

"চিন্তার কারণ নেই। মাইল্ড অ্যাটাক। হি ইজ ফাইন নাউ"

"এখনই আসছি"

শাড়িটা পেঁচিয়ে বেরতে গিয়ে খেয়াল হল, লিপস্টিক লাগায়নি। ওটা না লাগালে যে...

রূপজিতের সঙ্গে কিংবা অন্য কারও সঙ্গে যতই খেলুক না কেন, সে অভিজিতের স্ত্রী। অগ্নিদেবের মা। তার সামাজিক পরিচয় সেটাই। আর পাঁচটা সেলিব্রিটির মতো সেটুকু ভাঙতে চায় না। যতই বুড়ো হোক না কেন, অজান্তে মুক্ত অভিজিৎ আজও কোথায় হালটা ধরে রেখেছে। তার পাশে দাঁড়ানোটাই এখন দরকার।

আট

“সো বোল্ড?” দেওয়ালি পরিচালক বসুন্ধরার দিকে তাকাল।

“আই অলরেডি টোল্ড ইউ দিস মুভি ইনভলভস হট সিকোয়েন্সেস”

“অফ কোর্স ইউ মেনশন্ড। ওয়াজন্ট আওয়ার, ইট উড বি সো এক্সপ্লিসিট। বেঙ্গলি মুভিস আর নট দ্যাট বোল্ড”

“ডোন্ট ফরগেট আই অ্যাম ফ্রম শ্রীলঙ্কা। তামিল মুভিজ আর মোর ইরটিক দ্যান ইওর বেঙ্গলি ফ্লিক্স”

বলেছিল বটে। কনট্র্যাক্টেও লেখা আছে। দেওয়ালি ঠিক মাত্রাটা আঁচ করতে পারেনি। স্ক্রিপ্টের চার্ম আর অভিনয় প্রতিভার সুযোগ আছে বলেই, দেওয়ালি অফারটা নিয়েছিল। স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী কিছু সেন্সুয়াল সিন করার কথাও বসুন্ধরা আগেভাগেই বলেছে। টিকে থাকতে গেলে প্রিহিস্টরিক বাঙালিয়ানার মিডিওক্র্যাটিক ট্যাবুগুলো ঝেড়ে ফেলতে হবেই। সাধের সাইন্স ছেড়ে যখন সিলভার স্ক্রিনে নেমেছে, পড়াশোনার মতোই এখানেও তাকে সেরা হতে হবে। সে পথে যদি নিজের ইনহিবিশনস ছাড়তে হয়, আপত্তি কী! শোনা যেত, হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো। আজ বাঙালি প্রগতির চিন্তাকে বাদ দিয়েছে। শুধু ভাবছে। তাই লোকে বলে হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া ফরগট ইয়েস্টারডে।

“বাট ইজন্ট দ্যাট এ বিট টু বোল্ড?” দেওয়ালির দ্বিধা।

“নট ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট ফরম স্টোরি লাইন। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেক এ মুভি অফ টুয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি উইথ মাইন্ডসেট অফ ফরটিস। অল আর ম্যাচিওর অ্যাডাল্টস। ইফ দে হ্যাভ নট গ্রোন আপ, ইটস টাইম টু ডু সো”

চিন্তাধারার পরিবর্তন জরুরি, সেটা অনেকের মতো দেওয়ালিও মানে। যেখানে সারা পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, সেখানে দেওয়ালিই বা পিছিয়ে পড়ে থাকবে কেন? আগামী দিনের বুনিয়াদ না হয় দেওয়ালি আর বসুন্ধরার হাত ধরেই শুরু হোক। পর্দাটা এবার উঠে যাক। আড়ালে নয়, খেলা বাইরেই।

“ইভেন ইফ আই এগ্রি, হু উইল বি দেয়ার ডিওরিং দ্য শট?”

“ঋতব্রত, ইউ, মি অ্যান্ড হ্যান্ডফুল অফ ক্রু”

টেকনিশিয়ান স্টুডিওর মেক আপ রুমে দেওয়ালি ভাবার চেষ্টা করল। পার্ট অফ দ্য ব্রেস্ট আগেও, সময় বিশেষে দেখিয়েছে। কিছু বিকিনি শটস যে দেয়নি, এমনও নয়। তবে আড়াল রেখে।

কমপ্লিট ন্যুডিটি। সঙ্গে কানিলিঙ্গাস!

ভাবতেই প্রথমে গা-টা কেমন রি রি করে উঠল। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। দেওয়ালিও ব্যতিক্রম নয়। খাওয়ার পরে টেনশনে বেশ কয়েকটা সিগারেট খেয়ে ফেলল। ভেতরে চাপা উত্তেজনা। একদিকে এতদিনের সাবেক মূল্যবোধ। অন্যদিকে তাকেই ভেঙে চুরমার করে বেরিয়ে যাওয়ার অদম্য স্পৃহা। দুয়ের টানাপড়েনে দেওয়ালি বিধ্বস্ত। এক তৃতীয় অনুষঙ্গ হাজির।

চিন্তার ঘূর্ণিপাকেই দরজায় টোকা "মে আই?"

দরজা খুলতেই বসুন্ধরা ঘরে ঢুকল।

"ওয়াস গিভিং ইউ টাইম টু রিল্যাক্স। উই উইল শুট লেট ইভিনিং। আই নো ইট মাস্ট বি এ বিট অফ মেন্টাল এক্সারসাইজ ফর ইউ টু প্রিপেয়ার ইওরসেলফ। নো মোর শটস টুডে একসেপ্ট দ্য ক্রুসিয়াল ওয়ান লেইট ইভিনিং। প্রিপেয়ার ইওরসেলফ"

বসুন্ধরা বেরিয়ে যাচ্ছিল। দেওয়ালি বলল "হাউ মাচ আর ইউ গোয়িং টু শো?"

"অ্যাস মাচ অ্যাজ ইট ইজ প্লিজিং। লিভ ইট টু মি। আই নো হোয়াট ইজ বেস্ট"

ধোঁয়াশায় রেখে গেল। বুঝতেই পারেনি, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল ঘর অন্ধকার। চায়ে চুমুক দিতেই অন্ধকারের বুক চিরে সব কিছুই স্বচ্ছ, পরিষ্কার।

অতীত পেছনে।

কার্নিশ পেরিয়ে মেঘের ফাঁক থেকে চাঁদ ক্রমশ স্পষ্ট। আবরণটা যেন হঠাৎ খসে গেছে। এখন সে মোহময়ী। নগ্ন, অপরূপা ক্যামেরায়। অলঙ্কারে, ভূষণে, নিজস্বতায়। অন্ধকারের আস্তিন সরিয়ে নগ্ন অবয়বটা ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বল করছে। চাঁদের একফালি রশ্মি সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তাকে। সহজ অপরূপ আভরণে। সি উইল গিভ হার বেস্ট শট টুডে।

স্টার থেকে চরিত্রাভিনেতায় রূপান্তর ঘটছে। মনকে কামাতুর নারীর বেশে সাজাচ্ছে। প্যানটির মধ্যে হাত। নিজেকে নিয়ে খেলা শুরু করল। ক্লাইম্যাক্সের আগের মুহূর্তে সামলে নিল। তোলা থাক শটের জন্য। ফাইন্যাল অরগ্যজমটা ন্যাচারাল হবে। তাই হল।

ঋতব্রতর জড়তা ছিল। কিন্তু তার মধ্যে কামতুর নারীর পূর্ণ দৈহিক চাওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেখানে ঋতব্রত গৌণ। জাস্ট ইন ফ্রেম। ফার্স্ট টেকেই ওকে।

"ব্রিলিয়েন্ট! ইউ ওয়ার জাস্ট ফ্যাবুলাস" বসুন্ধরার প্রশংসা। ভাবেনি প্রথম টেকে দেওয়ালি এত ভালো শট দেবে।

'কোঁড়ক' নামে বাংলায় ছবিটা মুক্তি পেলেও, 'বারজিওন' নামে ইংরেজি ভার্সনটা ইন্টারন্যশনল লেভেলে সাড়া ফেলে। কান, টোরন্ট থেকে প্যাসিফিক মেরিডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে হইচই। ভারতেও কানিলিঙ্গাস

দৃশ্য নিয়ে শোরগোল।

দেওয়ালি রাতারাতি ন্যাশনাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল। কন্ট্রভারসি থাকলেই বা কী! কার জীবনে নেই? কান-এ রেড কারপেটের ওপর হাঁটর সময় মনে হচ্ছিল, ডিসিশনটা ঠিক।

দেওয়ালি সবসময়ই ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছে। পড়া ছেড়ে অভিনয়ের জগতে আসা। বোল্ড সিন। সে স্বতন্ত্র। বুঝতে পারছে, এটাই তাকে ক্রমশ খ্যাতির শিখরে তুলছে।

এই ইন্ডাস্ট্রিতে দেওয়ালি এক স্ট্রেঞ্জ কম্বিনেশন... ব্রেন, বিউটি, সেন্সুয়ালিটি, কোয়ালিটি। স্বপ্নটা আকাশচুম্বী। বজ্ঞান পড়া মন শিখিয়েছে কতখানি ছুঁতে পারবে। শুধু চেষ্টা করতে হবে।

সবে দেশে ফিরেছে। ফুরসত পাওয়ার আগেই মুম্বাই থেকে ফোন "ম্যায় দিনেশ ভাট বোল রহা হু। প্রডিউসার দিনেশ ভাট। মেরা ফিল্ম মে কাম করোগি?"

অবকাশ নেই সাফল্য নিয়ে মৌজ করার। সে কথা পরে ভাবা যাবে, এখন বৃহত্তর পৃথিবীর ডাক। সেই ডাকে সারা দেওয়া অনেক বেশি জরুরি।

"জরুর। লেকিন স্টোরি লাইন কেয়া? ম্যায় নিভা পাউঙ্গি কেয়া, ইয়ে ভি তো জাননা জরুরি"

"কব আ সকোগে মুম্বাই?"

"যব আপ চাহে"

"দিস উইক..."

"আজহি তো কান সে লটা। উইকেন্ড..."

"চলে আও মেরা অন্ধেরি অফিস পর। উধারই বাতচিত কর লেঙ্গে। স্টোরি ভি শুন লেনা। ইস ফিল্ম মে তুমহি হিরোইন, আগর ঠিক লগে তো..."

"কিউ নেহি। ম্যায় নিভাউ পাউঙ্গি কেয়া ইয়ে ভি জাননা হ্যায়। পহচ জাউঙ্গা মর্নিং ফ্লাইট মে..."

"অপনে পতা এস এম এস কর দেতি হু। মুম্বাই মে ঠহরনে কা ভি বন্দবস্ত হো জায়েগা"

প্রথা ভাঙার যেমন রিস্ক আছে, লেগে গেলে মার্কেট অনিবার্য।'কোঁড়ক'-এর সাফল্য টলিউডের জরাজীর্ণ স্টুডিও থেকে বলিউডের দোরগোড়ায় এনেছে।

সেটা কি প্রথা ভাঙার ঔদ্ধত্য? নাকি নিজস্বতা?

বোধহয় ভবিতব্য। দেওয়ালি অত জানে না।

শুধু যে পথ আহ্বান করছে, তাকে বরণ করে নিতে জানে। ভালোমন্দয় মিশিয়ে ভবিতব্যকে মেনে নেওয়াই কর্তব্য। সাফল্যের চাবিকাঠি। রূঢ় দিশাহীন বাস্তবের ঠিকানা।

অন্ধেরি ওয়েস্ট। ভি আই পি প্লাজা। দিনেশ স্ক্রিপ্ট শোনাল।

“লেট মি বি হনেস্ট। দিস ইজ এ ইরটিক থ্রিলার। দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টর মালভিয়া ইন অ্যান অপারেশন উইথ হার ফ্রেন্ড রিকি এগেনস্ট অ্যান অফ বিজনেস টাইকুন্স, ফলস ইন্টু এ লাভ-হেট রিলেশনশিপ উইথ উইথ ধ্যানরাজ, ফলস ইন লাভ উইথ হিম, গেটস ডিচড, টেকস রিভেঞ্জ। দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার ইজ অফ কোর্স ইউ। আই মিন মালভিয়া ইন দ্য স্টোরি। ডস দ্যাট সাউন্ড ইন্টারেস্টিং?”

“আই উড লাভ টু প্লে মালভিয়া। বাট আই নিড টু হিয়ার দ্য হোল স্ক্রিপ্ট টু গিভ ইট এ সেপ অ্যাস পার ইওর প্রেজাম্পশন”

“অফ কোর্স। উঁই ক্যান গো থ্রু ইট ওভার এ ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ডিনার”

“ইওরস অর মাইন?”

“মাইন, বি মাই গেস্ট ফর টুনাইট। আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ মাই ওয়াইফ ইজ অ্যান এক্সিলেন্ট কুক”

দিনেশের ‘ওডিয়াম’ ছবিটা শুধু হিট-ই করেনি, ইন্ডিয়াতে দেড়শো কোটি টাকার ব্যাবসা করেছিল। আর ফিরে তাকাতে হয়নি দেওয়ালিকে।

অনেক দিনের স্বপ্নটা রূপ নিচ্ছে। নতুন অবয়বে সাজছে। নতুন ছন্দে। ছোট্ট কুঠুরি ভেঙে দিচ্ছে ঝড়ের দাপটে। আগল ভেঙে ছুটতে মত্ত সুদূর আঙিনায়। স্বপ্নটা রূপে, ছন্দে, মহিমায়। একান্ত আপন।

‘কোঁড়ক’ আর ‘ওডিয়াম’ সাফল্যের তুঙ্গে পৌঁছলেও দেওয়ালির মনে হয়, এখনও কিছু বাকি। যার কাছে এসব তুচ্ছ। যা তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আজও সেই সাফল্য খুঁজছে। একলা রাতে, ঘুমে জাগরণে, উন্মাদনাহীন, একা, নিজ চেতনায়।

“বালি ট্রিপের জন্য রেডি তো?” দিগ্বিজয়ের ফোনে বাস্তবে ফিরে এল। ওদের সঙ্গে চেতনার বিস্তর ফারাক থাকলেও, ওরাই তো কাণ্ডারি। ওরা শুধু বুক ছুঁতে চায়। ক্লিভেজ থেকে নিপলেই আটকে আছে। আর কিছু দেখার বুদ্ধিও নেই, ক্ষমতা তো নে-ই। প্রথা ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার পথও চেনে না। জানতেও চায়নি। শেখেইনি। খেলছে, সংকীর্ণ অবয়বে।

“হ্যাঁ। সব ঠিক আছে। শোভন এক্সট্রা ভরতুকি দেবে তো?”

“আগেই তো বলেছি, তোমার লস পুষিয়ে দেব। বারবার এক কথা কেন...”

“হাতে টাকা না পাওয়া পর্যন্ত ভরসা নেই”

“বেশ। পুরো টাকাটাই আগেভাগে পৌঁছে দেব। হবে তো?”

“কাল? আমি পরশু মুম্বাই যাচ্ছি”

“জো হুকুম। কালকেই”

দিগ্বিজয় বুঝতে পারছে আজ ওকে এই দামে কিনলেও, কালকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। বোধহয় পাঁচ-দশগুণ হয়ে যাবে। খ্যাতির সঙ্গেই মানুষের দামও যে বাড়ে, আর পাঁচজনের মতো সে-ও বোঝে।

দেওয়ালিও। পৌঁছতে চায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অ-লিখিত সাম্রাজ্যের রানি হবে। শোভন কিংবা দিগ্বিজয়ের আলিঙ্গনে স্যান্ডউইচ হওয়ার মধ্যে নয়। এমন দিন কী কখনও আসবে? ভাবতেই শিউরে উঠল। যে বুকের ছোঁয়া চেয়ে হাজার মানুষ অগুনতি চাঁদি ফেলছে, শোভন দিগ্বিজয়ের মতো কেউকেটারা অ্যাডভানস ঢালছে, সেই বুকের বাহ্যিক দাম বুঝলেও, ভেতরের মর্ম তাদের কাছে অধরা। স্বপ্ন তখনই সত্যি হয়, যখন তাকে দেখা যায় একা, ঘুমভাঙা নিভৃত অন্ধকারে।

সেই আলোর পিপাসায় ছুটছে দেওয়ালি। এই চেনা-পরিচিত সকলকে ফেলে, অন্ধকার থেকে...

নয়

চিঠিটা নিয়ে থমকে বসে দেবাশিস। এ-ও সম্ভব?

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হুঁশ হল, দুনিয়াতে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। ক্ষমতা মানুষকে যে কোনও মুহূর্তে অহংকারী করে তুলতে পারে। না হলে, তার বহুদিনের বন্ধু অমর্ত্যর কাছ থেকে এরকম একটা জ্বালা ধরানো চিঠি!

অমর্ত্য কবেকার বন্ধু। সেই ১৯৯২ সাল থেকে। যখন দুজনেই সুকৃষ্টি থিয়েটার গ্রুপে একসঙ্গে কাজ করত। অমর্ত্য ছিল সাউন্ড অপারেটার। কলেজে বাংলার প্রফেসার। ১৯৯৫ সালে নিজের গ্রুপ মৃদঙ্গম স্থাপন করে থিয়েটার দুনিয়ার কাণ্ডারি হয়ে গেল। অমর্ত্য তার প্রথম নাটক 'বিলীন' লিখে পাকাপাকি জায়গা করে নিল নাট্য রচনার জগতে। পরে পরিমল সেন ও কিশোরী পুরস্কার লাভ করে নিজের রচনাশৈলীকে আরও বৃহত্তর পরিবেশে নিয়ে যেতে পেরেছে। নাট্য নির্দেশনায় দেবাশিসের নামডাক হয়েছে।

দুজনেই কাণ্ডারি। নাট্য জগতের পরিচিত নাম।

"আমার ছুটি হয়ে গেল" গম্ভীরভাবে অমিয় সেনকে ফোনে খবরটা দিল।

"মানে?" অবাক অমিয়।

"মানে আবার কী? পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমি থেকে অমর্ত্য ছুটি দিয়ে দিল।

ওদের মধ্যে চাপা মনান্তরের কথা অমিয়র জানা। নাট্য দুনিয়ায় থাকলে গুঞ্জন কানে আসে। অমিয়ই বা বাদ কেন? মতাদর্শে দুজনে বিপরীত অভিমুখে সোচ্চার হলেও সকলেই এক পথের পথিক। প্রায় সমবয়সি বলে হৃদ্যতাটা বরাবরই গাঢ়। মতাদর্শের পার্থক্য থাকতেই পারে। তার জন্য দেবাশিস ও অমর্ত্য অনেক বাড়তি সুযোগ পায় বলে মনে মনে আক্ষেপ। যাদের রাজত্ব, তারা বাড়তি সুবিধা ভোগ করার জন্যই তো দল করে। নীতিগত দিক থেকে নয়। পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে সেও হয়ত ওদের দলে নাম লেখাত, যদি না বিধানসভার টিকিটটা পিছলে হত। টিকিট পেলে সেও হয়ত অমর্ত্যর মতো মন্ত্রী হতে পারত।

নিয়তি কেন বাধ্যতে। যা হয়নি, তা নিয়ে অনুশোচনা করে লাভ নেই। বরং পারিবারিক চিন্তাধারা অনুসরণ করে, সেই মতকেই সামনে আনা শ্রেয়। অন্য সময় হলে, বিরোধী দলের সতীর্থের সঙ্গে মনোমালিন্যে আনন্দই পেত। কিন্তু দেবাশিসের মতো সুযোগ্য নাট্য নির্দেশকের অবসাদগ্রস্ত গলা শুনে খারাপ লাগল।

“তোমাদের মধ্যে মনোমালিন্যর কথা শুনছিলাম। কিছুটা আন্দাজ করতেও পেরেছি কারণটা। তবে তুমি তো বহুদিন এ লাইনে আছ। ভাবিনি সেটা এই পর্যায় গিয়ে পৌঁছবে”

“ক্ষমতার দম্ভ”

“সত্যি, ক্ষমতা মানুষকে কী নিদারুণ পাল্টে দেয়!”

“আমি দল করেছি ঠিকই। কিছুটা নিজের স্বার্থে। ঠিক নিজের বলব না। মৃদঙ্গমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গ্র্যান্ট প্রয়োজন। আফটার অল, এত বছরের নিজের হাতে তৈরি করা দল...”

“আমি তো দলে যোগ না দিয়েই চালিয়ে যাচ্ছি। অবশ্য তুমি তো জানো, আমার নীতিগত বিরোধিতা আছে”

“তোমার বাবা-মা দুজনেই দিকপাল। তাছাড়া তুমি সিনেমা, সিরিয়ালও কর। তোমার পক্ষে ব্যাপারটা অনেক সহজ। আমার পক্ষে একা টানা অনেক বেশি কঠিন”

শখ বজায় রাখতে কার কতটা সুবিধা, সে তর্কে না গিয়ে অমিয় বলল “একবার ফোন করে কথা বলে দেখতে পারো। পাওয়ার কনফ্লিক্ট। যদি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং কিছু থাকে, কথা বললে মিটেও যেতে পারে”

“নাঃ, আমি যেচে কথা বলতে যাব না। ওর আরও দেমাক বেড়ে যাবে”

অমিয়র বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না, দেবাশিস আগের মতোই নিজের অহংকারে অটুট। অমর্ত্য মন্ত্রী বলে ওর ওপর আপার হ্যান্ড নেবে আর সে ইনিয়ে-বিনিয়ে রিকন্সাইলেশনে যাবে, এটা ওর কাছে পীড়াদায়ক।

“ছেড়ে দাও না। নাট্য অ্যাকাডেমির গদি আঁকড়ে কী হবে! অ্যাকাডেমিতে তোমার নাটকগুলো করতে দিলেই হল”

“রিসেন্টলি সেগুলোতেও মন্ত্রিত্ব ফলাচ্ছে। তাই থিয়েটার থেকে ব্রেক নিয়ে সিনেমা করছি”

“জানি, নাটক নিয়ে। শুটিং শেষ?”

‘হ্যাঁ। এডিটিং-এর কাজ চলছে”

“সময় দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে। উড়লে পড়তে কতক্ষণ?”

ফোনটা কেটে অমিয়র মনে হল, বাঙালি কী সমষ্টিবদ্ধ হয়ে কোনও কাজ করতে পারে না? এক দলে থেকেও নয়? শিক্ষিত রুচিশীলদের মধ্যেই রেষারেষি, ক্ষমতার টানাপোড়েন। কাদা ছোড়াছুড়ি মারপিট। যাদের শিক্ষা কম, তাদের সামাজিক জীবনে গুরুত্বও অনেক কম। কোথাও পোজিশন নেই। টানাটানি নেই। শ্যামনগরের কনভেন্ট স্কুলের প্রাক্তনি দেবাশিস আঠারো বছর বয়স থেকে নাটক করছে। অমর্ত্যর বাবা-মা

দুজনেই ডক্টরেট। সে নিজেও, এক সময় বাংলার প্রফেসর ছিল। অথচ সাধারণ জনগণ, যাদের সুবিধা গোছানোর জায়গা তাদের তো কোথাও থেকে পাওয়ার কিছু নেই। এদের থেকেও জ্বালা।

ফোন নামিয়ে দেবাশিসের ভীষণ ক্লান্ত লাগল। এমনিতে তো, মন্ত্রী হয়ে সব সুযোগ সুবিধাই অমর্ত্য ভোগ করছে। এটুকুতে হাত না দিলে চলত না? মানুষের খিদে পশুর থেকেও মারাত্মক। পেলে তালজ্ঞান থাকে না। পার্টি ধরে লাভের গুড় অমর্ত্যই একা খেয়ে গেল। তা যাক। অ্যাকাডেমিতে শো-গুলোয় বাধা না দিলেই হল। অ্যান্টিকুইটির বোতল ক্যাবিনেট থেকে বেরিয়ে এল আপাত শান্তির আশায়। মগজটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক, তারপর পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবা যাবে।

কালবৈশাখী হতে পারে। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরল অমর্ত্য। রোজ দেরি করার জন্য মৌসুমী ঘ্যানঘ্যান করে "আগে যখন কলেজে পড়াতে তখন অন্তত সন্ধেবেলা বাড়ি থাকতে। এখন তো তোমার সঙ্গে কথা বলার সময়ও পাই না"

জামাটা ওয়ারড্রবে ঢুকিয়ে বলল "তখন তো মন্ত্রী ছিলাম না"

"সপ্তাহে দুটো দিন নাটকের রিহার্সালের জন্য বরাদ্দ ছিল। বাকি সময়টা ঘরে বসেই নাটক লিখতে"

বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। বিলীন-এর পর আরও কত ভালো নাটক লিখেছে, মঞ্চস্থ করেছে। সায়নদেব, শহরের ইতিকথা, ওয়াকি-টকি, খুনের গল্প চক্রব্যূহ। রুদ্ধশ্বাস, রীতিমতো সারা ফেলে দিয়েছিল। মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে লেখাটাও গেছে। মিটিং, কন্সটিটুয়েন্সি, পার্টি অফিস। জীবনটা পালটে গেল।

"এখন আর সময় করে উঠতে পারি না। সত্যি কী মন্ত্রী হওয়ার কোনও দরকার ছিল?"

"মাস্টারি করে যা কামাতে, তা দিয়ে এই বাজারে কী সংসার চলত?" মৌসুমীর ব্যঙ্গে কর্ণপাত করল না "অ্যামেচার নাটক করে মন ভরলেও তো আর পেট ভরে না"

এক সময় মৌসুমীও অমর্ত্যর সঙ্গে নাটকে কাজ করত। ঘরে না হলেও, অমর্ত্য নাটকের রিহার্সালে থাকত। এখন সে গুড়ে বালি। বাইরে তো ব্যস্তই থাকে, ঘরেও তেমন করে আর ওকে পায় না। আক্ষেপ হওয়ারই কথা।

"আজ অনেকদিন পর ফ্রি হয়েছি। লেখা নিয়ে বসব ভাবছি। একটু বরফ দাও তো" অমর্ত্য ক্যাবিনেট থেকে গ্লেনফিডিচের বোতলটা বার করল।

টাকা আর লেখা তো এক ঘাটে জল খায় না। আর হুইস্কি ছাড়া লেখাও বের হয় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বরফ আর স্ন্যাক্স আনতে কিচেনে ঢুকল। কাজের চাপে রিল্যাক্স করার সময়ই পায় না। নয় আজ একটু খেলই। তবু যদি পুরনো লেখার অভ্যাসে ফিরতে পারে।

কলেজ জীবন থেকেই ওর লেখার একটা ন্যাক আছে। যখন ওরা দুজনে প্রিন্সেপ ঘাটে পাশাপাশি বসে থাকত, ল্যাম্পপোস্টের অল্প আলোয়, ও কত কিছু পড়ে শোনাত। তখন আর কোনও শ্রোতা ছিল না। একমাত্র মৌসুমী।

নাটক করতে গিয়েই ঘনিষ্ঠতা। প্রেমের পরিণতি বাসরঘরে। প্রখ্যাত নাট্যকার বাবা কোনও বাধা দেয়নি। নাটকের ফ্যামিলিতে ছেলে বউ যে এক পৃথিবীর হবে, এটাই স্বাভাবিক।

গ্লেনফিডিচে চুমুক দিয়ে কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অমর্ত্যর মনে হল, মন্ত্রী না হলে কি মাস্টারি করে এত দামি হুইস্কি খেতে পারত! কিছু পেতে গেলে কিছু-তো ছাড়তে হয়। অনেকদিন থেকেই মাথায় আইডিয়াটা কিলবিল করছে। এবার সময় বার করে লিখে ফেলতে হবে। এই ইন্টারন্যাল পলিটিক্স আর ভালো লাগে না।

টাকার প্রয়োজন ছিল... এসেছে। নামের আকাঙ্ক্ষা ছিল... হয়েছে। এখন মনের খিদে মেটানোই বাকি।

সেখানেই বাধা হয়ে উঠল দেবাশিস। হতে পারে অমর্ত্য নাট্য অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান। রোজ ছিচকে পলিটিক্স আর ভালো লাগে না। বিরক্ত হয়ে, শেষ পর্যন্ত জবাব দিতে হল। বেশ করেছে। সামটাইমস সামহোয়্যার ডাউন দ্য লাইন ইউ নিড টু একজার্ট পাওয়ার টু ইন্সটিল পিস। শান্তি না থাকলে ক্রিয়েটিভিটি আসবে না। লেখাও হবে না।

পরপর দুটো পেগ নেওয়ার পর হারানো শব্দগুলো খুঁজে পাচ্ছে। কম বয়সের লেখার মেজাজটা একবার যখন এসেছে, হুড়হুড় করে বেরবে। মাত্র দু পাতা লিখেছে। হঠাৎ ফোন।

"অমর্ত্য কিছু একটা কর। ওরা আমাদের বাড়িতে ইটপাটকেল ছুড়ছে" সিদ্ধার্থদা। এক সময়কার প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী।

"কী হয়েছে সিদ্ধার্থদা?"

"একটু জোরে মাইক বাজছিল বলে আপত্তি করছিলাম। কারা জানি না রাস্তা থেকে আমাদের জানলায় ইট ছুড়ছে। বেশ কটা জানলা ভেঙে দিয়েছে"

"আমি দেখছি সিদ্ধার্থদা। আপনি একটুও চিন্তা করবেন না"

তার কন্সটিটিউয়েন্সি দমদম ক্যান্টনমেন্টে থাকে। কিছু তো করতেই হবে।

ধুস শালা। লেখাও গেল। নেশাও গেল। এখন ওসিকে ফোন কর। ঝামেলা মেটাও। নেশা যাওয়ার জন্য যতটা দুঃখ্য, তার থেকেও লেখার মুডটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার। খাতাটা সরিয়ে মোবাইলে। মন্ত্রী থাকাকালীন বোধহয় সৃষ্টিশীল কিছুই হবে না। কথাটা ঠিক। লক্ষ্মী আর সরস্বতী বোধহয় সচরাচর এক নৌকায় চাপে না। একমাত্র দাদুর বাড়িতে আসার সময় ছাড়া। তাও আবার মায়ের সঙ্গে!

দশ

“একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ আগামী-অতীত-কাল-হীন,

দেশহীন, সর্বহীন, ‘নেতি নেতি’ বিরম যথায়

সেথা হতে বহে কারণ ধারা

ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা

গরজি গরজি উঠে তার বারি

‘অহমহমিতি’ সর্বক্ষণ”

অন্ধকার জি ডি বিড়লা সভাঘরের স্ক্রিন ওঠার আগেই উদাত্ত কণ্ঠে ভেসে এল পঞ্চতপার বিবেকানন্দর লেখার একাংশ। আলেখ্যর শিল্পীরা স্টেজের বাঁ দিকে বসে। ডান দিকের পোডিয়ামে পঞ্চতপা আবৃত্তি করে চলেছে।

“বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করা যেতে পারে”

প্রায় ধূলিসাৎ অস্তিত্বকে পুনরুদ্ধারের আশায় শুভ্রা মিত্রের কাছে কথাটা পেড়েছিল অঞ্জন। এসব প্রোগ্রামের অংশীদার না হলে, ইমার মতো শিল্পীরা স্বীকৃতি দেবে কেন? ওরাও তো কাঙালের মতো বসে আছে প্রোগ্রামের আশায়। যত চিমসেই হোক না কেন, নাই মামার চেয়ে কানা মামা কিছুটা ভাল।

“স্পন্সর?”

“কেন? আমাদের শোভন তো আছে”

তারকাদের মাঝে বিরাজ করতে সব সময়ই ভালবাসে শোভন। নিজেকে কেমন দামি মনে হয়। অর্থবলে সংস্কৃতির মধ্যমণি হয়ে ধ্বজা ধরতে বদ্ধপরিকর। সদা প্রস্তুত। দাদার উপার্জিত কোটি কোটি টাকার একাংশ নয় একটু দানধ্যানের কাজে লাগাল। অস্তিত্ব সঙ্কটের মধ্যে তো একটু স্বস্তি পাওয়া যাবে। সেটাই বা কম কীসের? তাই ঔদার্যের কোনও খামতি নেই।

“আপনি স্ক্রিপ্টটা তাহলে লিখে ফেলুন। আমি অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলছি। শোভন রায়চৌধুরির সঙ্গে কনফার্মড হয়ে আমায় জানাবেন”

শুভ্রার সায়ে নাকতলার বাড়িতে কলম হাতে বসে পড়েছিল অঞ্জন। ভাবছিল, কী ভাবে রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দকে নতুন মোড়কে সাজানো যায়। বাঙালি ভুতের কথা শুনতে খুব ভালবাসে। এরা আবার সাধারণ নয়। ব্রিটিশ আমলের ভুত। তায় দেশপ্রেমী, যেটা পাবলিক খাবে। অবশ্য এই খাওয়ানোর নেশায়, নিজের

কথা কিছু আর বলা হল না। বেলা অনেক হল। টিকে থাকার জন্য, সৃষ্টির চেয়ে খাওয়ানো অনেক জরুরি। চিন্তার যে ব্যাপ্তি প্রয়োজন, সেটা তার নেই। খুব ভাল করেই জানে। তাই মশলা ঢেলে টিকে থাকা। কিছু কামিয়ে নাও, লাইমলাইটে থাক।

ইমা আক্ষেপ করে বলল "শুভ্রাদিকে আমার থেকে অনেক বেশি মাইলেজ দিলেন?"

"শুভ্রা তোমার থেকে সিনিয়ার, অনেক বেশি পপুলার। বেশি মাইলেজ তো দিতেই হবে। ওর নামেই তো হল ভর্তি হবে" অঞ্জন থেমে বলল "চিন্তা কর না ইম... অন্যভাবে পুষিয়ে দেব"

ইমা বুঝে উঠতে পারল না, আর কী ভাবে অঞ্জনদা পুষিয়ে দেবে। টিকে থাকার জন্য, প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের সঙ্গে এখনও স্ট্রাগল করতে হচ্ছে।

লিলুয়ার নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে ইমা। ছোটবেলা থেকেই ভাল গায়। পারবারিক উৎসাহে অন্যান্যদের মেয়ের মতোই রবীন্দ্রভারতী থেকে মাস্টার্স করার পর একটা ব্রেক খুঁজছিল।

ইউনিভার্সিটির এক বন্ধুই খবরটা পেড়েছিল "শুনলাম নতুন আর্টিস্টদের নিয়ে তারা টিভি একটা প্রোগ্রাম করছে। একবার দেখবি?"

"কী করতে হবে?"

"ঠিক বলতে পারব না। চল না, একদিন সল্ট লেকে তারা টিভির অফিসে যাই। গিয়ে খোঁজ নিই"

কপাল খুলে গেল। অপরাহ্নের গানের আসর। অন্যান্য তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে নতুন প্রয়াস। গায়কী মনে দাগ কাটল শ্রোতাদের।'সকালের নিমন্ত্রণে' প্রোগ্রামে গাওয়ার সুযোগ।

ওই চ্যানেলের টক-শোর অন্যতম অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তখন মন্দা চলছে। গুণী-মানী ব্যক্তিদের ইন্টার্ভিউ নিলেও, ব্যক্তিগত জীবনে উপসি ছারপোকা। সেরকম কাউকে ফাতনায় গাঁথতে পারছে না। মন মানলেও, দেহ সায় দেয় না।

"গীতি-আলেখ্য লিখেছি। নতুন প্রতিভার খোঁজ করছি। তোমার গলাটা তো বেশ। গাইবে?"

অন্ধকারের মধ্যে যেন ক্ষীণ আলোর রেখা "নিশ্চয়ই"

"এসে একদিন দেখা কর আমার বাংলা টিভির অফিসে"

এপিসোড শুটের পর চায়ে চুমুক দিয়ে ইমাকে দেখল। ছিপছপে ছোটখাট চেহারা। ভারী ফ্রেমের চৌকো চশমা। রুদ্রাক্ষের মালা। পাট করা সবুজ পাড়ের সাদা শাড়ি ও সবুজ ব্লাউজের অন্তরাল কল্পনা করার চেষ্টা করল।

মন্দার বাজারে মন্দ কী!

"নতুন এসেছ। গান শুনেছি। ভালোই গাও"

খুশি হল ইমা। অঞ্জনবাবুর মতো সেলিব্রিটি তার তারিফ করছে। কম কী! কেউ তো সুযোগ দেয় না। যেচে ডেকেছে।

কবিগুরুর জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্র সদনে গীতি-আলেখ্য। অনেকে থাকলেও, ইমাই প্রধান শিল্পী। ফাংশন শেষে অঞ্জন বলল "শিল্পীদের জন্য ডিনারের বন্দবস্ত করেছি। গোল্ডেন পার্কে। না খেয়ে কিন্তু যাবে না"

"রাত হয়ে যাবে। লিলুয়া ফিরতে হবে। বাস পাব না। আরেকদিন?"

"তা হয় নাকি? এত ভালো গাইলে। না খেয়ে যেতেই দেব না"

"বাবা চিন্তা করবে"

"ফোন করে দাও। আমি নিজে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসব। চিন্তা করতে বারণ কর"

বাড়ি পৌঁছেছিল রাত বারোটার পর। বাবা ঘুময়নি, বারান্দায় পায়চারি করছিল "এত রাত করলি?"

"কী করব? ফাংশনের পর গোল্ডেন পার্কে ডিনার ছিল। প্রথম বড় পাবলিক ফাংশন। কলকাতার অনেক বিশিষ্টজন ছিল। ছেড়ে আসি কী করে? এখানেই তো কন্ট্যাক্টস তৈরি হয়" ব্যাগটা খাটে ছুড়ে, আলনায় শাড়িটা মেলে বাথরুমে ঢুকে গেল।

রক্ষণশীল বাবার আপত্তি থাকলেও, মেয়ের কেরিয়ার বলে কথা। মেয়ে বড় হয়েছে, ভালমন্দ যা বুঝবে, তাই করুক।

"চিন্তা তো হয়"

"অঞ্জনবাবুর মতো বয়স্ক লোক থাকতে চিন্তা করার তো কারণ নেই। তুমি ঘুমতে যাও বাবা। আমি ঠিক আছি"

আরেক অধ্যায়। অঞ্জনদা কী ভাবে পোষাবে জানা নেই। সায় দেওয়া ছাড়া কিছু করারও নেই। এরাই বাংলা কৃষ্টির ধ্বজাধারী। এদের ছেড়ে যাবে কোথায়? বেশি বলতে গেলে, ছুড়ে ফেলে দেবে। তার মতো অনেকেই লাইনে রয়েছে। চেষ্টাও করছে নাম করার। তাই শুভ্রাদিই সই। এখন যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

স্ক্রিন উঠে গেছে। পঞ্চতপা তখনও পোডিয়ামে। ভাষ্য-আবৃত্তি শেষ হলে ইমার গানেই অনুষ্ঠানের সূচনা। ভৈরবী রাগে ত্রিতালে রবীন্দ্রসংগীতঃ

'পিপাসা হায় নাহি মিটিল, নাহি মিটিল ॥

গরলরসপানে জরজরপরাণে

মিনতি করি হে করজোড়ে,

জুড়াও সংসারদাহ তব প্রেমের অমৃতে ॥'

ব্রহ্মসংগীতের কথা যেন দুজনেরই জীবন দর্শনের অঙ্গ। একজন ঈশ্বর খুঁজেছিল ভারত প্রদক্ষিণ করে তার স্বরূপকে দেবী দুর্গার অবয়বের ছাঁচে দেখতে। আরেকজন চেয়েছে দুঃখের আঁধারে অদেখা ঈশ্বরকে সাধনায় পেতে। পথ ভিন্ন হলেও, মতের সামঞ্জস্য অকল্পনীয়। দুজনেই সমসাময়িক।

গান শেষ হতেই শুভ্রা মিত্রের কণ্ঠে ভেসে এলঃ

'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি

নাহি শশাঙ্ক সুন্দর'

গান শেষে অঞ্জনের ভাষ্য, নৃত্য, আরও গান, আবৃত্তি। দারুণ অনুষ্ঠান। হল জুড়ে হাততালি। শেষে শোভনের বিনম্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। সবাইকে।

বেরিয়ে যাচ্ছিল ইমা। আজকে কোনও হোটেলে ডিনার নেই।

"যাচ্ছ কোথায়? দাঁড়াও। কথা আছে"

দাঁড়িয়ে পড়ল। গ্রিনরুমের এক কোণায় বসে। অঞ্জনদা অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। এখন আর আগের মতো তাড়া নেই। সাকসেসের ঝলকে সেলিব্রিটি জীবনের সঙ্গে ধাতস্থ হয়ে গেছেন বাবা। এখন আর চিন্তা করেন না। তবে মধ্যবিত্ত মন ছেড়ে আদৌ বেরিয়েছে কি না ইমা জানে না। তবে এই জীবনের পাশে তাদের মধ্যবিত্ত যাপনের যে অনেক তফাত, সেটুকু বুঝতে পারে। রাতে না ফিরলেও চিন্তা নেই। শো-এর জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তো হরদম যতে হয় তাকে। মেয়েকে তো আর চিরকাল ছাতার আড়ালে রাখতে পারবে না। বড় হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। আজকের দিনে টিকে থাকতে গেলে, যা করার, তা তো করতেই হবে। ভাল লাগুক চাই না লাগুক। নিরুপায়।

"অঞ্জনদা... দেরি হয়ে যাচ্ছে..."

"আমি তো আছি। চিন্তা কীসের? বস"

অতএব প্রতীক্ষা। কতক্ষণ বসে ছিল খেয়াল নেই। সারাদিনের ক্লান্তি, একটু ঝিমুনি।

"অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম" অঞ্জনদার কথায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ঘণ্টা দেড়েক পার হয়ে গেছে "এত রাতে, বাড়ির সবাইয়ের ঘুম ভাঙাবে? চল। আমার বাড়িতেই রাতটা থেকে যাও। সেখানেই কথা হবে"

যখন পৌঁছল পেট চোঁ চোঁ করছে। আসার সময় কালীঘাট থেকে বিরিয়ানি আর চাপ কিনেছিল অঞ্জনদা। সেগুলো মাইক্রোওয়ভে গরম না করেই গোগ্রাসে গিলতে লাগল ইমা। চেঞ্জ করতে ঘরে ঢুকে গেল অঞ্জন।

খাওয়া শেষে শাড়ি-ব্লাউজটা আলনায় ফেলে ভাবল, এই ব্যাচেলারের বাড়িতে আর শাড়ি পাবে কোত্থেকে? আর পরেই বা কী হবে? একটু পরেই তো খুলে ফেলতে হবে।

যা ভেবেছে তাই। বাইরে এসে দেখল পাজামা-গেঞ্জি পরে অঞ্জনদা সিঙ্গল মল্টের বোতল খুলে বসেছে।

"খেলেন না?"

"দাঁড়াও একটু গলাটা ভিজিয়ে নিই। খুব খিদে পেয়েছিল, না? রিয়েলি সরি। একটু দেরি হয়ে গেল"

ইমার দিকে তাকাল। জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় শ্যামলা গায়ে সাদা ব্রা চিকচিক করছে। ইমা চশমা খুলে উলটো দিকের চেয়ার বসতে বলল "একটু খাবে নাকি?"

ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল "দিন একটু। সারাদিন যা ধকল গেছে না"

"বস। আরেকটা গ্লাস নিয়ে আসি"

"আপনি বসুন। আমি আনছি"

"চিয়ার্স টু আওয়ার ফিউচার"

"চিয়ার্স"

লিলুয়ায় বসে কখনো কী ভেবেছিল মাঝরাত্তিরে এক বৃদ্ধের সঙ্গে একলা ঘরে বসে মদ খাবে! বাবা জানতে পারলে ভিরমি খেত। বাবা জানেও না, মেয়ের এই খ্যাতির জন্য কী দাম দিতে হয়। নামটা ফলাও করে পাঁচজনকে বলেই খালাস। সেলিব্রিটি হওয়ার মূল্য চোকাতে হয় এই মধ্যরাতের অভিসারে।

কবিগুরুর পিপাসা কোথায় গিয়ে থেমেছিল, জানা নেই। গরল পানে জর্জর প্রাণে যে তার খ্যাতির পিপাসা মিটবে, সন্দেহ নেই। সেখানে নিজেকে সঁপে দেওয়ার মধ্যে বিবেক না থাকলেও, নাম আছে, টাকা আছে। আছে প্রতিপত্তি।

"দারুণ ভাল গেয়েছ" গ্লাস ভর্তি করে বলল।

"আপনি তো বলেই খালাস। আমার থেকে শুভ্রাদিকে প্রায়রিটি বেশি দেবেন"

"একদম নয়। এই পড়ন্ত বাজারে, শুভ্রাকে না ভেড়ালে, যে আসর জমবে না"

উঠে কিচেন থেকে খাবারটা নিয়ে বলল "খেয়ে নিন। অনেক রাত হয়েছে। বেশি খেলে আর খেতে পারবেন না"

জীবন্ত বিরিয়ানি সামনে বসে থাকতে, এই ঠান্ডা খাবারের কী স্বাদ? পেট ভরলেও, মন তো ভরে না। সামনে যখন ইমার আধখোলা দেহটা হাতছানি দিচ্ছে।

খাওয়া শেষে, হাত ধুয়ে বসে বলল "হুইস্কি আর মহিলা না থাকলে কী ক্রিয়েটিভিটি আসে? মহিলা না থাকলে কি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ হতে পারত?"

একটু বোধহয় নেশা হয়েছে। ইমা চুপ। রবীন্দ্রনাথ কেন মহান এই মুহূর্তে অঞ্জনদাকে বোঝানো বাতুলতা মাত্র। ওনার মহিলা সংসর্গ বিক্রি করেই, অঞ্জনদা আজ নামী সাহিত্যিক। আর ইমা কি না ওঁকে বোঝাবে কবিগুরুর মহিমা! যার সংগীত নিবিষ্ট মনে সাধনা করে বড় হয়েছে, তার মর্ম অঞ্জনদার কাছে যাই হোক না কেন, ইমার সারা জীবনের তপস্যা, সাধনা, ব্রত।

"রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়ুন তো। এই যে বললেন পুষিয়ে দেবেন, কী ভাবে?"

এমনি এমনি রাত্রিবাস করতে আসেনি ইমা। খালি হাতে ফেরত যাওয়ার জন্য তো নয়ই।

"তোমার একটা সোলো প্রোগ্রাম তো করবই। তাছাড়া শোভন এবার অ্যামেরিকার বঙ্গ-সংস্কৃতি স্পন্সর করছে। ওখানে, আমাদের সঙ্গে তুমিও যাচ্ছ"

'আমাদের' শব্দটার মধ্যে কী একটু বেশি এম্ফাসিস ছিল? ওটা রঙিন পানীয়ের জন্যেও হতে পারে। কে বা কারা সঙ্গে যাচ্ছে, সেটা বড় নয়। ইমা অ্যামেরিকা যাচ্ছে, সেটাই প্রধান।

সোফা ছেড়ে অঞ্জন ইমার পাশে। কোনও ভণিতা না করেই ওর বুকের ওপর কাঁপা হাতের শিথিল স্পর্শে খেলতে লাগল। কয়েক পেগ হুইস্কি পেটে না থাকলে, গা-টা রি রি করত। এটাই চাবিকাঠি। সোনার সিন্দুক খুলতে গেলে চাই নামমাত্র নজরানা। এই দিয়ে যদি আলাদিনের প্রদীপ পাওয়া যায়, ক্ষতি কী?

এই মোহ ছেড়ে পালায় কোন পাগল? আর যেই হোক, ইমা পাগল নয়। সে আজকের সারথি। ভাগ্য থাকলে, যুগের কাণ্ডারিও হয়ে যেতে কতক্ষণ? অজানা রোশনাই হাতছানি দিচ্ছে। সেই আলোর সম্ভারে যাবতীয় অন্তর্বাস যে খসে পড়বে, এটাই তো স্বাভাবিক। বেশি আর কী করতে পারে এই বৃদ্ধ? যে মাত্রায় গিলেছে, হুইস্কি লিবিডো বাড়ালেও ভায়াগ্রা কতখানি কার্যকরী হবে বলা মুশকিল। শেষ পর্যন্ত একটু হাতিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

অঞ্জনদাকে বুঝতে ভুল করেছিল ইমা।

এগারো

বিবস্ত্র দেওয়ালি ঘর সংলগ্ন স্পায়ের বাথটবে রিফ্রেসড। এতটা অবকাশ তো কলকাতা-মুম্বাইতে শুটিং, ইন্টার্ভিউ, পার্টির ফাঁকে পাওয়া যায় না। মোবাইল বাকিটা সময় খেয়ে নেয়।

শোভন-দিগ্বিজয়ের ফুর্তিতে শামিল হতে এসেছে। নগদ পনেরো লাখ আগেই দিগ্বিজয় ক্যাশ দিয়েছে। তার স্টারডমটাই যে এই রোজগারের উৎস, অস্বীকার করা যায় না। দামটা খ্যাতির। ওপরে পৌঁছতে পারলে পারদটাও চড়বে। শরীরে বাথ সোপ বোলাচ্ছে। ঈষদুষ্ণ জলে কাঁধডোবানো ফেনা। অন্তরালে হাতটা কোথায় ঘোরাফেরা করছে, অনভুতি ছাড়া বোঝার উপায় নেই। একান্ত নিভৃত অরগ্যাজমেই তৃপ্তি। আপাত পুরুষ সংসর্গের মধ্যে যা সে কখনো পায় না।

এ অঞ্চলের সন্ধেটাই অন্যরকম। রাতের আঁচলটা আস্তে আস্তে বালির হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। সন্ধ্যা গুটি গুটি রাতের কোলে ঢলে পড়ছে। স্বচ্ছ আকাশের দরজা খুলে এক একটা মৃদু তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। পেটিটেঙ্গেট বিচের ওপর এই রিসরটে। ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে তারার আলো স্নিগ্ধতার স্পর্শ ছড়িয়ে দিচ্ছে। সম্মোহনী রাত অভিসারে ডাকছে মাতাল করে দেওয়া পসরা সাজিয়ে।

দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের মৃদুমন্দ কলরব। খায়ানগান ড্রিমস ভিলা কেরবোকান রেস্টুরন্টে বসে আ লা প্লাঞ্চা[17] খাওয়ার সময় আরও প্রকট ছিল। বাথরুমের দেওয়াল আওয়াজটা ক্ষীণ করে দিয়েছে।

বালির স্পেশালিটি। বেশ খেতে। এর আগে খায়নি। স্বপ্নেও কী ভেবেছিল, কোনওদিন এই রিসর্টে বসে স্বাচ্ছন্দ উপভোগ করবে!

আজ বিকেলে যখন নগূড়া রাই ইন্টারন্যাশনল এয়ারপোর্ট থেকে পৌঁছল, রিসর্টে চেক-ইন করে ওরা দুজনেই বেরিয়ে গেল "আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখাশোনা করতে হবে। তুমি খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নাও। কাল ঘুরতে যাব"

দেওয়ালি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অনন্ত আজকের দিনটা নিজের মতো। উদ্দেশ্যহীনভাবে পেটিটেঙ্গেট বিচের ধূসর বালির ওপর পায়চারি। যতক্ষণ না দিনের আলো সন্ধ্যার আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। শেষ আলোটার দিকে তাকিয়ে, কোথায় যেন হারিয়ে গেল দেওয়ালি। নিজেকে দেখছে। সমুদ্রের শৃঙ্গারের মধ্যে কোনও রিসর্ট থেকে ভেসে আসছে এক অচেনা সুর। খুব কাছের। তবুও তাকে ছুঁতে পারছে না। পরে জেনেছে ওটা বালিনিজ গ্যমেলান[18]।

কলেজে পড়ার সময় লাজুক দেওয়ালি দূর থেকে ভালবেসেছিল অদ্রিজকে। শ্যামলা দেওয়ালির সাহসও ছিল না তাকে মনের কথা বলার। অব্যক্ত ভালবাসায় গুমরেছে। শুধু বলতে পারেনি 'আমি তোমায় চাই'। দূর থেকে দেখে, কখনো একটু সান্নিধ্যে, বুক কেঁপে উঠেছিল। সেটুকুই পাওয়া।

বাথরোব জড়িয়ে বারান্দায় এসে বসল। গবলেটে আরাক বালি[19]। থলথলে বুকটা চেপে ধরল দেওয়ালি। অব্যক্ত কান্নার মোচড়। থামতে গিয়ে অনুভব করল, পুরুষ্ট বুকের ওপরই কেবল হাতটা ঘোরাফেরা করছে। কান্নাটা যেন আরও গভীর অতলে। এই দলা মাংসপিণ্ড যার এক ঝলকের আশায় হাজার হাজার লোক টাকা ফেলছে। অনেকে লাখ লাখ ওড়াচ্ছে। তাকেই শুধু ছোঁয়ার জন্য। স্তনের খোলস সরিয়ে কান্নার অভ্যন্তরে কেউ পৌঁছতে পারছে না। চাঁদের আলো আলগা হওয়া বাথরোবের ফাঁক দিয়ে স্তনের ওপর, ক্যালিডিওস্কপের মতো খেলে বেড়াচ্ছে। সেও কান্নাকে ছুঁতে পারছে না।

জানলার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আসতেই উঠে পড়ল। আরাক বালির নেশায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, খেয়াল নেই। বিবস্ত্র শ্যামলা দেহটা, বিছানার চাদরের ওপর আলোর রশ্মিতে উদ্ভাসিত। স্টার বলে কথা। মেক আপ থাকুক, চাই না থাকুক কিরণ তার সমগ্রতার মধ্যে।

তাড়াতাড়ি উঠে হাউসকোট জড়িয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। এখুনি বুঝি শোভন দরজায় কড়া নাড়বে। যা ভেবেছিল তাই। আধ ঘণ্টা পরেই দরজায় টোকা। ততক্ষণে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে জগিং ড্রেস পরে নিয়েছে। রোজ সকালে ঘণ্টাখানেক জগিং করা অভ্যাস। সব সময়ই ভয়, এই বুঝি এখানে-ওখানে ফ্যাট না জমে যায়। মেদ জমলেই ডিম্যান্ড কমে যাবে। আজও ভাবছিল বিচে গিয়ে জগিং করবে। আরাক বালির সৌজন্যে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে গেছে। তাতে কী?

"রেডি হয়ে নাও। আমরা বিচে ব্রেকফাস্ট করব। সুইমিং ট্রাঙ্কস আনোনি?" শর্টস পরা শোভন জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল। সি বিচে আসছে। সুইমিং ট্রাঙ্কস না নিয়ে আসে?

"পনেরো মিনিট সময় দিন। রেডি হয়ে নিচ্ছি"

"বেশি দেরি করলে, আরও গরম হয়ে পড়বে। তখন সমুদ্রে স্নান করা যাবে না। তারাটারই চেঞ্জ করে নাও"

সাদা টু-পিস বিকিনি পরার সময় আয়নায় দেখল। ঘুরে ঘুরে দেখল। কোথাও কী মেদ জমেছে? রিহার্সাল করার সময় ঘরে একলা বহুবার আয়নার সামনে অনুশীলন করেছে। ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন ঠিক হচ্ছে কি না।

শুধু চেহারা আর মেক-আপ দিয়ে শিখরে পৌঁছনো যায় না। অভিনয় দক্ষতা প্রমাণ না করতে পারলে নিজস্বতা বজায় রাখা কঠিন।

"এটা কী?"

"ওরা বলল বুরবুর আয়েম[20]। বালির ট্র্যাডিশনল ব্রেকফাস্ট" বিচে লাউঞ্জারে পা ছড়িয়ে শোভন বলল।

"বেশ খেতে তো। আগে কখনো খাইনি। সকালে উঠেই ভাত? ভুঁড়ি না বেড়ে যায়..."

রিসর্টের সার্ভিস খুব ভাল। বিচেই সার্ভ করে গেছে।

দিগ্বিজয় সাকালবেলায়ই উদয়ন ক্রিকেট ক্লাবের মিটিং-এ বেরিয়ে গেছে। সারাদিন মিটিং। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার। শোভনকে ছেড়ে গেছে দেওয়ালির সঙ্গে মৌজ করার জন্য।

লাউঞ্জারে সানগ্লাস পরা দেওয়ালির দিকে তাকাল। ছিপছিপে শ্যামলা দেহটা হয়ত একটু বেশি সান-রে অ্যাবসর্ব করবে। কিন্তু সাদা বিকিনিটা সকালের আলোয় চিকচিক করছে। নাকি ঝলমলিয়ে উঠছে, ওকে পাওয়ার কামনা। ম্যাগনো ইন্ডিয়ার অকর্মণ্য কর্ণধার বলে নয়। তদানীন্তন সংস্কৃতির ধ্বজাধারী হিসেবে জীবনে তো কম মেয়ে ভোগ করেনি। দেওয়ালির সঙ্গে এই প্রথম। মনে মনে সংশয়, শেষ নয়ত? যে ভাবে তরতরিয়ে দেওয়ালি উঠে যাচ্ছে, পরে টাকা লুটিয়েও পাওয়া যাবে না।

সমুদ্রে নেমে পড়েছে ওরা। ঢেউয়ের তালে ব্রেকার ভেঙে আরও গভীরে চলে যাচ্ছে। উপচে পড়া ঠান্ডা জলোচ্ছ্বাস ম্লান করে দিচ্ছে তপ্ত বেলাভূমি। খেলতে... আয় আয় খেলবি না...

শোভনের এনার্জি দেওয়ালির দ্বিগুণ। ব্যান্ডেলে বড় হওয়া, পাড়াগাঁয়ের উলঙ্গ ছেলের পুকুরপাড়ে জলে ঝাঁপ দেওয়া পুরনো অভ্যাস। জলে ভয় নেই। ঢেউয়ের তালে ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের মাদকতা। যেমনদেওয়ালির সঙ্গে প্রমোদ স্বর্গে।স্বল্পবসনা দেওয়ালিকেজড়িয়ে ঢেউ ভাঙা। ছকভাঙা মাদকতা। সারাদিন তো পড়ে আছে।

দিগ্বিজয় বলেই গেছে "ডিনারের পর ফিরব। আজকের দিনটা তোমার"

দু-দশ লাখ যাই হোক না কেন, এই অনুভূতি কী টাকার অঙ্কে মাপা যায়? অন্যান্য মেয়েদের থেকে ও আলাদা। কেন? কী ভাবে?

ঢেউ-এর তালে তাল মিলিয়ে দুজনে হারিয়ে যাচ্ছে আরও গভীরে। আরও... আরও... আরও গভীরে... দেওয়ালির ভয় করছে। সাঁতার জানলেও শোভনের মতো পারদর্শী নয়। আনন্দে হলেও সারা শরীর কাঁপছে। বাধা দিয়ে বলল "আর না। ফ্ল্যাগের শেষ সীমায়"

"ফ্ল্যাগ? কীসের ফ্ল্যাগ?"

"দেখেননি সমুদ্রে নামার আগে লেখা ছিল, ফ্ল্যাগের সীমানা ছাড়িয়ে যাতে না যাই"

“তাই নাকি?”

“আমারও টায়ার্ড লাগছে। চলুন ফেরত গিয়ে বিচে রিল্যাক্স করি” - সমুদ্রসাঁতার মেয়েদের ক্লান্ত করে -

“বেশ, চল”

লাউঞ্জারে বসে দেওয়ালি তোয়ালে দিয়ে গা মুছল। এমনিতেই রং কালো। প্রখর রোদের তাপে, সমুদ্রের জলকণার প্রলেপে, আরও শ্যামলা হয়ে যাবে, যদি তাড়াতাড়ি না মোছে। সামনে এতগুলো ছবির শুটিং। মেক-আপের প্রলেপ লাগিয়েও শ্যামলা রঙের আবরণকে ঢাকা যাবে না। শোভন-দিগ্বিজয়ের সঙ্গে লাখের দামে আজকের অভিসার কাল শেষ হয়ে যাবে। এই চেহারাকে সম্বল করে এগিয়ে যাওয়াই ভবিতব্য। বলিউডে সবে পা দিয়েছে। হলিউড কাছে আনতে দরকার শুধু ভাগ্য আর সময়।

“ভীষণ খিদে পেয়েছে”

শোভনের কথায় ফিরে তাকাল “এই তো ব্রেকফাস্ট খেলেন...”

“কতক্ষণ আগে। তাও কি যেন নাম বলল বুরবুর আয়েম। চল লোকাল সিফুড ট্রাই করে দেখি”

“আপনি খান, আমি খাব না। অলরেডি ব্রেকফাস্টে ভাত খাওয়া হয়ে গেছে। এভাবে খেলে তো মোটা হয়ে যাব”

“আমাকে কম্প্যানি দেবে না?”

“কম্প্যানি দিতে কোনও আপত্তি নেই। তবে খাওয়াতে নেই। এভাবে খেলে যে-কটা সিনেমা হাতে আছে, তাও যাবে। কেউ নেবে না” বিকিনির ওপর বুটিকের কাজ করা লুঙ্গি জড়িয়ে, তোয়ালে দিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢেকে মুচকি হেসে বলল “আমাদের হিরোইনদের অনেক বুঝেশুনে চলতে হয়। একটু ফ্যাট জমলেই ডিসমিসড। চলুন আপনাকে কম্প্যানি দিচ্ছি”

বিচের গা ঘেঁষে দুজনে উত্তরে হেঁটে চলেছে। হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশ সেক্লুশন থেকে সেমিনিয়াক লেগানের জনবহুল এলাকায়। পেটিটেঙ্গেট বিচ যতটাই নিরালা, সেমিনিয়াক বিচ অনেক বেশি লোকাকীর্ণ। দেওয়ালির আন্দাজ করতে অসুবিধা হল না, কেন ওরা এই নিরালা দিকটাই বেছে নিয়েছে। মহিলার সঙ্গে ফুর্তি করতে হলে, সেক্লুশন বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে, সে যখন স্ত্রী নয়। এদিকে অনেক লোকের সমাগম। ছোট, মাঝারি, বড় অনেক খাবারের দোকান। এই তিন কিলোমিটার হাঁটাতে শোভনের খিদেও যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

“বড় রেস্টুরেন্টে তো সব সময়ই খাই। ছোট রেস্টুরেন্টগুলো অনেক বেশি অথেনটিক”

দেওয়ালি কোনও জবাব দিল না। নিজে যখন খাবে না, শোভন কোথায় খেতে চায়, ভেবে কী লাভ?

“একটা সি-ফুড প্ল্যাটার নিই? ভাগাভাগি করে খাব”

“আমি তো আগেই বলেছি, খাব না। সকালে ভাতের ব্রেকফাস্ট। দুপুরে আবার লাঞ্চ। বাপ রে... আমার এত খাওয়া ধাতে নেই”

শোবিজ দুনিয়ায় ঢোকার পর থেকেই বুঝে গেছিল, এই লাইনে টিকতে গেলে যেমন রথী-মহারথীদের খুশি করতে হবে, চেহারাটাও আটুট রাখতে হবে। মানে খাওয়া কন্ট্রোল করা। যতদিন বডি ফিট আছে, স্লিম আছে, ততদিন-ই কদর। না হলে বৌদি, কাকি, মায়ের রোল ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। এ তো আর হলিউড নয়। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য চরিত্রের ডিসপসিশন পাল্টে যায়। টলিউড-বলিউডে হিরোইনদের চেহারাই প্রধান। ওই বেচে ব্যবসা। চরিত্র চিত্রায়ন গৌণ। সে তো আর অমিতাভ বচ্চন নয়। যে চরিত্র বিশেষে গল্পের স্ক্রিপ্ট হবে। উঠতি তারকা মাত্র।

রাস্তার একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল শোভন। গরম গরম মাছ, রাস্তার ধারেই গ্রিল করে বিক্রি করছে।

“হোয়াট ফিস ইজ দিস?”

“মাহি-মাহি”

“ক্যান আই হ্যাভ ওয়ান?”

“ওয়েট এ ফিউ মিনিটস। লেট মি ফ্রেস গ্রিল ইট ফর ইউ”

“দারুণ। খেয়ে দেখলে পারতে। যতই হোটেল রেস্টুরেন্টে খাও না কেন, এই স্ট্রিট ফুডের স্বাদই আলাদা। আমি তো ব্যান্ডেলে পাড়াগাঁয়ের ছেলে। রাস্তার খাবার খেয়েই বড় হয়েছি”

“আপনি খান। এখনও ব্রেকফাস্টই হজম হয়নি”

যত্ন সহকারে গোটা মাছটাই সাপ্টাল। ঢেকুর তুলে বলল “আহঃ... পেট ভরে গেছে। হাঁটতে পারবে? চল জায়েগাটা একটু ঘুরে দেখে নিই। হজম করতে হবে তো...”

জালান রায়া সেমিনিয়াকের সারি সারি ডিজাইনার বুটিকের ড্রেসগুলো দেখছিল। কয়েকটা সিল্কের ড্রেস পছন্দসই, বেশ ভাল। কিনলে মন্দ হত না। সঙ্গে পার্স আনেনি, তাই কেনা যাবে না। শোভনের কাছে চাইতে লজ্জা করছে। এমনিতেই দিনের জন্য দু-লাখ দিয়েছে। এক্সট্রা আরও এক লাখ। এর পরে কী আর চাওয়া যায়? পরে নয়, এক বিকেলে, আবার ঘুরে কিনে নিয়ে যাবে। এছাড়াও ব্র্যান্ডেড দোকানের সারি - হ্যান্ডিক্রাফট, আর্ট ওয়ার্ক।

“ওয়াক”

ফিরে তাকাতেই দেখল, শোভন বমি করছে। সারা মুখ লাল হয়ে গেছে। রাস্তার ওপর বসে পড়ল।

“কী হল?”

"পে...টে ব্য...থা..." শোভন কথা বলতে পারছে না।

ঠিকই তো ছিল। হঠাৎ আবার কী হল? দেওয়ালি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ঠিক কী করবে বুঝতে পারছে না।

শোভন এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করছে "হোয়ার ইজ দ্য টয়লেট?"

আঙুল তুলে পাবলিক টয়লেটের দিকে ইঙ্গিত করল। রাস্তা থেকে উঠে, টয়লেটের দিকে ছুটল। দেওয়ালির মনে হল, নিশ্চয়ই সিরিয়াস কিছু হয়েছে। ওই মাছ খেয়ে নয়ত? এই বিদেশ বিভুয়ে তার কী করার আছে? কলকাতায় থাকলেই বা কী করত? হাসপাতালে নিয়ে যেত।

"ইজ দেয়ার অ্যান হসপিটাল নিয়ার বাই?"

"বি আই এম সি হসপিট্যল ইন কুটা" পাশের একজন বলল।

"হাউ ফার?"

"নট ফার। জাস্ট টেক এ ট্যক্সি। দে নো হোয়ার ইট ইজ"

পাবলিক টয়লেট থেকে বেরবার আগেই দেওয়ালি ট্যক্সি ধরে ফেলেছে "হাসপাতালে চলুন"

শোভন দাঁড়াতে পারছে না। মুখটা আরও বেশি লাল। ট্যক্সিতে উঠতে গিয়ে আবার বমি। দেওয়ালি ওকে ধরে কোনওক্রমে ট্যক্সিতে তুলল।

হাসপাতালে বেড প্যান আনার আগেই ট্রলিতে আবার পায়খানা করে দিল। ইট মাস্ট বি সামথিং সিরিয়াস। দেওয়ালি উদগ্রীব হয়ে ডাক্তার-নার্সদের কাণ্ডকারখানা দেখছে। সংক্ষিপ্ত হিস্ট্রি নেওয়ার পরই ড্রিপ চালিয়ে ইঞ্জেকশন দিল। কার্ডিয়াক মনিটর লাগিয়ে দিয়েছে।

এক ফাঁকে ডাক্তার জিজ্ঞেস করল "ডস হি হ্যভ অ্যাসমা?"

"নো ক্লু" আমতা করে বলল "আই অ্যাম নট অ্যাওয়ার অফ হিজ মেডিক্যাল হিস্ট্রি"

জানার কথাও নয়। হঠাৎ অ্যাসমার কথা জিজ্ঞেস করল কেন? ওরা একটা লম্বা পাইপ দিয়ে ওকে বমি করাচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছে না, কী হয়েছে? কিছুক্ষণের মধ্যে সম্বিত ফিরল শোভনের।

ক্ষীণ স্বরে বলল "উফ... মাথা ফেটে যাচ্ছে"

কপালে হাত দিতেই ছ্যাঁত করে উঠল। জ্বরে গাঁ পুড়ে যাচ্ছে। ইশারায় ডাক্তার তাকে ডাকল। পাশের ঘরে বসিয়ে বলল "ইটস স্ক্রমবয়েড পয়জনিং। প্রেসুমেবলি ডিউ টু দ্য ফিস হি কন্সিউমড। হোয়াট ফিস ওয়াজ দ্যট?"

"ডোন্ট রিমেম্বার দ্য নেম এক্সজ্যাক্টলি। দে সেইড সামথিং লাইক মাহি"

“আহ, দ্যাটস ইট, মাহি-মাহি। সাম অফ দিস ওয়েসাইড জয়েন্টস স্টোর ফিস আন্ডার আনহেলদি কন্ডিশনস ফর ব্যাক্টিরিয়া টু জারমিনেট। ইট ইজ এ টাইপ অফ অ্যালারজিক রিঅ্যাকশন। ক্যান বি ফেটাল ইফ হি হ্যাস অ্যাসমা। ইউ সেইড, ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া”

“ওয়েল... উই আর নট দ্যাট ক্লোজ। থ্রি অফ আস কেম অন এ হলিডে” দেওয়ালি আমতা করে বলল।

“গুড। ইউ ব্রট হিম অ্যাট দ্য রাইট টাইম। ইট কুড হ্যাভ বিন সিরিয়াস। উই হ্যাভ সেন্ট ফর হিস্টামিন লেভেলস টু কনফার্ম দ্য ডায়গনসিস। অলস গিভেন বেনাড্রিল আইভি উইথ ডোমস্টল অ্যান্ড র‍্যানিটিডিন। হি সুড বি ফাইন” ঠোঁটের কোণে সান্ত্বনার হাসি। কী স্ক্যামেই না পড়ত, যদি কিছু হয়ে যেত! লোক জানাজানি, পুলিস কেস। কেউ কী বিশ্বাস করত তাকে?

এখন ভালোয় ভালোয় ফেরত গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। ফুর্তি সিকয় উঠেছে। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। লাখ টাকা ফেরত দিয়ে দেব, তুই ভাল হয়ে বাড়ি চল।

শোভনের পাশে কতক্ষণ বসে ছিল জানে না। হঠাৎ খেয়াল হল দিগ্বিজয়কে জানানো হয়নি। শুনেই দিগ্বিজয় ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল “এখন কেমন আছে?”

“ডাক্তার তো বলল চিন্তার কিছু নেই। হাসপাতালে কয়েকদিন রাখবে। আন্টিল হি ফুললি রিকভারস”

“তুমি ওর সঙ্গে আছ তো?”

“হ্যাঁ। ওকে ছেড়ে কোথায় যাব?”

“আমি তো মিটিং-এ ফেঁসে আছি। মিটিং-এর পর আমি যাব। কী হাসপাতাল বললে?”

“বি আই এম সি হসপিট্যাল, কুটাতে। পেটিঙ্গেট থেকে খুব বেশি দূর নয়”

“মিটিং শেষে চলে আসব। তবে রাত হবে। কোনও ইমারজেন্সি হলে আমাকে অ্যাট ওয়ান্স ফোন করো”

“শিওর”

শোভন ঘুমচ্ছে। কেবিনে তার বেডের পাশে বসে আছে দেওয়ালি। উদাস দৃষ্টিতে একবার শোভনকে দেখছে। কখনো জানলার বাইরে, অপরাহ্নের আলোয়, স্মপাং শিউরের জালান নগুড়া রাই বাইপাসের এই অঞ্চলটাকে। জানলার ফাঁক দিয়ে, দূরে দেখা যাচ্ছে, একফালি নীল জলের আভাস।

নার্স ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করল “ইজ দেয়ার এ লেক নিয়ারবাই?”

“ইটস নট এ লেক, ইটস এ ক্যান্যাল। পুরা কান্ডি নর্মদা”

জল দেখলেই দেওয়ালির মন ভরে যায়। সে পেটিটেঙ্গেট বিচের জলরাশি হোক, চাই পুরা কান্ডি নর্মদা ক্যান্যাল। কোথায় যেন এক স্নিগ্ধতার আমেজ এনে দেয়। সবুজের ফাঁকে নীলের ঝলক যেন একটু বা নতুন ছন্দ। প্রকৃতির ডাক... সেখানেই শান্তি, সেখানেই তৃপ্তি। নিজেকে যেন খুঁজে পায় প্রখর আলো, কোলাহল,

স্টারডমের বাইরে। উদাসী মন আশ্রয় খুঁজে পায় সজীব প্রকৃতির রূপ তরঙ্গে। জীবনের সব ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে আবার নিজ মহিমায় সাজতে, নতুন ছন্দে, নতুন আবরণে।

মনে নেই, এর আগে কখনো এমনভাবে ঠায় বিছানার কারও পাশে বসে ছিল কি না। ছোটবেলায় একবার ভীষণ জ্বর হয়েছিল। সারারাত ঘুমতে পারেনি। মা ঠায় সারারাত পাশে বসে শুশ্রূষা করেছিল। এই মুহূর্তে দেওয়ালি ভুলে গেছে, সে উজ্জ্বল তারকা। ভুলে গেছে, শোভনের সাত দিনের মিস্ট্রেস। মায়ের সেই মুখটা বারবার ভেসে উঠছে।

দিগ্বিজয়ের কাছে শোভন চেনা সহজ অঙ্কের ক্যাল্কুলেটার। দেওয়ালির কাছে এখন আর নয়। যেন এক অসহায় শিশু মায়ের নরম স্পর্শের জন্য, অচৈতন্য ঘোরে প্রতীক্ষা করছে। অন্তরে দেখতে পাচ্ছে, এক অবলা শিশু তার দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে - একটু সহায়...

খাওয়া, আনন্দ, ভুলে দেওয়ালির যেন তা পূরণ করাই প্রধান ধর্ম। কেউ দিব্যি দেয়নি। কেউ মুচলেখা লেখায়নি। সেখানেই যেন মনের তৃপ্তি।

অনেক রাতে দিগ্বিজয় এল "এখন কেমন আছে?"

"নার্সরা তো বলল ঠিক আছে"

"উঠেছিল?"

"হ্যাঁ" মাথা নাড়ল দেওয়ালি "কিন্তু ডাক্তার বলেছে চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত কিছু খেতে দেবে না"

"থাকতে বলেছে?"

"না"

"তাহলে চল, রিসর্টে ফেরত যাই"

"আপনি যান, আমি এখানেই থাকব। যদি কোনও দরকার লাগে..."

"খাওয়া?"

"ওদের বলে দিয়েছি। ওরা খাওয়া সার্ভ করে দেবে" একটু থেমে, কী ভেবে আবার বলল "কিছু টাকা দিয়ে যাবেন? আমার কাছে কিছুই নেই। যদি কোনও দরকার লাগে..."

দিগ্বিজয় ওর হাতে কিছু ইন্দোনেশিয়া রুপায়া গুঁজে বলল "ও যদি হাসপাতালের বিল দেওয়ার অবস্থায় না থাকে, আমি এসে মিটিয়ে দেব। কখন কত বিল দিতে হবে, জানিয়ে দিও। সারাদিনের ধকলের পর ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। আমি রিসর্টে গিয়ে একটু রেস্ট নিই"

মাথা নাড়ল দেওয়ালি। লোকটা নয় তার সঙ্গে ফুর্তি নাই বা করল। অসময়ে একটু তো শুশ্রূষা তো আশা করতে পারে?

ওরা চারদিন পর শোভনকে ছাড়ল। দিগ্বিজয়ের প্রয়োজন হয়নি। শোভন-ই ডেবিট কার্ড দিয়ে বিল মিটিয়ে দিল। এই চারদিনে শোভনকে চোখের আড়াল করেনি দেওয়ালি। সঙ্গে থেকেছে। দিন থেকে রাত। সময় অসময়ে, যখন যা প্রয়োজন হয়েছে এগিয়ে দিয়েছে। টয়েলেটে নিয়ে গেছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে।

শোভন এই কদিনে দেওয়ালির মাতৃরূপ দেখেছে। মায়ের কথা আবছায়া মনে পড়ে। কিন্তু এর আগে ঝলমলে দুনিয়ার কাউকে পায়নি মায়ের মতো করে। মুখে প্রকাশ না করলেও, মনে মনে লজ্জা পেয়েছে।

ছিঃ...

এই মেয়েকেই ভাড়া করে এনেছিল আনন্দ-ফুর্তির জন্য!

ভাবতেও ঘেন্না লাগছে। মানুষ না হতে পারুক, এখনও অমানুষ হয়নি। তাকে নতুন জীবন দিয়েছে এই মেয়েটা। সে স্টার, না সাধারণ একজন, চার করে লাভ নেই। সে শুধুই এক নারী। যে শুধু আনন্দ দেওয়ার জন্যই নয়, মায়ের রূপ ধারণ করে মাতৃত্ব পালনও করতে পারে। মনে মনে প্রণাম জানিয়েছে, সেই মহীয়সী দেবীকে, যে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছে। শিক্ষা হল, আর কখনো একে নিয়ে ফুর্তির কথা ভাববে না। দিগ্বিজয় বললেও না। ওরা ধান্দা বোঝে। শোভনের তো কোনও ধান্দা নেই। ধান্দা না করেই সে ম্যাগনো ইন্ডিয়ার পার্টনার। সব-ই তো আছে। নেই শুধু একটু মনভরা স্বীকৃতি।

এর আগেও অবন্তী, ইমা, অনেক মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করেছে। কিন্তু এই দেওয়ালি মেয়েটা, ধান্দার বাইরের অন্য দুনিয়ার জীব। কোন প্রদেশের, জানা নেই। শুধু জানে, স্টারডমের বাইরে, এই সাতদিনে খুঁজে পাওয়া আরেক অন্য দেওয়ালিকে। যে অন্ধকারে রংমশাল জ্বালিয়ে জরাজীর্ণ, ক্লেদাক্ত, মৃতপ্রায় অস্তিত্বের বুকে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে, যে চকিত ক্ষণিকের বিলুপ্তির অন্ধকারে, নতুন প্রাণ দিতে পারে। যার ছত্রছায়ায়, উন্মাদনা ম্লান হয়ে যায় শান্তির দরবারে। যেখানে ফুল ফোটে না, পাপড়ি ঝরে না।

সেখানেই আছে এই দেওয়ালি। মেক-আপ ছাড়া।

তাকে প্রণাম জানিয়ে কলকাতায় ফিরল।

---

17 তাসমানীয় স্যামনের মাস্কার পন ফ্রেগলা, ব্রেইজডফেনেল, পিস্তাসি ও ডিললেনসসে।সঙ্গে কোরাল ট্রাউট, চিনির সিরাপে কড়াই শুঁটির সঙ্গে, মাখনে বেকড কুমড়োর সঙ্গে লেবুর ভেলুট।একই প্ল্যাটারেটুনা মাছ, ভেজিটেবল র‍্যাটাটুলি, বেসিল পেস্ত, লেমন ব্যুরে ব্ল্যাংক দিয়ে ম্যারিনেট করা

18 ইন্দোনেশিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের মতো

19 হুইস্কি

20 ভাতের পরিজের সঙ্গে ফালাফালি চিকেন, রোস্টেড নারকেল, আদা আর কচি পেঁয়াজ

বারো

“মৃদুলদা, রিল্যাক্স। উই উইল হেল্প আওয়ারসেল্ভস” মনিকান্ত মোহতা সিঙ্গল মল্টে চুমুক দিয়ে বলল। তবুও ইন্দ্রজিৎ দত্ত তৎপর। অতিথি পরিষেবার যাতে কোনও ত্রুটি না হয়।

শুভ্রজিৎ, গজেন্দ্র ধনির গ্লাসটা রিফিল করে বলল “চিন্তা কর না মৃদুল। আমি ঠিক সময় টপ আপ করে দেব”

দার্জিলিং-এর জলাপাহাড়ে ইন্দ্রজিতের পুরনো বাড়িতে শুক্রবারের সন্ধেয় আসর। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াগুলো অন্ধকারের আস্তিনে ঢাকা। অবসারভেটরি হিলের উত্তর দিকে ওয়াইয়ের উত্তরে কাঁটাপাহাড় আর জলাপাহাড় ভাগ হয়ে গেছে। এই দুইয়ের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গমালা।

দিনের বেলায় এই উত্তুঙ্গ পর্বতের শৃঙ্গমালার দিকে তাকালে, একটা অনুভূতি জাগে। সুন্দর? না ভয়ঙ্কর সুন্দর? যেন ধ্যানমগ্ন দেবাদিদেব মহাদেব। ধ্যানমগ্ন হয়ত নয়। ধ্যানের ভান করে চোখ বুজে মিটমিট করে হাসছে। নিজেই যেন মজা পাচ্ছে নিজের সৃষ্টির খেলায়। বিশাল পর্বতশৃঙ্গ ধাপে ধাপে উঠে গেছে মেঘের আস্তিন ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে।

মনটা উদাস বাউলের মতো একতারা বাজিয়ে গেয়ে ওঠে ‘আয় আয় খেলবি আমার কোলে’। ইন্দ্রজিৎ, মনিকান্ত, গজেন্দ্র বা শুভ্রজিতের সে ডাক শোনার সময় কোথায়? ভাগ্যিস। নইলে কী যে হত? সব ছেড়েছুড়ে, এখানেই পড়ে থাকত।

যদিও ইন্দ্রজিতের ছোটবেলা কেটেছে এখানেই সেন্ট পলস স্কুলে। তখন জীবনটা অন্য রকম ছিল। পাইনের পাতায়, হিমের কুয়াশায় জমে থাকা জল, এক অবিস্মরণীয় জলতরঙ্গের মতো টুপ টুপ করে পড়ছে। সুদূর থেকে ছুটে আসছে মেঘের ঢেউ। চেনা না হয়েও, চেনা। যদি সত্যি অনুভব করত, হয়ত কলকাতার ডামাডোল ছেড়ে, এখানেই পড়ে থাকত। আর তা হয় না। এখন অন্য দুনিয়া। অন্য জীবন। এই মায়াজাল কাটিয়ে একদিন চাকরি নিয়ে চলে গেছিল পাটনায়। এখন শুধু মাঝেমধ্যে লাস্যময়ী তারকাদের নিয়ে নিভৃত তৃপ্তির জন্য ফিরে আসা।

আজ অবশ্য সেরকম কেউ নেই, শুধুই ওরা। সিরিয়াস আলোচনার মধ্যে ফুর্তিবাজ মহিলাদের না জড়ানোই ভাল। ওরা আসে ইন্দ্রজিতের আতিথেয়তার ফ্রি ফয়দা তুলতে। অঢেল খাওয়া, দামি পানীয়। ওর গাড়ি নিয়ে লেবং ছাড়িয়ে টুকভের টি এস্টেটে বেড়াতে, ওরই টাকায় মৌজ করতে।

সেলিব্রিটিদের এটাই এক রোগ। যেখানে কিছু ফ্রি, হাতিয়ে নাও। যেন বুভুক্ষের ঘর থেকে আসে। প্রতি রাতে কোনও একটা পার্টিতে গিয়ে ফ্রি খানাপিনা। পরের দিন পেজ-থ্রিতে ফলাও ছবি। ইন্দ্রজিতের মনে হয়, রোজ এরকম পার্টিতে খেলে, বাড়ির খায় কখন? আর কেউ যদি খাওয়ায়, তাদের যতটা সম্ভব দুইয়ে, সেরাটা তুলে নাও। যেন উপস্থিতি দিয়েই ধন্য করছে।

তারা তো আর যে সে লোক নয়! অন্তরালে ছেলেবৃত্তি করলেও, জনসমক্ষে সেলিব্রিটি। স্ট্যাটাস আছে বৈকি। নইলে কি ফিতে কাটার জন্য এক সময় লোকে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা ঢালত? চিট ফান্ডের অস্তাচলে, সে গুড়ে এখন বালি। তাই ইন্দ্রজিৎ বা শোভনের মতো কিছু দিলদরিয়ার মজলিস আলোকিত করে, যা ফাউ পাওয়া যায়। বিনিময় একটু হাসি। মিষ্টি ভাষায় স্বীকৃতি। প্রয়োজনে বিছানায় সঙ্গী হতেও আপত্তি নেই। স্টারডমের লোভে হরদম দেহ বিক্রি করতে হচ্ছে। বিনিময় যদি কিছু পাওয়া যায়...

অন্যরা তির্যক ভাবে দেখলে বলে "কেন নয়? ওরাই তো খাওয়াতে আগ্রহী। এটাও নেটওয়ার্কিং-এর অঙ্গ"

সাধারণ মানুষের চেয়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, যে কত মধু লুকিয়ে আছে, যারা টাকা ঢালে, তারাই বলতে পারে। তাদের স্ট্যাটাস বাড়ে। এদের ফ্রিবি লাফিয়ে লাফিয়ে চাতকের মতো খুঁজে বেড়ায় নতুন শিকার।

আজ অবশ্য যারা এখানে, তারা এদের মতো কেউই কাঙাল নয়। অনেকেই সেলিব্রিটিদের নিয়ামক। সবাই বড় খেলোয়াড়।

মনিকান্ত মোহতা ভেজিটেবল ভল্যুভেন্টে কামড় দিয়ে বলল "তোমার জন্যই আমাদের এই অবস্থা"

"আমি আবার কী করলাম?" ইন্দ্রজিৎ হুইস্কিতে চুমুক দিল।

"এই সব নতুন নতুন ডিরেক্টেরদের স্লট দিয়ে দিচ্ছে। ওরা তোমার স্লট পেয়ে ধীরে ধীরে ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকে পড়ছে"

"আমি একা কেন? মাল্টিপ্লেক্স চেইনগুলো তো আমার কথায় চলে না। আমি না দিলেও, ওই চেইনে ওরা ঠিক স্লট করে নেবে"

"মাল্টিপ্লেক্স তো আজকের। বাঙালি কমিউনিটিতে তোমার হলের অনেক বেশি ট্র্যাডিশন। পাবলিসিটিটা অনেক বেশি পায়"

"হলটা তো আজকের নয়, বহুদিনের। আমার বাবার আমলের। বারবারই আমরা কোয়ালিটি বাংলা সিনেমাকে প্রায়রিটি দিয়ে এসেছি। আজ সেই ট্র্যাডিশন ভাঙি কী করে?"

গজেন্দ্র ধনি ওপাশের সোফা থেকে উঠে ইন্দ্রজিতের পাশে বসল। এক পলক শুভ্রজিতের দিকে তাকিয়ে বলল "মৃদুলদা থোরা তো সামঝো। এভাবে যদি কোয়ালিটি সিনেমা বাজার খেয়ে নেয়, আমরা তো পথে

বসব। তামিল রিমেক লোকে নিচ্ছে না”

“তো অন্য কিছু কর। মেক গুড মুভিস টু কিপ আপ উইথ দেম”

“নামকরা কোয়ালিটি ডিরেক্টররা তো আমাদের ব্যানারে কাজ করতে চায় না। ইভেন উইথ লুক্রেটিভ অফারস”

“ইউ আর স্ট্যাম্পড অ্যান্ড ব্র্যান্ডেড। গ্রামের মানুষেরাও তোমাদের গিমিক্স বুঝে গেছে। রামোজি আর প্রয়াগ ফিল্ম সিটিতে শুট করে সুইটজারল্যান্ড আর অ্যাফ্রিকার স্বপ্ন দেখালে লোকে নেবে কেন?”

শুভ্রজিৎ আস্তে করে বলল “মৃদুল, পুরোটাই লোকাল সেটসে নয়। আমি কিন্তু সত্যি অ্যাফ্রিকা গিয়েছিলাম”

“গিয়েছিলে কিছু আউটডোর সটস ফিল্ম করতে। বাকি তো এখানে শুট করা। পিপল আর ইনটেলিজেন্ট এনাফ। ইউ ক্যান ব্লাফ সাম পিপল সামটাইম, বাট ইউ কান্ট ব্লাফ অল অফ দেম অল দ্য টাইম”

শুভ্রজিৎ চুপ করে গেল। এত বছরের ফিল্মি জীবনে ছোটবেলা থেকেই সন্তর্পণে সবাইকে সন্তুষ্ট রেখে চলার চেষ্টা করেছে। তাইত এত বছর ধরে হিরোর মুকুটটা আগলে রাখতে পেরেছে। যেমন সি গ্রেড সিনেমার জন্য চামুণ্ডেশ্বরী ফিল্মস-এর প্রয়োজন, তেমনি কোয়ালিটি সিনেমার জন্য অন্যদেরও প্রয়োজন। স্টারডম আর আধিপত্য ইন্ট্যাক্ট রাখতে গেলে কোয়ালিটি আর নম্বর দুটোই জরুরি। সেই আশির দশকে চামুণ্ডেশ্বরী ফিল্মস কোথায় ছিল?

উত্তমকুমার মারা যাওয়ার পর, তখন বাংলা সিনেমা হাবুডুবু খাচ্ছে। বাবা-মায়ের ডিভোর্সের পর সংসারের বোঝা মাথায়। অথচ কেউ সুযোগ দিচ্ছে না। সংসার চালাতে হবে তো। তাই থিয়েটার থেকে শ্রুতি নাটক। যেখানে যা পাওয়া যায়।

যদিও দুটো ছবি ‘জলাতঙ্ক’ আর ‘আপন ভোলা’ কপালে জুটল, সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি। একেই বলে কপাল। হঠাৎই একদিন খুলে গেল। তৃপ্তি পালের প্রোডাকশনে, রথিকান্ত গুহর ‘চিরসঙ্গী’-তে শুধু নায়কের রোলই পেল না, মেজর ব্লকবাস্টার হিট। আর ফিরে তাকাতে হয়নি। রথিকান্ত গুহর বেশিভাগ ছবিতেই শুভ্রজিৎ হিরো।

ইন্দ্রজিৎ বেয়ারাকে ইঙ্গিত করল খাবার সার্ভ করতে “কিছুই তো খাচ্ছ না। কাম অন... প্লিজ...”

“মৃদুলদা ডোন্ট ওয়ারি। উই উইল হেল্প আওয়ারসেল্ভস” গজেন্দ্র চিজ বলস মুখে পুরে বলল “আমাদের জন্য এদের একটু চেপে দাও। প্লিজ...”

ইন্দ্রজিৎ হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে, সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল “তোমাদের ব্যাবসা উঠে গেলে কিছু যায় আসে না। তোমাদের মেন-স্টে রাখির ব্যাবসা তো ইন্ট্যাক্ট। চামুণ্ডেশ্বরী উঠে গেলেও কিছু যায় আসে না।

আমার তো হল আর ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ছাড়া, অন্য কোনও ব্যাবসা নেই। খাব কী?”

“তোমার আবার খাবার অভাব? ঠাট্টা করছ?”

“একদম নয়। আমি অ্যাম টকিং দ্য ট্রুথ”

“আরে ইয়ার ছোড়। ইয়ে কোই বাত হ্যায়!”

শুভ্রজিৎ টেরেসের এক কোণে বসে শুনছিল। কোনও বক্তব্য নেই। এত বছর, দু নৌকোয় পা দিয়ে খেলেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে চামুণ্ডেশ্বরীর জায়গাটাও শিথিল হয়ে আসছে। হিরোর বয়স তো পার হয়ে গেছে। এক সময়কার চকলেট হিরোর ক্রিম আর নেই। টিকতে গেলে, ক্যারেক্টার রোল করেই টিকতে হবে। চামুণ্ডেশ্বরী আবার এসবের ধার ধারে না। লোককে রঙিন স্বপ্ন দেখাতেই ব্যাস্ত। সেদিকে মৃদুলের গোত্রের লোকেরা চান্স দিতেও পারে।

সমর্পিতা আলাদা হয়ে যাওয়ার পর, যেভাবেই হোক, এখন নিজের প্রোডাকশন কম্প্যানিকে দাঁড় করাতে হবে। আগেও একবার চেষ্টা করেছিল। লাগেনি। তখন অবশ্য স্টারডমের বৃহস্পতি তুঙ্গে নাচছে। তাই গা করেনি। বছরে কুড়িখানা ছবি। বাজার রমরমা। পুষিয়ে নিয়েছে।

এখন তো আর সে রমরমা বাজার নেই। সমর্পিতা সরে যাওয়াতে আরও অসহায়। তনুশ্রীর সঙ্গে বিয়ের পরেই জ্যোতিষ বলেছিল, বিয়ের ঘরে নাকি গণ্ডগোল আছে। সারা জীবনই ভুগতে হবে। দু-দুবার বিয়ে করেও তো টিকল না। এটাও যাওয়ার মুখে। এখন ভালোয় ভালোয় গুছিয়ে নেওয়া ছাড়া, কন্ট্রভারসিতে জড়িয়ে লাভ নেই।

রাতের আকাশটা মধুময়। যেন স্বপ্নের ছবি। দু-এক পেগ পেটে পড়লে ছবিটা আরও রঙিন। একটু ঠান্ডা লাগলেও, রঙিন জলের উত্তাপে বেশ আরামদায়ক। হঠাৎ সামনের পাইন গাছটার মাথায় একটা বড় পাখি এসে বসল।

“প্যাঁচা” ইন্দ্রজিৎ পানীয়তে লম্বা চুমুক দিয়ে অবাক।

মনিকান্ত একটু জড়ানো গলায় বলল “কী করে বুঝলে? তুমি কী অরিন্থলজিস্ট নাকি?”

ইন্দ্রজিৎ হো হো করে হেসে উঠল “ছোটবেলা থেকে শিকার করছি। পাখি, জন্তু জানোয়ারের আওয়াজ শুনলেই বুঝতে পারি। ডানার আওয়াজেই বোঝা যায়”

“ডানার আওয়াজ শুনেই বুঝে গেলে ওটা প্যাঁচা? যাঃ বাওয়া! এ তো দেখছি স্বয়ং সেলিম আলি এলেন” খিক করে হাসল। হাতের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল “ওটা বাজপাখি”

ইন্দ্রিজিৎ বিরক্ত হয়ে বলল “তুমি কী সেলিম আলি নাকি?”

গজেন্দ্র চুপ করে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিল। বিরক্ত গলায় না ফিরেই বলল, “আঃ, চুপ করবে? কোথায় পাহাড়ের সন্ধে দেখবে, না প্যাঁচা নিয়ে চ্যাঁচানি”

মনিকান্ত জড়ানো গলায় বলল “সন্ধে নামা? মৃদুলদা তুমি তো দেখছি বিভূতিভূষণ হয়ে গেলে। এবার কি একখানা পাহাড়ের পাঁচালি বেরোবে নাকি? নেক্সট একটা পাহাড়ের পাঁচালি নামিয়ে ফেলা যাক। বাজারে তো কিছুই খাচ্ছে না। এটা যদি লেগে যায় সত্যজিৎ রায়ের আশীর্বাদে”

শুভ্রজিৎ এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। আস্তে বলল, “গজেন্দ্র তো ঠিকই বলেছে। ফালতু কথা না বলে, চুপচাপ দেখ না সন্ধেটা। কলকাতায় ফিরলে তো আর দেখা যাবে না”

সমর্পিতা চলে যাওয়ায় এমনিতেই উদাসীন। বাজে কথায় না জড়িয়ে নিঃশব্দে হুইস্কিটা উপভোগ করতে চাইছে। মনিকান্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। সবাই চুপ, সামনে তাকিয়ে।

বাগানের গেট যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে সরু রাস্তাটার ওপারে একঝাঁক প্রাচীন পাইনগাছ। দৃঢ় ঋজুভঙ্গিতে গাছগুলো সোজা একশো ফুটের কাছাকাছি উপরে উঠে গেছে। ঝাঁকড়া মাথাগুলো যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে। আশ্চর্য রঙে ভরে উঠেছে ওপরটা। সূর্যাস্তের পর অজস্র তারা মিটমিট জ্বলছে। সেই আলোয়, একটা নাম-না-দেওয়া রঙে ভরে রয়েছে আকাশ। ঠিক কালো নয়, ধুসরও নয়, কালচে নীলাভ একটা আশ্চর্য রং। বর্ণনাতীত আঁধার রঙে ঢেকে গেছে চরাচর। নীচে শহরের আলো ঝিকমিক করছে। মাঝে মাঝে কুয়াশার চাদর জড়িয়ে নিচ্ছে সন্ধ্যা। চারপাশে ঝিঁঝির ডাক আর পাইনপাতার মধ্যে বয়ে যাওয়া বাতাসের ফিসফিস। সব ছাপিয়ে দিগন্তবিস্তৃত দেবতাত্মা হিমালয় অটল গাম্ভীর্যে, নির্নিমেষ তাকিয়ে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের বুকে শহররূপ অহমিকার দিকে।

মৃদুল হঠাৎ বলে উঠল “মনিকান্ত একটু বেশি গিলে ফেলেছ বস। আমার চেয়ারটায় ধাক্কা দিচ্ছ কেন?”

অতীতের স্বপ্নে মশগুল শুভ্রজিৎ চোখ বুজে দ্য সঙ অফ লোনলি মাউন্টেন হাম করছিল। চোখ খুলে বলল, “মৃদুল তো ঠিকই বলছে। মনিকান্ত গো স্লো বস। বেশি খেয়ে ফেলেছ। আমার চেয়ারটা ধরেও তো নাড়লে”

মনিকান্ত জড়ানো স্বরে বলল “বাত কেয়া? সবাই আমার দিকে আঙুল তুলছ কেন? বাঙ্গালিতে বলে না, যত দোষ নন্দ ঘোষ। হম কিসকো ঢকেলা? মাস্ট বি ওয়ান অফ ইউ। আমাকে ধাক্কা দিয়েছ। আমার চেয়ারটা নড়ে উঠল কেন?” চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ধপ করে পড়ে গেল।

“শালে কৌন কিসকো ঢকেলতা? হম ভি তো গির গয়া”

গজেন্দ্র এতক্ষণ চুপ করে ছিল। উঠে চিৎকার করে উঠল “ভূমিকম্প! ভূমিকম্প হচ্ছে!” বলতে না বলতেই, সজোরে পায়ের তলার মাটিটা দুলে উঠল।

চারজনেই উঠে দাঁড়িয়েছে। মনিকান্তর নেশা ছুটে গেছে, ভয় কাঁপছে। কেঁদে উঠল “মর জায়েগা। সব মর জায়েগা। হিমালয়জি, মাফ কর দেনা হম সবকো। ঔর কভি ইতনা দারু নেহি পিয়েগা”

হঠাৎ যেন দুম করে প্রকৃতির ঘুম ভেঙে গেছে। চারপাশে হঠাৎ কোলাহল। পাইন গাছগুলোর মাথায় পাখিরা তারস্বরে কিচিরমিচির শুরু করেছে। দূর থেকে ভেসে আসছে মানুষের চিৎকার। শাঁখের আওয়াজ। মহাকাল মন্দির থেকে ভেসে আসছে ঘন্টার শব্দ, মিশে যাচ্ছে চার্চের ঘন্টার আওয়াজ।

চারজনে হতভম্ব, দাঁড়িয়ে ভয় কাঁপছে। আবার হঠাৎ ভীষণ জোরে মাটি দুলে উঠল। এতই জোরে, শুভ্রজিৎ ছাড়া বাকি তিনজনই পড়ে গেল। পাহাড়, উতরাইতে নেচে গেয়ে শুটিং করার অভ্যাসে পায়ের গ্রিপ অনেক বেশি স্ট্রং। দূরে পাহাড়ের অন্দরমহল থেকে হাড় হিম করা গুড়গুড় শব্দ আসছে। আগে কখনো শোনেনি। লো পিচের ভৌতিক শব্দ। গিলতে আসছে।

মনিকান্ত চিৎকার করে উঠল, “জয় মা বজরংবলি, হমে রকসা করে”

পায়ের তলায় দুলুনিটা থামছেই না। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড কান ফাটানো আওয়াজ। চোখের সামনে পাহাড়টা ধসে পড়ল। পাইনগাছগুলোকে কে বা কারা, দলে মুচড়ে টেনেহিঁচড়ে, নীচে নামিয়ে নিয়ে গেল। পুরো জায়েগাটাই নিরেট অন্ধকার। পাহাড়ের কোলে যে আলোগুলো এতক্ষণ হীরের কুচির মতো ঝলমল করছিল, সেগুলো উধাও। চারদিক থেকে ভেসে আসছে মানুষের আর্তনাদ। মিশে যাচ্ছে পাখিদের চিৎকারে।

তারই মধ্যে শুভ্রজিতের গলাটা গমগমিয়ে উঠলঃ

‘প্রলয় নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ, হে নটরাজ...

জটার বাঁধন পড়ল খুলে...’

প্রকৃতি যেন তাদের হিসেবের সব অঙ্ক মিলিয়ে দিচ্ছে প্রলয় নাচনে। মৃদুলের জলাপাহাড়ের বাংলোয়। বাংলার বুকে রাজত্ব করা টিন্সেলের কাণ্ডারিরা ভয়ে নির্বাক। মৃত্যুর মুখোমুখি। এতক্ষণের সব হিসেব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির ফুর্তিতে।

ইষ্টদেবতার কাছে আর পাঁচজনের মতোই প্রাণভিক্ষা চাইছে অসহায় ভাবে।

তেরো

“রাতে প্রদীপ গোয়েঙ্কা মনি স্কয়ারের ফ্ল্যাটে ডেকেছে। যেতে পারবে?” অনিন্দ্য শীলের ফোনে চমকে উঠল অবন্তী।

স্টুডিও পাড়ায় শিল্পী-কাম-ডিরেক্টর অনিন্দ্য সুবিধাবাদী বলেই পরিচিত। সে আবার ফোন করছে কেন? খুব বেশি কিছু জানা নেই অনিন্দ্য সম্বন্ধে। পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করে। হালে গোটা দুয়েক ছবি করেছে। যে ধরনের ছবির সঙ্গে যুক্ত, সেখানে অবশ্য অবন্তীর ঠাঁই নেই, যদিও ‘সাদা হাঁস’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিল। ব্যাস। ওই পর্যন্তই।

ফিল্মি পার্টিতে দেখা হয়েছে বটে, তবে চেনা মুখের একটুকরো হাসি ছাড়া বিশেষ কোনও কথাই হয়নি। সব সময়ই আঁতেলদের সঙ্গে ঘোরাফেরা। তারা আবার অবন্তীকে বিশেষ পাত্তা দেয় না।

কিছুটা অবাক হল বটে। কেনই বা প্রদীপ গোয়েঙ্কা ওকে দিয়ে ফোন করাবে, বুঝতে পারছে না। হাতে তেমন ছবিও নেই। ভবিষ্যতের আশাও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। নাচা-গানার সিনেমাগুলো আর বাজারে খাচ্ছে না। ওখানেই তো ওর আধিপত্য। বয়সও বাড়ছে। তার আগেই গুছিয়ে নিতে হবে। দেখাই যাক, ভাগ্য ঝুলিতে নতুন কিছু উপহার দেয় কি না।

“ফ্রি আছি। কোথায়, কখন যেতে হবে?”

“আমি টেক্সট করে দিচ্ছি। সাড়ে-সাতটা থেকে আটটার মধ্যে পৌঁছে যেও” অনিন্দ্য ফোন নামিয়ে রাখল।

বাংলা ছবির মন্দার বাজারে যে যেভাবে পারছে, কামিয়ে নিচ্ছে। কেউ পলিটিক্সে, কেউ বা জ্যোতিষের অ্যাডে। আগে জানত না। এখন বুঝতে পারছে, অনিন্দ্যও মেয়েছেলের দালালি করে টাকা রোজগারের ধান্দায় লেগেছে। ওদের তো শুয়ে পড়ার কোনও স্কোপ নেই। তাই অন্যদের পা ফাঁক করিয়ে কামিয়ে নাও।

অথচ ক’বছর আগেও এমন শোচনীয় দশা ছিল না। বাংলা সিনেমা শহরে না হলেও মফসসলে চলত। চাকতিটা যে হঠাৎ ঘুরে যাবে, অনেকেই বুঝতেই পারেনি। মুখে না বললেও আজ দুষছে ধনিদের। বাড়াবাড়ি না করে একটু ভদ্রস্থ সিনেমা করলে তো অবন্তীর মতো মেয়েরা খেয়েপরে বাঁচতে পারত। অভিনয়টা একটুআধটু জানে। ভাল ছবি করলে নিজের ইমেজ পালটে ফিট হয়ে যেতে পারত। এভাবে অন্তত বেঁচে থাকতে হত না।

কী আর করা যাবে! এখানেই লাক ট্রাই...

ঠিক পৌনে আটটা।

মনি স্কয়ারের সিকিউরিটি টপকে আঠারো তলার লিফট থেকে বেরতেই দেখল, প্রদীপ নিজেই দরজা খুলে অপেক্ষা করছে।

“এস” স্পষ্ট বাংলায় বলল।

সিম্পলের ওপর দারুণ সেজেছে। লাল লহেঙ্গা-চলিতে দেহের আগুন ফুটছে। ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে যদি একটা ফ্ল্যাট হাতিয়ে নেওয়া যায়। প্রদীপের মতো ক্ষমতাবান...

চটিটা দরজার ওপারে খুলে বিশাল লাউঞ্জে ঢুকল। দেওয়াল জুড়ে বিভিন্ন দেশের আর্ট কলেকশান। এক কোণায় বিশাল এইচ ডি টিভি। ওয়াল ক্যাবিনেট, নানান দেশের কিউরিওতে ভরা। সেন্টার টেবিলের চারপাশ ঘিরে সাদা লেদারের সোফা। সাদা সোফার ওপর লহেঙ্গা-চলির লাল পলাশের মতো জ্বলজ্বল করছে।

“কী খাবে?”

“আপনি যা দেবেন”

“হুইস্কি খাও তো?”

“খাই। তবে ভডকাই প্রেফার করি। হুইস্কি বড্ড বেশি স্ট্রং”

একবার হুইস্কি খেয়ে বেসামাল হয়ে উলটে পড়েছিল। তারপর থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকে। এখানে বেসামাল হলে প্রদীপকে খুশি করতে পারবে না। সাবধানতাই ভাল।

“কী দিয়ে?”

“ম্যাঙ্গ জুস। আছে?”

“শিওর”

“আপনি কষ্ট করবেন না। কোথায় আছে বলুন, নিয়ে নিচ্ছি”

স্বনামধন্য শিল্পপতি তার জন্য ড্রিঙ্ক সার্ভ করবে, ভাবতেই কেমন কুণ্ঠা লাগছে। যার এক ইশারায় একশোটা বেয়ারা সর্বদা প্রস্তুত। অবন্তী সোফা ছেড়ে প্রদীপের পেছন পেছন এগোল। অন্য সময় হয়ত অনেক কাজের লোক থাকে, কিন্তু এই অভিসারের রাতের সাক্ষী রাখতে চায় না।

লাল লহেঙ্গা-চলির ছন্দে মনে হয়, ডল পুতুল ফ্ল্যাটের শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন বিয়ের পর মনে করত সঞ্জীব।

সেই চপলা ছন্দ। গজদন্তের মিষ্টি হাসির আনন্দ। নূপুর ছাড়া মাদক ঝংকারে। স্বপ্নমাখা কল্পনার কলেবরে। চপলা নারীর চকিত চাওয়া। আজকের দিনে, সেটুকুই পাওয়া।

তফাত শুধু একটু। সেদিন সে ছিল গৃহবধূ নারী। আজ রূপের পশরা নিয়ে অভিসারিণী। যা এতদিন ছিল পদ্মপর্ণাদির এক্তিয়ার। এখন সেই রথে সে সওয়ার। পদ্মপর্ণাদি কী ফায়দা লুটেছে, জানা নেই। সুযোগ যখন পেয়েছে, তাকে উসুল করে নিতে হবে।

ভডকায় জুস মেশাতে গিয়ে বলল "আপনি?"

"সিঙ্গল মল্ট অন দ্য রক্স" সোফায় বসে বলল "মেক ইওরসেলফ অ্যাট হোম"

"জরুর"

আহাঃ...

ছোটবেলায় যদি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ার সুযোগ পেত। সেও রাজীবের মতো ইংরেজি বলতে পারত। কৃষ্ণনগরের মধ্যবিত্ত পরিবারে সে সুযোগ কোথায়? কষ্ট চেপে ভডাকায় চুমুক দিয়ে বলল "আপ কা মেহেরবানি আপ নে মুঝে ইয়াদ কিয়া"

"মেহেরবানি কা কোই বাত হি নেহি। তুমহে মু মাঙ্গে কিমত মিল জায়গা। তুম ঔর ম্যায় ছোড়কে সিরিফ অনিন্দ্যকো ইয়ে বাত মালুম হ্যাঁয়। দুসরা কোই না জানে"

প্রতিশ্রুতিতে মন নেচে উঠল। মু মাঙ্গে মানে কী গোটা একটা ফ্ল্যাট? প্রমটারদের কাছে তো সেটা জলভাত। এক রাতের জন্য নাও দিতে পারে। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? অনেক প্রডিউসার, ডিরেক্টরদের সঙ্গে শুয়েছে। অত চিন্তা ভাবনা করেনি। কিন্তু রাজীবের মতো সম্ভ্রান্ত লোকের সামনে সন্তর্পণে বসা, কথা বলা। এরা অন্য ক্লাস, কাঁচা টাকার উটকো প্রডিউসার নয়। মনে মনে সংশয়। মুখে চপল মিষ্টি হাসি।

গ্লাস থেকে মুখ তুলে ভালভাবে অবন্তীকে পরখ করল। পুতুলের মতো চেহারা। যেমন রঙিন পর্দায় দেখা যায়। তবে সিনেমার অতিরিক্ত মেক-আপ ছাড়া রংটা একটু শ্যামলার দিকে। লাল আভরণ যেন শ্যামলা অবয়বকে আরও উজ্জ্বল, আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। লো-কাট চলির অন্তরালে সুডৌল স্তন দেখা না গেলেও, তার ভরাট মাধুর্য বুঝতে অসুবিধা হয় না।

পদ্মপর্ণা বুড়ো হয়ে গেছে। কতদিন আর ভাল লাগে? প্রথম প্রথম যখন পদ্মপর্ণা আসত সি ওয়াজ স্মার্ট, ইয়ং অ্যান্ড অ্যাট্রাক্টিভ। এখন সব কিছু ঝুলে পড়েছে। মোটা মোটা থাই। ওজনও বেড়ে গেছে। সি ইজ নো লঙ্গার অ্যাট্রাক্টিভ। আফটার অল, ভ্যরাইটি ইজ দ্য স্পাইস অফ লাইফ।

"ইউ হ্যাভ এ ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ অ্যাক্সেন্ট"

"আই অ্যাম ফ্রম কারমেল কনভেন্ট" পদ্মপর্ণা জবাব দিয়েছিল।

সেই কারমেলের দিনগুলো যেন তার জীবনের বড় পাথেয়। শুধু শিক্ষার দিক থেকে নয়, প্রথম প্রেমের মনমাতানো নতুন ছন্দে। তখন আর কতই বয়স। চোদ্দ কি পনেরো হবে। পদ্মপর্ণাদের 'চিত্র' নামে পাড়ার

আর্ট স্কুল থেকে এক্সকারশনের সময় দার্জিলিঙের এক তরুণ গ্রুপের সঙ্গে পরিচয়। ওদের মধ্যে একটি ছেলে বেশ হ্যান্ডসাম। কিশোরী পদ্মপর্ণার চোখ বারবার আড় চোখে ওই ছেলেটিকে দেখছে।

"কোত্থেকে এসেছ তোমরা?" ওদের মধ্যে থেকে একজন ভাব জমাবার আছিলায় মেয়েদের দলের দিকে এগিয়ে এল।

"লেক গার্ডেনস" বোধহয় পদ্মপর্ণাই উত্তর দিয়েছিল।

"এখানে কেন?"

"আমরা আর্ট স্কুল থেকে এক্সকারশনে এসেছি। হিমালয়ের ছবি আঁকতে" ফ্রক পরা পদ্মপর্ণা গম্ভীরভাবে বলল।

"কী আঁকলে?"

"এখনও আঁকা হয়নি। আগে দেখে নিই কোন অ্যাঙ্গেল থেকে আঁকলে বেস্ট ভিউ পাওয়া যাবে" একেবারে পাকা আর্টিস্টের মতো বলল।

"আহা রে! কত বড় আর্টিস্ট। অ্যাঙ্গেল খুঁজছে" ছেলেটির কথায় শ্লেষ।

"কেন? আর্টিস্ট ছাড়া অ্যাঙ্গেল দেখা যায় না? ছবি বা ফটোগ্রাফির জন্য চোখটাই আসল"

"তোমার চোখ হিমালয় খুঁজে বেড়াক। আমি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি"

কী বেহায়া রে বাবা। লজ্জায় মুখ লাল হতে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে পড়েছিল। ভবিতব্য মাঝে মধ্যে অচেনাকে কাছকাছি এনে দেয়। সন্ধেবেলা ম্যালে চক্কর খেতে এসে আবার ওই গ্রুপের সামনাসামনি। পদ্মপর্ণা পালচ্ছিল, পাছে ওই ডেঁপো ছেলেটা আবার কিছু বলে দেয়। নির্জনতার জন্য সন্তর্পণে উইন্ডামেয়ারের পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

বেশ ঠান্ডা লাগছে। যদিও গায় ভাড়ি সোয়েটার। হিমেল হাওয়ার স্পর্শ হাতে-মুখে। সে যাক। চাঁদনি রাতে অন্ধকারের আবেশে দূরের শৃঙ্গমালা এক মোহময় আবেশ ছড়াচ্ছে। রেলিং-এর ওপর হেলান দিয়ে স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গেছিল। কত স্বপ্ন। স্কুল থেকে কলেজ হয়ে ইউনিভার্সিটি। বাবা চায় আই এ এস হোক। আরও ভাল পড়াশোনা করতে হবে।

"এপাশে একা?" চমকে ফিরে তাকাল পুরুষ কণ্ঠে।

সেই ডেঁপো ছেলেটা। এখানেও ফলো করে চলে এসেছে। মনে মনে রোমাঞ্চ অনুভব করলেও, মুখে শঙ্কা। আগে এভাবে কোনও ছেলের সঙ্গে একলা নির্জনে থাকেনি। ওকে ফলো করে, এখানে চলে এসছে।

সরে পড়ার অছিলা বুঝতে পেরেই ছেলেটি বলল "আমিও লেক গার্ডেনসে থাকি। মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী। যাচ্ছ কোথায়?"

“যাই... ওদের না জানিয়ে চলে এসেছি। গীতাদি একটু পরেই খুঁজতে লোক পাঠিয়ে দেবে”

“একটু দাঁড়াও না...”

দাঁড়াতে তো পদ্মপর্ণারও ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ওকে না পেয়ে যদি শোরগোল শুরু হয়ে যায়। গীতাদি আসার সময় বলেই দিয়েছিল কেউ কিন্তু দল ছাড়া হবে না। বুকটা কাঁপছে। দুরু দুরু। ভয় ভালোলাগার কোলাজ। এক অদ্ভুত অনুভূতি, এর আগে তো কখনো হয়েনি।

“রাগ ভূপতি নাথ”

“অ্যাঁ!” চমকে উঠল।

কোন নাথ? কোথাকার নাথ? কার নাথ? চক্রবর্তীর মধ্যে নাথ কোত্থেকে এল?

“রাগ ভূপতি নাথ” মৃত্যুঞ্জয় আবার বলল।

“সেটা কী?”

“ইভিনিং রাগ” পদ্মপর্ণার দিকে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল “এই মুনলিট ইভিনিং-এ স্ট্যান্ডিং অন দ্য ভারজ অফ নেচার ইউ ক্যান ওনলি থিংক অফ রাগাস। নাথিং এলস”

“তুমি রাগ বোঝ?”

“আলবাত। আমি সরোদ শিখি”

স্থান হয়ত উপলক্ষ মাত্র। কাল যেন সেই মুহূর্তে থেমে গেছে ভালবাসার আঁতুড়ঘরে। যেখেনে কথা হারিয়ে যায়। যেখানে নিঃশব্দ মৌনতার অনুভূতিতে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। প্রথম কাউকে ভালোলাগা। প্রথম কাউকে নিভৃতে কাছে পাওয়া। অচেনা অনুভূতি স্পন্দন তুলছে দুজনের হৃদয়ে। কাঁপা কাঁপা বুকে। মুহূর্তের পাওয়া পরম সুখে। ভয় মেশানো ভালোলাগায় মন হারিয়ে গেছে, ওই দূর পাহারের স্বপ্নের দেশে।

অন্ধ আবেগে পদ্মপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। সারা দেহে বিদ্যুতের তরঙ্গ ছড়িয়ে গেল। বুঝতে পারেনি পদ্মপর্ণা, নতুন স্বাদের আস্বাদ। লজ্জায় কুঁকড়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে পালাতে চাইলেও, অন্তর সায় দিল না। গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরল।

ঘোরে কতক্ষণ ডুবে ছিল জানে না। হঠাৎ খেয়াল হল দেরি হয়ে গেছে। ফিরতে হবে। নইলে গীতাদি রেস্কিউ টিম নিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

“ছাড়... যাই...”

“তোমার পাড়ায় থাকি। ক্লাস টেনে পড়ি” বলে টাকার নোটের ওপর খসখস করে নিজের নাম, টেলিফোন, ঠিকানা লিখে দিল মৃত্যুঞ্জয়।

“ফোন করবে তো?”

ব্লাউজের মধ্যে দশ টাকার নোটটা গুঁজে, কোনও উত্তর না দিয়ে হনহনিয়ে ছুটে পালাল পদ্মপর্ণা। পরে কতদিন একসঙ্গে কেটেছে। পড়াশোনা, আর্ট, নাচ, সংগীত, লম্বা লম্বা প্রেমপত্র। সময় বিহীন টেলিফোন। যতক্ষণ না মা এসে ধমক দিয়েছে "তোদের দেখি আর কথা শেষ হয় না। এবার ছাড়বি, না আমি সারারাত খাওয়া নিয়ে বসে থাকব।

মৃত্যুঞ্জয়ের সরোদ ক্লাসে রেওয়াজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা। পদ্মপর্ণার নাচের ক্লাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতীক্ষা। একজন অন্যের পরিপূরক।

মৃত্যুঞ্জয়ের অ্যামেরিকা চলে যাওয়ার পর স্টারডমের আরেক জগৎ। বিচ্ছেদর মধ্যে সময়ের ব্যাপ্তি, কত কিছুই না পাল্টে গেল। সেখানে টলিউড, বলিউডের প্রডিউসার ডিরেক্টার আছে। আছে বাংলাদেশের হ্যান্ডসাম হিরো। আছে রাজীবের মতো গণ্যমান্য। এদের প্রত্যাখ্যান করলে সে কী রুপালি পর্দার কিংবদন্তি হয়ে থাকতে পারবে?

'আই অ্যাম ফ্রম কারমেল কনভেন্ট' কথাটা যতই সদর্পে বলুক না কেন, হারিয়ে যাওয়া নিষ্কলুষ দিনগুলোর স্মৃতি যেন বুকের গভীরে আজও মোচড় দেয়। ফেলে আসা ছোটবেলা আর আজকের এই খ্যাতির শিখরের মাঝে অনেক কাহিনি।

"ড্রিঙ্কস?"

সেদিন পদ্মপর্ণা চোস্ত ইংরেজিতে বলেছিল 'থ্যাঙ্কস'। আর আজ অবন্তীর গালে টোল পড়ল 'ধন্যবাদ'।

রাত গাঢ় হওয়ার সঙ্গে নেশাও জমে উঠছে। যত জমছে, অবন্তীকে নিবিড় করে পাওয়ার কামনাও ঠিকরে বেরতে চাইছে। জড়িয়ে ধরে একটু আদর। বুকেপিঠে সন্ধানী হাতের ঘোরাফেরা। দু-টুকরো নরম মাংসপিণ্ডের মধ্যে যে এত আকর্ষণ লুকিয়ে আছে, হুইস্কির প্রলেপ না পড়লে বোঝাই শক্ত।

"কুছ খা লে। চাইনিজ লায়া হু"

"জো আপ চাহে। আপ আরাম সে পিয়ে। ইয়ে হামলোগ, লড়কিও কে কাম হ্যাঁয়"

গৃহবধূ তারকা এখন অন্য রূপে। অবন্তী কিচেনে হারিয়ে যাওয়ার আগে, রাজীব লেহাঙ্গার অন্তরালে ভরাট নিতম্বের ছন্দের দিকে তাকিয়ে রইল। কারও সঙ্গে অনেক বিষয় আলোচনা করা যায়, যেমন পদ্মপর্ণা। কারও সঙ্গে আলোচনা বাদে শুধু দেহটাই উপভোগ করা যায়, যেমন অবন্তী।

নাতিউজ্জ্বল বেডসাইড ল্যাম্পের আলো ঘরে এক মোহময় আবেশ ছড়িয়েছে। রুম ফ্রেসনারের সৌরভে ম ম করছে এসি ঘরের হাওয়া। প্রাণ ভরে ঘ্রাণ নিল অবন্তী।

আহাঃ...

এমন বড় যদি একটা ফ্ল্যাট পাওয়া যেত! ৩০০০ স্কোয়ার ফিট হবে। কোটি টাকার ওপর দাম তো নিশ্চয়ই। খাটের ওপর পাজামা চুড়িদার পরে শুয়ে আছে রাজীব। চলি থেকে লেহেঙ্গা খসিয়ে সন্তর্পণে গুছিয়ে রাখছে, ড্রেসিং টেবিলের স্টুল-এর ওপর। মেক-আপ শূন্য, গোলাপি ব্রা আর প্যানটিতে, শ্যামলা অবয়বটা বেড ল্যাম্পের আলো-আঁধারির লুকোচুরি খেলায় আরও বেশি মোহময়। ধীরে ধীরে বে-আব্রু হচ্ছে অবন্তী। না কি বাংলা স্টারডমের প্রাকৃত রূপ বাহ্যিক পরিচয়ের খোলস ছাড়ছে! গ্ল্যামার হারিয়ে গেছে। মিডিয়া বাইটস-এর প্রখর আলো মুছে গেছে। স্বপ্ন-লোভ-আকাঙ্ক্ষা মিলেমিশে একাকার নতজানু আদিম রিপুর কাছে।

লো-কাট ব্রায়ের ওপর থেকে উপচিয়ে পড়ছে অবন্তীর সুপুষ্ট স্তনযুগল। নাথিং ইজ ফ্রি ইন দিস ওয়ার্ল্ড।

“একটু ফ্রেস হয়ে আসছি” বাথরুমে হারিয়ে গেল অবন্তী।

রাজীব অবন্তীর বিবস্ত্র দেহ নিয়ে খেলছে, স্তন থেকে উরুতে। নাভির ওপর আঁকিবুঁকি কাটছে। এক সময় গাঢ় শ্বাস, দেহের ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গাঢ়তর হচ্ছে “আহঃ...”

ক্লাইম্যাক্সে পৌছনোর আগেই কাতরে উঠল রাজীব। অবন্তী স্তম্ভিত। সম্ভোগের অন্তিম মার্গে এর আগে কাউকে লুটিয়ে পড়তে দেখেনি। কিছুক্ষণ আগের ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাস কঠিনতর। ঘামছে। দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। কয়েকবার ‘ওয়াক ওয়াক’ করলেও বমি হল না। বুকটা চেপে আঁকড়ে আছে।

“ডক্টর... আই নিড এ ডক্টর” রাজীবের কথায় অবন্তী বুঝতে পারছে সিরিয়াস কিছু হয়েছে। ঠিক কী? ঠাহর করতে পারছে না।

কোনওরকমে বিছনার পাশে লোটানো চুড়িদার-পাঞ্জাবিটা গলাল। নিজে তাড়াতাড়ি জামা পরে ওয়ারড্রব হাতড়াচ্ছে। কিছু খুঁজছে। শেষমেশ এক কোণায় খুঁজে পেল চাদর। রাজীবকে ধরে সন্তর্পণে লিফট থেকে গাড়িতে।

“বাবুকা তবিয়াত অচানক খারাপ হুয়া। হাসপাতাল লেনে পড়েগা। নজদিক মে কউন হাসপাতাল?” গাড়ির দিকে এগোতে সিকিউরিটিকে প্রশ্ন।

“অ্যাপলো। কুছ কর সকু?” সিকিউরিটি রাজীবকে ধরে নিয়ে চলল।

“থোড়া গাড়ি মে লেট দে না। ম্যয় ড্রাইভ কর কর লে যা রহা হু। ফ্ল্যাট খুলা হ্যায়। সামহাল কর রখ না”

“জরুর। ম্যয় একেলা, নেহি তো ম্যয় ভি যা সকতা”

“জরুরত নেহি” অবন্তী গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অ্যাপলোর ইমারজেন্সিতে সর্ট হিস্ট্রি নেওয়ার পর, ডাক্তার ড্রিপ, ইনজেকশন, কার্ডিয়াক মনিটার লাগিয়ে বলল "মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক। রাজীব গোয়াঙ্কা না?"

মাথা নাড়ল অবন্তী। কে না চেনে রাজীব গোয়াঙ্কাকে? আর কে না চেনে অবন্তীকে? দুজনের মধ্য রাতের আসল কাহিনি জানলে, মিডিয়াতে না পৌঁছলেও, ডাক্তার নার্সদের কানাঘুষোয় সব মহলে নিশ্চিত পৌঁছে যাবে।

অবন্তীর চোখ ছাড়া পুরো মুখ ওয়ারড্রব থেকে আনা চাদরে ঢাকা। জানতই মাঝরাত অতিক্রম করলেও ডাক্তার, নার্সদের ফেস করতে হবে। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে এনেছিল। রাস্তায়ও কোনও অঘটন ঘটেনি। না হলে, শুধু কেরিয়ারেই সর্বনাশ নয়, জবাব দিতে দিতে, বাকি জীবনটাই নষ্ট হয়ে যেত।

"ওনার বাড়িতে কাম করি। বাবু ব্যথায় কাতরাইতে সময় নষ্ট না কইরাই নিয়া আইলাম। বাড়ির লোকরে এখনও খবর দেওয়ার সময় পাই নাই"

প্রচুর ছবিতে ঝি-এর রোল করেছে। সেই ভাষা দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করে রিয়ালিটিতে আবার ঝি-এর রোল। এবার নিজেকে বাঁচাতে, রাজীবকে বাঁচাতে। মুখটা চাদরে ঢাকা। যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ চিনতে পারে টিটি পড়ে যাবে। কালকে মিডিয়া হেডলাইন্স। চ্যানেলে চ্যানেলে সারাদিন চর্বিত চর্বণ। মশলা মাখানো চনমনে খবর। পুরো কলকাতা ভেঙে পড়বে বাড়িতে। মোবাইল বন্ধ করেও বাঁচতে পারবে না। নাম যত তাড়াতাড়ি ছড়ায়, বদনাম তার থেকে দ্বিগুণ।

"ইমিডিয়েটলি ভরতি করতে হবে"

"যা বোঝেন করুন। বাবুরে সুস্থ কইরা তুলতে হইব। ওনার ঠিকানা তো আপনাগো জানা"

"যদিও ভর্তি হওয়ার আগে ডিপসিট দিতে হয়, ওনার ব্যাপারটা আলাদা। এখনই আই সি ইউ তে ট্র্যান্সফার করছি"

"চিন্তার কিসু আসে?"

"তেমন নেই। মাইল্ড অ্যাটাক"

"আপনারা দয়া কইরা বাড়িতে একখান ফোন কইরা দেন" ভাগ্যিস বাড়ির নম্বরটাও অনিন্দ্য দিয়েছিল। সব ইতিবৃত্ত রিসেপশন লিখে বলল "তোমার নাম?"

"কান্তাবালা মাঝি"

"সই করতে জান?" মাথা নাড়ল।

"ঠিক আছে, দরকার নেই। বাড়ির লোক এলে সই করিয়ে নেব"

"আমি যাইতে পারি। তাড়াহুড়োয় বাড়ি খোলা রাইখ্যা আইসি"

মাথা নেড়ে বলল "ডাক্তারকে একবার জিজ্ঞেস করে নিই" কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল "ঠিক আছে"

ভাগ্যিস ইমারজেন্সির পেছনের দিকে গাড়ি পার্ক করেছিল। স্বনামধন্য চিত্রতারকা অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে বাঁচল, ফ্ল্যাটের স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে। যার ভাগ্যে যা লেখা। পদ্মপর্ণাদি কী পেয়েছে, অবন্তী জানে না। তার ভাগ্যে ফ্ল্যাট দূরে থাক, এ মুহূর্তে কানাকড়িও জুটল না। ঈশ্বরের আশীর্বাদ, লোকটাকে বাঁচাতে পেরেছে। নিজের ইজ্জতটাও। নাই বা হল ফ্ল্যাট। মান বাঁচানোর থেকে দামি কী আর কিছু আছে?

জানতেও পারল না ব্যাধিটার এক বিশেষ নাম আছে - অ্যাঞ্জাইনা ডি আরমর, বা কয়েটাল অ্যাঞ্জাইনা। আনকমন হলেও সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় বুকে ব্যথা থেকে মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে ড্রাইভ করতে গিয়ে মনে হল, অন্তত সিকিউরিটিকে বাড়িতে খবর দিতে বলে যায়।

"ঠিক হ্যায়। হার্ট অ্যাটাক হুয়া। ডক্টর বোলা ফিকর করনে কা জরুরত নেহি। হাসপাতাল মে ভর্তি কর লিয়া"

ওর হাতে পাঁচ হাজার টাকা গুঁজে বলল "ম্যয় আয়া থা কিসি কো নেহি কহেনা। নৌকরানি বোলকে ভর্তি কর দিয়া"

"জি মেমসাব। জইসে আপ কহে"

পকেটে টাকা গুঁজতে গুঁজতে সিকিউরিটি গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে বলল "আপ ফিকর মত কিজিয়ে। আজ রাত কা বাত কোই নেহি জানেগা। লোক পুছে তো নৌকরানি কা নাম কেয়া বলু?"

"কান্তাবালা মাঝি"

ভাগ্য ভাল লোকটা মরে যায়নি - ভাবতেই...

রাত তখনও শেষ হয়নি। বাইপাসের খোলা আকাশে না-দেখা তারাদের ভিড়ে জড়ানো চাদরটা ব্যাক সিটে ছুড়ে প্রাণভরে শ্বাস নিল। মর্তে সে যে এখনও সম্মান নিয়ে শ্বাস নিতে পারছে, সেটাই বা কম কী? ফ্ল্যাটে পৌঁছে বাসি জামাকাপড়গুলো বাথরুমের কোণায় ফেলে স্নান করল। আজকের কলঙ্কিত রাত্রির গন্ধটাকে মুছে ফেলতে হবে। কতক্ষণ শাওয়ারে ছিল জানে না। যখন বেরল, ঊষার প্রথম কিরণ পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। বিবস্ত্র দেহটা খাটের ওপর এলিয়ে মনে হল, আরেকটা ফ্ল্যাট, ওঠাবসা রথী-মহারথীদের সঙ্গে! এই ছোট্ট ঘরে যে শান্তি লুকিয়ে আছে, তা তো ঐশ্বর্যের মধ্যে নেই।

আজ সঞ্জীবের কথা বড্ড মনে পড়ছে। মনে পড়ছে ফেলে আসা দিনের কথা। নিতান্তই এক গৃহবধূ। আজ কতদিন হল সঞ্জীব ছেড়ে চলে গেছে। ভোরের সূর্য যেন ফিসফিস করে বলছে, শেষ থেকেই তো আবার শুরু...

চোদ্দ

সময়টা ভাল যাচ্ছে না।

কপালের দোষও বলা যেতে পারে। এই মন্দার বাজারে, যখন নিজের কম্প্যানিটাকেও দাঁড় করাতে পারেনি, নাদিম সাহেবকে যদি বা বলে কয়ে আর একটা সিডি বার করতে রাজি করিয়েছিল, সেখানেও বিপত্তি। সাধে কি নাদিম সাহেবের প্রোগ্রামে মুফতে গেয়ে এসেছে? শুভ্রা মিত্রর জানে কিছু হাসিল করতে গেলে, এমন অনেক ফ্রি সার্ভিস দিতে হয়। আপত্তি নেই।

বাধ সাধল মালিক রাজীব গোয়েঙ্কার এই হঠাৎ অসুস্থতা।

"এখন নতুন কোনও রিস্ক নেওয়া যাবে না। গোয়েঙ্কা সাহেব আগে সুস্থ হয়ে উঠুন। পরে ভেবে দেখা যাবে" নাদিম সাহেবের স্পষ্ট জবাব।

এত কাঠখড় পোড়ানো, ফ্রিতে গাওয়া শিকেয় উঠল। একটু যদি বা আশা ছিল, তাও বিশ বাঁও জলে। এমনিতেই তো রয়ালটি দিতে গায়ে জ্বর আসে। যখন তুঙ্গে সময় যাচ্ছিল তখনও ইনিয়ে-বিনিয়ে বলত "কোথায় আর বিক্রি? তেমন তো কিছুই নেই" আর এখন যেখানে মিউজিক কম্প্যানিগুলো পাইরেসির জন্য লাটে উঠেছে, সেখানে আর সুযোগ কোথায়? নতুন সুর নেই। নিজেও একটা মিউজিক কম্প্যানি খুলে চেষ্টা যে করেনি, তাও নয়। প্রথম অ্যালবাম 'মাতৃ বন্দনা' পাবলিসিটি সত্ত্বেও তেমন কাটল না। যদিও মিত্র ভারতীর কর্ণধার রাজীব চট্টোপাধ্যায় যথা সম্ভব সাহায্য করেছিল। গলার জৌলুসটাও কমে আসছে। রিয়ালিটি শো-তে জাজ হয়ে কালেভদ্রে কিছু জুটে যায়। সেখানেও কম্পিটিশন প্রচুর। হাভাতের সংস্কৃতির মধ্যে সবাই তো চাতকের মতো ওটুকুর জন্যই বসে আছে।

"আমাদের লেক গার্ডেনসের ফ্ল্যাটটাতে অফিস করে বসে আছ? কটাই বা অফার আসে? অন্য কিছু করা যায় না?"

জয়ন্তর কথা শুনে ভাবছিল, সত্যিই ওই ফ্ল্যাটে নতুন কোনও বিজনেস করা যায় কি না। তখনও তেমন নাম হয়নি। স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কাপড়ের বুটিকে চাকরি নিয়েছিল। ওই ফ্ল্যাটে কাপড়ের বুটিক তো করা যেতেই পারে। এখনও ড্রেস ডিসাইনিং-এর একটু-আধটু মনে আছে। চেষ্টা করে দেখলে মন্দ হয় না। শুরু হয়ে গেল ইন্টিরিয়ার ডেকরেটিং-এর সঙ্গে অ্যাগ্রেসিভ নেটওয়ার্কিং। এতদিনের অফিস, পুরনো ফ্ল্যাটটা সেজে উঠল নতুন বুটিকের চাকচিক্যে। পাবলিসিটি চাই। কে সব থেকে বাজারে খাচ্ছে? অফ কোর্স

দেওয়ালি। বছর পাঁচেক আগে অমর্ত্যর পরিচালনায় দেওয়ালির জন্য 'নক্ষত্র' ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছিল। ওকে ভেড়াতে পারলে, কভারেজ আর পাবলিসিটি ভালই জুটবে। একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক না কেন।

"আমায় চিনতে পারছ? শুভ্রা মিত্র। ব্যস্ত? কথা বলতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। মনে আছে আপনি অনেকদিন আগে 'নক্ষত্র' ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছিলেন। মুম্বাইতে আছি। তবে এই মুহূর্তে ফ্রি। মেকআপ রুমে। কথা বলা যেতে পারে"

"সোজাসুজি কাজের কথায় আসি। আমি একটা বুটিক ও চাঙ্কি ডিসাইনার জুয়েলারির দোকান খুলছি। ভাবছি তুমি যদি ইনাগোরেট করতে পার..."

ধাক্কা খেল দেওয়ালি। বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। এত খ্যাতির পরিণাম এই! এই স্টারডমে সবার পরিণতিই কী এক? সে যে সাইন্স কলেজের পরে এ পথে বা বাড়িয়েছে, ক্রমশ উত্তরণের মধ্যে কোথায় যেন একটা শঙ্কা। কালকে কী তারও এমন পরিণতি হবে? হয়ত এই প্রেজেন্ট সিস্টেম অজান্তে অনেককেই এই পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

অস্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় মা এক গুরুদেবের কাছে নিয়ে গেছিল। নামটা মনে নেই। গুরুদেব বলেছিল 'একদিন বুঝবে, ধরে রাখতে গেলেই হারাবে। ছেড়ে দাও... সব ছেড়ে দাও... দেখবে সারা পৃথিবী ধরা দেবে'

বললেই কী ছেড়ে যাওয়া যায়? কে পারে? কজন পারে? দেওয়ালি কী পেরেছে?

ছোটবেলায় খুব বই পড়ত। রোমান সম্রাট মারকাস অরেলিয়াসের মেডিটেশনস-এ এমনিই কিছু একটা পড়েছিল, যা গুরুদেব বলেছিলেন। তত্ত্বকথাগুলো সত্যি হলেও, বাস্তবিক ক্ষেত্রে, যখন নাম, যশ, খ্যাতি সোনার জাজিম বিছিয়ে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যায়, তখন পালানো মুশকিল। তাই শুভ্রাদির কথায় ভয় পেলেও, মুহূর্তে মন থেকে মুছে ফলল।

"ইচ্ছে থাকলেও নিরুপায়। এখন আমি মুম্বাইতে। এখানে চক-এ-ব্লক। ডেটস দেওয়া আছে। কলকাতায় ফেরার টাইম নেই"

"এক ইভিনিং-এর জন্য?"

"আমার চেয়ে কত গুণী মানুষ আছেন। তাঁদের কাউকে ডেকে নিও"

শুভ্রা বুঝল দেওয়ালি থাকতে পারবে না। কারণ যাই হোক না কেন। কাজও হতে পারে, আবার পড়ন্ত শুভ্রার জন্য সময় ব্যয় করা উদীয়মান দেওয়ালির কাছে অপচয়ও মনে হতে পারে।

"কাউকে উদ্বোধন করার জন্য পেলে?" জয়ন্তর প্রশ্নে অন্যমনস্ক শুভ্রা ফিরে তাকাল।

"নাঃ" উত্তরের বদলে দীর্ঘশ্বাস।

“মুম্বাই-এর অনেকের সঙ্গেই তো পরিচয় হয়েছে রিয়ালিটি শোতে। কাউকে বলে দেখব?”

“চেষ্টা করে দেখতে পার। কেউ কী আমাদের এই বুটিকের জন্য মুম্বাই থেকে আসবে? দেওয়ালিও তো এল না”

বিষণ্ণ নিরুৎসাহে ফ্যালফ্যাল করে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। রাগ ললিত গৌরী ক্রমশ মিশে যাচ্ছে বাসন্তী কেদারে। মনে ভয়। আগেই বুঝতে পেরেছে, সংগীত জীবনের গোধূলি এসে গেছে, জীবিকার অন্য উপায়ও ঘুরপাক খাচ্ছে অনাদি কল্যাণে। এই মিশ্রণের মধ্যে, শুধু একটা নতুন সুর হাতড়ে বেড়াচ্ছে। মিউজিক কম্প্যানিটাও তো চলল না? এটা কী চলবে?

বাবা বলত “তুই ভীষণ জেদি। কারও কথা শুনিস না”

সেই জেদটাই ছিল তার অস্ত্র। সাফল্যের মুল কারণ। তিমির কাকু ছিল, এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সাফল্য বরমাল্য পরাল। সে তো সংগীতের ক্ষেত্রে। কিন্তু এটা তো স্বতন্ত্র, অন্য এক জগৎ। এখানে তো তিমির কাকুও নেই। জয়ন্ত থেকেও যেন নেই। ওর মধ্যে সেই ডেয়ার-ডেভিল ভাবটাই নেই। পাশের ঘরে, কয়েকটা ফোন সেরে, জয়ন্ত এসে বলল “নাঃ। কেউ ফ্রি নেই”

“আমি তো কোনও ডেট ফিক্স করিনি। এক ইভিনিং-এর জন্যেও নয়?”

“সবাই কোনও না কোনও ছুতো দেখিয়ে অ্যাভয়েড করে গেল। শালা দুনিয়াটাই তাই। যেখানে ইনকাম নেই, সেখানে কেউ আসতেই চায় না। অথচ দেখ না। রিয়ালিটি শোর সেটসে কী মিষ্টি মিষ্টি কথা। মুখে মধু ঝরছে”

“দুনিয়াটাই তাই। আমারাও তো এতদিন মধু বিক্রি করেই নেটওয়ার্ক তৈরি করেছি”

“তবুও তো তুমি অনেক প্রোগ্রাম ফ্রিতে করেছ...”

“সেটাও তো কিছু পাওয়ার আশায়”

“এখানে তো কিছু পাওয়ার নেই। ফ্লাইট, অ্যাকমডেশন দিলেও লাভ তো কিছু নেই”

“সব-ই কী লাভ-লোকসানের অঙ্ক?”

জয়ন্ত কোনও কথা না বলে বাথরুমে ঢুকল। বড্ড গরম পড়েছে। ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এতগুলো ফোন করে বকবক করতে গিয়ে, ক্লান্ত লাগছে। মাথা কাজ করছে না। এরপর টেনশনে শুভ্রার মুড বিগড়লে, আর নিতে পারবে না। স্নান সেরে আগে মাথাটাকে ঠান্ডা করা যাক। পরে ভাবা যাবে।

চেনা লোকগুলো কেমন যেন অচেনা হয়ে যাচ্ছে। তবে কী সব হারিয়ে গেছে? আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করা যায় না? ছোটবেলার জেদটা এখনও মরে যায়নি। স্ফুলিঙ্গের মতো ধিকধিক করে জ্বলছে। সেই স্ফুলিঙ্গকে আবার বারুদে পরিণত করতে হবে। জয়ন্ত না থাকলেও একাই।

ফোনটা বেজে উঠল। ধরতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু বেজেই চলেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সি এল আই না দেখেই ফোনটা তুলে নিল আধো অন্ধকারে।

"দেওয়ালি বলছি। দিদি বিরক্ত করলাম না তো?" চমকে উঠল। আবার দেওয়ালি!

"না না, বিরক্ত করবে কেন?"

"এক উইক পরের সান্ডেতে ফ্রি পেয়েছি। ওই শিডিউলের চিফ ক্যামেরাম্যানের মা অসুস্থ। তাই ওদিনের শুটিং ক্যান্সেল করা হয়েছে। যদি আপনি ওদিনে অরগ্যানাইজ করতে পারেন, যেতে পারি" দেওয়ালি অন্ধকারে দিয়া জ্বালিয়ে দিল। আলোর ফ্ল্যাশ।

"আসবে? সত্যি?"

"মিথ্য বলতে কী ফোন করেছি? তুমি এক উইকে অরগ্যানাইজ করতে পারবে?"

"পারব। অরগ্যানাইজ করে অন-লাইন রিটার্ন ফ্লাইট বুক করে তোমায় জানিয়ে দেব। তোমার ই-মেলটা বলবে?"

"লজ্জা দিচ্ছ কেন দিদি। আই ক্যান অ্যাফরড এ রিটার্ন ফ্লাইট টু ক্যালকাটা। মেলটা টেক্সট করে দিচ্ছি। কনফারমড হলে ফোন করে দিও" একটু থেমে "ভীম নাগের সন্দেশ খাওয়াতে হবে কিন্তু। মুম্বাইতে সন্দেশ আর মিষ্টি দই পাওয়া যায় না"

ফোনটা রেখেই শুভ্রার মনে হল, ইশ... ও কত নেবে জিজ্ঞেস করাই হল না। পর মুহূর্তেই মনে হল, তাও কী করা যায়? নিজে থেকে ফোন করে নিজের খরচায় যখন আসছে, তখন কী নেবে?

টাকাটা বড় কথা নয়। এই দুর্দিনে যে পাশে দাঁড়িয়েছে, সেটাই সব থেকে বড়। হয়ত ওর উপস্থিতিতে কিছু ফ্ল্যাশ বাল্ব জ্বলবে। মিডিয়াতে লেখা হবে। এটুকু পাবলিসিটিরও প্রয়োজন নেই। না থাক। শুভ্রার ওকে প্রয়োজন। কৃতজ্ঞতায় বুকটা ভরে গেল। সুখের দিনে তো সবাই পাশে থাকে। দুঃখের দিনে... দেওয়ালি স্টার, সেলিব্রিটি হলেও, অন্যদের থেকে আলাদা।

জয়ন্ত স্নান সেরে বেরিয়ে বলল "আরেকবার আরেক সেটকে ট্রাই করে দেখি"

"দরকার হবে না। হয়ে গেছে। দেওয়ালি ফোন করেছিল। মুম্বাই থেকে আসবে"

পনেরো

“নাও তোমার লেখাটা হয়ে গেছে” অঞ্জন শোভনের দিকে পাণ্ডুলিপিটা ছুড়ে দিল “বলেছিলাম না, সময়মত শেষ করে দেব”

“কী নাম দিলেন?”

“নামটা তো তুমি দেবে। আগেরটা আমি সাজেস্ট করেছিলাম”

“বিবেকানন্দর পদকমলে। কেমন?”

“পদকমল শব্দটা ভাল লাগছে না। কীরকম সেকেলে। বরং নতুন রূপে বিবেকানন্দ বেটার হবে, নয়কি?”

“আপনি জানেন কোনটা বেশি খায়। চা বলি?”

“সঙ্গে টা-ও। বড্ড খিদে পেয়েছে” শোভনের অফিসের লেদার সোফায় গা এলিয়ে দিল অঞ্জন “তোমার জন্য লেখাটা কমপ্লিট। এবার আমার লেখা লিখতে দাও। রাজীব উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। ওর কামাই-এর তো বন্দোবস্ত করে দিতে হবে”

“কী নিয়ে লিখছেন?”

“বিবেকানন্দ-নিবেদিতার রাসলীলা হতে পারে। এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি। এগুলোই বাজারে খায়। ইংল্যান্ডে দেখনি ‘সান’ কিংবা ‘ডেইলি মিররের’ বিক্রি সব থেকে বেশি”

“বেশ তো, লিখুন না। আপনার তো এ বাজারে সব থেকে বেশি কাটতি” শোভন সায় দিল।

“তার পেছনে তো তোমারও হাত আছে। টিভি প্রোগ্রাম স্পন্সর করে, রাজীবকে অঢেল অ্যাডের টাকা দিয়ে, তুমিও তো কম হেল্প করছ না। এখন যখন ‘ক্ষণকাল’ পত্রিকাটা কিনেই ফেললে, স্কোপ তো আরও বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কত টাকায় রফা হল?”

“পঁয়ত্রিশ কোটি। অ্যাট লিস্ট আমাদের তো নিজস্ব একটা মুখপত্র হল। জয়েন করবেন?”

“না বাবা। আমি মৃন্ময়ের কাগজেই থাকি। দুঃসময়, ও না থাকলে ভেসে যেতাম। যখন বড়বাজার থেকে বার করে দিল, ওই তো আশ্রয় দিয়েছিল। ওকে ছাড়ি কেমন করে?”

কাহিনিটা কী, অঞ্জনদা কখনো খোলসা করে বলেনি। শোভনও জানতে চায়নি। লোকমুখে শুনেছে, পেইড নিউজ লেখার জন্য অঞ্জনদাকে বার করে দেওয়া হয়। সত্যি-মিথ্যা ঠিক জানে না।

অঞ্জনের সত্য কাহিনি অনেকেরই অজানা। প্রথম জীবনে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেয় স্কটিশ চার্চ কলেজে। সেই সময় দু-দুবার, দুই মহিলার সঙ্গে লিভ ইন রিলেশনশিপে জড়ায় প্রফেসর

সাহেব। কিন্তু কোনও বার-ই সেটা টেকে না। মায়ের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কারণটা পরিচিত মহলে ঘোরাফেরা করলেও, আসল কারণ ছিল অঞ্জনের অতিরিক্ত মহিলা আসক্তি। তার কু-প্রস্তাব থেকে ছাত্রীরাও বাদ যায়নি। সে সময়, বেশ কিছু মহিলার কাছে চড়-চাপড়ও জনসমক্ষে খেতে হয়। সে সব কাহিনি অবশ্য শোভনের অজানা।

বদনাম থেকে বাঁচবার জন্য প্রায় ষোলো বছর অধ্যাপনার পর, সেই আশির দশকে অধ্যাপনা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। প্রথমে 'ক্ষণকাল' পত্রিকায় যোগ দেয়। সেখান থেকে 'বড়বাজার'। বিতাড়িত হওয়ার পর ত্রাহি অবস্থা। কেউ চাকরি দেয় না। এদিকে উশৃঙ্খল জীবন যাত্রা। রসদও ফুরিয়ে আসছে। ধারদেনা করে, জীবনটাকে টেনে ঘষটে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। শোধ দেওয়ার বালাই নেই। এক বাড়ি থেকে আরেক। কোথাও স্থায়িত্ব নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে কর্ণদা, কর্ণের মতো উদ্ধার করল।

"মৃন্ময় তার কাগজের এডিটরিয়ালটা আমায় দেখতে বলেছে। সিনেমা করে, টাইম বার করা মুশকিল। তুমি আমার সঙ্গে কো-এডিটর হিসেবে জয়েন করবে?"

হাতে যেন চাঁদ পেল অঞ্জন। করবে মানে? আর কিছু কী করার আছে? এখন বাঁচতে হবে। কোথাও একটা মাথা গোঁজার ঠাই "তুমি ডাকলে না করতে পারি?"

মৃন্ময়ের কাগজে চাকরি। শেষমেশ মাকে নিয়ে ঠেকল গড়িয়ার অরবিন্দ সরণিতে। তবু তো একটা মাথা গোঁজার ঠেক পাওয়া গেল। সঙ্গে মাস মাইনের চাকরি। সেই সময় থেকেই রাজীবের অফিসে যাতায়াত। পটিয়ে-পাটিয়ে লাইনে আনার চেষ্টা।

"বুঝলে রাজীব, কিছু একটা করতে হবে"

"কোনও আইডিয়া আছে অঞ্জনদা। ব্যাবসাটা তেমন চলছে না। আগের লেখকেরা আর বাজারে বিকোচ্ছে না"

"সেনসেশন চাই, বুঝলে সেনসেশন চাই। ওটাই বাজারে খায়"

"বুঝলাম তো। কিন্তু কী সেনসেশন?"

"লোকে তোমার আমার লেখা পড়বে না। কিন্তু বাঙালি আজও মনীষীদের জীবন পড়তে ভালবাসে"

"ঠিক বুঝলাম না"

"মনীষীদের লেখা তো সবার কাছেই আছে। ওদের সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধও আছে। কিন্তু ওসব পড়ে কে?" অঞ্জন হাফ-টাকে হাত বুলিয়ে বলল "ওদের মহিলা ঘটিত কিছু গোপন কাহিনি যদি ফিকশন করে লেখা যায়..."

"কাহিনিটা বানাবে?"

"কে আসল কাহিনি জানে? সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে বেশ জমিয়ে যদি রসালো কাহিনি লেখা যায়, আমি বলছি বাজারে খাবে"

"যেমন?"

"এই ধর না রবীন্দ্রনাথ। কত মহিলার সংস্পর্শে এসেছেন। এদের মধ্যে কোনও একজনকে নিয়ে যদি জাম্পেস করে রসিয়ে লেখা যায়, ওনার অজানা জীবন নিয়ে, ওটা খাবে"

"জানবে কী করে?"

"জানবার কী দরকার আছে? ফিকশন। কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে লিখে ফেললেই হল। সত্যি মিথ্যা কে দেখতে যাচ্ছে? কার অত পড়ার সময় আছে?"

"তুমি লিখবে?"

"তুমি যদি ছাপাও, লিখতে পারি"

"বেশ একটা লেখ তো, বেশ জমিয়ে। দেখি চলে কি না"

অঞ্জন ভাবছিল কোনও মহিলাকে নিয়ে প্রথম লিখবে। বাঙালি এমনিতেই রক্ষণশীল। দেশি মহিলা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে পারে। বিদেশি কাউকে নিয়ে লেখাটাই শ্রেয়।

"আপনার যা মর্জি। তবে আর বছর দুয়েকের মধ্যে তো প্রকাশ দাসগুপ্ত রিটায়ার করছে। এডিটরিয়াল পোস্টটা আপনি নিতে পারেন" কর্ণ মারা যাওয়ার পর, এখন সে-ই কাগজের সর্বেসর্বা। মৃন্ময় খবরের কাগজের মালিক হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতি থেকে বহুদূর। বনেদি বড়লোক। ওকে ছাড়বার কী কোনও প্রয়োজন আছে? মৃন্ময়, শোভন দুজনকেই হাতে নিয়ে খেলতে পারবে। দুজনেই মালদার। সেটা বেশি ভাল নয় কী?

"সে তখন ভাবা যাবে। রাজীবকে ছাপাতে দেওয়ার আগে লেখাটা একবার পড়ে নিও"

"নিশ্চয়ই। আমাকেও তো জানতে হবে। না হলে প্রেস প্রশ্ন করলে কী জবাব দেব?" খাবার সার্ভ করতে বলল "নিন... নিন। টাকাটা কী চেকে দেব, না ক্যাশে?"

"চেকে নয়, ক্যাশ। চেক হলে দেখাব কী বলে? তোমার নামে বই ছাপানর জন্য তুমি আমায় পেমেন্ট দিয়েছ?" মোমোতে কামড় দিয়ে মুচকি হাসল।

টাকার ব্যাপারে শোভন যতই উদাসীন হোক না কেন, অঞ্জন হাড়ে হাড়ে বুঝে নিতে জানে। বুঝে নিতে বললে একটু কম বলা হবে, হাতিয়ে নিতে জুড়ি নেই। মনে পড়ে না ধার নিয়ে এযাবৎ কাউকে টাকা ফেরত দিয়েছে কি না। টাকা সোনার থেকেও দামি। টাকা ছড়ালে, যে কোনও মহিলাই যন্ত্রপাতি মালিশ করে দেবে।

এই চুয়াত্তর বছর বয়সে জিনিসপত্র চাঙ্গা না রাখলে কী চলে? সে অবন্তীর মতো তারকাই হোক, আর ইমার মতো গায়িকা। ইমা কী সেদিন ভাবতে পেরেছিল, অঞ্জন মাল খেয়েও চব্বিশ বছরের ছেলেকে হার মানাতে পারে? পারেনি।

মধ্যরাতে খ্যন্তমনিও অপরূপা। অঞ্জন অত ভাবে না। একটাই থিওরি। কভার দ্য ফেস অ্যান্ড ফায়ার দ্য বেস। বন্দুকের নল যত তীক্ষ্ণ হবে, রসটাও খরস্রোতা নদীর মতো, দুর্বার স্রোতে বইবে। ভায়াগ্রা শুধু অভাগাদের জন্য। নারীদের কল্যাণে অঞ্জন অতটা অভাগা নয়। রবিশঙ্করের চেয়ে কিছু কম নয়। খালি ভারত সরকারই তার কদর বুঝল না। এতদিনে ভারতরত্ন না হোক, একটা ভূষণ-শ্রী পেয়ে যেত।

ভূষণ-শ্রী চুলয় যাক। মহিলা সম্প্রদায়ের কাছে যে এই বয়সেও নিজের যৌবন আটুট রাখতে পেরেছে, সেটাই বড়! জীবনের 'ধন' কিছুই যাবে না ফেলা। ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা। সেখানেই জীবনের পূর্ণতা। রত্ন-শ্রী-ভূষণে নয়। এতকাল ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে চর্চা করতে করতে সাহেবদের একটা বুলি বড্ড প্রিয় ইট, ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি মেরি। ফর টুমরো উই ডাই।

"বেশ। আপনি যে ভাবে চান। আপনি তো আমাদের গর্ব" শোভন চায়ে চুমুক দিল।

হঠাৎ অঞ্জনের ফোন বেজে উঠল, ইমা "আপনার সঙ্গে জরুরি দরকার"

"পরে ফোন করছি। এখন শোভনের সঙ্গে জরুরি কথা বলছি"

"না... না... না... এখনই..."

"ব্যাপারটা কী? এত তাড়া কিসের?"

"খুব জরুরি। ইট ইজ ইম্পরট্যান্ট"

অঞ্জন আঁচ করল, কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে। যাই হোক না কেন, শোভনের সামনে এ ব্যাপারে ডিসকাস করতে চায় না।

"আমি কথা শেষ করে তোমায় ফোন করছি"

আবার কী হল? ধীর স্থির ইমাকে তো এর আগে এত উতলা দেখেনি। নিশ্চয়ই সিরিয়াস কিছু। নইলে ইমা ফ্র্যান্টিকভাবে ফোন করত না। মহিলাদের এই টেনশন নতুন নয়। অঞ্জন অভ্যস্ত। এর আগেও বহুবার, বহু নারীর ভাবাবেগ সামলাতে হয়েছে। মহিলারা একটু বেশি আবেগ প্রবণ হয়। শিল্পী হলে তো কথাই নেই... ইমার ইম্পরট্যান্ট ইমারজেন্সিকে মোকাবিলা করা বাঁ হাতের খেল।

আজ তো নয়, সেই কবে থেকে মহিলাদের নিয়ে খেলছে। হয়ত জীবনটা অন্য রকম হত, যদি তার আগের দুই লিভ-ইন পার্টনার, অনামিকা আর সুদেষ্ণা, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া না করে, তাকে পরিত্যাগ না করত, জীবনের সব স্বপ্নকে চুরমার করে। স্বপ্ন-ই ভাঙা নয়, তাদের বিদায় তার মননে যে গভীর রেখাপাত

করেছিল, তার অভিব্যক্তি আজকের অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। যাকে সবাই নারী পিপাসু, বিক্রেতা বলেই জানে। শুধু জানে না, অন্তর্নিহিত উৎস, যেখানে এর বীজ পোঁতা হয়েছিল। ঘর-ই শুধু গেল না, জীবনের দর্শনটাই পালটে গেল। প্রফেসারি ছেড়ে বিলেতে। আবার ফেরত কলকাতায়। পত্রিকার সাংস্কৃতিক সম্পাদক। নতুন জীবন।

দিনের শেষের কাজগুলো গুটিয়ে, যেই না চেয়ার ছেড়ে উঠেছে, রিসেপশন থেকে ফোন "আপনার সঙ্গে এক মহিলা দেখা করতে চাইছেন" এই কাজের শেষে? ভাবছিল আরেকদিন আসতে বলবে। কী মনে হতেই বলল "ঠিক আছে পাঠিয়ে দাও"

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজার সামনে এক লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। কপালে লাল টিপ তন্বী যুবতি। পুষ্ট অবয়বের আকর্ষণীয় অংশগুলো দেহে অতিরিক্ত প্রলেপ দিয়েছে। মেয়েটির দিকে মুখ তুল ডেস্কের উলটো দিকে ইঙ্গিত করে বলল "বস"

"অসময় আপনাকে বিরক্ত করলাম। কয়েকদিন ধরেই ভাবছি আসব। কিন্তু কলেজ শেষ হতে এত দেরি হয়ে যায়, যে আসা আর হয়ে উঠছিল না। আজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছে। ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে পড়েছিলাম"

এবার ভাল করে দেখল। একবার দেখলে মন বারবার ফিরে দেখতে চায়। ঠিক ফর্সা বলা না গেলেও, সাধারণ বাঙালি মেয়েদের চেয়ে রং যেন একটু বেশি পরিষ্কার। সরে যাওয়া লালপেড়ে সাদা শাড়ির আঁচলটা চেয়ারের হাতলে লুটিয়ে পড়াতে, লাল ব্লাউজের অন্তরালে স্তনযুগলের একাংশকে অনাবৃত। না চাইলেও, যে কোনও পুরুষের চোখ ওখানে পড়াই স্বাভাবিক। অঞ্জন তো আর ভীষ্ম নয়। তার চোখের ঘোরাফেরা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি। মিডিয়ার লোকেরা যেমন টিআরপি বোঝে, মেয়েটিও জানে তার ইউএসপি।

"কোন কলেজে পড়?"

"প্রেসিডেন্সি। বাংলায় অনার্স ফাইন্যাল ইয়ার। কবিতা লিখি। আপনার একটা কবিতা শোনার সময় আছে? বাই দ্য ওয়ে, আমার নাম দীপশিখা"

দীপশিখা বহ্নি ছড়াচ্ছে। যতক্ষণ থাকবে, কবিতা শোনাবে, ততক্ষণই চোখের তৃপ্তি।

"বল। কাজ শেষ হয়ে গেছে। বেরচ্ছিলাম"

"আপনার সময় নষ্ট করছি"

হ্যান্ডব্যাগ থেকে নোটবই বার করে পাতা উলটে কবিতা শোনাল। দারুণ লেখা তো। এই বাচ্চা মেয়ের এত বলিষ্ঠ লেখা। ভাবাই যায় না।

"বাহঃ..."

“অনেকদিন ধরেই লিখছি। কোথাও ছাপানো হয়নি। ভাবছিলাম আপনার এখান থেকে যদি বের হয়...”

অঞ্জন দীপশিখার অনাবৃত ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে, সুডৌল স্তনের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল “বেরবে। এখান থেকেই বেরবে। তুমি বরং এক কাজ কর। কালকে সন্ধের দিকে এস। একটু লেট করে। সম্পাদককে একটা চিঠি লিখে আনবে, যে তুমি কবিতাটা ছাপাতে আগ্রহী। সঙ্গে এই কবিতাটা অ্যাটাচ করে দেবে”

সেদিন সেখানেই শেষ।

অঞ্জন তখনও বুঝতে পারেনি, আরেক অধ্যায়ের শুরু। শুধু পেইড নিউজ লেখার উপরিতে পকেট ভর্তি করতেই ব্যস্ত। বিলেত থেকে ফেরার পর উন্নত লাইফ স্টাইল।‘বড়বাজারের’ মাইনেতে কী সেভাবে বাঁচা সম্ভব? ঘর-ই যখন রইল না, তখন জীবনকে আস্বাদন কর, তার রূপ, রস, গন্ধ, ছন্দ, বর্ণ, স্পর্শ করে। সেটাই বাঁচার মূলমন্ত্র। মাকে ঘরে রেখে, সারা দুনিয়ার ভোগের আস্বাদনেই জীবনের পূর্ণতা। শূন্য জীবনকে পূর্ণতায় ভরিয়ে দিল ভোগের লালসা - টাকা, নাম, মহিলা।

পরের দিন কথামত দীপশিখা এল। অঞ্জন ওগুলো ড্রয়ারে ঢুকিয়ে বলল “তোমার কী খুব তাড়া আছে?”

“নাঃ তাড়া থাকবে কেন?”

“তবে চল প্রিন্সেপ ঘাটের স্কুপে। আমার গাড়ি আছে। ওখানে বসেই তোমার কবিতা শুনব”

গঙ্গার বুকে, স্কুপের মায়াবী আলোয় তন্বী সুন্দরীর অমৃত কণ্ঠে কবিতা পাঠ। কতটা কবিতা শুনছিল, আর কতটা দীপশিখার দেহ মাধুর্য উপভোগ করছিল, মুহূর্তই বলতে পারবে। সেখান থেকে ইডেনের প্যাগোডায় বসে চুমু খাওয়া। ব্লাউজের ওপর দিয়ে, দীপশিখার ভরাট স্তনের মিঠে স্পর্শ। ওর কাজলকালো চোখে হারিয়ে গেছিল অঞ্জন। ব্লাউজের বাঁধন শিথিল করে, ওর বুকে মুখ ডুবিয়ে তার অতৃপ্ত উত্তেজনাকে চাঙ্গা রাখতে প্রস্তুত দীপশিখা। মূল্যটা গৌণ। জীবনের সার্থকতা, নিজের কাব্যিক স্ফূরণে। কবিতা, যৌবন, শরীর - সব মিশে গেল, সার্থকতার উন্মাদনায়, নেশায়।

সব-ই ঠিক চলছিল। গুটি কয়েক কাছের বন্ধু ছাড়া, এই লেনদেন ছিল লোকচক্ষুর আড়ালে। বাধ সাধল ঈশিতা, আরেক উদীয়মান কবি। তারও শখ হল এক-ই সিঁড়ি বেয়ে ওঠার। দীপশিখার বন্ধু। দেখতে একেবারেই সুশ্রী নয়। কবিতা যাই লিখুক না কেন। আপাদমস্তক দেখেই বলল “নাঃ, ভাল হয়নি। চলবে না”

“কেন? আপনি দীপশিখার কবিতা ছাপাতে পারেন। আমারটা কেন নয়? আমি কি ওর থেকে খারাপ লিখি?”

“বললাম তো, হবে না”

“এটাই আপনার ফাইন্যাল কথা?” ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে।

“হ্যাঁ ফাইন্যাল” অকাজের মহিলার প্রতি অঞ্জনের কোনও আকর্ষণ নেই।

ঈশিতাই ফাঁস করে দিল অঞ্জনের সঙ্গে সম্পর্কের ঘেরাটোপে দীপশিখার উত্থানের গোপন রহস্য। অবজ্ঞার প্রতিশোধ। একদিকে এই বোঝাপড়ার তথ্য, অন্যদিকে পেইড নিউজের খেলায় ফেঁসে গেল অঞ্জন। চাকরিটাও গেল। অঞ্জন তখন বেঁচে থাকার পথ খুঁজছে। ঠিক তখনই রাজীবের সঙ্গে লাইন ফিট করার চেষ্টা। আর চিত্র পরিচালক কর্ণ ঘোষের সিনেমায় সুযোগ করে দেওয়ার আছিলায়, মেয়ে তোলার টোপ। সবাই হিরোইন হতে চায়। সবাই স্টার হতে চায়। অঞ্জন স্টার না করতে পারলেও, কাঁচের স্বর্গ তো দেখাতে পারে। সেই থেকেই সে স্টারডমের সারথি।

"শোভন, গর্ব কিছুই নয়। সাফ কথা, এ ম্যাটার অফ মিউচুয়াল কনভিনিয়েন্স" চায়ের কাপটা শেষ করে উঠে পড়ল "চলি একটু কাজ আছে"

ম্যাগনোর অফিস থেকে বেরিয়ে, বহুদিন পর দীপশিখার কথা মনে পড়ে গেল। কোথায় আছে? কেমন আছে? এখনও কী কবিতা লিখছে? না কি, বিয়ে সংসার করে পাক্কা গৃহিণী? সে সব কথা মনে পড়লেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

ষোলো

“একটা জাতীয় পুরস্কার দরকার। যে ভাবেই হোক। দেখাতে পারলে আরও প্রোডিউসার পাওয়া যাবে। এই স্ক্যামের মধ্যে মনে হয় না, সাঙ্গুভ্যালি আর প্রোডাকশনে টাকা ঢালবে” শৌভিক ভারী দেহটা বারন্দার সোফায় এলিয়ে দিল। দু-একটা খুচরো ইন্টারন্যাশনল ফেস্টিভ্যালে, প্রোডিউসারকে ম্যানেজ করে টাকা খরচ করেই এন্ট্রি নিয়েছিল। আর কিছু না হোক, সবাইকে তো বলতে পারবে ‘আমার সিনেমা ফেস্টিভ্যালে দেখান হয়েছে।’ প্রাইজ অবশ্য জোটেনি। তাতে কী? ফরেন তকমা লাগিয়ে প্রোডিউসার আর পাবলিককে তো বশ করতে পেরেছে। সে নিজেও জানে, তার এমন কোয়ালিটি নেই, ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যালে প্রাইজ পাবে।

বহ্নি হাউস কোটের কোমরবন্ধনীর গিট্টুটা বাঁধতে বাঁধতে পাশে বসে বলল “চ্যাটার্জিবাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখ। কই, আমার গ্লাসে হুইস্কি ঢালনি?”

“নাঃ। কী জানি কতক্ষণ লাগে তোমার স্নান করতে! বরফ গলে ভূত হয়ে যাবে। সিঙ্গল মল্ট কি জলে গুলে খেলে কোনও টেস্ট থাকে?”

বহ্নি তার গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে আইস কিউবগুলো অ্যাড করে বলল “উনি চাইলে সব পারেন। আফটার অল হি রানস দ্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড শো”

“কথা বলার কী আছে? উত্তরটা তো আমার জানা। তুমি কী তাতে রাজি হবে?”

“কীসে?” বহ্নি চুমুক দিল, “আঃ... সিঙ্গল মল্ট আফটার এ হ্যারয়িং ডে। হোয়াট কুড বি বেটার?”

সেই আশির দশকে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির বান্ধবী আজ শুধু স্ত্রীই নয়, তার সন্তানের মা। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে পাস করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। তখন থেকেই কার্শিয়ং-এর মেয়ে বহ্নির সঙ্গে প্রেম। পাস করে বহ্নি চলে গেল মুম্বাই। ধীমান আর শৌভিক নাটকের গ্রুপ খুলল। বহ্নি বছর দুয়েক ওখানে ছিল। তেমন কিছু করতে পারল না।‘চাহত’ বলে একটা সিরিয়াল আর একটা ছবিতে মায়ের রোল করে ফেরত চলে এল। গাঁটছড়া বাধল। নির্জন অস্তিত্ব আলোকিত করল ওদের ছেলে নির্জন। এখন কী করে হাঙরের মুখে ঠেলে দেয় বিবাহিত স্ত্রীকে?

শৌভিক গ্লাস নাড়াচাড়া করতে করতে বলল “ইউ হ্যাভ টু স্লিপ উইথ দিস ওল্ড হ্যাগারড। নিজের মেয়ে বড় হয়ে সিনেমা করছে, তাতেও বুড়োর হিট যায় না। বাছ বিচার নেই। এনি লেডি ইজ জাস্ট ফাইন”

বহ্নি ঢকঢক করে প্রথম পেগটা গিলে, আবার ঢালল। তরলটা গলা দিয়ে নামতেই কেমন ঝাঁঝিয়ে উঠল। কয়েক সেকেন্ড। সে তো ভার্জিন নয়। এই বয়েসে শোয়াটা কী আর তেমন বড় ব্যাপার? শৌভিকর সঙ্গে না

শুয়ে, এক বুড়ো ভামের সঙ্গে একরাত। হোয়াটস হারম ইন দ্যাট? আগে কী অন্য কারও সঙ্গে শোয়নি। শৌভিক তো জানেই না। বলতে চায়নি। মুম্বাই-এর সিরিয়ালে সুযোগ পাওয়ার জন্য, তাকে সেই বয়সে কতবার প্রডিউসারের সঙ্গে শুতে হয়েছে! তখন অবশ্য অনেক ইয়ং ছিল। রূপ-যৌবন থাকলেও, কার্শিয়ং-এর রক্ষণশীল পরিবার থেকে আসা বহ্নির মধ্যবিত্ত চিন্তাধারার ঘেরাটোপ থেকে বার হওয়া অত সহজ ছিল না। তবুও একটা স্বপ্ন। আর জেদ। করেই দেখাবে।

ওই সিরিয়াল দিয়েই মুম্বাই-এর অধ্যায় শেষ। কপালে আর কিছু জুটল না।

২০০৪ থেকে ভাগ্যদেবী মুখ তুলে চাইলেন। শৌভিকের প্রথম ডিরেক্টরিয়াল ডেবুট 'উত্তরাধিকারী'। নায়িকা অনুশ্রী। সাইড রোলে বহ্নি। নায়িকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ তার পরের বছর শৌভিকের পরের ছবিতে - 'ম্যানচেস্টার'।

সে সব এখন স্মৃতি। এখন আর সে মুম্বাই-এর স্ট্রাগ্লিং অ্যাক্ট্রেস নয়, শৌভিকও আর স্ট্রাগ্লিং ডিরেক্টর নয়। বাংলা ছবির প্রথম সারির ডিরেক্টরদের মধ্যে একজন। পালাবদলের পরে ভাগ্যের সিন্দুকটা যেন আচমকাই খুলে গেছে।

"হোয়াটস দ্য হারম ইন দ্যাট। অ্যাট দিস এজ, ডাস ইট মেক এ ডিফারেন্স? আফটর অল, ইফ ইট হেল্পস ইন আওয়ার কেরিয়ার?"

গুম মেরে বসে আছে শৌভিক। উত্তর নেই। প্রত্যেকটা সারভিং-এ স্কচের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। বউকে জুরির চেয়ারম্যানের বিছানায় শুতে পাঠাবে, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার জন্য! নেশাটা গাঢ় না হলে ভাবতে পারছে না। বহ্নি বুঝতে পারছে, ভেতরে দ্বন্দ্বে টালমাটাল। এত বছরে লোকটাকে কাছ থেকে তো দেখে আসছে। পারিবারিক রুচিতে বাধছে, বিবেকেও।

"হোয়াই আর ইউ সো কন্সারনড? নথিং ইজ ফ্রি ইন দিস ওয়ার্ল্ড। দেয়ার ইজ এ প্রাইস টু পে ফর এভ্রিথিং। ইফ উই ওয়াণ্ট সামথিং, হোয়াট ইজ দ্য হারম ইন পেয়িং দ্য প্রাইস?"

"অ্যাট ইওর কস্ট?"

"কাম অন, স্লিপিং উইথ এ ওল্ড হ্যাগারড ইন দিস এজ, ইজ নো কস্ট অ্যাট অল, কম্পেয়ারড টু দ্য বেনিফিটস ইউ রিপ। বাংলা সিনেমার এখন যা অবস্থা, ইট মাইট কোল্যাপ্স লাইক এ হাউজ অফ কারডস এনিটাইম। ভুলে গেছ আমাদের স্ট্রাগ্লিং পিরিয়ডের কথা? নাইন্টিস?"

শৌভিক বহ্নির দিকে তাকিয়ে বলল "ভুলব কেন? আমি আর ধীমান নাটক নিয়ে স্ট্রাগল করছি। টলিউডে স্ক্রিপ্ট লিখে তখন আমাদের সংসার চলছে। মিড নাইন্টিসে কয়েকটা টেলিফিল্ম করলে। দোস ওয়ার হার্ড ডেইজ। তখন বয়স কম ছিল, জিল অনেক বেশি। নির্জনের বয়স কম..." সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে আরও

কিছুটা তরল গলায় ঢেলে বলল "নির্জন এখন বড় হচ্ছে। ওর ফিউচারের কথা তো ভাবতে হবে। ইফ উই আর আউট অফ বিজনেস, হোয়ার ডু উই স্ট্যান্ড?"

সবই বুঝতে পারছে। রিয়ালিটি অনেক কঠিন, বউকে পরের বিছানায় এগিয়ে দেওয়ার থেকে। সারভাইভ্যাল ইজ মোর ঘাস্টলি দ্যান ওয়ান নাইটস স্ট্যান্ড। ঢকঢক করে গ্লাসটা শেষ করে আবার ঢালল। বিবেকে বাধলেও, বহ্নির কথা জাস্টিফায়েড। ডারউইনের থিওরি অফ ইভলিউশন তো তাই বলে - ইন দিস ম্যাড ওয়ার্ল্ড, সারভাইভ্যাল অফ দ্য ফিটেস্ট ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া।

আধ খাওয়া সিগারেটটা বারন্দার বাইরে ছুঁড়ে, গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল "শেষ পর্যন্ত কী জ্যোতিষ আর কবচ, ব্রেসলেট, এন্ডরস করে রোজগার করতে হবে? তাছাড়া আর উপায় কী? পলিটিক্স কর, নইলে মা-মাসির রোলে সিরিয়াল। আমি চড়চড়ে গরমে গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে পারব না। আমার অত দম নেই। অ্যান্ড হোয়াট ইউ গেট আফটার হোল ডেইজ ওয়ার্ক ইজ পিনাটস"

"সবই বুঝতে পারছি বহ্নি, বাট..."

"কাম আউট অফ ইওর মিডিওকার শ্যাকলস। আমি তো বাজারে নেমে বেশ্যাবৃত্তি করতে যাচ্ছি না। চ্যাটার্জিবাবু এক সময়ের নাম করা ডিরেক্টর। আফটার অল, ইট ইজ এ ওয়ান নাইটস স্ট্যান্ড ওনলি"

ড্রিঙ্কস্টা সেরিব্রামে হিট করতেই, চিন্তাটা অনেক স্বচ্ছ। বহ্নি ঠিকই বলছে। এই কঠিন সময় সারভাইভ্যালটাই বড়। এসব প্রেজুডিস নিয়ে বসে থাকা যায় না। আজ সাঙ্গুভ্যালি পঞ্জি স্কিমে হাত গুটিয়ে নিয়েছে, কাল আরও পাঁচটা প্রোডাকশন হাউস উইথড্র করবে। প্রোডাকশন যত কম হবে, কম্পিটিশন তত বাড়বে। সে তো সেই কোয়ালিটির নয়, যে সাস্টেন করতে পারবে? কর্ণদাও পারেনি। লাইন মেরে বেশ কয়েকটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড জুটিয়ে টিকে থেকেছে। আজ যদি বেঁচে থাকত কী হত? সিনেমা জুটত কি না যথেষ্ট সন্দেহ। কোনও কাগজের এডিটরিয়াল আর চ্যাট শো করে রোজগার করতে হত। মরে নিস্তার পেয়েছে। সে তো বহ্নিকে ছেড়ে পালাতেও পারবে না। নির্জনের কী হবে?

"তোমাকে কদ্দিন থেকে বলছি, টিভি প্রোডাকশন কম্প্যানি স্টার্ট করতে। তুমি গুরুত্বই দিচ্ছ না"

"ড্যাম ইট। উই জাস্ট ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ক্যাপিটল, ইউ নো"

"তুমি ইনভেস্ট করবে কেন? ইউ আর অ্যাট ইওর পিক নাউ। ইনভেস্ট করার জন্য কিছু ভেঞ্চার ক্যাপিট্যালিস্ট জোগাড় কর। দেখ না, শুভ্রজিৎদা স্টার্ট করেছে"

"ভুলে যেও না, আগে দু-দুবার ফেল করেছে, ইভেন হোয়েন হি ওয়াজ অ্যাট হিস পিক। এক সময় ফাঁকা মাঠে প্রচুর কামিয়েছে। এখন তো শুনছি, সমর্পিতাও ওকে ছেড়ে কোন তামিল লোকের সঙ্গে থাকছে। এখন আর ওর কি-ই বা করার আছে?"

“সমর্পিতা চলে গেছে? জানতাম না তো”

“তাই তো শুনলাম” ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে গ্লাসটা নাড়াচাড়া করে বলল “আই ডাউট হোয়েদার হি উইল বি সাকসেসফুল হিয়ার টু। হি ইজ সো ভেরি আনস্টেবল”

“বাট ইউ আর নট। ওয়েক আপ, লেট দ্যাট ওল্ড হ্যাগার্ড ইউস মি ফর এ নাইট। আই ডাউট অফ হিস কেপেবিলিটি। এ ফিউ অ্যাওয়ার্ডস, অ্যান্ড উই রান দ্য শো”

অন্ধকারটা এখন আর অত গাঢ় নয়। ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। মেঘে ঢাকা চাঁদটা আবার উঁকি দিয়েছে। ফিকে আলো। এক সময় দুজনে জ্যোৎস্নায় কত ভেসেছে। এখন আর সে জ্যোৎস্না নেই। তবু ফিকে আলোটা হারিয়ে যায়নি। মেঘ আস্তেআস্তে সরছে। সেখানে কোনও পাগল মুনলিট সোনাটা বাজছে না। ডাকছে নাকোনওনতুন পৃথিবী। আনকোরা কম্পোজিশন তৈরি হচ্ছে সংসার আর সংস্কৃতির।

শৌভিক এখন আর বহ্নিকে দেখতে পাচ্ছে না। তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে আলো-আঁধারির লুকোচুরি। নিজেদের অবিচুয়ারি লেখার আগে বাস্তবের হাতছানি। নির্মোহ রূঢ়।

“মাম, আই অ্যাম হাংরি” ভেসে এল নির্জনের আবদার।

“আসছি বাবা” ড্রিঙ্কসটা এক চুমুকে শেষ করে উঠে পড়ল। নির্জনের পড়া হয়ে গেছে। ওকে ডিনার সার্ভ করতে হবে। একদিকে সে যেমন শৌভিকের স্ত্রী, অন্যদিকে সে তো নির্জনের মা। দ্য ওয়ার্ল্ড মাইট বি ক্রুড, বাট হোম ইজ নট। অভিনেত্রী হোক আর যাই হোক, এটাই তার আসল পৃথিবী। একে রক্ষা করাই আপাতত নারীধর্ম।

সতেরো

মোবাইলটা বেজে যাচ্ছে...

নো রেসপন্স। দেবাশিস ডিসকানেক্ট করে দিল। দেওয়ালি নিশ্চয়ই ব্যস্ত। মিসড কল দেখে নিশ্চয়ই ফোন করবে। সদ্য হিউস্টন থেকে ফিরেছে। এখনও ভাল করে জেট ল্যাগ কাটেনি, ঘুম পাচ্ছে। টাইম ডিফারেন্সটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। মোবাইলটা বেডসাইড টেবিলে রেখে, পর্দা টেনে শুয়ে পড়ল। রাখি নেই, কোথাও বেরিয়েছে বোধহয়। কালকেই বলছিল একবার দিদির সঙ্গে দেখা করবে।

বোধহয় হিন্দুস্তান রোডে রত্নাশঙ্করের নাচের স্কুলে গেছে। নিঝুম বাড়িতে, নিশ্চিন্তে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না। ঘুম ভাঙল মোবাইলের আওয়াজে। কলার লাইন কেটে দিয়েছে। বোধহয় অনেকক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। মোবাইলে টাইম দেখল, আটটা দশ। সিএলআইতে দেওয়ালি। এতক্ষণে বোধহয় ফ্রি হয়েছে। কল ব্যাক করল।

“স্যরি দেবাশিসদা। তুমি ফোন করেছিলে? শট দিচ্ছিলাম। ঠিক হচ্ছিল না বলে, বারবার রি-টেক করতে হচ্ছিল”

“শেষ পর্যন্ত ঠিক হল?”

“হ্যাঁ” মনে হল দেওয়ালি স্যাটিসফায়েড।

যতটুকু দেখেছে, দেওয়ালিকে পারফেকশনিস্ট বললে কম বলা হবে। এই তো কিছুদিন আগে, ওর সঙ্গে ‘খেয়ার আলোয়’ সিনেমা করতে গিয়ে দেখেছে। থিয়েটার আর্টিস্ট না হলে কী হবে? স্বরূপার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অ্যাক্টিং করতে জানে মেয়েটা। স্বরূপা ভেটারান অ্যাক্ট্রেস, বহুদিন ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে আছে। ওর মায়ের রোলের সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে চালিয়ে গেছে। এমনও হয়েছে, দেবাশিস শট ওকে করার পরও দেওয়ালি বলেছে “হল না দেবাশিসদা। আরেকবার”

“কেন রে? ভালই তো করেছিস” স্বরূপার অ্যাশিওরেন্স বৃথা।

“না দিদি। তোমার মতো করতে পারিনি। প্লিজ... আরেকবার...”

অনিচ্ছা সত্ত্বেও, স্বরূপা শট দিয়েছে। দেবাশিসকেও রি-টেক করতে হয়েছে। এডিটিং-এর সময় দুটো শট কম্পেয়ার করতে গিয়ে দেখছে, দেওয়ালিই ঠিক। ফাইন্যাল শট মাচ বেটার। তখনই মেয়েটার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। লাইনে নতুন হলে কী হবে, সুপার পারফেকশনিস্ট।

“কোথায় আছ?”

“এই তো সারাদিনের শুট শেষ করে লোখান্ডওয়ালার ফ্ল্যাটে ফিরলাম। তোমার মিসড কলটা আগেই দেখেছি। উফঃ... যা গরম না। স্নান করে এসিতে এখন রিফ্রেশড” বিবস্ত্র দেওয়ালি চুলটা ফ্যানের হাওয়ায় মেলে বলল।

“কবে কলকাতায় আসছ?”

“এই শিডিউল শেষ না হলে, যাওয়া নেই। এই তো সেদিন শুভ্রাদির ব্যুটিক ওপেন করতে গিয়েছিলাম, একদিনের জন্য। পেপারে দেখনি?”

“নাঃ... আমি তখন হিউস্টনে। দুদিন হল ফিরেছি”

“কিছু দরকার ছিল? ডাবিং-এর ব্যাপারে?”

“না... না... ডাবিং নয়। সিনেমা রেডি, অগস্টে রিলিজ করবে। অন্য ব্যাপারে...”

“কী?”

“ফোনে বলা যাবে না। সামনাসামনি বলতে হবে”

“বেশ, ইফ আই হ্যাপেন টু বি দেয়ার, আই উইল কল ইউ। ক্যান ইট ওয়েট আন্টিল দ্য প্রিমিয়ার?”

“আগে হলে ভাল হত”

“যদি যাই, তোমায় ফোন করব”

ফোনটা ডিসকনেক্ট করে, চুল মেলে, খাটের ওপর নিজের ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিল। ইট হ্যাস বিন এ লং ডে। টিডিয়াস শুট। ফেরার পথে দোকান থেকে মোমো কিনে এনেছে। ফ্রিজে সুপ আছে। মাইক্রোওয়েভে গরম করে নেবে। এ সময় ওজন বাড়লেই মুশকিল। হাতে এতগুলো ছবি। হলিউডের এজেন্ট মার্কের সঙ্গেও কথা বলেছে। কপাল থাকলে, লেগেও যেতে পারে।

শ্লথ পায়ে বেডরুমের বার থেকে ভডকা, ফ্রিজ থেকে তাজার বোতল আর বরফ নিয়ে ঘরে ফিরে এল। লোখান্ডওয়ালার এই ফ্ল্যাটটা হুট করে কিনে ফেলেছিল। এক এনআরআই তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাটটা বিক্রি করতে চাইছিল বলে বাজার থেকে অনেক সস্তায় পেয়েছে। তখনও সিওর ছিল না মুম্বাইতে তার ফিউচার আছে কি না, যদিও ‘কভার স্টোরি’ টা হিট করেছে। না লাগলে, বিক্রি করে কলকাতায় ফেরত চলে যাবে। আফটার অল, লসে তো রান করবে না। মুম্বাইয়ের প্রপার্টি মার্কেট ব্যুমিং। এখনও তো বেশ কয়েকটা ছবি হাতে। লেগে গেলে এখানেই টাকা। ইন্টারন্যাশনাল ফেম। কলকাতায় কী সে সব আছে? স্বপ্নটা আকাশচুম্বী। ফাস্ট রানিং পোরশেতে যখন বসেছে, অ্যাক্সিলেটারে পা না রাখলেই বিপত্তি। বাই-লেনে সটকে যেতে পারে।

আমের রসে ভডকা মিশিয়ে খাওয়ার যে কী তৃপ্তি, টেম্পারেট দেশের লোকেরা কী বুঝবে? আহঃ... সারাদিনের ধকলের পর প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। বেশ অনেকটাই খেয়ে ফেলল। আজকাল একটু-আধটুতে হয়

না। কালকে আফটারনুন শিফট। দেরি করে উঠলেও চলবে।

বছর পাঁচেক আগের কথা। তখনও ইন্ডাস্ট্রিতে স্ট্রাগল করছে। গড়িয়ার নাকতালায় রাজাদিত্য এমনিভাবেই তাজা মিশিয়ে ভডকা এগিয়ে দিত। অ্যাডভাইস দিত কেরিয়ারের ব্যাপারে। তখন রাজাদিত্যর ছবি 'মোমের বউ'-তে কাজ করছে। ফ্রেন্ড, ফিলসফার, গাইড রাজা। ইন্ডাস্ট্রির নাড়িনক্ষত্র শেখাচ্ছে, সঙ্গে অ্যাক্টিং। পারফেকশন কী করে অ্যাচিভ করতে হয় ওর কাছেই শেখা।

"বুঝলে দেওয়ালি, ইন্ডাস্ট্রিতে কোয়ালিটি সিনেমা না করলে টিকতে পারবে না। ইনস্ট্যান্ট সাকসেস উইদাউট কোয়ালিটি বেশিদিন ধোপে টেকে না..." কথাটা ভুল বলেনি। কোয়ালিটি না থাকলে, লং রানে টেকে না। আজও যে এগিয়ে চলেছে, তার মূলে রাজার অ্যাডভাইস। সি ইজ গ্রেটফুল টু হিম। বাট দ্যাট ডাসেন্ট মিন হি ক্যান কন্ট্রোল হার। শুনেছে আর্টিস্ট রিয়া ঘোষালও একদিন ওর খপ্পর থেকে পালিয়েছিল। সত্যি-মিথ্যে জানে না। পুরোটাই শোনা। রাজাদিত্যকে বিছানায় কম্প্যানি দেওয়া এক জিনিস, আর পুরো সত্ত্বাটাকে বন্ধক রাখা আরেক।

গ্লাসটা বেডসাইড টেবিলে নামিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া এসির হাওয়ায় ছুড়ে, নিজেকে নিয়ে খেলতে লাগল। দেয়ার আর এ ফিউ থিংস সি লার্নট ফ্রম হার কেরিয়ার ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। আফটার এ হার্ড ডে ইউ নিড টু রিল্যাক্স, টু ফ্রেশেন আপ ফর ইয়োর নেক্সট ডেইজ ওয়ার্ক। টু রিল্যাক্স ইউ নিড এ ড্রিঙ্ক অ্যান্ড অ্যান অরগ্যাজম। বয়ফ্রেন্ড যখন নেই, সি নিডস টু কয়েঞ্চ হার লাস্ট অন হার অউন। এই অ্যাক্টিভ কেরিয়ারে বয়ফ্রেন্ড রাখার অনেক ঝক্কি। স্বাধীনতাই কেবল যায় না, ওয়ান্স দে নো ইউ আর হুকড, কন্ডিশনস ফর বেটার অফার নিয়ে অ্যাপ্রচ করতে অনেকেই দ্বিধা করে। ফ্রিডম অনেক বেশি ডাইভারসিটি দেয়। বিশেষ করে সে যখন হলিউডের স্বপ্ন দেখছে।

ভডকার স্টিমুলেশন, কি নিজের হাতের, জানে না। অরগ্যাজমটা ঝট করে এসে গেল। নেতিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। আহঃ... হোয়াট এ রিলিফ! পুঞ্জিভূত চাপা উচ্ছ্বাসকে মুক্তি দেওয়ার মধ্যে অন্য স্যাটিসফ্যাকশন। ঠিক স্যাম্পেনের কর্ক খুললে যেমন ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে, সেলিব্রেশন। রাজাদিত্যর নাগপাশ থেকে বেরিয়ে তেমনই অনুভব করেছিল, রিলিফ।

দেওয়ালি ছোটবেলা থেকেই স্বতন্ত্র। কারও অধীনে থাকার মেয়ে নয়। বাবা চিরকালই বলত "যত পারিস আমার ওপর রোয়াব দেখিয়ে নে। যখন শ্বশুরবাড়ি যাবি, তখন সব রোয়াব ঠান্ডা হয়ে যাবে। মেয়ে হয়ে জন্মেছিস। মেনে নিতে শেখ..." পারেনি।

টিপিক্যাল বাঙালি শ্বশুরবাড়ির কথা এখন আর ভাবতেই পারে না। এমনিতে খারাপ ছিল না রাজা, তবে রোগ একটাই। ইনহেরেন্ট নেচার অফ অথরিটি। ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন দেওয়ালিকে গ্যেজ করতে পারেনি। যদি

শোনা কথা সত্যি হয়, তবে রিয়া তো সেভাবে দেওয়ালির মতো সাকসেসের সিঁড়ি বাইতেও পারেনি। যে কারণেই হোক, সেও তো জাল ভেঙে বেরিয়ে গেছে। হয়ত তখনও নভিস বলেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু দেওয়ালি তো রিয়া নয়, অন্য ধাতুতে গড়া। অস্বীকার করে লাভ নেই। তার উত্তরণ কাজ দিয়েছে। অজান্তে এই সার্বিক নির্ভরতার জাল ছেড়ে বেরবার ইন্ধন জুগিয়েছে।

এখন আর রাজাদিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। তবুও সেদিন যখন দেখা করতে চাইল, পুরনো দিনের কথা মনে করে, বালি থেকে ফেরার পর কথামত দেখা করেছিল। নাকতলার বাড়িতে নয়, নিজের ফ্ল্যাটেও নয়, প্রিন্সটন ক্লাবের ডিসক্রিট লাউঞ্জে।

"আবার পুরনো সম্পর্কটা ফিরিয়ে আনা যায় না" চায়ে চিনি মেশাচ্ছিল রাজাদিত্য।

"রাজাদা, এখন তো আমার সে টাইম নেই। কলকাতা-মুম্বাই মিলে, হাতে সময় কম"

"তুমি আমায় ভুল বুঝছ। মানে ফ্রেন্ডশিপটা"

"সে তো সব সময়ই আছে। আমি অতীতকে ভুলি না রাজাদা। তোমার কোনও কাজে আমায় নিশ্চয়ই পাবে। যদি ফিউচারে কোনও ছবি কর, নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে কাজ করব"

"থ্যাংকস। আপাতত হাতে নেই, প্রডিউসার পাচ্ছি না"

"যদি কখনও পাও, ভাল স্ক্রিপ্ট থাকলে বোলো" দেওয়ালি ম্যাচিওরড, প্রফেশনাল।

"তোমার তো এখন অনেক কন্ট্যাক্টস। কোনও প্রডিউসারের কাছে আমার নাম রেকমেন্ড করতে পারবে?"

"প্রডিউসাররা কী চেনা লোকেদের কথায় ইনভেস্ট করে, ওদের নিজেদের ইকোয়েশনে ছাড়া। যোগ-বিয়োগটা ওদের বুঝতে হয় আমাদের থেকে বেশি"

"তবুও..."

"কথা উঠলে নিশ্চয়ই বলব"

"থ্যাংকস" রাজাদিত্য বুঝতে পারছিল, ভদ্রতার আড়ালে দুজনের মধ্যে বিরাট একটা কাচের দেওয়াল। একজন সাকসেসফুল হিরোইন। আরেকজন পরিচিত কোয়ালিটি ডিরেক্টর হলেও, ডিসকোয়ালিফায়েড।

মাঝে মাঝে একান্তে এক অজানা ভয় গ্রাস করে। এই নাম টাকা সাকসেস যদি একদিন চলে যায়, নিতে পারবে? বিশেষ করে রাজাদিত্যের মতো কোয়ালিটি ডিরেক্টর যখন সাইডলাইনে চলে যায়, তখন সেও তো এভাবে যে কোনওদিন। খ্যাতিরও ইতি আছে। তাই দুটো ফর্মেই হিসেব করে এগোবার চেষ্টা করছে।

অরগ্যাজমের নিবৃত্তি হয়েছে। সাময়িক আরাম। ভডকায় সিপ। স্টারডমও ঠিক অরগ্যাজমের মতো। ক্ষণিকের আনন্দ। তৃপ্তির নিরসন হতে কতক্ষণ? তারপর? পুরনো স্মৃতি আঁকড়ে বসে থাকা। এই বিপুল

পৃথিবীর অন্ধকারে জীবনের সার্থকতা খোঁজা চাই। কে জানে? কোনদিন সেই স্ফুলিঙ্গ দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে কোনও এক প্রান্তে। সেদিন হয়ত সে থাকবে না সাধারণ পরিধির চিন্তাধারায়।

সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স মারফত উত্তরসূরি রেখে যাওয়ার মধ্যে প্রপাগেশন অফ জিন-এর বহিঃপ্রকাশ। অমরত্ব লাভের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। উত্তরসূরির সংকীর্ণ চিন্তাধারার বাইরেও তো অনেক দিক আছে। অস্তিত্ব যখন পাকাপাকিভাবে মননে ঠাই নেয় তখনই বৃহত্তর পরিমণ্ডল আকৃষ্ট করে।

নেশা ক্রমশ গাঢ়। মোমও আর সুপ গরম করে খেয়ে নিল। অন্ধকারে পর্দাটা ফাঁক করে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। ঠিক যেমন রাইম পড়তে পড়তে, চেয়ে থাকত... হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর...

নিঝুম অতিকায় শহর। এসির হিমেল ছোঁয়া নগ্ন দেহের প্রতিটা কোষে। বাহ্যিক স্বস্তিও ভেতরের আলোড়ন থামাতে অক্ষম। অস্থির শিহরণ বা কম্পন, নাকি জাগরণ?অন্ধকারের বুকে অনেক নক্ষত্র। নামগুলো ঠিক মনে নেই। সাতাশটা। ছোটবেলায় মা যখন জ্যোতিষের কাছে নিয়ে যেত, ওদের মুখেই শুনেছিল। বহু আলোকবর্ষ দূরের সেই তারাগুলো নিশ্চয়ই গতিশীল। এই দুনিয়ায় সবাই এক-একটা নক্ষত্র। সেও ওদের মতোই আরেকজন। খুঁজছে... কিছু একটা... কক্ষপথ... সরলরেখায়, যদিও বৃত্তাকার।

অব্যক্ত উচ্ছ্বাস অরগ্যাজমের চেয়েও ভয়াবহ। মোচড় দিয়ে উঠছে বুকটা। ইচ্ছে হচ্ছে, দুটি সুডৌল মাংসপিণ্ড সরিয়ে তাকে মুক্তি দেয়। কিন্তু রক্ত মাংসের খোলসটাই বাধা। চাঁদের আলোর ফিকে রেশটাও ওই মুচড়ে ওঠা বুকে আলো ছড়াতে পারছে না। শুধু লুকোচুরি খেলছে।

আঠারো

ওদের মধ্যে বসে ঋষিকা অস্থির হয়ে উঠছে। ওরা এখন গেঁড়ে বসেছে। সহজে উঠবে বলে মনে হয় না। ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কস অন দ্য হাউস। কার্টসি রাজ নেওটিয়া। ফুডের পালা কখন শেষ হয়ে গেছে। ফোকটে ড্রিঙ্কস, কেউ ছাড়ে? অঞ্জনদা, অভিজিৎ দুজনেই তো সমান।

খাওয়া শেষ। তাজ বেঙ্গলের দ্য জাংশনে ম্যাকলাকান সিঙ্গল মল্ট নিয়ে বসেছে। খাওয়ার সঙ্গে দু গ্লাস দামি হোয়াইট ওয়াইন খেয়ে ফেলেছে। ওর পক্ষে, এটাই যথেষ্ট। কী যেন নাম বলল? গেউটজট্রেমিনার, ফ্রান্সের হোয়াইট ওয়াইন। কোন্নগরের মেয়ের কী এসব বিদেশি নাম মনে থাকে? না আগে কখনো শুনছে?

নেহাৎ এখন দুর্জয়ের কারুণ্যে রূপজিৎ-এর পেছন থেকে তদবিরে, খবরের কাগজে মাঝেমধ্যেই ছবি বেরয় বলে 'সেলিব্রিটি'র আখ্যা পেয়েছে। তাই তো শিল্পপতি রাজ নেওটিয়ার এসব সাংস্কৃতিক পার্টিতে গান গাইবার ডাক পায়। নইলে যতদিন অভিজিতের লেজুড় হয়ে ঘুরত, কেউ কী পুঁছত? অরিজিৎদা ব্যঙ্গ করে 'ছেলেবৃত্তি'। বাচাল লোকটাকে কিছু বলতে পারে না। অসময়ে অনেক সাহায্য করেছে।

বেলভিউ থেকে ফেরার পর এতদিন বাদে অভিজিৎ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ডাক্তার সার্টিফাই করেছে, কার্ডিয়াক সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল। চুপচাপ ওদের মাঝে বসে বোর হয়ে যাচ্ছে।

ঋষিকাকে ছটফট করতে দেখে অভিজিৎ বলল "তুমি চলে যাও। আমি অঞ্জনদার সঙ্গে পরে যাব"

"তোমাকে একা ছেড়ে?"

"অঞ্জনদা তো আছে। ফেরার পথে নামিয়ে দিয়ে যাবে"

ইতস্তত করছিল। তারপর মনে হল, কতক্ষণ এভাবে চুপ করে বসে থাকবে? ওদের কী শেষ করার কোনও টাইম আছে?

"কোনও অসুবিধা হলে ফোন করে দিও। গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি"

"চিন্তা করো না। উই আর জাস্ট ফাইন" অঞ্জনদার আশ্বাস।

ঋষিকা চলে যেতে অভিজিৎ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অঞ্জনদার সঙ্গে অনেক কথা আছে। একটু পরে রাজীবও এসে যোগ দেবে। এই পুরুষদের মেহফিলে ঋষিকা সত্যিই বাড়তি। না থাকলেই বরং ভাল, মন খুলে কথা বলা যাবে। ও এসব বোঝে না। খালি পেপারে ছবি বেরলেই খুশি। রূপচর্চা আর স্তাবক নিয়ে পড়ে থাকে। অভিজিতের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই এসবে। স্টার হবে। সেলিব্রিটি হবে। পঞ্চম থেকে নবম কবির গানের প্যাকেজ দিয়ে বাজার ধরবে।

কেন? অভিজিতের সঙ্গে থাকলে কী ক্ষতি হত? উস্কানির পেছনে ওর মায়ের প্ররোচনা না থাকলে কী এসবে নামত? জাহান্নামে যাক। খালি সোশালি বউ হয়ে থাকলেই হল। ফান্টুস তো আয়ার কাছে মানুষ হচ্ছে। কতটুকু সময় দেয় ছেলেটার জন্য? পেছনে ওই লেডিস মার্কা পোঁ জুটেছে, দুর্জয়। যেখানে যায়, ঋষিকাকে বগলদাবা করে নিয়ে যায়। সে নর্থ অ্যামেরিকান বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন হোক, আর ইন্দ্রিজিতের জলাপাহাড়ের বাংলো হোক। সবকিছু ঋষিকা না বললেও, খবর ঠিকই পেয়ে যায়। ভাগ্যিস ছেলেটা হোমো। নইলে ঋষিকাকে নিয়ে চিন্তায় থাকত।

রাজ নেওটিয়া তো সচরাচর এরকম পার্টি দেয় না। খাওয়া-দাওয়া মাল যখন ফোকটে, মেক হে হোয়াইল দ্য সান সাইন্স। অঞ্জনদা ভাল করেই জানে। সেলিব্রিটি হাওয়ার প্রথম ক্রাইটেরিয়া, অন্যের পকেট ভেঙে খেয়ে তাকে ধন্য করা, তাতে উভয়েরই স্ট্যাটাস বাড়ে। এসব ব্যাপারে অঞ্জনদা সিদ্ধহস্ত, বিগ বস। ওর কাছে অভিজিৎ এখনও শিশু।

"আরেক পেগ?" বেয়ারাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অঞ্জনদা অভিজিতের দিকে তাকাল।

"ডবল। তোমার ড্রাইভার আছে তো?"

"ভাবলে কী করে, মাল খেয়ে গাড়ি চালাব। এমনিতেই আমি গাড়ি চালাই না। মা মারা যাওয়ার পর আমার ওখানেই থাকে। রাতবেরাতে ফিরতে দেরি হলে ট্রেন পাবে কোত্থেকে?"

"কোথায় থাকে?"

"সুভাষগ্রাম। যখন থাকে না বা ছুটির প্রয়োজন হয়, শোভনের কাছ থেকে গাড়ি চেয়ে নিই। কত চাইব বল? মায়া তো সব সময়ই ওর গাড়িই ইউজ করে। সবাই যদি প্রত্যেকদিন চায়, দেবে কোত্থেকে? তোমার কী ড্রাইভার আছে?"

"আছে, তবে রাতে কথাও বেরলে ঋষিকাই ড্রাইভ করে। রাস্তা ফাঁকা, ম্যানেজ করে নেয়"

কথা শেষ না হতেই অঞ্জনের ফোন বেজে উঠল "সেদিন ফোন করেছিলাম। ফোন ব্যাক করলেন না তো"

"টাইম পাইনি। আমি এখন তাজে একটা ইম্পরট্যান্ট মিটিং-এ আছি। বাড়ি ফিরেই আজ ফোন করব। পসিটিভ"

"ঠিক? এটা আর্জেন্ট, আগেও বলেছি"

"বললাম তো পসিটিভ। ইউ ক্যান কাউন্ট মাই ওয়ার্ড"

অভিজিৎ লক্ষ করেছে, অঞ্জনদার হুইস্কির মাত্রা যত বাড়তে থাকে, তত বেশি ইংরেজি বলতে শুরু করে। এক সময় ইংরেজির অধ্যাপক ছিল তো। অভ্যাসটা অগোচরে আত্মপ্রকাশ করে।

ফোন ডিসকানেক্ট করতে বলল "কে?"

"আরে ইমা, প্রোগ্রাম চাইছে। কোত্থেকে প্রোগ্রাম দেব বলত? এই পঞ্জি স্ক্যামের পর সব স্পন্সারশিপ শিকেয় উঠছে। প্রোগ্রাম আসবে কোত্থেকে? ওই শোভন যেটুকু স্পন্সর করে। সারাক্ষণ পেছনে ঘ্যানঘ্যান করে যাচ্ছে"

"ওর আর কী দোষ? সব প্রফেশনল আর্টিস্টদের তো একই অবস্থা। আমাদের সব প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। নেহাৎ প্রতি বছরের শেষে চেনা জনের কাছ থেকে আমার নাটকের ইয়ারলি থ্রি-ডে প্রোগ্রামের টাকা উঠে আসে বলে এখনও চালিয়ে যাচ্ছি"

"তোমার আর কী চিন্তা? প্রফেসারি কর। বউ এধার-ওধার ফাংশন করে কিছু কামিয়ে নিচ্ছে। আইডিয়াটা ভাল বার করেছে পঞ্চকবির গান। কে দিল? তুমি?"

"নাঃ, ওর মাথা থেকেই বেরিয়েছে"

"ইমার তো রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া কোনও অল্টারনেটিভ নেই। কিছু ফোক গায় বটে, কিন্তু শুভজিতের মতো এস্ট্যাব্লিসড তো নয়। চোখে এখন সরষে ফুল দেখছে"

ওদের কথার মাঝে রাজীব ঢুকে বলল "আজ আর বসতে পারব না। রুমকি ফোন করেছিল, পেট ব্যথা করছে। বোধহয় খাওয়া থেকে। কেটে পড়ছি। তোমরা চালিয়ে যাও"

দ্য জাংশন-এর অপর প্রান্তে গিয়ে, ফিরে বলল "অভিজিৎদা তোমার আগের বইটা লাইব্রেরিগুলোতে পাঠিয়ে দিয়েছি। নেক্সট আর কিছু লিখছ?"

"লিখছি, এখনও কমপ্লিট হয়নি। হলে জানাব"

রাজীব জানে যদ্দিন শোভন আছে, সিরিয়াস বই ছাপাবার টাকার অভাব হবে না। বিক্রি না হলেও মিত্র ভারতীর গ্ল্যামার বাড়ে। কলেক্টরস আইটেম। যখন অঞ্জনদাকে বড়বাজার থেকে বার করে দেয়, তখন শুধু অঞ্জনদারই নয়, ওরও খারাপ দশা। এতদিনের হাউসটা তখন ধুঁকছে। পলিটিক্যাল রিসাফলের পর শূন্যে ঝুলছিল। ধীরে ধীরে, বুদ্ধি খাটিয়ে, সেই অবস্থা থেকে বার করে এনেছে। আফটার অল, বালিগঞ্জ সাইন্স কলেজের ছাত্র, ঘটে একটু তো বুদ্ধি আছে।

"কাটি" রাজীব বেরিয়ে গেল।

অঞ্জন বেয়ারাকে ইশারা করল "ডবল, দুজনের জন্য"

তাজের বাইরে ভ্যালেটের গাড়ি আনার অপেক্ষা করতে গিয়ে ঋষিকার মনে হল, অভিজিৎ আর অঞ্জনদা যে ভাবে জাঁকিয়ে বসেছে, মনে হয় না, ঘণ্টা দুয়েকের আগে বেরবে। অন্তত যতক্ষণ না, বার বন্ধ হয়ে যায়।

দেখাই যাক না কেন, রূপজিৎ কোথায় আছে "কোথায়?"

"আজকের লেখাটা জমা দিয়ে অফিস থেকে বেরচ্ছি। তুমি?"

"তাজ বেঙ্গল থেকে বেরচ্ছি। তোমায় বাড়িতে নামিয়ে দিতে পারি..."

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে রূপজিৎ বলল "তোমায় এদ্দুর আসতে হবে না। আমি মেট্রো করে রবীন্দ্রসদন স্টেশনে চলে আসছি। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব"

গাড়িতে বসে মনে হল, এই সম্পর্কের মায়াজালে কোনটা আসল আর কোনটা মেকি, সেটাই তো বুঝে উঠতে পারল না। বাষ্পীয় সম্পর্কে সাংসারিক ঘেরাটোপ পেরিয়ে, মুহূর্তটাই বোধহয় পাওয়া। বেশি কিছু আশা করার মানেই হয় না। আজ যা সত্য, কালকে ধোঁয়াশার চাদরে মোড়া হতেও পারে।

ফাঁকা রাস্তা। শুধু টার্ফ ভিউর সামনে ট্র্যাফিক লাইটে কিছুক্ষণ। রবীন্দ্রসদন ছাড়িয়ে ডান দিকে বাঁক নিয়ে প্রতীক্ষা।

"অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ? হেঁটে মেট্রো ধরতে যেটুকু সময়" রূপজিৎ পাশের সিটে বসে বলল "সোজা মুদিয়ালি হয়ে আনোয়ার শাহ রোড ধরলে এই সময় মিনিট পনেরোর বেশি লাগবে না"

উত্তর না দিয়ে রাস্তার ট্র্যাফিকে মনোনিবেশ করল ঋষিকা। দিনে এই রাস্তায় চালাতে সাহস করে না। রাত বলেই সাহসটুকু পায়। জীবনেও, রাত অনেক বেশি সাহস জোগায়।

ফ্ল্যাটের আলোটা জ্বালিয়ে রূপজিৎ বলল "তুমি প্রিপেয়ারড হয়ে নাও। আমি বাথরুম থেকে আসছি। বড্ড হিসি পেয়ে গেছে"

ঠিক যেমন বাচ্চারা বলে। হাসি পেল ঋষিকার। রূপজিৎ যখন মুখহাত ধুয়ে হিসি করছে, শাড়ি জামা ব্লাউজ ব্রা ওয়ার্ডরবে পরিপাটি করে সাজাতে গিয়ে ফ্লাশের শব্দে বুঝল, এবার বেরবে। খাটের ওপর নগ্ন শ্যামলা দেহটাকে এলিয়ে, বসে রইল ওর প্রতীক্ষায়...

মুখ থেকে বুক। চুমুতে ভরিয়ে দিচ্ছে ঋষিকার ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নাঙ্গ। এই যৌবন, এই আবেগ, এই উচ্ছ্বাসের জন্য সে হা পিত্যেস করে বসে থেকে, রূপজিতের প্রতীক্ষায়। অভিজিতের সঙ্গে বয়সের পার্থক্যটা এত না হলে সম্পর্কের মাধুর্যটা আরও গাঢ় হত। উচ্ছ্বাস কদ্দুর, বলা যায় না। অন্তত রূপজিতের মতো কখনোই নয়।

প্রত্যেক মধ্যবয়স্কা মহিলারই কমবয়সী ছেলের সঙ্গে শারীরিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্তত যৌবনকে সতেজ সজীব রাখতে। নইলে মানসিক ভারসাম্য আটুট রাখা মুশকিল। বিশেষ করে মেনপজ এগিয়ে এলে। কথাটা সামাজিক সংস্কারের বাইরে হলেও সত্যি। ক্ষয়িষ্ণু চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একান্তই জৈবিক। কোথায় যেন জীবনের নতুন ঘ্রাণ খুঁজে পাওয়া যায়।

বিষ? সে তো সামাজিক কাঠামোয় তোতার বুলি।

অমৃত? যে স্বাদ না পেয়েছে জানবে কী করে? সেই অমৃত আস্বাদন করছে, উত্তেজিত রোমশ দেহের স্পর্শে, ছন্দে, গীতিতে, আবেগে। যতক্ষণ না ঝর্নার প্লাবনে ভেসে যায় কিছুদিনের না পাওয়ার ক্লান্তি।

সেখানেই মুক্তি...

সেখানেই তৃপ্তি...

সেখানেই আগামীর প্রেরণা...

বেঁচে থাকার সূক্ষ্ম সংগীত।

উচ্ছ্বাসের পরিপূর্ণ অবসাদে নেতিয়ে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। বাথরুমে ধুয়ে জামাকাপড় পড়ে নিল। রাত অনেক হয়েছে। অভিজিতের ফেরার আগেই বাড়ি ঢুকতে হবে।

চাবি খুলে ঘরে ঢুকতেই দেখল অভিজিৎ খাটে শুয়ে আছে। জামাকাপড় খুলে বাথরুমে ঢোকবার আগে অভিজিতের গলা "দেরি হল যে?"

"গাড়িটা মাঝপথে ট্র্যাফিক লাইটে স্টার্ট নিচ্ছিল না"

"শেষ পর্যন্ত নিল?"

"হ্যাঁ। লোকাল এক মেকানিক জাম্প স্টার্ট দিয়ে চালিয়ে দিল। বলল ব্যাটারির প্রবলেম আছে। ব্যাটারিটা চেক করিয়ে নিতে"

"তাই নিও। রাতে মাঝপথে গাড়ি থেমে যাওয়া আনসেফ। স্ট্র্যান্ডেড হয়ে পড়তে পার"

"কাল করিয়ে নেব"

ঋষিকা বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

অনেক রাত হয়ে গেছে। মাল খেয়ে এত রাতে ইমাকে ফোন করাটা ঠিক হবে কি না, ভাবছিল অঞ্জন। কথা যখন দিয়েছে, আর্জেন্ট কাহিনিটা শুনেই নেওয়া যাক।

"এই মাত্র ফিরলাম। ঘুম ভাঙালাম?"

"নাঃ, জেগেই ছিলাম। একটু ধরুন... বারান্দায় যাচ্ছি"

মিনিট খানেক। ইমা বলল "আমি প্রেগন্যান্ট"

"কী করে বুঝলে?"

"পিরিয়ড মিস করেছি। প্রেগন্যান্সি কিট এনে টেস্ট করে দেখেছি, পসিটিভ"

"ডাক্তার দেখিয়েছ?"

"না। আগে আপনাকে জানালাম"

"আমাকে জানাচ্ছ কেন? ডাক্তার দেখিয়ে নাও"

"কারণ ডেটটা যদি ভুলে গিয়ে না থাকেন, সেদিন থেকে হিসেব করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ডাক্তারের কনফার্ম করার অসুবিধা হবে না"

মহা ফাঁপর। কলকাতার নামজাদা গায়িকা হওয়ার স্বপ্ন। সেলিব্রিটি হবে। হতে গেলে এসব একটু-আধটু করতে হয়, এটা তো জানা। প্রিকশন না নিয়ে কী সেলিব্রিটি হওয়া সাজে? যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। ন্যাকা... মাঝরাতে আদিখ্যেতা। শুনলেই পিত্তি জ্বলে যায়। ম্যাকলাকানের মেজাজটাই নষ্ট করে দিচ্ছে। এই মেয়েগুলো নেশার মর্মটুকুও বুঝতে শেখেনি। যত সব ন্যাকামি। মেয়ে হয়ে জন্মেছ, একদিন না একদিন প্রেগন্যান্ট তো হতেই হবে। এতে টেনশন করার কী আছে? বিয়ে হলে বাচ্চা পয়দা করে ঘর-সংসার কর। নইলে খালাস করিয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফেরত এস। রাতবেরাতে নেশা ভাঙানোর কী আছে? এই একাত্তর বছরের জীবনে কী কম মেয়েকে প্রেগন্যান্ট করেছে? নিজেও হিসেব ভুলে গেছে। মেয়েদের প্রেগন্যান্সির হিসেব রাখতে গেলে তো এবার থেকে ছোটদের গল্প লিখতে হবে। সারা জীবন বিয়ে না করেই নারীর যৌনতা বিক্রি করে কাটিয়ে দিল, এখন কি না বুড়ো বয়সে বসে ছোটদের ছড়া লিখবে! নিকুচি করেছে প্রেগন্যান্সির। চুলোয় যাক মাঝরাতের ব্যভিচার। পুরুষ মাত্রই তো এসব করবে। এটাই পুরুষের ধর্ম। এটাই পৌরুষ।

"পিল খাওনি?"

"ফাংশনের ছোটাছুটিতে ভুলে গেছিলাম"

"কী আর করা যাবে। কালকে আমার চেনা গায়েনকলজিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিচ্ছি। অ্যাবর্শান করিয়ে নাও, ব্যস। এতে এত টেনশনের কী আছে?"

"আগে তো কখনো প্রেগন্যান্ট হইনি, এই প্রথম" ইমার গলা কাঁপছে।

"সব মেয়েকেই একদিন প্রেগন্যান্ট হতে হয়। কেউ বাচ্চা রাখে, কেউ খালাস করিয়ে এগিয়ে চলে। ডোন্ট ওয়ারি, কাল সব বন্দোবস্ত করে ফোন করব। এখন অনেক রাত, ঘুমিয়ে পড়ো"

"এই প্রেগন্যান্সি নিয়ে কী ঘুম আসে?"

"তো শুয়ে শুয়ে নাগরের স্বপ্ন দেখ। এর বেশি আমি আর কী করতে পারি? লাইনে নেমেছ, সেলিব্রিটি হতে চেয়েছ, সব করে দিয়েছি। নইলে কোথায় থাকতে? পাড়ার ছোটখাটো ফাংশনে গান গাইতে আর মাস্টারি করতে। দেয়ার ইজ এ প্রাইস ফর এভ্রিথিং। এটা তো মিনিমাম প্রাইস" ফোনটা কেটে দিল অঞ্জন। অনেক রাত হয়েছে। নেশার আমেজটা নষ্ট করাই বোকামি। খাটে শুয়ে সুখটান দিয়ে আমাজটাকে উপভোগ

করছে। আহাঃ... এ জন্যেই তো সংস্কৃতি জগতের অলিখিত কর্ণধার হওয়া। এরকম কত ইমা এল, গেল। তাতে আর যারই হোক, অঞ্জনের কিছু হওয়ার নয়।

অঞ্জন ফোনটা কেটে দিতে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আকাশের দিকে চেয়ে রইল ইমা। অন্ধকার আকাশে, ওই যে তারাগুলো জ্বলছে, ওদের মতোই কী হতে চেয়েছিল ইমা? পৃথিবীর চৌহদ্দির মধ্যে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে তারা ধরার চেষ্টা। না কি, হওয়ার? হাজার হাজার তারাদের মতো, নিজেও আর একটা। তারারা তো স্বপ্ন-পাড়ের রূপের প্রতীক। বাস্তবে কী তাদের ছোঁয়া যায়? না পাওয়া যায়? না কি, ওদের মতো হওয়া যায়? এতদিন ধরে স্বপ্নটাকে বাস্তবে আনতে চেয়েছে। বুঝতেও পারেনি, স্বপ্নের আঁতুড়ঘর থেকে বাস্তব অনেক অনেক অনেক দূর।

ছিটকে যাওয়া বহুদূরের তারার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠছে। কান্নাটা গলার কাছে এসেও বেরতে পারছে না। হাঁসফাঁস করছে, এই তারকা হওয়ার নেশায় রুদ্ধ কারাগারে। উল্লাস, উচ্ছ্বাস থেমে গেছে। হঠাৎ হাজার লোকের হাততালি, অট্টহাসি পালটে গেছে। রয়েছে পরিহাস, বিদ্রুপ করছে তার সরল মূর্খতায় আবদ্ধ ভাবনাকে।

তার প্রথম সন্তান। যারই উন্মাদনায় হোক না কেন তার ঔরসে নারীত্বের পূর্ণতা কেবল মাত্র আজ রাতের মেহমান। ঈশ্বরের দান। বিদায় নেবে কাল অথবা পরশু, ইহলোক থেকে, তাকে অপূর্ণ রেখে। ভ্রূণর মধ্যে তো তারই জিন। তারই আমির পূর্ণতর বিকাশ। সেখানেই সে প্রোজ্জ্বল নিজ মহিমায়। ওই তারাদের মধ্যে তার কোনও জায়গা নেই। আছে স্বপ্ন ছেড়ে বাস্তবের বারন্দায়। যেখানে সে এখন দাঁড়িয়ে।

এই বাস্তবের মেঝটাই তো তার পৃথিবী, তার আসল ঠিকানা, তার নারীত্ব, মাতৃত্বের পূর্ণতা, তার অপ্রকাশিত আমি। সেখানেই সে সব থেকে বেশি উজ্জ্বল। ওই দূরের তারাদের ভিড়ে নয়।

উনিশ

"কংগ্র্যাচুলেশনস"

ফোনের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। টুইটার, ফেসবুক, লিঙ্কডিনে শুভেচ্ছা। ন্যাশেনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে শৌভিকের ছবি 'অঙ্গার'। খবরটা দাবাগ্নির মতো ছড়াচ্ছে। মিডিয়ার ফোন, বন্ধুদের শুভেচ্ছা। অভিবাদনে ভেসে যাচ্ছে শৌভিক, বহ্নি। সেন্সেশন, অনেকদিন পর বাংলা ছবি ন্যাশনাল ক্যাটাগরিতে স্বীকৃতি পেল। কংগ্র্যাচুলেশনের উচ্ছ্বাসে ভেতরে একটা চাপা কান্না জমাট বেঁধে আনন্দের ভাগীদারি থেকে বঞ্চিত করছে ওদের। উচ্ছ্বাসে ভাগ নেওয়ার মতো মুখ নেই। আসলটা ওরা কেউ জানে না। একমাত্র দুজনে।

"তোমার কৃতিত্বে জয়জয়কার" ফোনের ফাঁকে গরম চা এগিয়ে দিল বহ্নি।

"কৃতিত্ব! মাই ফুট" কাপটা হাতে নিয়ে বলল "কৃতিত্ব একটাই, বউকে ওই ওল্ড হ্যাগারডের বিছনায় এগিয়ে দেওয়া। বিজিত অনেক লাইন মেরেছিল। অ্যাওয়ার্ড-এ বোধহয় সব লাইনই মার খেয়ে যায়। মহিলার থেকে বেস্ট বেট আর কী কিছু আছে?"

"দিস ইজ লাইফ। দিস ইজ হাউ দ্য ওয়ার্ল্ড মুভস। যে দেবতার যে পূজা" চিনিটা নেড়ে বহ্নি বলল "ক্রুড অ্যাস ইট মে সিম, দিস ইজ রিয়ালিটি। লাইক ইট অর নট"

"লাইক ডিসলাইকের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। দুজনেই এগ্রি করে নেমেছি। ছবিটা এতগুলো অ্যাওয়ার্ড পাবে ভাবিনি"

"ছবিটা খারাপ করনি, ফাইন্যাল টচটুকু বাকি ছিল। বউ হিসেবে, সেটুকুই দিয়ে দিলাম। ইউ ডিসার্ভ ইট ইন ইওর ওন রাইট" শৌভিককে মরাল বুস্ট দেওয়ার চেষ্টা। এত বছর ঘর করছে। লোকটাকে হাড়ে হাড়ে চেনে। যদিও ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে বড় কিছু করার কেপেবিলিটি নেই। লোকাল এরিনাতে অন্যদের চেয়ে ভাল। পুরুষোত্তম ঘোষ যদিও ভীষণভাবে বিজিতকে ব্যাক করার চেষ্টা করেছিল। এমনকী জুরি পালটে ওর সিনেমাকে ফোরফ্রন্টে আনতেও। কিন্তু চ্যাটার্জি সাহেব ঝানু মাল। সে রাতে যে খেলা সে খেলেছে, সেটা অঙ্কের ইকোয়েশন উলটে দেওয়ার পক্ষে কাফি। হোয়েন অ্যান এজুকেটেড লেডি রিসর্টস টু হোরডম, দ্য প্যারামিটারস আর ডিফারেন্ট।

যাদবপুর ভারসাস প্রেসিডেন্সি। ফিমেল ভারসাস মেল। কোয়ালিটি ওভার গ্রুপিজম। যত গ্রুপবাজিই করুক না এখানে, উইথ রাইট পলিটিক্যাল কানেকশনস, হি কান্ট মেডেল উইথ শৌভিক হিয়ার। স্ট্রেঞ্জ। শৌভিক একবারও জানতে চায়নি সেই রাতের কথা। হয়ত বিবেক থেকে মেনে নিতে পারেনি। বহ্নিও কিছু

বলে ওকে আরও অপ্রস্তুত করতে চায়নি। এতটা আশা করেনি। বুড়োর আশির ওপর বয়স। হলে কী হবে? এখনও পুরদস্তুর চাঙ্গা। সেটা ভায়াগ্রার জোরে, না নিজ গুণে, বোঝবার যো নেই। যখন মানসিকভাবে প্রস্তুত, তখন ভেবে কী হবে? বরং পরিণতিটাই বেশি ভাবার।

মুম্বাই-এর সুসজ্জিত বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে পরের দিন সকালে ওনাকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল "হবে তো?"

"ছবির নাম 'অঙ্গার' তো?"

"হ্যাঁ"

"গ্যারান্টি দিতে পারছি না। চেষ্টা করে দেখি"

কাজটা সহজ নয়, নিজেও জানে। বিশেষ করে, সে যখন কমিটির চেয়ারম্যান। নিজে থেকে তদবির করতে গেলে, বদনাম হয়ে যাবে। জুরি ঠিক হয় মিনিস্ট্রি থেকে। পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স খাটাতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। সহজ উপায়, যে সমস্ত জুরি ভিন্ন মতামত দিতে পারে, তাদের ফোন না করা। প্রশ্ন করলে, অফিস থেকে উত্তর যাবে 'অনেক চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি'। অবশিষ্ট যারা রইল, তাদের নিজের ইচ্ছেটা আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে রাখা। চেয়ারম্যানকে কেউ চটাতে চায় না। তার ইচ্ছেতে সায় দেওয়া, আশা করাই যেতে পারে।

অঙ্কের পরিপ্রেক্ষিতে 'অঙ্গার' পুরস্কৃত, সম্মানিত, বন্দিত।

"হাততালি পেতে কার না ভাল লাগে? তবে যেভাবে ক্যাশ ক্রাঞ্চে প্রডিউসাররা হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, সেখানে পুরস্কার হয়ত ইন্ধন যোগাতে পারে, ফর ফারদার ইনভেস্টমেন্ট" চায়ের কাপটা নামিয়ে বলল।

"এইট্টিজ অ্যান্ড নাইন্টিজ-এর স্ট্রাগলের দিনগুলো এখনও ভোলনি"

"তখন ইয়াং ছিলাম। জিল অনেক বেশি ছিল। বয়সটাও তো বাড়ছে। এই বয়সে আউট অফ ওয়ার্ক হলে, ফাইন্যানশিয়াল স্টেক তো আছেই, মেন্টাল সেটব্যাকটাও কম নয়"

"তোমাকে সেটাই বেশি করে ভাবাচ্ছে। রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?"

আবার ফোন বেজে উঠল "কংগ্র্যাচুলেশনস। শুনে যা আনন্দ হচ্ছে না" বিজিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পুরুষোত্তম ঘোষের পলিটিক্যাল লবি স্ট্রিং থাকলেও, সেন্ট্রাল-স্টেটের সাময়িক টানাপোড়নে, এখনও পুরপুরি ফাংশনাল নয়। তাই তাকে ধরে পুরোটা ম্যানেজ করতে পারেনি। শৌভিকের পলিটিক্যাল পেট্রনেজ ছাড়াও অ্যাডিশনাল তুরুপের তাস বহ্নি। সেখানেই আপার হ্যান্ড।

"তুমিও খুব ভালই করেছিলে। ইটস জাস্ট এ ম্যাটার অফ লাক। আমারা যারা ছবি করি, সেটাই তো সব থেকে বেশি ইম্পরট্যান্ট। নয় কি?"

“যা বলেছ শৌভিকদা। স্টিল হন্যার ইজ এ হন্যার। নোবডি ক্যান ডিনাই দা ফেদার”

“নেক্সট টাইম, ইট উইল বি ইওর টার্ন”

ফোনটা রেখে বিজিত ভাবছে পুরুষোত্তমদার এত ক্যালকুলেটেড ছকে জ্যাকপটটা শৌভিক পেল কী করে? পুরুষোত্তমদা তো কম ধুরন্ধর নয়। নিজেও কয়েকবার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। ভেটারান লোক, খেলাটা ভালভাবেই জানে। অন্তত শৌভিকের থেকে অনেক ভাল। তাহলে কোন দাবার ছকে শৌভিক বাজি মাত করল?

তার লেটেস্ট ছবি ‘নিঃশব্দ’ বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ার পর, প্রযোজক চামুণ্ডেশ্বরী ফিল্মস-এর নির্লিপ্ততা লক্ষণীয়। মনিকান্ত মোহতাকে নতুন স্ক্রিপ্ট নিয়ে কথাটা পাড়তেই বলল “জলদি কেয়া হ্যায়? অভি তো এক মুভি রিলিজ কিয়া। কলেকশন পুরা নেই হুয়া। অভি তো ইয়ে পিকচার কা ডিজিট্যাল রাইটস ভি নেহি সেল হুয়া...” স্পষ্ট কিছু না বললেও আকারে ইঙ্গিতে অনীহাটা প্রকট। ফ্লপ দিয়েছ। নেক্সট প্রোডাকশনের ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে ভাবতে হবে।

যদ্দিন ইয়ারের দোস্ত শুভ্রজিৎ মধ্যগগনে ছিল, তার কথার দাম ছিল। এখন সে গুড়ে বালি। শুভ্রজিতের হাতে সিনেমা নেই। ফিতে কেটে যা কামাবার কামাচ্ছে। আগে দু-দুবার প্রোডাকশন কম্প্যানি খুলে ফ্লপ করেছে। মাঝে সমর্পিতা থাকতে রিয়ালিটি শো ইভেন্টগুলো অরগ্যানাইজ করে টিকে থাকার চেষ্টা করলেও, সমর্পিতা চলে যাওয়ার পর তার কন্ট্র্যাক্টও বেহাত হয়েছে। এখন টেলিফিল্ম প্রোডিউস করে টিকে থাকার মরিয়া চেষ্টা।

ওর কথা এখন চামুণ্ডেশ্বরীর মনিকান্ত বা গজেন্দ্র শুনবে বলে মনে হয় না। এখন নিজেই পথ দেখতে হবে। তবু যদি অ্যাওয়ার্ড পেত, তাহলেও কনভিন্স করা যেত। সেটাও শৌভিক হাতিয়ে নিয়ে, জল ঢেলে দিয়েছে।

এই ছোট্ট কুয়োর মধ্যেই তো এদের বাস। সেখানে ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুতি, মারামারি, খেওখেয়ি। শালা, বাইরে মিষ্টি ব্যাবহার। ভেতরে একে অপরকে লেঙ্গি মেরে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা। সেও দেখে নেবে। তার নাম বিজিত মুখার্জি। এক মাঘে শীত যায় না।

“শৌভিক একটা চটজলদি ইন্টার্ভিউ নেব। সবার আগে” সৈকতের ফোন।

“আমার তো এখন স্টুডিওতে গিয়ে ইন্টার্ভিউ দেওয়ার টাইম নেই ভাই”

“তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি নিজে ক্রু নিয়ে তোমার বাড়ি চলে আসছি। সঙ্গে বহ্নিরও নেব”

“এক মিনিট, বহ্নিকে জিজ্ঞেস করি” ফোনটা মিউট করে জিজ্ঞেস করল “সৈকত বাংলা টিভি থেকে এখন আমাদের দুজনের ইন্টার্ভিউ নিতে চাইছে। হ্যাঁ বলব?” মাথা নাড়ল বহ্নি।

“ঠিক আছে। চলে এস। কতক্ষণ লাগবে?”

“ম্যাক্সিমাম হাফ অ্যান আওয়ার”

সৈকতের অন্য ছক। ফিল্ম ডিরেক্টর হিসেবে ছাইপাঁশ যাই করুক না কেন, আকাল দেখছে। বিজিতের ফ্লপ বিশেষ করে ভাবাচ্ছে। আগের ছবিতেই বাংলা ধূর্জটি টাকা ঢালতে গাঁইগুই করছিল। ফিউচারে ঢালবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ। নতুন লাইন ফিট করতে হবে। এখন শৌভিকের তুঙ্গে বৃহস্পতি। ওর সঙ্গে লাইন ঠিক রাখলে পরে সুবিধা পাওয়া যেতে পারে।

কুড়ি

“নতুন রাতদিনের টিভি চ্যানেল। পার্টনারশিপ উইথ স্টেলার মিডিয়া গ্রুপ। তোমাদের কতগুলো জিনিস জানা দরকার। কী খবর নিউসকাস্ট করলে সেটা বড় কথা নয়। ভিউয়ারশিপ ধরে রাখতে হবে” বোর্ড রুমে বিমান স্টাফদের ব্রিফ করছে “এখনও চালু হয়নি। চালু হওয়ার আগে তোমাদের সিঙ্গাপুরে ট্রেনিং-এ পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছি। ট্রেনিং শেষ করে ফিরলে মাস্টার গেম প্ল্যান বলব। প্রথম কথা হচ্ছে, যাকে যে কাজে পাঠাচ্ছি, সেটা মাস্টার করে ফিরবে। কাজ না জানলে, কোয়ালিটি দিতে পারবে না” বিমান দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল। স্টেলার-সানন্দর জয়েন্ট ভেঞ্চারে নতুন যে চ্যানেলের সিইও-র গুরুদায়িত্ব নিয়ে এসেছে, যে কোনও প্রকারে সফল করতেই হবে।

“তোমাদের সত্তর জনকে সিলেক্ট করেছি এই ট্রেনিং প্রোগ্রামের জন্য। একটা চার্টও তৈরি করেছি। টেবিলে ওগুলো রাখা আছে। কে কী কাজ শিখবে, ওখানে ডিটেল লিস্ট করা আছে। লিস্ট দেখে বুঝে নাও, কাকে কী শিখতে হবে। গো থ্রু ইট ইন ডিটেলস। কারও কোনও প্রশ্ন থাকলে আমরা সন্ধেবেলা আবার বসব টু আনসার ইওর কোয়ারিস”

বিমান উঠে পড়ল দ্য ম্যাগ্নিফিসেন্ট সেভেন্টির অপারেটিং প্রোটকল ধরিয়ে। কাল ভোরের ফ্লাইটে দিল্লি। কয়েকজন চেনা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে স্মুদ ওয়ার্কিং এনশিওর করতে হবে। এদের মধ্যে কেউ যদি স্পন্সর করে, তার বক্তব্যকে প্রায়রিটি দিতে হবে। মিডিয়ার একটাই ভাষা। দেয়ার ইজ নাথিং আনফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ারের মতো, দেয়ার ইজ নাথিং এথিক্যাল ইন মিডিয়া বিজনেস। মিডিয়ায় নেমেছ, একটাই মন্ত্র। সাকসেস অ্যাট এনি কস্ট...

বাবা স্যার কিথ আরথার মারডকের মৃত্যুর পর একুশ বছর বয়েসে অস্ট্রেলিয়ান রুপার্ট মারডক, ১৯৫২ সালে বাবার নিউজ লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে, বাবার সীমিত মিডিয়ার দায়িত্ব তুলে নেয়। নতুন নাম নিউস কর্পোরেশন নামে কম্প্যানিকে ভূষিত করে। অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডে একটার পর একটা খবরের কাগজের অধিগ্রহণ। ষাটের শেষভাগে ইংল্যান্ডের নিউজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ও সান-এর মালিকানা অধিগ্রহণ। সত্তরের মাঝামাঝি অ্যামেরিকায় বিজনেস এক্সপ্যানশনের সময় ইংল্যান্ডে দ্য টাইম পত্রিকা কিনে নেয়। টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স, হারপার কলিন্স, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল কেনার পর বিস্কাই-বি তৈরি থেকে শুরু করে তার নিউজ কর্পোরেশন ৮০০ টি সংস্থা দখল করে...

বিমান এই ভাষাটাই বোঝে, এই ভাষাই মানে। যেনতেন প্রকারে মুনাফা। দিল্লি থেকে কলকাতা, রক্ষাকর্তাদের সঙ্গে ডিল, সামঝোতা। শুধু ডিল করলে তো চলবে না। ইউ হ্যাভ টু ডেলিভার।

দ্যা ম্যাগ্নিফিসেন্ট সেভেন্টি ফেরার পর, পুরোদমে চ্যানেল শুরু। নতুন নতুন ক্যাপশন - ব্রেকিং নিউজ, খবর বারোটা, বুদ্ধজীবী বনাম বুদ্ধিজীবী। বিমানের চমক লাগানো ভেল্কি। অল্প সময়েই চ্যানেল শীর্ষস্থানে। তার ইমেজও। মধ্যগগনে বিচরণ। বিচক্ষণ বিমলের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, সে-ই তো বাংলা মিডিয়ার বাদশা। সদর্পে ফের ছড়ি ঘোরানো শুরু।

সরকারবাবু একদিন কিছু বলতে এলেন। বিমান বাধা দিয়ে বলল "মালিক আপনি হতে পারেন, চ্যানেল চালাই আমি। আপনি যান তো, আমাকে কাজ করতে দিন"

নিঃশব্দে বাবু চলে গেলেও কথাটা ভালভাবে নেননি। আফটার অল বিমান যত বড়ই হোক না কেন, তাঁর কর্মচারী। মাইনে করা লোকের কাছ থেকে এ ধরনের তাচ্ছিল্যে অভ্যস্ত নন। ভেতরে ভেতরে ফুঁসছেন। বিমান হ্যাস বিকাম গ্রেটার দ্যান ইন্সটিটিউশন।

কে তৈরি করেছিল বিমানকে? সে ছাড়া বিমান কোথায়? চ্যালেঞ্জ? আর নয়... অনেক হয়েছে।

যত হম্বিতম্বিই করুক না কেন, বিমানের একটাই ভয়। বড়বাজার থেকে সরেছে। চ্যানেল থেকে সরতে কতক্ষণ? লাইফ বোট বানাতে হবে। ভেতরে অন্য অঙ্ক। সরকারবাবুর ছায়া থাকুক চাই না থাকুক, এখন থেকে নিজের পরিচয়ে বাঁচতে হবে। আপন মহিমায়। স্পন্সরশিপ নিয়ে চায়না...

সৌগত দত্ত ও মনু ঘোষকে বলল "চায়নায় গিয়ে দেখলাম স্ক্র্যাপ কম্পিউটার কী ভাবে রিফারবিস করে বাজারে চালাতে হয়। এখানেও তো আমরা এমন কিছু একটা করতে পারি?"

"কে রিফারবিশড মাল কিনবে?"

"সস্তার কম্পিউটার কেনার অনেক লোক আছে। ইনভেস্টমেন্ট তো বেশি নয়। টাকা উঠে আসবে"

"ঠিক সিওর নই" সৌগতর দ্বিধা।

"তোমার সিওরিটির গ্যারান্টি আমি। তোমার ইনভেস্টমেন্টের রিটার্ন এলেই তো হল"

"তুমি পসিটিভ, আমরা লসে রান করব না?"

"অ্যাবসলিউটলি। গভর্নমেন্ট অফিসে টেন্ডার কী করে পাস করাতে হয়, আমার জানা। কন্ট্যাক্টসও আছে, পাস করিয়ে দেবে। কিছু খাওয়াতে হবে"

বাজারে এল নতুন কম্পিউটার কম্প্যানি মেন্টিস।

"নামটা পালটাতে হবে। বাঙালি টচ নেই" বিমান গভর্নমেন্ট অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে জানাল।

"কী নাম?"

“বাঙালি নাম, যেটা খাবে। এই ধর আপনা পিসি। হিন্দি বাঙালি দুই কমিউনিটিই খাবে”

মেন্টিসের নতুন নাম হল আপনা পিসি।

গুছিয়ে নেওয়ার পর বিমান আরও বেপরোয়া। চ্যানেলের সর্বময় কর্তা। মালিকের কোনও বক্তব্য থাকবে না, তা কী হয়? প্রত্যাশিত গোল্ডেন হ্যান্ডসেক দিয়ে সরকারবাবু বিদায় দিলেন। সঙ্গে স্বাধীনতা, যা খুশি করার।

আপনা পিসি থেকে তো রোজগার এসে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কি সাংবাদিকের মন ভরে? তরুণ পাঁজা আর ধূর্জটি রায়কে ধরে কেয়াতলায় একটা দৈনিক শুরু করল। শেষ পর্যন্ত চলল না। বিমান তখন নতুন ছক সাজাচ্ছে। সৌগত দত্ত ও মনু ঘোষের সঙ্গে চ্যানেল। বাংলা টিভি। ইন পার্টনারশিপ উইথ চ্যানেল এক্স অফ চেন্নাই।

সোজা ম্যাগ্নিফিসেন্ট সেভেন্টির অন্যতম প্রকাশ চক্রবর্তীকে ফোন “নতুন চ্যানেল শুরু করছি, বাংলা টিভি। জয়েন করবি?”

হঠাৎ ফোন পেয়ে ঘাবড়ে গেল প্রকাশ। ততদিনে বিবিপি সুপ্রতিষ্ঠিত। বিমানের তৈরি মাস্টার প্ল্যানে সদর্পে এগিয়ে যাচ্ছে। কোনটা বড়? ইন্সটিটিউশন, না তার পেছনের কারিগর? প্রতিষ্ঠিত ইন্সটিটিউশন ছাড়া মানেই সিওরিটি থেকে আনসিওরিটি।

“ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলত”

“সব্বাই আমার বাড়িতে চলে আয়। সব পরিষ্কার করে বলছি”

মিটিং, আলোচনা, দ্বন্দ্বের পর, সত্তরের মধ্যে পঞ্চাশ জন বিমানের সঙ্গে এল। বাকি কুড়ি রয়ে গেল। পার্ক স্ট্রিটের প্লাজা কনক্লেভে বিশাল অফিস, মাত্র সাত লক্ষ টাকায় ভাড়া নিয়ে, মাস্টার প্ল্যান কষা হচ্ছে। বিমান, সৌগত, মনু, জয়েন করা পঞ্চাশ। কাজ বিশেষ কিছুই নেই। তিন মাস পরে চ্যানেল অন এয়ার হবে, তারই পরিকল্পনা। পার্টনার চ্যানেল এক্স-এর টাকায় মৌজ মস্তি। বিমানের ক্ষমতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, প্রশ্ন সততা নিয়ে। প্রকাশের সেখানেই দ্বিধা, সংশয়। চিত্রতারকা, পরিচালক সুপর্ণা সেন সঙ্গে থাকলেও, যতটা সৌগতদা আর মনুদা আনন্দে বিহ্বল, প্রকাশ অতটা নয়। মিডিয়া লাইনে এতদিনে হাড়েহাড়ে মালকে চিনে ফেলেছে। আরেকটা গ্ল্যামার আইকন দরকার। যদি সুপর্ণাদি ঝোলায়, একটা লাইফবোট চাই।

উঠতি তারকা দেওয়ালিকে ফোন “দেখা করতে পারি?”

“নিশ্চয়ই প্রকাশদা। আজকে তো ফ্রি নই। বরং শনিবার আমার ফ্ল্যাটে চলে এস”

দেওয়ালির সঙ্গে পরিচয়টা কি আজকের? সেই কবে, যখন দেওয়ালি স্টার হয়নি। বিবিপিতে একটু পাবলিসিটির জন্য কত অনুনয়। জানে প্রকাশের কথা বিমান ফেলতে পারবে না। বিমানকে দিয়ে দেওয়ালির

অতিরিক্ত পাবলিসিটি ম্যানেজ করেছিল। ডেফিনেটলি সেটা তার উত্তরণের পথে সহায়ক হয়েছে।

একটা স্লিভলেস ফিনফিনে হাউসকোটে নিজেই দরজা খুলে দিল দেওয়ালি "অনেকদিন পর। এস এস ভেতরে এস। কী খাবে? হুইস্কি, রাম, ভডকা?" দেওয়ালির আন্তরিক আপ্যায়নে সোফায় গা এলিয়ে বসে বলল "হুইস্কি"

"বস, নিয়ে আসছি। জল দিয়ে, না বরফ?"

"বরফ হলে ভাল হত"

হুইস্কির বোতল টেবিলে রেখে বলল "কিছু মনে করো না। যা গরম না। এই বাড়ির জামায়-ই আছি। সব সময় তো মেক আপ করে শট দিতে হয়। বাড়িতে আর এসব লাগানো পোষায় না"

"আমার সৌভাগ্য। স্বনামধন্য স্টারকে নিজের মতো করে পাচ্ছি"

সিগারেট ধরিয়ে বলল "আওয়াজ দিও না প্রকাশদা। স্টার তো বাইরের লোকের কাছে। তোমার কাছে আমি সেই স্ট্রাগ্লিং দেওয়ালি" হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে বলল "এখনও বিবিপিতে আছ?"

"না ছেড়ে দিয়েছি। বিমানের সঙ্গে একটা নতুন চ্যানেলে জয়েন করেছি, বাংলা টিভি। মাস তিনেকের মধ্যে এয়ার হবে"

"এটা কার?"

"তুমি চেন না। সৌগত দত্ত আর মনু ঘোষ বলে দুজনের। তবে ম্যাক্সিমাম শেয়ার চেন্নাই-এর একটা কম্প্যানির, চ্যানেল এক্স। তবে বিমান-ই সর্বেসর্বা"

সিঙ্গল মল্ট হুইস্কি কদ্দিন খায়নি। তবু আজ দেওয়ালির দৌলতে জুটে গেল। মেয়েটা তরতরিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে, কিন্তু এই উত্তরণের পেছনে যারা সাহায্য করেছে, তাদের এখনও ভোলেনি। স্টারডমের দুনিয়ায় বিরল। এই লাইনে এত বছর কম সেলেব ঘাঁটল না। একটু উঠলেই ধরাকে সরা জ্ঞান করে। অথচ এই মেয়েটা, ঠিক আগের মতোই।

"জারনালিজম পাস করার পর থেকেই ইচ্ছে ছিল, একটা সৎ প্রতিষ্ঠানে কাজ করব। স্পন্সরড নিউজ করতে আর ভাল লাগছে না। অনেক হয়েছে, হাঁপিয়ে উঠেছি" দেওয়ালির দিকে তাকিয়ে বলল "তোমার কাছে একটা দরকারে এসেছি। আমাদের এই চ্যানেলের পাশে কি তোমায় পাব?"

"আগের মতো হয়ত অত সময় দিতে পারব না। লাইন দিয়ে ডেটস। তবে তুমি ডাকলে, ফ্রি থাকলে সব সময়ই আছি। জাস্ট প্রে, তোমার ইচ্ছে পূরণ হয়" চাকচিক্যের বাইরে, নিরাভরণ দেওয়ালি যেন অন্য সুর শোনাচ্ছে। যা এতদিন কোনও তারকার মুখে শোনেনি। নাম হলেই, টাকা ছাড়া কথা বলে না। অথচ দেওয়ালি তার ধার পাশেও গেল না।

“সুপর্ণাদিকে বিমান ভেড়ালেও, ওর ওপর আমার কোনও আস্থা নেই। যে কোনও সময় ডিচ করতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, তুমি করবে না। তাই তোমার কাছে আসা”

“তুমি সিওর থাকতে পার, আমি ডোবাব না। যদি তোমার ডাকে আসতে না পারি, বুঝবে কোথাও ফেঁসে গেছি”

“তা আমি ভাল করেই জানি”

তিন মাস পর ঘটা করে বাংলা টিভির গালা ওপেনিং। ওবেরয় গ্র্যান্ডের ব্যাঙ্কয়েট। বহু তারকা ফ্রিতে এন্তার মাল খেয়ে টাল। বাংলা টিভির মহরতে শুভ কামনা করে সৌগত আর মনুর দেদার খসিয়ে, বাহাবা বেচে গেল।

ফলাও পাবলিসিটি সত্ত্বেও ছ মাস ধরে লাভের মুখ দেখল না কম্পানি। প্রকাশ এবং ম্যাগ্নিফিসেন্ট ফিফটি আঁচ করতে পারেনি, বিমান যথারীতি আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। চ্যানেল গোল্লায়।

“না রে, আর ভাল লাগছে না। এবার এসব মিডিয়া ছেড়ে দেব” একদিন হঠাৎ ঘোষণা করল বিমান।

“কী করবে?”

“ছেলেটা মেডিক্যাল পড়ছে, ওকে দেখতে হবে। বাড়ির জন্য একটুও সময় দিতে পারছি না”

“আমাদের কী হবে বিমানদা?”

“তোরা কাজ করে যা। সৌগত, মনু তো আছেই”

বিমান যখন কেটে পড়ল, তখনও ওরা আঁচ করতে পারেনি ভাঁড়ার শূন্য। প্রফিট হচ্ছে না বলে চ্যানেল এক্স ফারদার ইনভেস্ট করবে না। বিপাক দেখে মুনু ঘোষ সৌগতর হাতে চ্যানেলের ভার দিয়ে, শেয়ার ছেড়ে সরে পড়ল।

যে স্বপ্ন নিয়ে বিবিপি ছেড়ে প্রকাশ বাংলা টিভিতে জয়েন করেছিল, সেই স্বপ্ন তখন টিপিক্যাল মরীচিকা। মাইনে নেই, কাল হাঁড়ি কী করে চড়বে, জানা নেই। তবুও চ্যানেল চালিয়ে যেতে হবে। তিন মিনিট অফ এয়ার হলেই লাইসেন্স ক্যান্সেল। রিপিট রেকর্ডেড প্রোগ্রাম দিয়ে কোনরকমে ভাসছে নিঃশেষ বাংলা টিভি।

প্রকাশ তখন একবার ভেবেছিল দেওয়ালিকে ব্যাপারটা জানায়। দেওয়ালি ব্যস্ত, হাতে একদম সময় নেই। পর মুহূর্তেই মনে হল, এধরনের স্টারদের কাছে তার একটা আলাদা জায়গা আছে। দুর্দিনেও সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইতে পারবে না। কোনও ভাবেই সম্ভব নয়।

প্রবলেমটা ঠিক ইগোর নয়, কিছুটা পজিশনের। প্রতারকের পাল্লায় পড়েছি - কথাটা কাউকে তো বুক ঠুকে বলা যায় না। বিশেষ করে তাঁর মতো পরিচিত মুখের কাছে লজ্জার ব্যাপার। কেউ বিশ্বাস করবে না।

যা কপালে আছে, তাই হবে। সানি পার্কে সৌগত দত্তর বাড়ির সামনে ধরনায় বসে বুঝল, সৌগত বাড়িতে নেই - অ্যাবস্কন্ডিং!

একুশ

ড্যম ইট।

আচমকা প্রাগের ওয়েস্ট চেক মিউজিয়ামে এক্সিবিশন করার মধ্যেই খবরটা এল, সুভাষ কর্মকার আর নেই। প্রথমে ছ্যাঁত করে উঠেছিল বুকটা। পর মুহূর্তেই, অদৃশ্য এক অসহায়তা গ্রাস করল রিয়াকে। মনে হচ্ছে, মিউজিয়ামের শক্ত মেঝের ওপর দাঁড়িয়েও পায়ের তলার মাটি ক্রমশ সরে যাচ্ছে। দমকা ঝটকা হাওয়ায়, ছাউনিটা যেন হঠাৎ ভেসে গেল। এখন সে একা, সম্পূর্ণভাবে। তার চিত্রশিল্পী জগতের কাণ্ডারি হারিয়ে গেছে অজানার বাঁকে, তাকে শূন্যে ভাসিয়ে। কলকাতার বুকে এখনও যেটুকু ক্ষীণ আশা ছিল, তাও পলকে হারিয়ে গেল। এমন শক্তি নেই, ওই সুবিধাবাদী হাঙরদের সঙ্গে একা পাঞ্জা লড়ার, যদিও জেদটা আগের মতোই।

"হোয়াটস দ্য ম্যাটার রিয়া?" ড্রাহতস্লাভের চোখ এড়ায়নি।

"সুভাষদা ইজ নো মোর"

"মাই গস! ইউ গট দিস নিউজ নাউ?"

"অন মাই মোবাইল ফ্রম ক্যালকাটা"

"আই হ্যাড কুকড সো মেনি টাইমস ফর হিম। বিন টু কেন্ডুলি মেলা, শান্তিনিকেতন..."

"হি ওয়াজ মাই মেন্টর। হি পাসড অ্যাওয়ে টুডে"

ড্রাহতস্লাভ চুপ করে রইল। খুব ভালভাবেই জানে এই ফেমাস পেইন্টারের ইতিবৃত্ত। রিয়ার যা কিছু আর্টের শিক্ষা, সবই ওঁর কাছে।

মাইকেলের সঙ্গে বিয়েটা হিসেবের অঙ্কে হলেও রিয়া জানত, বিয়ে টিকবে না। বিয়ের পিঁড়ি থেকে পালাতে গিয়েও, শেষ পর্যন্ত মালাবদলটা করে ফেলেছিল। বিয়ে না করলে যে, তার ইউরোপে থাকা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে, খুব ভাল করেই জানত। উপায় নেই। চেকস্লভাকিয়ান সিটিজেনশিপ নিয়ে ইউরোপে ভাগ্য ফেরানোটাই একমাত্র পথ। কলকাতায় এতদিন চেষ্টা করেও তো লাইন ফিট করতে পারল না।

আর্ট তো বাইরের আভরণ। রোজগার কী শুধু আর্ট থেকে হয়?

টালিগঞ্জের এঁদো একচিলতে হাফ-বস্তির মধ্যেও একটা স্বপ্ন দেখত, বড় হওয়ার। কেউকেটা হওয়ার, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কিছু করার। তার কী এমন আছে, যা অন্যদের থেকে একটু বেশি? চমক লাগানো দেহসৌষ্ঠব ছাড়া। ভরা যৌবনে উপচে পড়া বুক। স্তনের প্রশস্তিতে নিতম্ব গৌণ। লোকে তার দিকে তাকালে,

তাৎক্ষণিক ভাবে যেটা লক্ষণীয়। ঈশ্বরের বরমাল্যকে আশীর্বাদ মেনে সে পথেই হাঁটা। ছেলেবাজি নয়। গ্র্যাজুয়েশনের সময় থেকেই নেটওয়ার্কিং-এর প্রথম সূত্র। বাবা বুঝতে পারেননি। কিংবা ভুল বুঝেছিলেন। হয়ত বুঝতে চাননি। নিম্নমধ্যবিত্ত সংকীর্ণতার বলয়ে বৃহত্তরকে দেখা যায় না। সেই সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির ঘেরাটোপে বাবা রিয়াকে দেখতে শেখেনি, বুঝতে চায়নি। তার তন্বী ঘন যৌবনা মেয়েকে দেখেছে আর পাঁচটা বাপের মতোই।

বিদ্রুপ করে বলেছিল "এমন ধিঙ্গি মেয়ে, ছোট ছোট জামা পড়ে সারা পাড়া নাচিয়ে বেড়াচ্ছিস। পড়াশোনার বালাই নেই। তোকে দিয়ে কিসসু হবে না"

উঠতি বয়সের ঠিকরে পড়া দেহসৌষ্ঠব। মডার্ন ওয়ান-পিসের দৌলতে ঠিকরে পড়ছে। কিছুই করেনি, শুধু চাঁদের মতো দ্যুতি ছড়িয়েছে। সেই রোশনাইয়ে যে কত হৃদয় মুখ থুবড়ে পড়ে ছটফট করেছে, হিসেব রাখেনি। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সোপানের ধাপ। বাবা বুঝতেই পারেনি।

যৌবনের বুদবুদে এদের চোবাও। ডুবিয়ে দাও শ্রাবণধারায়। কে তাকে সঙ্গী করল, সেটা বড় কথা নয়। বিনিময়ে কী পেল, সেটাই সব। বাবার তির্যক ব্যঙ্গ "যে ভাবে চলছিস, কেউ তোকে বিয়েও করবে না। নেহাৎ মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, তাই ফেলে দিতে পারব না"

"তোমাকে আমার বিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমার কপালে যা আছে তাই হবে"ঝাঁঝিয়ে উত্তর দিয়েছে।

রিয়া যে একটা স্বত্বা, বুঝতেও পারেনি। এটাই ওর টিআরপি অথবা অধঃপতন। বাবা হয়ত ক্ষুদ্র শান্তিতেই তৃপ্ত, তাই বৃহত্তর পাওয়াকে দেখতে শেখেনি। বুড়ো হয়ে গেছে তো। কী আর করা যাবে? যেখানেই থাকুক সুখে থাকুক... মেয়ের মঙ্গলকামনায় তার আশীর্বাদ, আকাঙ্ক্ষা...

টালি থেকে বালি, স্বপ্নের থলি, মাঝখানে খালি। আধুরা স্বপ্নে নতুন দিশা। স্বপ্ন হারিয়ে গেলে, প্রত্যাশা।

স্বপ্নটা নতুন মোড় নিল। কলকাতায় আর্টে যেটুকু এগোবার সুযোগ ছিল, তাও গেল। এই ক্রিয়েটিভ ফিল্ডটা এমনই। সবাই লড়ে যাচ্ছে, একটু জায়গা করে নেওয়ার জন্য। তবুও সুভাষদার মতো কিংবদন্তি শিল্পী পেছনে ছিল বলেই এতদিন এদের মধ্যে থাকার চেষ্টা করেছিল। এখন সে গুড়ে বালি।

সোজা নিত্যানন্দ দাস বাউলকে ফোন "আমাদের বৈষ্ণবের আখড়া গ্রুপটা আবার চালু করা যায় না?"

"কেন যাবে না দিদি? আপনি চাইলেই যাবে"

"তবে কাজ শুরু করে দিন। যা টাকা লাগে আমি দেব। প্রাগে এক্সিবিশন চলছে। শেষ হলেই ইন্ডিয়া যাচ্ছি"

কমার্সিয়াল বাউলদের মিডিয়ায় দাপাদাপিতে নিত্যানন্দ দাস বাউল একঘরে। এই মন্দার বাজারে, রিয়ার ফোনে যেন ধড়ে নতুন করে প্রাণ এল। সিনেমার মতো গ্রামে গ্রামে ঘুরে কামাই নেই। পূর্ণদাস বাউল সেই কবে উত্তমকুমারের 'নায়িকা সংবাদ' ছবিতে গান গেয়ে স্থায়ীভাবে বাউল গানের কিংবদন্তি হয়ে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। এখন হাফ-বাউলরা মিডিয়ার শোতে অংশগ্রহণ করে যা পারছে করছে। এদের নেটওয়ার্কিং মহিমায় নিতু বাউল একঘরে। মেয়েটা যদি সত্যি চায়, তবে এদের মধ্যেই ফিরে আসতে পারে। রিয়ার টাকা আছে, নেটওয়ার্ক আছে।

টাকা কী আর ছবি বিক্রি বা বাউল গান গেয়ে আসে? মডেলিং শুট করেই আসল আয়। কলকাতায় দুটো ফ্ল্যাট, শান্তিনিকেতনে জমি-বাড়ি। বাবা কী কল্পনাও করতে পেরেছিল? উদ্যমটাই আসল। সংস্কার গৌণ। এখন ছেলেমানুষি মনে হয়।

যা আশা করেছিল তাই, বিয়েটা টেকেনি। বিয়ে মানেই বন্ধন। রিয়া মুক্তচিন্তার পূজারি। বাউলদের মতো। লাগাম ছাড়া জীবনের আনন্দ নিতে হবে। গে লাইফে অভ্যস্ত মাইকেলকে মুক্তি দিয়েছে সিটিজেনশিপ পাওয়ার পরেই। দুজনেই হাঁফ ছেড়েছিল।

ইংল্যান্ডের এজেন্টকে কল "এনি ওয়ার্ক ফর মি?"

"হ্যাভ টু চেক ইট আউট"

"প্লিজ আই অ্যাম ইন ডায়ার নিড অফ ক্যাশ, মোর দ্য বেটার"

"সিওর ম্যাম। উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট"

"থ্যাঙ্কস"

ডিসকানেক্ট করে, রাজা চক্রবর্তীকে ফোন। রাজা অনেকদিনের বন্ধু, তার ভক্ত, বাউল সংগীতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট। এখানে ওখানে প্রোগ্রাম করে বেড়ায় "সুভাষদা মারা গেছে শুনেছ?"

"খবরে দেখলাম"

"প্রাগে আমার আর্ট এক্সিবিশন চলছে। শেষ হলে কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় আসছি। ফ্লাইট কনফার্ম করে জানাব। আমাদের বৈষ্ণবের আখড়া গ্রুপটাকে আবার চাঙ্গা করতে হবে"

অনেক বাউলদের মতো রিয়াও তান্ত্রিক যোগে বিশ্বাসী। এখানে মুক্তি আছে। দেহের লীলা অপবিত্র নয়। সাইকো-ফিসিক্যাল ম্যানুপুলেশনের মাধ্যমে দৈহিক মিলনকে নাকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যুগলে চেনা গণ্ডি ভেঙে নাকি এক অভূতপূর্ব মার্গে পৌঁছে যায়। এই তান্ত্রিক যোগের মাধ্যমে পরিচিত জীবনচক্র ভেঙে চিরশান্তি বা সমাধির পথে যাওয়াও সম্ভব। চিন্তার সেই সুদূর স্তরে না পৌঁছলেও, দেহমিলনের বৈধতাকে

সর্বসমক্ষে অন্তত প্রতিষ্ঠা করা যায়। তান্ত্রিক সেক্স। শুধু দেহ নয়, সর্বগ্রাসী কামনার নিয়ন্ত্রণ। মিলনের ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে সিমেনের সংবরণ ও দৈহিক সিক্রিশনের আস্বাদন, সুধাবৎ।

ব্যক্তিগত জীবনযাত্রাকে যদি দর্শনে রূপান্তরিত করে নিজের মধুমাখা জীবনকে বৈধতা দিতে পারে, মন্দ কী? দৈনন্দিন রাসলীলায় জাস্ট একটা সিলমোহর। ষোলোর জায়গায় আঠারো আনা বজায় থাকবে। আশ্চর্য সংস্কারাচ্ছন্ন একুশ শতকের বাঙালি সম্প্রদায়ের কাছে স্বতন্ত্র জীবনযাত্রাও বৈধতা পাবে।

“টাকা চাই। তোমার বাজেটে, আমাদের বৈষ্ণবের আখড়া গ্রুপটাকে দাঁড় করাতে গেলে আরও টাকার প্রয়োজন” রাজা রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল।

“ছবিগুলো সব গ্যালারিতেই তো রাখা আছে। বিক্রি হচ্ছে আর কোথায়? এখানে কোনও মার্কেটিং নেই। আমাদের মতো আর্টিস্টদের কেউ ব্যাক করে না। ওই নামকাওয়াস্তে এক্সিবিশন। বাইরে আমার যে কটা ছবি বিক্রি করতে পেরেছি, এখানে কিছুই পারিনি” রিয়া গলফ রোডের স্টুডিওতে আঁকা ছবিগুলোর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

দিন দুই লেগেছে জেট ল্যাগ কাটিয়ে উঠতে। এখনও ঘুমঘুম পাচ্ছে। তার মধ্যেই রাজাকে ডেকে নিয়েছে গ্রুপের মাস্টার প্ল্যান করার জন্য “এখানে ওই যে কটা আর্টিস্ট পলিটিক্যাল অ্যাসসিয়েশনে গোটা ইন্ডাস্ট্রিটাকে আঁকড়ে রেখেছে, তারাই করে খাচ্ছে। বাকি সব ভোঁ ভা”

“শুনলাম, এখানে অনেক আর্টিস্ট নিজের আঁকা ছবি বিক্রি করে, নামী আর্টিস্টদের কাছে। ভালই টাকা পায়। ওই নামীদামি আর্টিস্টরা নিজের নাম দিয়ে ছবিগুলো চালায়”

“ওটা তো বরাবরই আছে। যারা কোনও নাম করতে পারেনি, অথচ টাকার প্রয়োজন। আমি সে পথে কোনদিন হাঁটিনি। এখন সার্কেলে আমার নামটা পরিচিত। বদনাম হয়ে যাবে। বাইরে প্রফেশনালিজম অনেক বেশি। আমার যা কিছু ছবি বিক্রি হয়েছে বেশিভাগই অন্য দেশে”

“তাহলে ওখানেই বিক্রি করে এলে না কেন?”

“আগে বিক্রি হত, হঠাৎ ইকনমিক রিসেশনের জন্য অনেক কমে গেছে। ইউরোপে রিসেশন সাংঘাতিক। লোকে সারভাইভ করবে, না ছবি কিনবে?”

তবু বারবার কলকাতায় ফেরা কেন? হ্যাংওভার কাটাতে...

প্রাগে লাইন ফিট করতে কিছুটা সক্ষম হলেও, ইংল্যান্ডে নেহেরু সেন্টারে কিছু এক্সিবিশন করে প্রচার ছাড়া, তেমন কিছুই হয়নি। এখানে কিছু বিজনেসম্যানদের সঙ্গে ব্যক্তিগত রিলেশনের জন্য আগে কিছু ছবি কাটলেও ইদানীং ওদের উৎসাহ কম। বুঝতে পারছে, বয়সের সঙ্গে ফেমিনাইন চার্মসও কমছে। এতদিন

নিজের শিল্পদক্ষতার ঘটতি অন্যভাবে পুষিয়ে নিলেও, এখন কাজে লাগছে না। মাথার ওপর ছিলেন সুভাষদা। সেও নেই। সব মিলিয়ে আর্টের দুনিয়ায় মাটি সরে যাচ্ছে। আসার আগে, মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছিল, শান্তিকেতনের জমিটায় বাউলদের আখড়া বানাবে। এক সময় ইচ্ছে ছিল, ওখানে পটশিল্পীদের স্কুল খুলবে। এখন আর আগ্রহ নেই।

মুক্ত জীবনে রস আস্বাদন। বাংলায় বসে অবাধ যৌন জীবনকে সামাজিক মোড়ক দেওয়ার একটাই পথ। বাউল জীবনে ঢুকে যাওয়ার মধ্যেই, অপূর্ণতার পাথেয়। বেঁচে থাকার রসদ। সেখানেই আগামীর মন্ত্র।

সে কথাই এখন ভাবছে... মনেপ্রাণে বৈষ্ণবের আখড়া...

বাইশ

“দশ লাখ। যাকে চাও হাজির করে দেব” দিগ্বিজয়ের ঠান্ডা আওয়াজ।

স্টেটসে বঙ্গ সংস্কৃতির আগে অঞ্জনদার লেখা নতুন বই-এর একটা ঘটা করে পাবলিসিটি চাইছে শোভন। প্রেফারেবলি মুম্বাই বা চেন্নাই-এর কাউকে দিয়ে। দিগ্বিজয়ের বিশাল নেটওয়ার্ক। জোগাড় করা প্রবলেম নয়।

“ঠিক আছে” অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল শোভন।

“মুম্বাই না চেন্নাই?”

“যে বেশি গ্ল্যামারাস”

যদিও চেন্নাই-এর কন্ট্যাক্টগুলো বেশি মজবুত, তবে মুম্বাই বাজারে বেশি খায়। ছোটবেলা কেটেছে চেন্নাইতে। সেখানে বিস্তর কন্ট্যাক্ট। যেমন সুবিমল, মাল্টিন্যাশনাল কম্প্যানির জিএম। উঁচু মহলে অবাধ বিচরণ। ওদের ব্র্যান্ড প্রোমোট করার জন্য প্রায়শই দক্ষিণি তারকাদের ডাকতে হয়। তারাও উপরি রোজগারের জন্য সুবিমলের কাছে দায়বদ্ধ। তারপর দিগ্বিজয়-মায়ার মধুচক্র থেকে উইকএন্ডে আরও কামাই। ওদের অনেক কম ধরিয়ে, কমিশন দ্বিগুণ। বাবা অ্যাকাউন্টস অফিসার থাকলেও, ছেলে হিসেবনিকেশ তাঁর থেকে বেশি বোঝে।

কোন হিরোইনকে হাজির করল, সেটা শোভনের চিন্তার বিষয় হতে পারে, দিগ্বিজয়ের নয়। বিনিময়ে কী পেল, সেটাই বড় কথা। শোভন থাকুক ওর পাবলিসিটির ঘোরে, তার কাছে পাত্তিটাই মুখ্য। অবশ্য মিডিয়াকে খাওয়াতে গেলে, মুম্বাই-এর হিরোইন জরুরি। এদের মেধায় লুক ওয়েস্ট। তাতে কমিশন কম থাকলেও, দিগ্বিজয়ের সেটাই কাম্য। ওর মতো টাটকা মুরগি হারনো, ওদের দুজনেরই ক্ষতি।

শোভনের অফিস থেকে বেরতে গিয়ে মোবাইল বেজে উঠল। ব্রিফলি শুনেই বলল “খবরটা জেনুইন?”

“পাক্কা, অথেনটিক সোর্স”

“গাড়িতে উঠছি। বাড়ি গিয়ে কথা হবে”

“অমন হন্তদন্ত হয়ে চললে কোথায়?” দিগ্বিজয়কে তাড়াহুড়ো করে বেরতে দেখে, মায়ার প্রশ্ন।

“একটা স্কুপ পেয়েছি। বিগ স্টোরি। ঠিক হলে, জ্যাকপট”

“সুবিমলকে টাইম দিয়েছিলে। ও চেন্নাই থেকে আসছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে”

“সুবিমল ক্যান ওয়েট, দিস কান্ট” মায়াকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মায়া বুঝতে পারছে না, এমন কী ঘটল যে হঠাৎ বেরিয়ে যাচ্ছে? সুবিমল নতুন অনেক মুরগি ধরেছে। ভাল পারসেন্টেজ...

"তুমি কী ফ্লাইট বোর্ড করেছ?" মায়া সুবিমলকে ফোন করল।

"এখনও না, জাস্ট বাড়ি থেকে বেরচ্ছি"

"দেন ডোন্ট। দাদা কী একটা কাজ নিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল। বলল আর্জেন্ট। তুমি তাহলে এখন এস না। আমি দাদার সঙ্গে সময়মত কথা বলে, তোমায় রিং ব্যাক করছি"

খবরটা যদি সত্যি হয়, ইট ইজ এ বিগ স্কুপ। অনিন্দ্য দেওরা মুম্বাই-এর উঠতি পলিটিশিয়ানদের অন্যতম। হ্যান্ডসম, সুবক্তা, ডাইন্যামিক। তার স্কুপ খাবে তো বটেই। ঠিক জাল ছড়াতে পারলে মোটা কামাই। এ তো আর শোভনের কলকাতা নয়। যেখানে লাখ নিয়ে কারবার। এ দিল্লি, টাকার ফানুস উড়ছে। কোটি টাকার গল্প। ঠিকমতো খেলতে পারলে শুধু স্কুপই নয়, বড় দাঁও। লাইফটাইম কামাই, ফিউচার সিকিওর্ড। খুচরো কমিশনের ওপর গণ্ডা গণ্ডা লোকেদের দিনভোর তোয়াজ করতে হবে না। এ সুযোগ ছাড়া যায় না।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল "এক্ষুনি দিল্লি যাচ্ছি"

মায়া বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কী! হঠাৎ এমন কী হল, যে তড়িঘড়ি দিল্লি ছুটতে হবে "কী ব্যাপার? একটু খুলে বলবে?"

"টাইম নেই, ফিরে এসে বলব" দিগ্বিজয় সুটেকেস প্যাক করতে করতে বলল "বিশাল স্কুপ। বড় স্টোরি। ধরতে পারলে..."

এত বছর ধরে দেখছে। লোকটার টাকার প্রতি অসম্ভব আসক্তি। কার নেই? মায়ারও কী কম? এমন কী খবর পেল, কত বড় দাঁও? সুবিমল তুচ্ছ...

খবর জোগাড় করে একবার থমকাল। রিজিওন্যাল নিউজে ছাড়লে কিছুই পাবে না। বরং ন্যাশনাল নিউজে খবরটা বিক্রি করতে পারলে মোটা কামাই।

"ইজ ইট জেনুইন?" ডিটিভির বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার মুকেশ লাল জিজ্ঞেস করল।

"হান্ড্রেড পারসেন্ট। হাউ মাচ উড ইউ পে মি?" দিগ্বিজয় কনফিডেন্ট।

"টু ক্রোড়স"

"দ্যাটস পিনাটস। দিস ইজ দ্য বিগেস্ট স্টোরি ইন রিসেন্ট টাইমস। আদার চ্যানেলস হ্যাভ অফার্ড মি মাচ মাচ মোর..."

“হ্যাভ টু চেক উইথ চেয়ারম্যান। কেয়ার টু ওয়েট?”

“নো প্রবলেমস অ্যাট অল”

আধ ঘণ্টা। বুক দুরু দুরু। শেষ পর্যন্ত কতয় রফা হয়। এসি কনফারেন্স রুমেও দরদর করে ঘামছে।

“বস সেইড ফোর ক্রোড়স অ্যাট মোস্ট”

“টেন। টেক ইট, অর লিভ ইট”

আবার প্রতীক্ষা। ব্যাবসাদারের ছেলে না হলেও হিসেবটা জানে। এতদিন ধরে খেলছে। কোথায় কত দাঁও নখের ডগায়। বাংলার থেকে দিল্লির লোকেরা অনেক বেশি উদার। তবে ভার যাচাই না করে মালকড়ি ছাড়ে না। দুই থেকে চারে যখন উঠেছে, বিশ্বাস না করলে অফারটা দিত না। এখন বাড়তি বোনাসের জন্য লড়ে যাচ্ছে। দেখা যাক শেষমেশ কত দাঁড়ায়।

“ওকে সিক্স। দ্যাটস ফাইন্যাল”

“ক্যাশ?”

“গিভ মি অ্যান আওয়ার। উইল ড্র দ্য মানি”

এত টাকা নিয়ে ট্র্যাভেল করবে। আজকের দিনে? ভয় ভয় করছিল। বলা তো যায় না...

“ওয়েল মেক এ ব্যাঙ্ক ড্রাফট ইন মাই নেম”

“অ্যাজ ইউ প্রেফার”

“আই উইল হুইজ অফ অ্যান্ড বি ব্যাক ইন অ্যান আওয়ার”

চড়া রোদে ঠান্ডা অফিস থেকে বেরিয়ে এল। গোটা দিল্লি শহর ড্রাই হিটে তপ্ত। সুনসান। ট্যাক্সিতে হোটেল লীলা প্যালেস। বিয়ার আর স্যান্ডুইচ। ড্রাফটের বদলে হেডলাইন স্টোরি।

কলকাতায় যাওয়ার আগে আরেকটা কাজ বাকি। শোভনের বই লঞ্চের জন্য হিরোইন ফিট করা। ভাবছে, কাকে নিলে পাবলিসিটিও হবে, কমিশনও বেশি থাকবে। মুম্বাই-এর কোনও পড়ন্ত নায়িকা।‘দ্য লাইব্রেরির’ ঠান্ডা লাউঞ্জে মোবাইলে আনমনা। কন্ট্যাক্ট স্ক্রোল করেই যাচ্ছে। অনসূয়া বসু। গ্ল্যামার এখনও আগের মতোই। এখন হাতে তেমন কাজ নেই। কম টাকায় রফা করতে পারবে। ফ্লাইট প্লাস অ্যাপিয়ারেন্স ফি। সঙ্গে ফাইভ স্টার হোটেলের এক্সপেন্স।

“দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য। চিনতে পারছ?”

“কলকাতা থেকে। কেন চিনব না? কেমন আছেন?”

“ফ্রি আছ। কথা বলা যাবে?”

“অ্যাবসলিউটলি ফ্রি” অনসূয়ার স্বরে হৃদ্যতার আভাস।

“একটা বুক লঞ্চ করতে হবে। কলকাতায়। ফ্লাইটস, হোটেল প্লাস দু-লাখ”

“এত কমে তো আমি কোথাও যাই না”

“কলকাতায় আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা হবে। সেই সঙ্গে কিছু কামিয়ে নিয়ে যাও”

“সেভেন ডেইজের কমে কলকাতা গেলে নট ওয়ার্থ দ্য জার্নি। কিছু লোকের সঙ্গেও দেখা করতে হবে। বাংলা সিনেমায় একটা রোল নিয়ে কথা চলছে...”

“ফাইন”

“হায়ার কার আর চার লাখ। মুম্বাইতে থেকে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং বেড়ে গেছে”

অন্য সময় হলে দরাদরি করত। সামনে ছ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট ঝুলছে। মনটা এমনিতেই প্রসন্ন। দিগ্বিজয় দরাদরির মধ্যে গেল না “এক সপ্তাহের হোটেল এক্সপেন্স নিয়ে পোষাবে না। তোমার রিকোয়েস্টে থ্রি ল্যখস। দ্যটস ফাইন্যাল”

“বিজনেস ক্লাস ফ্লাইট” মুম্বাইয়ের বাসিন্দা অনসূয়া হাসিল করতে ভালই শিখেছে।

“ডান। ফোরথ জুলাই। বিবেকানন্দর ডেথ অ্যানিভারসারি। দিনটা মার্ক করে রাখ। অন-লাইন ফ্লাইট আর হোটেল বুকিং করে মেল করে দেব। তোমার মেল অ্যাড্রেসটা টেক্সট করে দিও”

বিয়ারটা শেষ করে উঠে পড়ল। ড্রাফট নিয়ে সিডিটা মুকেশ লালকে হ্যান্ড ওভার করে আজই কলকাতা ফিরবে।

সেন্সেশন। ঝড় তুলল সারা দেশে। মিডিয়া থেকে সোশাল নেটওয়ার্কিং থেকে ক্লাবে, পাবে। ভাইরাসের মতো ভিডিওটা ছড়াচ্ছে এমএমএস-এ, হোয়াটস অ্যাপে। ইউ টিউবে উঠেছিল। কিন্তু কোর্ট ইঞ্জাংশনে ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। ডিটিভি-র টিআরপি তুঙ্গে। হাইপ তো একদিন মিলিয়ে যাবে। কিন্তু এর ফাঁকে যে যা কামাবার, কামিয়ে নিচ্ছে।

কেন্দ্রের মন্ত্রী অনিন্দ্য দেওরার এক বিরল অন্তরঙ্গ ভিডিও। সুপ্রিম কোর্টের স্বনামধন্য মহিলা অ্যাডভোকেট সুহাসিনী রাথডের সঙ্গে, সুপ্রিম কোর্টের চেম্বারেই লাইভ সেক্স। অনিন্দ্যর অবয়বটা অস্পষ্ট হলেও, সুহাসিনীর নগ্ন দেহের প্রতিটা লোভনীয় অংশ স্পষ্ট। বয়স হলেও খারাপ দেখতে তো নয়। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা। এখনও স্তন থেকে ভরাট নিতম্ব আবরণেই আকর্ষণীয়। যখন বে-আব্রু হয়ে আমোদে লিপ্ত হয়, আকর্ষণ দ্বিগুণ। সত্যি খবর সাড়া ফেলে না, যতটা এসব। তার ওপর সুপ্রিম কোর্টের চেম্বারে। তাও আবার এক হ্যান্ডসম কমবয়সী মন্ত্রীর সঙ্গে। রমরমিয়ে বাজারে খাচ্ছে। দেশের কোথায় কী সমস্যা, কী ভাবে

তার উন্নতি করা যায়, কতটা কাজ এগিয়েছে, কী ভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সে নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। সেক্স, রেপ, স্ক্যাম, মিডিয়ার হেডলাইন্স। টাকা এতেই আসে।

দিগ্বিজয় ড্রিঙ্কস হাতে, লেদার সোফায় হেলান দিয়ে, চ্যানেল সার্ফ করছিল। মায়া সুবিমলের সঙ্গে বেরিয়েছে। মেয়ে কলেজের এক্সকারশনে দার্জিলিং। ভাবছে, কী ভাবে টাকাটা ইনভেস্ট করবে। কলেজ শেষে মেয়েকে অ্যামেরিকায় পড়তে পাঠানোর ইচ্ছে। মা-মেয়ে দুজনেরই সেরকম ইচ্ছে। লুক ওয়েস্ট...

"হোয়ার ডিড ইউ গেট দিস ভিডিও ফ্রম?" মোবাইলে মুকেশের গম্ভীর আওয়াজ। টিভি মিউট করে দিল।

"হোয়াই? ফ্রম ওয়ান অফ মাই কন্ট্যাক্টস"

"দ্য ভিডিও ইজ হোক্স। ইট ইজ নট অফ অনিন্দ্য দেওরা"

"ইট ক্লিয়ারলি শোস অনিন্দ্য দেওরা"

"ইট ইজ নট। হি র‍্যাং আওয়ার অফিস। হি ডিসক্লেমড হিজ ইনভলভমেন্ট। হি ইজ মুভিং টু কোর্ট টুমরো ফর এ ফিফটি ক্রোর কম্পেনসেশন। হি অলসো থ্রেটেন্ড, হি উড মেক সিওর আওয়ার চ্যানেল ইজ অফ দ্য এয়ার ফর ম্যাল-অ্যালাইনিং হিম"

ছ্যাঁত করে উঠল বুকটা। অজানা আতঙ্ক যেন মাথা থেকে স্পাইন্যাল কর্ড বেয়ে নামছে। একটা ঝিলিক শরীরটাকে বেসামাল করে দিয়েছে। খোদ অনিন্দ্যর ড্রাইভার ভিডিওটা দিয়েছে। প্রশ্ন করেছিল "কইসে মিলা?"

"বাবুকা লেট হো রহা থা। মোবাইল মে কই বার ফোন করনে পর ভি নেহি পাকরায়া। মেরা বেটিকা বহুত তবিয়ত খারাপ, ঘর জানা জরুরি থা। ইসলিয়ে উধার গয়া, তো দেখা, বাবু রঙ্গালিয়া মনা রহা হ্যাঁয়। বেটিকো হাসপাতাল লে জানা জরুরি থা। বিবি আকেলে নেহি সকেগি। মুঝে রহা নেহি গয়া। মোবাইল মে ভিডিও খিঁচ কর, চল বসা। হামারে বেটিকা জিন্দেগি বাবুকা রঙ্গালিয়া সে জ্যাদা কিমতি। সহ নেহি গয়া"

অবিশ্বাস হওয়ার কোনও কারণ নেই। দিগ্বিজয়েরও অবিশ্বাস হয়নি। ইমোশনে মানুষ অনেক কিছু করে। সেখানে বদলা নেওয়ার জন্য ভিডিও তোলা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

"আই গট ইট ফ্রম সামওয়ান ভেরি ক্লোজ..." নামটা চেপে গেল।

"ড্যাম ইট, ফ্রম হুম ইউ গট। আই অ্যাম কনসার্নড অ্যাবাউট দ্য অথেন্টিসিটি। উই হ্যাভ সেন্ট দ্য ভিডিও টু দ্য টেকনিক্যাল ল্যাবরেটরি ফর অ্যানালসিস" কঠোরভাবে বলল "ইফ ইট ইজ রং ইউ আর ইন শিট"

মুকেশ ফোন কেটে দেওয়ার পর এসির মধ্যে দরদর করে ঘামছে। যদি ভুল প্রমাণিত হয়, ডিটিভি তাকে ছেড়ে দেবে না। এত কোটির কম্পেনসেশন! চ্যানেল বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। ওই ছ কোটি টাকা সাপের মতো

ছোবল মারছে। টাকার চেয়েও বড় তার রিপোর্টার জীবনের অস্তিত্ব সংকট। এত বড় খেলায় কোথায় দাঁড়াবে তার ঠিক নেই।

টিভি বন্ধ করে ঢকঢক করে বেশ কয়েক পেগ হুইস্কি গিলে ফেলল। মায়া কখন ফিরেছে জানা নেই। বিছানায় শুয়ে ঘুমের ভান। তবু ঘুম আসছে না। এত বছর তো, ছোটমোট এরকম অনেক খেলাই খেলেছে। কোথাও তো এভাবে ফাঁসেনি। এই প্রথম। শেষ কী?

কয়েকদিন পর মোবাইলে একটা অজানা নম্বর।

"দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য?"

"ইয়েস"

"অনিন্দ্য দেওরা। ইউ আর দ্য পারসেন হু সোল্ড দিস ফলস ভিডিও অফ মি টু ডিটিভি। হু গেভ ইউ দ্য গাটস? নাউ এনজয় দ্য টিউন..."

তেইশ

ঘুম ভেঙে গেল দেওয়ালির। শীত করছে। হিমশীতল বেডরুম। চারদিকে অন্ধকার। চাদর ঢেকে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সকালের এই ঘুমটা বড্ড আদুরে। বাবার বকুনি, তাও ছোটবেলায় সকালের ঘুমটা বড় প্রিয় ছিল। কাজের ফাঁকে ঝালিয়ে নেওয়া।

"এত দেরি করে উঠলে তোর কিসসু হবে না। সকালে উঠে ফ্রেস হয়ে পড়াশোনা করলে মনে থাকে। যে শুয়ে থাকে, তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে"

"আহঃ বাপি... আরেকটু ঘুমতে দাও না" দেওয়ালি উলটো দিক ফিরে আবার সুখনিদ্রায় ডুব দিত।

যখন শুটিং নেই, জীবনটা হাতের মুঠোয়। এই লোখান্ডওয়ালা কমপ্লেক্সে সে-ই কর্ত্রী। বাধা দেওয়ার কেউ নেই, বাবাও আজ অবশ্য পৃথিবীতে নেই। অবচেতনে বাবার কথাগুলোই বোধহয় বেশিক্ষণ ঘুমোতে দিল না। এসির টেম্পারেচার বাড়িয়ে, চাদর সরিয়ে উঠে বাথরুমের দিকে এগোতেই চোখ পড়ল আয়নায়। উলঙ্গ দেহটাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখল। রংটা শ্যামলা হলে কী হবে, তন্বী দেহে বুক আর নিতম্ব যেন ঢেউ খেলিয়েছে। আঁটসাঁট শরীরে কোথাও কি ফ্যাট জমেছে? বুকটা কী ঝুলে গেছে? নিতম্ব কী এখনও পুষ্ট? বোঝা যাচ্ছে না। ড্রেসিং টেবিলের আলো জ্বালিয়ে ঘুরেফিরে আবার দেখল তন্বী অবয়ব। নাঃ...

কাল রাতে ফেসটাইমে, অ্যামেরিকার এজেন্ট মার্ক হিগিন্সের সঙ্গে কথা বলার পর সচেতনতা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। ডিসকানেক্ট করার পরও উত্তেজনা থামেনি। আনন্দের সঙ্গে অজানা আশংকা। পারবে তো? স্বপ্নটা মাটিতে নামলেও, তাকে ছুঁতে ভয়।

"গট ইট। ওয়ারনার ব্রাদ্যারস হ্যাভ সিলেক্টেড ইউ ফর ওয়ান অফ দেয়ার হলিউড প্রোডাকশনস"

"ইজ ইট? কান্ট বিলিভ"

"ইট ইজ ট্রু। দে কনফার্মড ইট বাই মেইল। আই অ্যাম ফরোয়ার্ডিং দ্য মেইল। অ্যান্ড বিলিভ ইট, ফর দ্য লিড রোল ইন দেয়ার আপকামিং প্রোডাকশন, দ্য পারসুইট"

স্তম্ভিত, বেশ কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কথা বেরয়নি। রিফিউজি কলোনি থেকে উঠে আসা মেয়ে হলিউডের নায়িকা! স্বপ্নেরও বাইরে। মার্কের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল, তার বেশ কয়েকটা হিন্দি ছবির প্রোডিউসার, সত্যম ভাট। মার্ক ওর ফরেন লোকেশনে শুট-এর জন্য প্রায়শই বিদেশিনী সাপ্লাই করে। দেশ থেকে কাউকে সাইড রোলের জন্য ডেভস বা ইন্সক্রুকে নিয়ে যাওয়া অনেক এক্সপেন্সিভ। দেশ-বিদেশে লোকাল মহিলাদের রেক্রুট করে, কম খরচে কাজ হাসিল করে।

“প্রোফাইল ভেজ দে না। ফির নসিব মে লগে তো...”

সত্যম নিজেও আসা করেনি। কত মেয়েকেই না হদিস দিয়েছে। এদের মধ্যে কতজন পোর্টফোলিও পাঠিয়েছে, দেওয়ালির পরিচিত বন্ধুবান্ধবরাও। এর আগে কারও লেগেছে বলে তো শোনেনি। মার্ক বলছে, সি হ্যাস বিন সিলেক্টেড। দ্যটস ইট। রোল কী তাও জানে না। ঠিকমতো করতে পারবে কি... ইংরেজির কতখানি পারফেকশন দরকার, তাও জানা নেই। লরেটোর ইংলিশে চলবে? না আরও বেটার? ছবির নাম পারসুইট, প্রোটাগনিস্ট বাঙালি। ওরা ইন্ডিয়ান ইংলিশই আশা করবে...

“ডোন্ট ফরগেট মাই এনহ্যান্সড পারসেন্টেজ উইথ দ্য লিড রোল, ইন অ্যাডিশন টু দ্য কন্ট্র্যাক্টেড পারসেন্টেজ”

“বাই অল মিনস। উডন্ট ডিপ্রাইভ ইউ অ্যাট অল আফটার দ্য গুড নিউজ” ভয় মেশানো আনন্দে বুকটা কাঁপছে।

আয়নায় আরেকবার নিজেকে দেখল। পর্দা সরিয়ে, আলো জ্বালিয়ে। পুরুষের ছোঁয়ার চেয়ে যা এই মুহূর্তে অনেক রোমাঞ্চকর। কী ভাবে নিজেকে সাজাবে... দেশি থেকে বিদেশি আঙ্গিকে। আরেকবার দেখল, ৫-৩ অবয়বটাকে।

চপল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার ইউ এস পি। ৩৪বি-২৫-৩৫। পঞ্চাশ কেজির তন্বী দেহটা নিশ্চিত আগুন ছড়াবে। ব্রেস্ট অগমেন্টেশনের কী প্রয়োজন? মার্ক-ই ভাল বলতে পারবে। চরিত্রটা কী, না জেনে প্লাস্টিক সার্জারির পথে এগোনো ঠিক হবে না।

আজ গোয়েঙ্কা সাহেবের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ব্যান্ড্রা-কুরলা কমপ্লেক্সে ব্যান্ডস্ট্যান্ডের ওপর তাজ ল্যান্ডস এন্ড। ঠিক ছটায়, শার্প। সেদিন যখন কলকাতা থেকে রাজীব গোয়েঙ্কা ফোন করল, হকচকিয়ে গেছিল। ওর মতো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের কাছ থেকে আচমকা ফোন আশা করেনি। খুব পোলাইটলি জিজ্ঞেস করেছিল “রাজীব গোয়েঙ্কা। আর ইউ ফ্রি টু টক?”

“সিওর”

“ওয়ান্ট টু মিট ইউ”

“আই অ্যাম ইন মুম্বাই, ফর শুটিং...”

“আই অ্যাম অন এ বিজনেস ট্রিপ টু মুম্বাই নেক্সট উইক। ক্যান ইউ মিট মি অ্যাট তাজ ল্যান্ডস এন্ড ইন ব্যান্ড্রা অন স্যাটারডে অ্যাট সিক্স?”

“আই থিংক দ্যাট ইজ মাই ডে অফ। আই উইল ডবলি চেক অ্যান্ড গেট ব্যাক টু ইউ”

স্যাটারডে, আজ ডে অফ। ইউসুয়ালি, সকালে শপিং সেরে দুপুরে ঘুম দেয়। বিকেলে কোনও পার্টি বা লঞ্চ প্রোগ্রাম থাকলে যায়। কিছু না থাকলে, জুহুতে কলেজের পুরনো বন্ধু শ্রেয়সীর সঙ্গে আড্ডা মারে। ওর বাড়িতে, নয় এখানে। কাজের বাইরে ফিল্ম সার্কেলের সঙ্গে মেশে না। তার মুম্বাই-এর সংক্ষিপ্ত জীবনে ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে সে রকম দহরম-মহরম নেই। আবাহন নেই, বিসর্জনের প্রশ্নও ওঠে না। গোয়েঙ্কা সাহেবের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য আগে থেকেই শ্রেয়সীকে বলে এ সপ্তাহের আড্ডা অফ করে দিয়েছে।

আজ শপিং-এ যাবে না। সারাদিন একা ঘরে বসে হলিউডের ব্রেক সেলিব্রেট করবে, নিজে রান্না করে। ফ্রেঞ্চ কুসাইন। বাথরুম থেকে ফ্রেসেন্ড হয়ে, হাউসকোট জড়িয়ে, ফ্রিজ থেকে ব্রেইসড বিফ রেড ওয়াইনে ম্যারিনেট করতে দিল। ছ-ঘণ্টা ম্যারিনেট করতে হবে। জুস ডি বুফ ব্রেসি। বিফের সঙ্গে গাজর, মাশরুম আর আলু। শ্রেয়সীর কাছেই শেখা।

"ব্যস্ত আছ?" দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য মোবাইলে।

"নাঃ ফ্রি"

"তুমি তো এখন মুম্বাইতে? ভাবছিলাম, যদি আমায় সাহায্য করতে পার। আই অ্যাম ইন বিগ ট্রবল"

"কেন? কী হল?"

"আরে তোমাদের মুম্বাই-এর এমপি অনিন্দ্য দেওরার একটা স্কুপ..." একটু থেমে বলল "লাইভ সেক্স রেকর্ডিং উইথ ওয়ান ফিমেল অ্যাডভোকেট অফ সুপ্রিম কোর্ট, ইন দ্য অ্যান্টি চেম্বার অফ দ্য কোর্ট, ডিটিভিতে বের করে দিয়েছি"

"টিভিতে দেখেছি, পেপারেও পড়েছি। আপনি ইনভলভড, জানতাম না"

"আমিই স্কুপটা দিয়েছিলাম। এখন ভিডিও এক্সপার্টরা প্রুভ করেছে, ওই সেক্স ভিডিওতে অনিন্দ্য ছিলই না। ইট ওয়াজ সামওয়ান এলস"

"আপনি ডবল চেক করেননি?"

"সেটাই তো ভুল করেছি। টাইম ওয়াজ শর্ট। পাছে অন্য কেউ বার করে ক্রেডিট নেয়, তাই আমিই ফাঁস করে দিই। জানই তো, এত মিডিয়া। দ্য লাইন ইজ হাইলি কম্পিটিটিভ। ওয়েস্টিং টাইম ইজ লুজিং বিজনেস। এখন ও থ্রেটেন করছে, আমার ইহকাল-পরকাল বরবাদ করে দেবে। ইফ হি পিকস দ্য স্টিক, আই অ্যাম ফিনিশড"

এই কী সেই লোক যে 'ফিফটি-ফিফটি' কমিশনে অভ্যাস্ত? এই কী সেই লোক, যে তার দেহটাকে ছিঁড়ে খাবে বলে শোভনের টাকায় বালি নিয়ে গেছিল? এই কী সেই মিডিয়ার আলিখিত ডন, যার ওপর ভর করে এক সময় রথের স্বপ্ন দেখেছে। তার এত কনট্যাক্ট থাকতে হঠাৎ দেওয়ালিকে কেন?

“তোমার তো মুম্বাইতে প্রচুর কনট্যাক্টস। কোনওভাবে ওর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না?” পলিসড ওয়েতে জীবন-ভিক্ষা। ভাবছে... করবে? কিছু কী তার এক্তিয়ারে আছে যা করা যায়, নিজের পজিশন বজায় রেখে? কেনই বা করবে? দেয়ার ইজ নো ফ্রি লাঞ্চ ইন দিস ওয়ার্ল্ড। দিগ্বিজয়ের থেকে তার কী পাওয়ার আছে? বিশেষ করে, এই হলিউডে ঢোকার প্রারাম্ভে?

খেয়ালই করেনি, মোবাইল হাতে কখন জানলার পাশে চলে এসেছে। আনমনে তাকিয়ে আছে বিশাল মহানগরীর দিকে। দিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভিড় বাড়ছে। দিগ্বিজয়ও দিনরাত ধান্দায় ব্যস্ত। আজ সে যেখানে যাওয়ার অফার পেয়েছে, তা কি এত লোক ধান্দাবাজি করেও হাসিল করতে পারে?

পুজোপাঠ করে না, তবু ঈশ্বর আর ভাগ্যকে তো ফেলতে পারে না। না হলে, এতজনের মধ্যে সে আর এমন কী, যে হলিউডে ডাক পাবে? ওখানেও একটা রোলের আশায় তার মতো অনেকেই রাতদিন মাথা ঠুকছে। ভাগ্যই যদি পরিণতি ঠিক করে, তাহলে ভবিতব্যই দিগ্বিজয়কে তার সামনে এনেছে। লোকটা ভাল না মন্দ, সে বিচারের দায় তার নয়। যদি কিছু করার থাকে, করে দিলেই হয়। ঈশ্বর কি তাকে পুরস্কৃত করার বদলে, দিগ্বিজয়ের মাধ্যমে কিছু চাইছে। ওকে ফিরিয়ে দেওয়া মানে কি ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করা। ভাবছে... কোনও পরিচিতিকে যদি কাজে লাগাতে পারে। ক্লিক... সেলিব্রাল কম্পিউটার স্ক্রিনে। কে যেন আর্কাইভ থেকে নামটা ভাসিয়ে দিল...

“অনিন্দ্যকে চিনি না, তবে ওর স্ত্রী লিজার সঙ্গে পরিচয় আছে। ওর একটা প্রোডাকশন কম্প্যানি আছে। ওয়াটার এন্টারটেনমেন্টস। তেমন আহামরি নয়। তবে হ্যাঁ, চেনা আছে। কথা বলে দেখি। ফোনে হবে না, দেখা করতে হবে। আজ ফ্রি নই। কাল সকালে যদি পারি”

“তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না”

“নাই-বা দিলেন। কথা বলে আপনাকে জানাব”

ফোনটা নামিয়ে তৃপ্তিতে মন ভরে গেল। হলিউডে নায়িকা হওয়ার থেকে যা একটুও কম নয়। যাকে জাগতিক সাকসেস বা ফেলিওরের মাপকাঠিতে হিসেব করা যায় না। শুধুই অনুভব।

সিক্স ও’ক্লক। তাজ ল্যান্ডস। রিসেপশন বলল “সুইট নাম্বার ১৩১৩। থারটিন্থ ফ্লোর”

রাজীব দরজা খুলে দিল “কাম ইন। মেক ইওরসেলফ অ্যাট হোম। ড্রিঙ্ক? সফট অর হার্ড?”

“মক্টেল প্লিজ”

“গিভ মি এ মোমেন্ট টু প্লেস দ্য অর্ডার”

তেরো তালার ওপর পর্দা টানা এক্সিকিউটিভ স্যুট। নীচে টোয়াইলাইটের আঁচলে মোড়া ব্যস্ত মেট্রোপলিস। দূরে তার আঁচলে ঢাকা, বিস্তৃত অ্যারেবিয়ান সি। সূর্যের শেষ আলোয়, সাগরের অদ্ভুত মায়াময় রূপ। সরু বিচের বালিগুলো ছাই রঙা, রুপালি রাজপুত্তুরের মতো ঝিকমিক করছে। দামাল ঢেউ। হাজার সূর্যের কুচি গায়ে মেখে খেলা করছে। কাড়াকাড়ি করছে আলোর টুকরোগুলো নিয়ে। মাঝেমাঝেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে বালিয়াড়িতে।

"কমফরটেবল?" মাথা নাড়ল দেওয়ালি "আই হ্যাভ অর্ডারড ইওর টম কলিন্স উইথ সাম রিসোটো উইথ প্রন্স অ্যান্ড ক্রুগেটেস। ইউ আর নট অ্যালারজিক টু প্রন্স, আর ইউ?"

"নো"

"আমারা কলকাতার লোক তো, মাছটাই প্রিয়। অবশ্য আমি ভেজিটেরিয়ান। ইউ হ্যাভ টু এক্সকিউজ মি" এবার স্পষ্ট বাংলায়।

মাছ খাইয়ে কী মাছ তুলতে এসেছে বোঝা যাচ্ছে না। এন্টারটেন্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি হাতের মুঠয়। মাথা নাড়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। যতক্ষণ না উদ্দেশ্যটা প্রকাশ পায়।

"তোমার বিজি সেড্যুলের মধ্যে ডেকে পাঠিয়েছি একটা প্রপোসাল নিয়ে" কোনও ভণিতা না করেই রাজীব সরাসরি কথায় এল "আমরা তোমাকে আমাদের নতুন গ্রুপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার করতে চাই। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে..."

"আমি কলকাতার মেয়ে। আপনাদের গ্রুপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হওয়া তো আমার সৌভাগ্য" দেওয়ালি টম কলিন্সে চুমুক দিয়ে বলল "তবে আমার বিজি সিড্যুলে কতখানি সময় দিতে পারব, তাই ভাবছি"

"সব সময় ফিসিক্যাল প্রেসেন্স যে জরুরি, তা নয়। মেইনলি দ্য প্রেসেন্স অফ ইওর নেম অ্যান্ড পিকচার। ফিসিক্যাল প্রেসেন্স লাগলে, উই উইল গিভ ইউ এনাফ নোটিস। অফ কোর্স, উই উইল রেমুনারেট ইউ অ্যাডিকোয়েটলি অন এ ইয়ারলি রিটেইনার"

"ইফ ইউ ক্যান অ্যাডজাস্ট টু মাই সিডিউল, আমি রাজি"

টেবিলে রাখা ব্রিফকেস থেকে একগোছা লিগ্যাল কাগজ এগিয়ে বলল "দেন হিয়ার ইজ দ্য কন্ট্র্যাক্ট ফর্ম। মন দিয়ে পড়। ডিনার খেয়ে যাবে?"

"নাঃ... আই হ্যাভ আদার এনগেজমেন্টস"

লিগ্যাল মারপ্যাঁচ তেমন কিছু নেই। রাজীব যা বলেছে, তাই। অ্যানুয়াল রেমুনারেশন এক কোটি কুড়ি লক্ষ। মানে মাসে দশ লাখ সিকিওর্ড ইনকাম। নট এ ব্যাড প্রপোসাল আফটার অল... আজ সিনেমা আছে, অফারস আছে, কালকে নাও থাকতে পারে।

"কোথায় সই করতে হবে?"

রাজীব ডুপ্লিকেট কনট্র্যাক্ট ডকুমেন্ট বার করে বলল "দুটো কপিতেই। একটা তোমার জন্য"

চেক লিখে বলল "হিয়ার ইউ আর... ওয়ান ক্রোর টুয়েন্টি ল্যাখস, অ্যাস আই সেইড"

দেওয়ালি চেকটা দেখল। অ্যাকাউন্ট পেয়ি। যা বলেছে তাই।

"দিস ইজ এ অফিশিয়াল রেক্রুটমেন্ট। সো ইট হ্যাস টু বি হোয়াইট। অবশ্য তোমার ট্রিপস অ্যান্ড ইন্সিডেন্টাল এক্সপেন্সেস, মানে পার্কস, আমরা অন্যভাবে রেমুনারেট করে দেব"

"ইট ইজ এ প্লেসার টু বি অফ সার্ভিস টু ইউ" চেকটা লেদার পার্সে গুঁজে দেওয়ালি বলল।

"আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিটেন ইউ এনি লঙ্গার। বললে না, এনগেজমেন্টস আছে। আমাকেও বিজনেস ডিনারে বেরোতে হবে"

তাজ ল্যান্ডস এন্ড থেকে বেরিয়ে ব্যস্ত ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেসওয়ে। তাকিয়ে আছে সামনের গাড়ির টেল ল্যাম্পে। উইকএন্ডে দু-দুটো অফার! আজ দেওয়ালি ভাবছে জীবনটা কতখানি সত্যি!

সত্যিই তো। রাতের আকাশে তাকিয়ে, তারা গোনার প্রয়োজন নেই। মন্দির, মসজিদ, গির্জায় মাথা ঠুকে চাওয়ারও কিছু নেই। সিনেমার স্ক্রিপ্ট থেকে একটু আলাদা। পরের সিকোয়েন্সটাও অজানা, গল্পটা তো বটেই। শুধু সেই অদৃশ্য স্ক্রিপ্ট-রাইটারের নোটে নিপুণ অভিনয় করে যেতে হবে ভবিতব্যের ডিরেকশনে, লাইফের ফুল লেংথ ফিচার ফিল্ম।

মোবাইলটা বেজে যাচ্ছে। সি এল আই তে উঠেছে দিগ্বিজয় ভট্টাচার্যের নাম। বাজুক। ফোন তুলল না। এখন কথা বলে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। যা করার, সেটাই করবে। ফ্ল্যাটে ফিরে একবার মনে হল রিং ব্যাক করে। যদি এর মধ্যে আর্জেন্ট কিছু ঘটে থাকে... না থাক। লিজাকে ফোন করল "ক্যান উই মিট টুমরো টু ডিসকাস সামথিং ভেরি আর্জেন্ট?"

"সিওর। জয়েন মি ফর ব্রেকফাস্ট অ্যাট মাই প্লেস। উড বি এক্সপেক্টিং ইউ"

চব্বিশ

“থ্যাংক ইউ ফর ইওর কাইন্ড সার্ভিসেস। অ্যাস ইউ আর মোর বিজি উইথ ফিল্ম প্রোডাকশন অ্যান্ড ইন মুম্বাই, উই রিলিভ ইউ ফ্রম ইওর কমিটমেন্টস অ্যাস এ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার অফ আওয়ার গ্রুপ”

ছ্যাঁত করে উঠল পদ্মপর্ণার বুকটা। একদিন হয়ত হওয়ারই ছিল। কিন্তু তিন বছর এক নাগাড়ে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার থাকার পর প্রদীপ গোয়েঙ্কার কাছ থেকে এই মুহূর্তে কথাগুলো আসবে, আঁচ করতে পারেনি। তাহলে কী সত্যিই ফুরিয়ে গেছে! বুড়ো হয়ে যাচ্ছে? গ্ল্যামার কমে যাচ্ছে? নাকি কালের নিয়মে ক্রমশ হারিয়ে যাওয়ার পথে?

সে তো শুধু এই সময়ের উজ্জ্বল তারকা নয়, রাজীবের ঘনিষ্ঠও। নাকি, পুরনো সম্পর্কগুলো শিথিল হয়ে যাচ্ছে? প্রদীপ ব্যবসাদার মানুষ। ইনভেস্টমেন্ট ভালই বোঝে। বিজনেসম্যানের কাছে ব্যালেন্সশিটের চেয়ে বড় কিছু নেই। সেখানেই ভয় - নিজের ভাও কমে যাওয়ার ভয়। এই লাইনে ভাও কমলে, হারিয়ে যাওয়া অনিবার্য। কেউ রুখতে পারবে না।

স্বপ্নপরির মতো তার উত্থান যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে অজানা বাঁকে।‘শান্তির দূত’ সিরিয়াল দিয়ে অভিনয় জগতে প্রবেশ। প্রথম ছবি জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ‘মার্বেল প্লেট’-এ সহ-অভিনেত্রীর ভূমিকায় টলিউডের চোখ পড়েছিল সেই নবাগতার অভিনয় দক্ষতার দিকে। পরে ‘ফেরিওয়ালা’ সিরিয়ালে দর্শকের মনে পাকাপাকি জায়গা, যেন নিজের জীবনকেই বেচতে বসেছে মেহফিলে। শুভ্রজিৎ তখন ধীরে ধীরে উঠছে। তার সঙ্গে জুটি বেঁধে একের পর এক ছবি হিট। উত্তম-সুচিত্রার পর, বাংলা বাজারের হিট পেয়ার। টলিউডের আকাশ ছেয়ে ফেলেছে মায়াবী আকর্ষণে। তামাম বাংলা মাতিয়েছে।

টলিউডে টাকা নেই, তাই বলিউড। কপাল মন্দ, লাগল না। ব্যাক টু হোম। আবার আধিপত্য। কমার্শিয়াল সাকসেসের মাঝে তার নক্ষত্রলোকে আচমকা কর্ণ ঘোষের আবির্ভাব।‘জ্বালা’ ছবিতে অভিনয়ের জন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড। খ্যতি, যশ, প্রতিপত্তি। শুধু গ্ল্যামারাস নায়িকাই নয়, ক্যারেক্টার রোলেও নাম্বার ওয়ান।

শুভ্রজিতের বিচ্ছেদে তিক্ত অভিজ্ঞতা। মুম্বাইতে দ্বিতীয় চেষ্টা। ভাগ্যদেবী মুখ তুলে চাইলেন।‘পত্নী কে রং’‘জীবন মেল’‘জানে ইয়া আনজানে’ - বলিউডের বেলাভূমিতে জায়গা পাকা। শুধু তার কেন, স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ের ভাগ্যের চাকাও একই সঙ্গে ঘুরতে শুরু করল। মাস মাইনের চাকরি ছেড়ে সিঙ্গাপুরে নিজের কন্সাল্টেন্সি। ঠিক একই সময় প্রদীপের সঙ্গে ওদের গ্রুপের চুক্তি।

“ব্যাপারটা আর কিছু নয়। বিজনেসের নিয়ম মোর হ্যপেনিং ফিগার দিয়ে মার্কেট করা, টু ইনক্রিজ দ্য অ্যাট্রাকশন। দেওয়ালি সিমস টু বি মোর ইন ডিমান্ড এভ্রিহয়ার। কান্ট হেল্প। আই হ্যাভ এ বিজনেস টু রান” এটাই স্টারডমের পরিণতি। কিন্তু মেনে নিতে মন চায় না।

“আপনি যা ভাল বোঝেন...” বললেও ভাবছে, হারনো দুনিয়ায় আবার কী ভাবে বিরাজ করা যায়। নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার তাহলে দেওয়ালি। আপকামিং ফেস অফ দ্য সোবিজ ইন্ডাস্ট্রি। স্টারডমের আসনটা নড়বড়ে। বয়সের সঙ্গে নতুনরা জায়গা করে নেয়। সিঙ্গাপুরে কর্তার ব্যবসায় যোগ দিয়ে ঘরসংসার করতেই পারে। সেখানে গ্ল্যামারের চাকচিক্য মরীচিকা। চুম্বকের আকর্ষণ থেকে বেরনো সহজ নয়... রাজীবের অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে ফোন করল এক সময়ের প্রতিষ্ঠিত চিত্র পরিচালক অমিয় মজুমদারকে।

“ফ্রি আছেন? আসতে পারি?”

“চলে এস আমার ফ্ল্যাটে”

রিজেন্ট এস্টেটের ফ্ল্যাটে ঢুকতেই অমিয়বাবুর সাদর আপ্যায়ন “অনেকদিন পরে। কী খাবে, চা না সরবত?”

“বড্ড গরম। সরবত” জিরাপানিতে চুমুক দিয়ে বলল “আপনি অনেকদিন আগে বলেছিলেন না, ছবির স্ক্রিপ্ট লিখেছেন”

“হ্যাঁ অনেকদিন ধরে বসে আছি। প্রোডিউসার পাচ্ছি না। আজকালকার ছেলেদের মতো ধান্দাবাজিও করতে পারি না। এত ভাল ছবি করার পর, এই বয়সে কার কাছে হাত পাতব? বিবেকে লাগে। আমার বোধহয় ছবি করার দিন শেষ হয়ে এসেছে”

“একদম নয়। আমি আপনার ছবি প্রোডিউস করব। আমাকে কিন্তু নায়িকার রোল দিতে হবে”

“বেশ, তাই দেব। স্ক্রিপ্টটা শুনবে? সময় আছে?”

মাথা নাড়ল পদ্মপর্ণা “বাজেট কত?”

“রিসেন্টলি ক্যাল্কুলেট করিনি। আগে করেছিলাম। এক কোটি কুড়ি লক্ষ মতো। এখন অবশ্য দাম বেড়ে গেছে। দেড় কোটি মতো ধরে রাখতে পার”

“নো প্রবলেম”

টাকাটা কোনও ফ্যাক্টর নয়। ফিল্মি অস্তিত্বটাই সব। এখনও এমন বয়স হয়নি যে সিনেমা ছেড়ে দিতে হবে। চেহারাটা একটু ভারী হয়েছে, তাতে কী? মিনি স্কারট নয় না-ই পরল। মেক-আপ লাগালে গ্ল্যামার এখনও আটুট। অভিনয়ে কোনও খামতি নেই। তাহলে সেন্টার স্টেজ ছেড়ে দেবে কেন? যদি নিজেই

প্রোডাকশন করে লাইমলাইটে থাকা যায়... এখনও রিটায়ারমেন্টের সময় হয়নি। অমিয়বাবুর মতো দক্ষ চিত্র পরিচালকের হাতে পড়লে, রাজীবকে বোঝানো মুস্কিল হবে না, তার আসন কোথায়।

“আজ আমি টোটালি ফ্রি। স্ক্রিপ্ট শুনতে তো সময় লাগবে। আমি এখানেই খাব”

“বস। তোমার খাবারের কথা বলে, স্ক্রিপ্টটা নিয়ে আসি”

“কাম ইমিডিয়েটলি। টেক দ্য নেক্সট ফ্লাইট” মৃত্যুঞ্জয়ের ফ্র্যান্টিক কলে ঘাবড়ে গেল পদ্মপর্ণা।

“কেন, কী হয়েছে?”

“স্পন্দনের স্কুলে খেলতে গিয়ে অ্যাঙ্কেলে ফ্র্যাকচার হয়েছে। বোধহয় অপারেট করতে হবে”

“আই অ্যাম অন মাই ওয়ে”

ছাঙ্গি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে বসে মৃত্যুঞ্জয় বলল “আমি একা কদ্দিক সামলাই? আমারও তো বিজনেস বাড়ছে। এবার তোমার ছবির নেশা কমাও। ঘর সংসারের দিকে মন দাও”

পদ্মপর্ণা চুপ। দুনিয়ার গুড বাই মেনে না নিতে চাইলেও, কর্তার আবদার তো উপেক্ষা করা যায় না। সত্যি তো, কতটা সময় দিয়েছে সংসারের জন্য? এত বছর শুধু কেরিয়ার, স্টারডমের পেছনে ছুটেছে। মৃত্যুঞ্জয় বাধা দেয়নি। এখন আর একা সামলে উঠতে পারছে না। এই পনেরো বছরে নীরবে বউয়ের স্টারডমের নেশায় তাল মিলিয়ে সাপোর্ট দিয়ে গেছে। এখন একটু আশা করতেই পারে...

“অপারেশন করতে হবে?”

“তাই তো বলছে। পায় স্ক্রু লাগাতে হবে”

“ও কোথায়?”

“স্কুল থেকে হাসপাতালে ভর্তি করেছি। ওখানেই যাচ্ছি”

স্পন্দন মাকে দেখে ভরসা পেল “মম আই অ্যাম গ্ল্যাড ইউ আর হিয়ার”

“আই উইল বি উইথ ইউ অ্যাস লং অ্যাস ইউ ওয়ান্ট মি”

“দেন ডোন্ট গো ব্যাক টু কোল। আই ফিল সিকিওর্ড হোয়েন বোথ আফ ইউ আর অ্যারাউন্ড”

ছেলের আবদার যেন অন্য সুর শোনাচ্ছে। বহুদিন পর অনুভব করছে, সে কলকাতার গ্লিটজ-এর উজ্জ্বল নক্ষত্র নয়, শুধুই মা। নাই-বা রইল স্টারডম, ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডারের মুখোস। ওই কৃত্রিম দুনিয়ার বাইরেও তো আর পাঁচ জনের মতো একটা জীবন আছে, তার ছোট্ট একটা সংসার। বিয়ে হলেও, মাহাত্ম্য বোঝেনি। আজ অনুভব করছে, অবহেলিত সত্ত্বাকে। এখানেই সে সম্পূর্ণ।

“আই উইল বি উইথ ইউ অ্যাস লং অ্যাস ইউ ওয়ান্ট মি হিয়ার। ইফ নিড বি, পার্মানেন্টলি”

ঠিক করেই ফেলেছে, অমিয়দার ছবিটা শেষ করে, নিজেকে গুটিয়ে আনবে। তার এত বছরের সাজনো বাগান, যেখানে হাজার ফ্ল্যাশের ঝলক নেই। ওই গ্লিটজের বাইরে।

মৃত্যুঞ্জয়কে বলল "সেই ছোটবেলায় কী সুন্দর বাজাতে। এখন কী রেওয়াজ ছেড়ে দিয়েছ?"

"আবার ধরতে পারি, তুমি এখানে থাকলে..."

"ছেলেকে বললাম তো, এখানেই থাকব। আমিও আবার ছবি আঁকায় মন দেব"

মৃত্যুঞ্জয় মৃদু হেসে বলল "বেশ তো। আজ থেকেই তবে আবার রেওয়াজ শুরু করব। রাগ রামকলি"

"এটা কীসের রাগ?"

"প্রত্যুষের, শান্তির রাগ। এখনও সব ভুলে যাইনি"

হাসপাতালের বাইরে, তীব্র গতিতে গাড়িগুলো ছুটছে। সেদিকে তাকিয়ে পদ্মপর্ণার মনে হল, ওরা পাগল। ছোটার কী কোনও শেষ আছে? হাসপাতালের এই কেবিনে স্পন্দনের হাতে হাত রেখে, মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে দাঁড়িয়ে অনেকের মতো আরেক জগৎ হাতছানি দিচ্ছে। এখানে কেউ তাকে চেনে না। শুধু স্বামী, ছেলে আর মেয়ে। এটুকুই যথেষ্ট। এর বাইরের ছুটে চলা দমকা হাওয়া, সব লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। তার থেকে ভোরে উঠে ওর হাতে সেতারের ঝংকার শোনাই ভাল।

মৃত্যুঞ্জয় বুঝতে পেরে পদ্মপর্ণার দিকে তাকিয়ে বলল "তবে কাল থেকে ললিত রাগ দিয়ে শুরু করা যাক"

"সেটা কীসের রাগ?"

"প্রত্যুষের। সেই ছোটবেলা থেকে আলাপ। দেখতে দেখতে বিয়ের পর পনেরোটা বছর পার হয়ে গেল। তোমার ফেরার আশায় থাট কাইফির তালটাও ভুলে যেতে বসেছি"

"কী সব বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না..."

"সাহানা রাগের গ্র্যামার। ওসব ভেবে কাজ নেই। তুমি যে রংমহল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছ, সেটাই বড়। অনেক তো ছোটাছুটি, লাফালাফি হল। এখন স্পন্দনের তোমাকে প্রয়োজন। আর কদ্দিন তোমাকে ছেড়ে থাকবে?"

"ও ভাল হয়ে গেলে আর এক মাস। অমিয়বাবুকে কথা দিয়েছি, ওনার আগামী ছবি প্রডিউস করব। ব্যস... ওটার পর আমি এখানেই"

"সত্যি? নামের এমনই মোহ, সব ছেড়ে আসতে পারবে?"

"কেন পারব না? তোমাকে যখন বিয়ে করেছিলাম, তখন আমি একাই রাজ করছি টলিউডে। সেদিন কী কোনও নামী দামি লোককে চেয়েছি। সেদিনও ছিলাম ছোটবেলায়। আজও আবার ফিরে আসব স্পন্দনের

হাত ধরে। যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল ম্যালে। স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন ছিল ভূপতি নাথ। মাঝখানের রাগগুলো বাদ দিলে, আজকে তো আবার ললিত”

মৃত্যুঞ্জয় বুঝতে পারছে, পদ্মপর্ণা কিছুই ভোলেনি। হয়ত ঠিকই বলছে। স্পন্দনের হাত ধরে ললিত রামকলি হতে কতক্ষণ?

আলতো করে পদ্মপর্ণার হাতে চাপ দিয়ে বলল “ইট ইজ নেভার টু লেট টু স্টার্ট ইয়েট ওয়ান্স এগেন”

পঁচিশ

কাতার এয়ারওয়েজের কলকাতা-হিউস্টন ফ্লাইট। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে দোহায় দু-ঘণ্টা হল্ট।

ঋষিকা কায়দা করে শোভনদার পাশে জানলার আয়েলসের সিটটা দখল করে নিল, অঞ্জনদা ডাইভ দেওয়ার আগেই। এমনিতে তো শোভনদাকে এতটা সময়ের জন্য একা পাওয়া যায় না। এই লং ফ্লাইটে শোভনদার সঙ্গে কিছু কথা সেরে ফেলতে হবে। শোভনের জন্যই তো তার এই বঙ্গ সংস্কৃতিতে গাওয়ার সুযোগ। নইলে এত গায়ক-গায়িকা থাকতে, ঋষিকা সুযোগ পায়? সবটাই লাইনের খেলা। এত গায়িকার মধ্যে সে আর ইমা ম্যানেজ করেছে। কারণ শোভন স্পন্সর। তাই কলকাতার লিটারারি অ্যাম্বাসাডার। যে মালকড়ি ছাড়ে, অ্যামেরিকার বাৎসরিক উৎসবে, তারই সব থেকে বেশি ভেক। বিদিতা বসুর মতো সাংস্কৃতিক উদ্যোক্তারা খুব ভাল করেই জানে।

পঞ্জি কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার পর গোটা রাজ্যে স্পন্সরশিপের খরা। এখন আর সাধারণ মানুষের টাকা নিয়ে ফুর্তি করার জন্য কেউ মালকড়ি ছাড়ছে না। বছরের আসল কামাই, এই ফরেন অনুষ্ঠানের দৌলতে। কলকাতার উদীয়মান সংস্কৃতির হিসেব চল্লিশ বছর আগে দেশছাড়া এনআরআই বাঙালিরা রাখে না। কিছু অতীতের নাম আর স্পন্সরের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী পারটিসিপ্যান্ট ঠিক করা হয়।

“আপনি জানলার ধারে বসবেন?”

“না না, তুমি বস। আমি এখানেই ঠিক আছি” অ্যাটাচিটা সন্তর্পণে ওভারহেড লকারে গুছিয়ে রেখে বলল।

“লং ফ্লাইটের জানলায় বসলে ঘুমিয়ে নেওয়া যায়”

পেছনে ফিরে দেখল, ইমা জায়েগা খুঁজছে। ওই তো, অঞ্জনদার পাশে একটা সিট খালি আছে। ওখানে বসছে না কেন? কে জানে? মরুক গে। ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। যেখানে খুশি বসবে।

ক্রুইজিং হাইটে পৌঁছতে ঋষিকা বলল “তোমার জন্যই এই সুযোগ। থ্যাংক ইউ”

তৃপ্তির হাসি। শোভনের নিজেকে ইম্পরট্যান্ট মনে হল। এই আত্মতৃপ্তিটাই তো বাঁচার পাথেয়। কদরের মধ্যে যে তৃপ্তি আছে, টাকার মধ্যে নেই। ঋষিকার দিকে তাকাল। এখন আর সে শাড়ি পড়ে নয়। এই ভারিক্কি চেহারায় জিনস, টপস মন্দ লাগছে না। তবুও তো গিন্নির থেকে রোগা। মেয়েদের দেহে একটু চর্বি না থাকলে ভাল লাগে? গিন্নির মতোও ধুমসি নয়, ইমার মতো শুটকি নয়। ভালই হয়েছে, ঋষিকার পাশে সিট পেয়ে। নইলে ওই বুড়ো অঞ্জনদার পাশে বসে সারা রাস্তা ধান্দার ইতিবৃত্ত শুনতে হত।

“জামাটা নতুন কিনলে? আগে তো দেখিনি”

“কিছুদিন আগে অ্যাটলানটায় প্রোগ্রাম ছিল, ওখান থেকেই কিনেছি। কলকাতায় তো এসব জামা পরা হয় না। এই বাইরে এলেই যা একটু পরা” ঋষিকার মিষ্টি হাসি।

ভোর সাড়ে চারটে। এয়ার হস্টেস লাইট স্ন্যাক্স সার্ভ করার ফাঁকে ঋষিকা বলল “একটা কথা তোমায় অনেকদিন বলা হয়নি। আমাদের অশ্বিনী দত্ত রোডের তিন তলার ফ্ল্যাটটা বড্ড পুরনো। বয়স হচ্ছে তো, দিনে এতবার সিঁড়ি ভাঙা আর পোষাচ্ছে না। তোমার তো অনেক চেনাজানা। রাজেরহাটে একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করে দিতে পারবে?”

“কটা বেডরুম?”

“তুমি যা পারবে। থ্রি হলে ভাল হয়। অফ কোর্স, লিফট থাকা চাই। বুঝতেই পারছ, টাকাপয়সা বিশেষ নেই। দুজনের গান গেয়ে যেটুকু রোজগার। যত কম দামে...”

ভালই বুঝতে পারছে। বিনা পয়সায় না হলেও মিনিমাম খরচে। ইউসুয়ালি এ সব আবদার পাশ কাটিয়ে যায়। কিংবা স্বভাববশত ভুলে যায়। এখানে তেমন কোনও ফায়দা নেই। নিজের নামের ব্যাপ্তির অবকাশও নেই, যা আছে হিউস্টনের বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে “দেখি চেষ্টা করে”

“দেখি না, করে দিতেই হবে। জানি তুমি চাইলেই পারবে”

শোভন কোনও উত্তর দিল না। ম্যাগনো ইন্ডিয়ার কর্তা বলে কথা। নিজের স্বার্থ ছাড়া, অন্য কোনও ব্যাপারে কতখানি প্রাধান্য দিতে হবে, ভালই জানা।

রিসেপশন কমিটি অপেক্ষা করছিল গাড়ি নিয়ে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা লামারের হোটেল হিল্টনে থাকার ব্যাবস্থা। অন্যান্য পার্টিসিপ্যান্টদের জন্য এক্সিকিউটিভ রুম। শোভনের ম্যাগনো ইন্ডিয়া যেহেতু স্পন্সর, তাই ওর জন্য এক্সিকিউটিভ স্যুইট। সেটাই আজকের সংস্কৃতি। যে টাকা দেবে তার খাতিরই আলাদা। সর্বত্রই স্পন্সরের জয়জয়কার। কোথাও কী সংস্কৃতির সঙ্গে, স্পন্সরশিপের এক অলিখিত মেলবন্ধন আছে? উদ্যোক্তারা স্বীকার না করলেও, অবশ্যই আছে।

শুধু বঙ্গ সংস্কৃতি কেন?

কলকাতা বুক ফেয়ার, এপিজে লিটারারি মিট থেকে জয়পুর লিটারারি ফেস্ট। প্রতিভার থেকে মুখ্য নেট-ওয়ার্কিং আর সুবিধার অঙ্ক। প্রবাসী লেখকদের আমন্ত্রণ করে আনতে পারলে, বিনিময়ে বিদেশের ফেস্টে আমন্ত্রণের সম্ভাবনা। তাই পোড়া দেশের লেখকরা কদর না পেলেও, প্রবাসী লেখকদের কদরই বেশি। আর বিদেশি সাদা চামড়া হলে তো কথাই নেই। সাদা চামড়া দেখলেই ভয় জড়োসড়ো কেঁচো হয়ে পা চাটতে

শুরু করে। দেশ স্বাধীন হলেও মানসিক পরাধীনতায় ক্রীতদাস জাতি কি এর থেকে কিছু বেশি ভাবতে পারে? পারে না। যদি পারত, তবে শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে, নিজের অস্তিত্ব সদর্পে প্রতিষ্ঠা করত। স্বাধীনতার সাতষট্টি বছর পরেও হিসেবটা সেই এক।

ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন আর স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ। না হলে, বাঙালি কী তাদের মনে রাখত? না তাদের ভজনা করে নিজেদের হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় লেগে থাকত! দেশে সম্মান পেতে গেলে আজও বিদেশিদের স্বীকৃতিই সব।

দ্য জর্জ আর ব্রাউন কনভেনশন সেন্টারের থার্ড ফ্লোরে এ বছরের বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, থুড়ি উৎসব। এলাহি আয়োজন। সংস্কৃতির ঝর্নার চেয়ে সাজ-বাহার বন্যাই বেশি। বড়লোক বাঙালি অ্যামেরিকানরা উইক এন্ডে বং-কানেকশনটা ঝালিয়ে নিতে এসেছেন। উপনিবেশের পত্তনকালে কলকাতার বাবুদের হপ্তাশেষের আমোদ মনে পড়ে... চল্লিশ বছর আগে দেশ ছাড়া বাঙালিরা আজকের বিবর্তিত কৃষ্টিকে না জেনে সেই অতীতকে আঁকড়ে বাঙালিয়ানা বজায় রাখতে চাইছেন। পরের জেনারেশন তো আর বাংলার তোয়াক্কা করে না। বৈভবের মধ্যে অস্তিত্বকে ফিরে পাওয়ার মহোৎসবে মত্ত।

এক ফাঁকে শোভন অঞ্জনদাকে এক কোণে গিয়ে বলল "আমার 'নতুন রূপে বিবেকানন্দ' বইটার ওপর সেমিনার আছে। আমি তো বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছুই জানি না..."

"সে জন্যে তো আমি আছি। ফ্লাইটে তোমার পাশে বসতে চেয়েছিলাম, পুরো ব্রিফ করার জন্য। কিন্তু ঋষিকা আগেভাগে ওখানে গেঁড়ে বসল বলে, আর হয়ে উঠল না..."

"তাহলে?"

"প্রোগ্রামের ফাঁকে ব্রিফ করে দেব। সুবিধামত ডেকে নিও"

"ইমাকে দেখছি না। ও কোথায়?"

শোভনের প্রশ্নের উত্তরে অঞ্জনদা বলল "কী করে বলি? নিশ্চয়ই অরগ্যানাইজারদের সঙ্গে ধান্দা করছে"

অঞ্জনদার উন্নাসিকতায় খটকা লাগলেও, ভাবার অত সময় নেই। অন্যান্য স্পন্সরদের সঙ্গে একটা স্পেশাল ডিনারের আয়োজন করেছে অরগ্যানাইজাররা। জগৎজং, পিএফপি টেজনলজি এরা সব থেকে বেশি দিয়েছে, তাই কোহিনুর স্পন্সর। তারপর ম্যাগনো এবং অন্যান্যরা প্ল্যাটিনাম স্পন্সার। পরে সোনা, রুপো আরও নানাবিধ অলঙ্কারে স্পন্সররা নামাঙ্কিত। এত হিরে-মাণিক যদি দেশের কোনও কাজে লাগত। আধমরা ইকনমির উঠোনে দাঁড়িয়ে অনেক না হোক, কিছু তো করা যেত। তাতে কার কী? দেশের উন্নতি হল, কি না হল, এনআরআইদের কী কিছু যায় আসে? মাঝেমধ্যে দেশে গিয়ে পরিচিতিটা ঝালিয়ে নেওয়া আর দামি

লাইফস্টাইল মাফিক বিদেশের মাটিতে বং সং এনজয় করার মধ্যেই তাদের দেশাত্মবোধ। রাবিন্দ্রিক চর্বিতচর্বণে জাতে ওঠা।

বিবেকানন্দ শিকাগোতে কবে কটা লেকচার দিয়েছিলেন, জানার দরকার নেই। নিদেনপক্ষে, পারলামেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নসে লেকচার দিয়ে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, এটুকুই কাফি। বিচক্ষণ কিছু মানুষ হয়ত ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ ডেটটা জানতে পারে। তাহলেই বিবাকানন্দকে জেনে প্রকৃত বাঙালি হওয়া যাবে। এই ফাস্ট লাইফে কার এত সময় আছে, বিবেকানন্দর নটা ভল্যুম পড়ার, বোঝার? সেদিন অ্যামেরিকা জয় করে বিখ্যাত হয়েছিলেন এক বাঙালি। নামটাই কাফি। স্বামী অভেদানন্দ কে? মিশনে দীক্ষিত কিছু শিষ্য হয়ত বলতে পারবেন।

বেঁচে থাকলে বিবেকানন্দকে কীসের মুকুট পরাতেন? কোহিনুর তো এখন স্পন্সরশিপ আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রানিসাহেবার তহবিলে গচ্ছিত। ওনাকে কী ভূষণ দিতেন, কে জানে? অন্তরের জহরতের কী কোনও মূল্য নির্ধারণ করা যায়? তবুও ডলারের থলি নিয়ে তাকে সাজাতে হয়। সংস্কৃতি তাই নিলামের পণ্য। মাল ছাড়, সাংস্কৃতিক উত্তরণ অনিবার্য। আজকের যুগে থাকলে বিভূতিভূষণ বোধহয় সাহিত্যিক তকমা পেতেন না। ভাগ্যিস উনবিংস শতাব্দীতে এসেছিলেন, তাই একশো বছর পরেও তাঁকে ভাঙিয়ে টু-পাইস কামানো যায়। আজ ভাঙাবার লোকও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

শোভন হারিয়ে গেল স্পন্সরদের ডিনারে। অঞ্জন মিশে গেল রাজীবের সঙ্গে, লাইন ফিট করতে। শ্রেয়া ঘোষাল আর আমজাদ আলি খান ছাড়া, অন্যেরা গুণের চেয়েও যোগাযোগে অলংকৃত।

ব্রাউন কনভেনশন সেন্টারের থার্ড ফ্লোরে কানাঘুষো চলছিল। কিছুক্ষণ পরেই ওপেন অ্যানাউন্সমেন্ট "আমাদের এই সম্মেলনের বিশিষ্ট শিল্পী ইমার খয়রি রঙের লেদার হ্যান্ডব্যাগটা পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ যদি কোথাও কোনও হ্যান্ডব্যাগ খুঁজে পান, দয়া করে ফ্রন্ট অফিসে যোগাযোগ করুন"

উদ্যোক্তাদের একজন, বিদিতা বসু ইমাকে জিজ্ঞেস করছে "কোথায় রেখেছিলে? মনে পড়ছে?"

"হাতেই তো সবসময় থাকে। আজও ছিল। অনেকের সঙ্গেই কথা বলছিলাম। কোথায় যে রাখলাম, খেয়াল করতে পারছি না" ইমার কাঁদো কাঁদো মুখ।

"কী ছিল ব্যাগে?"

"ইউসুয়ালি যা থাকে। কার্ডস, চিরুনি, মেকআপ কিট আর কিছু ডলার"

"পাসপোর্ট?"

"না, সব জায়গায় নিয়ে ঘুরব না বলেই ওটা হোটেল রুমে রেখে এসেছি। কী যে হবে, ওটা না পেলে। আমার হাতে কোনও ডলার নেই। শপিং-এর কথা তো ছেড়েই দিলাম"

“কোথায় আর যাবে? চিন্তা করো না। ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে। তুমি রিল্যাক্স কর, আমি দেখছি”

“কী করে করব? এই বিদেশ বিভুইয়ে হাতে তো কিছুই নেই”

“অত ভাবছ কেন? উই আর দেয়ার টু হেল্প ইউ”

বিদিতার ভয়, টেনশনে ইমা প্রোগ্রাম না নষ্ট করে ফেলে। ইন্ডিয়া থেকে খরচ করে এত আর্টিস্ট এনেছে একটা উইক এন্ডের জন্য। সব কিছু পারফেক্ট না হলে হাজার বদনাম। বিদিতা ব্যাগের সন্ধানে লেগে পড়ল।

ইমার আনন্দটাই মাটি। কারো সঙ্গে ঠিকমত কথা বলতে পারছে না। কেউ আবার সহানুভুতি জানিয়ে যাচ্ছে, অনেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এক ফাঁকে সাবেকি টাঙাইল জড়ানো ঋষিকা ইমার কাছে এসে বলল “কোথায় ফেলেছ? পেলে?”

মুখটা করুণ “না দিদি। ওরা তো খুঁজছে। কোথায় রেখেছি, খেয়াল করতে পারছি না”

“কোথায় আর যাবে? এই সেন্টারেই কোথাও আছে। চিন্তা করো না, পেয়ে যাবে”

মুখে সান্ত্বনা দিলেও, মনে মনে খুশিই হল। টেনশনে ইমা তেমন পারফর্ম করতে পারবে না। সে অনুষ্ঠান মাতিয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এই কম্পিটিশনের বাজারে টিকে থাকতে গেলে যতটা আপার হ্যান্ড পাওয়া যায়। পরের বারে এখানে আসার সম্ভাবনা বাড়বে। সবাই তো সেই এক গান নিয়েই বাজার জমানোর চেষ্টা করছে। এই ট্র্যাকেই তো আসল খেলা। দেশে আর কটা ফাংশন, ক’টাকাই বা পায়? বাজারে দেনা। এক বাংলাদেশি শাড়িওয়ালার কাছে লাখ টাকার ওপরে। সেলিব্রিটি বলেই ধারে দিয়েছে। ইদানীং নানান অজুহাতে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। শেষমেশ কিছু তো ছাড়তেই হবে।

অনেক খুঁজেও ব্যাগটা পাওয়া গেল না। শেষে হয়রান হয়ে বিদিতা বসু বলল “তন্ন তন্ন করে তো খোঁজা হল। পাওয়া যাচ্ছে না” ভরসা দিয়ে বলল “এখানে তো কেউ নেবে না। কিন্তু গেলটা কোথায়?”

“এখন কী করি?” মুখ চুন ইমার।

“কী আর করবে? আমরা কিছু টাকা ডলার দিয়ে দেব”

“আপনারা আর কত দেবেন? হাত খরচ। ব্যাস। এখানে তো আসা হয় না। ভেবেছিলাম বাবা-মা-ভাই-বোনেদের জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাব”

“এক্কেবারে চিন্তা কর না। তোমার যা ইচ্ছে কেন। উই উইল বেয়ার অল ইওর এক্সপেন্সেস। খালি ভাল করে গানটা করো”

পুরনো জুটি। বিদেশের মাটিতে দুজনেই ধান্দায় ব্যস্ত। রাবীন্দ্রিক মহিলা সংসর্গ নিয়ে কিছু বলতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। পরের বার বং সং থেকে ছাঁটাই হওয়ার সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথকে ভুলভাল বিক্রি

করে ইয়ারলি হলিডে খোয়াতে চায় না অঞ্জন। ভালই জানে কোথায় কতটুকু পাড়তে হবে। তার থেকে রাজীবকে তার বই বিক্রির কাজে সহায়তা করাই ভাল। শুধু সময়মতো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে 'লিটারারি মিট'-এ নিজের বক্তব্যটুকু রাখা।

বিদিতা বসু রাজীবের দিকে এগিয়ে বলল "লিটারারি মিটের পর, সব বরেণ্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন?"

"নিশ্চয়ই"

রাজীব জানে, বিদিতা নতুন পাবলিশিং হাউস খুলেছে। ওর বিজনেস দরকার। ওদের দিয়ে পাবলিসিটি করিয়ে যদি কিছু লেখা বাগাতে পারে, তা হলে হাউজের একটা সম্ভাবনা আছে। পাবলিসিটিতেও কাজে লাগবে। সৃষ্টির উৎকর্ষ বুঝতে অক্ষম কর্পোরেটকে নামী সাহিত্যিকদের পাশে দাঁড় করাতে পারলেই লাভের সম্ভাবনা। প্রতিষ্ঠান-পুষ্ট ছাঁচে গড়া সাহিত্যিকরাই তো আজকের নক্ষত্র। লেখার মান নিয়ে কিছু বলতে যাওয়া মানেই একঘরে হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রবাসী বিদিতার অবশ্য সাহিত্যের মান ঠাহর করা সম্ভব নয়। যারা এই আপাত চাকচিক্যে গৌরবান্বিত, তারা কী করে জানবে ভেতরের রহস্য? প্রতিষ্ঠানের হয়ে লিখতে গেলে অনেক দায়বদ্ধতা। নির্দিষ্ট সময় লেখা শেষ করতে হবে। ওদের ভাষাই বলতে হবে। ওদের ভাবনায় ভাবতে হবে। না হলে, ছাপা হবে না। প্রতি বছর গণ্ডা গণ্ডা লেখা দিতে হলে, তথ্যগত ভুল অনিবার্য। সাহিত্য করতে গেলে তো প্রচুর খাটতে হয়। অন্তত বিদেশের প্রথম সারির সাহিত্যিকরা সেভাবেই চলেন।

বিদিতা আর পাঁচটা এনআরআইয়ের মতো এদের পাশে দাঁড়িয়েই ধন্য। পরিচয় করিয়ে দিয়ে রাজীবও, বাৎসরিক বিদেশ ভ্রমণের নিশ্চিত আশ্বাস পেয়ে। স্তাবক হিসেবে নিজেকে শিল্পিত করে ধ্রুপদী মাত্রায় পৌঁছনই তার লক্ষ্য।

"আর যদি কিছু প্রয়োজন হয়, বলবেন। আমি আপনার পাশে সব সময়ই আছি" রাজীব প্রত্যেকের সঙ্গেই ভদ্র।

"আপনি পাশে থাকলে আমার কোনও চিন্তা নেই"

ঋষিকার আশা অপূর্ণ থেকে গেল। ব্যাগ হারানোর পরেও ইমার রেওয়াজি গলার পারফরম্যান্সে কোনও খামতি নেই। অন্যান্য বারের থেকে ভাল। ঋষিকাকে ছাপিয়ে গেল ওর তরুণ সুরেলা আওয়াজ। জেতার আশা নিয়েও, থামতে হল।

বিদিতা কথা রেখেছিল। ইমার হাতে বেশ কিছু ডলার গুঁজে বলল “মনের আনন্দে শপিং কর, ডলারের চিন্তা করতে হবে না। এই উৎসবে আনন্দ করতে এসেছ, প্রাণ ভরে আনন্দ কর। উই আর হিয়ার টু মেক এভ্রিওয়ান হ্যাপি”

“ভীষণ গিল্টি লাগছে। হঠাৎ এই ব্যাগটা হারিয়ে”

“ডোন্ট ওয়ারি। ইওর পারফরম্যান্স ওয়াজ এক্সিলেন্ট। এনজয় ইওর স্টে ইন হিউস্টন”

ইমা দেবাশিসকে বলল “আমি তো হিউস্টনের কিছুই চিনি না। তুমি তো কিছুদিন আগেই ঘুরে গেছ। শপিং করব, সঙ্গে যাবে?”

যদি ও তার ট্রুপের সঙ্গে নাটকের আগে ফাইন্যাল টাচ-আপ বাকি, তবুই মার আবদার ফেলতে পারল না। গে সনার রোড থেকে মেমরিয়াল সিটি মলে পৌঁছতে বেশি সময় লাগে না। দেবাশিস আগের বারও ঘুরে গেছে। পকেটে রেস্ত কম থাকায় তেমন কিছুই কেনা হয়নি। তবুও... এত বড় মল। ঘুরে ঘুরে দেখার চার্ম-ই আলাদা।

লক্ষ করছে ইমা দুহাতে শপিং করে যাচ্ছে। ডিসাইনার ড্রেস থেকে বাচ্চাদের খেলনা, বয়স্কদের জন্য জামাকাপড়। অভাবের সংসারে আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনেক আশা নিয়ে থাকে। ওদের আনন্দ দেখলে মনটা ভরে যায়, কদরও বাড়ে। একমাত্র ইমা ছাড়া, আর কেউ তো ফ্যামিলিতে তারকা হতে পারেনি। দেবাশিসও ওদের সঙ্গেই এসেছে, পকেটে অত ডলার নেই। ইমা পেল কোত্থেকে! বিশেষ করে ব্যাগ হারনোর খবরটা শোনার পর, হিসেব মিলছে না।

কিছুটা ঘুরে বলল “টায়ার্ড লাগছে। তুমি ঘোর, আমি একটু জিরিয়ে নিই” অসংখ্য লোকের আনাগোনা। কতক্ষণ পার হয়ে গেছে, খেয়াল করেনি। সম্বিত ফিরল এক কোনায় লোকের ভিড় আর সোরগোল শুনে।

“সি ইজ ওয়ান ইন্ডিয়ান লেডি। ওহ মাই গস, সি ইজ ব্লিডিং। উই হ্যাভ টু টেক হার টু হস্পিট্যাল”

‘ইন্ডিয়ান লেডি’ শুনেই ওই ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গেল। ভিড় ঠেলে কাছে যেতেই দেখল, ইমা একরাশ রক্তের মধ্যে পড়ে আছে। কী হয়েছে? এত রক্ত কেন? বেঁচে আছে তো? অ্যামেরিকায় যত্রতত্র গুলি গোলার কাহিনি অজানা নয়। তবে কি কেউ স্যুট করেছে? ব্যথায় কাতরাচ্ছে ইমা। জিনস-টপস রক্তে ভেসে গেছে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সে তো ছাই এ জায়গার হালচালও জানে না।

বিদিতাকে মোবাইলে ধরল “মেমরিয়াল সিটি মলে ইমার সঙ্গে শপিং-এ এসেছিলাম। কী হয়েছে ঠিক জানি না। পড়ে গেছে, ব্যথায় কাতরাচ্ছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে”

“আমি এক্ষুনি আসছি”

বিদিতা পৌঁছনোর আগেই হারমান্যান মেডিক্যাল সেন্টারের ট্রমা টিম পৌঁছে গেছে। স্ট্রেচারে ইমাকে তুলছে। সঙ্গে দেবাশিস। বিদিতা অ্যাম্বুলেন্সকে ফলো করে লেভেল ওয়ানে পৌঁছে গেল। ওরা ইমাকে রিসাসিটেশন রুমে নিয়ে গেছে। বিদিতা রিসেপশনে রেজিস্টার করাচ্ছে।

ওদের জিজ্ঞেস করল "ইজ সি ইন্সিওরড?"

"সি ইজ ফ্রম ইন্ডিয়া। সি হ্যাস কাম টু অ্যাটেন্ড এ কনফারেন্স অ্যাট দ্য জর্জ আর ব্রাউন কনভেনশন সেন্টার। উই অরগ্যানাইজারস হ্যাভ কভারড অল দ্য গেস্টস অ্যাটেন্ডিং দ্য কনফারেন্স। হোয়াট হ্যাপেন্ড?"

"আই ডোন্ট নো। দ্য ডক উইল বি উইথ ইউ ইন এ মোমেন্ট অ্যান্ড এক্সপ্লেন এভ্রিথিং"

"কী হয়েছিল?" বিদিতার প্রশ্ন।

"ঠিক জানি না। ও ঘুরে ঘুরে শপিং করছিল। আমি টায়ার্ড হয়ে রেস্ট নিচ্ছিলাম। সন্ধেতে প্রোগ্রাম আছে বলে বেশি স্ট্রেন নিতে চাইনি" দেবাশিস ভ্যাবাচ্যাকা...

আধ ঘণ্টা পর ডাক্তার এসে বলল "ডোন্ট ওয়ারি। এভ্রিথিং ইজ ফাইন অ্যান্ড আন্ডার কন্ট্রোল। সি জাস্ট হ্যাড অ্যান অ্যাবরশান। সি উড বি ফাইন"

অ্যাবরশান! অবিবাহিত মেয়ের অ্যাবরশান!! আকাশ থেকে পড়ল দুজনেই। একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে। আজকের মেয়েদের কাছে ইন্টারকোর্সটা কোনও ব্যাপারই নয়। আগের থেকে অনেক বেশি ফ্রি, আনহিবিটেড। কিন্তু প্রিকশন না নিয়ে! আর প্রেগেনেন্সি হলেই বা? অ্যাবরশন না করিয়ে এতদূর অ্যাটেন্ড করতে আসা।

ডক্টর অবশ্য রিঅ্যাসিওর করেছে "আর্লি স্টেজেস। সো দ্য অ্যাবরশন উইল হ্যাভ নো আফটার এফেক্টস"

বিদিতা মেডিক্যাল আফটার এফেক্টস-এর কথা ভাবছে না, ভাবছে সামাজিক রিঅ্যাকশনের কথা। কলকাতায় হলে, ইমা কী ভাবে হ্যান্ডেল করত জানে না। কিন্তু হিউস্টনে সম্মেলন চলাকালীন - ভাবতেই পারেছে না।

দেবাশিস বলল "যেটুকু জানলাম, শপিং করে লাগেজ নিয়ে আসার সময়, ক্যারিকেসে ধাক্কা লেগে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়"

বিদিতা ভাবছে, ভাগ্যিস কনভেনশন সেন্টারে হয়নি। হলে কী যে কেলেঙ্কারি হত, চাপা দেওয়াও যত না। লোকে ঠিক বুঝে যেত। শপিং মলে যখন হয়েছে, যা হোক একটা গল্প বলে দেওয়া যাবে। ওরা ডে কেস অবসারভেশনে রেখে ছেড়ে দিল। ইভিনিং-এ প্রোগ্রাম আছে বলে দেবাশিস আগেই কেটে পড়েছিল। বিদিতা ইমাকে হোটেলের রুমে দিয়ে কনভেনশন সেন্টারে ফেরত এল।

ঋষিকা এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করল "ইমাকে দেখছি না। ওর হ্যান্ডব্যাগ পেয়েছে?"

"ও শপিং করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছিল। হসপিটালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। এখন ভাল আছে। হোটেলের ঘরে রেস্ট নিচ্ছে। ডক্টর বলেছে, সি সুড হ্যাভ রেস্ট নাউ। নট টু বি ডিস্টার্বড" একটু থেমে বলল "ব্যাগটা পাওয়া যায়নি"

কনফারেন্স শেষে বিদিতাই ইমার ব্যাগ গুছবার ভলান্টিয়ার করতে, ইমা বাধা দিল "না... না... আমিই গুছিয়ে নিতে পারব"

"তোমায় একটু হেল্প করি..."

"আমি নিজেই পারব। এখন অনেক বেটার ফিল করছি"

সাহস হল না জিজ্ঞেস করতে, ডাক্তার কী বলেছে? বুঝতেই পারছে, অঞ্জনদার রাতের অপকীর্তি খালাস হয়ে গেছে।

মাতৃত্ব এসেও ধরা দিল না। অজন্মা শিশুটিও জানে কখন কোথায়, কার উত্তরসূরি হয়ে, পৃথিবীতে আসতে হবে। নিজের ঝোঁকে ইমা ভুলে গেলেও, সে জানে, কোথায় তার শান্তি। কোন পরিচয়ে সে বড় হয়ে উঠবে। ভূমিষ্ঠ না হওয়া শিশুও অলিখিত বিধানে জন্মের পটভূমি ঠিক করে নেয়।

তাড়াহুড়োয়ে একগাদা জিনিস সুটকেসে ঠাসার সময় বোধহয় ভালভাবে লক করেনি। হোটেলের পোর্টার, লাগেজ টানতে গিয়ে, লকটা খুলে, কিছু সরঞ্জাম, উপচে পড়ল। সেগুলো যথাস্থানে তাড়তাড়ি গোছাতে গিয়ে ইমা এতই ব্যস্ত, লক্ষ করেনি, বিদিতা করিডরে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে।

ইমা না দেখলেও বিদিতা খেয়াল করল, ইমা সন্তর্পণে হারানো হ্যান্ডব্যাগটা ঢুকিয়ে ঠিকঠাক বন্ধ করছে। আর যাতে না খোলে।

ব্যাগটা তাহলে হারায়নি!

ছাব্বিশ

প্রকাশ ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, কী করবে? শুধু সে নয়, তার সঙ্গে আরও পঞ্চাশ জনের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে। কোথায় যাবে? প্রত্যেকের সংসারই তো তার মুখ চেয়ে বসে। সোজা কুট্টিকে ফোন "সৌগত ইজ অ্যাবস্কন্ডিং। মনু ঘোষ অ্যান্ড বিমান হ্যাভ লেফট। দ্য চ্যানেল ইজ অ্যাবাউট টু ক্লোজ। উই আর আউট ইন দ্য স্ট্রিটস। ইফ ইউ গিভ আস দ্য সাপোর্ট, উই আর স্টিল কেপেবল অফ রানিং দ্য চ্যানেল"

"লেট মি চেক উইথ মাই বস। উইল কল ইউ ব্যাক" চ্যানেল এক্স-এর সিএফও কুট্টি সময় চাইল।

শেষমেশ চেন্নাই থেকে কুট্টির ফোন "উই আর কামিং। লেটস ডিসকাস হাউ উই ক্যান স্যালভেজ দ্য চ্যানেল"

এই ডামাডোলের মধ্যে কিছু প্রভাবশালী লোকের সাহায্যে ধূর্জটি রায়ের সিনে আগমন। সৌগত দত্তকে ফিরিয়ে এনে, দেনায় ডোবা চ্যানেলের ২০% নামমাত্র দামে কিনে নিল ধূর্জটি। কিন্তু ৮০% শেয়ার তো চ্যানেল এক্স-এর। অত টাকা তো ওর নেই। তাতে কী? কব্জির জোর তো আছে। নিজস্ব বাহিনী দিয়ে চ্যানেল এক্স-এর লোকদের ঠেকিয়ে দিল। স্ট্রেট হাইজ্যাক। সৈকতকে সিইও করে বাংলা টিভির কতৃত্ব হাতে নিল। নতুন অধ্যায়।

লস এঞ্জেলসে যাবে। কলকাতায় এলেও কাউকে জানায়নি দেওয়ালি। লাস্ট মিনিট শপিং। প্যান্টালুন্স থেকে ডিসাইনার বুটিক। হলিউডে যখন চান্স পেয়েছে, নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ান ক্যারেক্টার। ওখানে মনের মতো ড্রেস পাবে কি না কে জানে। ইন্টারন্যাশনাল এরিনাতে হয়ত ভারতীয় মাধুর্য ফুটিয়ে তুলতে হবে। শুধু চেহারায় নয়, পোশাকেও। খবরটা চেপে গেছে। গিয়ে দেখা যাক, ব্যাপারটা কী। সময় মতো লোকে ঠিকই জানতে পারবে। সব কিছু ভুলে মন প্রাণ জুড়ে স্বপ্ননগরী হলিউড। অনেক পরিশ্রম করতে হবে, খুব ভালভাবেই জানে। এই সিন্সিয়ারিটিই তার পাথেয়।

এক ফাঁকে দেবাশিসদাকে ফোন "কলকাতায় এসেছি। তুমি বলেছিলে না বিশেষ কথা আছে। যখন বলবে দেখা করতে পারি। প্লিজ কাউকে জানিও না, আমি কলকাতায়"

"সে নয় জানাব না। আজ হবে না, অ্যাকাডেমিতে আমাদের শো আছে। কাল সকালে ফ্রি আছ?"

"চলে এস না আমার ফ্ল্যাটে। দশটার পর প্লিজ... একটু হেলতে দুলতে উঠব"

"ঠিক আছে। এগারোটা নাগাদ পৌঁছচ্ছি"

বিকেলে কিছু কাজ আছে। একবার পালিত স্ট্রিটে যেতে হবে, অনামিত্রার বুটিকে। গত উইকে যে নতুন দুটো ড্রেস করতে দিয়েছিল, পরশু নিয়ে এসেছে। অন্য কাজের ভিড়ে ট্রাই করে দেখার সময় পায়নি। আজ সকালে ট্রাই করতে গিয়ে দেখল, ফিটিংটা ঠিক হয়নি। কোমরটা একটু টাইট। ব্রেস্টের কাছে ঢলঢলে। ঝুঁকলেই প্রায় সবটা দেখা যাচ্ছে। চার্ম থাকবে না। দুটো ড্রেসেরই এক অবস্থা। রিঅ্যাডজাস্ট করতে হবে।

"হ্যালো অনামিত্রাদি। পরশু তোমার কাছ থেকে যে ড্রেসগুলো এনেছি সেগুলো ফিটিং হয়নি"

"কী হয়েছে?"

"কোমরটা বড্ড বেশি চাপা, বুকটা ঢলঢলে। আজকে বিকেলে ফ্রি আছ?"

"ক'টায় আসতে চাও? আমার একটা বুক লঞ্চ আছে, সাউথ সিটির স্টারমার্কে। সাড়ে সাতটার মধ্যে আশা করি শেষ হয়ে যাবে। আটটা নাগাদ চলে এস। অসুবিধা আছে?"

"নাঃ। পাক্কা আটটায় পোঁছব"

অনামিত্রাদিও সেলিব্রিটি। এমন কিছু পেটোয়া লোককে মিডিয়া করেই থাকে। হলুদের গুঁড়োর মতো বুক লঞ্চ, ডিবেট থেকে যে কোনও পেজ থ্রি প্রোগ্রামে অনামিত্রাদি প্রায় এভ্রি ইভিনিং কোথাও না কোথাও আছেই। ভাগ্যিস আজকে বুক লঞ্চ। তাড়াতাড়ি ফিরবে। নইলে হায়াত বা তাজে কোনও পার্টি সেরে ফিরতে অনেক রাত। ওর বুটিকের অন্যদের দিয়ে হবে না।

ঠিক আটটায় যখন গুরুসদয় রোডে পৌঁছল, অনামিত্রাদি গাড়ি থেকে নামছে। দেওয়ালিকে বলল "জাস্ট ইন টাইম, কাম ইন। আই হোপ দ্য আদার গার্লস হ্যাভেন্ট লেফট। আই হ্যাভ টু এক্সপ্লেন টু দেম, টু মেক নেসেসারি করেকশন ইন ইওর প্রেসেন্স। আই অ্যাম সো সরি"

মেয়েগুলো যাব যাব করে পাততাড়ি গোটাচ্ছিল। অনামিত্রাদি হ্যান্ডব্যাগটা এক কোণায় নামিয়ে বলল "উড ইউ মাইন্ড পুটিং ইট অন সো দ্যাট আই ক্যান সি দ্য প্রবলেম"

"নট অ্যাট অল" দেওয়ালি ড্রেসগুলো নিয়ে চেঞ্জিং রুমে ঢুকল।

সত্যি, লো কাট ড্রেসটার ওপরটা একটু বেশি লুজ। একটু ঝুঁকলেই বুকের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। অবশ্যই টাইট করে দিতে হবে। কোমরের অংশটা খুব চাপা লাগছে না। তবুও দেওয়ালি যখন আনকমফরটেবল ফিল করছে, একটু লুস করে দিলেই হবে। টেপ দিয়ে পাছার মাপটা নিয়ে বলল "এটা ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ। একটু লুস রেখো। পাছাটা প্রমিনেন্ট হলে মুখের দিকে কেউ তাকাবে না"

মেয়েদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে, অফিসের অ্যানেক্সে গিয়ে বলল "একটু ওয়াইন চলবে। আই অ্যাম ডাইং ফর এ ড্রিঙ্ক"

"অল্প, অনেক কাজ পড়ে আছে..."

"এটা টেইস্ট করে দেখ" অ্যানেক্সের বার ক্যাবিনেট থেকে বোতলটা বার করল "ঝাম্পা লে অ্যামর ব্রুট রোস। আগে কখনো খেয়েছ?"

"নাঃ... নামও শুনিনি"

"এটাই সব থেকে দামি ইন্ডিয়ান ওয়াইন"

চুমুক দিয়ে দেওয়ালি বলল "অনেকটা স্যাম্পেনের মতোই"

"এক বন্ধু নাসিক থেকে এনে দিয়েছে। নাসিকের কাছেই ডিস্টিলারি। কী যেন নাম? হ্যাঁ... হ্যাঁ... মনে পড়েছে... মুকনে ড্যাম" ওয়াইনে চুমুক দিয়ে বলল "এখন কী এখানেই?"

সেলিব্রিটিদের ওরকম দু-একটা ফ্রেন্ড থাকে। সবাই সে কথা জানে। বয়ফ্রেন্ড আছে কি না, সেটা বড় কথা নয়, বয়ফ্রেন্ড চেঞ্জ হয়ে নতুন কেউ এসছে কি না, সেটাই পেজ থ্রি পার্টির গসিপ। এক সময় ইন্টারেস্টেড থাকলেও, এখন অবকাশ নেই। কিছু করার না থাকলে ঘরে শুয়ে বই পড়তে ভালই লাগে। না হলে সেই এক মুখ, এক কথা, সাজগোজ, একই দেঁতো হাসি হাসতে আর ভাল লাগে না। যাদের ট্যাবলয়েডের পেজ থ্রি-তে ছবি বার করার শখ আছে, তারাই এসব পার্টির রেগুলার কাস্টমার।

"না... না... তোমায় তো বললাম। কিছুদিনের মধ্যেই মুম্বাই ফেরত যাচ্ছি। এবার যে এসেছি কাউকে জানাইনি। তোমার ড্রেসগুলো পছন্দ বলেই যখনই আসি, কিছু করিয়ে নিয়ে যাই। তাছাড়া মুম্বাই-এর ডিসাইনার ড্রেসগুলো অ্যাফরড করতে পারি না। টু এক্সপেন্সিভ, কোটিপতিদের জন্য"

"এখন তো মুম্বাইতে ঢুকে পড়েছ। কিছুদিনের মধ্যেই তুমিও কোটিপতি হয়ে যাবে"

"কোটিপতি তো তুমি আমি আমি দুজনেই। বলা উচিত ছিল, কোটি কোটি পতি। অত টাকা আমার কোথায়?"

"হবে হবে, সব হবে। জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি"

ন'টা নাগাদ বেরিয়ে এল। অনামিত্রাদিরও রেস্ট দরকার, ড্রাইভারকেও ছাড়তে হবে। মেনল্যান্ড চায়না থেকে ডিনার কিনে ফিরল। জামাগুলো দলা করে ওয়ার্ডরোবে ফেলেই বাথরুমে ঢুকে গেল। আগে স্নান করে ফ্রেস হয়ে নেওয়া যাক।

বিবস্ত্র দেওয়ালি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে বাইরে তাকিয়ে আছে। আলো-আঁধারির খেলা দেখতে বেশ লাগে। ছটফট করছে মনটা। এখন আর অনামিত্রাদির মতো আলো ঝলমলে রঙিন মেকি সাজানো নাইট লাইফ ভাল লাগে না।

দেবাশিস এল সাড়ে এগারটায়। সোফায় গা এলিয়ে বলল "কাল নতুন নাটকটায় হিউজ অ্যাপ্লজ পেয়েছি। তুমি কদ্দিন?"

"কয়েকদিন পরেই মুম্বাই ফেরত যাব" হলিউডের খবরটা ইচ্ছে করেই চেপে গেল "তুমি কী বলবে বলেছিলে দেখা হলে..."

"ছবিটা তো রেডি। আগস্টে রিলিজ করবে। আশা করি সে সময় থাকবে। ব্যাপারটা অন্য। তুমি তো জান, ছবি করা আমার প্রধান কাজ নয়। ওটা ওয়ান অফ। আমি নাটকের মানুষ, ওটাই আমার দুনিয়া, ওটা নিয়েই বড় হয়েছি। বেশ কিছুদিন ধরেই অমর্ত্যর সঙ্গে আমার এই নাটকে নিয়ে মনোমালিন্য চলছে"

"ঠিক জানি না"

দেবাশিস সব ঘটনাগুলো আবার রিপিট করল। দেওয়ালি মন দিয়ে শুনছে "যেহেতু অমর্ত্য এখন মন্ত্রী, তাই অবভিয়াসলি ওর ক্ষমতা অনেক বেশি। ওর কথাই চলবে। মানে প্রত্যেকটা শোর আগে ওর পারমিশনের আশায় বসে থাকতে হয়। দুজনে একসঙ্গে বড় হয়েছি, একই সঙ্গে দল গড়েছিলাম। সেখানেই বিবেকে লাগছে। বুঝতে পারছি না কী করে সুরাহা হবে"

"দেবাশিসদা, হাউ ডু আই কাম ইন দ্য পিকচার?"

"আমাদের ওয়ার্ল্ডে, কেউ পক্ষে, কেউ বিপক্ষে থাকবে। সেটাই স্বাভাবিক। তুমি তো আমাদের দুনিয়ার লোক নও। তোমারও তো অমর্ত্যর সঙ্গে ভালই চেনা। যদি কোনও রকম ভাবে মিটমাট করে হেল্প করতে পারতে..."

"আমি তো তোমাদের নাটকের দুনিয়ার লোক নই, ভেতরের কাহিনিও জানি না। অমর্ত্যদা কেন-ই বা আমার কথা শুনবে? যদিও তোমার থেকে ছোট, একটা সাজেশন দেব? এই পাওয়ার স্ট্রাগেলের চক্কর থেকে বেরিয়ে এস"

"যাব কোথায়? তোমার নয় মুম্বাইতে একটা আস্তানা হয়েছে। আমার তো এর বাইরে যাওয়ার পথ নেই"

"আছে। ছাড়তে পারলে দেখবে সব ফিরে আসবে। ছেড়ে দাও না। টেম্পোরারি হার স্বীকার করলে কোনও লস নেই। আমি সাদামাটা একটা কথাই বুঝি, ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। অত ধরেবেঁধে কিছু হয় না"

"তোমার ভাগ্য খুলছে বলেই এ কথা বলতে পারলে"

"ভাগ্য খুলছে না বন্ধ হচ্ছে, কে জানে? এই দেখ না। হতে চেয়েছিলাম কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট, হয়ে গেলাম অ্যাক্ট্রেস। কার কপালে কী আছে, কেউ বলতে পারে?"

দেওয়ালির কথাটা আজ নয়, ছোটবেলা থেকেই শুনেছে। মেনে নেওয়াটাই কষ্টকর। এখনও সেই স্তরে পৌঁছয়নি যে, জগৎ ভুলে ভাগ্যের হাতে সব কিছু সঁপে দিয়ে বসে থাকবে। বসে থাকলে কি এখানে আসতে পারত? দুনিয়াদারির টানাপোড়েনে ডারউইনের থিওরি অফ ইভলিউশন-ই প্রযোজ্য - সারভাইভ্যাল অফ দ্য ফিটেস্ট। দেওয়ালি কোনও আধ্যাত্মিক অ্যাঙ্গেল থেকে বলছে না। ডিফিটকে অনেকেই ভবিতব্য আখ্যা দিয়ে শান্তি খোঁজে। সে ওদের দলে নয়।

"কী জানি... মনে হয়েছিল, তুমি সাহায্য করতে পারবে..."

"তাই তো হল"

ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। দেওয়ালি আশা করেনি, ঠিক এই মুহূর্তে অমর্ত্যর ফোন আসবে। মাঝে মাঝে এমন কিছু হয়... "তুমি কী এখন কলকাতায়?" অমর্ত্যর গলা।

"কেন বলত?"

"রাজীব বলছিল, তোমায় ওদের গ্রুপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার করেছে। আমাদের গভর্নমেন্টের কিছু পাবলিক অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনের জন্য তোমার কথা ভাবছিলাম"

"যদিও এই মুহূর্তে কলকাতায়, মুম্বাইতে ফেরত যাচ্ছি। ওখানে ডেটস দেওয়া আছে"

"তুমি কী তাহলে পারবে না?"

"কেন পারব না? তোমারা অরগ্যানাইজ করে জানিও। এসে করে দিয়ে যাব" একটু থেমে বলল "তুমি বললে না এসে পারি?"

"বেশ, জানাব"

ফোনটা কেটে বলল "টক অফ দ্য ডিভিল, অ্যান্ড হিয়ার হি ইজ"

"কে? অমর্ত্য?"

মাথা নাড়ল দেওয়ালি "কী জানি আমায় হয়ত ভবিতব্য তোমাদের এই ঝামেলাটা মিটমাট করার জন্যেই টানছে। নইলে ঠিক এই সময় ফোনটা আসে?"

দেবাশিসের মনে হল, দেওয়ালি হয়ত ঠিকই বলছিল, ভবিতব্যই আসল, বাকিটা ফালতু। মেনে নেওয়াটাই শ্রেয়। দেখা যাক না, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

সাতাশ

হলিউড। অ্যামট্র্যাক-বুরব্যাঙ্ক এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন পেরিয়ে বাইরে এসে প্রাণ ভরে শ্বাস নিল দেওয়ালি। এক নতুন দুনিয়া, নতুন স্বপ্ন। মাটিতে পা রেখে মনে হল, আবার নতুন করে পথ চলা শুরু, নতুন অধ্যবসায়, নতুন প্রয়াস।

রিসিভ করার জন্য এনক্লোজারে অপেক্ষা করছিল মার্ক। না দেখলেও, প্রোফাইল ঘেঁটে চেহারাটা পরিচিত। এজেন্ট যদি ক্লায়েন্টের চেহারার ইম্প্রেসারিও তার সেরিব্র্যাল কম্পিউটারের অ্যামিগডালাতে রাখতে না পারে, তাকে বিক্রি করবে কী করে?

“ডিওয়ালি? অ্যাম আই রাইট?”

“রাইট ইউ আর”

দেওয়ালির ট্রলি ঠেলে বাইরে আসতেই বলল “হ্যাং অন হিয়ার, হোয়াইল আই ফেচ মাই কার”

লাগেজ ডিকিতে ডাম্প করে, সেভরলে ড্রাইভ করতে করতে বলল “দে হ্যাভ ফিক্সড ইওর স্টে নট টু ফার অফ, অ্যাট দ্য এলএ ম্যারিয়ট। হিয়ার উই এন্টার ওয়েস্ট এম্পায়ার অ্যাভিনিউ। টার্ন লেফট টু নর্থ হলিউড বুলেভারড, অ্যান্ড উই আর দেয়ার”

এলএ ম্যারিয়টের এক্সিকিউটিভ সুইটে চেক-ইন করে আনন্দে উদ্বেল দেওয়ালি সিগারেট ধরাতে গেলে, মার্ক বাধা দিয়ে বলল “স্যরি, দিস হোটেল হ্যাস এ নো স্মকিং পলিসি। আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, ইউ হ্যাভ টু কুইট ইওর হ্যাবিট, ওর ইওর ফিউচার ইন হলিউড” মহা ফ্যাসাদ। কিছুই করার নেই। সিগারেট ছাড়, নইলে হলিউডের স্বপ্ন ছাড়। দোটানার মধ্যে দেওয়ালি।

জীবনের স্বপ্নকে পেতে গেলে কিছু ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ ছাড়া প্রাপ্তি শূন্য। কোনটা প্রায়রিটি। উত্তর অজানা নয়। দেহ বিক্রি করে স্টার হওয়া, আর সিগারেট বিসর্জন দিয়ে হলিউডে পদার্পণ, ব্যাপারটা একই। নিজেকে নতুন ভাবে আবার নতুন করে তৈরি করা। আজ এসেছে নতুন স্বপ্ন নিয়ে। কী রূপে সাজতে হবে, ভবিতব্যই বলে দেবে, সে কে? “দ্য ফ্যাগ ইজ ডেসার্টেড ফ্রম নাউ। লেটস হিয়ার ইওর স্টোরি অর দ্য এসেন্স অফ মাই ক্যারেক্টার। মোর রেলেভ্যান্ট, ইজন্ট ইট? হাউ আই গট দ্য ব্রেক। অফ কোর্স, আই ও ইট টু ইউ, অ্যাস দ্য মিডিয়েটর”

মার্ক সুইটের সোফায় গা এলিয়ে বলল “ক্যান আই অর্ডার এ ড্রিঙ্ক? হোয়াট উড ইউ প্রেফার?”

“এনিথিং... হোয়াটেভার সুটস ইউ”

"ওয়েল দে ওয়ার প্ল্যানিং এ মুভি অন ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেনট অ্যাস দে আর রিয়ালাইজিং, দ্যাট মোস্ট অফ দ্য হলিউড ফ্লিক্স হ্যাভ বিকম এ টেকনিক্যাল এক্সারসাইজ, দ্যান দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য স্টোরি। অ্যাস দে ওয়ার হুইজিং থ্রু এ সেট অফ বুকস বাই ইন্ডিয়ান অথারস, দে কেম অ্যাক্রস অ্যান ইন্টারন্যাশল থ্রিলার উইথ প্রিডমিনেন্স অফ ইন্ডিয়া, এ বুক নেমড পারসুইট, বাই সাম চ্যাপ অনিরুডা বোস..."

"দ্য নেম সাউন্ডস বেঙ্গলি" দেওয়ালি ব্লু মুনে চুমুক দিল।

"প্রেসসাইসলি। দ্য স্টোরিলাইন ড্রু দেয়ার অ্যাটেনশন। দো দ্য বুক ইজ এ হাই পেসড ইন্টারন্যাশনাল থ্রিলার উইথ মেনি মার্ডারস, দ্য কি থিম ইজ এ স্ট্যাগারিং ইন্টারন্যাশনাল কন্সিপিরেসি অ্যাডমিকসড উইথ হাইলি কমপ্লেক্স ইন্টারন্যাশনাল জিও-ইকনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্স। আই হ্যাভ রেড দ্য বুক অ্যান্ড ব্রট এ কপি ফর ইউ। ইউ সুড রিড দেম বিফর দ্য মিটিং উইথ দেম অন ব্রিফিং"

খুব মোটা নয়, দু-দিনে শেষ করে ফেলতে পারবে। এক সময়, বিশেষ করে স্কুল আর কলেজ জীবনে বইয়ের পোকা ছিল। যেহেতু কলেজ জীবনে কোনও বয়ফ্রেন্ড ছিল না, পড়ার বাইরে যেটুকু সময় পেত, বই পড়ে আর সিনেমা দেখে কাটিয়ে দিত। সিনেমায় ঢোকার পর-ই, বই পড়া বন্ধ হয়ে গেল। স্ক্রিপ্ট পড়া শুরু। আজকাল তো উপন্যাস থেকে বড় একটা সিনেমা হয় না। আজকালকার ডিরেক্টররা নিজেরাই গল্প লেখে, যা আগের দিনে ছিল না। তাই বই পড়ার ইচ্ছে থাকলেও, সময় বা সুযোগ কোথায়? অবশ্য এই বইটা আগে পড়েনি। কিন্তু এটা টলি বা বলিউড নয়, হলিউড। এখানে হোম ওয়ার্ক না করে গেলে ফেইলিওর অবশ্যম্ভাবী।

"ইজ দিস কপি ফর মি?" মার্ককে জিজ্ঞেস করল।

"ফর ইউ। আই বট ইট ফ্রম অ্যামাজন। দিস ইজ ইওর ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক। আই ওয়ান্ট ইউ টু ডায়জেস্ট দ্য ক্যারেক্টার বিফোর ইউ মিট দেম। আই হ্যাভ বিন ইন দিস বিজনেস ফর কোয়াইট এ হোয়াইল। ব্রেক্স ডোন্ট কাম অফেন। ইফ ইউ হ্যাভ ওয়ান, বি সিন্সিয়ার অ্যান্ড মেক দ্য মোস্ট আউট অফ ইট। ইউ নেভার নো, হোয়াট ইজ ইন স্টোর"

ইউ নেভার নো হোয়াট ইজ ইন স্টোর... কতটুকুই বা আমরা ভবিতব্যকে জানি? যেটুকু তাস আমাদের হাতে, তাই নিয়েই তো খেলতে হবে। দেওয়ালি খুব ভাল করেই বোঝে।

মার্ক উঠে পড়ল "আই হ্যাভ টু ড্যাশ অফ। ফ্রেশেন আপ, টেক রেস্ট অ্যান্ড ক্যারি অন ইওর হোমওয়ার্ক"

মার্ককে দরজায় এগিয়ে জিজ্ঞেস করল "হোয়াই মি?"

“রিড দ্য নভেল। ইউল আন্ডারস্ট্যান্ড এভ্রিথিং। দ্য প্রোটাগনিস্ট অফ দ্য নভেল ইজ ফ্রম ইওর পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আই থট ইউ ফিটেড ইন পারফেক্টলি। সো ডিড দ্য প্রোডাকশন হাউস” দুষ্টু হাসি ছুড়ে বেরিয়ে গেল।

এত ঘণ্টার জার্নি, সঙ্গে জেট ল্যাগ। স্নান সেরে শর্টস আর স্লিভলেস গেঞ্জি পরে শুয়ে পড়ল। এখানে মধ্যদিন হলেও, ইন্ডিয়ার হিসেবে এখন মধ্যরাত্রি। ঘুমে চোখ ঢুলু ঢুলু। নরম বিছানায় পড়তে না পড়তেই ঘুম। যখন ভাঙল, জানলার পর্দা ফাঁক করে দেখল, সন্ধে হয়ে গেছে। সুইমিং পুল ছাড়িয়ে সান্ধ্য বেশে সেজে উঠেছে লস এঞ্জেলস। নিমেষে দিনের আলোকে দূরে ঠেলে অন্ধকার নেমেছে। গাড়িগুলো হুস হুস করে ছুটছে ম্যানহ্যাটন বিচের স্বল্পালোকিত রেস্তরায়। অ্যামেরিকান সভ্যতা অযথা ফিরে তাকাতে জানে না। অত ভাবার সময় নেই। এটাই জীবনের প্রবাহ। স্রোতের মাদকতায় ভেসে ছুটে এসেছে...

আসার আগে অনিন্দ্য দেওরার স্ত্রী লিজার সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করেছিল, দিগ্বিজয় ভট্টাচার্যকে ক্ষমা করে দিতে...

“ওনলি অন ওয়ান কন্ডিশন, হি মাস্ট রিটার্ন দ্য মানি। দ্য মানি ইজ নট দ্যাট ইম্পরট্যান্ট। হি মাস্ট প্রমিস নট টু লিক ফলস স্কুপস, উইদাউট ডবলি অ্যাসারটেনিং ইটস অথেন্টিসিটি। দোজ রিপোর্টারস ডাই ইন গ্রিড” অনিন্দ্য ভদ্রভাবে বলেছিল।

“আই উইল ইনফর্ম হিম অ্যাস ইউ সে”

“আই অ্যাম স্পেয়ারিং হিম অ্যাট লিজাস রিকোয়েস্ট, জাস্ট বিকস সি ইজ এ ফ্রেন্ড অফ ইওরস। অ্যান্ড হি মাস্ট পাবলিকলি অ্যাপলোজাইজ কনফারমিং হিস মিস্টেক। মাই ক্রেডিবিলিটি অ্যাস অ্যান এমপি ইজ অ্যাট স্টেক। উই ডোন্ট ফাক অ্যারাউন্ড লেডিস, উই হ্যাভ মোর ইমপরট্যান্ট থিংস টু ডু দ্যন স্ক্রুইং উইমেন”

আসার আগে, দিগ্বিজয় ভট্টাচার্যকে ফোন করে সুসংবাদটা জানাতে ভলেনি।

“তোমাকে যে কী ভাবে ধন্যবাদ দেব...”

“দরকার নেই। শুধু কথাগুলো মনে রাখবেন”

খিদে পেয়ে গেছে। দেওয়ালি রুম সার্ভিসে ফোন করে জে ডব্লিউ স্টেকহাউস থেকে ওদের ফিক্সড মেনু অর্ডার দিল। খাওয়া থাকা যখন প্রোডাকশন কম্প্যানির সৌজন্যে, তখন ভালমন্দ খেয়ে অনিরুদ্ধ বোসের পারসুইট বইটা বসে মন দিয়ে পড়বে।

এ লা কার্টে মেনু ছেড়ে, ফিক্সড মেনুই অর্ডার করল। লবস্টার বিসক, ফিলেট মিগনন মেডালিয়ন্স, স্রিম্পস উইথ সিপটলে বাটার সস। সঙ্গে আলু আর ভেজিটেবলস। ডেসার্টে চিজ-কেকের সঙ্গে ফ্রেস স্রবেরি। সঙ্গে পল মেসন এক্সট্রা ড্রাই ক্যালিফিরনিয়ান ওয়াইন।

সোফার ওপর পা ছড়িয়ে ওয়াইনের গ্লাস হাতে বইটা পড়তে শুরু করল। প্রথম তিরিশ পাতায় একটার পর একটা খুন হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ভিক্টিমদের রোলে অভিনয় করার জন্য সুযোগ পায়নি। ইন্টারেস্টিং গল্প, অনেক রিসার্চ করে লেখা।

রুম সার্ভিস খাওয়া দিয়ে গেলেও, নভেলটা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। পেটে ছুঁচো ডন মারছে, কিছু তো খেতেই হবে। নভেলটা উলটে রেখে খাওয়ার সময় ভাবছে, এই সিনেমার নেশায় সে কতই না পিছিয়ে পড়েছে। নিজের দেশে, খোদ কলকাতা শহর থেকে উপন্যাস লেখা হয়েছে, সে খবর জানতে হচ্ছে অ্যামেরিকায় বসে মার্কের কাছ থেকে, তাও হলিউডে চান্স পাওয়ার পর।

সাহেবরা কদর না দিলে দেশের লোকের মর্ম বুঝতে শিখিনি। এখনও চিন্তাধারা কত সংকীর্ণ! অবশ্য কবেই বা উদার ছিল? মানসিক পরাধীনতায় বন্দি বাঙালির কাছে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায়? একশ বছর আগে লেখা গল্প আঁকড়ে সংস্কৃতিকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। কোমর বেঁধে সতীদাহের অভ্যাসটা এখনও গেল না। মন আজও কৃষিকাজ বুঝে ওঠেনি...

আলু বাদ দিয়ে ভেজিটেবলের সঙ্গে মেন কোর্স খেয়ে নিল। ডেসার্টটা থাক, পরে খাবে। এমনিতেই আলু অ্যাভয়েড করে। ভুঁড়ি বাড়লেই চান্স হারাবে। স্লিম ফিগার চাই। ডাম্পড হতে চায় না, বিশেষ করে হলিউডে।

গ্রিপিং গল্পটা। হঠাৎ এমন সব টুইস্ট নিচ্ছে, যে বুঝেই উঠতে পারছে না, এরপর কী হবে? সত্তর পাতা পড়ার পর বুঝতে পারছে, সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার এলিনা। নিশ্চয়ই এলিনার রোল... যদিও বাঙালি, তবু এলিনার বড় হয়ে ওঠা পাঞ্চেত ডি'জংপার ওয়েস্ট সিকিমের মনাস্ট্রিতে। ইন্টারন্যাশনাল হোমরাচোমরারা, ওয়ার্ল্ড কন্ট্রোলের নেশায় একটার পর একটা খুন করে যাচ্ছে। ছোট ছোট চরিত্রগুলো ওদের কন্সপিরেসির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। ডামাডোলের মধ্যে, সিকিমের এই অন্ধ বৌদ্ধ মঙ্ক, ছোট্ট একটা মনাস্ট্রিতে বসে নিমরোদের মতো সব অনুভব করছে। এলিনা চরিত্রটা ইন্টারেস্টিং। বুদ্ধিজম আর হিন্দুত্বর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। শুধু মার্ডারগুলোরই ইনভেস্টিগেশন করছে না, প্লটের গভীরে গিয়ে রহস্য উন্মোচন ছাড়াও জীবনের গূঢ় রহস্য সন্ধান করছে।

ছাড়তে পারছে না নভেলটা। টানটান উত্তেজনা। ওয়াইন শেষ। ডেসার্ট শেষ করে আরেকটা বোতলের অর্ডার দিল।

“হ্যাভ ইউ ফিনিশড ম্যাম?”

“ইয়েস” রুম সার্ভিসের বয়ের হাতে দশ ডলার গুঁজে বলল “ইউ ক্যান ক্লিন আপ দ্য টেবিল। অলসো আই হ্যাভ অরডার্ড ফর অ্যানাদার বটল। প্লিজ কিপ ইট অ্যাস এ নাইটক্যাপ”

“সিওর ম্যাম, উইল ডু। এনজয় ইওর স্টে উইথ আস”

রুম সার্ভিস বেরিয়ে যেতেই বইয়ে ডুবে গেল। নভেলটা কন্টিনিউয়াস পড়ে যেতে হবে। না হলে খেই হারিয়ে ফেলবে। চুম্বকের মতো টানছে। এত ভাল গল্প, অথচ নাম শোনেনি। সব-ই পাবলিসিটি।

রাত শেষ হতে চলেছে। জেট ল্যাগের জন্য ঘুম নেই। এখন তো ইন্ডিয়াতে দিন। বইয়ের সঙ্গে ওয়াইনের নেশা মিলেমিশে একাকার। উত্তেজনায় নেশা চড়ছে। শেষের প্যরাটা দুবার পড়ল - ... সি ওয়াজ এ চায়েল্ড এগেন, এ চায়েল্ড হু ওয়াজ জাস্ট বর্ন, বর্ন উইথ অল দ্য ইনোসেন্স, বিমিং উইথ জয় অ্যান্ড লাফটার, আনকন্সাস অফ দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড। সি ওয়াজ এ প্রোডাক্ট অফ দ্য মাদার নেচার। দিস টাইম সি হ্যাড বিন বর্ন নট টু সি দ্য ওয়ার্ল্ড, সি হ্যাড বিন বর্ন টু সি হার সোল, হার টু সেলফ...

দেওয়ালিরও মাঝেমধ্যে ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে নিজেকে। পাপেটের মতো নেচে যাচ্ছে। এই কী সে? তার নিজস্বতা? তার আমি? স্টারডম যতই চমকপ্রদ হোক না কেন, ঘুম ভাঙা অন্ধকারে চমকে ওঠে! আর কতদূর? যেখানে কেউ নেই, তবু যেন কার অমৃতস্পর্শে দেহ মন আনন্দে শিহরিত হয়ে ওঠে প্রতি মুহূর্তে। ইন্টারন্যাশনাল স্টারডমের দরজায় দাঁড়িয়ে খুঁজছে হারিয়ে যাওয়া দেওয়ালিকে।

ওয়ার্নার ব্রাদারসেরডেভিড স্মিথ সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে এলিনাকে হজম করে ফেলতে হবে। আরেকবার পড়তে হবে নভেলটা। এলিনার চরিত্রের ডিফারেন্ট ফ্যাসেটস নিয়ে আরও ডিটেলসে। যাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে গল্পের প্রোটাগনিস্ট।

ভোর হয়ে গেছে। দেওয়ালির ঘুম পাচ্ছে। সারা রাত বইটা এক নাগাড়ে পড়েছে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে মার্ককে ফোন করল “আই হ্যাভ বিন রিডিং দ্য নভেল হোল নাইট। আই অ্যাম ইয়েট টু রেকুপারেট ফ্রম দ্য জেট ল্যাগ। আই ওয়ান্ট টু রিড দ্য নভেল ইয়েট ওয়ান্স এগেন, টু ডাইজেস্ট দ্য ক্যারেক্টার অফ এলিনা। ক্যান উই পোস্টপন দ্য মিটিং ফর অ্যানাদার ডে?”

“সিওর” মুখে কিছু না বললেও মার্ক বুঝল, তার চরিত্র পিক করতে ভুল হয়নি।

দ্যটস হোয়াই, হি ইজ নট ওনলি দ্য বেস্ট ইন হলিউড, হি ইজ দ্য ইনভিজিবল ক্রিয়েটর অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ গ্লিটজ।

আঠাশ

“দ্যাটস ইট। আমি বলেই এতদিন নিয়েছি নইলে তোমার সঙ্গে কেউ ঘর করতে পারবে না” সমর্পিতা শেষে ব্যাগ আর কুসেঞ্জিতকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শুভ্রজিৎ জিজ্ঞেস করতেও সাহস করল না, কোথায় যাচ্ছে। ওদের বাড়ি আর ফ্ল্যাটের তো অভাব নেই। কোথাও গিয়ে উঠতেই পারে। কোথাওই হয়ত উঠবে না। হাওড়ার এই জেদি মেয়েটাকে অনেকদিন ধরেই চেনে। অনুশ্রী বিদায় নিয়েছে। সুপর্ণার সঙ্গেও সম্পর্ক টলমল। তার পরেই বিচ্ছেদ। দুটো বিয়েই চার-পাঁচ বছরের বেশি টেকেনি। তখনই সমর্পিতার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। এটা তো তেরো বছর টিকল। সমর্পিতাই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল। শেষ পর্যন্ত, সেও চলে গেল।

কানাঘুষায় শুনেছিল, ইদানীং এক তামিল ফিল্ম প্রডিউসারের সঙ্গে দহরম মহরম। যদিও স্পষ্ট করে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পায়নি। ফ্লোরের বাইরে কতটুকুই বা সময় দিয়েছে?

“কী হবে বল-তো শুভ্রজিৎদা?”

“যা হওয়ার হবে। কে সারা সারা...”

প্রথমে দোলনা, পরে সাউথ পয়েন্ট, প্রেসিডেন্সি থেকে এনভায়রনমেন্টাল ইকনমিক্স। দিল্লি ও ব্যঙ্গালুরু ইংলিশ থিয়েটার থেকে উঠে আসা এই মধ্যবয়সী চিত্র পরিচালককে কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। শুভ্রজিতের হাত ধরেই তার চিত্র পরিচালক হিসেবে যা একটু নাম।

“নিঃশব্দ ছবিটা তো চলল না...”

মুম্বাই থেকে ফিল্ম অ্যাক্ট্রেস আনলেই কী চলে? ছবিটা ডকুমেন্টারির মতো হয়ে গেছে। না সিনেমা, না ডকুমেন্টারি। গল্প না থাকলে সিনেমা চলে?”

“তুমি তো জান আমার গল্প তৈরি করার ক্যালি নেই। আগের ছবিগুলোতে এখান ওখান থেকে ঝেড়ে, একটা গল্প খাড়া করেছিলাম। বাবা তো আর্কিটেকচারে প্রফেসার ছিল, যদিও ভালই কবিতা লিখত। খুব ভালই জানত, এসব ক্রিয়েটিভ লাইন থেকে বেশিদিন রোজগার হয় না। মা-ও অ্যানাটমির প্রফেসর। দুজনেই চেয়েছিল লেখাপড়া নিয়েই থাকি, সিনেমা নয়”

“তো দুম করে পিএইচডি, ব্যঙ্গালুরুর চাকরি ছেড়ে, এ লাইনে ঢুকে পড়লি কেন?”

“প্যাশন... প্যাশন বলেই সব ছেড়েছুড়ে এলাম। দুম করে সত্যজিৎ রায়ের ছবি রিমেক করার চান্সও পেয়ে গেলাম। সে সময় তুমিই তো উৎসাহ দিয়েছিলে, লাইন ফিট করে দিয়েছিলে”

“সে তো পাঁচ বছর আগের কথা। তখন বাংলা সিনেমার হাল অনেক ভাল ছিল, যখন আমিও করেকম্মে খেয়েছি। এখন দেখ আমার অবস্থা। নিজেই সিনেমা পাই না, তোর জন্য কী করব?”

“নতুন যে প্রোডাকশন কম্পানিটা খুলেছ, ওখান থেকে ফাইন্যান্স যদি করতে...”

“অত টাকা কোথায়? কিছু টেলিফিল্ম শুরু করেছি, দেখি কোথায় দাঁড়ায়। সমর্পিতা যখন ছিল, রিয়েলিটি শোর কস্টিউম ডিজাইনিং, সেটস, এসব করে বেশ কামাচ্ছিল। চলে যাওয়ার পর, জানি না এখন কী করব”

“পারমানেন্টলি?”

“তাই তো বলে গেল। ভীষণ হেল্পলেস লাগছে”

“বস তুমি আমি এখন একই পথের পথিক। দুজনেই ব্যাচেলার” বিজিত হাসল।

“তোর বয়েস আর আমার বয়েস এক হল? আমি তোর থেকে পনেরো বছরের বড়। তোর এখনও মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করার বয়স আছে। আমার তো নেই”

“পকেটে রেস্ত, আর হাতে ছবি না থাকলে, কোনও মেয়েই পাত্তা দেয় না”

“এক মালদার বাপের মেয়ের সঙ্গে লটকে পড়। রাজত্ব প্লাস রাজকন্যে। সে-ই ফাইন্যান্স করে দেবে। তুই তো আমার মতো অর্ধ শিক্ষিত নয়। লেখাপড়া করেছিস। এমএ, এমফিল। তোর অসুবিধা হবে না। এখন তো আবার সেলিব্রিটি” মুচকি হেসে বলল “বিয়ের বাজারে নেমে পড়”

“তাহলে তো, এ লাইনের মেয়ে ছেড়ে, অন্য লাইনের মেয়ে খুঁজতে হয়”

“ধ্যত, এই লাইনের মেয়েদের কেউ বিয়ে করে? আমাকে দেখে শিখছিস না? তিনটের মধ্যে দু-দুটোই তো লাইনের। টিকল”

“সব-ই কপাল বস। ফোটবার থাকলে ফুটবে। লাইন, বে লাইন, এসব কোনও ব্যাপারই নয়”

ফাঁকা মাঠে, একা ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ভুলেই গেছে, যে চিরকাল সময় ভাল যায় না। চামুণ্ডেশ্বরীর সঙ্গে একাই টলিউড দাপিয়েছে। কাউকে ঢুকতে দেয়নি।

“তুই কী কিছু নতুন স্ক্রিপ্ট লিখেছিস?”

“তোতাকাহিনি শেষ করলাম, চামুণ্ডেশ্বরীর ব্যানারে। নিঃশব্দ ফ্লপের পর মনিকান্ত বলছে এটার প্রগনোসিস না দেখে, পরেরটার জন্য মালকড়ি ছাড়বে না। তোমার তো এতদিনের বন্ধু। ওদের জন্যে কত হিট দিয়েছ। একবার আমার জন্যে বলবে বস?”

শুভ্রজিতের আর কোনও আগ্রহ নেই। এমনিতেই সমর্পিতা চলে যাওয়াতে ডিস্টার্বড। রিসেন্ট ছবিগুলোতে নতুন সব হিরো-হিরোইন নিয়ে বিজিত ছবি করছে। দু-একটা ক্যারেক্টর রোলও তো লিখতে পারে ওর

জন্যে। বিজিতের সাকসেসের পেছনে কী তার কোনও হাত নেই? তার কথা মনে রেখেও তো একটা স্ক্রিপ্ট লিখতে পারে। যে ছবিতে সে অভিনয় করবে না, বিজিতের জন্যে সুপারিশ করে কী লাভ?

"দেখি... ওদেরও তো বাজার ভাল যাচ্ছে না"

চামুণ্ডেশ্বরীর গতে বাঁধা প্রোডাকশনগুলো আর চলছে না। মফসসলে এ ধরনের ছবির একটা মার্কেট ছিল। যাত্রার সাবস্টিটিউট। একসময় সেগুলো কাটত। এখন যাত্রাও চলে না, সেই ধরনের ছবিগুলো তো নয়ই। প্রয়াগ বা রামোজি ফিল্ম সিটিতে বিদেশের সেট বানিয়ে বাইরের শুট করা সিকোয়েন্স বলে চালাত। এখন গ্রামের লোকেরাও চালাক হয়ে গেছে।

অথচ ব্যানারের যে ইমেজ করেছে শুভ্রজিৎ, বিজিতদের জড়িয়ে, সেই ইমেজে কোনও কোয়ালিটি ডিরেক্টর কাজই করতে চায় না। তারা তাদের মতো সিনেমা করবে, ওদের গতের বাইরে। বরং ঘরে বসে থাকবে তবুও ওদের কথা মেনে কাজ করবে না। ওদের কোনও ফরমুলাতেও নয়।

মনিকান্ত বলল "বাজার কা হাল কাফি খারাপ। তামিল রিমেক ভি আজকল নেহি চলতা"

"নই কোই স্টোরি লাগাইয়ে। ফির তো চলেগা" শুভ্রজিৎ গম্ভীরভাবে বলল।

"কেয়া নয়া স্টোরি? হর ডিরেক্টর তো রবীন্দ্রনাথ ঔর ব্যোমকেশকে পিছে পড়া হ্যায়। উসে ছোড়কে বাঙ্গাল কা পাবলিক ঔর কুছ ভি নেহি সোচ সকতা। কেয়া করু?"

"ইংলিশ পিকচার কা রিমেক কিজিয়ে"

"কেয়া বোলতা জিত? ইংলিশ পিকচার? উসকা বাজেট জানতা? কিতনে পড়েগা? হল কলেকশন ছোড় কর, ইলেক্ট্রনিক রাইটস সে ভি পয়সা ওসুল নেহি হোগা। লস মে পিকচার করে?"

"ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ঠিক কিজিয়ে। বাঙ্গাল মে কুছ হোনে ওয়ালা নেহি হ্যায়। হিন্দি পিকচার সে জ্যাদা কামাই হোতা ইসলিয়ে আয়নক্স ওয়াগারা হল মে ভি, জ্যাদা দিন নেহি রাখতা"

"হামারে ভি তো, ডিসট্রিক্ট মে বোহত হল হ্যায়। উধার ভি চলতা নেহি"

"বাঙ্গাল কে বাহার। মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লি, চণ্ডীগড় মে..."

"আদমি কো, একহি প্রাইস মে ডাবড তামিল পিকচার দেখনে কো মিল জায়, তো কৌন বাংলা মুভি দেখেগা সিরফ বাঙ্গালি ছোড়কে? উনলোগ বিজিতকা মাফিক দো-এক পিকচার দেখ সকতে হ্যায়, লেকিন মহাদেভ, অবন্তীওয়ালা পিকচার নেহি দেখেগা। পাবলিসিটি কা ভি খরচা হ্যায়। ডিস্ট্রিবিউটার মিলে তো ভি ওসুল নেহি হোগা"

"হমলোগ কো ভি তো জিনা হ্যায়..."

"অপনে প্রোডাকশন কম্প্যানি খুলা। দেখ, কিতনা মুনাফা হোতা"

শুভ্রজিৎ কিছু বলতে পারল না। নিজের প্রোডাকশন হাউসই টেলিফিল্ম করে টালমাটাল। সে আর কী বলবে? এখন তো পাশে সমর্পিতাও নেই যে ভরসা দেবে। যেগুলো আছে, সেগুলো ধান্দার পোঁ। কবে সটকে পড়বে, কে জানে? এরা বুঝবে না। একবার মৃদুলের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

মৃদুলের রিয়া সিনেমার ছাদে পার্টি। যেমন প্রায়শই দিয়ে থাকে। একটানা প্রখর প্যাচপ্যাচে গরমের পর কাল রাতে বৃষ্টিটা সেভাবে না হলেও গুমোট অনেকটাই কমেছে। এই দু-সপ্তাহ ধরে এসিতে বসে হাঁপিয়ে উঠেছিল মৃদুল। কংক্রিট জংগল যতই সুখপ্রদ হোক না কেন, খোলা হাওয়ার ঘ্রাণ না নিলে দম বন্ধ হয়ে আসে। প্রাইমারি লেভেলে সেন্ট জেভিয়ারস স্কুল ছেড়ে দার্জিলিং সেন্ট পলস। যাদবপুর ইউনিভারসিটিতে পড়া অবধি আর ফেরত আসেনি। ওখানকার মাটির ঘ্রাণ, বাতাস, পাহাড়, খোলা আকাশ বারবার টানে। ওখানেই যেন জীবনের প্রাণ আছে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে, পাহাড়ের কোলে। সন্ধেবেলা লনে বসে হুইস্কি কিংবা হুটহাট করে শিকারে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে যে চার্ম আছে, কলকাতায় নেই।

সেখানে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলে হিমেল চূড়াগুলো। গুটি গুটি পায়ে, গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে সন্ধ্যাতারার আগরবাতি জ্বালিয়ে শান্ত নীরবতার কোলে। স্থির, শিথিল। ওক, দেওদার, পাইনের সমারহ ছাড়িয়ে, পাহাড়ের বধির বুকে, গেয়ে চলে রাত জাগা গান। সেখানেই সে খুঁজে পায় নিজেকে, কলকাতার ভিড়ে নয়। তবুও কলকাতায় রিয়া এন্টারটেনমেন্টসের সাম্রাজ্য। কদ্দিন পালিয়ে থাকা যায়? তাই মাঝেমধ্যে পার্টি, আড্ডা। কোনও স্বার্থে নয়। খাওয়াতে ভালবাসে, ভালবাসে মানুষকে। আন্তরিকতার জন্যই বুঝি কলকাতার যেকোন ও সেলেব এক ডাকে হাজির হয়। ঢালা ও ড্রিঙ্কস, অঢেল খাবার, সুন্দরী তো আছেই। তারই ফাঁকে কিছু বিজনেস ডিল।

শুধু রিয়া হল-ই নয়, সাম্রাজ্য কোথায় নেই? বোলপুর, মেমারি, গুশকরা, ইলাম বাজার, দুর্গাপুর, হলদিয়া বা রাজের হাটেই নয়, থিম্পুতে ও তার বিস্তার।

রঙিন ফোয়ারার মধ্যে শুভ্রজিৎ এক ফাঁকে মৃদুলকে ছাদের কোনায় টেনে বলল "বাজার ভীষণ মন্দা। নতুন কোনও ছবির কাজও নেই। কিছু করা যায় না?"

"আমার ব্যাবসাই লাটে ওঠার জোগাড়। একসময় ডিসট্রিক্টের রমরম করে চলা হলগুলোও বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। রোজই একটার পর একটা হল ছেড়ে দিচ্ছি। পাবলিক কী যে চায়, বুঝতে পারছি না"

"আমারও তো একই দশা। এক সময় ডিসট্রিক্টে মারমার কাটকাট করে ছবিগুলো চলত। এখন কোনও ছবিই লাগছে না"

“এখন আর লোকে সিনেমা দেখে না। ঘরে বসে ফোকটে সিরিয়াল দেখে নইলে ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ নিয়ে খেলছে। ইকনমির অবস্থাও ভাল নয়। ইনফ্লেশন, রোজগার নেই। হলে গিয়ে কে খরচ করবে?”

“তবুও তো আমাদের টিকতে হবে”

“যেমন টেলিফিল্ম করছ, তেমনই কর”

“ওতে তো স্টারডম নেই। খরচা তুলতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত”

“স্টারডমের কথা ভুলে যাও। ওসব দিন পার হয়ে গেছে। এখন নতুন নতুন ছোকরারা আসছে। যা দেবে, তাতেই করে দেবে। মহাদেব, অবন্তীর অবস্থা দেখছ না? এখন আর কেউ স্টার দিয়ে সিনেমা করাতে চায় না, নিজেরাই স্টার হতে চায়”

মৃদুল-ই পারে অপ্রিয় কথাটা সোজাসুজি বলতে। কটু হলেও সত্যি। ইন্ডাস্ট্রিতে যে আর কারও ক্ষমতা নেই, শুভ্রজিৎকে সেই অপ্রিয় সত্যটা মুখের ওপর বলে। পড়ন্ত হলেও, এতকালের একচেটিয়া জনপ্রিয় নায়ক। কার বুকের পাটা আছে, টলি-সম্রাটকে সোজাসাপ্টা অপ্রিয় কথা বলার?

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে বলল “ভুলে যাও ব্রাদার, পুরনো দিন ভুলে যাও। এখন তোমার যা বয়স তাতে হিরো হিসেবে কেউ নেবে না, এক ক্যারেক্টার রোল ছাড়া। এই ছবি তো আর মফসসলে কাটবে না। আমার হলগুলোতেও নয়। তাই প্রোডাকশন থেকে যা পার কামিয়ে নাও”

ভুল কিছু বলেনি মৃদুল। এটাই রিয়ালিটি। কিন্তু মন যে মানে না। এতকালের সাম্রাজ্য এক নিমেষে হারিয়ে গেলে কী নিয়ে বাঁচবে? যেটুকু অবলম্বন ছিল সমর্পিতা, সে-ও চলে গেল। ব্যস্ততা ছেড়ে নিরবচ্ছিন্ন ঘরে বসে হুইস্কি। না হলে কোনও ওপেনিং আলোকিত করে, খবরের কাগজে ছবি বেরলে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া। জিরো ভবিষ্যতে এখনও সে বাংলার এক নম্বর হিরো। সেখানেই যা তৃপ্তি।

“মৃদুলদা আমাদের কথা ভুলেই গেছ” কচি হিরোইনগুলো হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

“কেন ভুলব? তোদের ড্রিঙ্কস ঠিকমত দিচ্ছে না?”

“এই তো, ড্রিঙ্কস হাতে। তোমার শিকারের গল্প শুনব। ইওর রিয়াল লাইফ এক্সিপিরিয়েন্সেস” মৃদুল ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেল।

শুভ্রজিৎ আলো-আঁধারিতে ছাদের এক কোণে, গ্লাস নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে। একদিন মনে হত, তারাগুলো কত কাছে। হাত বাড়ালেই ধরা যায়। আজ অনেক দূরে। দু-হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইলেও পারছে না। তিরিশটা বছর হারিয়ে গেছে, মহাশূন্যে। স্বপ্নের স্বর্গটা হারিয়ে গেছে ওই দূর আঁধারে। দূরে... বহুদূরে... তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। চাইলেও ছুঁতে পারছে না।

উনত্রিশ

এলিনার চরিত্রে দেওয়ালি। যদিও গল্পের গতিতে অভিনয় দক্ষতা প্রমাণের খুব একটা বেশি সুযোগ ছিল না, তবুও জমজমাট গল্পের বুনুনি, নিখুঁত এডিটিং, আর মন মাতানো বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গার ফটোগ্রাফিতে, প্রথম উইকে ১০০ মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করল।

বিজনেস ডিরেক্টর জন হ্যান্ডারসন দেওয়ালিকে বলল "দ্য মুভি পারসুইট হ্যাস ডান এক্সট্রিমলি গুড বিজনেস গ্লোবালি ইন দ্য ফার্স্ট উইক। ইউ হ্যাভ কন্ট্রিবিউটেড টু আওয়ার এনরমাস রেভিনিউ। আই হ্যাভ প্রোপসড দ্যট উই রিটেন ইউ ইন আওয়ার ফিউচার প্রোডাকশনস"

সাকসেসের সিংহদরজা খুলে গেল। দেওয়ালি যেন স্বপ্ন দেখছে। স্যম্পেন-কর্ক খোলার ফোয়ারা। ভাসিয়ে দিচ্ছে তার অস্তিত্বটাকে। ওপারে বিশাল সমুদ্র, তার কল্পনারও বাইরে। সেই সাগরের তীরে হ্যান্ডারসন উত্তরণের মন্ত্র শোনাচ্ছে।

সেলিব্রেশনটা ওয়ারনার ব্রাদারসের অফিসে নয়। এলএ ম্যরিয়টের সুইটে। মার্ক ডম পেরিগননের বোতল খুলে বলল "চিয়ার্স। আই নিউ ইউ কুড মেক ইট। ইট অ্যাডস অ্যান অ্যাডিশনাল বুসট টু মাই কেরিয়ার অ্যাস ওয়েল"

"আই কুড গেট হিয়ার বিকস অফ ইউ"

"দিস ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং অফ দ্য স্টোরি। আই ওয়াজ গোয়িং থ্রু দ্য আদার নভেলস অফ দ্য অথার। আই ফাউন্ড অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং নভেল, ফালক্রাম... হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি এ মার্ডার মিস্ট্রি সাসপেন্স থ্রিলার, হুইচ হ্যাস দ্য পোটেনশিয়াল অফ বিইং এ হিট। হ্যান্ডেড ওভার দ্য স্টোরি ফর দেম টু রিড। লেটস সি..."

"ইজ দেয়ার এ রোল সুটেবল ফর মি দেয়ার?" দেওয়ালি ডম পেরিগননে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"ওয়েল দেয়ার ইজ এ সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার ইন্দ্রাক্ষি, হুইচ ইউ ক্যান পোট্রে। অফ কোর্স, দ্য ক্যারেক্টারস ইজ এ উই বিট ওল্ডার দ্যান ইওরস। দ্যাট ক্যান বি টেকেন কেয়ার অফ। ইট হ্যাস মোর অ্যাক্টিং পোটেনশিয়াল দ্যান এলিনা"

"হোয়াইল আই অ্যাম হিয়ার ফ্রি অফ আদার কমিটমেন্টস, আই উড লাভ টু গো থ্রু ইট"

"দে হ্যাভ নট কনফারমড এনিথিং ইয়েট। অফ কোর্স, ইউ ক্যান। বাট দ্য ওনলি কপি আই হ্যাড, আই হ্যাড হ্যান্ডেড ইট ওভার টু দেয়ার প্রাইমারি অ্যাসেসর। হোয়েন আর ইউ লিভিং?"

“ইন এ উইক্স টাইম। জন আস্কড মি টু হ্যং অ্যারাউন্ড ফর এ উইক”

“হোয়াই?”

“হ্যাভেন্ট এ ক্লু”

“দেয়ার মাস্ট বি সামথিং ব্রুয়িং। লেট মি চেক ইট আউট”

দেওয়ালি জানে না কি ব্রু করছে। মার্কের কথায় মনে হল, সামথিং পসিটিভ। নতুন আভাস শুনছে, আগামীর সুরে। মার্ক চলে গেছে ডিনার খেয়ে। দেওয়ালি জামকাপড় ছেড়ে সিল্কের নাইটি জড়িয়ে স্যাম্পেনের গ্লাস হাতে জানলার ধারে দাঁড়াল। আকাশের আলো কমে এসেছে। আকাশের ক্যানভাসে ফুটে ওঠা দূরের তারাগুলো, এখন আর অত দূরের মনে হচ্ছে না। রাতের আঁচলটার আস্তিন ধীরে ধীরে অন্ধকারের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ধীর শিথিল পায়। আকাশের এঘর ওঘর সেঘরের দরজা খুলে মৃদু তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

সুদূরের হলিউড যখন ধরা দিয়েছে, তখন রেড কার্পেটে হেঁটে অস্কার নিতে যাওয়াই বোধহয় পোলস্টার। সেই তারার নিশানায় এগিয়ে যাওয়া। ফালক্রাম-এর ই-বুকটা কালই ডাউনলোড করে পড়ে ফেলতে হবে। এখানে এক সপ্তাহের ব্রেকটা নষ্ট করতে চায় না। মন বলছে, আবার ডাক পাবে। অন্তত মার্কের কথায় তো তাই মনে হল। রাত অনেক হয়েছে। স্যাম্পেনের নেশায় ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। নাইটিটা বিছানার এক ধারে ছুঁড়ে বিবস্ত্র দেহটাকে চাদরের আচ্ছাদনে মুড়ে দিতেই ঘুম।

আবার সেই পুরনো ড্রিম। একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে সে একা দাঁড়িয়ে, অভিমুন্যের মতো, গাঢ় অন্ধকারের সঙ্গে লড়ছে। কোথাও এক ফোঁটা আলো নেই... ঘুমটা ভেঙে গেল। আজ তো স্বপ্নের সিঁড়ির নিচে সে দাঁড়িয়ে। তবে কী অন্ধকার গুহার যজ্ঞে সে এখনও পবিত্র হয়নি?

দিন চারেক পর ফালক্রাম শেষ করতে না করতেই মার্কের ফোন “ইয়াহু! দে হ্যাভ সিলেক্টেড দ্য নভেল অ্যাস ওয়ান অফ দেয়ার আপকামিং ভেঞ্চারস। আই হ্যাভ প্রপোসড ইওর নেম। দ্য কাস্টিং টিম আর কন্সিডারিং...”

আনন্দে, আশংকায় ছ্যাঁত করে উঠল বুকটা... পারবে তো? হয়ত চান্স আছে। না হলে জন হ্যান্ডারসন কেনই বা তাকে হল্ট করতে বলল। নাথিং সাকসিডস লাইক সাকসেস।

আরও দুদিন পর যখন রিটার্ন ফ্লাইট কনফার্ম করতে নেট খুলেছে, আচমকা মার্কের ফোন “ডান... ইউ গট ইট। ডু আই গেট অ্যান এক্সট্রা কমিশন ফর মাই হার্ড ওয়ার্ক?”

“এনিথিং ফর ইউ মার্ক। আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু বুক মাই রিটার্ন ফ্লাইট”

“হ্যাং অন আনটিল ইউ সাইন দ্য কন্ট্র্যাক্ট। অফ কোর্স ইট মে বি এ হোয়াইল বিফর থিংগস স্টার্ট রোলিং। টিল দেন, ইউ ক্যান ডিসাপিয়ার টু ইন্ডিয়া টু ক্যারি অন ইওর আদার কমিটমেন্টস”

“অ্যাস ইউ সে”

পারসুইটের সাফল্যের পর ফালক্রামের কন্ট্র্যাক্ট সই করে কলকাতায় ফিরতেই ফোনের বন্যা। মিডিয়া সারাক্ষণ পেছনে ছুটছে...

“একটু টাইম দিতে পারবে? একটা লাইভ প্রোগ্রামের জন্যে?” সৈকতের ফোন।

“একদম সময় নেই। কালই মুম্বাই ছুটতে হবে”

“যখন তোমার সুবিধা হবে। লাইভ প্রোগ্রাম ছেড়ে দাও, অন্তত একটা ইন্টারভিউ?”

“তারও সময় নেই সৈকতদা। অনেক ফোন আসছে, রাখছি”

যাওয়ার আগে অন্তত পারসুইটের লেখককে ধন্যবাদ জানিয়ে যেতে হবে। পাবলিশারের কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে ফোন করল “একটু দেখা করতে চাই”

“চলে আসুন আমার বাড়ি সল্ট লেকে”

সল্ট লেকের দোতলার ড্রয়িং রুমে বসে চা খেতে খেতে বলল “আপনার গল্পের জন্যই আমার হলিউডের সাকসেস”

“আপনার সাকসেস ঈশ্বরের আশীর্বাদে। আমি ভেহিকেল মাত্র। এই ছবিটা হিট করায় আমারও কিছু রোজগার হল। ওরা ফালক্রামের ফিল্মিং রাইটস সই করিয়ে নিয়ে গেছে। ওদের মুখেই শুনলাম, সেখানে আপনাকে ইন্দ্রাক্ষির ক্যারেক্টারে কাস্ট করার কথা ভাবছে”

“ভাবছে না, কনফার্ম করে দিয়েছে। আসার আগে কন্ট্র্যাক্ট সই করেই এলাম”

“যেহেতু আমি কনসার্নড নই, তাই আমায় জানায়নি”

“এ খবরটা এখানে কেউ জানে না একমাত্র আপনি আর আমি ছাড়া। প্লিজ কাউকে জানাবেন না”

“এখন জানাবার তো কিছু নেই। যখন জানবার, এমনিই জানবে। ভাল অভিনয় করুন। আরও এগিয়ে জান। বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে এই কামনা করি। ওই গল্প নিয়ে ভায়াকম ১৮-র সঙ্গে কথাবার্তা চলছে হিন্দিতে ছবি করার। অবশ্য এখনও ওরা কনফার্ম করেনি। করলে আপনার নাম প্রপোস করতে পারি?”

“অফ কোর্স”

“যখন ওয়ারনার ব্রাদার্স থেকে দুটো ছবির রয়ালটি পেয়েছি, ভাবছি আমার গল্প ক্যানভাসে ছবিটা বাংলায় করব। তার হিরোইন নন্দিনীর রোলে আপনাকেই ভেবে রেখেছি। করবেন তো?”

“নিশ্চয়ই। আই ও দিস টু ইউ”

মুম্বাইর ফ্লাইটে বসে ভাবছে কোথায় ছিল, আর ঝট করে কোথায় পৌঁছে গেল। একেই বলে ভাগ্য। তকদির কা খেল। লোখান্ডওয়ালার ফ্ল্যাটে প্রোডিউসারদের লাইন। দেওয়ালি এখন অনেক বেশি সতর্ক। উঠতে যতক্ষণ লাগে, পড়তে তার দ্বিগুণ। ষাট-সত্তরের এক বিখ্যাত নায়কের কথা মনে পড়ে। বড় কষ্টে চলে গেছেন। এখন স্ক্রিপ্ট শুনতেই সময় কেটে যাচ্ছে। সাকসেসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আরও বেশি করে মাটি আঁকড়ে ধরেছে। হাওয়ায় ভাসার একটুও শখ নেই।

“আই হ্যাভ অনাদার এক্সকুইজিট রোল ফর ইউ” ফোনে বসুন্ধরা “ফর ইউ অ্যান্ড ইউ ওনলি। ক্যান আই কাম অ্যালং উইথ দ্য স্ক্রিপ্ট?”

“ইউ নো, ইউ আর ওয়েলকাম এনিটাইম। আই সাপোস ইট উইল টেক এ ডে টু গো থ্রু দ্য স্ক্রিপ্ট?”

“ইফ ইউ ক্যান স্পেয়ার...”

“শ্যাল উই সে আফটার টুমরো, স্যাটারডে?”

“ফাইন। আই উইল কুক সাম লাঞ্চ ফর ইউ”

“ইলেভেন ও’ক্লক শার্প”

দেওয়ালি উদগ্রীব আগ্রহে রান্না স্নান শেষে যেই বেরিয়েছে, সিকিওরিটি জানাল বসুন্ধরা এসে গেছে।“আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর ইউ টু বি ব্যাক ফ্রম এলএ। ওনলি ইউ, ফিট ইনটু দ্য ক্যারেক্টার”

“বসুন্ধরাজি, দ্যটস সো কাইন্ড অফ ইউ টু থিংক অফ মি। ইউ গেভ মি মাই ফার্স্ট বিগ ব্রেক। হাউ ক্যান আই ফরগেট দ্যাট? নেভার। নাউ হোয়াট হ্যাভ ইউ ইন স্টোর ফর মি?”

“দিস ইজ মাই ওউন ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য গ্রিক মিথলজি অ্যাবাউট প্রমিথিয়াস। হ্যাভ ইউ হার্ড অফ প্রমিথিয়াস?”

“নো”

“মেরি সেলিজ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ওয়াজ দ্য দেন মডার্ন অ্যাডাপ্টেশন অফ দ্য গ্রিক মিথলজি। সিওরলি ইউ হ্যাভ হার্ড অফ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন?”

“অফ কোর্স। আই হ্যাভ রেড ইট”

“ওয়েল লেট মি ফার্স্ট টেল ইউ এ বিট অ্যাবাউট দ্য গ্রিক মিথলজি। প্রমিথিয়াস ইজ বেস্ট নোন ইন গ্রিক মিথলজি, অ্যাস দ্য গ্রেটেস্ট বেনিফ্যাক্টর, হু ব্রট ফায়ার টু ম্যানকাইন্ড। হি সাইডেড উইথ ঝিয়াস অ্যান্ড

আদার অলিপম্পিয়ান গডস, ইন দ্য কসমোলজিক্যাল স্ট্রাগল উইথ ক্রোনস অ্যান্ড আদার টিসিয়ান্স; বিইং অন দ্য কঙ্কারিং সাইড, ইন দ্য ড্রেডফুল ওয়ার উইথ দ্য গ্রিক গডস, লাইক টাইট্যানোম্যাকি অ্যান্ড আদারস। আলটিমেটলি ডিফিটিং ক্রোনস অ্যান্ড আদার টিসিয়ান্স”

গল্পটা শুনতে ভাল লাগছে। কিন্তু দেওয়ালি বুঝতে পারছে না, হঠাৎ বসুন্ধরা গ্রিক মিথলজি নিয়ে পড়ল কেন? যদ্দুর শুনেছে তাতে তো প্রমিথিয়স পুরুষই মনে হচ্ছে। বলিউডে কী গ্রিক মিথলজি চলবে?

বসুন্ধরা বলে চলেছে “প্রমিথিয়স, হ্যাপেন্ড টু বি দ্য সন অফ টিটান, আয়েপেটাস অ্যান্ড ক্লাইমিন, ওয়ান অফ দ্য ওসেনয়েডস। হি হ্যাড এ ব্রাদার নেমড এপিমেথিয়াস” দেওয়ালিকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল “ইউ মাইট বি ওয়ান্ডারিং হোয়াই আই অ্যাম ন্যারেটিং এ গ্রিক মিথলজি। ইট হ্যাস রেলেভ্যান্স টু মাই স্ক্রিপ্ট। অ্যাপারেন্টলি প্রমিথিয়াস সিগ্নিফায়েজ ফোর থট, অ্যান্ড এপিমেথিয়স সিগ্নিফায়েস আফটার থট। ওয়ান ডে, হি ওয়েন্ট টু ঝিয়াস অ্যান্ড আস্কড হিম হোয়াই হি ওয়াজ নট গিভিং ফায়ার টু ম্যানকাইন্ড? ঝিয়াস রিপ্লায়েড দ্যাট ম্যান ওয়াজ হ্যাপি, অ্যান্ড উড নট বি সো, ইফ দে গট ফায়ার, অ্যাস দে ডোন্ট হ্যাভ এ ক্লু হাউ টু ইউজ ইট। ঝিয়াস রিফিউসড টু গিভ দেম ফায়ার। প্রমিথিয়াস স্টোল ফায়ার ফ্রম মাউন্ট অলিম্পাস অ্যান্ড গেভ ইট টু হিউম্যানিটি, মাচ টু ডিসকন্টেন্ট অফ ঝিয়াস” থেমে বলল “হাউ ওয়াজ দ্য স্টোরি?”

“ইন্টারেস্টিং” এতক্ষণ এক নাগাড়ে শুনছিল। এবার সিগারেট ধরিয়ে বলল “হোয়াট রেলেভ্যান্স হ্যাস ইট উইথ দ্য স্ক্রিপ্ট? সিওরলি ইউ আর নট মেকিং এ মিথলজিক্যাল স্টোরি!”

“ডেফিনিটলি নট। কামিং টু ইট। ম্যান হ্যাড বিন ফ্রাইটেন্ড অফ ফায়ার। সো দে রেস্পেক্টেড ঝিয়াস। ওয়ান্স দে গট দ্য গিফট অফ ফায়ার, দে রিয়েলাইজড, হোয়াট ইট কুড ডু। মাচ টু দ্য র‍্যাথ অফ ঝিয়াস, হু রিয়েলাইজড, হি হ্যাড লস্ট হিস পাওয়ার অ্যান্ড দ্য অ্যাডরেশন দ্যট অ্যাকম্প্যানিড ইট। ইন আওয়ার ভেদিক মিথ টু, দেয়ার দ্য ওয়ার্ড ‘প্রমথ’ হুইচ মিন্স টু স্টিল। দেয়ার ইজ এ সিমিলারিটি উইথ দ্য গ্রিক মিথলজি। ফ্রম দ্য ওয়ার্ড প্রমথ কেম ‘প্রমন্থ’ হুইচ ওয়াজ এ টুল টু ক্রিয়েট ফায়ার” থেমে বলল “আই নিড এ ড্রিঙ্ক”

“লেট মি গেট ইউ এ ক্যান অফ বিয়ার”

বিয়ারে চুমুক দিয়ে বলল “ইন রিগ ভেদা মাতারিসভন ইজ দ্য নেম অফ অগ্নি, হু ব্রিংস দ্য ডিভাইন ফায়ার টু দ্য ভৃগুজ। মেরি সেলি ক্রিয়েটেড ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অন দ্য সেম কনসেপ্ট। দ্য ব্লেসিং অফ গুড। মাই সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার ইন দ্য স্ক্রিপ্ট, ইজ নট প্রমিথিয়াস অর প্রমথ অর ভিক্টর, বাট দেওয়ালি, অ্যান্ড... দ্যাট ইজ, ইউ”

এবার দেওয়ালির কাছে পরিষ্কার। বসুন্ধরা বর্তমানের প্রেক্ষাপটে একই ভাষায় কোনও গল্প বলতে চাইছে, যা আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়ে সমাজকে আবার নতুন জীবন দেবে। এতক্ষণ বুঝতেই পারছিল না, কেন বসুন্ধরা তাকে স্ক্রিপ্ট না শুনিয়ে গ্রিক মিথলজি শোনাচ্ছে। একই মন্ত্র, যার ভিত্তিতে ফ্র্যাঙ্কেন্সটাইন লেখা হয়েছিল, সেটা আজকের দিনেও প্রযোজ্য।

বসুন্ধরা বলল "ইজ দ্যাট ক্লিয়ার হোয়াই আই ওয়াজ সিঙ্গিং এ প্রেলুড অফ মিথস, বিফোর ন্যারেটিং মাই স্ক্রিপ্ট? দ্য স্টোরি ইজ দ্য সেম, ইভন টুডে। দ্য রোল অফ ফায়ার, কিন্ডলিং হিউম্যানিটি। বি ইট প্রমিথিয়াস, অর ভিক্টর, অর ইন মাই স্টোরি দ্য প্রোট্যাগনিস্ট, হুম আই হ্যাভ পোট্রেইড অ্যাস এ ফিমেল। আই ওয়ান্ট ইউ ফর দ্য লিড রোল। দ্য ট্রুথ ইন রিয়ালিটি, ইন টুডেস কন্টেক্সট। আই হ্যাভ মেইড এ নাইস স্ক্রিপ্ট"

এ জন্যেই বসুন্ধরা অন্যান্য পরিচালকদের থেকে স্বতন্ত্র। তাই বিদেশে ওর ছবি সমাদৃত হয়। তাই ওর ছবি করে দেওয়ালি কান্স-এর রেড কার্পেটে হাঁটতে পারে। হলিউড ব্লকবাস্টার মিলিয়ন ডলারের ছবি করতে পারে। কিন্তু একজন ইন্ডিয়ানের-ই ক্ষমতা আছে সেই দর্শন দেওয়ার, যা এতক্ষণ শোনাল বসুন্ধরা।

"আরন্ট ইউ হাংরি?"

"আই অ্যাম ফ্যামিসড"

"দেন লেটস হ্যাভ লাঞ্চ, বিফোর আই হিয়ার ইওর স্টোরি"

যখন বসুন্ধরা গেল, তখন রাত হয়ে গেছে। শুনতে শুনতে, চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে গিয়ে অনুভব করল, এমন ছবি সে এতদিন পায়নি। চরিত্রটাকে পুরোপুরিভাবে হজম করলে দারুণ কাজ হবে। ঠিকমতো করতে পারলে অনেক অ্যাওয়ার্ড গ্যারান্টিড। ভেতরে রোমাঞ্চ। বলিষ্ঠ লয়ে নতুন আঙ্গিকে...

লোখান্ডওয়ালার বাইরের কোলাহল ম্লান। একাকী ঘরে নতুন চরিত্রের গভীরে। সুরটা ভেতরেই ছিল, আজ এই গল্পের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে শুধু... টু এক্সেল, ইউ হ্যাভ টু বি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য রেস্ট...

হলিউডে প্রথম ছবি মিলিয়ন ডলারের বিজনেস করে তাকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। কিন্তু চূড়াটা এখনও অধরা। মাউন্ট অলিম্পাসের চূড়ায় সম্রাটের মতো...

শুধু প্রমিথিয়াসের মতো একটু বুকের পাটা চাই। নরকের তোয়াক্কা না করে সেই উচ্চতা থেকে একটু আগুন এনে ভরিয়ে দিতে হবে নিজেকে।

ত্রিশ

“আজকাল প্রোগ্রাম খুব কমে গেছে” ঋষিকার আক্ষেপ।

“সত্যি ঋষিকাদি। তুমি তো এবার অ্যামেরিকার বঙ্গ সংস্কৃতিতে গেছ। আমার তো সেটাও জোটেনি। এখন প্রোগ্রাম বলতে কিছু এন আর আই মাঝেমধ্যে বাইরে থেকে এলে নিজেদের দেশি গরজ প্রমাণ করতে উইভারস স্টুডিও বা আইসিসিআর-এ আমার ডাক পড়ে” পরাজিত, দুর্জয় মেয়েলি ভঙ্গিমা।

“কী যে করব বুঝতে পারছি না। এখন আর লোকে এসব ট্র্যাডিশনাল গানের প্রোগ্রাম স্পন্সর করতে ইচ্ছুক নয়”

“তুমি তো অন্তত গানের স্কুল খুলে কিছু পাচ্ছ”

“খুলেছি বটে, তেমন আর চলছে কই? গুটিকয়েক স্টুডেন্ট”

“তুমি প্যাকেজিংটা পাল্টাও। এবার পঞ্চকবি থেকে নবম কবি, কিংবা ওরকম কিছু একটা বার কর”

“নবম কবি পাব কোত্থেকে? যখন জন্মায়নি!”

“ইনভেন্ট কর। খুঁজে খুঁজে বার কর আর কোথায় কোন কবি আছে, যার কথায় গাওয়া যায়। তোমার তো নিজের গান কিছু নেই, যা দিয়ে বাজারে টিকে থাকবে”

শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটা তো মিথ্যে নয়। এতদিন নেশার মতো পঞ্চকবি প্যাকেজটা ভালই চালাচ্ছিল। এমনিতেই বাজারের যা হাল, তাতে ওই সেকেলে অশ্রুমোচন আর কেউ নিতে চাইছে না। কদ্দিন আর এই নিয়ে চলবে। মনে পড়ে, বহুদিন আগে অরিজিৎদা বলেছিল ‘নতুন কিছু কর’। তখনও ক্ষমতা ছিল, করতেই পারত। শোনেনি। ব্র্যান্ডিং-এর আশায় আর পাবলিসিটির নেশায় সেই উপদেশ বর্জন করেছিল। আজ কথাগুলো শেল হয়ে বিঁধছে। মানুষ যখন নাম, খ্যাতি, অর্থ, প্রতিপত্তির পেছনে ছোটে, সময় হয় না নিজেকে দেখার।

“ইনভেন্ট করার থাকলে কী আর অন্যদের গান গাইতাম? নিজের গান নিয়েই বাজারে নামতাম”

দুর্জয়ের মনে হল, আচমকা বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সত্যি কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে। বেশ বুঝতে পারছে, সেও একইভাবে স্খলনের পথ বেছে নিয়েছে, নিজেকে কাল্টিভেট না করে। তৈরি করার মতো কিছুই তো ছিল না। কিংবা থাকলেও, দেখার চেষ্টা করেনি। দেখতে চায়নি। বুঝতেই চায়নি।

“কিছু যদি মনে না কর, একটা কথা বলি। আমি তো কয়েকটা সিনেমায় ছোটখাটো রোল করেছি, কয়েকটা সিরিয়ালও। ভাবছি সিরিয়ালেই নেমে পড়ব। অন্তত কিছু করার তো থাকবে, ইনকামও হবে।

আমার সঙ্গে সিরিয়ালে নামবে?”

চমকে উঠল ঋষিকা। কোন্নগর থেকে এত বছর ধরে কত চড়াই-উতরাই পার হয়ে, ঘর খুইয়ে, পেয়ে, আবার আধো হারিয়ে, এখানে পৌঁছেছে। এতদিনের সাধনা কী মাঠে মারা যাবে? শেষ পর্যন্ত সব ছেড়েছুড়ে সিরিয়াল! লাইমলাইটে থাকতে গেলে এছাড়া আর কোনও গতি নেই। গান অর ফান। অন্তত জনসমক্ষে থাকতে পারবে, কিছু রোজগারও হবে। এখন এছাড়া আর কী উপায়? জনমত, জনগণ, ছাড়া যে তার অস্তিত্বটাই টালমাটাল। কোনওদিনও যেটা খোঁজার চেষ্টা করেনি, ভাবতে শেখেনি।

“কথা বলে দেখ। কী রোল দেবে জানি না!”

“মা-মাসির কিছু একটা রোল জুটে যাবে। আমার ওপর ছেড়ে দাও। চিন্তা কর না”

দুর্জয় চলে যাওয়ার পর সোজা গাড়ি নিয়ে রূপজিতের ফ্ল্যাটে “হঠাৎ, এই সময়, না বলে?”

“তোমার ফ্ল্যাটে আসতে গেলে কি পাঁজিতে দিনক্ষণ দেখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে হবে?” ঝাঁঝিয়ে উঠল ঋষিকা।

“আমি কী তাই বলেছি?” বুঝতে পারছে ঋষিকার মুড অফ।

“আমাকে জড়িয়ে ধরে ভীষণভাবে আদর কর”

ঋষিকাকে জড়িয়ে মুখটা তুলে বলল “কী হয়েছে বল-তো?”

“তোমাকে বড় প্রয়োজন। আমাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নাও। আরও... আরও... আরও... জোরে। শক্ত করে...”

বুঝতে অসুবিধা হল না, ঋষিকা একটা আশ্রয় খুঁজছে।

“বিয়ে না করলে সব ফাঁস করে দেব” শঙ্করীর চমকানিতে ঘাবড়ে গেল অঞ্জন।

সারা জীবন এত মহিলার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছে, বিয়ের প্রশ্ন তো আগে ওঠেনি। দু-দুবার বিয়ে করতে গিয়েও যখন হয়নি, বিয়ে নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি। না করেই যদি সব পাওয়া যায়, তবে বিয়ে কেন? অনেক দায়। একজনের সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। লাগাতে লাগাতে লাগানোটাই ধর্ম হয়ে গেছে। এই বুড়ো বয়েসে সেই ধর্ম ছেড়ে কি না ঘরসংসার করা! তাও আবার ঝিয়ের সঙ্গে! অধর্মের চূড়ান্ত। তবু ওর বাচ্চাটা যদি নিজের হত। এই উঠতি চৌবাচ্চা ঘরে তুলে হ্যাপা কে সামলাবে? শঙ্করী না হয় সিকিউরিটি খুঁজছে, অঞ্জনের সম্পত্তির ভাগীদারি। ঝি-এর কাছ থেকে আর বেশি কী আশা করা যায়?

“বিয়ে! হঠাৎ বিয়ে করব কেন? নয় তোমার সঙ্গে একটু ফুর্তিই করেছি। সে তো অনেক মেয়ের সঙ্গেই করে থাকি। নতুন কী?”

“সোজা বলে দিলাম, বিয়ে না করলে সব ফাঁস করে দেব”

বুঝতে পারছে না, কী ফাঁস করবে? কী যে ভীমরতি হয়েছিল ওর সঙ্গে... এমন তো অনেক দিন যায়, যেখানে কিছুই জোটে না। শোভনের ম্যাগনো ইন্ডিয়ার কত কর্মচারীকেই তো প্রপোস করেছে। সবাই তো আর রাজি হয়নি। সেদিনও তো অফিস শেষ হওয়ার পর অভ্যাস মতো দীপশিখাকে “আজ রাতে ফ্রি?”

“নাঃ। আর থাকলেও, আপনার মতো বুড়ো হাবড়ার সঙ্গে শোব কেন? আমার কি খরা পড়েছে? হাত নাড়লেই, অনেক ছোকারা লাফিয়ে উঠবে। এই চেহারায় ওদের দাঁড় করাতে বেশি সময় লাগবে না” দীপশিখার তির্যক উত্তর।

রাগে, দুঃখে গা ঘিনঘিন করেছিল। এত বড় অপমান! ওদের বস আর অফিসের অন্যান্য স্টাফরা কত সম্মান করে, ও কি ভুলে গেছে? সে তো আর যে সে লোক নয়, অঞ্জন স্যার! তাকে ছাড়া শোভনও অসহায়। তাকেই কি না প্রত্যখ্যান? জিজ্ঞেস করে দেখুক না ইমাকে। মোটেই সে হাল-দাঁড়হীন নৌকো নয়। ইমা প্রেগন্যান্ট হওয়ার পর নিশ্চয়ই তাকে ঢোঁড়া সাপ বলবে না। অপমানে, রাগে ফুঁসছে। তাকে ছোকরাদের সঙ্গে তুলনা! এত বড় সাহস!

শঙ্করী তখন সবে অফিসের বাবু-দিদিমণিদের কাপ-প্লেটগুলো গুছিয়ে কিচেনে নেওয়ার উদ্যোগ করছে। সোজা শঙ্করীর কাছে গিয়ে বলল “আজ রাতে আমার বাড়িতে থাকবে?”

অঞ্জনের গুণ শঙ্করীর জানা। তবে তার মতো কাউকে ডাকবে, ভাবতেও পারেনি। ভয় করছে, না বললে যদি বাবুকে বলে দেয়, চাকরিটাই যাবে। এই বাজারে চাকরি গেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে? স্বামী ছেড়ে যাওয়ার পর, একাই সংসার টানছে, মেয়েকে বড় করছে। কতদিন হল কোনও পুরুষের সঙ্গ পায়নি। তারও তো চাহিদা আছে, সাধ, আহ্লাদ আছে। অঞ্জন-বাবু বলে কথা। খুশি করতে পারলে বকসিসও মিলে যেতে পারে। দিনকাল যা পড়েছে।

“কাজগুলো শেষ করে নিই”

“গাড়িতে অপেক্ষা করছি, অফিসের বাইরে, পাশের গলিতে। হয়ে গেলে চলে এস। কতক্ষণ লাগবে?”

“এই আধ ঘণ্টা”

অঞ্জনের ভজন ব্যঞ্জনা রসপূর্ণভাবে শেষ করে ভাবল, একটু বকশিস নিয়েই বা খালাস হবে কেন? আনন্দ দিয়েছে, আনন্দ নিয়েছে। এই আনন্দর রেশটাকে যদি ধরে রাখা যায়, মন্দ কী? কাঞ্চন, সুখভোগ, রসস্রাব শুধু নয়, সঙ্গে স্থায়ী আচ্ছাদন হলে মায়ে-ঝিয়ের পাকাপাকি হিল্লে যাবে। মেয়ে বড় হচ্ছে। ওর জন্য গুছিয়ে রেখে যেতে হবে, বৈকি। তাই বিয়ে।

বেগতিক দেখে অঞ্জন শোভনকে কথাটা পাড়ল। হাজার হোক মনিব বলে কথা। তার কথা অমান্য করলেও, মনিবের কথা অত সহজে টালতে পারবে না। শোভন ইতস্তত করছিল। মালিক হয়ে নিম্নতম কর্মচারীকে কী করে বলে, অঞ্জনদাকে ছেড়ে দিতে। যখন বলেছে, কিছু তো করতেই হয় "টাকা নিয়ে ব্যাপারটা ভুলে যাও"

"না বাবু, আমি পোয়াতি। আমার ইজ্জতের কি কোনও দাম নেই?" শঙ্করী নাছোড়বান্দা।

"বিয়ে ছাড়া আর কী করলে ছাড়বে?"

"মেয়েমানুষের ইজ্জত। তাহে কী টাকা দিয়ে কিনবে? না বাবু, বিয়ে করতেই হবে বলে দিলুম"

মহা ফ্যাসাদ। অঞ্জন বুঝে উঠতে পারছে না কি করে ঘাড় থেকে নামাবে। সে যে ঝি-এর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছে, বাজারে রটলে মহা ফ্যাসাদ। এতদিনের সাজানো বাগান পুড়ে ছাই।

শোভন হেসে বলল "বিয়ে করে নাও। বয়েস তো হয়েছে। এই বয়েসে ফ্রি দেখাশোনা রান্নাবান্না করার লোক পাবে"

"তা বলে ঝি?"

"মডার্ন বউদের চেয়ে ঝি-রাই ঘরের কাজ ভাল করে" শোভন মুচকি হাসছে।

হাফ-টাক চুলকিয়ে বলল "শেষ পর্যন্ত দেখছি করতেই হবে"

"করলেই ভাল। অসুখে বিসুখে সেবা শুশ্রূষা করতে পারবে। ওর মেয়েটাও তো সোমত্ত। অফ টাইমে ফুর্তিও দেবে। হে... হে... হে..."

"আমি কিনা ঝামেলায় মরছি, আর তুমি হাসছ?"

"ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই করেন"

ঈশ্বরের আশীর্বাদ হয়ে, মায়ে-ঝিয়ে অঞ্জনের নাকতলার বাড়ি আলোকিত করল।

ডাঃ দেবাশিস রায়ের দিকে তাকিয়ে শুভ্রজিৎ বলল "আমার কী হয়েছে বলুন তো? কিছুই ভাল লাগছে না"

"ডিপ্রেশন। অ্যাকিউট ডিপ্রেশন অ্যান্ড আইডেন্টিটি ক্রাইসিস"

"আগে তো কখনও ছিল না"

"আগে তো সাকসেস ছিল, সমর্পিতা ছিল, সামনে ভবিষ্যৎ ছিল। এখন ওগুলো নেই। আপনি তো এ লাইনে অনেকদিন আছেন। একদিন গ্ল্যামার থাকবে না, এটা আপনি জানেন না?"

"জানা এক জিনিস আর বাস্তবে ফেস করা আরেক। বোধহয় ফেস করতেই অসুবিধা হচ্ছে"

সিনিয়ার সাইক্যাট্রিস্ট ডাঃ দেবাশিস রায় ভারী ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে শুভ্রজিৎকে দেখল। জীবনে তো কম সেলিব্রিটি হ্যান্ডেল করে তাদের আবার সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেয়নি। হতে পারে এক নম্বর হিরো। কিন্তু দেবাশিসের কাছে শুধুই পেশেন্ট, অ্যানাদার ওয়ান।

"ভারচুয়ালিটি যখন রিয়ালিটিতে নেমে আসে, তখনই প্রবলেম। সো কমন উইথ দ্য সো-বিজ। অবশ্য অন্যরা আপনার থেকে আলাদা। তাদের সাকসেসটা আপনার মতো লং-ড্রন নয়। তাই অনেক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারে। আপনি যেহেতু অনেকদিন ধরে পিকে ছিলেন, স্টারডমটা আপনার কাছে অনেকটা কম্পালসিভ অবসেশনের মতো - না পারছেন ধরে রাখতে, না পারছেন ছেড়ে বেরতে। ইট মে বি এ হোয়াইল টু গেট ওভার, বাট নট ইম্পসিবল"

"কতদিন?"

"থ্রি টু সিক্স মান্থস। ইট ইজ কলড অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার। আপনি একা নন - পল গ্যাসকয়েন, হ্যারিসন ফোর্ড, এমিলি লয়েড, মিচেল ফাইফার, উইওনা রাইডার, অনেকেই এই অবসেশনে ভুগেছেন। অফ কোর্স ইচ কেস ইজ ডিফারেন্ট"

"সব সময়ই তো স্টারডমের পিকে থেকেছি একমাত্র আর্লি ফেজে কয়েকটা বছর বাদে। ইট হ্যাস বিকাম এ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ মাই লাইফ। হঠাৎ সব কিছু খালি..."

"এই ভয়েডকে ফিল করতে কোনও হবি?"

"নাঃ, সেরকম কিছু নেই"

"বই পড়া?"

"সেগুলো আর হয়ে ওঠেনি। তিনটে সিফটে কাজ করে যখন বাড়ি ফিরতাম, আই ওয়াজ এক্সহসটেড। কিছু যে করব, এনার্জিও ছিল না"

"তাই অবসেশন, বারবার ওই গ্ল্যামারে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা। গ্ল্যামার তো আর্টিফিশিয়াল মেক-বিলিভ ওয়ার্ল্ড। অন্যদের তৈরি করা, আনরিয়ালিটি। এই ডেলিউশন থেকে বেরিয়ে আসার একটাই উপায় - ভুলে যেতে হবে আপনি কী ছিলেন। রিয়ালিটিতে দাঁড়িয়ে শুধু মানুষ হিসেবে জীবন কাটাতে হবে। জাস্ট লাইক এনি আদার কমনার"

"ভারচুয়ালিটি বলুন আর ডেলিউশন বলুন, এ ছাড়া তো আমার আর কোনও দুনিয়াই নেই"

"স্ত্রী চলে গিয়েই ব্যাপারটা আরও বেশি প্রমিনেন্ট হয়ে উঠেছে। আসলে আপনি নিজেকে দেখতেই শেখেননি"

"তার মানে?"

“অন্যের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখার চেষ্টা করেছেন, মেক-বিলিভ ওয়ার্ল্ডের চশমা পরে। অন্যরা যে ভাবে আপনাকে এতদিন দেখতে শিখিয়েছে”

“তিরিশটা বছর তো এভাবেই দেখেতে শিখেছি। এখন কি আবার নতুন করে দেখা সম্ভব?”

“কেন নয়? নো এজ ইজ আউট অফ বাউন্ডস অফ রিঅ্যাসেসিং সেলফ। আমরা সকলেই করে থাকি। উইথ ম্যাচিওরিটি, আওয়ার পারসেপশনস চেঞ্জেস”

তাহলে কী শুভ্রজিৎ এখনও ম্যাচিওরড হয়নি? ভীষণ অসহায় লাগছে। যে বাঁ আঙুলে এতদিন ধরে টলিউড ইন্ডাস্ট্রির ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে, ম্যাচিওরড না হলে কি তা সম্ভব ছিল? ডাঃ রায় কোথাও ভুল করছেন না তো? ভেতরের অঙ্কগুলো জানেন না বলেই হয়ত অন্য পারস্পেক্টিভে দেখার চেষ্টা করছেন।

“আর ইউ সিওর ডাঃ রায়?”

“পসিটিভ। এটাই আমার প্রফেশন, এটা করেই খাই। কিছু ওষুধ লিখে দিচ্ছি। টাইম মতো খাবেন। আর প্রতি ফর্টনাইটে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন। অ্যাট লিস্ট ফর ফার্স্ট থ্রি মান্থস”

চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল। সব কিছু মেনে নিতে না পারলেও, কাউকে তো বিশ্বাস করতে হবে। এখন ডাঃ রায় ছাড়া তার জীবনে কে আছে? উনি তো আশ্বাস দিয়েছেন সব ঠিক হয়ে যাবে। শুধু সমর্পিতাই নয়, অনুশ্রীর জন্যেও তো সেভাবে টাইম দেয়নি। কেরিয়ারের ইন্টক্সিকেশনে বিয়ে করেও ঘর চিরকালই সেকেন্ডারি থেকে গেছে। হয়ত টাইম দিলে তিন-তিনবার এভাবে বিয়ে ভাঙত না। ইট ইজ টু লেট নাউ। এখনও কোথাও গিয়ে দাঁড়ালে মিডিয়ার ফ্ল্যাশ তার ওপর পড়ে। ডে-নেক্সট কভার স্টোরি হয়ে যায়। কতটা তাকে লাইমলাইটে রাখার জন্য, আর কতটা মিডিয়ার টিকে থাকার, এখন আরও বেশি প্রকট। যখন রোশনাই নিভে যায়, ঘরে ফিরে নিরালা নিঝুম অন্ধকার। তার পাশে কোনও বনলতা সেন নেই। প্রাচুর্যের মধ্যেও বিশাল একটা ভয়েড তাকে জায়েন্ট শার্কের মতো গিলে ফেলে। সেখানে স্টুডিওর প্রখর আলো নেই। ফ্ল্যাশের ঝলকানি নেই। ফ্যান আর ফলোয়ারের উন্মাদনা নেই। ক্ল্যাপ থেকে ক্ল্যাপস্টিক... কিছুই নেই। রিদম মেলাবার জন্য মিউজিকের বিট নেই... সকালে ড্রেসিং রুমে ঢুকে মেক-আপের ব্যস্ততা... সব হারিয়ে গেছে... এখন মনে হচ্ছে ডাঃ রায় হয়ত ঠিকই বলছিলেন। এখন আবার সময় হয়েছে নিজেকে নতুন করে কাছ থেকে দেখার।

একত্রিশ

একটা অস্কার অ্যাওয়ার্ড!

ডলবি থিয়েটারের রেড কার্পেটের ওপর স্টেজে যাওয়ার সময় যখন হাজার ফ্ল্যাশ ঝিলিক দিচ্ছিল, যখন দুনিয়ার সব চ্যানেলের ক্যামেরা ক্লোজ আপে তাকে ধরার চেষ্টা করছিল, সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, স্বপ্নে দেখা ধ্রুবতারাটা লস এঞ্জেলসের এই আসরে নেমে এসে তার ওপর অদেখা ম্যাজিক ওয়ান্ড বুলিয়ে দিচ্ছে।

মুম্বাইতে থাকাকালীন মার্ক ফোনে জানিয়েছিল "আই হ্যাভ এ নিউজ ফর ইউ। বিফর দ্যট বি সিওর টু ব্রিং এ বটল অফ ক্রুগ ক্লস ডি' অ্যাম্বনায়উইথ ইউ হোয়েন ইউ কাম টু এলএ। দো আই উড হ্যাভ প্রেফারড গাউট ডি ডায়ামন্টস, আই নো ইউ ক্যান্ট অ্যাফরড ইট। ইট কস্ট, ওনলি টু-মিলিয়ন ডলারস" ওপাশ থেকে হাসছে। দেওয়ালি মার্কের ভাষা বুঝতে পারছে না। কী সব নাম বলছে! বাপের জন্মে শোনেনি।

"হোয়াট আর দোস?"

"স্যাম্পেনস। এক্সপেন্সিভ স্যাম্পেনস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ক্রুগ ক্লস ডি' অ্যাম্বনায় ইজ নট দ্যট এক্সপেন্সিভ। ওনলি ২৫০০ ডলারস। আই অ্যাম সিওর ইউ ক্যান অ্যাফরড দ্যট"

"ইজ ইট সামথিং স্পেশাল দ্যট উই শুড সেলিব্রেট?"

"ইউ উইল জাস্ট জাম্প। বিফর আই ডিসক্লোজ, প্রমিস টু গেট মি এ বটল"

"এনিথিং ফর ইউ মার্ক। হোয়াটস দ্য রিজয়সিং ফ্যাক্টর?"

"ইউ হ্যাভ বিন নমিনেটেড ফর দ্য বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্ট্রেস ফর ইওর রোল ইন ফালক্রাম"

"ইউ মাস্ট বি জোকিং। ইউ আর আউট অফ ইওর মাইন্ড। আর ইউ রানিং হাই রাইট নাউ?"

"নাইদার অ্যাম আই জোকিং, নর অ্যাম আই আউট অফ মাই মাইন্ড। ইট ইজ ট্রু। গেট রেডি টু ফ্লাই টু এলএ, আফটার এ মান্থ। আই বিলিভ দ্য সেরিমনি উড বি হেল্ড অ্যাট ডলবি থিয়েটার"

দেওয়ালি বিশ্বাস করতে পারছে না, কলকাতার মতো ছোট্ট শহর থেকে আসা একটি বাঙালি মেয়ে, কোনও ব্যাকিং ছাড়াই, কোথাও একটা জায়গা করে নিতে পেরেছে। একে ভাগ্য ছাড়া আর কী বলা যায়? মার্কের সঙ্গে যোগাযোগটা ঠিক যেভাবে ভাগ্যই করিয়ে দিয়েছিল। ফালক্রামে ইন্দ্রাক্ষি চরিত্রটা ডিফিকাল্ট ছিল। অন্য ধাঁচে খুনের গল্প, প্রথাগত ডিটেকটিভ কাহিনি থেকে আলাদা। দেশি ও বিদেশি চিরায়িত গত ভেঙে এই গল্পের খুনগুলো সাইন্টিফিক। অনেক চরিত্রের মধ্যে, ইন্দ্রাক্ষি চরিত্রটারও অনেক ব্যঞ্জনা ছিল। বিশেষ করে একজন মডার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়েও যখন ক্রনিক অবসেসিভ সাইকোসিস ডিসঅর্ডারের রোগী।

দেওয়ালি বেশ কয়েকজন সাইকিয়াট্রিস্ট-এর সঙ্গে দেখা করেছিল, চরিত্রটাকে বোঝার জন্য। মানসিক রোগী হলেও নতুন আঙ্গিক আছে চরিত্রটির মধ্যে।

এমনিতে আজকাল খুব একটা বই পড়ে না। তবুও ইন্দ্রাক্ষি চরিত্রটিকে বুঝতে, তাকে প্লেটোর দর্শনের কিছু অংশও বুঝতে হয়েছে। দিনের পর দিন তালিম, আয়নার সামনে নিজেকে বারবার তৈরি করা, শটের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। যদিও পারসুইটের মতো বক্স অফিসে অত হিট করেনি, ব্যাবসা ভালই করেছিল। পারসুইট যতটা ফাস্ট পেসড, এই গল্পটা অনেক বেশি অ্যানালিটিক্যাল। সেদিকে দিয়ে অভিনয় দেখানোর সুযোগও পারসুইটের থেকে অনেক বেশি।

"ইফ হোয়াট ইউ সে ইজ ট্রু, সিওরলি আই ও ইউ এ বটল"

"ক্রুগ ক্লস... আই উইল কিপ ইউ ইনফরমড"

এলএ ম্যরিয়টের সুইটে বসে আরেকটা স্যম্পেনের অর্ডার দিল। যদিও পোস্ট অ্যাওয়ার্ড ব্যাঙ্কয়েটে খেয়েছে, সেটা নেহাতই সৌজন্যমূলক। নমিনেশন পাওয়া এক জিনিস, আর সাপোর্টিং রোলে অস্কার পাওয়া অন্য। উত্তেজনায় ভালভাবে কিছু খেতেও পারেনি। একজন এশিয়ান হয়ে রেড কার্পেটে হেঁটে, ডায়াসে উঠে অস্কার নিয়ে আসা? ভাবতেই পারেনি। সব কিছুই আবছা। মনেই পড়ছে না, দু-একটা কথা বলেছিল মাইক হাতে। বাকি সেরিমনিটা চুপচাপ বসে থাকলেও, ঠিক ফলো করতে পারেনি। ভেতরে ভেতরে কেঁপেছে, মুখে কম্পসড ভাব রেখে, পুরো অনুষ্ঠানটাই কাটিয়ে দিল। যে ড্রেসটা পরেছিল, সেটা কোনও নামি ডিসাইনারের নয়, কলকাতার অনামিত্রাদির। মার্কের কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর কলকাতায় গেলেও, কাউকে জানায়নি খবরটা। অনামিত্রাদিকেও নয়। পালিত স্ট্রিটে গিয়ে শুধু বলেছিল "একটা এক্সকুইজিট ডিসাইনার ড্রেস করে দিতে পারবে?"

"কীসের জন্য?"

"হলিউডের একটা পার্টির জন্য। টিপিক্যালি ইন্ডিয়ান। হোয়ার আই স্ট্যান্ড আউট অ্যামং দ্য ফরেনার্স"

অনামিত্রার বুঝতে অসুবিধা হয়নি, দেওয়ালি কী চাইছে। র সিল্ক, ক্রিমের ওপর লাল ডোরাকাটা স্লিভলেস বডি হাগিং গাউন। ওপরের অংশের লাল ডোরাগুলো ব্রায়ের সাপোর্টের মতো সেমিসারকেল করছে ওপরের দিকে। কোমরের কাছে ল্যাটার‍্যালি সেন্ট্রিফিউগ্যালি বাইরের দিকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিউবিক রিজিয়নে ওভাল লাল প্যাচ। কুচকি থেকে হাঁটু অবধি লাল প্যাচগুলো ক্রিস-ক্রস, অনেকটা মৎস্যকন্যার মতো। হাঁটুর নীচে কিছু স্ট্রিক্স থাকলেও, মেইনলি ক্রিম রঙের আফটার টেল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। এক্সকুইজিট!

বেশ কয়েকবার ট্রায়ল অ্যান্ড মডিফিকেশনের পর ফাইন্যাল ট্রায়েলের সময় অনামিত্রা বলল "করে তো দিলাম। ভাল কি মন্দ লোকে বলবে। এটা পরে চলতে পারবে তো?"

স্টুডিওতে বেশ কয়েকবার পায়চারি করে বলল “ঠিকই তো মনে হচ্ছে”

“যদি অসুবিধা হয়, টেলটা আরেকটু ছোট করে দিচ্ছি। দেখ, আবার হোঁচট খেয়ে পড়ো না”

“এখন ঠিকই লাগছে। কয়েকবার হেঁটে প্র্যাকটিস করে নিই”

সেই ডিসাইনার ড্রেসে দেওয়ালি। পোস্ট অ্যাওয়ার্ড ব্যাঙ্কয়েটে স্বচ্ছন্দভাবে হেঁটে চলে অন্যান্যদের কংগ্র্যাচুলেশন নিয়ে মৃদু হাঁসির প্রলেপ মেখে ঘুরে বেরিয়েছে। স্যাম্পেনের গ্লাস হাতে প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। শ্যামলা মুখে স্মিত হেসে লস এঞ্জেলেসের অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি নির্বিঘ্নে উতরে, হোটেলের সুইটে ফিরেছে। ড্রেসটা সযত্নে ওয়ার্ডরবে রেখে অস্কারটা বুকে আগলে নিঃশব্দ ঘরে একাকী উপভোগ করেছে। কত দিনের স্বপ্ন, কত দিনের সাধনা, কত দেওয়া-নেওয়ার পালা... শেষমেশ কনভারজ করল অস্কার।

“ম্যাম, হিয়ার ইজ ইওর স্যাম্পেন”

“অন দ্য লাউঞ্জ টেবল প্লিজ”

টিপস গুঁজে রুম সার্ভিস বেরিয়ে গেল। দেওয়ালি আধো অন্ধকারে স্যাম্পেনের কর্ক খুলে ফ্লুটে ঢালল। কপালে ফ্লুটটা ঠেকিয়ে, টোস্ট অফার করল, টু হার মাদার লাক ‘চিয়ার্স’। হার ওউন সেলিব্রেশন ইন সলিচুড। এ রেস্টিটিউট অ্যাট রিজয়সিং হার ভিক্টরি ইন হার ওউন ওয়ে।

অনেকটা পথ পার হয়ে এসেছে। লরেটো বউবাজার থেকে সায়েন্স কলেজ হয়ে লস এঞ্জেলস। ভৌগলিক দূরত্ব খুব বেশি না হলেও, মানসিক পরিধি অনেকটা। মাঝে ধ্রুবতারার রং পাল্টে গেছে, দিকটাও। স্ট্যাটিক? ওই তারাটা কী তবে এলিউসিভ? অ্যাস্ট্রনমারদের কাছেও আধো চেনা...

অন্যদের কথা বলতে পারবে না। কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে তো তাই। ধ্রুবতারার ঠিকনাটা বারবার পাল্টেছে। হাতে স্যাম্পেনের ফ্লুট, বুকে অস্কার আগলে ভাবছে, এটাই কী তার আল্টিমেট? তাই যদি হয়, এত আনন্দের মধ্যে, বিষাদ কেন? তারার সাজে সেজে, তারাকে কাছে পেয়ে, বুকে আগলেও, কোথায় যেন একটা শূন্যতা। দোলাচলে স্যাম্পেনের বোতলটা যখন প্রায় নিঃশেষ, তখন বিছানায় শুয়ে ঘুম। তখন একটাই স্বপ্ন, যা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাকে, তার অবচেতনের অলিন্দে।

বসুন্ধরার ছবিটা তাকে নতুন চেতনায় দীক্ষিত করছে। স্বপ্নে দেখা ওই তপ্ত অগ্নিপিণ্ড থেকে প্রমিথিয়াসের মতো তাকেও তুলে আনতে হবে একমুঠো আগুন। তুলে দিতে হবে আগামী প্রজন্মের হাতে। তাতে যদি তাকে ঝিয়াসের রোষে পড়ে উচ্ছিষ্ট হতে হয়, ক্ষতি নেই। তবুও এটাই হবে। অস্কার বুকে নিয়ে, মসগুল হওয়ার জন্যে ঈশ্বর তাকে বরমাল্য পরায়নি।

তার মধ্যেই... তার স্বপ্নের সমাধি, তার অবচেতনের পূর্ণতা, তার নিজেকে পাওয়ার পরিতৃপ্তি। সেই তো প্রমিথিয়াস, সেই তো ভিক্টরের ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, সেই তো আগামীর স্ফুলিঙ্গ। চেতনায় আলোড়ন। স্বপ্ন তো

আগামীর কল্পনায় গাঁথা ছবি। সেখানেই বসুন্ধরার ভাবনার স্ফুলিঙ্গ নতুন রূপ পাবে।

প্রমিথিয়াস মিথ থেকে আবার বাস্তবে...

বোতলটা নিয়ে বাকি স্যাম্পেনটুকু ফ্লুটে ঢালল। এতদিন ধরে ভাবছিল, গন্তব্যে পৌঁছনোর সার্থকতা কোথায়? এখন বুঝতে পারছে, হয়ত ঠিক বোঝেনি। এই চেতনার মধ্যে সে বুঝে নিল অজানা, অচেনা, এক অপূর্ণতাকে। যে তাকে ডাকছে নতুন সাজে। আভরণ, মাদকতা ভুলে, নতুন ছন্দে, ফ্লিটিং হরাইজনের সীমান্ত পেরিয়ে যেতে হবে জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার বাইরে। অস্কারের উন্মাদনায়, স্যাম্পেনের ফ্লুটে নয়... গড হ্যাস এন্ট্রাস্টেড হার উইথ এ ডেস্টিনি। দ্যট ইজ হার ফিউচার ফর হুইচ সি ওয়াজ বর্ন টু সার্ভ হিউম্যানিটি লাইক প্রমিথিয়াস। সি হ্যাস বিন এন্ডাউড উইথ ডিভাইন লাইট টু টিউন দ্য মাস্টার ক্যাডেন্স অফ টুমরো। নট ইন পেটি অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড অ্যাপ্লসেস। সি হ্যাজ বিন বর্ন উইথ এ মোটিভ অফ গড। অ্যান্ড ইট ইজ হার ডিউটি টু ফিল হার অব্লিগেশন টু হার ক্রিয়েটর। দ্য অস্কার ইজ এ টেম্পরারি গিফট ফ্রম হার গডমাদার টু কয়েঞ্চ হার মেটিরিয়াল লাস্ট। দেয়ার ইজ এ লাইফ বিয়ন্ড মেটিরিয়াল পারসুইটস। হার পারসুইট, নট দ্য হলিউড ফ্লিক দ্যট সেলস...

"কংগ্রাটস। হ্যাভ আই কট ইউ অ্যাট দ্য রং হাওয়ার?" বসুন্ধরা, বহুদূর দেশ থেকে।

"নট অ্যাট অল। ইন ফ্যাক্ট আই হ্যাড জাস্ট ওকেন আপ উইথ এ নিউ ড্রিম অ্যাকিন টু ইওর মুভি"

"দ্যাটস এ কমপ্লিমেন্ট ইন্ডিড। মাই মুভিস হ্যাভ নাউ কাম ইন ইওর ড্রিমস টু" বসুন্ধরা হাসছে।

কানিলিঙ্গাস-এর সিন দিয়ে, যার হাত ধরে বিদেশি মার্কেটে প্রবেশ, তারই নতুন ছবি স্ফুলিঙ্গ অবচেতনে অন্য মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। মন্ত্রটা এখন নিজস্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির সীমা উত্তীর্ণ করে বৃহত্তর ব্যাপ্তিতে। ফালক্রামে ইন্দ্রাক্ষি চরিত্রের ব্যঞ্জনা, যেখানে প্লেটোর দর্শনের ছোঁয়ায় অন্য মাত্রা পেয়েছে।

"সিওরলি ইউ আর কামিং ফর আওয়ার ক্যালকাটা প্রিমিয়র"

"হোয়েন ইজ দ্যট?"

"নেক্সট মান্থ, অন ফ্রাইডে দ্য থারটিন্থ"

"আর ইউ প্রেপিং ফর এ হ্যালোউইন স্কেয়ার?"

"নট কোয়াইট। থার্টিন ইজ সাপোজড টু বি এ লাকি নাম্বার, দো ইট হ্যাস বিন রংলি প্রিচড অ্যাস অ্যান আনলাকি ওয়ান"

"হোয়ার ডিড ইউ গেট দ্যট ইনফরমেশন?"

"ইফ ইউ রিড অ্যাবাউট স্যাটার্ন, ইউ উইল কাম টু নো। স্যাটার্ন ইজ দ্য গেটওয়ে টু হেভেন বিয়ন্ড মেটিরিয়্যাল রেল্মস"

“সিওর আই উড বি দেয়ার”

বসুন্ধরা ফোন কাটার পর দেওয়ালি ওর কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। লোকটা প্রচুর পড়াশোনা করে। মেটিরিয়াল গণ্ডির তো একটা সীমা আছে। ওটা টপকাতে পারলেই, আরেক দুনিয়া, অসীম। সেখানেই সাফল্যের পুরস্কার। অস্কারের ঊর্ধ্বে।

এবার তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পালা।

বত্রিশ

“আমার মজুরি আরও দু-লাখ বাড়াতে হবে” সৈকত ধূর্জটির উল্টো দিকের চেয়ারে বসে ঘোষণা করল।

“আরও দু লাখ?! অন্যান্য চ্যানেলের সিইওদের থেকে তোমায় তো অনেক বেশি দিচ্ছি। এর পরেও?”

“জিনিসপত্রের দাম যা বেড়েছে, কুলিয়ে উঠতে পারছি না”

“এমনিতেই চ্যানেল ভাল চলছে না। অনেক স্টাফের ডিউসও ঘাড়ে। এই সময় বাড়ালে তো টোটাল লসে রান করব”

“তুমি আর চ্যানেল চালাচ্ছ কোথায়? চালাচ্ছি তো আমি। তুমি খালি ইনভেস্ট করেই খালাস। তাও যদি পুরো চ্যানেলটা কেনার ক্ষমতা থাকত। ২০% স্টেক ধরে ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছ” সৈকতের কথাগুলো মোটেই ভাল লাগছিল না। এভাবে তো সৈকত কথা বলে না। আজ হলটা কী? হঠাৎ এমন দাবি কেন?

“চা না কফি?”

“কফি। ব্ল্যাক, চিনি ছাড়া”

ধূর্জটির একটুও ভাল লাগছে না, কিন্তু কিছুই করার নেই। চ্যানেলের মালিক হয়েও সৈকত ছাড়া চালাতে অপারগ। কম্পিউটারের ব্যাবসাটা যদিও বা একটু রপ্ত করেছিল, চ্যানেলটা তরুণের বুদ্ধিতেই কিনেছিল। বিপাক বুঝে সে-ও হাত গোটাল। এখন মালিক হয়েও একা চ্যানেল টানার ক্ষমতা নেই। অবশ্যই ৮০% স্টেক হোল্ডার চ্যানেল এক্সকে ডেকে আনতে পারে। তাহলে তো পুরপুরি সাইড-লাইন্ড হয়ে যাবে। নিজের কোনও সে থাকবে না। নামেই শেয়ার হোল্ডার। বেগরবাই করলে ২০% স্টেকও ওরা কিনে নেবে। মনে মনে ব্যালেন্স করছিল, হুইচ ইজ লেসার অফ দ্য টু ইভিলস।

“আরও টিআরপি বাড়াও, অ্যাড থেকেও কিছু আসুক। তারপর ভেবে দেখা যাবে”

“কোত্থেকে টাকা তুলব? যে ভাবে চিটফান্ড নিয়ে ছানবিন শুরু করেছে, সব স্পন্সরশিপ বন্ধ। বাজারে কোনও টাকা নেই। যেটুকু আছে, বড়বাজার খেয়ে নিচ্ছে। ওদের অরগ্যানাইজেশন অনেক স্টেডি, অনেক বেশি ডাইভারসিটি। ওখানে স্পন্সর করলে বেশি মাইলেজ পাওয়া যায়, অ্যাডের লোকেরা ভালই জানে”

“তুমিই যখন স্বীকার করছ, বাজার মন্দা, এই অবস্থায় কী হিসেবে মাইনে বাড়াতে বলছ?”

“আমার হিসেবটা তো আমাকেই দেখতে হবে। আর কে দেখবে?” সৈকত নাছোড়বান্দা।

“নাও, কফি খাও। পরে পয়সার কথা হবে”

“পরে নয়, এখনই”

মহা মুস্কিল। কিছুতেই ঘাড় থেকে নামাতে পারছে না "থাক না। পরে এ ব্যাপারে কথা হবে"

"না এখনই" সৈকত দৃঢ়ভাবে বলল "হ্যাঁ বলে কাগজ এখনই সই করে না দিলে, তোমার ভিডিওগুলো ফাঁস করে দেব। ভুলে যেও না, ওগুলো এখনও আমার কাছে"

কেউ না জানলেও ধূর্জটি খুব ভালই জানে, ওগুলো সৈকত সযত্নে আগলে রেখেছে। যদিও কোনওদিন কিছু বলেনি। খুব ভালই জানে, ওই ভিডিওগুলোতে কী আছে। তাকে শ্রীঘরে পাঠানোর পক্ষে কাফি। সময় বুঝে দুধকলা দিয়ে পোষা সাপ ফণা তুলে হিসহিস করছে। শুধু ছোবলটাই বাকি। মারলে বাংলা টিভি কোথায় যাবে, আর সৈকত কোথায় দাঁড়াবে। তবে নিজে যে ফাঁসবে, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। সৈকত ধোয়া তুলসীপাতা নয়, ভাল করেই জানা। তবে সাপের বাচ্চা যে আচমকা এমন ফোঁস করে উঠবে, ভাবতেও পারেনি!

"ফাঁস করলে তোমার কী ফয়দা হবে? তোমার সিনেমা করার বারোটা বাজবে, চ্যানেলটাও ডুববে। তখন চ্যানেল এক্স কব্জা করে তোমার পেছনে তিন লাথি মারবে"

"আমি এতদিন মিডিয়াতে আছি। না হয় তোমার মতো টাকা তোলার ক্যালি নেই। কিন্তু খেলাটা তোমার থেকে বেশি জানি"

সৈকত নাছোড়বান্দা দেখে ধূর্জটি বলল "বেশ। আজকের দিনটা সময় দাও। অ্যাকাউন্টসগুলো একবার দেখে নিই"

"শুধু আজকের দিন। কালকে ডেফিনাইট উত্তর চাই, হ্যাঁ"

"আরে ইয়ে ফিল্মকে ধান্দা কুছ ঠিক নেহি চল রহে হ্যায়। এক কে বাদ এক ফ্লপ। পাবলিসিটি দে কর ভি ফায়দা নেহি আ রহা হ্যায়। ইয়ে চামুণ্ডেশ্বরী তো বেওসা কে লিয়ে কিয়া থা" গজেন্দ্রর হো চি মিন সরণির ফ্ল্যাটে মনিকান্ত মোহতার আক্ষেপ।

"তো কেয়া করে? বন্দ কর দে?"

"ঔর কেয়া করনে কা? হমে তো ধন্দে মে কামানা হ্যায়। দুসরে ধন্দে সে মুনাফা হোনে সে ভি ইয়ে ফিল্ম বিজনেস মে অব কোই ফায়দা নেহি। লোগ হল মে-ই নেহি যাতা। উসদিন হম ব্যাল্যান্স সিট দেখ রহা থা। লস হি লস। লাস্ট দো বরস মে কুছ ভি প্রফিট নেহি। পার্টি লাগাও, মিডিয়া কো খিলাও, অচ্ছে রিভিউ লিখনে মে। বস, লস হি লস"

"সয়েদ তামিল রিমেক ছোড় কর নই স্টোরি লে তো কুছ ফায়দা হোগা..." গজেন্দ্র বোঝাবার চেষ্টা করল "বিজিত তো নই স্টোরি লে কর কুছ করনে কা কোশিশ কর রহা হ্যায়"

"নই স্টোরি কাঁহা? দুসরে লোগ তামিল সে লেতা। ঔর ওহ অংরেজি স্টোরি পাঞ্চ করকে বাজার মে ছোড়তা। ফির ভি লাস্ট পিকচার ভি তো ফ্লপ হুয়া। সিরিফ বড়ে বড়ে ইন্টেলেকচুয়াল বাত হি বাত। আরে হামলোগ ইহা ধন্দা করনে আয়া। ইন্টেলেকচুয়ালিজম বেচনে নেহি"

"তো চামুণ্ডেশ্বরী বন্ধ কর দে?"

"ফয়দা নেহি হোনে সে লস মে কিতনা দিন রান করেগা। ইয়ে লস ভরতে ভরতে আপনে দুসরে ধন্দা ভি চৌপট..."

"ওহ তো সহি বাত হ্যায়। ইয়ে তো আপনকা আসলি ধন্দা কভি নেহি থা"

"রাখি কা এক্সপোর্ট বিজনেস অভি ভি আচ্ছা চল রহা হ্যায়। ঔর পুরানে প্রমোটিং বিজনেস, ইয়ে কলকাত্তা মে ওহি মুনাফা দেগা, ঔর কুছ নেহি"

"বন্দ করনেকে পহেলে, মৃদুলদা সে বাতচিত করে?"

"চলো, উসে ফোন লাগাও"

ইন্দ্রজিৎকে ফোন করল গজেন্দ্র "এখনই আমার হো চি মিন সরণির ফ্ল্যাটে আসতে পারবে?"

"এখনই! ইজ ইট ভেরি আর্জেন্ট?"

"আর্জেন্ট"

"উইল জয়েন ইউ ইন হাফ অ্যান আওয়ার" কুড়ি মিনিট পরে গজেন্দ্রর ফ্ল্যাটে ঢুকে বলল "ব্যাপার কী? আর্জেন্ট তলব?"

"বস, কথা আছে। ড্রিঙ্ক খাবে?"

"নাঃ। ব্যাপারটা খোলসা করে বল-তো"

মনিকান্ত খুব ধীর শান্ত গলায় বলল "আমরা ঠিক করেছি, চামুণ্ডেশ্বরীর প্রোডাকশন উইংটা বন্ধ করে দেব"

"হঠাৎ?"

"বেশ কিছুদিন ধরেই এ নিয়ে কথাবার্তা চলছিল। ফিল্ম প্রোডাকশনে কোনও মুনাফা হচ্ছে না। লস হি লস। এই লস আর টানা মানে, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া"

"হল আর ডিস্ট্রিবিউশন?"

"ওগুলো এখনও ছাড়ার কথা ভাবিনি। হিন্দি সিনেমা চালিয়ে এখনও কিছু রেভিনিউ আসছে। দেখা যাক কোথায় দাঁড়ায়। তুমি চামুণ্ডেশ্বরীর প্রোডাকশন উইংটা কিনবে? আউটরাইট ট্র্যান্সফার উইথ অল রাইটস। বন্ধ করার আগে তোমাকে অফার দিলাম"

"আমার অত টাকা কোথায়? কিছু হলের মালিকানা থাকলেও, ফিল্ম প্রোডিউস করে, হলে চালিয়ে, মুনাফা লোটার রেস্ত নেই"

"তাহলে বন্ধ করে দিই?"

"তাহলে তো রিল্যায়েন্স এন্টারটেনমেন্ট একচেটিয়া কন্ট্রোল নেবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে"

"ওরা অনেক বড় গ্রুপ। রিল্যায়েন্সের কী টাকার অভাব? এত বিজনেসের মধ্যে এটা যদি নাও চলে, ওদের কিসসু যায় আসে না। দে ক্যান অ্যাফরড টু টেক এ রিস্ক, উই কান্ট"

"ইজ দ্যাট ইওর ফাইন্যাল ডিসিশন?"

"ফাইন্যাল। তুমি কিনলে, বন্ধু হিসেবে তোমাকেই দিতাম। না হলে স্টেকটা ওপেন মার্কেটে বিড করব। যে বেস্ট বিড দেবে, তাকেই বিক্রি করে দেব। আগে যদিওবা প্রফিট ভালই হত, এখন এই হাতি পোষা মানে, ডাহা লস"

"তোমরা কী করবে?"

"টাকাটা আমাদের অন্যান্য বিজনেসে ইনভেস্ট করব। অনেক বেশি মুনাফা"

ইন্দ্রজিতের মনে হল চামুণ্ডেশ্বরীর মতো, কলকাতার সব থেকে বড় ফিল্ম প্রোডাকশন ব্যানার যদি সরে যায়, বাংলা সিনেমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সিনেমার বিনোদন মানুষ আর আগের মতো নিতে পারছে না। রিয়াল লাইফ বাধ্য করছে রিলের রূপকথা থেকে মুখ ফেরাতে। যতক্ষণ না নতুন জেনারেশন ভাল ছবি নিয়ে আসে, পাবলিক হলমুখো হয়। কিন্তু কোয়ালিটি ছবি প্রোডিউস করতে গেলে তো রেস্ত দরকার। এই বাজারে, কার এত আছে, এত টাকার রিস্ক নিয়ে ঢালার?

অন্ধকার হলেও, কোথায় যেন নতুন আলো। পতনের মধ্যেই তো উত্থানের বীজ। নিয়ম মতো কিছুই বেশিদিন শূন্য থাকে না। পূরণ হয়ে যায়। ব্যবসার বাইরেও তার বাঙালি মন বলছে, ভালই হল। বাংলা ছবি আবার প্রাণ ফিরে পাবে। কিন্তু কী ভাবে? উত্তরটা অজানা হলেও প্রোগনোসিসটা যে মন্দের ভাল, সেই ভাবনাতেই তৃপ্তি। চিটফান্ড আগেই হাত গুটিয়েছে। এবার চামুণ্ডেশ্বরীও। যদি রিল্যায়েন্স এসে কোয়ালটি ছবি প্রোডিউস করতে পারে, ক্ষতি কী? কে গেল, কে এল, কীভাবে হল - এসব ভবিতব্যের ওপরই ছেড়ে দেওয়া যাক।

তেত্রিশ

বসুন্ধরার নতুন ছবি 'স্ফুলিঙ্গ'-র কলকাতা প্রিমিয়ার। অন্যান্য তারকাদের মধ্যে প্রধান স্টার দেওয়ালিও হাজির। হলিউডে সাকসেস ও অস্কারের পর সব ক্যামেরার ফোকাস তার-ই দিকে। অল্প কিছুদিন হল লস এঞ্জেলস থেকে ফিরেছে। পুরস্কারের পর এই প্রথম কলকাতার রুপোলি দুনিয়ায়। পরিচিত টলিউড শিল্পী মহল ও রুটিন কলকাতার পেজ থ্রি সেলিব্রিটিরা কংগ্র্যাচুলেশনস জানাচ্ছে। মিডিয়া হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ব্যবসা ধরে রাখার জন্য দেওয়ালির ছবি দরকার। সে এখন প্রতিদিনের পেজ থ্রি আলোকিত করা সেলিব্রিটি নয়। ট্যাবলয়েড ছেড়ে মেইন নিউজ হেডলাইন্স। বাংলার গর্ব। কলকাতার বাঙালি মেয়ে অস্কার জয় করে ফিরেছে। বিদেশে সম্মান পেলেই আমাদের পুজো পাবে। দেওয়ালিই বা বাদ যায় কেন? অস্তিত্ব উপেক্ষা করে, সাহেবদের স্বীকৃতিকে বরণ করে নেওয়া শতাব্দীর প্রথা। যে সে ব্যাপার নয়!

উৎসুক জনতাকে পেছনে ফেলে, লেন্সের ঝলকানি কাটিয়ে, আপার ব্যালকনিতে পৌঁছল। ছবি শুরু হওয়ার আগে বসুন্ধরা ছবিটা ইন্ট্রডিউস করতে গিয়ে বলল "দিস ইজ অ্যান এজ ওল্ড কনসেপ্ট, ডেপিক্টেড ইন গ্রিক মিথলজি, অ্যাবাউট প্রমিথিয়াস স্টিলিং ফায়ার ফ্রম মাউন্ট অলিম্পাস, ফর দ্য সার্ভিস অফ হিউম্যানিটি। দো দ্য কনসেপ্ট ইজ ইউনিভারসল, আই হ্যাভ অ্যাটেম্পটেড টু প্রেজেন্ট ইট উইথ মাই ওন স্টোরি, ইন দ্য লাইট অফ টুয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি। আই হোপ ইউ উইল এনজয় মাই রেন্ডিশন। মে আই টেক দিস অপারটুনিটি অফ কংগ্র্যাচুলেটিং দ্য লিড অ্যাক্ট্রেস ইন দিস ফিল্ম দেওয়ালি, ফর হার রিসেন্ট উইনিং অফ অস্কার ইন হার হলিউড পারফরমেন্স ইন ফালক্রাম। অন বিহাফ অফ দ্য প্রোডাকশন টিম অ্যান্ড রেস্ট অফ আস হু আর প্রেজেন্ট হিয়ার, লেটস গিভ হার এ বিগ হ্যান্ড অফ অ্যাপ্লজ"

হাততালি। সিনেমা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেওয়ালির মনে হল, প্রমিথিয়াসের স্ফুলিঙ্গ আনার গল্পকে সে এই ভারচুয়াল দুনিয়ার সামনে এনে কী প্রমাণ করতে চাইছে? এ তো অভিনয়। ছবির শেষে হাততালি পড়বে, ভাল রিভিউ লেখা হবে, প্রাইজও পেতে পারে। যে স্ফুলিঙ্গ সে খ্যাতির শিখরে বসে লস এঞ্জেলস থেকে তুলে এনেছে, সে তো শুধুমাত্র পুরস্কার নয়, আগামীর বুনিয়াদ। প্রমিথিয়াসের গল্পের মতো সেই স্ফুলিঙ্গ যদি জীবনেই প্রয়োগ করতে না পারল, তাহলে কী লাভ মুকুট পরে? সময়ের বিবর্তনে পুরস্কারের রোশনাই একদিন ম্লান হয়ে যাবে। পড়ে থাকবে কিছু স্মৃতি, বিস্মৃতির অতলে। সেখানে তার নাম না থাকলেও সে অনন্ত দেওয়ালি।

হল থেকে বেরিয়ে এল। কে ছবি দেখছে, কে তার গতি-প্রকৃতি অনুসরণ করছে, দেখার দরকার নেই। এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে, অতীতের ধ্বংসের মধ্যেই ভবিষ্যতের ছবি। সময় হয়েছে। স্ফুলিঙ্গটা এবার দাবানল হয়ে জ্বলবে। এখনই উচ্ছ্বাস নয়। গাড়িতে বসেই প্রকাশদাকে ফোন "ফ্রি আছ? আমার ফ্ল্যাটে আসতে পারবে?"

প্রকাশকে ইতস্তত করতে দেখে বলল "বেহালা থেকে অনেক দূর, তাই না? ঠিক আছে। তুমি বেহালা চৌরাস্তার মোড়ে চলে এস। ওখান থেকে পিক করে নিচ্ছি"

আজ তো দেওয়ালির প্রিমিয়রের দিন। প্রকাশ বুঝতে পারছে না, এমন কী হল, দেওয়ালি দেখা করতে চায়? তবু যখন চেয়েছে, যেতেই হবে। মেয়েটার সঙ্গে যতবারই কোনও মিডিয়া কভারেজ করতে গিয়ে দেখা হয়েছে, ওর চোখে এমন কিছু দেখেছে, যা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। অস্কার তার নমুনামাত্র। এবার নিশ্চয়ই অন্য কিছু ভাবছে, প্রথার বাইরে। দেখাই যাক না...

ফ্ল্যাটে বসে বলল "ড্রিঙ্কস"

"হুইস্কি দিতে পারো" চুমুক দিয়ে বলল "প্রথমেই কংগ্রাচুলেশন জানাই অস্কার পাওয়ার জন্য"

"অস্কারের চেয়েও বড় কাজের জন্য তোমায় ডেকেছি। টাকা আর সম্মান তো আর ঘাটে নিয়ে যাব না। মরার আগে কিছু করে যেতে হবে"

"বালাই ষাট। মরতে যাবে কেন?"

"তোমাদের এই বাংলা টিভি চ্যানেলটা নিয়ে গণ্ডগোলের কথা শুনেছিলাম। কার কত স্টেক আছে"

"এখন আমার চ্যানেল নয়। ওখান থেকে বেরিয়ে ফ্রিল্যান্স করছি। চেন্নাই-এর চ্যানেল এক্সের ৮০% শেয়ার। বাকি কুড়ি বোধহয় ধূর্জটি রায়ের। তরুণ পাঁজারও শেয়ার ছিল ওর মধ্যে। জানি না, এখন আছে কি না। শুনেছিলাম ধূর্জটিকে বিক্রি করে সরে গেছে। সঠিক বলতে পারব না"

"আমি যদি চ্যানেলটা কিনে তোমাকে সিইও করি, তোমার পুরনো টিম দিয়ে চালাতে পারবে?"

"কেন পারব না? পুরনো টিমের সবার সঙ্গেই যোগাযোগ আছে। কিন্তু তুমি চ্যানেল কিনতে যাবে কেন?"

"এই সিস্টেমটায় ঘুণ ধরে গেছে। এটা সিস্টেমলেস। ভেঙে ফেলতে হবে। আমার একটা চ্যানেলের মালিকানা দরকার"

প্রকাশ বুঝল, দেওয়ালি কোনও বড় দাঁও চাইছে। যখন সে স্ট্রাগ্লিং দেওয়ালিকে প্রথম দেখেছিল তার থেকে অনেক তফাত। এখন ইন্টারন্যশনালি তার ফেম। টাকাও যথেষ্ট। শুধু বুঝতে পারছে না, কেন এখানে ঢালতে চাইছে।

"চ্যানেল এক্সের ফাইন্যান্স ডিরেক্টর কুট্টির সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। ওদের এই ইনভেস্টমেন্টটা ভেস্টেড। এখান থেকে ওদের কোনও রেভিনিউ নেই। ছেড়ে দিতে পারলে খুশি-ই হবে। আমি তোমার সঙ্গে কুট্টির একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করে দিতে পারি। যদি এগ্রি করে, তোমার কাছে ৮০% এসে যাবে। বাকি রইল ২০%"

"ওটাও আমার চাই। দরকার হলে বেশি টাকা দেব ধূর্জটিকে। আমার ১০০% কন্ট্রোল চাই"

"তুমি আগে কুট্টির সঙ্গে কথা বল। রাজি হলে ৮০% স্টেক কিনে নাও। আমি ধূর্জটি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে দেখি, কীভাবে ওর কাছ থেকে রাইটসটা কিনতে পারবে" সেকেন্ড পেগটা ঢালতে গিয়ে বলল "একটা কথা মাথায় ঢুকছে না, তুমি হঠাৎ এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন?"

"কাউকে তো একদিন স্টেপটা নিতেই হবে। এখনকার পজিশনে আমিই নিতে পারি, যদি তুমি পাশে থাক"

"আছি। কথা দিলাম"

প্রকাশ আলো দেখছে। মনে মনে অনেকদিন ধরেই ভাবছিল, এই ঘুণ ধরা অবস্থার পরিবর্তন দরকার। জ্বালিয়ে তছনছ করে দিতে হবে। দেওয়ালিই সেই স্ফুলিঙ্গ।

চেন্নাইতে ওদের হেড কোয়ার্টার্সে কুট্টির সঙ্গে দেখা করার সময় প্রকাশও ছিল। সব শুনে কুট্টি বলল "হোয়াই নট? উই আর গেটিং নাথিং ফ্রম আওয়ার ইনভেস্টমেন্ট দেয়ার। নো রেভিনিউজ। নো কন্ট্রোল টু রান ইট ইন আওয়ার ওন ওয়ে। নাইদার গেটিং আওয়ার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাক। উই আর অ্যাওয়ে ফ্রম ক্যালকাটা। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু টেক কন্ট্রোল ফ্রম হিয়ার। ইফ ইউ পে আওয়ার বেসিক ইনভেস্টমেন্ট, উই উড বি মোর দ্যান হ্যাপি টু সেল আওয়ার স্টেক। অফ কোর্স, আই হ্যাভ টু চেক উইথ দ্য চেয়ারম্যান। আই ডোন্ট থিংক দ্যট উইল বি এ প্রবলেম"

"প্লিজ ডু অ্যান্ড কনফার্ম। আই ওয়ান্ট টু ফিনিশ দ্য ডিল হিয়ার বিফর আই ফ্লাই টু ক্যালকাটা"

মুম্বাই থেকে উকিলকে চেন্নাইতে ডেকে ইন্টারব্যাঙ্ক টাকা ট্র্যান্সফার করল। ডিল কমপ্লিট। দেওয়ালি বাংলা টিভির ৮০% স্টেক হোল্ডার।

রিটার্ন ফ্লাইটে প্রকাশ বলল "তরুণ শেয়ার ধূর্জটিকে বিক্রি করে কেটে পড়েছে। ওর সম্বন্ধে যেটুকু খোঁজ পেলাম, ওর সঙ্গে ওদের সিইও সৈকতের কোনও একটা ব্যাপারে কনফ্লিক্ট। এটাই রাইট টাইম। ও এই ঝামেলা এড়াতে চ্যানেলটা বিক্রি করে দিতে পারে। ওরও যখন বিশেষ ফায়দা হচ্ছ না। ওর এখন কম্পিউটারের ব্যবসায় বেশি লাভ"

“ফিডার পাঠিয়ে দেখ না যদি ছেড়ে দেয়। কিছু বেশিই দেব”

যদিও সৈকতের কাছে চব্বিশ ঘণ্টার সময় চেয়েছিল, ওকে এড়াবার জন্য কাজের ছুতো দেখিয়ে দিল্লি চলে গেছে। ভাবছিল এই আপদকে ঘাড় থেকে কী করে নামায়। মুখ খুললে, বড় রকম ফাঁসবে। অথচ ওর স্যালারি বাড়াতে গেলে লসে রান করা চ্যানেল আরও ডুববে। ঠিক সেই মুহূর্তে দেওয়ালির অফার এল।

“ফাইন। উনি যদি আমায় বেশি টাকা দেন, ওনাকে বিক্রি করতে কোনও আপত্তি নেই। তবে আমি ডিলটা কলকাতায় করব না। ঝামেলা হতে পারে। ওনাকে দিল্লিতে আসতে হবে”

দিল্লিতে স্টেক ছেড়ে টাকাটা নিয়ে ধূর্জটির মনে হল, ঘাড় থেকে আপদ নামল। এবার দেওয়ালির পাঁঠা। সৈকতের সঙ্গে বুঝে নিক। অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যে রংবাজি সৈকত ওর সঙ্গে করছে ওর ভিডিওগুলো নিয়ে, সে তো আর দেওয়ালির সঙ্গে করতে পারবে না। মরুক গে। ওর কী?

বাংলা টিভির অফিসে চেয়ারম্যানের কাউচে দেওয়ালি সেক্রেটারি কাজরিকে বলল “এখন থেকে এই চ্যানেলের একশো ভাগ মালিক আমি। এই আমার পেপার্স” কাগজের কপিগুলো ওর হাতে দিয়ে বলল “প্রকাশবাবু এখন থেকে এই চ্যানেলের নতুন সিইও। এক ঘণ্টা পরে বোর্ডরুমে ডিউটি স্টাফ ছাড়া আর সবাইকে ডাক”

খবরটা পেয়ে সৈকত আর মৃন্ময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

“আই হ্যাভ টেকেন ওভার রাইটস অফ দিস চ্যানেল। ইওর সার্ভিসেস আর নো লঙ্গার রিকোয়ার্ড। থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর সার্ভিসেস। ডিসমিসাল ডিউস উড বি পেইড”

“ধূর্জটি তো আমাকে কিছু বলেনি”

সৈকতের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে বলল “ওর সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন। পেপার্সের ফটোকপি কাজরির কাছে দেওয়া আছে। বোর্ড মিটিং-এ দেখিয়ে দেওয়া হবে। পুরনো স্টাফদের মধ্যে কে থাকবে, সেটা প্রকাশবাবু ঠিক করবেন। আপনারা আসতে পারেন। কিছু প্রশ্ন থাকলে, বোর্ড মিটিং-এ জানাবেন”

সৈকতের মাথায় বাজ পড়ল। এতদিন ধরে ছড়ি ঘুরিয়েছে। আজ এই বয়েসে চাকরি নেই। অস্কার জিতে মেয়েটা মাথা কিনে নিয়েছে। ওর ঘর থেকে বেরিয়ে মনে হল, ধূর্জটি চুপিচুপি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিছুই করার নেই। ধূর্জটিকে শূলে চড়িয়েও লাভ হবে না। বরং তার সিনেমার প্রোডাকশনগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। যদিও ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছে, তবু চুপ করে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও গতি নেই।

মৃন্ময় জিজ্ঞেস করল “আমার কী হবে বস?”

“আগে নিজের গতি করি, পরে তোমার কথা ভাবব। এখন তোমাকে নিয়ে ভাবার সময় নেই”

“অমর্ত্যদাকে বললে হয় না?”

“অমর্ত্য এর মধ্যে জড়াবে না, যখন লিগ্যালি ওই মেয়েটা পুরো চ্যানেলকে কব্জা করেছে। বোর্ড মিটিং-এ শুনি কী বলার আছে। তারপর ভাবা যাবে”

বোর্ড হলে সবাই শুধু অস্কার পাওয়া নায়িকাকে দেখছে না, দেখছে তাদের নতুন মালকিনকে। এ মেয়ে শুধু স্ফুলিঙ্গতে অভিনয় করতেই জানে না, তাদের জীবনেও স্ফুলিঙ্গ।

ধ্রুবতারাও হতে পারে...

চৌত্রিশ

বাংলা টিভির অফিসে নিজের ঘরে সেক্রেটারিয়েট টেবলের উল্টো দিকে দেওয়ালি “কয়েকটা বেসিক পলিসির ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলার জন্য ডেকেছি”

“স্টাফিং-এর স্ট্রাকচারটা মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছি। পুরনো সব মাস্টার লোকগুলোকেও ডেকে নিয়েছি। নাম্বার্স-এর ওপর জোর না দিয়ে কোয়ালিটির ওপর এম্ফাসিস দিয়েছি” প্রকাশ ইন শর্ট কাজের হিসেব দিল।

“ও দিকটা পুরোপুরিভাবে তোমার। তুমি যা ভাল বুঝবে, তাই করো। আমি শুধু তোমায় ডেকেছি, যে কারণে চ্যানেলটা কিনেছি, বলার জন্য”

“অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম। তুমি তো সিনেমার লোক, এখন হলিউডের অস্কার পাওয়া নায়িকা, হঠাৎ চ্যানেল কিনলে কেন? পরে মনে হল, সময় হলে নিজেই বলবে”

গলায় পার্লের নেকলেসটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল “চ্যানেলটা একটা আউটলেট মাত্র। এই স্ট্রাকচারে কিছুই হচ্ছে না। খালি পিঠ চাপড়ানো আর তোষামোদি। আমি চাই না, এই চ্যানেল নিজেদের কালচারাল পভার্টিকে ঢাকতে আরেকটা সেলিব্রিটি ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করুক। প্রত্যেক স্ফিয়ারে অসংখ্য ট্যালেন্ট রয়েছে, যারা ব্রেক চায়। এই সব হাইপড সেলিব্রিটিদের পলিটিক্সের জন্য কোনও আউটলেট পাচ্ছে না”

ইন্টারকমে কফির অর্ডার দিয়ে বলল “যে কোনও ফিল্ড ধর, গান, সাহিত্য, সিনেমা, এই আপকামিং নেগলেক্টেড ট্যালেন্টদের ফোরফ্রন্টে আনো, যারা আর কোথাও ব্রেক পাচ্ছে না। আমি বিশ্বাস করি না, সে যুগেই ট্যালেন্ট ছিল, আর এ যুগে নেই। এ যুগেও আছে। খালি প্ল্যাটফর্ম দরকার”

“সে করা যাবে। তুমি কিন্তু বিশাল এক কমিউনিটির সঙ্গে ডিরেক্ট কনফ্লিক্টে যাচ্ছ”

“আমার কিচ্ছু আসে যায় না। ওদের আমি হ্যান্ডেল করে নেব। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি শুধু খুঁজে বার কর, সেই ট্যালেন্টগুলো। যেমন ধর, যারা ভাল সুর দিচ্ছে, নতুন মিউজিক কমপোজ করছে। অথবা লো বাজেটে নতুন ভাল টেলিফিল্ম করতে পারে। ফাইন্যান্স আমি করব। যে সব কর্পোরেটের বাইরে উঠতি সাহিত্যিক, যারা লিটল ম্যাগাজিন বা ছোট প্রকাশনায় লিখছে, তাদের সামনে তুলে ধর। দলবাজি করে কালচারাল ডিগ্রেডেশন আজকের এই মিডিওক্রিটিরাই তৈরি করছে। ওদের সিন থেকে হাটাতে হবে। আমাদের চ্যানেলই পাবলিকের কাছে পৌঁছানোর একটা অ্যাভিনিউ”

“তাতে যদি স্পন্সারশিপ না পাওয়া যায়...”

কফিটা প্রকাশদার দিকে এগিয়ে বলল "নাও। তুমি যা বলছ ঠিক। স্পন্সারসিপ তো ব্র্যান্ডের ওপর আসে। তোমাদের ভাষায় যে ব্র্যান্ড বাজারে খাচ্ছে, সেটা কোনও পজিটিভ ব্র্যান্ড-ই নয়। আর্টিফিশিয়াল। আমরা ব্র্যান্ড তৈরি করব। আওয়ার এক্সক্লুসিভ অথেনটিক অরিজিনাল ক্রিয়েটিভ ব্র্যান্ড"

প্রকাশ বুঝতে পারছে, দেওয়ালি ঠান্ডা মাথায়, দাবার ঘুঁটি সাজাচ্ছে। শান্ত, দৃঢ়, ফোকাসড। প্রথমে ভেবেছিল হুজুগে চ্যানেলটা কিনে ফেলেছে। সদ্য অস্কার পেয়েছে, হলিউডে ছবি করে কিছু কামিয়েছে। হয়ত সেই যোশে দুম করে একটা চ্যানেল। এখন মনে হচ্ছে, না। ঝোঁকের বশে করেনি। ঠান্ডা মাথায় একের পর এক চাল সাজাচ্ছে। এ শুধু ভিত। গোড়াপত্তন। দেওয়ালির সেই সাহস আছে, ভেঙে আবার গড়তে পারে। কথায় নয়, কাজেও। হঠাৎ সাকসেস আর পাঁচজনের মতো মাথাটা ঘুরিয়ে দেয়নি। সিনেমার ভারচ্যুয়ালিটি থেকে রিয়ালিটিতে দাঁড়িয়ে আছে।

মুচকি হেসে বলল "যেদিন তোমার প্রথম কভারেজ ছিল, সেদিন একজন স্ট্রাগ্লিং নায়িকাকে দেখেছিলাম। আজ এত সাকসেসের মধ্যে আমি কিন্তু তোমাকে আবার নতুন করে চিনছি। তোমার স্বপ্নে কদ্দুর সাহায্য করতে পারব জানি না। তবে সেন্ট পারসেন্ট চেষ্টা করব"

"সেজন্যেই তো প্রিমিয়ার ফেলে তোমাকে ডেকেছি। জানি, তুমি পারবে। আমি থাকতে কেউ তোমায় কিছু করার সাহস পাবে না। এখানে টাকা আর প্রতিপত্তি কথা বলে"

এ তো যে সে মেয়ে নয়।"আজ কফি খাওয়ালে। আমি একদিন স্যাম্পেনের বোতল খুলব" প্রকাশ চলে গেল।

মুচকি হাসল দেওয়ালি। প্রকাশদা কিছুটা চিনলেও, পুরপুরি চিনে উঠতে পারেনি।

সবাই তাকিয়ে আছে। সল্ট লেকের ম্যাগনো ইন্ডিয়ার অফিসে শোভনের ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে দেওয়ালি। চাপা নীল জিনস, সাদা টপস। সানগ্লাসটা গলার বেষ্টনী থেকে গাঢ় নীল পুতির মালার ওপর ঝুলছে। পরিচিত চিত্রাভিনেত্রী। ফিরে তাকানোই স্বাভাবিক। আগে যে এ অফিসে কোনও হিরোইন আসেনি, এমন নয়। দেওয়ালি আলাদা। বলিউড, হলিউড বিজয়ী আর কোনও অভিনেত্রীকে তো এর আগে এ অফিসে দেখেনি।

শোভন অবাক "তুমি! ফোন করনি তো?"

"এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই"

লক্ষ করল শোভনের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের এপাশে মায়া ভট্টাচার্য। দেওয়ালিকে দেখে বলল "আস্কার পাওয়ার জন্য কংগ্র্যাচুলেশনস"

মোনালিসার মতো মিস্টিক হাসি "শোভনের সঙ্গে কিছু পারসোন্যাল কথা আছে" মানে কেটে পড়। মায়া বুঝেও না বুঝে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শোভনের দিকে তাকাল।

শোভনও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল "এখনই?"

"হ্যাঁ এখনই"

"মায়া..." শোভনের ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধা হল না। তার জলহস্তীর মতো শরীরটাকে চেয়ার থেকে তুলে বলল "আমি তাহলে আসি। পরে দিগ্বিজয় তোমার সঙ্গে কথা বলে নেবে"

মায়া বেরিয়ে যেতেই, শোভন বলল "চা না কফি?"

"কফি ব্ল্যাক, চিনি ছাড়া"

"কেমন আছ? তোমার বলিউড-হলিউড করার জন্য তো আজকাল দেখাই হয় না"

"তাই জন্যেই তো নিজে দেখা করতে চলে এলাম" ভণিতা না করে শোভনের দিকে তাকিয়ে জোর দিয়ে বলল "যদি রাজীবদা অঞ্জনবাবুর মনীষীদের নিয়ে কেচ্ছা ছাপানো বন্ধ না করে, মোকাবিলাটা তোমার সঙ্গে হবে। তোমার রাজীবদাকে ব্যাক করা বন্ধ করতে হবে"

"আমি বললেই রাজীব শুনবে?"

"আলবাত। আজকের দিনে টাকা কথা বলে। তোমার ফাইন্যান্স বন্ধ হলে ওর অনেক বেশি ক্ষতি। ঠিক শুনবে। সেই সঙ্গে, অঞ্জনবাবুকে দিয়ে নিজের নামে বই লেখানো বন্ধ কর" একটু থেমে বলল "আই মিন ইট"

যেন আল্টিমেটাম দিচ্ছে। এই কী সেই দেওয়ালি, যাকে নিয়ে সে এক সময় ফুর্তি করত? কত পাল্টে গেছে। একদিন সে টাকা ছড়াত, দেওয়ালি তালে তাল মেলাত। আর আজ সেই দেওয়ালি তাকে আল্টিমেটাম দিচ্ছে। ভাবতেই পারছে না!

"হঠাৎ আল্টিমেটাম? সে তো তোমার কোনও ক্ষতি করেনি"

"আমার ক্ষতি করার ক্ষমতা অঞ্জনবাবুর নেই। কিছু সস্তা পপুলারাটির লোভে আগামী প্রজন্মের সর্বনাশ করছে। তুমি থামাবে, না আমি বন্ধ করব। আমি ফিল্ডে নামলে খুব ভাল হবে না। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে" শোভন শুনেছে দেওয়ালি এখন বাংলা টিভির কর্ত্রী।

রণমূর্তি দেখে ঘাবড়ে "নাও, কফিটা খাও। ব্যাপারটা কী?"

"ব্যাপার কিছুই নয়। টাকার জোরে যে বদরক্ত ছাড়াচ্ছে তা এবার বন্ধ হওয়ার দরকার। তোমার আইডেন্টিটি ক্রাইসিস থাকতে পারে, সকলের নয়। যা তোমাদের ক্ষমতায় নেই, তাই টাকার জোরে মানুষের ওপর চাপাবার চেষ্টা করছ কেন? এটা কালচার নয়। শুধু জোর করে টিকে থাকার খেলা"

"কে না টিকে থাকতে চায়?"

"সবাই চায়। কিন্তু যে টিকে থাকার নেশায় একটা গোটা প্রজন্মকে পঙ্গু করে দিচ্ছ, এবার সময় হয়েছে তাতে দাঁড়ি টানার"

"তুমি কী হুমকি দিচ্ছ?" শোভন উত্তেজিত।

"এখনও নয়, ভালভাবে সত্যিটুকু বলছি। ভুলে যেও না, বালিতে যখন বাঁচা-মারার মাঝখানে খাবি খাচ্ছিলে, তখন আমিই তোমার পাশে ছিলাম"

"সে কথা ভুলি কী করে? কোনওদিন ভুলতে পারব না"

"অন্তত সেই কৃতজ্ঞতায় কথাটুকু রাখ। এতে তোমারই ভাল। নইলে এই আর্টিফিশিয়াল হাইপে একদিন আত্মহত্যা করবে। যা তোমার ক্ষমতায় নেই, তাকে নিয়ে ঢাক পিটিয়ে লাভ নেই। কিছু মোসাহেব টাকার জন্য মাথা নাড়বে। কিন্তু নিজের কাছ থেকে পালাবে কোথায়? শেষে, ওটাই কাল হবে। এখনও সময় আছে। তোমার ভালর জন্যে বড় সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই"

সেদিনের উঠতি তারকা আজ দার্শনিকের মতো কথা বলছে। কম তারকা তো ঘাঁটেনি, ফুর্তি করেনি। একে ঠিক চিনতে পারেনি। যে সময় বালিতে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে পাঙ্গা লড়ছিল, তখনই বোঝা উচিত ছিল। কৃতজ্ঞতা থাকলেও, চিনতে পারেনি। তাই বুঝি আজ চোখে আঙুল দিয়ে চেনাতে এসেছে। দেখছে... উত্তেজনা কমে যাচ্ছে, শ্রদ্ধা বাড়ছে।

"তোমার কী নেই? টাকা, বউ, ছেলে, সংসার সব-ই তো আছে। ওদের নিয়ে থাক না। এই চক্করে যাওয়ার কী দরকার? যা তুমি নও, কখনও হতে পারবে না। চেষ্টা করলে নিজের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই হবে না"

আজ নক্ষত্র বলেই কি বড় বড় জ্ঞান দিচ্ছে? যদি না হত, তাহলেও কী এই কথাগুলোই বলত? কী হলে কী হত, ভেবে লাভ নেই। যা সামনে, সেটাই সত্যি। দেওয়ালি প্রমাণ করে দিয়েছে সে নক্ষত্র। শোভন নয়। চলে যাওয়ার পর চুপচাপ অফিসে বসে ভাবছে, মেয়েটা যে কথাগুলো বলে গেল, সত্যি হলেও, মন মানছে না। সজানো সাম্রাজ্য ছেড়ে তার বেরোবার ক্ষমতাই নেই। মুখে যাই বলুক না কেন, দেওয়ালি পারবে?

দিগ্বিজয়কে ফোন করল "তোমার বউ এই গেল। দেওয়ালি এসেছিল। প্রায় জোর করেই তাকে চলে যেতে বলল। ও আমাদের এসব বন্ধ করে দিতে চাইছে। এস সবাই মিলে একসঙ্গে ওকে কোণঠাসা করি"

"আমি নেই" দিগ্বিজয় হাত তুলে দিল।

"তুমি নেই মানে? সব সময় তো তোমরাই আমার পাশে ছিলে। আজ বলছ, তুমি নেই!"

“আজও আছি, তবে দেওয়ালির ব্যাপারে নয়। ছেড়ে দাও না। ও যা বলছে মেনে নাও। তাতেই আমাদের মঙ্গল”

ফোনটা রেখে বুঝতে পারছে না, হঠাৎ কী হল। কেউ দেওয়ালিকে ঘাঁটাতে চাইছে না কেন! চেনা অঙ্কগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে না, কী সেই জাদু, যা দিয়ে সবাইকে বস করেছে। নিশ্চয়ই দেহ নয়।

“নাও, তোমার উপন্যাস রেডি” অঞ্জন রাজীবের দিকে ম্যানাস্ক্রিপ্টটা এগিয়ে দিল।

“কী উপন্যাস?”

“ওই যে বলেছিলাম না, জাম্পেস করে একখানা নভেল লিখব। নাম দিয়েছি ‘রানির কোলে কৃষ্ণ’। দারুণ খাবে। গ্যারান্টিড বেস্টসেলার। এর আগে কেউ ছোঁয়নি”

“তুমি বরং প্রদীপ প্রকাশনীকে ছাপাতে বল”

“কেন? তুমি ছাপাবে না?”

“না... মানে ওদেরও একটু সুযোগ দাও”

“তুমি ছাপালে যা পাবলিসিটি পাবে, ও তার ধারে কাছে নয়”

“আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়”

“কেন? হঠাৎ কী হল? এর আগে তো আমার সব বই-ই...”

“আগের কথা ভুলে যাও। আর নয়”

“গল্পটা পড়ে দেখ। জমিয়ে লিখেছি। পরকীয়া দর্শনে...”

“বললাম তো, এসব আর হবে না। তাতে যদি প্রফিট না হয়, তবু ভাল। বিজনেসটাকে তো আর তুলে দিতে পারি না”

অঞ্জন বুঝতে পাচ্ছে না, হঠাৎ রাজীবের কী হল। এর আগে তো এভাবে কথা বলেনি। কোথাও থেকে কী হুমকি এসছে? কার অদৃশ্য হাত খেলছে বোঝা না গেলেও, বড় কোনও চাপে যে রাজীব কুপোকাত, বুঝতে পারছে। অথচ এতকাল এ সব কেচ্ছা ছাড়া আর বিশেষ কিছু লিখতেই পারেনি। এখন আবার নতুন করে কী লিখবে? হোয়েন ইট রেইন্স, ইট পোরস। শুধু রয়ালটি, ঘরে স্বকন্যা শঙ্করী, বুড়ো বয়সে জিরোবার জো নেই।

“বিয়ে করেছ, সুখে ঘর-সংসার কর” রাজীব আর কথা বাড়াল না। শোভনের প্রতিধ্বনি রাজীবের মুখে। ভদ্র হলেও, ভাষাটা খুব স্পষ্ট, এবার ফোট। কিন্তু যাবে কোথায়?

রাজীবের অফিস থেকে যখন বেরল, তখন সন্ধে। টিপটিপ বৃষ্টি ক্রমশ গাঢ়। চারদিক অন্ধকার। চেকমেট সিচুয়েশন। শোভন, রাজীব, সবাই এক। কালচারাল জোকার। সবই রিং-এর মধ্যে। কী কুক্ষণেই না মেয়েটার সঙ্গে ফুর্তি করতে গেছিল। ঘরের কাজকম্ম করুক, তবুও ভাল। শোবার কথা ভাবেলেই অস্বস্তি হয়।

"খালি পেটে বেশি খেয়ে আউট হয়ে যেও না" শঙ্করীর চেতাবনি। অসহ্য...

"কিছু খাবার দিলেও তো পার"

"সারাদিন গা'টা ম্যাজম্যাজ করছিল। রান্না করা হয়নি। বাইরে যা বাদল, চুমকিকে কিছু আনতে পাঠাব, সে অবস্থাও নেই। রাতে পুষিয়ে দেব"

বাইরে ঝড় আরও তীব্র, আরও ভয়াবহ। ভেঙে পড়তে চাইছে। আরও কয়েকটা পেগ। তড়িঘড়ি শুয়ে পড়ল।

"খাবে না?" জবাব নেই। গোসা হয়েছে ভেবে শঙ্করী নিবিড়ভাবে পাশে শুয়ে জড়িয়ে ধরল। বাইরের ঝড় যেন ভেতরে। শাড়ি সায়া খুলে ফেলেছে। হাতছানি, বাসনার রুদ্ধদ্বারে। নেশার ঘোরে অঞ্জনের মনে হল, এ তো প্রেমের চুম্বন নয়। সাপের নিঃশ্বাস। সিভাস রিগ্যাল তখন মগজে আগুন ঢালছে। পালাতে হবে। মুক্তি চাই। আচমকা অনুভব করল, তার আর কোনও প্রলোভন নেই, ক্ষমতাও নেই। প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ঘূর্ণির দাপটে দিশাহারা। কানের কাছে, আপদের হিসহিস। শক্তিও নেই। শরীরী বিষের ছোবলে খড়কুটোর মতো ভেসে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। ঢোড়া সাপের মতো অসহায়। নেতিয়ে পড়ল।

পঁয়ত্রিশ

রাজাবাজার সাইন্স কলেজ থেকে যখন দেওয়ালি বেরিয়ে এল, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। প্রসাধন প্রায় নেই। বেণিটা ছড়ানো। পায়ে হাওয়াই। কাঁধে শান্তিনিকেতনি ঝোলা। দেখে মনেই হয় না, হলিউডের অস্কার পাওয়া নায়িকা।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে। নতুন কিছুই পড়েনি। এত বছর পরে, ভুলে যাওয়া কেমিস্ট্রিটা আবার ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। একদিনে তো হবে না। বেশ কিছুদিন লাগবে, সব কিছু ঝালিয়ে, আবার পুরনো রুটিনে ফিরে যেতে। অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না...

"কোন দিকে যাব?"

"গঙ্গার ধারে"

ট্র্যাফিক জ্যামের মধ্যে গাড়িটা যখন শামুকের মতো এগোচ্ছে মনে মনে ডাঃ সংঘমিত্রা চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারল না।

"হঠাৎ এত বছর পর? তুমি তো সিনেমা করে অনেক নাম কুড়িয়েছ। ফিরে আসতে চাইছ কেন?"

"ছোটবেলা থেকে ডক্টরেট হতে চেয়েছিলাম, পোস্ট-ডক রিসার্চ নিয়ে থাকতে চেয়েছিলাম, হিরোইন হতে নয়। মাঝখানে হঠাৎ কী যে হয়ে গেল। সিনেমায় সুযোগ। ভাগ্যও ফেভার করল। এখন মনে হচ্ছে, এখানেই আমার জায়গা"

"এত বছর পরে রি-ইনস্টেট করা ডিফিকাল্ট। দেখি, প্রো-ভিসি বিশ্বজ্যোতি ব্যানার্জি আর ভিসি নিরঞ্জন দত্তর সঙ্গে কথা বলি। ওরা যদি স্পেশাল কেস হিসেবে অ্যালাউ করে" এইচওডি বললেন। সংঘমিত্রাদির তাদারকিতে শেষ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি পুনর্বহাল করল। ফুল টাইম দিতে হবে। তাতেই রাজি দেওয়ালি।

স্ট্র্যান্ড রোডে পৌঁছে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল "কোথায় যাব?"

বাঁ দিকে ছড়ানো নদীর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ "ফ্লোটেল"

নদীতে ভাসমান ফ্লোটেলের দ্য অ্যাংকরেজে আলো-আঁধারি কোনায় বসে পড়ন্ত বেলায় শুনতে পাচ্ছে, জলের শব্দ... আঃ...

কতদিন এভাবে বসেনি। অ্যাপয়েন্টমেন্টস, পার্টি, ডেটস, শুটিং, অ্যাওয়ার্ডস... সোনার খাঁচায় বন্দি জীবন। প্রতি মুহূর্তে হিসেব মেপে পদক্ষেপ... অ্যাম্বিয়েন্সটা ভালই লাগছে। স্টুয়ার্ড অর্ডারের অপেক্ষায় "ভাল ফ্রেঞ্চ ওয়াইন কী আছে?"

“ভিগ্নেস ডি’ পল ভ্যালমন্ট ব্ল্যাংক বা লং স্যাম্পস ব্ল্যাংক”

“ব্ল্যাংকের সঙ্গে স্যাক্স কী পাওয়া যাবে?”

“স্মোকড চিকেন টারট দিই। খেয়ে দেখুন, ভালই লাগবে”

“বেশ, তাই দাও”

স্টুয়ার্ড অর্ডার নিয়ে চলে যেতে, ফিরে তাকাল জলের দিকে। কিছুক্ষণ আগে জমে ওঠা মেঘটা সরে গেছে। দিনের আলো হারিয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যার আকাশে। গঙ্গার ওপর বিদায়ের শেষ আভা। নিঃশেষ অর্থহীন আলোর বর্ণ। অন্ধকার সেজে উঠছে, নতুন রূপে, আভরণে। তারাগুলো সন্ধ্যার আঁচলে মায়াময়।

গ্লাসে ওয়াইন... কিছুক্ষণ...

গঙ্গার জলে কালচে ঝিলিক। দূরে নৌকোটা আবছায়ায় ক্রমশ ক্ষীণ। আজ কী পূর্ণিমা? এখানে কোনও পাগলের মুনলিট সোনাটা নেই। মাঝির গলা ফাটানো ভাটিয়ালি নেই। তবু ভরপুর...

ওয়াইনে অলস চুমুক। বিস্তীর্ণ অন্ধকারের মধ্যে টিমটিম আলোগুলো জ্বলছে। তার চাওয়া, নতুন স্ফুলিঙ্গ, উত্তরণের সোপান। এখানে অনেক কম্ফর্ট। দূরে কোথাও একটা সাইরেন, লঞ্চের ভোঁ তোড়জোড় চলছে কোথাও যাওয়ার। দেওয়ালির তাড়া নেই। আবর্ত থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। মহাশূন্যে। শান্তির কোলে।শুধু পূর্ণতার ক্যাডেন্সেশ্যাম কল্যাণ বাজছে। নতুন আমেজ।

“স্মোকড চিকেন টারট” বেয়ারা সাজিয়ে দিল “আর কিছু?”

“এখন না। পরে...”

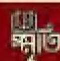
রাস্তার ওপাশের ঝলমলে স্টেট ব্যাঙ্কের আলোর দিকে ফিরে তাকাতে মন চাইছে না। ছোটার টানে ভুলেছিল গন্তব্য। বসুন্ধরার প্রমিথিয়াসের ‘স্ফুলিঙ্গ’ চিনিয়েছে তাকে। র‍্যাট রেসের বাইরেও একটা নিশানা আছে, যা জ্বলতেও পারে। অবক্ষয়ী উন্মাদনার বাইরে মহাবিশ্বের অজানা তারা হয়ে। দূরে দিগন্তে তাকিয়ে। সে আবিষ্কার করেছে পূর্ণতাকে। কে বুঝল বা বুঝল না, তাতে কী?

ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বার করে সিএলআই দেখল, প্রকাশদা।

ক্রিং... ক্রিং... ক্রিং... বেজেই চলেছে।

কয়েক মুহূর্ত...

মোবাইলটা ছুড়ে দিল। গঙ্গার জলে।



SMRITI PUBLISHERS
ESSENCE OF CREATIVITY
www.smritipublishers.com